LAKHMI
হীরক
জয়ন্তী
১৯০৩ বৎসর ১৯৬৩
লক্ষ্মী ঘি
খাদ্য-দ্রব্য সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত ও পুষ্টিকর করিতে
লক্ষ্মী-ঘি অপরিহার্য

সূচীপত্র

বাজেটে
সাজের খাত!
হ্যাঁ, বেশি খরচ না করেও আপনি এক সুন্দর তোশাখানার মালিক হতে পারেন। প্রত্যেক মহিলাই তাঁর বাজেটের মধ্যে খাটাউ ভয়েলস-এর সুন্দর সুন্দর শাড়ি পাবেন। সকালের স্নিগ্ধ সাজের জন্য আছে মনোরম হাল্কা রংয়ের ভয়েল, প্রগলভ বিকেলের জন্য রয়েছে হালফ্যাশনের ছাপা শাড়ি আর সোনাঝরা সন্ধ্যার জন্য আছে সোনালী ছাপের গাঢ় রংয়ের শাড়ি।
সব সময়..
সব জায়গায়...
সব অনুষ্ঠানে...
আপনাকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়
খাটাউ
ভয়েলস-এ
"পাড়ের প্রতি মিটারে খাটাউ মিলস ছাপ দেখে নিন"
দি খাটাউ মাকঞ্জি স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোং লিঃ
হেড অফিসঃ লক্ষ্মী বিল্ডিং, ব্যালার্ড এস্টেট, বোম্বাই-১
মিলস ঃ হেইনেস রোড, বাইকুল্লা, বোম্বাই-২৭
হোলসেল ক্লথ শপঃ গোবিন্দ চক, মুলজী জেঠা মার্কেট, বোম্বাই-২
জয়ের শপথ নিন — বেশি ফলান — বেশি সঞ্চয় করুন

এ্যানটল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

দেবযানী

রবিন
ব্লু
Robin Ultramarine

REGISTERED TRADE MARK
ভারতের সর্ব্বজন
প্রশংসিত
এন,সি
নস্য
—প্রস্তুতকারক—
এন, সি, আর্য স্নাফ ফ্যাক্টরী—মাদ্রাজ-১
কলিকাতা অফিস—৯২এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

COMET
আঁধার
রাতে
পথ চ'লতে
BEEVAS/DC/18
ডজ এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলিকাতা-১৪

উজ্জ্বল দাঁত
ও সুস্থ মাড়ির জন্য
বনকো
টুথ পেষ্ট
Bonko
TOOTH PASTE
বেংকল প্রাইভেট লিমিটেড • কলিকাতা-৩৭

সেরা এনামেলের বাসন
রিফ্লেক্টর
বাসনপত্র
হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য
জলের বোতল
এনামেলের সাইনবোর্ড ইত্যাদি
বেঙ্গল এনামেল
ওয়ার্কস লিঃ
৩০/২ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
একমাত্র বিক্রয় প্রতিনিধি :
সেরামিক সেলস্ করপোরেশন
২৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২

The heavenly fragrant cologne that lingers longer..
777
three sevens
EAU-DE-COLOGNE
777

Stay flower fresh
all over—
all day...

বাংলার প্রাচীন পট

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শ্রী আর সি দত্তের সৌজন্যে

'এ যুগে আবার মা গো! দুর্গতি নাশিতে জাগো—
এসে নিজে, রক্তবীজে নাশো সেই মূর্তি ধরে।'

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

মাতৃপূজা

বাঙালীর ঘরে মা আসিয়াছেন। কেমন আমাদের মা? সিংহ-পৃষ্ঠবিহারিণী আমাদের জননী—দশভুজে তিনি দশপ্রহরণধারিণী। তাঁহার দক্ষিণে সৌভাগ্য স্বরূপিণী লক্ষ্মী। বামে বিদ্যাদায়িনী বাণী। সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং বলরূপী কার্তিকেয়। ষড়ৈশ্বর্য-শালিনী আমাদের মা।

বাঙালীর মানস-লোকে বিশ্বজননীর দেবী দুর্গারূপে জাগরণ এক অবিচিন্ত্য ব্যাপার। বাঙালী ব্যতীত বিশ্ব-জগতের আর কেহ বিশ্বাতীত অনন্ত সত্তাকে আত্মভাবের এমন ব্যক্তচেতনায় অনুভব করিতে পারে নাই। বাঙালী মাকে পাইয়া নিজেকে পাইয়াছে। বিশ্বজননীকে বিশ্বাত্ম-ভাবনায় একান্ত এবং জীবন্তভাবে উপলব্ধি করিয়া সে বিশ্বকে আপন করিয়া লইয়াছে।

মাতৃ-যজ্ঞের হোমানল-শিখা নির্বাপিত হয় না। দেবীর পূজামণ্ডপে ধূমায়িত দিব্যধূপে আমরা তাঁহার পুণ্য সৌরভ অনুভব করিতেছি।

আমরা মাকে ঘরে পাইয়াছি। 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমরা তোমায় ছাড়ব না মা।' আমাদের সর্বস্ব দিয়া আমরা মায়ের পূজা করিব। সন্তান-স্নেহময়ী আমাদের জননী। সন্তানের সেবাতেই মায়ের সেবা। আমরা মায়ের আর্তপীড়িত অসহায় সন্তানগণের দুঃখ দূর করিব। আমরা তাহাদের অশ্রু মুছাইব। দনুজদলনী জাগিবেন। মায়ের হাতে রক্তমাখা খড়্গ দুলিয়া উঠিবে। নরশোণিত-লিপ্সু অসুরের দল নির্জিত হইবে। পাতালপুরে তাহারা পলাইবে। স্বার্থ সঙ্কীর্ণতার অচলায়তন বিধ্বস্ত হইবে। দেবগণ জয়ধ্বনি করিবেন। দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইবে। দিকে দিকে মঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিবে। আমাদের মাতৃপূজা সার্থকতা লাভ করিবে।

কেমন মা

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে জগজ্জননী দেবীর পরিচয় আছে। অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ব্রহ্ম বিদুষী হইয়াছিলেন। তিনিও ঋষি। তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা। তিনি ব্রহ্মশক্তিকে আত্মা-রূপে অনুভব করিয়া তাঁহার উপলব্ধি যে মন্ত্রে অভিব্যক্ত করেন তাহাকেই দেবীসূক্ত বলা হয়। দেবী বাকের উক্তি হইতে মনে হয়, তিনিই নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি ব্রহ্মতুল্য চিৎবস্তু। মায়াবদ্ধ জীব দেহে আত্মবুদ্ধিবশে জড় দেহকেই 'আমি' বলিয়া মনে করে। ইহা অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফল। ইহাকে বলা হয় মোহ। এই মোহ বিদূরিত হইলে জীব বুঝিতে পারে যে, সে জড়দেহ নহে। সে চিদ্‌বস্তু। ব্রহ্ম যেমন চিদ্‌বস্তু, ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া সেও চিদ্‌বস্তু। দেহে এইরূপ আত্মবুদ্ধির অপনোদনের সহায়কস্বরূপে জীব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অর্থাৎ আমি অচিৎ নহি, পরন্তু ব্রহ্মের ন্যায় চিৎতত্ত্ব, এইরূপ চিন্তা করিতে পারে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বামদেব ঋষির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঋষি ব্রহ্মকে অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন—'আমিই মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্যও হইয়াছিলাম'। এখন তিনি বুঝিতেছেন যে, 'আমিই ব্রহ্ম।' তিনি সব হইয়া থাকেন অর্থাৎ সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন। আচার্য শঙ্কর জীব ও ব্রহ্মের সর্বতোভাবে একত্বের কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে শুদ্ধ ব্রহ্মই মায়িক উপাধি-যোগে জীব হইয়া থাকেন। দেহরূপ উপাধি হইতে মুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মস্বরূপই থাকেন।

কিন্তু তাঁহার এই মত শ্রুতিবাক্য হইতে সিদ্ধ হয় না। শ্রুতির মতে সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক এবং ব্রহ্মই জগৎরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং জীবও ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জীব ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। তাঁহার চিৎস্বরূপত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, তিনিও ব্রহ্ম। বামদেব ঋষি স্বকীয় স্বরূপত্ব এইরূপভাবে উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, তিনি মনু হইয়া-ছিলেন, সূর্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ সব ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্মাত্মকত্ব বিষয়ে তাঁহার সহিত মনুসূর্যাদির পার্থক্য নাই। প্রকৃতপক্ষে ইহার দ্বারা বামদেব ঋষি নিজেই যে ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত তাঁহার কোনরূপ পার্থক্য নাই ইহা প্রমাণিত হয় না। পার্থক্যই যদি না থাকিবে, তবে আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য হইয়াছিলাম, ইহা মনে করিবে কে?

দেখা যাইতেছে, বামদেব ব্রহ্ম সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 'আমিই মনু হইয়াছিলাম, সূর্য হইয়াছিলাম।' ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, বামদেব ব্রহ্মের পরস্ব-রূপের উপলব্ধিতে ব্রহ্মের জ্ঞান এবং আনন্দের সহিত ব্রহ্মের অপর স্বরূপ অর্থাৎ বিকারধর্মী বিশ্ব-প্রপঞ্চও উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন। ইহা উপলব্ধি না করিলে তিনি আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য হইয়া-ছিলাম, এই ধরনের কথা বলিতেন না। বস্তুত তিনি তাঁহার উক্তির দ্বারা ব্রহ্মের পরা এবং অপরা, মূর্ত এবং অমূর্ত, বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত উভয় বিভূতিরই মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মাত্মক অনুভূতিতে জীব এবং ব্রহ্মে পৃথক অস্তিত্বের অনুভব থাকে। ব্রহ্মবিদগণের বন্দনীয়া বাক্ দেবীও দেবীসূক্তে তাঁহার এই ব্রহ্মাত্মক ভাবটি ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মকে আত্মা বলিয়া অনুভব করিয়াছেন। শ্রুতির মতে ব্রহ্ম সর্বেশ্বর। তিনি সর্বভূতের অধিপতি। তিনি সর্বভূতের পালক। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন, তিনি সকলের কারণ—ইন্দ্রিয়াধিপতি। তিনি জীবগণেরও অধি-পতি। তাঁহার কেহ জনক নাই, অধিপতিও নাই। দেবীসূক্তোক্ত ব্রহ্মের স্বরূপ এমনই। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মের কোন শক্তি স্বীকার করেন না, কিন্তু দেবীসূক্তোক্ত ব্রহ্মের সর্ব-শক্তিমত্তা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মকে জগতের উৎপত্তি এবং নিমিত্তকারণ উভয়-স্বরূপে নির্দেশ করিয়া দেবীসূক্তে ব্রহ্মের পরিণামবাদই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

'ভগবান সম্বন্ধ ভক্তি অভিধেয় হয়
প্রেম-প্রয়োজন বেদে তিন বাক্য কয়।'

যুক্তিস্বরূপে প্রভু ভাগবতের চতুঃশ্লোকীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

'প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে হয়
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতে কয়।'

নারায়ণ ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন। প্রভু ইহাও বলিয়াছেন যে, চতুঃশ্লোকীর সূত্রটি ঋগ্বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে—'ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক-নিবন্ধন।' প্রভুর মতে ঋক্ মন্ত্র-বিধৃত এই চতুঃশ্লোকীতে জীবজগতের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পরব্রহ্ম শ্রীভগবান বলিতেছেন—

'সৃষ্টির পূর্বে ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ আমি হইয়ে
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে।
সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমি ত বসিয়ে
প্রপঞ্চ যে দেখ সব সেহ আমি হইয়ে।
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে
প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে।
'অহমেব', 'অহমেব' শ্লোকে তিনবার
পূর্ণৈশ্বর্য বিগ্রহের স্থিতি নির্ধার।'

দেবীসূক্তেও এই একই সুর। চতুঃশ্লোকীতে তিনবার অহং অহং এবং দেবীসূক্তে অষ্টাত্মক এই মন্ত্র অর্থাৎ ইহাতে আটবার অহং অহং উচ্চারিত হইয়াছে এবং সেই উচ্চারণ জীব-জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিচারে। জীব ব্রহ্মসাযুজ্য বা কৈবল্য লাভ করিলে ব্রহ্মের সম অবস্থা প্রাপ্ত হয় শ্রুতিতে এই সিদ্ধান্ত আছে। 'সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা'—কিন্তু এই সমস্ত শুধু ভোগের সম্বন্ধ। সে অবস্থায় জীবের অধিকার 'জগদ্ব্যাপার বর্জ' অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে মুক্ত বা কৈবল্য বা সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব কোন অধিকার লাভ করে না। 'ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ' ব্রহ্মসূত্রের ইহাই নির্দেশ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ বিশ্লেষণকালে বলিয়াছেন, শোন দেখি, চন্দ্র সূর্য এই ব্রহ্মের শাসনে বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে। দ্যুলোক এবং পৃথিবী সর্বত্র চলিতেছে ব্রহ্মের প্রশাসন। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, এই ব্রহ্মের ভয়ে সূর্য উদিত হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি, ইন্দ্র ও মৃত্যু নিজ নিজ কার্যে ধাবিত হইয়া থাকে।

দেবীসূক্তে আমরা ব্রহ্মের এমন সর্ব শক্তিযুক্ত স্বরূপেরই পরিচয় পাই। জীব মুক্তি লাভ করিলে ব্রহ্ম হইয়া যায়, সূক্তে এরূপ নির্দেশ নাই কিংবা জগৎ মিথ্যা সূক্তে ইহাও প্রমাণিত হয় না। পক্ষান্তরে জগৎ-ব্রহ্মেরই শক্তি, সুতরাং ব্রহ্ম যেমন সত্য, সেইরূপ জগৎও সত্য। ব্রহ্ম সনাতন এবং নিত্য—এইখানে জীবের সহিত ব্রহ্মের অভেদ। জগৎ পরিবর্তনশীল। সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক বলিয়া বিকারধর্মী। এইখানে জীব ও ব্রহ্মে ভেদ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীবের যুগপৎ ভেদাভেদ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ চিন্ময়।

'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম কবয়োঃ বিদুঃ'—ব্রহ্ম শুধু বৃহৎ নহেন, তিনি জীবকেও বাড়ান, এজন্যই তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের এই শেষোক্ত গুণটি স্বীকার করিতে গেলে জগৎকে মিথ্যা মানা চলে না। প্রত্যুত জগতের জড়ত্ব এবং নশ্বরত্বের পরিপ্রেক্ষাটি আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মের জীবকে বাড়াইবার নিজ স্বভাবটি আস্বাদন করেন এবং এইটি তাঁহার লীলা। জগৎ জড় এবং নশ্বর বিকারধর্মী বলিয়াই ব্রহ্ম জীবকে বাড়াইতে ব্যাকুল, এইটি ব্রহ্মের বীর্য এবং মাধুর্য। ইহার বলে জীব ব্রহ্মের আত্মসম্বন্ধ আস্বাদনে নিজের স্বরূপ-ধর্মটি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এইভাবে জীব ব্রহ্মের উভয়ের সম্বন্ধসূত্রে 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি' ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই শ্রুতিবাক্য সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে।

'জীব নিস্তারিব এই ঈশ্বর স্বভাব'—শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি। দেবীসূক্তের প্রত্যেকটি মন্ত্রে ব্রহ্মের এই স্বভাবটির মাহাত্ম্য এবং মাধুর্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। সন্তানরূপী জীবের স্নেহে মাতৃমহিমা ঔজ্জ্বল্য লাভ করিয়াছে। মন্ত্রের বর্ণে বর্ণে জীবের অন্তর-শতদলে মায়ের চিন্ময় বিগ্রহ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃপূজার আগ্রহ এইভাবে জীবের অন্তরে উজ্জীবিত করিয়া মা তাঁহার পূজার প্রকরণ নিজেই জীবকে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ জীব স্বভাবত বহির্মুখ। তাহাদের অন্তরে মাকে পাইবার জন্য আগ্রহের অভাব ঘটিতে পারে, কিন্তু মায়ের স্বভাবে সে ভাবটির যে একান্তই অভাব। মা আমার মহাভাবময়ী। তিনি সন্তানকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, আমি যে তোমাদের কত আপন তাহা তোমরা জান না। আমি বিত্তের চেয়ে প্রিয়। পুত্রের চেয়ে প্রিয়। তোমাদের যত কিছু আছে সবচেয়ে প্রিয়, এই সত্যটি তোমরা উপলব্ধি করিতে পার নাই, তাই তোমরা সংসারে নানারূপে ক্লেশভোগ করিতেছ। হে আমার প্রিয় সন্তানগণ, তোমরা শ্রদ্ধাবান হও। ব্রহ্মবস্তু শ্রদ্ধা না হইলে মিলে না। শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে আমার কথাটি শুনিবার জন্য কান বাড়াইয়া দাও—আমি তোমাদিগকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব। তোমাদিগকে আমিই সে কথা শুনাইব। সে কথা আমিই তো সর্ব বেদে বলিয়াছি। আমিই বেদান্তকৃৎ বেদবিৎস্বরূপে তোমাদিগকে সে কথা শুনাইয়াছি।

শ্রবণেই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মূল রহস্য নিহিত। আত্মা শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য। শ্রবণ করান দেবী। 'শৃ' ধাতুর একটি অর্থ হিংসা বা বিনাশ, অপর অর্থ গুণের বিস্তার করা বা শোনান। এই দুইটি ধাতুগত অর্থ হইতে এই শব্দটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। মায়ের দুই কাজ—সন্তানের পথের বাধা নাশ করা এবং তাহাকে নিজের কথা শুনাইয়া মাতৃ-বীর্যের আস্বাদনে তাহার অবীর্য দূর করিয়া স্বরূপধর্মে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করা। চণ্ডী বলেন—'শ্রীকৈটভারি-হৃদয়ৈক কৃতাধিবাসা' অর্থাৎ কৈটভারি যিনি তাঁহার হৃদয়ে একচ্ছত্র অধিকার স্থাপন করিয়া যিনি বিরাজ করেন তিনিই শ্রী। 'গৌরীত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা' অর্থাৎ তিনিই আবার শিবসীমন্তিনী দুর্গা। দুই-ই এক। মা-ই মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি কখনো দেবতা কখনো মানুষী তনু ধারণ করিয়া মা। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে মা দেবতারূপে ব্রহ্মার পথের বাধা অপসারিত করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। অহং, অহং উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মাকে তিনি তাঁহার পাকা আমিটি তাঁহাকে ধরাইয়া দেন। দেবীসূক্তে মা কন্যারূপিণী। তিনি মানুষী তনু আশ্রয় করিয়া বিশ্বের জীবের নিকট তাঁহার আত্মস্বরূপটি উন্মুক্ত করেন। আকারটি দুই কিন্তু অধিকার একজনেরই।

দেবীসূক্ত চণ্ডীর বীজস্বরূপ। এখানে শ্রবণই প্রথম। দেবী মেধস মুনিকে আচার্যরূপে অবলম্বন করিয়া রাজা সুরথ এবং সমাধি বৈশ্যকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। তাঁহাদের পথের বাধা তিনি দূর করেন। শ্রবণ না হইলে লীলার স্ফুরণ ঘটে না। ভাগবত বলেন, ভগবানের পথ শুনিয়া দেখিতে হয়। মেধস মুনির মুখে এই দেখাই আমরা দেখিলাম। তাঁহার মাতৃমাধুর্যের স্ফুরণের কৌশলটি কেমন অন্তরে উপলব্ধি করিলাম। আমাদিগকে আপন করিয়া লইবার জন্য চৈতন্যস্বরূপিণী মায়ের নিত্য লীলার বদান্য মহিমা আমরা মন্ত্রমাহাত্ম্যে অখণ্ডভাবে অনুভব করিলাম। মধুকৈটভ, মহিষাসুর এবং শুম্ভ-নিশুম্ভের নিঃশেষচ্ছেদে চিদানন্দময়ী জননীর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। আমাদের ব্রহ্মগ্রন্থি, বিষ্ণুগ্রন্থি এবং রুদ্রগ্রন্থি উদ্ভিন্ন হইল—আমরা শরণাগতির পথে পাইলাম আমাদের মাকে। মন্ত্রমূর্তিকে আশ্রয় করিয়া মা আমাদের কাছে আসিলেন তাঁহার চিন্ময় মূর্তিতে ঈষৎসহাস ও অমল পরিপূর্ণ চন্দ্রবিম্বানুকারী কনকোত্তম কান্তি লইয়া। আসিলেন তিনি আমাদের কাছে দারিদ্র্য দুঃখহারিণীরূপে শ্রীস্বরূপে। আসিলেন ভগবতী সাজিয়া। ঋক্ মন্ত্রে শ্রবণ, যজুঃমন্ত্রে যজন এবং সামচ্ছন্দে আমাদের কণ্ঠে উদ্গীত হইল মায়েরই জয়গান। এইভাবে আমরা মাতৃপূজায় নিজদিগকে নিবেদন করিয়া দিলাম। শ্রবণ হইতে সাধনা পরিপূর্তি লাভ করিল কীর্তনে—'বিকাশিবক্ত্রাস্তু বিকাশিতাশাঃ' দেবগণেরও মাতৃমহিমা কীর্তনে এইরূপ মুখ খুলিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা দিব্য দেহ লাভ করিয়াছিলেন—পাইয়াছিলেন শুম্ভ-নিশুম্ভের নিপাতে মাতৃ-মহিমা কীর্তনে। আমিত্বের বিলয়ে উঠিয়াছিল মাতৃভক্তের মুখে জীবনের জয়গান। সর্বেন্দ্রিয়ে মাতৃ-সম্বন্ধ তাঁহারা আহ্লাদ করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাদিগকে কোলে-বুকে টানিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা পাইয়াছিলেন অজস্র চুম্বনে মায়েরই উপস্পর্শ। সে অবস্থায় সবই আনন্দময়।

ব্যাপারটি এই যে, ভাগবতের চতুঃশ্লোকী

যিনি পরব্রহ্ম তিনি ব্রহ্মাকে উপদেশ করেন, দেবীসূক্তও উপদেশ করিলেন তিনিই কন্যা-রূপে—উপদেশ করিলেন সমগ্র জগতে তাঁহার সন্তানগণকে। যিনি পরব্রহ্ম জগতের যিনি মা, তিনিই আসিলেন কন্যারূপে। মা ও মেয়ের এই মিলিত বীজটি মেধসমুনির মুখে চণ্ডীতে মন্ত্ররূপে মূর্তি লাভ করিল; ব্যক্ত হইল লীলায় প্রথম চরিত, মধ্যম চরিত এবং উত্তর চরিতে। বাঙলা দেশে দেবীকে আমরা পাইলাম মা এবং মেয়ে এই নিজ বীর্যের পরম মাধুর্যে। চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ চিন্ময় বিগ্রহে। মধুকৈটভ বধে যাঁহার উদার প্রভাব স্পর্শে বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়াছিলেন, মহিষাসুর বধে যিনি নিঃশেষ দেবগণসমূহ মূর্তিরূপে দিগন্তর জ্বালায় ব্যক্ত করিয়া আগুনের খেলা খেলিয়া-ছিলেন, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধে সর্বদেবময়ীরূপে ভূলোক-দ্যুলোক দীপ্ত করিয়া আত্মমাধুর্য বিস্তার করিয়া সন্তানকে যিনি আলিঙ্গন করিয়া লইয়াছিলেন—বাঙালীর কাছে একাধারে দুর্গা হইয়া তিনি আসিলেন।

বাঙালীর দুর্গোৎসবে নবপত্রিকাস্বরূপে যিনি পূজা পাইতেছেন তিনিই হইলেন মধুকৈটভনাশিনী। চণ্ডীর প্রথম চরিতের তিনিই মন্ত্রমূর্তি। প্রলয়কালে সমগ্র সৃষ্টি বীজস্বরূপে ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করে। বদ্ধ জীব তাহার কর্ম-সংস্কার লইয়া সুপ্তভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কর্ম বন্ধন তাহার কাটে নাই। জীবরূপে ব্যক্ত হইবার ইচ্ছারূপ সংস্কার হইতে সে মুক্ত হয় না। বদ্ধাবস্থাজনিত অহং মমতা-বুদ্ধিকে বিস্তার করিয়া সে নিজকে আস্বাদন করিতে চায়। এইভাবে পড়িতে চায় পুনরায় জন্ম কর্ম-চক্রের আবর্তনের মধ্যে। বিশ্বজননী তাহার সে ইচ্ছাটি পূর্ণ করিবার জন্য তাহাকে অসংখ্য যোনি ভ্রমণ করান। এইভাবে জন্ম হইতে জন্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া মাতৃসেবার আগ্রহ তাহার অন্তরে যেদিন উদগ্র আকার ধারণ করে, সংসারে সে আর শান্তি পায় না। স্বরূপত সে মায়ের সন্তান এই বোধটি যেদিন তাহার অন্তরে জাগ্রত হয় এবং সে মাতৃ-সেবায় আত্মনিবেদন করে—তাহার পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। এই বোধ জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত বেদান্তমতে জীবকে চন্দ্র-লোক হইতে ওষধিজাত শস্যকে আশ্রয় করিয়া নানা দেহে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়। নব-পত্রিকারূপে মা জীবরূপী কর্মসংস্কারাবদ্ধ সন্তানকে প্রলয়কালে এইভাবে বহন করিয়া থাকেন। কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং মোহ-রাত্রি—মায়ের এই স্বরূপ। যাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট, যাহাতে স্থিত এবং যাহাতে এই জগৎ প্রলীন হয়—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এইটি জানিতে পারিলে জীবের কর্মবন্ধন কাটিয়া যায়। নবপত্রিকাস্বরূপে দেবীর পূজায় এই চেতনা লাভের জন্যই প্ররোচনা রহিয়াছে। মায়ের বুকে রহিয়াছে সংস্কারাচ্ছন্ন মাতৃ-চৈতন্যহীন সন্তানের জন্য বেদনা। এই বেদনা সন্তান বুঝিলে তাহার জন্ম-জন্মান্তরের বীজস্বরূপ মূলে সংস্কার ধ্বংস হইবে, হইবে মধুকৈটভ বধ।

মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গার আর একটি ভাব। এই মূর্তির মননকে অবলম্বন করিয়া মায়ের যজন, পূজন—তাঁহার মনন করিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে সাধনার মূলে আত্মসম্বন্ধটিই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। মা আমাদের জন্য কি করিতেছেন এইটি আমরা অন্তরে সত্যস্বরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমরা মায়ের ভক্ত হইতে পারি না এবং মাতৃভক্তিরূপ ভজন-সম্পত্তিও আমাদের অধিগত হয় না। মায়ের পূজা তো আমাদের এই মন, বুদ্ধিতে এবং আমাদের জড় উপচারে সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হয় না। দেবোদ্যানজাত পারিজাতাদি পুষ্পে মায়ের পূজা করিতে হয়। দিব্য সুগন্ধ এবং অঙ্গ-রাগে করিতে হয় মায়ের অর্চনা। মোহরূপ মহিষাসুর আমাদের হৃদয়রূপ নন্দনকানন অধিকার করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং মায়ের পূজা করিতে যে প্রয়োজন মহিষাসুর বধের। মায়ের কৃপায় মহিষাসুর বধ হইলে তবে দেবতারা মায়ের সেবার উপযোগী দেহ লাভ করিয়াছিলেন—মায়ের চরণে সার্থক হইয়া-ছিল তাঁহাদের প্রেমভক্তিময় প্রণতি। বীরেন্দ্র-সিংহ পৃষ্ঠবিহারিণী আমাদের মা মহিষ-মর্দিনী।

অনেকরূপে আত্মমূর্তি প্রকটিত করিয়া সর্বদেবময়ীস্বরূপে মা আমাদের সর্বতোভাবে সমাশ্রয় দিতেছেন। তাঁহাকে পাইলে সবই পাওয়া গেল—সিদ্ধ হইল আমাদের সর্বার্থ।

আমরা আমাদের সর্বকর্মের মধ্যে মায়ের শুভহস্তটি সম্প্রসারিত রহিয়াছে, এই সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিব। আমরা সর্ব সম্বন্ধে লাভ করিব মায়েরই সম্বন্ধ—মাতৃসেবারই আনন্দ। আমরা বিশ্বময় মায়ের ভাবটি উপলব্ধি করিব। আমরা হইব বিশ্বেশ্বরীর সন্তান। আমাদের ব্যষ্টিবোধ বিশ্বে সমষ্টি-চেতনা লাভ করিবে। এইটিই মায়ের উত্তর চরিত্র—লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ চিদৈশ্বর্য পরিপূর্ণ মায়ের বিগ্রহ। মায়ের এই গোটা হইয়া ফোটা রূপটিই আমরা দেখিতেছি। আমরা পাইয়াছি মাকে ত্রয়ী-রূপে, পাইয়াছি ত্রিবৃৎ-তত্ত্বে। পাইয়াছি তাঁহার পরিপূর্ণ মাধুর্য-বীর্যে—আমরা পাইয়াছি মাকে একাধারে মা এবং কন্যারূপে, আমরা পাইয়াছি মাকে আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে। ফলত মায়ের এই যে দুর্গা-রূপ ইহা অবতার নয়, স্বয়ং অবতারী। দুর্গম নামক অসুরকে বধ করিবার জন্য দেবী শাকম্ভরীরূপে চতুর্বিংশত মহাযুগে অবতীর্ণ হইবেন এইরূপ শাস্ত্রে আছে। বর্তমান যুগ অপেক্ষায় একাদশটি মহাযুগ অতীত হইলে তবে সে কাল আসিবে। বস্তুত জীব যখন দুর্গত হইয়া মাকে ডাকে তখনই তিনি দুর্গারূপে আবির্ভূত হইয়া অসুরদল দলন করেন, সন্তানকে আপন করিয়া লন। সন্তানের জন্য মায়ের এই সংগ্রাম মূর্তিই অধ্যাত্মবিজ্ঞানে নিত্য সত্য। মায়ের এই যে দুর্গারূপ, এই রূপে তিনি সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। ইনি নিত্য, ইনি জগন্মূর্তি। ইনি নিজ মহিমায় দ্যুলোক, ভূলোক সর্বত্র সম্প্রবিষ্ট। আমরা চিন্ময়ী মাকে পাইয়াছি মৃন্ময়ীরূপে। আমাদের দেবী দশভুজার স্বরূপতত্ত্বটি এমনই। এমনই আমাদের মা। বাঙলার ভক্তকবি গোবিন্দ রায় গাহিয়াছেন—

'দশভুজা রূপ হেরি ভেবেছ রূপের শেষ
অন্তরে দেখিলে মায়ের দেখিবে অনন্ত বেশ।
ধরতে গেলে জ্ঞানের আলো লুকিয়ে যায়
ওঙ্কারে
ওঙ্কার মুরতি রে মন, চিনো কি রে
উঁহারে?'

ব্রহ্ম হরিদাস

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই অমারাত্রির অবসানে অরুণোদয়ের শুভ মুহূর্তে যে পুণ্যশ্লোক পরমভাগবত উচ্চকণ্ঠে হরিনাম কীর্তনে দেশের কলুষরাশি অপসারিত করিয়াছিলেন, তাহারই অতি স্মরণীয় নাম ব্রহ্ম হরিদাস। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্য-প্রকাশের অব্যবহিত মাহেন্দ্রক্ষণে যাঁহার নয়নাসার মাটীর মর্তকে মালিন্যমুক্ত করিয়াছিল, যাঁহার অঙ্গস্পর্শে বাঙ্গলার আকাশ-বাতাস পবিত্র হইয়াছিল বৈষ্ণব-সাহিত্যে তিনিই ব্রহ্ম হরিদাস নামে সুপরিচিত।

ইঁহারই অন্যতর আখ্যান যবন হরিদাস। প্রচলিত বিশ্বাস এই মহাত্মা যবন কুলেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গগত ঐতিহাসিক বন্ধুবর সতীশচন্দ্র মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন, হরিদাস ব্রাহ্মণ সন্তান। যশোর-খুলনার ইতিহাস ১ম খণ্ডের ২য় সংস্করণে তিনি এই কথা লিখিয়াও গিয়াছেন। আমি আজ সেই বিরল প্রচার অধুনালুপ্ত গ্রন্থখানি হইতে সংক্ষেপে ব্রহ্ম হরিদাসের কথা বিবৃত করিতেছি।

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিয়াছেন—

বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশে কীর্তন প্রকাশ।

যশোর-খুলনার ইতিহাসে বূঢ়নের পরিচয় এইরূপ। × × × সাতক্ষীরা ও খুলনা সদর উপবিভাগের অধিকাংশ এই বৃদ্ধ দ্বীপের অন্তর্গত। এখনও সাতক্ষীরা শহরের উত্তর পশ্চিমাংশে যমুনা-ইছামতী হইতে কপোতাক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রকাণ্ড বূঢ়ন পরগণা পূর্বতন দ্বীপের স্থান নির্দেশ করিতেছে। (১৩৮ পৃঃ)

জয়ানন্দ স্বপ্রণীত চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

স্বর্ণ নদীতীরে ভাট কলাগাছি গ্রামে।
হীনকুলে জন্ম হয় উপরি পূর্ব নামে॥

বূঢ়ন পরগণায় সোণাই নামে নদী আছে। নদীতীরে ভাট এবং কলাগাছি গ্রামও আছে। কলাগাছি গ্রামই হরিদাসের জন্মস্থান। জয়ানন্দ বলিয়াছেন, হরিদাসের

"উজ্জ্বলা মাতার নাম পিতা মনোহর"

অপর কাহারো মতে হরিদাসের মাতার নাম গৌরী দেবী, পিতার নাম সুমতি শর্মণা। সতীশ মিত্র মহাশয় বলেন—প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক গোঁসাই গৌরাচাঁদ স্ব-রচিত শ্রীশ্রীসংকীর্তন বন্দনায় লিখিয়াছেন—

মনোহর চক্রবর্তী সুমতি ব্রাহ্মণ।
জপা তপা যাহাল ব্রাহ্মণের আচরণ॥

সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন—"মনোহর চক্রবর্তী সুব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠী ছিল। মনোহরের পূজিত শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের নাম শ্রীনন্দকিশোর ও শ্রীবাসুদেব। মনোহরের বাসুদেব বিগ্রহ নিকটবর্তী বিথারী গ্রামে শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের গৃহে অধিষ্ঠিত আছেন। কলাগাছি গ্রামে এখনো লোকে মনোহরের ভিটা দেখাইয়া দেয়। আমরা সে গ্রামে গিয়া সে ভিটা দেখিয়াছি। বিশেষত মনোহরের বংশের এখনো কেহ কেহ জীবিত আছেন। চক্রবর্তী বংশীয়েরা ১৭।১৮ পুরুষ কলাগাছিতে বাস করিতেছেন।" মিত্র মহাশয় অনুমান করেন হরিদাসের জন্মের দুই-তিন বৎসর পরে মনোহর স্বর্গারোহণ করিলে উজ্জ্বলা দেবী পতির চিতায় সহমৃতা হন। এই সময় পিরালীদের অত্যাচারে গ্রামের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক মুসলমান সেই দুর্দিনে হরিদাসকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন। এই মুসলমানের নিবাস হাকিমপুর, নাম হাবিবুল্লা। সতীশ মিত্র একটি কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—"হবুল্লা কাজীর বেটা ব্রহ্ম হরিদাস"।

প্রেম বিলাসের ২২ বিলাসে আছে—হরিদাসের—

বূঢ়নে হইল জন্ম ব্রাহ্মণের বংশে।
যবনত্ব প্রাপ্তি তার যবনান্ন দোষে॥

হরিদাসের বোধ হয় পিতৃ-মাতৃদত্ত নাম একটা ছিল, অনেকে অনুমান করেন হরিনামে অভূতপূর্ব নিষ্ঠার জন্য উত্তরকালে তিনি হরিদাস নামেই বিখ্যাত হন। প্রথম যৌবনেই হরিদাস গৃহত্যাগ করেন, এবং যশোর জেলার বেনাপোল গ্রামের প্রান্তে কুটীর বাঁধিয়া সেখানেই নির্জনে নাম সাধনায় সিদ্ধ হন। নিকটেই কাগজ পুকুরিয়া গ্রাম, এই গ্রামে রামচন্দ্র খাঁ নামে এক জমিদার বাস করিতেন। হরিদাসের নিষ্ঠা এবং তজ্জনিত প্রতিষ্ঠা তাহাকে অসহিষ্ণু করিয়া তোলে। তিনি স্বীয় অনুগৃহীতা এক পতিতাকে হরিদাসের নিকট পাঠাইয়া দেন। উদ্দেশ্য সুন্দরী যুবতী হরিদাসকে ছলাকলায় ভুলাইয়া অধঃপতিত করিবে। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়াছিল। হরিদাসের পুণ্য প্রভাব এই বারবণিতাকে সৎপথে পরিচালিত করে। তিনি আপনার সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া হরিপরায়ণা হইয়া জন্ম সার্থক করেন।

এক শ্রেণীর মানুষ থাকে যাহারা অপরের অভ্যুদয় সহ্য করিতে পারে না। মাৎসর্যের প্রতিমূর্তি ইহারা; কিন্তু ইহাদের প্রতিঘাতই মানুষের উৎকর্ষ শিখরে অধিরোহণের সহায়ক হয়। আমার অনুমান, রামচন্দ্র খাঁর প্রতিহিংসা সহজে প্রতিনিবৃত্ত হয় নাই। প্রতিহত হইয়া তাহা লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। মনে হয় রামচন্দ্র খাঁর প্ররোচনাতেই হরিদাস মুলুকপতির রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। হরিনাম কীর্তনের অপরাধে কাজীর আদালতে হরিদাসের বিচার হইয়াছিল। মুসলমান সমাজ হরিদাসকে মুসলমান বলিয়াই জানিতেন। মুসলমান হইয়া উচ্চকণ্ঠে হরিকীর্তন—গুরুতর অপরাধ? শত অনুরোধেও হরিদাস যখন হরিনাম ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সর্বজন সমক্ষে তাঁহাকে বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়া হয়। পৈশাচিক উল্লাসের নির্মম-হস্ত হরিদাসকে কঠোর প্রহারে জর্জরিত করিয়াছে, কিন্তু মৃতকল্প হরিদাসের নামমাধুর্য প্রমত্ত অমৃত সিক্ত রসনা তিলেকের তরেও হরিনাম উচ্চারণে বিরত হয় নাই। হরিদাস বলিয়াছিলেন—

খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

কাহার প্রভাবে কাহার শিক্ষাগুণে তাহার এই নিষ্ঠায় রতি হইয়াছিল, ইতিহাসে সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই। সম্মুখে তো কোন আদর্শই ছিল না। ব্রাহ্মণ-কুলজাতই হউন, আর যবনকুলজাতই হউন হরিদাস যে কর্ণের সহজাত কবচ-কুণ্ডলের মত এই নিষ্ঠা এই প্রেম লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। প্রহারে প্রহারে প্রপীড়িত হইয়াও নিজের জন্য কোন ক্লেশবোধ নাই।

সবে যে সকল পাপীগণ তাঁরে মারে।
তার লাগি দুঃখ মাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এ সব জীবেরে কৃষ্ণ করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সভার অপরাধ॥

জগতের ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত দুর্লভ। অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াও তৃপ্তি নাই, তাহাদের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রার্থনা, এ এক অভাবনীয় উদাহরণ। এ এক অদ্ভুত চরিত্র। মানুষের ভাষায় ইহার কোন ব্যাখ্যা হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ভক্তরাজ প্রহ্লাদের সাধনার মূর্তপ্রতীক এই ব্রহ্ম হরিদাস।

সপ্তগ্রামের ধনকুবের গোবর্ধন দাস হরিদাসকে শ্রদ্ধা করিতেন। গোবর্ধন পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস প্রথম জীবনে হরিদাসের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন। তাহারই সুফল রঘুনাথের শ্রীচৈতন্য সঙ্গ লাভ, কৃপা প্রাপ্তি। পাঁচশত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের মত

ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানের অন্যতম নেতা আচার্য শ্রীঅদ্বৈত পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে স্বহস্তে হরিদাসকে শ্রাদ্ধান্ন নিবেদন করিয়াছিলেন। যাহা ছিল ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভোজ্য। হরিদাস একটি মূর্তিমন্ত বিপ্লব। বেনাপোল হইতে গৌড় রাজধানী, তথা হইতে ফুলিয়া, সপ্তগ্রাম, শান্তিপুর—এক কথায় সারা বাংলায় তিনি এক অজ্ঞাতপূর্ব আলোড়নে অধ্যুষিত করিয়াছিলেন। প্রেমোন্দাম—অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দের করুণার সঙ্গে সর্বংসহা ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা জেতা—হরিদাসের সুদৃঢ় দার্ঢ্যভক্তির অদৃষ্টপূর্ব নিষ্ঠার শুভ সম্মেলনে যে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহাতে অবগাহনের সুযোগ না পাইলে দুর্ধর্ষ জগাই মাধাই—সুদুরাচার জগাই মাধাই—"সাধুরেব স মন্তব্য" গীতার এই মহাবাক্যের দৃষ্টান্ত স্থলে পরিগণিত হইতেন না, এ কথা একেবারে ধ্রুব সত্য। উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই দুইজনকেই নাম প্রেম প্রচারের আদেশ দান করিয়াছিলেন।

কি সর্বজন অনুসরণীয় মর্যাদাবুদ্ধি। জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন—কিন্তু কিছুতেই হরিদাস ভক্ত গোষ্ঠীতে প্রবেশ করিবেন না। অবশেষে স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব পথে বাহির হইয়া ধরণীর ধূলি হইতে তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন। তিনি কোনদিন দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই, তাই সচল ব্রহ্ম শ্রীশচীনন্দন তাঁহাকে নিত্য দর্শন দান করিতেন। পুরীতে শ্রীরূপ আসিয়াছেন, শ্রীসনাতন আসিয়াছেন, উভয়ে তাঁহার কুটীরেই অবস্থান করিয়াছেন। কত আলোচনা, কত সিদ্ধান্ত, কত গূঢ় রহস্যের গোপন সঙ্কেত শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহার। হরিদাসের সৌভাগ্যের তুলনা হয় না। মহাপ্রভুর কি ভালবাসাই না পাইয়াছিলেন তিনি। তাঁহার দেহাবসানও তেমনই অলৌকিক, সে সৌভাগ্যও কল্পনাতীত।

হরিদাস মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। একমাত্র আচার্য অদ্বৈত ভিন্ন মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে তাঁহার অধিক বয়স্ক কেহ ছিলেন না। একদিন মহাপ্রভুর একান্ত সেবক শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া আসিয়া দেখিলেন হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন। গোবিন্দ জানাইলেন, মহাপ্রসাদ আনিয়াছি। হরিদাস উত্তর করিলেন নাম সংখ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই, অথচ মহাপ্রসাদকেও উপেক্ষা করিতে পারি না। এই বলিয়া তিনি প্রসাদের কণিকামাত্র গ্রহণ করিলেন। পরদিন মহাপ্রভু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ হরিদাস? হরিদাস বলিলেন, দেহ সুস্থ আছে কিন্তু মনবুদ্ধি অসুস্থ।

প্রভু কহে কোন ব্যাধি কহতো নিশ্চয়।
তিঁহো কহে সংখ্যা সঙ্কীর্তন না পূরয়॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হইলা সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর॥
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিল প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি করহ কীর্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন॥
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা।
রৌরব হইতে কাড়ি বৈকুণ্ঠে চড়াইলা॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিয়া।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হইতে।
লীলা সম্বরিবে মোর লয় এই চিতে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার ও চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥

তুমি কৃপাময়, আমার ইচ্ছা পূর্ণ কর। মহাপ্রভু বলিলেন, তুমি যাহা চাহিবে শ্রীকৃষ্ণ তোমার সেই ইচ্ছাই পূর্ণ করিবেন। কিন্তু আমার যাহা কিছু আনন্দ তো তোমাদিগকে লইয়া; আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি তোমার পক্ষে উচিত হইবে। হরিদাস নিবেদন করিলেন, অধমকে দয়া কর, আমার শিরোমণি স্বরূপ কত কোটি ভক্ত তোমার লীলার সহায়ক রহিয়াছেন। আমার মত পিপীলিকা মরিলে পৃথিবীর কি ক্ষতি হইবে।

পরদিন সদলবলে মহাপ্রভু হরিদাসের কুটীরে শুভাগমন করিলেন। অঙ্গনে হরিনাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইল। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। হরিদাস যেমন মহাপ্রভু এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে বন্দনা করিলেন, তেমনই সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ। মহাপ্রভুর মুখে হরিদাসের গুণগ্রাম শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন। চতুর্দিকে হরিবোল হরিবোল ধ্বনি উঠিল। হরিদাস আপনার অগ্রে মহাপ্রভুকে বসাইয়া বক্ষে তাঁহার পদারবিন্দ ধারণ করিলেন, হরিদাসের চক্ষু দুটি সুস্থির হইল গিয়া মহাপ্রভুর মুখারবিন্দে।

স্বহৃদয়ে আনি ধরিল প্রভুর চরণ।
সর্বভক্ত পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম বলে বারবার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম করি উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥

হরিদাসের দেহ কোলে তুলিয়া সংকীর্তনের মাঝে প্রেম বিহ্বল মহাপ্রভু বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে—হরিদাসের দেহ বিমানে স্থাপিত হইল, এবং সকলে মিলিয়া নাম সঙ্কীর্তন করিতে করিতে হরিদাসের দেহ লইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। হরিদাসের দেহকে সমুদ্র জলে স্নান করাইয়া ভক্তগণ তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী চন্দন এবং প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিয়া হরিদাসকে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করা হয়। সেই সমাধিতে স্বয়ং মহাপ্রভুও হরিদাসের অঙ্গে বালুকা মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সমাধির উপর ইষ্টক বেদী নির্মিত হইল। সংকীর্তনরত মহাপ্রভু বেদী প্রদক্ষিণপূর্বক সমুদ্রে স্নানান্তে জগন্নাথ মন্দিরের সিংহ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু—

সিংহদ্বারে আসি পসারির ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে॥

হরিদাস ঠাকুরের শ্রাদ্ধোৎসবের জন্য স্বয়ং মহাপ্রভু আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছেন, মহাকালের বক্ষে সে আলেখ্য অনপনেয় বর্ণ সমারোহে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া আছে। মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া সুপ্রচুর দ্রব্য সম্ভার লইয়া পসারিরা ছুটিয়া আসিলেন। স্বরূপ তাহাদিগকে বাধা দিয়া মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় পাঠাইয়া দিলেন। পরে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত বহুবিধ মহাপ্রসাদ লইয়া তিনি গম্ভীরায় ফিরিলেন। উপযুক্ত সমারোহেই ব্রহ্ম হরিদাসের তিরোধানোৎসব সমাধা হইল।

কবিরাজ গোস্বামী অতি বিনয়ে রূপ সনাতনকেও নীচ জাতি নীচ সঙ্গী বলিয়াছেন। হরিদাস ঠাকুর দৈন্যবশতঃ মহাপ্রভুকে যাহা বলিয়াছিলেন, হয়তো কবিরাজ গোস্বামী তাহারই পুনরুক্ত করিয়াছেন। নানা কারণে ব্রহ্ম হরিদাসের আবির্ভাব বৃত্তান্ত রহস্যাবৃতই রহিয়া গিয়াছে।

ফোর্টনাইটলি কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট পাঠাবার সময় হয়ে গেছে। কিন্তু রিপোর্ট করবার মতো আছেই বা কী? আইন অমান্য আন্দোলনের শেষ দীপশলাকাটি কবে নিবে গেছে। সার জন অ্যান্ডারসনের দাপটে সন্ত্রাসবাদী সলতেটিও নিবু নিবু।

সার্কল ইন্সপেক্টার অফ পুলিস আফসোস করে বললেন, "কিছুই কোথাও ঘটছে না, সার। এখানকার হিন্দু মুসলমানে এমন সদ্ভাব যে দাঙ্গা পর্যন্ত বাধে না। এখানে বেশীদিন চাকরি করলে আমি আর কাজ দেখাতে পারব না, সার। কাজ দেখাতে না পারলে প্রমোশন হবে না। চোর ডাকাত ধরে কি আজকাল প্রমোশন হয়, সার?"

সত্যি। সাবডিভিজনাল অফিসার তা বলে তেমন কোনো ঘটনা কামনা করতে পারেন না। বললেন, "এমন শান্তি আমি অনেকদিন পাইনি। যে-কোনো অবস্থার জন্যে অনবরত প্রস্তুত থাকতে হয়েছে। সারাক্ষণ যেন ঘোড়ার পিঠে বসে আছি। মনে হচ্ছে এবারকার পুজোর ছুটিটা বাইরে কাটাতে পারব।"

"বেআদবি মাফ করবেন, সার।" সার্কল ইন্সপেক্টার মনে করিয়ে দিলেন, "আপনারা হলেন হেভন-বর্ন সার্ভিসের মেম্বর। প্রমোশনের ভাবনা নেই। কিন্তু আপনাদের যাতে শান্তি আমাদের তাতে অশান্তি।"

সাবডিভিজনাল অফিসার হেসে বললেন, "একটু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচব যে, তাও আপনার সইবে না! আমি কিন্তু ভাবছি এবারকার রিপোর্টটা কি ব্ল্যাঙ্ক যাবে?"

"কেন? ব্ল্যাঙ্ক যাবে কেন?" ইন্সপেক্টার বিস্মিত হয়ে বললেন, "আমি হলে একটা কিছু ইনভেন্ট করতুম। পরের বার লিখতুম, অনুসন্ধানের পর জানা গেল খবরটা ভুল।"

"ইউ আর এ রোগ!" পরিহাস করে বললেন এস ডি ও সাহেব। "আপনার প্রমোশন দেখছি বন্ধ করাই মুশকিল!"

ইন্সপেক্টার জানতেন যে সাহেব তাঁকে

অন্নদাশঙ্কর রায়
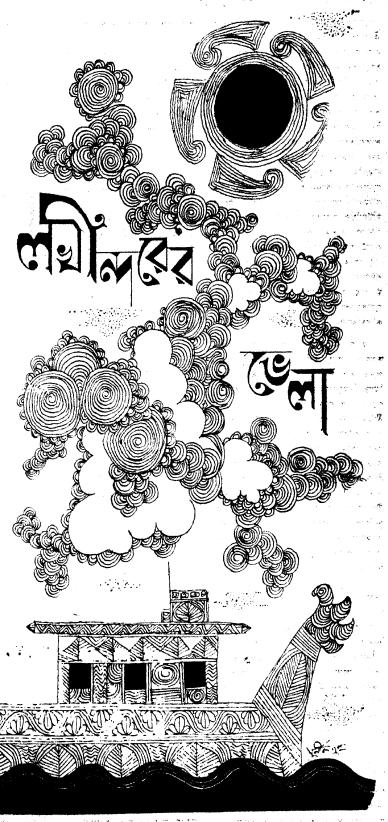
ডেকে পাঠিয়েছেন যে-কোনো একটা ঘটনার জন্যে, যার অঙ্গে রাজনীতির গন্ধ আছে। তিনি এতক্ষণ তাই নিয়ে মনে মনে গবেষণা করছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, "ওহো! ছিল একটা খবর।"

মহকুমা শাসক নোটবই খুলে কলম বাগিয়ে বললেন, "শুনি? শুনি?"

"ভেড়ামারা অঞ্চলে", ইন্সপেক্টার থেমে থেমে বলতে লাগলেন সাহেব যাতে লিখে নিতে পারেন, "একটি নতুন মুখ দেখা গেছে, সার।"

"নাম?" জানতে চাইলেন শাসক।

"নাম জানা যায়নি, সার।" তিনি বলে গেলেন, "পদ্মার ধারে দক্ষিণডিহি গ্রামে যে স্বদেশী আশ্রম আছে তারই এক প্রান্তে একখানা কুঁড়েঘর তুলে এঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। শোনা যাচ্ছে আশ্রমের ডাক্তার পরাণবাবুর কাছে চিকিৎসার জন্যে ইনি এতদূরে এসেছেন।"

সাহেব ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, "এর মধ্যে রাজনীতি কোথায়?"

ইন্সপেক্টার সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, "সার, অভয় দেন তো আমিও একটা প্রশ্ন করি। পরাণবাবু তো এম-বি পাশ করেন নি। তার আগেই মেডিকাল কলেজ ছেড়ে নন্‌-কোঅপারেশনে যোগ দেন। একজন হাতুড়ের কাছে চিকিৎসার জন্যে কেউ শেয়ালদার থেকে ভেড়ামারা জংশনের টিকিট কাটে? তাও সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট?"

"হুঁ।" সাহেবের ধাঁধাঁ লাগল।

"সঙ্গে মালপত্র বলতে একখানা সুটকেস ও একটা হোল্ড-অল।" ইন্সপেক্টার বলে চললেন, "কিন্তু সুটকেস যদিও একখানাই তবু তার গায়ে একরাশ লেবেল। সুইটজার-ল্যান্ডের। জার্মানীর। ভিয়েনার। চিকিৎসার জন্যে ভদ্রলোক না গেছেন কোথায়। কিন্তু চিকিৎসার জন্যেই কি? সুভাষ বোসও তো চিকিৎসার জন্যে গেছলেন।"

"তা হলে," মহকুমা হাকিম বললেন, "অসুখটা পলিটিকাল?"

ইন্সপেক্টার ঠিক এই কথাটির অপেক্ষায় ছিলেন। রহস্যের ভঙ্গী করে বললেন, "সার, কে জানে বিপ্লববাদের জাল কতদূর পাতা হয়েছে! এম এন রায়ের বৃত্তান্ত তো শুনেছেন। রায় কাঁহা কাঁহা মুল্লুকে ঘুরেছেন। মোস্কো, রাশিয়া, চীন। যদি বলি ইনিও সেই গোষ্ঠীর একজন তা হলে কি খুব একটা ভুল বলা হবে?"

এটা তো তথ্য নয়। অনুমান। এস ডিও সাহেব নোটবই সরিয়ে রাখলেন। বললেন, "অলরাইট। আপনারা ওয়াচ করে যান। নতুন কোনো ডেভেলপমেন্ট দেখলে আমাকে জানাবেন। থ্যাঙ্ক ইউ, ইন্সপেক্টার।"

ফোর্টনাইটলিতে এই ব্যাপারটার উল্লেখ করতে ভুললেন না মিস্টার পাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও লিখলেন যে আশ্রমের সঙ্গে বিপ্লববাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আশ্রমের কর্মীদের অযথা সন্দেহ করা অনুচিত। তাঁরা দেশগঠনের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। সেই ভালো নয় কি? যাই হোক, তিনি একবার সরেজমিনে গিয়ে তদন্ত করবেন।

এই উপলক্ষে তিনি একটা নতুন ফাইল খুলে তার নাম রাখলেন, "একটি নতুন মুখ।" রইল সেটা তাঁর কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল বাক্সয় তোলা। সেখান থেকে স্থানান্তরিত হবে টুর বাক্সয়, যখন তিনি ভেড়ামারা অঞ্চলে সফরে বেরোবেন।

কাজকর্মের ভিড়ে চাপা পড়ল সেই ব্যাপারটা। কিন্তু মন থেকে গেল না।

আশ্রমটা বহুদিনের পুরোনো। পরাণ-বাবুও দশ এগারো বছরের পুরোনো বাসিন্দা। যাই করুন খোলাখুলিভাবে করেন। গোপনে করবার পাত্র নন। সাফ বলেন, "অহিংসা যদি ব্যর্থ হয় আমরা হিংসার পথে নামব। কিন্তু সেক্ষেত্রেও খোলাখুলিভাবে লড়ব।"

"অহিংসা কি ব্যর্থ হয়নি, ডাক্তার দাস?" প্রশ্ন করেন মিস্টার পাল।

"ব্যাহত হয়েছে, বলতে পারেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে, কেমন করে বলবেন? না, এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি। গান্ধীজী বেঁচে থাকতে ব্যর্থ হবেও না।" ডাক্তার দাস তাঁর বিশ্বাসে অটল। "মহাত্মাজী চলে গেলে হয়তো অন্য কথা।"

দক্ষিণডিহিতে আগের বার যখন যান তখনকার কথাবার্তা। সেবারেও কী একটা সন্দেহের কারণ ঘটেছিল। পুলিশ তো মাঝে মাঝে রিপোর্ট করবেই। মানবে না যে আশ্রমিকরা খদ্দর তৈরি করে আর দরিদ্র নারায়ণের সেবা করে বলে রাজনীতির উর্ধ্বে। কলকাতা থেকে দাদারা এসে দু'দশ দিন বিশ্রাম করে যান। পদ্মার হাওয়ায় ভালো ঘুম হয়। আশ্রমের কুয়োর জলে ভালো হজমও হয়। পুলিশ কিন্তু ধরে নেয় যে ওটা একটা অছিলা। আসল মতলবটা হলো চুপি চুপি কৃষক সমিতি গঠন। সেইসূত্রে মুসলমানদের হাত করা।

"তার পর?" মহকুমা হাকিমকে স্বাগত সম্ভাষণ করে ডাক্তার দাস বললেন, "এবার কী মনে করে রাজপ্রতিনিধির পদার্পণ?"

"এমনি।" পাল তাঁকে সম্মান দেখিয়ে বললেন, "ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করে ফিরছি। আশ্রম পথে পড়ে। আমারও তো একটু বিশ্রাম চাই। আপত্তি আছে?"

"আরে, না, না। আপত্তি কিসের? আসুন, ভিতরে এসে বসুন ভালো করে। এত বেলায় এসেছেন। চারটি খেয়ে গেলে হতো না? আমরা অবশ্য মোটা খাই মোটা পরি।" ডাক্তার সবিনয়ে বললেন।

বাইরে বিশ্রী রোদ। আশ্রমের ছায়াশীতল মাদুরমোড়া কুটীরে দু'দণ্ড বিশ্রাম করতে কার না ইচ্ছা করে! পাল বললেন, "আমার সঙ্গে টিফিন ক্যারিয়ারে কিছু আছে।"

ডাক্তার একটু আহত হয়ে বললেন, "বেশ, আপনার যা অভিরুচি।"

পাল যার জন্যে এসেছিলেন তা তো সরাসরি প্রশ্ন করে জানা যায় না। সেটা অভদ্রতাও হবে। তিনি ডাক্তারকে খুশি করার আশায় বললেন, "আমি আপনাদের অতিথি।"

"যেমন জেলখানায় আমরা আপনাদের অতিথি।" বলে হেসে উঠলেন ডাক্তার। "দাঁড়ান। আপনাকে আমরা শোধ দিয়ে ছাড়ব। জেল ডায়েট খাওয়াব।"

আশ্রমে ওঁরা যা খেতেন তা একরকম জেল ডায়েটই বটে। যাতে জেলে গেলে কষ্ট না হয়। উভয়ত্র ওটা পুষ্টিকর। ভালো রাঁধুনির হাত লাগলে উপরন্তু রুচিকর। উপকরণের অভাব নেই, উত্তম হস্তেরই অভাব। যেমন জেলখানা তেমনি আশ্রম দুই-ই শ্রীহস্ত-বর্জিত।

আহারের বিলম্ব ছিল। পাল বললেন, তিনি একবার আশ্রমটা ঘুরে ফিরে দেখতে চান। কোনখানে কী হচ্ছে। সুতো কাটা, তাঁত বোনা, রং করা, এমনি যতরকম কর্ম। মায় রোগীচর্যা ও গোসেবা। ডাক্তার তাতে রাজী।

পাশ করা ডাক্তার নন বলে তিনি নিজের হাতে প্রেসক্রিপশন লেখেন না। সেটা করেন তাঁর সহকারী। সহকারীটিকে পাশ করিয়ে আনা হয়েছে। পরাণবাবু অবশ্য আর সমস্তই করেন, কিন্তু সহকারীর সহযোগে। "আমি নয়, তুমিই চিকিৎসা করছ, আমি শুধু তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, সাহায্য করছি। আমিই সহকারী।" এই বলে তিনি তাঁর সহকারীকে দায়িত্ব নিতে শেখান।

ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা উপস্থিত হলেন নতুন তৈরি একটি কুঁড়েঘরে। ঘরটি দক্ষিণ-মুখী, জানালাটা উত্তরমুখী। সেই জানালার ধারে বসে পদ্মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল একটি যুবককে। বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বয়স। শরীর ভেঙে গেছে। কিন্তু চোখ দুটো জ্বলছে। মুখখানি সুকুমার ও সুন্দর।

"আমার বন্ধু অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ বোস।" বলে পরিচয় দিলেন ডাক্তার দাস।

"আরে!" চমকে উঠলেন পাল সাহেব, "নিরুদা! এই চেহারা হয়েছে আপনার!"

সেই নতুন মুখটি যে অতি পুরাতন এই আবিষ্কারের পর পাল একেবারে বসে পড়লেন। ঘরে ঢুকে দোসরা একটা ডেক-চেয়ারে। অনিরুদ্ধের পাশে।

"তুমি! তুমি কোত্থেকে! অংশুমানকে তুমি কোথায় পেলে, পরাণদা!" চঞ্চল হয়ে উঠলেন উভয়ের বন্ধু অনিরুদ্ধ।

"কই, এটা তো আমার জানা ছিল না।"

অবাক হলেন পরাণদা, "তোমার সঙ্গে এঁর সম্পর্ক তা হলে অনেক দিনের! জানলে এঁকে খবর দিতুম। নিরু, ইনি এখানকার এস ডি ও।"

"ওঃ! তুমি তা হলে অফিসিয়াল ভিজিটে এসেছ!" বলে কৌতুক করলেন অনিরুদ্ধ। "বন্ধুকে দেখতে নয়!"

অংশুমান কি ফাঁস করতে পারেন তাঁর আসার উদ্দেশ্য ও উপলক্ষ? বললেন, "এদিকে আজ ট্যুরে এসেছিলুম। আশ্রমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলুম। ভাবলুম এখানে বিশ্রাম করি ও সেই ফাঁকে আশ্রমটা একবার ঘুরে দেখি। কী করে জানব যে আপনি এখানে! আপনি, নিরুদা!"

"তুমি, অংশুমান!" নিরুদা সেকালের মতো স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, "তুমি এখন এস ডি ও। সব খবর ভালো তো? কতকাল পরে দেখা!"

এর পর তিনি মোড়ার উপর উপবিষ্ট ডাক্তারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "তিনজনেই আমরা মেসতুতো ভাই। তুমি, আমি আর অংশুমান। তুমি যে বছর নন্‌কোঅপারেশন আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়ে মেস ছেড়ে চলে গেলে তার বছর দেড়েক বাদে অংশুমান এলো মেসে। তোমার নাম তখন আমাদের সকলের মুখে মুখে। সেও শুনে থাকতে পারে। তোমার কি মনে পড়ে না, অংশুমান?"

"পড়ছে, পড়ছে। একটু একটু মনে পড়ছে।" অংশুমান চোখ বুজে বললেন, "প্রাণমোহন দাস। এম-বি ফাইনাল দেবার আগেই দেশের ডাকে মেডিকাল কলেজ ত্যাগ। কিন্তু তারপরের কথা আমার মনে নেই। ইনিই যে তিনি সেটা এই প্রথম জানলুম।"

"জীবনে এ রকম হয়।" পরাণদা হাসি-মুখে বললেন, "কোথাকার জল কোথায় গড়ায়! আবার একই তীর্থে মেশে। সেই মেস ছিল হিমাচল। আর এই আশ্রম হলো ত্রিবেণী। মাঝখানে তেরো চোদ্দ বছর ধরে যে যার পথে চলা।"

কথাবার্তার মাঝখানে পরাণদা উঠলেন। তাঁর কাজ ছিল।

তখন অনিরুদ্ধ বললেন, "তুমিও তো কাজের লোক। তোমাকে আমি ধরে রাখব না, অংশু। কখনো যদি আবার এ পথ দিয়ে যাও পাঁচ মিনিটের জন্যে আমাকে দেখে যেয়ো। এখান থেকে আর কোথাও যাবার প্ল্যান আমার নেই। পরাণদা আমার ভার নিয়েছেন। বছরখানেক লাগবে বলছেন।"

"রোগটা কী তা যদিও জানিনে," অংশুমান বললেন, "তবু আমার মনে হয় আপনার আরো ভালো চিকিৎসার দরকার। পরাণদার মতো জেনারেল প্র্যাকটিশনারকে না দেখিয়ে স্পেশ্যালিস্টকে দেখানো বিজ্ঞতা নয় কি?"

"তা যদি বল তবে কাকে না দেখিয়েছি? কলকাতায়, সুইজারল্যাণ্ডে, জার্মানীতে, ভিয়েনায় কে না দেখেছেন?" অনিরুদ্ধ আবার পদ্মার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এবার আশ্রয় নিয়েছি বাংলাদেশের হৃদয়কন্দরে। পদ্মাবক্ষে। বছরখানেক ধরে আমার জন্যে একটা ভেলা বানানো হবে। লখীন্দরের ভেলার অনুকরণে। সেই ভেলায় চড়ে আমি ভাসব। অর্থাৎ হাউসবোটে চড়ে আমি নদীনালায় ঘুরে বেড়াব। নেচার কিওর।"

অংশুমান বিস্মিত হলেন। এরূপ চিকিৎসাপদ্ধতি তাঁর অবিদিত। বললেন, "লখীন্দরের ভেলায় তো আরো একজন ছিলেন। তিনিই বাঁচালেন।"

"না। বেহুলার কোনো পার্ট নেই এবার।" অনিরুদ্ধ নিস্পৃহভাবে বললেন, "বাঁচতে যে হবেই এমন কোনো কথা নেই। যদি না পাই মনের মতো করে বাঁচতে। নিজের মতো করে বাঁচতে।"

অনিরুদ্ধ ছিলেন বছর চারেকের সিনিয়র। একা থাকতেন তেতালাতে আস্ত একখানা ঘরে। মেসের রান্না মুখে রুচত না বলে প্রায়ই নিজের খুশিমতো কিছু একটা রাঁধতেন আর বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। অংশুমানকে ঠিক বন্ধু বলা চলে না। বড় বেশী জুনিয়র। তবু তাঁকেও ডেকে পাঠাতেন, খাওয়াতেন। তাঁর উপর একটা অহেতুক স্নেহ ছিল অনিরুদ্ধের।

অংশুমানের একবার অসুখ করে। তাঁর রুমমেটরা যে যার কাজে বেরিয়ে যান, তাঁর জন্যে ক্লাস কামাই করেন না। বেচারা একলাটি পড়ে থাকেন জ্বর নিয়ে। তখন তাঁর কাছে এসে বসেন, তাঁর মাথায় জলপটি দেন, সময় মতো তাঁকে ওষুধ খাওয়ান ও শেষে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে যান ওই অনিরুদ্ধই। পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তিনি কখনো এসব ক্ষেত্রে নীরব সাক্ষী হন না। বলেন, পড়াশুনার জন্যে যথেষ্ট সময় আছে, না হয় একটা বছর লোকসান হবে।

হয়েওছিল তাই। অংশুমানের জন্যে নয় যদিও। পড়াশুনায় অনিরুদ্ধ একটু পেছিয়ে রয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠীর সঙ্গে এম-এ পরীক্ষায় বসতে পারেননি। তার জন্যে তাঁর ভাবনা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে আইনটাও পড়ছিলেন। আরো এক বছর কলকাতায় থাকতে হতোই। কথা ছিল তিনি প্রথমে প্র্যাকটিস করবেন দেশে, অর্থাৎ আসান-সোলে। পরে উঠে আসবেন কলকাতায়। হাইকোর্টে পসার জমাবেন। মফঃস্বল বারে তাঁর বাবা একজন মহারথী। অতি সহজেই স্টার্ট পাবেন। কলকাতায় সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু স্টার্ট যেখানেই করুন ফিনিশ করবেন কলকাতায়। সুতরাং কলকাতায় দুটো একটা বছর বেশী থাকলেই সুবিধে। মানুষ চিনছেন।

এই স্নেহশীল মানুষটির কী একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথা ছিল। হাসি দিয়ে সেটাকে তিনি সব সময় কোণঠাসা করে রাখতেন। দুটি কি তিনটি অন্তরঙ্গ বন্ধুই জানতেন কী তাঁর ব্যথা। তাঁরাও প্রকাশ করতেন না। তা সত্ত্বেও অংশুমানের কানে এসেছিল যে তিনি তাঁর এক বাল্যসখীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কথা দিয়েছিলেন। তাই সে মহিলার যথাসময়ে বিবাহ হয়নি। তাঁর বাবা যেই টের পেলেন যে স্বাবলম্বী হয়ে অনিরুদ্ধ তাঁর বাল্যসখীকে বিয়ে করবেন অমনি একটা উকিলী চাল চাললেন। ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলেন আর একটি মেয়ের সঙ্গে। এটি আরো সুন্দরী, আরো ধনবতী।

বিবাহিত তরুণ সহপাঠীরা তাঁদের বৌদের কথা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলতেন। প্রেমপত্র লিখতেন ও পেতেন। বৌদের হাতের ফুল তোলা কার্পেটের জুতো পায়ে দিতেন। রকমারি উপহার কিনে পাঠাতেন। তাঁদের সকলের সঙ্গে সমানে ফূর্তি করতেন অনিরুদ্ধ। কিন্তু নিজের বেলা সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয় নির্বিচল। যেন তাঁর বিবাহই হয়নি। কেউ প্রশ্ন করলে কৌশলে এড়িয়ে যান। কেউ কৌতূহলী হলে শামুকের মতো খোলার ভিতর ঢুকে যান।

মানুষটি নরম। রাগ করতে কেউ তাঁকে দেখেনি। কড়া কথাও কেউ তাঁর মুখে শোনেনি। তবু তাঁর স্বভাবে এমন কিছু ছিল যার নাম ইস্পাত। তা দিয়ে তিনি অপরকে আঘাত করতেন না, কিন্তু আত্মরক্ষা করতেন। ভয় দেখিয়ে খোসামোদ করে তাঁকে তাঁর পদতলভূমি থেকে টলানো যেত না। একবার যদি "না" বলতেন তো শত-চেষ্টাতে "হাঁ" বলতেন না।

"না। বেহুলার জন্যে ঠাঁই নেই এ ভেলায়। এটা পুরোপুরি লখীন্দরের ভেলা।" নিরুদা আরো খোলাসা করে বললেন, "আমার অসুখটা আমার একার। এর কোনো সমভাগিনী নেই। সুখের সঙ্গে অসুখের এইখানেই তফাৎ। একদিক থেকে এটা একটা বাঁচোয়া। মানিক,—তোমাকে মানিক বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো? অসুখও মানুষকে বাঁচাতে পারে।"

এ কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন অংশুমান। অসুখও মানুষকে বাঁচাতে পারে। কার হাত থেকে বাঁচাতে পারে!

"আবার কবে এদিকে আসবে, মানিক? সাধ্য থাকলে আমিই তোমার ওখানে যেতুম। বৌমাকে আশীর্বাদ করে আসতুম। বিয়ে করেছ নিশ্চয়। ছেলেমেয়ে ক'টি? ভালো আছে তো সকলে? ইচ্ছে করে সবাইকে দেখতে। সবাইকে ভালোবাসা জানিয়ো। পারো তো আরেক দিন এসো, যেদিন তোমার হাতে কাজ কম।" ধীরে ধীরে বললেন নিরুদা।

"আসব। আবার আমি আসব।" কথা

দিলেন অংশুমান। "আপনার মুখে মানিক নামটি শুনে কী যে ভালো লাগছে আমার! হ্যাঁ, বিয়ে করেছি। দুটি ছেলে। পথঘাট সুবিধের নয় বলে তাদের আনা সম্ভব হবে না, নিরুদা। আপনাকেও আমি নড়তে দেব না। আগে স্বাস্থ্য ফিরে পান। পাবেন, পাবেন। পদ্মার জল হাওয়ার গুণে আছে। আর পরাণদাও তাঁর সাধ্যমতো করবেন।"

নিরুদা ম্লানমুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন। সেই সেকালের মতো। বললেন, "পরের বার যখন আসবে তখন দেখবে যে আমি উঠে পায়চারি করছি। তোমার সঙ্গে অনেক গল্প আছে।"

সেদিন পরাণদার সঙ্গে খেতে বসে নিরুদার অসুখের প্রসঙ্গ ওঠে। পরাণদা বলেন, "অন্তত একটি বছর আমার চোখে চোখে রাখব।" ওর হয়েছে ঘুরে বেড়ানোর ভেসে বেড়ানোর বাতিক। এক জায়গায় বেশি দিন থাকতে ওর অরুচি। মানছি ভিয়েনার ডাক্তাররা ধন্বন্তরি। কিন্তু সেখানকার জল-হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাবে কি বাঙালীর শরীর? আর পথ্যও কি বাঙালীর ধাতে সইবে? দু'তিন বছর ধরে অভ্যাস বদলালে হয়তো একরকম সমঝোতা হতে পারত স্থানের সঙ্গে পাত্রের। তাহলে ডাক্তারের কাজ অনেক সহজ হতো। লোকে ভুলে যায় যে, রোগের চিকিৎসা হচ্ছে রোগীর চিকিৎসা। আর রোগী যদি সহযোগিতা না করে তবে কারো সাধ্য নেই যে তাকে সারায়।"

অংশুমান আশ্চর্য হয়ে সুধান, "কেন? নিরুদার দিক থেকে কি সহযোগিতার অভাব?"

"প্রকারান্তরে।" পরাণদা উত্তর দেন, "রোগী যদি সব সময় ভাবে এখানে থাকলে আমি সেরে উঠব না, অন্য কোনোখানে যাওয়া চাই, তাহলে ডাক্তার বেচারা করবে কী? সেইজন্যে আমার প্রথম অনুশাসন হচ্ছে যেখানে এসেছ সেখানকার সঙ্গে মানিয়ে নাও। তার জন্যে যদি এক বছর লাগে তো এক বছর থাকতে হবে। কিন্তু ওই যে বললুম, নিরু কোথাও তিন চার মাসের বেশী টিকবে না। ডাক্তারকে একটা ন্যায়-সংগত সুযোগ দেবে না। এমন নয় যে, ওর টাকার টানাটানি। পিতৃকুল, মাতৃকুল, শ্বশুর-কুল, তিন কুলেই টাকার ছড়াছড়ি।"

অবাক হলেন অংশুমান। এ রহস্য ভেদ করবে কে? কেন নিরুদার কোথাও মন বসে না? আগে তো এ রকম ছিলেন না। ওই মেসেই কাটিয়ে দিয়েছেন সাত বছর।

"ওর মতো সাকসেসফুল পুরুষ ক'জন?" বলতে থাকলেন পরাণদা। "আসানসোলে ওদের তিন পুরুষের প্র্যাকটিস। ওর বাবা ওখানকার বারের একজন দিক্‌পাল। ছেলেও দেখতে দেখতে আরেকজন দিক্‌পাল হয়ে ওঠে। প্রায় মামলায় এক পক্ষে বাপ, আরেক পক্ষে বেটা। যেই জিতুক ওরাই জেতা। ওরাই নেতা। এত সুখও সইল না ছেলের। চলল হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করতে। সেখানে তো বাপ-ঠাকুরদার নামযশ নেই যে সাহায্য করবে। তবু সেখানেও নিজগুণে ও দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক এমনি সময় বাধল ওর অসুখ। আজ একে দেখায়, কাল ওকে দেখায়। যে যা বলে তাই শোনে। শোনে আর কোথায়! ওষুধ মুখে দিয়েই বলে, বাজে ওষুধ। এতে আমার অসুখ সারবে না। ইন্‌জেকশনের ছুঁচ দেখলেই মূর্ছার ভান করে। পুরী, দেওঘর, আলমোড়া ইত্যাদি হরেক জায়গা ঘুরে বিশেষ কোনো ফল পায় না। বলে, ইউরোপে যাব।"

"তারপর?" অংশুমান আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

"তার পর গেল ইউরোপে। কিন্তু সঙ্গে নিল না ওর গৃহিণীকে। বছর খানেক ছিল। বিভিন্ন স্থানে। বিভিন্ন দেশে। শরীর আরো খারাপ হলো। ফিরে আসতে চাইল। ফিরল। কিন্তু বাড়ীতে নয়। আমার কাছে। এখন ওর খেয়াল কী শুনবে? হাউস বোট চড়ে নদীতে নদীতে ঘোরা। পাগল!" পরাণদা হাসলেন।

নিরুদার জন্যে বুক ভরা ব্যথা নিয়ে সেবারকার মতো বিদায় নিলেন অংশুমান। আবার যখন সার্কল ইন্সপেক্টারের সঙ্গে দেখা হলো তখন তাঁকে সমস্ত সমাচার শোনালেন।

সি আই বললেন, "লোকটির জন্যে আমারও দুঃখ হয়, স্যার। অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি হাইকোর্টে বেশ পসার জমতে শুরু করেছিল। কী যে হলো কেউ বলতে পারে না। একদিন তাঁর মক্কেলদের পরামর্শ দেন অন্য উকিলের কাছে যেতে। কাগজপত্র ঘুরিয়ে দেন। ফী ফেরত দিয়ে বলেন, স্বাস্থ্যঘটিত কারণে আমি অক্ষম। অথচ তখনো তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি। একটু ডায়েবেটিক ছিলেন। কখনো কোনো ব্যায়াম তো করতেন না।"

অংশুমানের মনে পড়ল যে, মেসে থাকতে নিরুদার ব্যায়ামে অভিরুচি ছিল না। খেলা দেখতে গড়ের মাঠে কে না যেত? কিন্তু নিরুদা বাদ।

"পরের ফোর্টনাইটলিগুলিতে ওই ভুলটা শুধরে দেবেন, স্যার। যদি উল্লেখ করে থাকেন।" ইন্সপেক্টার দরদীর মতো বললেন।

মাসখানেক বাদে সেই অঞ্চলে আর একটা টুর ফেললেন এস ডি ও সাহেব। স্কুলের উন্নতির জন্যে সভা ডাকলেন। সভার পর যথেষ্ট সময় থাকবে আশ্রমে নিরুদার খোঁজ নেবার। যথাকালে ভেড়ামারা স্টেশনে ট্রেন ধরবার।

নিরুদা কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁকছিলেন। হাউসবোটের নক্সা। অংশুমানকে দূর থেকে দেখে স্বাগত করতে এগিয়ে এলেন। "আসতে আজ্ঞা হোক, আসতে আজ্ঞা হোক, মাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহোদয়।"

"কেমন আছেন, নিরুদা? একটু যেন ভালো মনে হচ্ছে।" বললেন অংশুমান।

"কোনো অভিযোগ নেই, মানিক। পরাণদা আমাকে রাজার হালে রেখেছেন। যাকে বলে ভি আই পি ট্রীটমেণ্ট।" নিরুদা খুশি হয়ে বললেন। "অতখানি মনোযোগ আমাকে এর আগে আর কেউ দেননি।"

"ওটা কী আঁকছেন, নিরুদা? দেখি।" চেয়ে নিলেন অংশুমান।

"তোমাকে বুঝিয়ে দিই। এই যে পাটাতন দেখছ এটার মাঝের অংশটাকে তুলে খাড়া করে টেবল বানানো যায়। এইখানে বেখে আমি খাব বা লিখব। এর দুধারে বেঞ্চ। তার একটাতে বসব আমি, অন্যটাতে আমার অতিথি। যদি কখনো কেউ এসে হাজির হন। পরে এটাকে ঠেলে ঢোকানো যাবে। তখন ঢালা বিছানা। বেশ হাত পা ছড়িয়ে আরাম করে শোব। নয়তো সেতার নিয়ে বাজাব।" নিরুদা উৎসাহের সঙ্গে বললেন।

"সেতারটা কোথায় লটকাবেন?" অংশুমানের প্রশ্ন।

"কেন? জায়গার অভাব?" একটা দাগ দিয়ে দেখালেন নিরুদা।

"বেশ, বেশ!" সমর্থন করলেন অংশুমান। "তারপর আহারের বাসনকোশন রাখছেন কোথায়? রান্না করছেন কোথায়?"

"পিছনের দিকে দুটো সেকশন থাকবে। একটা রান্নাঘর তথা ভাঁড়ার। একটা স্নানের ঘর তথা টয়লেট। তারপর পাটাতনের তলায় আমার বক্স রুম। ঐ যে দুটি বেঞ্চ ও-দুটিতে কপাট দেওয়া থাকবে। কপাটের ওধারে সুটকেস। হোল্ড অল্। যতরকম টুকিটাকি।" নিরুদা দাগ দিয়ে দেখালেন।

"হাউ ক্লেভার!" তারিফ করলেন অংশুমান।

"ভার বাড়াতে চাইনে, ভাই।" নিরুদা মাথা নাড়লেন। "যেটা না হলে নয় সেইটেই আমার সঙ্গে থাকবে। আর সব একে একে জলে ফেলে দেব। আমি জানতে চাই কত কমে একজন মানুষের চলে। তার উল্টোটা আমার জানা আছে।"

"বুঝেছি। আপনি ভার নামাতেই চান। কিন্তু কেন?" অংশুমান জিজ্ঞাসু।

"সোজা উত্তর।" নিরুদা মুচকি হাসলেন। ভেলাটা যত হালকা হবে তত সহজে ভাসবে। যত ভারি হবে তত সহজে ডুববে। আমি কি ভাসতে চাই না ডুবতে চাই? এই যে হাউস-বোট দেখছ, এটা আরামের জন্যে নয়। এটা হলো একটা প্রতীক। এই কৌটায় নিহিত থাকবে আমার প্রাণ।"

তাঁর কথাবার্তায় রূপকথার আমেজ এলো। মনে পড়ে গেল অংশুমানের ছেলে-

বেলায় শোনা রূপকথা। বেহুলার কাহিনীও মনে পড়তে থাকল।

"কলকাতা আমি সহ্য করতে পারলুম না, মানিক। ইউরোপও না। মেটিরিয়ালিজমের জয়জয়কার। একটা বিশেষ বয়স পর্যন্ত ভালো লাগে নানা রঙের খেলনা। সে বয়সটা পেরিয়ে গেলে যদি কারো ভালো লাগে তা হলে বুঝতে হবে সে একটি বুড়ো খোকা। আমার সে বয়স যেদিন পেরিয়ে গেল সেদিন আমি খেলা ছেড়ে খেলাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। আর আমি খেলনা নিয়ে খেলব না।" তাঁর কণ্ঠস্বরে ইস্পাত।

"ঠিক বুঝতে পারছি নে, নিরুদা। কী এমন বয়স হয়েছিল আপনার? বানপ্রস্থের অনেক দেরি এখনো। মেটিরিয়ালিজম যদি বলেন, এই হাউসবোট কি তার ঊর্ধ্বে? হাজার হালকা হলেও একে ভাসিয়ে রাখা যাবে না, যদি এর নির্মাণের সময় ভালো এনজিনীয়ারের সাহায্য না নেন।" অংশুমান সাবধান করে দিলেন।

পরের বার অংশুমান গিয়ে দেখেন হাউস-বোটের একটি মডেল নির্মাণ করা চলেছে। মিস্ত্রীর সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন স্বয়ং নিরুদা। তাঁকে বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছে।

"এস, ভাই, এস। সব ভালো তো?" নিরুদা তাঁর দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। বোঝা গেল গায়ে কিছু জোর হয়েছে।

"ও কী, নিরুদা? মডেল মনে হচ্ছে?" অংশুমান সুধান।

"ঠিক ধরেছ।" নিরুদা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "ছোট মাপের হলেও যথাসম্ভব নিখুঁৎ যাতে হয় তারই চেষ্টায় আছি। কিন্তু মুশকিল কী, জানো?"

"না তো?" অংশুমান অজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

"বোটের মডেল না হয় হলো। পদ্মার মডেল হবে কী করে?" বিষম কূট প্রশ্ন।

"পদ্মার মডেল তো হয় না।" অংশুমান ভেবে বললেন।

"তা যদি না হয় তবে এই মডেল আমি কিসের জলে ভাসাব? গামলার জলে না ডোবার জলে? সেখানে ভাসলেও তার থেকে প্রমাণ হবে না যে পদ্মার জলে ভেসে থাকতে পারবে।" তিনি বিষণ্ণ ভাবে বললেন।

"না। তেমন কোনো নিশ্চিতি নেই।" স্বীকার করলেন অংশুমান।

"তার পর পাগলা হাওয়ার মডেল আমি পাচ্ছি কোথায়?" আরো বিষম প্রশ্ন।

"পাগলা হাওয়ার মডেলও হয় না, নিরুদা।" অংশুমান উত্তর দিলেন।

"তা হলে কেমন করে প্রমাণ হবে যে আমার এ মডেল ঝড়বাতাসেও ডুববে না? হাতপাখার হাওয়া তো ঝোড়ো হাওয়ার মডেল নয়।" তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে এলো।

"এখন থেকে ওসব ভেবে কী হবে, নিরুদা? হাউসবোট যারা বানাবে তারাই এসব বিবেচনা করে বানাবে।" আশ্বাস দিলেন অংশুমান। "তা হলেও আপনার এই মডেলের মূল্য আছে। এটার থেকে ওরা একটা আইডিয়া তো পাবে।"

"সে কথা ঠিক।" নিরুদা বললেন, "কিন্তু আমার প্রশ্নগুলোর অন্য অর্থ আছে, মানিক। আমি যখন বলি আমার জীবন আমি নিজের মতো করে গড়ব তখন আমার মনে থাকে না যে চারদিকের জীবনপ্রবাহ আমার হাতে গড়া নয়। আর ঘটনাচক্রের উপরেও আমার হাত খাটে না। যে-কোনো সময় আমার জীবনকে এরা বিপর্যস্ত করতে পারে।"

"তা হলেও আপনার গড়া জীবন না-গড়া হয়ে যায় না।" অংশুমান বললেন, "যেটা পাওয়া গেছে সেটা খোওয়া যেতে পারে, কিন্তু না-পাওয়া যেতে পারে না। নিখুঁত করে গড়ুন, নিঙড়িয়ে গড়ুন। যায় যাবে কালসাগরে তলিয়ে। কিন্তু গড়া যে হয়েছে এটা তো পাকা।"

"পাকা না ফাঁকা?" নিরুদা চিন্তান্বিত হলেন। তার পর কী মনে করে বললেন, "এই এক প্রহেলিকা। যাকে নিয়ে জ্বালাতন হচ্ছি। শরীর সারবে কী করে?"

ঘরে গিয়ে বসলেন দুজনে। সেই দুটো ডেক চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে। বেলা পড়ে আসছিল। পদ্মার বুকে বিচিত্র মেঘের ছায়া। নিরুদা ধীরে ধীরে বলতে আরম্ভ করলেন।

"দেখ, মানিক, আমি হার্ড বয়েল্ড লইয়ার। সেইজন্যেই সাকসেসফুল। আবার সেইজন্যেই আমার আজ এ দশা। আমি সবাইকে সন্দেহ করতে করতে জীবন-দেবতাকেও সন্দেহ করতে শিখেছি। মানুষের ভাগ্য ভগবানের হাতে এ বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে। আবার মানুষের হাতে এ কথা বলতেও বল পাইনে। তবে কার হাতে? অন্ধ নিয়তির? দ্বান্দ্বিক ইতিহাসের?

গড়বে যে কিসের উপরে গড়বে? কার উপর নির্ভর করা যায়? তোমার পায়ের তলায় মাটি কোথায়? যেখানে দাঁড়িয়েছ সেখানে একদিন আবিষ্কার করবে যে মাটি সরে গেছে। সেখানে পদ্মার ঢেউ। দশ বছর প্র্যাকটিস করে আমি হাজারটা মামলা দেখেছি। হাজারটি মানুষের ভাগ্যের খবর জেনেছি। কত যত্নে ওরা গোড়া বেঁধেছিল। ভেবেছিল শক্ত ভিতের উপর সংসার পেতেছে। এক একটা মামলা শেষ হয় আর দেখি পাকা খুঁটিও কেঁচে গেছে। যারা হারে তারা তো হারেই, যারা জেতে তারাও যে চিরকালের মতো নিশ্চিন্ত তা নয়।

যদি জানতুম যে মামলার জয় মানে ধর্মের জয়, সত্যের জয়, ন্যায়ের জয়। তাও কি সব ক্ষেত্রে ঘটে? আইন অনুসারে বিচার হয়েছে যখন, তখন মেনে নিতে হবে যে ন্যায়ের জয় হয়েছে। কিন্তু আমার ন্যায়বোধ আমাকে অতটা নিশ্চিত হতে দেয়নি। নিজের সফলতায় আমি নিজেই সংশয়ান্বিত। যে আমাকে যথেষ্ট ফী দিয়েছে তারই মামলা আমি হাতে নিয়েছি, সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকেই আমি জিতিয়ে দিয়েছি। তা হলে ওটা ধর্মের জয়, না ধনের জয়? ন্যায় তা হলে কোন্ দিকে? আমি যেদিকে সেইদিকে না অপর দিকে? জিতেও আমি শান্তি পাইনি, মানিক। বরং কখনো কখনো হেরে গিয়েই শান্তি পেয়েছি। যদিও তার দরুণ মক্কেল হারিয়েছি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার বাসনা যতদিন ছিল ততদিন আমি আমার জয়ের জন্যেই মাথা ঘামিয়েছি, ন্যায়ের জয়ের জন্যে নয়। ক্যালকাটা হাইকোর্ট বারেও যখন প্রতিষ্ঠা হলো তখন আমার মনে খটকা বাধল, এতদিন আমি করেছি কী? অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে আলোর সীমানা বাড়িয়ে দিয়েছি, না আলো অন্ধকারের মধ্যে বাছবিচার না করে অন্ধকারকেই কার্যত প্রাধান্য দিয়েছি? শয়তান যত পাইয়ে দিতে পারে সাধু তত পারে না। যে আমাকে পাইয়ে দিয়েছে আমিও তাকেই পাইয়ে দিয়েছি। ভগবান আমাকে যে বুদ্ধি দিয়েছেন সে বুদ্ধি লেগেছে তাঁরই বিরুদ্ধে। আমি প্রোফেসনাল লাঠিয়াল। যে আমাকে নিযুক্ত করেছে তারই স্বার্থে আমি লাঠি চালিয়েছি। সেটা কি ন্যায়ের স্বার্থে? কখনো কখনো। আমি যদি প্রোফেসনাল লাঠিয়াল না হতুম তা হলে হয়তো সেকালের নাইটদের মতো বিপন্নকে উদ্ধার করতুম। তার দরুণ নিষ্ক্রয় নিতুম না।

যা নিয়ে এতদিন আমার গর্ব ছিল—আমি প্রোফেসনাল ও আমার ফী থেকেই মালুম যে আমি উঁচুদরের—সেইটেই হলো আমার কাছে লজ্জার কথা। আমার এই অর্থকরী প্রোফেসনটা মরাল নয়, ইমমরাল নয়, অ্যামরাল। জগতে যদি মরাল অর্ডার বলে কিছু থাকে তা হলে আমিও তার আমলে আসি। আমি তার বাইরে বা ঊর্ধ্বে নই। অর্থের জন্যে অন্যায়ের পক্ষ নেব, ন্যায়কে হারিয়ে দেব, এর কি কোনো ক্ষমা আছে তার কাছে? অবশ্য সব সময় তা করিনি। ন্যায়ের পক্ষেও লড়েছি, অন্যায়কে নিরস্ত করেছি। কিন্তু বেছে বেছে তাই যদি করতুম তা হলে আমার সংসারযাত্রা চলত না। আমাকে ঘর থেকে নিতে হতো। সেও তো সেই আইন ব্যবসায়ের টাকা। ন্যায় অন্যায়ের চুলচেরা বিচার করলে বাবাও কি অত টাকা রোজগার করতে পারতেন? না ঠাকুরদাদা পারতেন?

ন্যায়মন্দিরে কি ব্যবসা করা চলে? ন্যায় কি সব নাগরিকের মাথাব্যথা নয়? আমিও কি একজন নাগরিক নই? আইনজ্ঞান ও সূক্ষ্ম-বুদ্ধি নিয়ে কি ব্যবসা করা উচিত?

ইহুদীদের ধর্মমন্দিরে টাকাপয়সার আদান-প্রদান দেখে যীশু খৃস্ট কী করেছিলেন, জানো নিশ্চয়। তিনি ওই পোদ্দারদের ঘাড় ধরে বার করে দেন। আমি থাকলে আমাকেও তাড়িয়ে দিতেন। ধর্মাধিকরণ কি ধর্মমন্দির নয়? তা হলে আমরা সেখানে ব্যবসা করি কোন্ অধিকারে? এর স্বপক্ষে অনেক যুক্তি শুনেছি ও শুনিয়েছি। কিন্তু মন মানেনি। আইন থাকবে বইকি। আইনজ্ঞও থাকবে। আদালতও যে না থাকবে তা নয়। গান্ধীজীর ওই পঞ্চায়তের বিচারে কেউ সন্তুষ্ট হবে না। তোমাদের ইউনিয়ন বেঞ্চকোর্টও আদালতের বিকল্প নয়। আদালত থাকলে উকীলও থাকে। কিন্তু উকীলদের দানাপানির অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন বিচারকদের। তা বলে তাঁদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না। সরকার যদি তাঁদের বিবেক কিনে নেয় তা হলে সেও তো সেই কেনা-বেচাই হলো।

আমি যতই উন্নতি করি, উপার্জন করি ততই অস্বস্তি বোধ করি। জীবন যিনি আমাকে দিয়েছেন তিনি বিনামূল্যেই দিয়েছেন। আমি তাকে লাভের ব্যবসায় খাটাচ্ছি। কিন্তু সত্যি লাভবান হচ্ছি কি? মানুষের শক্তি অপরিমিত নয়। তার এতখানি শক্তি যদি অপাত্রে বা অকাজে অপচিত হয় তা হলে জীবনের হিসাব মিলবে কী করে? না জীবনের কোনো হিসাবনিকাশ নেই? সমস্তটাই আর্থিক লেনদেনের হিসাবনিকাশ? আমি ক্রমশ বুঝতে পারি যে আমি যা দিচ্ছি তার বিনিময়ে লক্ষ মুদ্রা লাভ করলেও সেটা লাভ নয়, যদি না তার দ্বারা ন্যায়ের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

এও আমি উপলব্ধি করলুম যে প্রচুর অর্থের প্রলোভন সংবরণ করা কঠিন। প্র্যাকটিস যদি করি তো অল্পে সন্তুষ্ট হব না। বড় বড় মামলায় নামব, প্রাণপণে লড়ব, মোটা মোটা ফী পকেটস্থ করব। চুলোয় যাক ন্যায় অন্যায়। না, গরিব উকীল বা গরিবের উকীল হব না। ভেবে দেখলুম প্রলোভনের রাজ্য থেকে পলায়নই শ্রেয়। ওটা ফল্‌স্ লাইফ।

কিন্তু বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। বাড়ীর লোকটিকেই আমি বোঝাতে পারব না। পারিবারিক মনোমালিন্য ডেকে আনব কেন? তার চেয়ে একটা অসুখ বাধানোই মন্দের ভালো। তুমি বিশ্বাস করবে না, মানিক, আমি অনেকদিন মনে মনে বলেছি, আহা, আমার যদি একটা বড়রকম অসুখ হতো! তা হলে আমাকে বেশ কিছুকাল কোর্টে যেতে হয় না। সেই আমার পলায়ন। তার জন্যে জবাবদিহি করতে হয় না। মনোমালিন্যেরও সম্ভাবনা থাকে না। আর্থিক অনটন হয়তো হবে, কিন্তু সেটা তেমন গুরুতর নয়। পরিবারকে আসানসোলে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। বাবা দেখবেন। তোমার মতো আমারও দুটি সন্তান।

অসুখের কথা ভাবতে ভাবতে সত্যি সত্যি পড়ে যাই অসুখে। প্রতিরোধের ইচ্ছা থাকলে তো প্রতিরোধ করব। অসুখ আর সারবার নাম করে না। সকলে দুঃখিত হয়, আমি হইনে। আমার একটা লম্বা ছুটির দরকার ছিল। সেটা এইভাবেই এলো। তা ছাড়া দরকার ছিল একটা চেঞ্জের। সত্যিকার চেঞ্জের। ইউরোপে গিয়ে সেটাও হলো। কিন্তু একটা জিনিস এখনো বাকী। তার নাম পুনর্নবত্ব। সেইজন্যেই পরাণদার আশ্রমে আসা। পদ্মাতীরে বাসা। ভেলায় করে ভাসা। ভাসতে ভাসতে কোথায় যাচ্ছি কে জানে! স্বর্গে না পাতালে! মর্তে যদি থাকি তো নতুন মানুষ হয়ে নতুন করে বাঁচব।"

অংশুমান এতক্ষণ অভিভূতের মতো শুনছিলেন। কণ্ঠক্ষেপ করেননি। এবার মৌনভঙ্গ করলেন। "কিন্তু নতুন করে বাঁচতে গেলেও তো সেইসব পুরাতন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। পিতার সম্মতি, স্ত্রীর অনুমোদন, সন্তানদের ভরণপোষণ।"

অনিরুদ্ধ সকৌতুকে হেসে বললেন, "তা হলে কিন্তু লখীন্দরের ভেলা নির্ঘাত ডুববে।"

"তাই নাকি!" অংশুমান ধাঁধার জবাব খুঁজে না পেয়ে বললেন, "আপনার মনের ইচ্ছাটা কী, শুনতে পাই, নিরুদা?"

"আমি আর অন্যের মুখ চেয়ে বাঁচতে রাজী নই। হলেই বা তারা আমার প্রাণের চেয়েও আপন।" অনিরুদ্ধ যেন একটা ইশতেহার থেকে শোনালেন। "লখীন্দর যদি বাঁচে তো তার কিছু নিজের কাজ আছে বলেই বাঁচবে। সে কাজ অর্থকরী না হয়ে অনর্থকরীও হতে পারে। সে তার জীবনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারলেই সুখী হবে, সুখী করবে। নয়তো অসুখী হবে, অসুখে ভুগবে ও—"

"ছি! অমন অলক্ষুণে কথা মুখে আনতে নেই।" বাধা দিয়ে বললেন অংশুমান। "আমি কি জানিনে, ইস্পাত আছে আপনার গঠনে? সেই ইস্পাতের ফলা দিয়ে আপনাকে আপনি উদ্ধার করবেন। সব রকম পরিস্থিতিতে।"

একেই বলে পাতলা বরফের উপর দিয়ে স্কেট করা। এ বিদ্যায় নিরুদার জুড়ি নেই। তিনি তাঁর সদর জীবনের গল্প বললেন, কিন্তু অন্দর জীবনের গল্প জানতে দিলেন না।

"সব রকম পরিস্থিতিতে!" সেকালের মতো মিষ্টি মিষ্টি হাসতে লাগলেন নিরুদা। "না, ভাই। সবরকম পরিস্থিতিতে ইস্পাতের ফলা কাজ দেয় না। অসুখের মূলে যদি থাকে অ-সুখ তবে ইস্পাতের ফলা তত গভীরে যায় না। তার জন্যে চাই গভীরতর বোঝাপড়া। যার জন্যে আমি ব্যাকুল। যার আশা নেই দেখে আমি পীড়িত। অগতির গতি আমার এই লখীন্দরের ভেলা। বাঁচতে হয় সত্য করেই বাঁচব। মরতে হয়—"

"না, না, না, না। ও কথা মুখে আনবেন না, দাদা।" ব্যাঘ্রঝম্পনের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন অংশুমান। চেপে ধরলেন অনিরুদ্ধের দুটি হাত।

"আমি বলি কী!" অংশুমান তাঁর হাত ছেড়ে দিলেন। "আমি বলি কী, নিরুদা, আপনি সমস্যার মুখোমুখি হোন। তাকে এড়াতে গিয়ে পালিয়ে বেড়ানো কোনো কাজের নয়। ভেলায় ভাসা মানে ড্রিফট করা তো? কতকাল ড্রিফট করবেন? ওদিকে আয়ু চলে যাচ্ছে। মানুষ কতদিন বাঁচে? লখীন্দরের তো দেহে প্রাণ ছিল না। তার বেলা যা অগতির গতি আপনার বেলা কি তাই? আপনি কি অগতি?"

"মানিক রে! আর আমায় জ্বালাসনে।" স্নেহের সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বললেন নিরুদা। "আমার যদি চারা থাকত আমি কি একটা দিনও ভুগতে রাজী হতুম? আয়ু? আয়ু নিয়ে আমি করব কী? আরোগ্য? আরোগ্য নিয়েই বা করব কী? আরো আয়? আরো ব্যয়? আরো ভোগ? আরো সঞ্চয়? না, ভাই। এ উত্তরে আর আমার মন ভরে না। খুঁজছি আমি অন্য কোনো উত্তর। অন্বেষণে বেরিয়েছি। এটা জীবনের থেকে পলায়ন নয়। বরং জীবনের উদ্দেশেই পলায়ন। এর বেশী এখন আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হবে ক্রমে ক্রমে। এতদিন জীবিকার দাবী মিটিয়েছি, তাই জীবিকা আমার দাবী মিটিয়েছে। এবার জীবনের দাবী মেটাব। তা হলে জীবনও আমার দাবী মেটাবে। তখন আমি পাব আমার জিজ্ঞাসার উত্তর। জানতে পাব আয়ু নিয়ে আমি করব কী। আরোগ্য নিয়ে আমি করব কী। না পেলেও আমার খেদ নেই। অসুখেও সুখ আছে।"

এর পরে বাকী থাকে করমর্দন ও বিদায় গ্রহণ। "পুনর্দর্শনায় চ"। সেটা সারা হলে দুজনে দুজনের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। মুখে কথা নেই। মুখের বদলে মন বলছে কথা। বলতে বলতে চোখে জল এসে যায়। দুজনেরই।

মহাকাঞ্চনদ্বীপ গভর্নমেন্ট

অর্থমেব জয়তে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ফাইল নং ই।জি।৪৫৫
সাল ১৯৫৭-৫৮
বিষয় স্কুলে অর্থ সাহায্য
করেসপণ্ডেন্স—এস ১

মহামান্য
মহাকাঞ্চনদ্বীপ সরকারের শিক্ষা বিভাগ
সমীপেষু,

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর সরকার বাহাদুরের নিকট নিবেদন এই যে, পঞ্চদশ পরগণার নিকাশীপুর গ্রামে প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের বাস। কিন্তু গ্রামের বালক বালিকাদের জন্য এতাবৎ এতদঞ্চলে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। গত কয়েক বৎসরে পার্শ্ববর্তী যবন দ্বীপ হইতে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার গ্রামে আসিয়াছে। ইহাতে স্কুলের অভাব আরও বিশেষভাবে অনুভূত হয়। গ্রামবাসীদের সকলের চেষ্টা ও সহযোগিতায় গত বৎসর গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

এ যাবৎ স্কুলের সমুদয় ব্যয়ভার আমরা গ্রামবাসীরা নিজেরাই চাঁদা তুলিয়া নির্বাহ করিয়াছি। কিন্তু এ-বৎসর প্রথমে অনাবৃষ্টি ও পরে বন্যায় শস্য নষ্ট হওয়াতে আমাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। অনেকেরই চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্য নাই। শিক্ষক মহাশয়ের বেতন নিয়মিত দেওয়া কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের রথতলায় যে পুরাতন চালাঘরটিতে স্কুল বসিতেছে তাহারও আশু সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু অর্থাভাবে তাহা হইতেছে না।

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, সদাশয় সরকার বাহাদুর গ্রামের এই বিদ্যালয়টিকে মাসিক দশ টাকা নিয়মিত সাহায্য এবং স্কুলঘরের দরমার বেড়া ও খড়ের চাল মেরামতের জন্য পঞ্চাশ টাকা এককালীন দান মঞ্জুর করিয়া গ্রামস্থ বালক বালিকাগণের শিক্ষালাভের পথ সুগম রাখিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ইংরেজী ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ সাল।

বশংবদ নিবেদক
নিকাশীপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নোটিংস :

সিরিয়েল নম্বর ১। নিকাশীপুর গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে আবেদন (পি-ইউ-সি)।

নিকাশীপুর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক দশ টাকা ও এককালীন দান হিসাবে পঞ্চাশ টাকার সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহা উদ্বাস্তুদের শিক্ষার বিষয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে যথোচিত ব্যবস্থার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সি. কে. জি. আর. ব্যানার্জী
১৩।১২।৫৭ আন্ডার সেক্রেটারী
১৬।১২।৫৭

ইউ, এস,

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় (শ্রী পি. দাস)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউ নোট নম্বর ২০৩৫।-এফ।৫৭ তারিখ ১৯।১২।৫৭

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

এই মন্ত্রণালয় হইতে শুধু সে-সব স্কুলেই সাহায্য দেওয়া হয় যেগুলি পুরাপুরি অথবা মুখ্যত : উদ্বাস্তু বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত। বর্তমান দরখাস্তে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে যে, স্কুলটি গ্রামের সমুদয় বালক বালিকাদের জন্য। সুতরাং ইহা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবেচনার বিষয়। ডি. এস দয়া করিয়া দেখিতে পারেন। নির্দেশের জন্য।
এল. এস. আর
৮।১।৫৮

ইউ, এস,

পি. দাস
আন্ডার সেক্রেটারী
১২।১।৫৮

ডি. এস (প্রাইমারী স্কুল)

সমগ্র গ্রামের শিক্ষার দায়িত্ব উদ্বাস্তু মন্ত্রণালয় লইতে পারে না। শিক্ষা বিভাগকে জানাইয়া দেওয়া হউক।

এন, চক্রবর্তী
ডেপুটি সেক্রেটারী
১৬।১।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য ঘটনাসম্মত নহে। বিদ্যালয়টি সমগ্র গ্রামের বালক বালিকাদের শিক্ষার জন্য হইলেও উহাতে বর্তমানে অনেক উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রী পড়িতেছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। ঐ সকল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বিদ্যালয়টি উক্ত মন্ত্রণালয় হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার অধিকারী। এ বিষয়ের প্রতি

মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো যাইতে পারে।
সি. কে. জি.
৩।৩।৫৮

আর. ব্যানার্জী
৭।৩।৫৮
ইউ. এস.

ইউ. এস.
ডি. এস.

জে. এস-ও হয়তো দেখিতে চাহিবেন।

পি. সি. দত্ত
ডি. এস.
১০।৩।৫৮

জে. এস.

এন. সি. রায়
জয়েণ্ট সেক্রেটারী
১১।৩।৫৮

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়

উদ্বাস্তু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যাহারা স্টাইপেণ্ড পাওয়ার উপযুক্ত আমরা তাহাদিগকে নির্ধারিত হারে বৃত্তি দিতে প্রস্তুত আছি। যে সব উদ্বাস্তু ছাত্র অথবা ছাত্রী পরীক্ষার শতকরা অন্যূন পঞ্চাশ ভাগ নম্বর পাইয়াছে তাহারা নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত শিক্ষা বিভাগের মারফতে পাঠাইলে প্রত্যেকটি আবেদন বিবেচিত হইবে। দরখাস্তের সঙ্গে যথারীতি উদ্বাস্তু সার্টিফিকেট, অভিভাবকের মাসিক আয়ের পরিমাণ, পরিবারের জনসংখ্যা একজন গেজেটেড অফিসার কর্তৃক এটেস্টেশান করাইয়া দাখিল করিতে হইবে।

পি. দাস
ইউ. এস.
১৭।৪।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

জয়েণ্ট সেক্রেটারী অনুগ্রহপূর্বক দেখুন। এ অবস্থায় অর্থ সাহায্যের বিষয় আমাদিগকেই বিবেচনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্ল্যানিং শাখার অভিমত জানা প্রয়োজন। তাহাদের বর্তমান অথবা আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিকাশীপুরে অথবা উহার নিকটবর্তী কোনো গ্রামে কোনো স্কুল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা আছে কি? একই অথবা কাছাকাছি গ্রামে একাধিক স্কুল স্থাপন গভর্নমেণ্টের পলিসি নহে। প্ল্যানিং শাখা দয়া করিয়া দেখিতে পারেন।

আর. ব্যানার্জী
ইউ. এস.
৯।৬।৫৮

জে. এস.
ডি. এস (প্ল্যানিং)

এন. সি. রায়
জে. এস.
১০।৬।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ফ্রেস রিসিট

মাননীয় শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী
সমীপেষু

মহাশয়,

আমাদের প্রাথমিক স্কুলের জন্য মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য এবং স্কুলঘরের মেরামতের জন্য এককালীন অর্থ প্রার্থনা করিয়া গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে মহামান্য সরকারের নিকট এক দরখাস্ত করিয়াছিলাম। অদ্যাবধি তাহার কোনো প্রাপ্তি সংবাদ পাই নাই। ইতিপূর্বে দুইখানি চিঠি লিখিয়া এ-বিষয় স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। তাহারও কোনো উত্তর পাই নাই। এক্ষণে জানাইতেছি যে, আর্থিক অনটনের হেতু আমাদের বিদ্যালয় পরিচালনা সুকঠিন হইয়াছে। গত তিন মাস যাবৎ স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ের বেতন বাকী পড়িয়াছে। গৃহটির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, সম্মুখে বর্ষা আসন্ন। তাহার পূর্বেই উহার চাল নতুন করিয়া না ছাওয়া হইলে ঐ ঘরে বিদ্যালয় বসিতে পারিবে না।

অতএব আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, অবিলম্বে আমাদের অর্থ সাহায্যের আবেদন মঞ্জুর করিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা হয়। ইতি ইংরেজী ২০শে জুন ১৯৫৮ সাল।

আপনার একান্ত বশংবদ
নিকাশীপুর গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

করেসপণ্ডেন্স : সিরিয়েল নম্বর ২—রিসিট (এফ. আর)

ফ্রেস রিসিটটি নিকাশীপুর গ্রামের অধিবাসীদের পত্র। এই সংক্রান্ত সমুদয় কাগজপত্র প্ল্যানিং শাখায় পাঠানো হইয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে তাহা ফিরিয়া আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।
সি. কে. জি.
২১।৭।৫৮
ইউ. এস.

পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করা হউক। প্ল্যানিং শাখাকে রিমাইণ্ডার দেওয়া হউক।

আর. ব্যানার্জী
ইউ. এস.
২।৮।৫৮

করেসপণ্ডেন্স : সিরিয়েল নম্বর (৩) ইস্যু

মহাকাঞ্চনদ্বীপ গভর্নমেণ্ট

অর্থমেব জয়তে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ই।জি।৪৫৩।৫৭-৫৮ মহানগর ১০।৮।৫৮

নিকাশীপুর গ্রামবাসীর প্রতি

প্রিয় মহাশয়গণ,

আপনাদের ১১।৯।৫৭ তারিখের আবেদনপত্র ও তৎপরবর্তী রিমাইণ্ডারগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করিতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

আপনাদের বিশ্বস্ত
স্বাক্ষর অস্পষ্ট
পক্ষে/আণ্ডার সেক্রেটারী

নোটিংস : সিরিয়েল নম্বর (৪) ইস্যু

বিষয় : নিকাশীপুর গ্রামের স্কুলের অর্থসাহায্যের আবেদন।

প্ল্যানিং শাখা দয়া করিয়া ৯।৬।৫৮ তারিখে প্রেরিত ই।জি।৪৫৩।৫৭-৫৮ ফাইলটি তাঁহাদের মন্তব্যসহ শীঘ্র ফেরৎ পাঠাইবেন কি?

পি. সি. সাক্সেনা
সেকশান অফিসার
গ্রেড. টু
১০।৮।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্ল্যানিং শাখা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নিকাশীপুর গ্রামে কোনো বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব নাই। যখন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হইবে তখন অন্যান্য অঞ্চলের প্রয়োজন বিবেচনার সঙ্গে নিকাশীপুর গ্রামের দাবি বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে। রুরেল ডিভলাপমেণ্ট এবং আর. ই. এস ব্লকের স্কিমেটিক বাজেট হইতেও স্কুলের জন্য অর্থ সাহায্য দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয় এই কাগজপত্র দেখিতে পারেন।

কে. এল. বক্সী
বিশেষ কাজে নিযুক্ত অফিসার
প্ল্যানিং
১৯।৮।৫৮

গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয়

নিকাশীপুরে কোনো আর. ই. এস. আর. ডি অথবা পোষ্ট ইনটেনসিভ ব্লক নাই। সুতরাং স্কিমেটিক বাজেট হইতে সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

এল. এম. দাস
জয়েণ্ট ডিভলাপমেণ্ট কমিশনার
৬।৯।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলি দয়া করিয়া দেখা হউক। উপযুক্ত ক্ষেত্রে বেসরকারী স্কুলে মাসিক সাহায্য দেওয়ার পূর্ব নজীর আছে। স্কুলঘরের মেরামতের জন্য এককালীন সাহায্য দিতে হইলে আমাদের অর্থ দপ্তরের অনুমোদন লইতে হইবে। কিন্তু তৎপূর্বে ইহা স্থির করা প্রয়োজন যে, একই ঘরে ছাত্র ও ছাত্রীদের ক্লাশ হওয়া বাঞ্ছনীয় কিনা।

স্ত্রী শিক্ষার ডেপুটি ডিরেক্টরের অভিমত লওয়া সমীচীন।
সি, কে, জি,
১২।৯।৫৮

আর, ব্যানার্জী
ইউ, এস, ইউ, এস,
১৩।৯।৫৮

ডি, ডি (মিসেস মিত্র)

স্কুলে সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে যেখানে পৃথক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব নহে, সেখানে নিম্ন শ্রেণীতে সহশিক্ষা অনুমোদন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। নিকাশীপুরের বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বয়স নয় বৎসরের অধিক না হইলে একই ঘরে ক্লাশ করিতে আপত্তি নাই। প্রসঙ্গতঃ চালাঘরটি স্বাস্থ্যসম্মত কিনা সে বিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে হয়।

(মিসেস) টি, মিত্র
ডেপুটি ডিরেক্টর (স্ত্রী শিক্ষা)
২৭।৯।৫৮

ইউ, এস (গ্রাণ্টস)

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (ডি, জি, এইচ, এস) তাঁহাদের অভিমত দয়া করিয়া জানাইবেন কি?

আর, ব্যানার্জী
ইউ, এস,
২।১০।৫৮

ডি, জি, এইচ, এস (স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউ নোট নম্বর ২০৩৫।-এফ।৫৭ তারিখ ১৮।১০।৫৮

ডিরেক্টর জেনারেল, হেলথ সার্ভিসেস
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

যথেষ্ট আলো হাওয়ার ব্যবস্থা থাকিলে চালাঘরে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া কোনো আপত্তি নাই। ঘরটি নিয়মানুযায়ী কিনা, তাহা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের রিপোর্ট না পাইলে আমাদের পক্ষে কোনো মতামত জানানো সম্ভব হইবে না। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট অনুগ্রহপূর্বক দেখুন।

এ, কে, গুপ্ত
লেফটেনাণ্ট কর্নেল, এম, বি (কলিঃ),
এম, আর, সি, পি (এডিন),
এল, আর, সি, পি (লণ্ডন),
ডি, জি (এইচ, এস)
১৯।১১।৫৮

পি, ডবলিউ, ডি,

পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট

নিকাশীপুরে স্কুল গৃহ সম্পর্কে এই দপ্তরে তথ্য নাই। তবে নীতির দিক দিয়া চালাঘর সমর্থনযোগ্য নহে। উহার নন-রেকারিং এক্সপেণ্ডিচার কম হইলেও রেকারিং এক্সপেণ্ডিচার এত বেশী যে, চালাঘর নির্মাণ পরিণামে জনসাধারণের অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে। পাকা দালান ছাড়া কোনো স্কুলঘর তৈয়ার বা মেরামতের জন্য কোনো সরকারী অর্থ সাহায্য দান এই বিভাগ সুপারিশ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নূতন স্কুল স্থাপনের ব্যাপারে পি, ডবলিউ, ডি কোড অনুযায়ী পাকাবাড়ি তৈয়ার আবশ্যিক ঘোষণা করিয়া নিয়ম প্রণয়ন আমরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রস্তাব করিতেছি।

এ, পি, চক্রবর্তী
চীফ ইঞ্জিনিয়ার (কনস্ট্রাকশন)
৯।১২।৫৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

উপরের নোট দ্রষ্টব্য। পাকা দালান ব্যতীত স্কুল স্থাপন করা হইবে কিনা তাহা পলিসি ডিশিসানের ব্যাপার। যতক্ষণ ক্যাবিনেট সেইরূপ কোনো সিদ্ধান্ত না করিতেছেন, ততক্ষণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই রীতি।

শিল্পী ঃ শ্রীনন্দলাল বসু

দরখাস্তে উল্লেখিত সাহায্যদানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন চাওয়া যাইতে পারে।

সি, কে, জি,
৩০।১২।৫৮
ডি, এস (গ্রাণ্টস)

ডি-এস এস (গ্রাণ্টস) ট্যুরে গিয়াছেন ফিরিয়া আসিলে পাঠাইবেন।

পি, কে, রায়
(ডি, এস-এর খাশ সহায়ক)
৯।১।৫৯

পুনরায় পেশ করা হইল।

সি, কে, জি,
১৪।১।৫৯

পি, সি, দত্ত
ডেপুটি সেক্রেটারী
১৬।১।৫৯

অর্থ মন্ত্রণালয়

ইহা দুঃখের বিষয় যে, কেসটি অসম্পূর্ণ-ভাবে শিক্ষা বিভাগ হইতে পাঠানো হইয়াছে। সমুদয় তথ্য জানা না থাকিলে অর্থ দপ্তর কি ভাবে অর্থব্যয়ের যুক্তিযুক্ততা বিচার করিতে পারে? বর্তমান ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সর্বাগ্রে জানা দরকারঃ (১) স্কুলের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কত? (২) ছাত্র বেতন হইতে স্কুলের আয় কত? (৩) আয়-ব্যয়ের অডিট সার্টিফিকেট, (৪) স্কুল সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কিনা।

সরকারী সাহায্য পাইতে হইলে শিক্ষকের যে শিক্ষার মান গ্রান্টস রুলে বিধিবদ্ধ হইয়াছে বর্তমান শিক্ষকের তাহা আছে কি?

বি, সি, মুখার্জী
আন্ডার সেক্রেটারী
২।৩।৫৯

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পঞ্চদশ পরগণার শিক্ষা ইন্সপেক্টরকে সরজমীনে তদন্ত করিয়া উক্ত বিদ্যালয় সম্পর্কে রিপোর্ট দিতে বলা হউক।

আর, ব্যানার্জী
ইউ, এস,
১৮।৩।৫৯

শিক্ষামন্ত্রীর নোট

গত রবিবারের দৈনিক 'রাষ্ট্রদূত' পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রসঙ্গে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্কুলে সাহায্য দেওয়া হয় না বলিয়া অভি-যোগ করা হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিকাশী-পুর নামক গ্রামের প্রাথমিক স্কুলের কথা তাহাতে উল্লেখ করা হইয়াছে দেখিলাম। অবশ্য নিকাশীপুর অঞ্চলে অনেক সরকার বিরোধী আন্দোলনকারী আছে। বিগত নির্বাচনের ফলই তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ। যাহা হউক, সেক্রেটারী অনুগ্রহপূর্বক ব্যাপারটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জানাইবেন কি?

সেক্রেটারী

এম, এম, পাণিগ্রাহী
১৩।৬।৫৯

অত্যন্ত জরুরী

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নোটে যে বিষয় উল্লেখ আছে, সে সম্পর্কে কোনো কাগজপত্র আছে কি?

এ, স্বামীনাথন
সেক্রেটারী
১৩।৬।৫৯

জে, এস,

প্লিজ স্পিক, ইমিডিয়েটলী।

এন, সি, রায়
জে, এস,
১৩।৬।৫৯

ডি, এস (গ্রান্টস)

(পূর্ব পৃষ্ঠা হইতে)

আলোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চদশ পরগণার স্কুল ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পেশ করা হইল। এই সঙ্গে লিংকড ফাইলটির প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। ইন্স-পেক্টরের রিপোর্টে দেখা যাইতেছে, প্রায় এক বৎসর হইল স্কুলটি উঠিয়া গিয়াছে। বেতন না পাওয়ায় স্কুলের শিক্ষক অনেকদিন পূর্বেই অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। যে ঘরে স্কুল বসিত তাহাও গত বৎসর বর্ষার সময় ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে। উহার বাঁশের বেড়া, খুঁটি ইত্যাদি হয় স্থানীয় অধিবাসীরা উনুনে ধরাইতে ব্যবহার করিয়াছে নয়তো বৃষ্টিতে পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। বর্তমানে একমাত্র মাটির ভিটাটুকু ছাড়া উহার আর কোনো চিহ্ন নাই। এমতাবস্থায় বিষয়টি অর্থ দপ্তরে পুনরায় পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। জয়েণ্ট সেক্রেটারী অনুগ্রহপূর্বক দেখুন।

পি, সি, দত্ত
ডেপুটি সেক্রেটারী
১৫।৬।৫৯

জে, এস,

আমি একমত। বিষয়টি সমাপ্ত গণ্য করিয়া ফাইল বন্ধ করা হউক। সেক্রেটারী অনুগ্রহ করিয়া দেখুন। তিনি বোধ হয় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে জানাইয়া রাখিতে চাহিবেন।

এন, সি, রায়
জয়েণ্ট সেক্রেটারী
১৬।৬।৫৯

সেক্রেটারী

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনুগ্রহপূর্বক দেখুন। তথ্য হিসাবে।

এ, স্বামীনাথন
১৭।৬।৫৯

এইচ, ই, এম,

দেখিলাম, ধন্যবাদ।

এম, এম, পাণিগ্রাহী
২১।৬।৫৯

সেক্রেটারী

কাগজপত্র প্রচার বিভাগে দেখানো হউক। প্রচার অধিকর্তাকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া একটি প্রেস নোট ইসু করিতে অনুরোধ করা হউক।

এ, স্বামীনাথন
সেক্রেটারী
২২।৬।৫৯

জে, এস,

যথোচিত এ্যাকশানের জন্য প্রচার অধি-কর্তা দয়া করিয়া সেক্রেটারীর মন্তব্য দেখুন।

এন, সি, রায়
জে, এস,
২৪।৬।৫৯

প্রচার অধিকর্তা

প্রচার বিভাগ

শিক্ষা বিভাগের ইচ্ছানুযায়ী প্রেস নোট ইসু করা হইল। জে, এস অনুগ্রহপূর্বক দেখিবেন।

পি, খাসনবীশ
প্রচার অধিকর্তা
২৯।৬।৫৯

জে, এস,

এন, সি, রায়
২।৭।৫৯

প্রেস নোট

নিকাশীপুর গ্রামের বিদ্যালয়ে অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয় না বলিয়া অভিযোগ করিয়া সম্প্রতি মহানগরের কোনো একটি দৈনিক পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রতি গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। পাছে এই প্রবন্ধের দ্বারা জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় সেজন্য এই সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জ্ঞাপন করা যাইতেছে।

কোনো বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন পাওয়া গেলে শিক্ষা বিভাগ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা, অবস্থান, শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষকদের যোগ্যতা ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করেন। ইহা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, কোনো প্রকার তদন্ত ব্যতিরেকে অর্থ সাহায্যের আবেদন মঞ্জুর করিয়া সরকার জনসাধারণের অর্থের অপচয় হইতে দিতে পারেন না। নিকাশীপুর বিদ্যা-লয়ের আবেদনেও অনুরূপ অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, নিকাশীপুরে কোনো বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং বিদ্যালয়কে অর্থসাহায্যদানে অস্বীকৃত হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঐরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত।

শিক্ষা বিস্তারে গভর্নমেণ্টের আগ্রহ সুবিদিত এবং যে সকল বিদ্যালয় সহায়তা-লাভের যোগ্য বিবেচিত হয় তাহাদিগকে গভর্নমেণ্ট অকাতরে অর্থসাহায্য করিতেছেন। চলতি বৎসরের বাজেটে বিদ্যালয়ে সাহায্যের জন্য সাত লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও অধিকতর অর্থ নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, একখানি প্রতিষ্ঠাবান সংবাদপত্র বিষয়টি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা না করিয়া একমাত্র স্বার্থান্বেষী সরকার বিরোধী পক্ষের কথায় এইরূপ দায়িত্বহীন মন্তব্য করিয়াছেন।

একোঽহম্ বহুস্যাম্

প্রবোধ কুমার সান্যাল

সামান্য একটি ফড়িং অথবা প্রজাপতি যদি কারও হাতে মারা পড়ে তবে তাই নিয়ে কেউ কাঁদতে বসে না। কেউ যদি বলে অমুক ব্যক্তি একটি চড়ুই পাখি বধ করেছে তাতে কি ঠিক মহাভারত অশুদ্ধ হয়, না কি সেই ব্যক্তিকে আমরা খুনী বলে রটনা করি?

আমি দিপুর কথা ভাবছিলুম,—পরবর্তী-কালে যে-ব্যক্তি শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্র পাঠক হয়ে উঠেছিল।

গঙ্গা ফড়িংয়ের পাখা ছিঁড়ে দিয়ে সে যখন বারান্দায় সেটাকে ছেড়ে দিত, সেটা আর বিশেষ চলতে পারত না। তখন দিপু আমাকে ডাক দিয়ে বলত, দেখবি আয় বিশু, চড়াই পাখি কেমন খেলা ক'রে ফড়িংটা খায়! সত্যই তাই, চড়ুই তার খাদ্য খেয়ে যেত।

বাদলা ফড়িংয়ের বেলাও এই। চিমটে দিয়ে-ধরা টিকটিকি নিয়ে সে ছুঁড়ে দিত কাকের দিকে। নেংটি ইঁদুরকে ঝুলিয়ে দিত সে সুতো বেঁধে—শুধু এইটি দেখবার জন্য, ওটাকে লাফিয়ে ধরবার আগে পুষি বিড়ালের চোখ দুটো কেমন জ্বলজ্বল করে! সুন্দর একটি রঙ্গীন প্রজাপতিকে ধরে আগুনে ফেলে দিলে কেমন গন্ধ পাওয়া যায়, এটি দিপুর জানার দরকার ছিল! গর্তের ভিতর থেকে ব্যাং বার ক'রে সে যখন সেটাকে ছিপটি মারত, সে-দৃশ্য দেখে আমিও যে কৌতুক বোধ করতুম না তা নয়। সেই ব্যাংটি মরার ভাণ ক'রে পড়ে থাকত অনেকক্ষণ, তারপর লাফ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই আরেক ছিপটি! আমাদের বাড়ির ফুল গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে ছটকিয়ে আসত হাত দেড়েক লম্বা ঢোঁড়া সাপ। সেদিকে আমাদের দুজনেরই চোখ থাকত। দিপু চট ক'রে গিয়ে বড় লাঠি দিয়ে চেপে ধরত সাপটাকে, এবং আমি গিয়ে চক্ষের পলকে একটি ফাঁস লাগিয়ে ওর মাথাটা বেঁধে দিতুম। তারপর পাড়ার ছেলেদের সামনে রেখে ওটাকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়ে শঙ্খচিলকে খাওয়ানো! দিপুর একটা অদ্ভুত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। কীট-পতঙ্গ সরীসৃপ পাখি ও চতুষ্পদকে ধ'রে দড়ি অথবা তার দিয়ে এক একটাকে বেঁধে ওই ওদের উঠোনে সবগুলিকে জীবন্ত ঝুলিয়ে রাখা!

কিন্তু এর জন্য যে ধৈর্যটুকুর দরকার, সেটি নাবালক দিপুর তেমন বিশেষ ছিল না। ওটা বোধ হয় আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

দিপুকে দেখে আমি সেকালে ভয় পেতুম অন্য এক কারণে। তার হাতে খাদ্য এবং খাদক—কেউ বিশেষ নিরাপদ থাকত না। তখন দেখতুম, দিপুর অন্য চেহারা। যে চড়ুই পাখিটি খেয়ে পালাত ডানাকাটা

ফড়িংটিকে, দিপু তার প্রায় সারা সকালের চেষ্টায় ধ'রে ফেলত একটি চড়ুই পাখিকে। সে-পাখির নিস্তার ছিল না। যখন দেখতুম জ্যান্ত পাখিটাকে দুই হাতে ধ'রে ছিঁড়ে ফেলবার সময় তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলজ্বল করছে, তখন মনে হত সে খুনে! দেখতে পেতুম সে ক্ষমা করছে না কা'রোকে। অতি সুকৌশলে ঘরের মধ্যে সে কাককে বন্দী করেছে তার গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারবার জন্য, এবং আমাকে যখন সেই ফাঁসের একটা প্রান্ত ধরবার জন্য সে বলত, আমি প্রতিবাদ করতে সাহস পেতুম না তার সেই জ্বলন্ত দৃষ্টির সামনে। অতর্কিতে সে যেদিন পুষি বিড়ালটার মাথায় সজোরে লাঠি মেরে সেটাকে ধরাশায়ী করল, আমি সেদিন দেখতে পেয়েছিলুম এই খুনীর ভবিষ্যৎ! ভেবেছিলুম, এরাই বোধ হয় যথাসময়ে সৈন্যদলে নাম লেখায়, নয়ত বাঘ-ভালুকে শিকারের জন্য যায় বন জঙ্গলে, নয়ত যায় দুর্গম কোনও অভিযানে—যেখানে স্বভাবের কঠোরতা প্রথম দরকার।

অন্য সময় দেখতুম দিপুর চোখ শান্ত, অনেকটা যেন ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা চোখ। কোনও একটা প্রাণী দেখামাত্র সে দুরন্ত হয়ে ওঠে, নচেৎ সে ধীরগতি এবং পড়াশুনোয় আমার চেয়ে অনেক বেশি তার সুনাম ছিল।

দিপু আমাকে বলত, ভয় পাস কেন তুই? ও ত' পাখি, পোকা, বেড়াল! ওদের মারলে কি ফুরোয় নাকি?

মারবিই বা কেন কথায় কথায়?

দিপু হাসত। বলত, পোকা মারে পাখি, পাখিকে মারে জন্তু, জন্তুকে মারে মানুষ!

বললুম, তোর যা চেহারা, তুই ত' একদিন মানুষকেও মারবি!

এ আর বাহাদুরি কি? যুদ্ধ বাধলে মানুষ মানুষকে মারে না? কী বোকা রে তুই? সেদিন চন্দর মাস্টার কী বলছিল ক্লাসে? যুদ্ধে গিয়ে যে যত খুন করে সে তত হাততালি পায়,—শুনলিনে?

আহা, সে ত' যুদ্ধের সময়! আর তুই যে বাড়িতে ব'সে ব'সে বেড়াল মারছিস?

দিপু বলল, ধেৎ, তুই মেয়েমানুষের হদ্দ! ওটা দিয়ে হাত শানিয়ে রাখতে হয় রে। নাঃ তোর কোনও আশা নেই, বিশু। মারবার সময় যদি তোর মন খারাপ হয়, কি হাত কাঁপে, তোকে মারবে আরেকজন! তা হলে সেই একই হ'ল!

দিপুর নিজের একপ্রকার একটা দর্শন-শাস্ত্র ছিল, আমার পক্ষে যেটা বোধগম্য হ'ত না। দিপু ভালবাসত হাঁড়িকাঠে পাঁঠাবলি দেখতে। মুর্গি জবাই দেখবার জন্য সে বাজারে গিয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকত। দেখত, মুর্গি'র গলার নলিটা কেটে টিপে ধরার পর তার গলার একটা বিশেষ আওয়াজ কেমন ক'রে তার দেহের ছটফটানির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। সে দেখতে ভালবাসত, গরম তেলের কড়ায় কৈমাছ কেমন সুন্দরভাবে ছটফটিয়ে মরে!

সে আমাকে বলত, তুই ত' ভণ্ড। মাছ মাংস খাবি অথচ তাদের কাটাকুটি দাঁড়িয়ে দেখতে পারিসনে! ভণ্ডামি ছাড়া আর কি? ছুরি দিয়ে যখন ডাক্তাররা কারও ফোঁড়া কাটে, আমার বেশ লাগে। যদি ডাক্তাররা না কাটত, রুগি যে মরে যেত? থাম তুই, বাজে বকবক করিসনে। দুঃখ রইল কী জানিস? শঙ্খচিলকে ধরতে পারিনি। ব্যাটারা আমার সাপ খেয়ে পালিয়েছে!

এর মধ্যে দিপুর জীবনে কোনও গভীর দুঃখ চাপা থাকতে পারে কিনা সে-খোঁজ আমি আর নিইনি। কিন্তু এটি লক্ষ্য করলুম, খেলাধুলোর কালে তার শরীরের কোনও অংশ দৈবাৎ কেটে ছিঁড়ে গেলে সে নিজেই মুখ দিয়ে ওখানকার রক্তটা চুষে নিত।

একদিন রাগ ক'রে বলেছিলুম, তুই নিজে কি জন্তু যে, নিজের রক্ত খাস?

দিপু হেসে বলেছিল, মানুষের রক্তে নুন আছে রে, আর কা'রো নেই। তোর এখনও কোনও বুদ্ধি হয়নি।

আমার মুখে তখনও সাবালকের ভাষা এসে পৌঁছয়নি। সেদিন কিন্তু বুঝতে পারিনি, বুদ্ধি আমার কোথায় কম। তবু ওরই মধ্যে আমি অনুভব করতুম, দিপু আমার সমবয়স্ক হলেও আমার চেয়ে অনেক বড় যেন। প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতায় সে জীবনকে খুঁজে পায়, প্রত্যেক নিষ্ঠুর কর্মে সে জ্ঞান সংগ্রহ করে। সে এগিয়ে গেছে অনেক অনেক পিছনে প'ড়ে আছি আমি তার থেকে! সেইজন্য রাগ করে এক একদিন চন্দর মাস্টার বলত, নাঃ কিচ্ছু হবে না তোদের! শুধু লেখাপড়াই শিখবি, বিদ্যে-বুদ্ধি একটুও হবে না!

লেখাপড়া আর বিদ্যাবুদ্ধির মধ্যে তফাৎটা কোথায়—এটি বুঝতে লেগেছিল অনেক কাল!

কিন্তু দিপু যে একটি বীভৎস নিষ্ঠুরতার কাহিনী আমার সামনে রেখে গেছে, সে কোনওদিন ভুলিনি বলেই আজ দিপুর কথাটা মনে পড়ে গেল। ও ঘটনাটুকু শুধু আমিই জানতুম।

আমাদের বাড়িতে রাতদিনের ঝিয়ের কাজ করত সরলা। কিন্তু কাজকর্ম সারতে তার যত রাত্রিই হোক, সে এক সময়ে চলে যেত তার ঘরে। সে-ঘর ছিল অদূরবর্তী এক বস্তিতে। সেখানে থাকত তার স্বামী। সে লোকটা ছাতুবাবুর বাজারে খেলনা বিক্রি করত। ওদেরই একটা বছর সাতেকের মেয়ে ছিল, তার নাম টুনি। মেয়েটা সবসময়ে মায়ের আশেপাশে ঘুরত, ঘটিবাটিটা এগিয়ে দিত, জলের বালতি টেনে আনত, মাঝে মাঝে সাবান কাচাও করত। আমাদের বাড়িতেই তার দুবেলা দুমুঠো জুটে যেত, এবং এক আধটা ঘাগরা বা জামাজুমিও পেতো। আবার রাত্রে চলে যেত ঘরে তার মায়ের সঙ্গে। সরলা কাজকর্ম সব সেরে ভাতের কাঁসি নিয়ে মেয়েটার নড়া ধ'রে এক সময়ে বেরিয়ে পড়ত।

এমনি একটা সময়ে কবে যেন টুনিকে এই পাড়ারই একটা পোষা কুকুর কামড়ে দেয়। গোটা দুই দাঁত বুঝি মেয়েটার পায়ে বসে যায়, এবং একটু রক্ত বুঝি পড়ে। এর পর মেয়েটা জ্বরে ভোগে দিন দুই। সরলা মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে যেন ঝাড়-ফুঁক তুকতাক করিয়ে আনে এবং কি যেন গাছগাছড়া বেটে খাওয়ায়। হয়ত গোঁদল-পাড়ায় গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে আনা যেতো, কিন্তু তাতে বুঝি চার পাঁচ টাকা খরচ। টুনির বাপের সে সাধ্য নেই। তখন কে যেন বলল, ভয় পেয়ো না, সরলা—ওটা পোষা কুকুর। চিকিৎসে যা করেছ, ওতেই হবে। বিষটুকু বেরিয়ে গেছে জ্বরের সঙ্গে। তবে হ্যাঁ, কামড়ের জায়গায় লোহা পুড়িয়ে একটু ছ্যাঁকা দিলে আর কোনও ভাবনাই থাকত না!

সে আমি পারব না, মা—সরলা বলল, ওই আমার কচি মেয়ে। মা হয়ে ওকাজ আমি পারব না।

কথাটা ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন রাত্রে সবাই আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। শীতের রাত বোধ হয় তখন নটা দশটা। বাড়ি প্রায় নিশুতি। হঠাৎ প্রবল আর্ত চিৎকারে আমরা সবাই জেগে উঠলুম। টুনি চিৎকার করছে প্রবল ও প্রচণ্ড যন্ত্রণায়, ছটফট করছে কাটা ছাগলের মতো। বাড়ির মধ্যে চেঁচামেচি হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল। পাড়াময় লোকজন জেগে উঠল টুনির চিৎকার ও কান্নায়।

ছুটল সবাই নীচের তলায়।

সরলা গিয়েছিল তার ঘরে ভাতের কাঁসি রেখে আসতে। মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছিল নীচের তলার দরদালানে। সরলা দ্বিতীয়-বার এসে ঘুমন্ত মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যাবে, এই ভেবে মেয়েটাকে সে অন্ধকারে একলা ফেলে গিয়েছিল। মাত্র পাঁচ মিনিটের এদিক ওদিক। কেরোসিনের কুপিটা জ্বলছিল দালানের এক কোণে। বাড়িতে তখনও ইলেকট্রিক হয়নি।

বিড়াল-কুকুর-ইঁদুর-সাপ কো ন টা ই কামড়ায়নি টুনিকে। ছোট মেয়েটা ঘুমোচ্ছিল অকাতরে। সে স্পষ্ট বলতেও পারে না, ঠিক কি ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু তার পায়ের কচি মাংস আগুনের ছ্যাঁকায় গলে গিয়ে ততক্ষণে দগদগে হয়ে উঠেছিল। মেয়েটা ডুকরিয়ে-ডুকরিয়ে যখন অফুরন্ত কান্না কাঁদছে এবং সরলা কাঁদছে তার সঙ্গে—তখন কা'রা যেন বলছিল, ইঁদুর-বেড়ালের

কামড় ত' নয় মা, এ যে আগুনে পোড়া! দাও দেখি বাছা দোয়াতের কালি? আর নয়ত আলু বেটে দাও!

কেরোসিন কিংবা রেড়ির তেলের আলোয় টুনির সেই গলিত বীভৎস ক্ষত স্পষ্ট ক'রে সেই রাত্রে দেখা গেল না বটে, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম, কচি মেয়েটার উপর এই অমানুষিক বর্বরতা কোন্ নিষ্ঠুর হাতে সংঘটিত হয়েছিল! সেই রাত্রে আমিও যেন টুনির ওই অগ্নিদগ্ধ একখানা পা নিজের পায়ের সঙ্গে মিলিয়ে অস্থির যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে উঠেছিলুম!

বহুকাল পরে সামাজিক সভ্যতার ইতিহাস ওলটাতে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলুম, সভ্যতা নয়—আগাগোড়া অসভ্যতার ইতিহাস! সেই আদিপর্ব থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি মেয়ের উপরে যে দানবীয় বর্বরতা যুগে যুগে সংঘটিত হয়েছে, তার কলঙ্কের সমস্ত কালি মেখে নির্লজ্জ পুরুষ আজও দাঁড়িয়ে!

দিপুকে কোনদিনই আমি মনে মনে ক্ষমা করতে পারিনি।

অনেককাল তারপর চলে গিয়েছে। কলকাতার চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যেখানে আমাদের বাড়ি ছিল, বটগাছের তলাটায় যেখানে আমরা এককালে গুলী খেলতুম, দিপুদের ঘরের বারান্দা আমাদের উঠোনের ওপর যেখানে ঝুঁকে পড়ত—সে সবের কোনও অস্তিত্ব নেই। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ভাঙনে সেদিনকার সেই পল্লী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। শ্রীমন্ত রায়ের গলি নেই, কানাই ঘোষ রোড কোথায় হারিয়ে গেছে, সেইকালের খোলার বস্তির আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। পরস্পর পরিচিত প্রতিবেশীরা কে কোন্দিকে ছত্রখান হয়ে গেছে, কেউ কারও খোঁজ রাখে না।

আমি তখন এক বীমা কোম্পানীর দালালি করি। ঠিক যে দালাল তাও নয়, তবে ওদের নিয়েই থাকি। বারুইপুরে আর ডায়মণ্ডহারবার—এ দুটো সাবডিভিশন অর্গানাইজ করার ভার ছিল আমার ওপর। আমার ফ্যামিলি থাকে উল্টোডিঙির নতুন কলোনিতে। সপ্তাহে একবার করে বাড়ি যাই। আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম পক্ষের কন্যার খিটিমিটি লেগেই থাকে। পাড়ার লোক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে, বিশু চৌধুরী কেনই যে আবার বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে গেল!

বারুইপুর আমার হাতের মুঠোয়। ডায়মণ্ডহারবারের এমন অঞ্চল নেই যে, চিনিনে। আজকাল সাইকেল রিক্সা পাই নানা গ্রামে। শহর বাজারের চেহারা গেছে পাল্টিয়ে। কলকাতার সৌখিন সম্প্রদায়ের অনেকে ঐ অঞ্চলে এসে বাগান বাড়ি ফেঁদেছে। আমাকে প্রায়ই যেতে হয় মাৎলার ওপারে। কখনও যাই লক্ষ্মীকান্তপুরের ওদিকে। বহু ক্ষেত্রে এখনও গরুর গাড়ি ভরসা। আমার সহকারীরা অবশ্য সাইকেল চালিয়ে যায় বহু অঞ্চলে।

একদিন তালটুলির হাটতলা পেরিয়ে আমি যাচ্ছিলুম হাসান মোড়লের মাঠকোটার ওদিকে। গরুর গাড়িখানা এখানেই ছেড়ে দিলুম। বেলা বোধ হয় তখন এগারোটা। গায়ে ছিল আমার বুশশার্ট, পরণে প্যাণ্ট, মাথায় শোলার টুপি। যদিও মাঘ মাস, তবুও রৌদ্র ছিল প্রখর। আমি চোখ থেকে সান-গ্লাসটি খুলে এদিক ওদিক চেয়ে দেখছিলুম, চায়ের দোকান পাওয়া যায় কিনা।

এদিকটা চাউল কেনাবেচার একটা বড় কেন্দ্র, নানা লোকের জটলা দেখা যাচ্ছিল এখানে ওখানে। কিন্তু ওদেরই মাঝখান থেকে যে লোকটা মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ্য করছিল, তার কাঁধের ওপর ব'সে রয়েছে একটা পোষা বুলবুলি পাখি। লোকটাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ থেকে। এবার সে আমার দিকে সরে এল।

একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে। কিছু মনে করবেন না।

হাসিমুখে বললুম, আমারও যেন মনে হচ্ছে আপনাকে চিনি!

লোকটা বলল, আপনি কি বিশুবাবু?

বললুম, তাহলে ঠিকই হয়েছে। হাঁ, আমি বিশু। আপনি ত' সেই আমাদের দীপেন পাঠক?

তাহলে আর 'আপনি' কেন ভাই? আমরা সেই ছোটবেলাকার বন্ধু! আমাকে সবাই দিপু বলে ডাকত। তারপর? এদিকে যে? একেবারে সাহেব সাজা হয়েছে দেখছি!

দিপু আমার আপাদমস্তক তাকিয়ে যেন আবিষ্কার করার চেষ্টা পেল তার প্রাচীন বন্ধুকে। আমিও বললুম, তুমি অনেক বদলে গেছ ভাই, দিপু। গোঁফ দাড়ি সব পেকে গেছে দেখছি। তোমরা ত' কলকাতার লোক ছিলে, গ্রামে কি করা হয়? কাঁধে একটা পাখি বসিয়ে রেখেছ কেন? খুব পোষমানা দেখছি!

দিপু বলল, হাঁ, তা এই নিয়েই থাকি ভাই। বিশেষ তেমন কিছু করিনে। গ্রামেই থাকি চুপচাপ। চলছে একরকম।

তা বেশ—আমি বললুম, চ'লে যাওয়াটাই আসল কথা। আমি এসেছিলুম হাসান মোড়লের সঙ্গে দেখা করতে। এই বীমা কোম্পানী সংক্রান্ত কাজে। তা বেশ, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কতকাল পরে। মনে আছে সে সব পুরনো পাড়ার গল্প?

বুলবুলিটা ফুড়ুক-ফুড়ুক করে একবার দিপুর মাথায়, একবার কাঁধে, একবার হাতের বাজুর ওপর লাফালাফি করছিল।

দিপু বলল, মনে আছে বৈকি সব। কত উৎপাত করা গেছে এককালে।

এবার আমি বললুম, এদিকে চায়ের দোকান কোথাও আছে ভাই বলতে পার?

আছে বৈকি। ওই যে, রাজমুদির দোকানের ঠিক পাশে—ওই চালা ঘরটার সামনেই পাবে। নতুন দোকান দিয়েছে।

আমি বললুম, চলো না আমার সঙ্গে। দুজনে দুপেয়ালা চা নিয়ে বসি? তা বছর পঁয়ত্রিশ হ'তে চলল বৈকি দেখতে দেখতে! কতকালের কথা!

হ্যাঁ, তা হবে—ঠিকই ত।

চায়ের দোকানের সামনে কাঁচা জায়গাটার ওপর একখানা আমকাঠের যেমন-তেমন বেঞ্চি পাতা ছিল। সামনেই দোকানির মস্ত এক উনুনে জিলিপির কড়ায় মাল তৈরী হচ্ছে। মাছি আর বোলতা ভন ভন করছে তিল-কুটোর থালায় আর পানতুয়ার গামলায়। একটু গুছিয়ে বসতেই দিপুর কাঁধের উপর থেকে ফড়ুক ক'রে বুলবুলিটা উড়ে গেল। হাসিমুখে বললুম, পালিয়ে গেল যে?

দিপু ভ্রুক্ষেপ করল না। বলল, যাবে না কোথাও। উনুন দেখে ভয় পেয়েছে কিনা, বাগান-টাগানে ঘুরতে গেল! আসবে আবার।

দোকানে বেগুনি আর পানতুয়ার অর্ডার করলুম। পানতুয়া নিয়ে আগে দুজনে জল খেলুম। তারপর বেগুনি দিয়ে চা। ওরই মধ্যে দেখে নিলুম, দিপুর চেহারাটা। তার খালি ও মেঠো দুখানা পায়ে কোনওকালে জুতো পরেছে কিনা সন্দেহ। গায়ে ছেঁড়া-খোঁড়া একটি ময়লা গেঞ্জি, তার চেয়েও ময়লা একখানা ধুতি পাট করে লুঙ্গির মতো কোমরে জড়ানো। দাড়ি গোঁফ দুচারমাস বোধ হয় কামায়নি। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময় এই, তার মাথার কটা সে চুলগুলো একেবারে পাকা—যেখানে আমার মাথায় একগাছা চুল আজও পাকেনি!

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে এক সময় হাসিমুখে বললুম, দিনকাল যা পড়েছে, কারও সঙ্গে মন খুলে আর কথা বলা যায় না। তবু তোমাকে পেয়ে যেন কত আপন মানুষকে দেখলুম! তোমার ছেলেপুলে কি, দিপু?

দিপু হাসল। বলল, ছেলেপুলে কি বলছ হে? বে'থাই আমি করিনি। আর সব দিকে মন দেবারই বা সময় পেলুম কই?

বলো কি, সংসার করোনি? তোমার সেই ছোড়দি, মেজদা—তাঁরাও কি এখানে থাকেন? মা কোথায়?

দিপু আবার হাসল,—সবাইকেই তোমার মনে আছে দেখছি। মা মারা গিয়েছেন বুঝতেই পার। তবে ভাই-বোনদের খবর আমি বিশেষ কিছু জানিনে। এখানে একাই থাকি। চলছে একরকম।

দিপুর কণ্ঠে কোথায় যেন সুদূর একটা বিষাদের সুর বাজল। আমার মনে আছে, দিপুর সম্বন্ধে আমি আন্তরিক ঘৃণা পোষণ করেছি বহুকাল অবধি। সে ঘৃণা আজও আমার মন থেকে সম্পূর্ণ মোছেনি। তার সেই নিষ্ঠুর আচরণ মনে করলে এখনও গা ছমছম করে। দিপুর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যেও আমি সেটি ভুলতে পারছিলুম না।

এক সময় আমি বললুম, তা বেশ, এ মন্দ কি? গ্রামে থাকা ত ভালই। শহরের উত্তেজনা নেই, আজে বাজে খরচ নেই,—এ তুমি ভালই করেছ, দিপু। আর ধরো তোমার দায়-দায়িত্ব কিছু নেই, ছেলেপুলে মানুষ করতে হয় না,— ঝাড়া হাত-পায়ে দিব্যি আছ। তোমাকে দেখলে হিংসে হয়, দিপু। এখানে কাজকর্ম কি করা হয়?

কই আর কাজ?—দিপু বলল, কেই বা দিচ্ছে বলো? তবে কি জানো বিশু, কাজের লোক কাজ ঠিকই খুঁজে পায়! ও নিয়ে ভাবতে হয় না!

কিন্তু আমি ভাবছি তুমি কেমন ক'রে একেবারে ছিটকে এসে পড়লে এই গ্রামে? এদিকে কি তোমাদের জমি-জায়গা ছিল কিছু আগে?

দিপু বলল, এক ছটাকও ছিল না, আজও নেই। তবে ওই যা তুমি বললে, ছিটকে এসেই পড়েছিলুম বটে একদিন। সেও অনেকদিনের কথা হল বটে। আমি এখানে নিজের থেকে আসিনি হে। ইংরেজ আমলের পুলিস আমাকে এনেছিল!

আমি দিপুর দিকে তাকালুম। পুলিস চিরকালই আমার কাছে ভয়ের বস্তু। তবে দিপুর স্বভাব-প্রকৃতি যা আমার জানা ছিল, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ পুলিস যে একদিন তাকে বেছে বার করবে, এ ত' জানা কথা। তার সেই জ্বলজ্বলে হিংস্র চক্ষু আজও আমি ভুলিনি।

হাত ঘড়িতে প্রায় বারোটা বাজে। এবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলুম। বললুম, আচ্ছা ভাই, অনেককাল পরে তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগল। এবার আমি যাই। মোড়লের ওখানে কাজ সেরে আবার ফিরতে হবে সন্ধ্যের আগে। এখানে গরুর গাড়ি পাবো ত?

দিপু বলল, যাবে কোথা?

টাউনে ফিরব।

আচ্ছা, সে-ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো, তুমি ভেবো না। আগে কাজ সেরে এসো মোড়লের ওখানে। কিন্তু হাসান মিঞাকে পাবে কি? শুনেলুম মামলার তদ্বির নিয়ে খুব ব্যস্ত? চলো, আমি তোমাকে এগিয়ে দিই।

পকেট থেকে মনিব্যাগ বার করে হোটেলের পয়সা দিতে গেলুম, কিন্তু দোকানি হাঁ হাঁ ক'রে উঠল,—বলেন কি, দামের কথা মুখেও আনবেন না। বড়বাবুর বন্ধু আপনি!

থমকিয়ে একটু অবাক হয়ে গেলুম। দিপু বলল, তা হোক, তুমি তোমার দামটা নিয়েই নাও, গোবর্ধন।

গোবর্ধন বলল, প্রাণ থাকতে নয়, বড়-বাবু। এ দোকান আপনার, আপনার দয়ায় ক'রে খাচ্ছি। দাম নেবো কি বলছেন? আরও এক টাকার খেয়ে যান না? আপনাদের পায়ের ধুলো পড়েছে, এই আমার ভাগ্যি।

দিপুর দিকে আবার তাকালুম। দিপু বলল, তবে চলেই এসো। এইজন্যেই আমি বাজারের দিকে আসতে চাইনে। কারও কাছে কিছু নিলে দাম নিতে চায় না। চলো, এগোই—

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারা গেল না। হেসে বললুম, এ গ্রামের লোক বুঝি তোমাকে ভয় পায়, দিপু? বোধ হয় তোমাকে খুশী রাখতে চায়?

দিপু হাসল,—না, তা ঠিক নয়। বোধ হয় পাগল-ছাগল কিছু একটা মনে করে! এই আর কি।

দিপুর চেহারাটার দিকে আরেকবার তাকালুম। ছেঁড়া গেঞ্জি, পাটকরা ময়লা ধুতি, মেঠো খালি পা,—রুক্ষ ধূসর ক্ষৌর-কর্মবিহীন চেহারা,—এর পিছনে আর কী পরিচয় তার থাকতে পারে তাই ভাবছিলুম।

হঠাৎ চমকিয়ে উঠলুম। কোথা থেকে একটা শাদা পায়রা পাখার শব্দ করতে করতে একেবারে পাক খেয়ে নেমে এলো দিপুর হাতের মধ্যে। আমি একেবারে অবাক। দিপু সেটার মাথায় ও ডানায় সস্নেহে হাত বুলোতে লাগল। আমি বললুম, বাঃ পাখিরা তোমাকে ভালবাসে দেখছি খুব? বুলবুলিটা কোথায় গেল?

ভেবো না, আসবে ঠিক। এই কোথায় আছে যেন।—পরম নিশ্চিন্ত মনে পায়রাটাকে কোলের মধ্যে নিয়ে দিপু সঙ্গে সঙ্গে চলল।

দিপু ঠিকই বলেছিল। হাসান মোড়ল সেই সকালে বেরিয়েছেন মহকুমা আদালতে মামলার তদ্বিরে। সন্ধ্যের আগে তিনি ফিরবেন কিনা বলা কঠিন। শীতকালে আমন ধান উঠলে মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা এদিকে অনেক বাড়ে। খুন-খারাপির কেস ত' হামেশাই। চার ক্রোশ রাস্তা ভেঙে আমার আসাই মিথ্যে হল।

দিপু বলল, বেশ ত, এলেই যখন এত-দূরে, আমার আস্তানাটা একবার দেখেই যাও? এই ত' কাছাকাছি, ওই নারকেল বাগানটার ঠিক পেছনে।

গরুর গাড়ির ব্যবস্থা তুমি করতে পারবে?

না না, গরুর গাড়ি কেন বলছ? নতুন খাল দিয়ে ধানের নৌকো যাচ্ছে কত, আমি তোমাকে ঠিক তুলে দেবো। দু ঘণ্টার মধ্যে পেঁৗছে যাবে। এখন আর কেউ গরুর গাড়িতে যায় না।

নারকেল বাগানের তলা দিয়ে যাবার সময় দিপু আবার বলল, বলতে ভরসা হয় না

বিশ্ব, তোমরা ভাই বড়লোক! তবে এক-মুঠো ডাল-ভাত যদি মুখে দিয়ে যেতে আমার ওখানে, বড় খুশী হতুম। পুরনো বন্ধু।'

আমি এইটিই ভাবছিলুম। কিন্তু আপাতত জানিয়ে বললুম, আমাদের কাজকর্ম একটু অন্যধরণের কিনা, সেইজন্য সেই সকালে স্নান সেরে চারটি খেয়ে বেরোই, আবার খাই সেই রাত্রে বাসায় ফিরে। দুপুরের ভাত খেলে ঘুম ছাড়া আর কিছু হয় না!

দিপু বলল, না, চাপ দেবো না আমি। যদি ভাল লাগে খেয়ো দুটি। নৈলে দু'একটা ডাব খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ো!

অতি পুরনো কালের উঁচু পাঁচিল ঘেরা একটা বাগানের দরজার কাছে এসে দিপু বলল, এই আমার আস্তানা। এখানকার লোকে এটাকে বলে, থানাবাড়ি। এসো ভাই ভেতরে।

পাঁচিলের যে অংশটা ধ্বসে গেছে, সেইটিই হয়ে উঠেছে প্রবেশপথ। কিন্তু আশ্চর্য, ভিতরে ঢুকে দিপু পায়রাটাকে উড়িয়ে দিতে না দিতেই কোথা থেকে যেন সেই বুলবুলিটা আবার ফড়ুক করে উড়ে এসে দিপুর কাঁধের ওপর বসল। এমন কৌতুকজনক অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম। আমি শুধু হাসলুম।

কিন্তু দিপুর ওই প্রাচীন থানা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কিছু বাকি ছিল। সেটি ঘটল আমরা ঢুকতে না ঢুকতেই। গোটা তিনেক কুকুরের সঙ্গে চার পাঁচটা সুপুষ্ট বিড়াল দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল। এটি আমার দেখতে বাকি ছিল যে, একদল পায়রা, পাঁচ-ছয়টা বুলবুলি, পাঁচ সাতটা গাঙশালিক—এরা কেউ আমাদেরকে গ্রাহ্য না করে আমাদের আশেপাশে এবং হাতের কাছে নড়াচড়া করছে।

উঠোনে গোটা দুই পাতিলেবু আর পাতাঝরা পেয়ারাগাছ দেখতে পাচ্ছি। তাদেরই নীচে বুলবুলির পাশ দিয়ে বিড়াল ঘুরছে এবং পায়রার পাশে কুকুর মাটি শুঁকছে—এটি দেখতে ভালই লাগে। কোনটার সঙ্গে কোনটার বিরোধ বা ঈর্ষা নেই—এটি বেশ চিত্তাকর্ষক। ওরা সবাই যেন দিপুর পরম প্রিয় সন্তান দল।

ছোট আমগাছটার তলায় একখানা পুরনো চৌকি পাতা ছিল, আমি সেখানে বসে বললুম, তুমি বেশ একটি চিড়িয়াখানা বানিয়ে তুলেছ দেখছি, দিপু।

দিপু বলল, না, তা হবে কেন। এখানে সবগুলোই ছাড়া থাকে। ওদের মধ্যে ভালবাসা আছে খুব।

তুমিই ত এসব শিখিয়েছ, দিপু!

দিপু শুধু হাসল। ওদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে ভালবাসা, সেটাকে সহজেই বের ক'রে আনা যায়। তবে সবাই কি আর আমার কথা শোনে? গোটা চার পাঁচ টিয়া আছে ওদিকে, কিন্তু ওদের একটা বড় হিংসুটে, কথা শোনে না। চন্দনার জোড়াটা খুব ভাল। ওরা ওদিকের উঠোনে থাকে, এদিকে আসে না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছিলুম, বনবাগান সমেত থানাবাড়ির চৌহদ্দি মস্ত বড়। কিন্তু এদিকটা তার আধখানা মাত্র। ওদিকের পুরনো ভিটের দক্ষিণে বাগান নাকি আরও বড়। দিপু বলল, সবসুদ্ধ বিঘে চল্লিশেক হবে বৈকি। কবে যেন কোন্ আমলে এটা ছিল সেপাইদের চৌকি। বোম্বেটেরা আসত লুটপাট করতে, মেয়েছেলে ধ'রে নিয়ে যেতে। ইংরেজরা পরে এসে এই থানাবাড়ি দখল করে। এটা এখনও খাসেই আছে।

একে একে দিপুর অনেকগুলো পরিচয় পাচ্ছিলুম। ওর সঙ্গে একসময় উঠে এই জরাজীর্ণ ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়ে এলুম দক্ষিণে। এদিকটা মস্ত বাগান, কিন্তু ছমছমে ছায়ায় আচ্ছন্ন। বড় বড় কাঁঠাল, আম, লিচু, তাল, নারকেল—অসংখ্য ফলের গাছ। ওই ছায়ার তলায় আনারসের বন। আশেপাশে আঁসফল ডুমুর আর বৈঁচির গাছ। কিন্তু আমার হাসি পেল যখন দেখলুম, মুরগি, বেজি আর খরগোস ঘুরছে এখানে ওখানে। অদূরে গোয়ালে কয়েকটা গরু। তালটুলির লোকেরা এখান থেকে দুধ কেনে।

এত বড় বাগানবাড়িতে তুমি একা থাকো, দিপু? মানে আর কারোকে দেখছিনে ত? শুধু তুমি আর এইসব পশুপাখি?

দিপু কতক্ষণ পরে শুধু ছোট্ট জবাব দিল, না, একা নয়!

তার মুখে আর কোনও কথা না শুনে আমিও চুপ ক'রে গেলুম। আমার বয়স হয়েছে এবং দুবার বিয়ে করেছি। সুতরাং ওদিককার ব্যাপারটা কিছু বুঝি বৈকি! তা ছাড়া দিপুকে জানি আশৈশব, তার মূল প্রকৃতি আমার নখদর্পণে। হিংসা, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা—এসব ছিল তার নিত্যসঙ্গী। সেগুলোর সঙ্গে ষড়রিপুর প্রথমটি যদি মিলিয়ে থাকে, দিপুর পক্ষে সেটি অস্বাভাবিক নয়। সে একা এখানে থাকে না, অপর একজন কেউ সঙ্গে আছে এবং এখনও আমি তাকে চোখে দেখলুম না—এর পিছনে দিপুর আগাগোড়া ইতিহাস সুস্পষ্ট বৈকি। দিপু কেন কলকাতা ছেড়েছে, আত্মীয় পরিজনের খবর সে রাখে না কেন, এমন স্বেচ্ছানির্বাসনের মূলে রহস্যটি কোথায়—একথা সে যেন জানিয়ে দিল তার ওই ছোট্ট জবাবটিতে। দিপু তার নিজের স্বভাবজ চাতুর্যের দ্বারা স্থানীয় দোকানদার, ফড়ে, চাষী, মোড়ল প্রভৃতিকে নানা উপায়ে ঘুষ খাইয়ে তাদের মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছে, একথা নাবালকও বোঝে। কথায় কথায় সে এক-সময়ে আমাকে বললেও বটে,—হ্যাঁ, তুমি ধরেছ ঠিক, এদের নিয়েই আমি থাকি। তবে এখানকার এইসব দুধ, ডিম, ফল, সব্জি—এসব আমি একটু অল্প দামেই বেচি।

অল্প দামে কেন? এত চড়া দর আজকাল!

তা হোক গে—দিপু ঈষৎ হাসল, কী হবে অত লাভ নিয়ে? আমার চললেই হ'ল! যে-কটা লোক খায় খাক্।

মনে মনে বললুম, বড় চালাক তুমি! আমার কাছে সাধু সাজছ! আসলে খুশী রাখতে চাও কতকগুলো লোককে, পাছে তা'রা তোমার নৈতিক অপরাধের জন্য গলা-ধাক্কা দিয়ে গাঁ ছাড়া করে। আমি যে বীমা কোম্পানীর ঘুঘু, এটি তুমি বোঝনি ভাই, দিপু!

সব দিক দেখেশুনে আবার যখন এসে সেই পশুপাখি দলের মাঝখানে তক্তাখানায় বসলুম, দিপু তখন বড় বড় দুটো ডাব, তার বাগানের গোটা দুই মর্তমান কলা ও চিনি দেওয়া একবাটি চিঁড়ে-দই এনে আমার সামনে রাখল। বলল, একটু যা হয় মুখে দাও বিশু, নৈলে আমার বড্ড মন খারাপ হবে। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসছি। একটা ডুব দিয়ে দুটি খেয়ে নেবো!

আচ্ছা এসো, আমার তাড়া নেই।

দিপু চলে গেল, কিন্তু তার শালিক, কুকুর, বুলবুলি আর পায়রার দল আমাকে ঘিরে রইল। বিড়াল দুটো বসল অদূরে।

দিপুর সম্বন্ধে কোনও কথাই যখন আমার পক্ষে অবিশ্বাস্য ছিল না, তখন তার শেষের কথাগুলোও আমি বিশ্বাস করলুম—ওই চৌকিতে ব'সে পশুপক্ষী দলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বহু গল্পই একে একে তার সঙ্গে ক'রে গেলুম। নিজের জীবন কাহিনীও ফাঁদলুম বৈকি।

দিপু এক সময় শান্ত সংযত কণ্ঠে বলল, তুমি এখনই চলে যাবে জানি। হয়ত আবার কখনও দেখা হবে, হয়ত হবেও না। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করে যাও বিশু, যে কয়টা ডাকাতি করেছি, কোনটাই নিজের জন্যে নয়! অধিকাংশ খেয়েছে স্বদেশী ছেলেরা—যারা ইংরেজ পুলিশের ভয়ে পালিয়ে বেড়াত! অনেকটা খেয়েছে দুঃখী গরীব, যাদের কিছু নেই। আর আমি? আমার কি অধিকার ছিল ভাই পরের পয়সায়? আমি ত' কখনো দেশের কোনও কাজ করিনি?

কিছুক্ষণ চুপ করে গেল দিপু। এ গ্রামে কবে সে এসেছে, এ প্রশ্ন করতেই দিপু একটু হাসল। বলল, আগে পূর্ববঙ্গে অনেকগুলো গ্রামে অন্তরীন ছিলুম, কিন্তু ওরা কোথাও আমাকে রেখে বিশ্বাস করত না। ওদের ধারণা, ডাকাতি কোথাও হলেই আমি নাকি দায়ী! একদিন আমি পাবনা জেলার সাতবাড়ি ঘাট থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসেছিলুম এই ডায়মণ্ডহারবারে। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে নৌকোয় ছিলুম মাস-খানেক। তারাই আমাকে খাওয়াতো।

হেসে বললুম, তাই নাকি?

হ্যাঁ, ভাই। তবে ওর মধ্যে বাহাদুরিই বা কতটুকু? কত ছেলে কতদিকে দুঃখ পেয়েছে, কেউ কি খোঁজ রাখে? আমি যখন এই তালটুলিতে এসে দাঁড়ালুম, তখন এক বুড়ি তার ঝোপড়ার মধ্যে আমাকে ঠাঁই দিয়েছিল! বুড়ি ভিক্ষে করত গাঁয়ে-গাঁয়ে। সবাই ওকে ময়নাবিবি বলে ডাকত, কিন্তু আমি ওকে মা বলতুম। বুড়ি কিন্তু ভারি বিশ্বাসী ছিল। আমি যেদিন ওকে আমার পুটলিটে রাখতে দিয়ে বললুম, মা, এতে যা টাকা আছে তাতে একটা তালুক কেনা যায়, বুঝেছ? খুব সাবধান কিন্তু? কেউ না জানে! —বুড়ি শুধু হেসে বলেছিল, আমাকে পাঁচজনে খাওয়ায় বাপ, তোমারটায় কি হবে আমার? যাই হোক, সেই পুটলিটে কিন্তু কাজে লেগেছিল দুর্ভিক্ষের বছরে। আর ওই বছরে আমি ধরাও পড়ে গেলুম পাঁচটা লোক খাওয়াতে গিয়ে! কলকাতার এক গোয়েন্দা পুলিশ এখানে এসে হঠাৎ খুন হয়! ওরা গন্ধ পেয়ে টেনে নিয়ে গেল আমাকে। একেই আমি পলাতক, তার ওপর খুনের মামলা।

দিপু হাসিমুখে বলল, বুঝতেই পার আমার অবস্থা! ডাকাতির সময় দু'চারটে খুন যে হয়নি তা নয়। কিন্তু—এ গোয়েন্দা ভদ্রলোক বড় ত্যাঁদড় ছিল। যাক্‌গে।

টাকাটার কি হ'ল?

টাকাটা? খানাতল্লাসীর ফলে সেই টাকার পুটলি পুলিশের হাতেই গেল! সে যাই হোক, ফাঁসীর হুকুম অবশ্য হয়নি আমার, তবে আলিপুরের জেল থেকেও একদিন আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম হঠাৎ। সুন্দর-বনেরই ভেতর দিয়ে গিয়েছিলুম বাগের-হাটে! বছর তিনেক পরে দেখতেই ত পেলে সেখানে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ উড়ল! আমি এলুম কলকাতায়।

তারপর?

দিপু আবার হাসল,—ভাল লাগল না কারোকে। ময়নাবিবিকে মা বলতুম। ওকে রান্না করে দিয়েছি অনেকদিন। ওর আশীর্বাদের দাম কম নয়, ভাই। এখানে আবার ফিরে এসে দেখলুম, মায়ের অবস্থা ফেরেনি, তেমনিই ভিক্ষে করছে! দুটো চোখ নষ্ট হতে বসেছে। তা প্রায় সত্তর বছর বয়স হ'ল বৈকি। আমি এসে বললুম, মা, আমি তোমার সেই দিপু, তোমাকে আর আমি ভিক্ষে করতে দেবো না! বুড়ি বলল, খাওয়াবে কে বাপ? আমি বললুম, তোমার মুখে ভাত দেবার মত ছেলে আজও জন্মায়নি, মা। এখন থেকে তোমার অন্ন তুমিই খুঁটে খাবে!

বুড়ি কবে মারা গেল? —প্রশ্ন করলুম।

ওকথা বলতে নেই। এখন একটু ভালই আছে। এসো, দেখে যাও ভাই আমার মাকে।

সর্বাপেক্ষা যে-ঘরটি ওরই মধ্যে বাসযোগ্য, ময়নাবিবি থাকে সেই ঘরে। বাইরে থেকে তাকে দেখলুম, আহারাদির পর কাঁথামুড়ি দিয়ে সে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। দেখি এক রাশি শাদা চুল, চেহারাটা এক বীভৎস পিশাচীর মতো। দিপু সেইদিকে তাকিয়ে অপরিসীম শ্রদ্ধা সহকারে বলল, দেখলে ত, একা আমি থাকিনে! ওই আমার মা!

আমার নোংরা মুখে আর কোনও কথা ফোটেনি!

অতঃপর আমাকে একখানা ধান বোঝাই নৌকায় তুলে দেবার জন্য দিপু সঙ্গে সঙ্গে চলল নতুন খালের ঘাট পর্যন্ত। বেলা তখন তিনটে বাজে।

ঘাটের ধারে এসে দেখা গেল, একখানা নৌকা প্রায় প্রস্তুত। মাঝিমাল্লারা তখন দড়া-দড়ি খুলতে লেগেছে। দিপুকে তারা অভিবাদন জানাল। এক ফাঁকে দিপু আমার একখানা হাত ধরে বলল, আর কিছু নয়, বিশু—বুঝেছ? মানুষের ভালবাসার ছোট ছোট স্পর্শ! সেই অনেক। একটি ছোট পাখি, একটি সামান্য বেজি,—তারাও জানে তোমার চোখে করুণার ছায়া আছে কিনা। ভালবাসা আশ্চর্য বস্তু। পশুপাখি মানুষ—সব তার চোখে সমান!

আমি একটু হাসলুম। বললুম, তোমার ছোটবেলায় একথাটা কেউ যদি তোমাকে শিখিয়ে দিত!

ছোটবেলা! হাসল দিপু,—হ্যাঁ, ছোট-বেলায় তুমি আমাকে দিয়ে অনেক অন্যায় করিয়ে নিয়েছিলে, বিশু!

আমি? দিপুর কথায় অবাক হয়ে গেলুম।

দিপু দূরের দিকে তাকিয়ে তার প্রাচীন দিনের কাহিনী স্মরণ করে বলল, বড় নিষ্ঠুর তুমি ছিলে, বিশু। তুমি দেখতে চেয়েছিলে কেমন করে জ্যান্ত একটা পাখিকে ছিঁড়ে ফেলতে হয়, কেমন করে লাঠির ঘায়ে বেড়াল-কুকুর মরে, ছোট মেয়ের পায়ে লোহার খুন্তি পুড়িয়ে চেপে ধরলে কেমন করে সে ডুকরে ডুকরে কাঁদে! তা হোক, জীবনে কত পাপ, কত ভুল, কত বর্বরতা, —হোক না কেন? কিন্তু তুমি ভয় পেয়ো না! তোমার ভালবাসাই তোমার সকল নিষ্ঠুরতার মহৎ প্রায়শ্চিত্ত! কেন মিথ্যে ভয় পাচ্ছ, বিশু?

আমি হাসব কি কাঁদব—কিছু বুঝতে না পেরে দিপুর দিকে তাকালুম। কিন্তু সেই অবেলার আলোয় তার দুই চোখে এমন এক সমবেদনাবোধের নিবিড় ছায়া ও করুণার আভা দেখতে পেলুম যে, আমার শুকনো গলায় আর কোনও কথা এল না!

নৌকো থেকে ডাক দিল মাঝিরা। আমি দিপুর কাছে বিদায় নিয়ে বললুম, আচ্ছা ভাই দিপু, এবার আসি। অপরাধ স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভালই করেছ। তোমার কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি!

প্রসন্ন নির্মল স্নেহের হাসি হেসে দিপু আমাকে বিদায় দিল।

শব্দব্রহ্ম

দিনেশ দাস

শব্দ যদি ব্রহ্মই না হয়
শব্দ যদি না হয় চেতনা
অথবা না হয় যদি ভাবনার কণা—
কী হবে কবিতা লিখে, আমাকে বল না!

মাটির ফুলকে তুমি যত ঊর্ধ্বে তোলো
মহাশূন্যে পাক্ থাক্ ঘূর্ণির উৎসবে,
মাটিতে ফিরবে সে তো ঝড়ের পরেই
তারপরে ধুলো হয়ে গ'লে মাটি হবে।

ভাবনার ফুল যদি অন্ধকার থেকে
পরিচ্ছন্ন আলোয় না আসে,
ভাবনা যদি না হয় শব্দে পরিণত,
তারা যদি মস্তিষ্কের কোষে ক্রমাগত
রাতের পোকার মত ঘোরে চতুর্দিকে:
তা হ'লে বল তো তুমি, কী হবে কবিতা লিখে?

কলকাতা শেখায়

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

থেকেছি উদাস দূরে, কলকাতায়।
এখন কলকাতা
প্রতিটি মিছিল, সভা, ট্রাফিক আইল্যান্ড,
বাতিস্তম্ভ, বাস-বোঝাই মানুষ, রমণী,
প্রসূতশালা, রঙ্গালয়, সন্ধ্যার উলঙ্গ আলো,
পবিত্র হোটেল-বাড়ি, শুঁড়িখানা,
কমিটী, উদ্যান ইত্যাদিকে...
ইত্যাদিকে...ইত্যাদিকে
কান ধরে শেখাতে পারে, শিখিয়ে দিয়েছে,
এ ওর একমাত্র ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলেও তবু
কী করে অজস্র দূরে থাকা যায়।

কলকাতা শেখাতে পারে। শিখিয়েছে দারুণ রগড়। তাই
ভিড়ের ভিতরে কেউ আস্তিনে টান দিলে, কিংবা
ঘাড়ের উপরে কেউ ডাকাতি করলেও, কিংবা
হঠাৎ-এগিয়ে-এসে-গায়ে-পড়ে-আলাপ-জমানো
হুড়মুড়-বাড়ির কড়া নড়ে উঠলে তবু ভাবতে পারি—
নির্দন্ত বাঘের কথা। আকাশী ফুলের কথা।
আকাশী ফুলের প্রতি কেরানীকুলের ঘোর
আসক্তির কথা। কিংবা
হেডক্লার্ক-বাবুটি কারও অন্তরঙ্গ পিসেমহাশয়
এমন উদাস কথা।
কলকাতার ঘনিষ্ঠ সুদূরে থেকে
ভাবতে পারি, ভেবে যাই,
হয়ত বাবলার কাঁটা চিরকাল নির্দয় ছিল না।

এখনো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

তারা অপলাপী যারা শুধু যন্ত্রণারই কথা কয়।
এমন কি আসেনি সময়
যখন ফুটেছে ফুল উচ্ছল বাগানে,
আকাশ হয়েছে নীল, নদী স্বচ্ছ গানে
রক্তে এনে দিয়ে গেছে ঘুম?
কোনো সন্ধ্যা, কোনো ভোর আদরে কুঙ্কুম
মাখায়নি মনে, আছে শুধু জ্বালা ক্ষত?
এখনো শিশুর হাসি আছে ত অন্তত,
এখনো পৃথিবী জন্ম দিতে পারে সুন্দর শৈশব,
এখনো সময় আসে, আনে না যে মিথ্যা পরাভব॥

কোনো চিহ্ন নেই

অরুণ মিত্র

আরোগ্যের জন্যে কয়েকটি কথা প্রথমেই তাদের মনে এসেছিল। যেমন—নদী, যেমন—সূর্য, যেমন—প্রেম। শুধু মনে আসা নয়, তারও বেশী। এইসব শব্দের চিহ্ন তাদের স্বভাবে তারা মুদ্রিত করেছিল। তাদের ধারণা হয়েছিল, জীবনের মূলকে তারা প্রত্যক্ষ করেছে এবং তাকে এক বিশুদ্ধতায় তারা সঞ্চারিত করতে পারবে।

তাদের আশ্রয়ের জমিতে পলি পড়ে কিনা তারা অবশ্য জানত না। কিন্তু নির্জনে তাদের কথোপকথন উর্বর হত। যে-কোনো ধ্বনি, তা জলের গতিরই হোক বা মাটির বিস্ফারেরই হোক বা তাপের স্পন্দনেরই হোক, তাদের বাক্যে মিশত। যেভাবে চোখের দেখার সঙ্গে ঘুম মেশে।

প্লাবন আর আগুনের সর্বনাশকে তারা মনে ঠাঁই দেয়নি। অথচ শতাব্দীর গুহার মধ্যে এক ভীষণ উপস্থিতি তাদের নিকটেই ছিল। তারা ভাবেনি তাদের আবিষ্কৃত উষ্ণতা এবং শীতলতার পরে চূড়ান্ত আর কিছু ঘটতে পারে। গাঢ় বিনিময় একসঙ্গে অনেক তারা করেছে; কিন্তু তাদের জানা ছিল না নির্ভরকে কুরে খাবার পোকা প্রত্যেক নিশ্বাসে গিসগিস করে। এবং তাদের জানা ছিল না মানুষের মুখ ছুঁয়ে 'এই আরোগ্য' বলতে গিয়ে বাতাস একসময় হাহাকার ক'রে ওঠে।

তাদের আশ্রয়ের কোনো চিহ্ন নেই এখন। একটা সমাধির পাথরও না।

এসেছিলে বুঝি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এসেছিলে বুঝি, কথা কিছু বলেছিলে.
চেয়েছিলে বুঝি মেলে ঘন কালো চোখ
রাত্রির মতো। যাত্রার পথ ধরে
উধাও হবার ছিলো কি স্বপ্নলোক?

চেয়ে দেখি আজ সময়ের বিভীষিকা
হাঙরের মতো নিষ্ঠুর হাই তোলে.
এসেছিলে বুঝি. কথা কিছু বলেছিলে।

স্বপ্নের সাধ স্বপ্ন কি মেটাবে
তোলা টবে শুধু সাধের ফুলকে
বারবার ফোটাবে?

পেয়েছি তোমাকে। মনীষার নিশ্বেসে
বারেবারে ভোলা বারেবারে বিশ্বাসে
কখনো অবাক কখনো ভাঙলো মন
কখনো আবার সময়ের কঙ্কণ
সব মুছে দেয়। থাকে শুধু স্লেট ফাঁকা
কী কখন ফুটবে, কোন ছবি হবে আঁকা?

এসেছিলে তবু আসোনি
আকাশে জোয়ার বিদ্যুৎভরা অশনি॥

নিঃসঙ্গতা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তালাবন্ধ ঘর খুললেই আমি ভীষণ একাকী
বারান্দায়, সিঁড়িতে, উঠোনে;
যে-কেউ আড়ালে আছ আমি শুধু অস্থিগুলি দেখি
অন্তিম লগ্নের আয়োজনে।

এই নিঃসঙ্গতাভার সইব কী করে। সারাক্ষণ
আজ শান্ত প্রতীক্ষার ভীষণ তিমিরে
শুয়ে আছি। সংশয়ের শরবিদ্ধ মাছি
উড়ছে সর্বত্র আকাঙ্ক্ষার
নারীর মতন সেই সুমসৃণ মধ্যমা প্রতীক
রক্তমুখী গোলাপকে ঘিরে। মাঠে, পথে

অনেক বিরোধ আমি আড়ালে এড়িয়ে
ঠাণ্ডা হাওয়ায় মুখ রেখে
গোলাপের স্নিগ্ধ ঘ্রাণে তৃপ্ত হব বলে
এখানে এলাম। ভেবেছি প্রান্তর
শেষ হলে ফিরে পাব নির্ধারিত ঘর।

আজ শান্ত প্রতীক্ষার ভীষণ তিমিরে
শুয়ে আছি, বারান্দায়, সিঁড়িতে, উঠোনে
এখনো সংশয়। একমাত্র ধৈর্যশীল হলে
হয়তো বাঁচবো, তাই ধৈর্যের নিবিড়ে
ফিরে ফিরে যাই। প্রেত কণ্ঠস্বর
পুরণো স্মৃতির পাকে পাকে; তার অবশেষে
ফিরে পাব আকাঙ্ক্ষিত ঘর॥

যাত্রী

হরপ্রসাদ মিত্র

রোদে পুড়ে, বিষ্টিতে ভিজে, ভিড়ে পিষে
শ্রান্ত একটি যাত্রী এসেছিল সমুদ্র দেখতে।
ঢেউয়ের চাবুক খেয়ে,
বালিতে আছড়ে পড়ে,
ঝিনুক, জল, বালির সঙ্গে মিশে—
সমুদ্র দেখলো সে।

দুপুরের নির্জনতায়, বিকেলের হাসিখুশিতে,
রাতের দুর্বোধ্য গর্জনে—
সমুদ্রকে দেখে দেখে, দেখে দেখে
যথারীতি স্টেশনে ফিরলো সে।
টিকিটও কিনলো, ট্রেনেও উঠলো।
তার ট্রেন ছেড়ে গেল
ধোঁয়া উড়িয়ে, ধ্বশ-ধ্বশ্ গর্জন তুলে।

তেমনি,—হে প্রেম, তোমাকে আমি প্রেমই দিয়েছি।
হে সুন্দর, তোমার নৈবেদ্য আমার সৌন্দর্যই।
তারপর ঘরে ফিরি।
রোদে পুড়ে, বিষ্টিতে ভিজে, ভিড়ে পিষে—
আমি তোমাদেরই যাত্রী।
আমি সমুদ্রতৃষ্ণার্তের তৃষা।
আমি বলতে চাই, 'আমি আছি'।
জয়-পরাজয়ের অশেষ যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে
হে প্রেম, তোমাকে আমার প্রেমই দিয়েছি
হে সুন্দর, তোমার নৈবেদ্য আমারই সৌন্দর্য।

টান

অরুণকুমার সরকার

কিছুই টানে না আর, টেনে নিয়ে যায় না সাগরে।
পুকুরে, ডোবায় কেউ, বড় জোর নদীর কিনারে
যাবার প্রত্যাশা এনে মাঝপথে দারুণ হাঁপায়।
দেখে কষ্ট হয় বড়; বলি, আচ্ছা, আসব অন্যদিন।

আবার শহরে ফিরে কড়া নাড়ি: অমুক আছো হে!
আছে। বেঁচে বর্তে আছে। চোখে কিন্তু জ্যোতি নেই আর
যদিও রেখেছে ঠাট, যেমনটি তেমন ব্যবহার।
জানে না ভেঙেছে হাল, দড়াদড়ি খেয়ে গেছে কীটে,
নৌকোর পাটায় গর্ত, পালে ফুটো, দিক বদলেছে।

আরেক পাড়ায় যাই, উঠতি মাঝিমাল্লাদের ঘাটে।
দেখিয়ে ন্যাংটো পাঁজরা টানটান মালকোঁচা আঁটে
চোয়াড়ে ছোঁড়ার দল। তারপর চড়া দর হেঁকে
ডাঙায় ডিগবাজি খেয়ে ট্যাঁক থেকে বের করে বেঁকে
কোথায় সাগর! এক সাগরের ছবি এলোবেলো।
সাক্ষাৎ সঙ্গম নাকি মারাত্মক রকম সেকেলে।

কিছুই টানে না আর, টেনে নিয়ে যায় না সাগরে।

পদপাত

উমা দেবী

তোমরা আসতে পারো। এ ঘর এখন
অন্ধকার। ছায়াচ্ছন্ন মন।
জানালা সুদৃঢ়ভাবে বন্ধ করা আছে,
শুধু তা রেখেছি খুলে হৃদয়ের কাছে।
তোমরা এখন
এসো এসো। রাত্রি অন্ধকার আর ছায়াচ্ছন্ন মন।

নিভে আসা নেত্রজ্যোতি জ্বালাও জ্বালাও তবে মর্মের প্রদাহে।
ছায়ামূর্তি কায়া হোক তীব্র রূপোৎসাহে।
প্রাণের বাতাসে আহা অধরপল্লব
মর্মরিত হোক। আর জীবন-উৎসব
স্পর্শে স্পর্শে সঞ্চারিত হোক তনুত্বকে
হাস্যের মতন লহু ধমনীতে বয়ে যাক ঝলকে ঝলকে।
তারপর পাঁচটি প্রদীপে জ্বালা পাঁচটি শিখার পথে
একখানি পথিক আলোক
নির্বাপিত করুক এ শোক।
এই বিরহের শোক—এক বৃন্তে ধৃত পাঁচ পর্ণের মতন
এক একটি খসে গেলে বেদনা যেমন।

অন্ধকার ঘর। তাই এ মুহূর্তে চোখেরও আলোক
নিভিয়ে দিয়েছি—কর কর বীতশোক।
নিশীথে জোয়ার এলে ধীরে ধীরে ভরে ওঠা নদীর মতন
অতীন্দ্রিয় চেতনার কর উদ্দীপন।
তোমরা ছায়ার দেশে—আমার এ অস্তিত্বও শুধু তাই
অন্য এক ছায়া
তোমরা তো ঝরে গেছ, পর্ণহীন দেহ শুধু তাই বৃন্তকায়া।
তোমরা বিস্মৃত নও, তাই প্রাণ স্মৃতির মতন
অন্ধকার রাত্রে খোঁজে ব্রত-উদ্‌যাপন।
অন্ধকার...ফেটে-যাওয়া পৃথিবী আর স্বাপ্নিক প্রপাত
হৃৎপিণ্ডের গুপ্তপথে শুনি যেন...শুনি যেন কার পদপাত,
এ মুহূর্তে দেখা যাবে যেন কোনো সম্ভাব্য হঠাৎ।

শাশ্বত পিপাসা

শংকর চট্টোপাধ্যায়

কুসুম নিভিয়া গেলে আমি কার হাত ধরি বল
একেলা বিপুল শূন্যে কাটায়েছি গৌরবাবিহীন
লুণ্ঠিত বৃক্ষের ম্লান পাদদেশে, স্পর্শ অভিলাষী
জন্মের মুহূর্ত হতে ক্রমান্বয়ে বহু বৎসরের
পাপ, পুণ্য, জরা, প্রেমে শুকায়েছে দীপ্ত অস্থিরাশি
শববাহকের হাতে। কোন বৃক্ষ অগ্নিতে সাজায়?
আপন গর্বিত অঙ্গ পিপাসিত মোহান্ধ না হলে।
মৃত্যু ও স্মৃতির মত ঝরে গিয়ে কৌতুকে আবার
বিকল পবন হতে কেড়ে লয় জলবাষ্পকণা।
কী ভীষণ খেলা চায় পদচ্যুত বসন্তের দিনে?
পুরানো উদ্যানগুলি ভেঙে দিয়ে অতি প্রাকৃতিক
মুখচ্ছবি তুলে ধরে, বড় ক্ষিপ্ত সঙ্গীতে প্লাবনে
বক্ষের সমস্ত খুলে দিতে চায়, শিশিরে জ্যোৎস্নায়
মানুষ মানুষী শুধু খোঁজে ব্যর্থ ফুল্ল পুষ্পটিরে।

উত্তর

গোবিন্দ চক্রবর্তী

শিখাটা ছিল ঊর্ধ্বমুখী।
বৃহস্পতির স্থির আগুন জ্বলছিল যেন
নিশুতি রাতের আকাশে।
আর নীচে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার,
নীচে অন্ধকার কাঁপছিল থর থর করে
অতল জলের ছায়ার মত।

সেই প্রশ্নের একটা মীমাংসা হয় না?
ঊর্ধ্বমুখী শিখা,
নিম্নচারিণী ছায়া,
একটি প্রদীপ
আর তুমি, তোমার আত্মা, তোমার মন—
উত্তর মেলে?

জলের শীতলে

জগন্নাথ চক্রবর্তী

জলের শীতলে দগ্ধ
জলের শীতলে।

আকাশ দিয়েছে রোদ
আরো কিছু রোদ আছে বুকে,
কিছু রোদ দিতে চাই,
যেতে চাই কিছু রোদ নিয়ে:
দগ্ধ হবো এই আশা দগ্ধ হবো
দগ্ধ হতে গিয়ে,
সব সূর্য পুড়ে গেলে
দগ্ধ হবো জলের শীতলে।

সরীসৃপ-রোদ দেখ,
দ্বীপ থেকে দ্বীপ থেকে দ্বীপ থেকে।
গভীর মগ্নতা দিয়ে ঢাকা
গভীর নগ্নতা দিয়ে ঢাকা
চলিষ্ণু বীজের মধ্যে প্রভাবিষ্ণু প্রাণ
চিরকাল রাখা।

এই তটে ছুঁয়েছিল মাটি
অসংখ্য ঝুরির ত্বকে
বৃদ্ধ বট,
শিরে তার কুয়াশা-উত্থিত
নীল পট।

এই জল প্রলয় পয়োধি
মীনের শরীরময় স্মৃতি
তৃষ্ণার আকাশ খুঁজে ফেরে
এই নীল জল নিরবধি।

এই তট, এই বট
ভেসে রয় অন্ধকার জলে
অনারব্ধ কাল শুধু
দগ্ধ হয়
জলের শীতলে।

ভ্রমণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একা, অহঙ্কার অত্যন্ত গম্ভীর
নাকের ক লক্ষ শিরা কাঁপে যেন ঠোঁট ওল্টায় চিবুক পর্যন্ত
শরীর বিমর্ষ নয়—হাঁসের পালকসম ভারী অনুরাগী
গোধূলির, জলপ্রপাতের, কুচো আমিষের, হলুদ স্বর্গের
চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি যেমন দাঁড়ানো যায় একা
যেমন দাঁড়ানো যায় জলে
পর্বত শিখরে
যেমন হঠাৎ মুখ পাখিদের সঙ্গে উড়ে যায়
মুখহীন চেয়ে থাকা যেমন শৈশব থেকে ভাসে
সিন্ধুকের ঝনাৎকার, সীমানা ছাড়িয়ে যায় লক্ষ
বিকেলের ওড়াউড়ি
যেমন দাঁড়ানো যায় একা হিম স্ত্রীলোকের বুকের ভিতরে।

কে যেন স্বর্গের থেকে চ্যুত হয় অহরহ, চ্যুত হয় স্বর্গের পরিধি
সটান ভূপৃষ্ঠে নয়, আরো নিচে, পাতাল বা খৃষ্টান নরকে
নরকে প্রবাসী আছি বহুকাল, চিঠি লিখো,
কেয়ার অফ অনুতাপ শাখা
সোনালি সাপের চোখ ডাক পিওনের মতো উৎকণ্ঠা ওড়ায়
সায়াহ্নের ম্লান যন্ত্র...ভেঙে যায় চিৎকারের গলা
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে প্রহরী ও সবুজ নিশান
একা বৃষ্টিপাত
আবার হঠাৎ যেন ফিরে আসে বহু চোখ,
অন্ধকারে ফুলের উত্থান—
পতনের পদশব্দ হয়
সুনীল সুনীল বলে ডাক দেয় পার্কের রেলিংএ
মৃত্যু ও মায়ের কণ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে যায়
আবার হঠাৎ ঘুম ঘুমের ভিতর থেকে ডুবন্ত প্রদীপের
রঙ কিংবা নিবেদন নিয়ে আসে, প্রেতকণ্ঠে সুনীল সুনীল
হিজল বনের পাশে খোলা প্রান্তরের দিকে ভাসে।

জাগরণ কোনোদিনও ক্ষমাশীল নয়, যেন জাগরণ বহু জাগরণ
যেমন নারীর ঘুম শরীরের কলরবে খেলা
যেমন রাত্রির মধ্যে ভিজে পায়ে বাড়ি ফেরা,
অন্ধকারে চোখ ভিজে যায়
ভালোবাসা খুঁজে নেয় ঘাতকের চক্ষু, বুক পেতে দেয়
ছুরির সম্মুখে
কোনো কণ্ঠস্বর কোনো উত্তর জানে না
স্বর্গ নরকের চেয়ে কতখানি দূরে থাকে কবিতার খাতা।

নিলাম

দুর্গাদাস সরকার

সূর্যের রঙ বদলায় না ত'। উলট-পালট আমরা।
দুই পা এগোলে পিছনের পথে হাঁটি।
ধুতিটাকে রাঙা জলেতে চুবিয়ে, নাকে ঘসে শাদা মাটি
বিনা টিকিটের যাত্রীরা করে বদল ট্রেনের কামরা।

হিসেব খতিয়ে মেলে না, আমরা কোন্ সে জগতে ছিলাম!
চেনা মুখ দেখে হঠাৎ আঁতকে উঠি।
ধরা দিতে এসে কারা নিয়ে গেছে বাকী জীবনটা ছুটি;

হর্সচেস্টনাট

কেতকী কুশারী

জঞ্জালে যখন মন সমর্পিত, মনুষ্য আমার,
ঘুমায় বিষণ্ণ চিন্তা দীর্ঘায়িত পঙ্গীর শিয়রে,
অর্ধ-প্রহরায় রত পিপীলিকা শব্দের বিবরে,
পরিপূর্ণ চেস্টনাটে অকস্মাৎ আগত জোয়ার।

কালের নন্দিতা নারী! একি নৃত্যে উত্থিত শরীরে,
উত্তরোল মুক্তছন্দ অগণিত স্ফুটিত মুদ্রায়,
যে মুহূর্তে স্মৃতি থেকে হারিয়েছে ঋতু-অভিপ্রায়,
তুমি উচ্ছ্বসিত হলে, হাওয়া দিলে নিথর প্রাচীরে।

যদিও নিয়েছো আজ ভিন্ন রূপ, তবু চেনা যায়,
অচ্ছোদসরসীনীরে নেমেছিলে শত জন্ম আগে,
হে বরবর্ণিনী, আজও ভঙ্গিমায় চোখে ঘোর লাগে,
ধূলিকণালগ্ন প্রাণী স্নান করে গভীর তৃষ্ণায়।

জানি না দেখেছে কি না আর কেউ, আমি অগ্রভাগে
ছিন্নপত্রে লিখে রাখি আনন্দিত দৃষ্টির স্বাক্ষর,
আমার অনেক পরে যারা শুনবে এমন মর্মর
আমার ইচ্ছার ছায়া ছোঁওয়া দেবে তাদের সংরাগে।

শব্দের অপর পারে যে লীলার আশ্চর্য নির্ঝর
অনিরুদ্ধ ঝরে, তার-ই দিব্য মূর্তি ইন্দ্রিয়গোচর।

ভালোবাসার অসুবিধা

তারাপদ রায়

একবার চোখ বুজলে,
এক হাজার রমণীর মুখচ্ছবি চোখের ভিতরে,
পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রুপ-ফটো:
যেন কোনো মহিলামঙ্গল সমিতির
খোলা মাঠে বাৎসরিক সম্মেলনে তালমাতাল হাওয়া,
এক সঙ্গে হাজার শাড়ির ব্যাকুলতা।

কাউকে আলাদা করি, দেয়ালে ফটোর থেকে তুলে
সযত্নে হৃদয়ে এনে কাউকে টাঙাবো,
এমন প্রতিভা নেই;
কারো সঙ্গে দুই দণ্ড আলাপনে নিবিড় নিরালা
এমন মধুর ভাষ্য কণ্ঠগত নয়।

ভালোবাসা গেটে বসে কুকুরের মতন চেঁচায়,
'প্রবেশ নিষেধ' লেখা বিজ্ঞাপন বুকের দরজায়।
সাবধান,
হে নীল শাড়ির নিবিড়তা
হাজার মুখের মধ্যে একটি মুখ, হে ট্রেসপাসার,

দোল পূর্ণিমা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

ষোলশত গোপী নিয়ে দোলপূর্ণিমায়
খেল রঙ্। এরকম বসন্ত যাপন
হৃদয়ের প্রয়োজন; অপচয়, ক্ষয়
অন্ধকারে কী ভীষণ প্রয়োজন হয়।

আনো রঙ সুবিশাল ভান্ড ভ'রে, যত
নারী, গোপী, চতুর্দিকে বালক, পুরুষ
সকলের গায়ে দাও; বৃক্ষগুলি, মেঘ
সমস্ত রঙিন হোক। এক একবার এই
পৃথিবীর সর্বদেহ তরল উজ্জ্বল
রঙের প্রবাহে সিক্ত হওয়া প্রয়োজন।

সীমাহীন উল্লাসের উন্মূল বাতাসে
বাজুক বাজুক শিরা, স্নায়ু, রক্তরাশি;
মর্মের গভীরে কোন অতিকায় শাঁখ
সমুদ্রের নিদ্রাভঙ্গ ঘটাক নিনাদে।

দূরের আকাশ

বটকৃষ্ণ দে

যখন যৌবন ছিলো কৃষ্ণচূড়া উষ্ণ করতো ডাল:
দুরন্ত আনন্দে, ইচ্ছে, আকাশ-কে বাক্সে ভ'রে রাখি,
কিংবা রাত্রে, তারার ময়ূর-পাখা অন্ধকারে আঁকি
তার নামে; উপহার দিই তাকে রৌদ্রের সকাল।

এই সব এলোমেলো ভাবনা। আর, নিজেকে ওড়ানো
রেস্টুরেন্টে, কফি-কাপে, বান্ধবীর সান্নিধ্যের তাপে,
ইন্টেলেকচুয়্যাল সেজে:—যৌবন, কতো কী জাদু জানো!—
অনন্ত নায়ক-বৃত্তি জীবনের নাটকী সংলাপে।

কৃষ্ণচূড়া পীত হয়: পলাশের সমাপ্ত-সকাল।
...শুধু মাঝে মাঝে, দূরাগত কোনো অর্কেস্ট্রার স্মৃতি
উত্তর বসন্তে আনে উন্মনার হাওয়ার সম্প্রীতি!
—জানলা খুলি : আকাশ যে এতো ছোট, মনে হয়নি কাল!

আক্ষেপানুরাগ

সুনীল বসু

আলোটা নেভাও লক্ষ্মীটি
বাবা আসবেন এক্ষুনি,
তারারা জ্বলছে মিটিমিটি
এইদিকে বোসো কোণাকুণি!

সিঁড়িতে রেখেছো জুতোটা কি?
যদি দেখে ফেলে ছোটখুকু:
বাবা বলে করে ডাকাডাকি
বুদ্ধি কি নেই এতটুকু?

তিনমাস রয়েছো বেকার
কোন দাম নেই রাশি-রাশি—
ওই যা-তা কবিতা লেখার
চাকরি জোটাও পাশাপাশি।

কতদিন একখানি শাড়ি
দাও নি বল তো, মনে আছে?
কেউ থাকে নাকি বাপের বাড়ি
এতদিন এসে মা-র কাছে?

না না থাক, আদর-টাদর
আজ কিছু খেয়েছ বিকেলে?
ছি ছি ঐ সব, অভদ্দর!
চাকুরির খোঁজ কিছু পেলে?

বলে বলে তোমাকে পারি না
টাকা ছাড়া চলে না জগত:
সকলেই করে কি যে ঘৃণা—
বলে তোমাকে জড়ভরত!

যাই তবে, বাবা ডাকছেন
না...না ঠোঁট, ফেটেছে ভীষণ;
লোকটির নাম পি, বি, সেন
কর না গো অ্যাপ্লিকেশন!

শোন, এসো পরশু আবার
বাবা-মা যাবেন বারাসত!
লক্ষ্মী, কোর না মুখ ভার
কথা শোনো, হয়ো না দ্বিমত।

কাজ-টাজ জুটলে তখন
তুমি যা বলবে, সব কথা—
শুনব, রাখব না গোপন
ইচ্ছার অবরুদ্ধতা!

এই নাও ধরো, দশটাকা
বেশী নেই এখন আঁচলে!
জীবনটা লাগে কি যে ফাঁকা—
বুঝবে না তুমি, কি যে জ্বলে!!

জুপিটার

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী

জানি ওই বজ্রমুষ্টি মৃত্যু হানে,—তবু তুমি সম্পূর্ণ দেবতা,
এবং আমার যতো অসম্ভব, তোমাকেই নিঃশেষে দেবো তা।
জানি তুমি স্বর্গ হতে মর্ত্যে, আর পাতালেও করো আনাগোনা
এবং তোমার মধ্যে লেলিহান শতমুখী সৌন্দর্য-বাসনা,
কুৎসিত-কে সিংহাসনে অর্ধভাগ দিয়ে তুমি সমাসীন তবু

কুৎসিতকে তুমি বুঝি দিয়েছো তোমার বজ্র,—অর্ধ-শক্তিভাগ,
তোমার অর্ধেক সত্তা ছেয়ে আছে অবিচ্ছিন্ন বিপুল বিরাগ।
তোমার ইচ্ছার কাছে নতমুখী যারা আসে,—মৃত্যু সাধে তারা,
কেননা, তোমার রাজ্যে মহীয়সী কুৎসিতের নির্মম পাহারা।
তবু কী ঐশ্বর্যে তুমি আদিগন্ত সৌন্দর্যের উর্ধ্বতম প্রভু?

সৈকতে

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

করুণ বিশ্বাস, মূঢ় ভালবাসা, তোমরাও এখনো
তাকাও আমার মুখে, বুকে রাখো হাত;
রোদের আশিসে মুখ দ্যাখো তোমরা, দাও ছায়াঘন
আশ্বাস; শম্বুকন্তু বিশ্বে, কে হানো চরম অভিঘাত!
আমি শুভ্র চেতনায় যতোবার হাওয়ার গভীরে
ডুবে যাই, আকাশের উজ্জ্বল মুখোশ
আমাকে প্রলুব্ধ করে; মনে হয়, কোথাও নির্দোষ
হাওয়া নেই; গাঢ় ক্ষত দিন আর রাত্রির শরীরে।
কৃপণ চোখের আলো, কপট আঁধারে ভালবাসা,
বড় ভয়: অকরুণ জলধিতে আকণ্ঠ পিপাসা॥

একটি বিবর্ণ চিঠি

কৃষ্ণধন দে

একটি বিবর্ণ চিঠি,—তাই নিয়ে এত তোলপাড়া
অবুঝ মনের? এই সবুজ বনের পথহারা
কত প্রজাপতি ওড়ে, কত পাখী নামে ডানা মেলে
এই নদীটির বাঁকে, ঢেউগুলি ছোটে হেসে খেলে
ঝরাফুল টেনে নিয়ে, পূবের বাতাস এসে জোটে
লোভাতুর নায়কের মত, এরা ধরা দেয় নাকি মোটে
কোথাও মনের কোণে, তবু চোখে ম্লান হয়ে আসে
একটি বিবর্ণ চিঠি,—তারও রং মিলায় আকাশে।

ও চিঠির কথা ভোলো, গোধূলির আলো নিভে যাক,
আমাদের কানে শুধু ঝিল্লী তার নূপুর শোনাক,
আর দিগন্তের চাঁদ সবে-জাগা চোখে ঢুলুঢুলু
হৈমন্তিক ধানক্ষেতে ছুঁয়ে যাক্ মাঠের আঙুল।
ও চিঠি বিবর্ণ হবে আরও কত, তারও পরে শেষে
ওকেও হারাব, শুধু তোমাকেই যাব ভালবেসে।

'অবনী বাড়ি আছো'

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ, সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—
'অবনী বাড়ি আছো?'

আধেকলীন, হৃদয়ে দূরগামী
ব্যথার মাঝে ঘুমিয়ে পড়ি আমি
কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া
'অবনী বাড়ি আছো?'

ডুমুর

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

খুকি দুটো ডুমুর পেড়ে দে
যেন তোর ঝুমুর ভাঙে না
আমি হাত বাড়াতে ভয় পাই
কচি ফল ছুঁলে যে রাঙে না।

মগডালে পিঁপড়ে আছে ঢের
দুটো ফল পেড়েই নেমে আয়
কোল পেতে রয়েছি এই দ্যাখ্
পিপাসায় কাতর সন্ধ্যায়

খুকি দুটো ডুমুর পেড়ে দে
আমি হাত বাড়াতে ভয় পাই।

সকাল

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে
ঘাস সব ভিজে।
আর্দ্র-হাওয়া হাত বাড়িয়েছে
সদ্য ঠাণ্ডা—সাটিনে-কামিজে।

গাছগুলো—মনে হচ্ছে : ছবি
প্রকৃতির খেলা হিজিবিজি,
প্রজাপতি পাখা মেলছে—দূরে
অরণ্যে কি গান ভাঁজে ঝিঁঝি!

নদী একলাটি পাশে
উবু হয়ে বসেছিল ভূঁয়ের ফরাশে
আচমকা দৌড়ে গিয়ে হাসে—
বালি ঝিকমিক।
হঠাৎ শালিক
উড়ে গেল—
তাকাচ্ছিল নাচছিল যে খানিক।

একমুঠো প্রান্তিক আকাশ
ঠিকরোচ্ছে সোনা
ভারি আশ্চর্য না!
এমন সময় ঘরে ফিরে
যেতে পারবো না।

চিরন্তন

মানস রায়চৌধুরী

দুলিয়ে দাও দুলিয়ে দাও
পাহাড় মরু ঝর্ণা
তোমার হাতের বাতাস লেগে
থামুক ঘরকরনা।
বাজার থেকে ক্রেতা ফিরুক
শূন্য থলির অনুদ্দেশে
মুখ বাড়িয়ে ব্যাকুল প্রেমিক
অচুম্বিত যাক্ না ভেসে
কেবল উড়াও শেষ কথাটি
'আমি তোমার পর্ না'।

সাইকেলের ঘণ্টি থেকে
অনাদরের শব্দ,
তাড়িয়ে ফেরে ভেড়ার পাল,
এখন নবলব্ধ
দৃশ্য, চোখে বেলাশেষের
শূন্য সিঁথি এলোকেশের
কোথায় রাঙন, কেমন বরণ
ভাবতে গিয়ে পেরোয় আরেক অব্দ।

চিল্কায় দুপুর

শক্তিব্রত ঘোষ

'না, এখানে রান্নার সুবিধে কিছু নেই,'
হাসলেন মাদ্রাজী যুবক, কাজে এই
বালুগাঁয়ে কাটে যাঁর অবিচিত্র দিন
মাছের তদারকীতে, নিরামিষাহারী।

একদল বাঙালির পেটে মহামারী
ক্ষিদে, এই দ্বিপ্রহরে, উচ্চকণ্ঠ ক্ষীণ;
সারাপথ কেটে গেছে ইলিশের বাসে,
সুস্বাদ ঝোলের গন্ধ-স্বপ্নের বিলাসে।

অচিরে নিরর্থ চিল্কা : নোনা জলাশয়;
হয়তো অশ্লেষা ছিল যাত্রার সময়।

গোলাপ কস্তুরী

অনিরুদ্ধ কর

হাওয়ায় দুলে ওঠে ছায়ার রক্ষীরা
গন্ধভার দোলে বিজনে যতো
বিদায় নিয়ে যায় স্মৃতির রমণীরা
গহন বনভূমি শরণাগত।
স্বচ্ছ সবুজের অস্ত্রহীন দেশ
আমন্ত্রণ করে বিপদরাশি
মলয় নিয়ে যায় চতুর নির্দেশ
গন্ধভার দোলে সর্বনাশী।
গন্ধভার দোলে বিপুল সন্ত্রাসে
শত্রু তরবারি যাবে না ফিরে......

(এমন পরাভূত), গোলাপবালা হাসে
স্মরণে-জাগরণে হৃদয় তীরে।

ঝেলম

শান্তিকুমার ঘোষ

তুষারের নীচে খর স্রোত অন্তঃশীলা :
উপত্যকা পৌঁছে হয় প্রগলভ নদী—
যার 'পরে সপ্ত সেতু, চেনারের গাঢ় ছায়া,
শিকারায় রঙ্গ এত যুবতী-যুবকে।

নৈঃশব্দের স্তর থেকে আবেগ স্পন্দন টেনে
বহাও সম্মোহ গান তরঙ্গিত প্রেম॥

দুর্বোধ

আনন্দ বাগচী

রহস্যে দুমড়ানো বাড়ি, অলৌকিক অন্ধকারে মোড়া,
কার যেন শাড়ি দুলছে অজ্ঞাত হাওয়ায়, হায় প্রেম,
মৃত্যুর বিকল্প প্রেম, তুমি আজ নদীর মতন
বুকে আনো জলস্রোত স্ফটিকনখের অধরেখা;
যৌবন বেদনা তুমি জন্মঅন্ধ বেদনা তুমিই
সব চিত্রনাট্যে, ঘরে, খামোকা এখন কী যে খোঁজো।

ফেরিঅলা বহুক্ষণ চলে গেছে বিকেলের ঘণ্টা দিতে দিতে॥

ফিরে আসি

সুনীলকুমার নন্দী

অনেক ঘুরে ফিরে
যেদিকে মুখ তুলি
গোপন এসেছিলো

বুঝেছি পথ নেই,
কেউ না কেউ আছে—
না-বলে ফিরে আসি।

যদিবা খুঁজে মেলে
একটু খুলে খুলে
পিছনে ছায়া পড়ে

বিজন ঝোপ, জট
যখুনি পা বাড়াই
তুমুল কলরোল...

কণ্ঠ ছিঁড়ে খায়...
কেননা জ্বল্‌জ্বল্‌
নিজেরই কানে বাজে

আবার ফিরে আসি
ইচ্ছে ধ্বনি নিলে
শুকনো খড়্‌খড়্‌...

শব্দ...ফোটে কই
গোপন এসেছিলো
পর্দা টেনে দেয়

বুকের রক্তিমা—
না-বলে ফিরে আসি;
গোপন, খান্‌খান্‌...

ঘরের মেঝেময়
রঙের ভাঙা বাটি।

বরণ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

হটাও বিকল্প মালা, ক্রোধ সব টুকরো করো ফুলে;
হে উপসনাহীন ফুটন্ত সম্মান; সরে যা, সরে যা, তুই যা।
দেখুক ভিক্ষুক চোখ তিনসহস্র ভালোবাসা কেন এ পাঁজরে
মৃত্যুকে সাহায্য করে প্রতিরাত্রে জেগে ওঠা শব্দের চিতায়।
শ্মশানের অগ্নি ছাড়া আজ আর অন্য কোনো আলো
সংঘবদ্ধ অন্ধকারে চেনাতে পারে না মুখ, ক্ষুধার্ত মুখর।
কে আছো যথেষ্ট নারী অসমাপ্ত উপমার বাহু
যেন আলিঙ্গনে রুদ্ধশ্বাস নীলিমাও ফেটে যাবে তারার বুদ্বুদে।
আমি আযৌবন শুধু পৃথিবীর জমি খুঁড়ে খুঁড়ে
দেখেছি বিশ্বাস ক্লান্ত, দীর্ঘ হয়ে দাঁড়াবার মাটির গভীরে
স্বাধীন বৃক্ষের যতো গোপন শিকড়ে চলে অনিন্দ্য আমোদ।
হায় ফুল নীরবতা, হায় ফুল সনির্বন্ধ বুকের উত্থান
কেন ভ্রষ্ট হাতে আজো বারবার কেঁপে ওঠো, কেন
তোমার বিরুদ্ধযুদ্ধে মনীষার শেষ আবরণ
দানবের মতো হিংস্র টুকরো টুকরো টুকরো করে তবু
সূর্যের উল্লাসে নগ্ন সদ্যজাত পবিত্রতা পারিনা সাজাতে।

হটাও বিকল্প মালা, যদি না ফুলের রঙে রক্তলাল
প্রতিশোধ থাকে।

বৃষ্টি এলে

অমলকান্তি ঘোষ

দিগন্ত ছুটে এসে জানালার সামনে দাঁড়ালে
আমি তাকে ইসারায় ডেকে আনি ঘরের আড়ালে
প্রশ্ন করি, অভিজাত আকাশের সঙ্গ ত্যাগ করে
তুমি কেন এলে এই ঘরে

সে তার সরল হাসি-নীরবতাময় নীল চোখে
তাকিয়েই জবাবের প্রয়োজন সহজে এড়াল...

তোমার লেখার নাম ডাকনাম হয়ে
ঘন হয়ে এলো।

অপূর্ণ? বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দুই বন্ধুতে পার্কে নিজেদের পরিচিত কোণটিতে এসে বসল· জয়া আর মানসী। বসল ঘাসের ওপরই। পাশেই একটি ঝাঁকড়া কাঞ্চনফুলের গাছ এই সময় নিজের ছায়া গুটিয়ে এনে ফেলে জায়গাটার ওপর, তা ভিন্ন জবার বেড়া দিয়ে বেশ একটু ঘেরাঘোরাও। অবশ্য পার্কে যতটা সম্ভব। যেটুকু সম্ভব নয় সেটুকু ওদের বিশ্রম্ভালাপে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। অত ঘোমটা-টানা নয়। তাহলে তো আফিসের পর সোজা বাড়ি চলেই যেত; তারও বেশি যা, তাহলে আফিস করতে আসতই বা কেন? তবে, এমন বেহায়া-বেপরোয়াও নয় যে, শুনিয়ে শুনিয়ে চালাবে আলাপ। কণ্ঠ থাকে ভদ্র, সংযত; একটা পর্দার মধ্যে। আলাপটা চলতে চলতে সেরকম জায়গায় এসে পড়লে, পর্দাও সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে। পার্কের আলাপের যে একটা আলাদা আর্ট আছে সেটা বেশ রপ্ত হয়ে গেছে ওদের।

অবশ্য ঠিক যে আলাপের জন্যেই ওদের এসে বসা এমনও নয়। অন্তত সে উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়নি।

সামনেই ঐ বিরাট এমুড়ো-ওমুড়ো টানা বাড়িটা ওদের আফিস। ওদের ডিপার্টমেণ্টও পাশাপাশি, কাজও একধরনের; দুজনেই নিজের নিজের আফিসের স্টেনো-টাইপিস্ট। এই বৃত্তি-সাম্যের জন্যেই পরিচয়টা সখ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য আর একটা জিনিস আছে মাঝখানে, সখ্যের স্বর্ণসূত্র হয়ে; বয়স।

প্রথম দিনের কথা। পরিচয়ের প্রথম দিন নয়; যেদিন পার্কের এই কোণটুকু আবিষ্কার হ'ল। মানসীর ঘরটা আগে, জয়ারটা তার পরে। বেরিয়ে দাঁড়িয়েই ছিল করিডোরে জয়া মানসী আসতে দুজনে এগিয়ে চলল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাড়িটা ছেড়ে ফুটপাথে পা দিয়েই জয়া সামনের দিকে চেয়ে "ঈস!" করে উঠল। মানসী প্রশ্ন করল—"হ'ল কি?"

স্রোতের বেগে আফিস থেকে নেমে আসছে সবাই, জয়া মানসীর ডান হাতটা ধরে খানিকটা পাশে নিয়ে গেল, সেখানটায় ফুট-পাথটা ঘুরে অন্য রাস্তায় পড়েছে, ভিড় নেই। দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—"ও ভিড় ঠেলে আমি উঠতে পারব না ট্রামে; দিব্যি গেলেছি কালকে; বাসের কথা তো ছেড়েই দাও।"

কারণটা জিজ্ঞাসা করল না মানসী, শুধু অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল—"সত্যি! কী যে হয়েছে অবস্থা!"

তারপর একটু বিরতি দিয়ে বলল—"বন-মানুষের স্টেজ থেকে সব মানুষ কি বেরিয়ে আসতে পেরেছে এখনও?"

"অন্তত সব পুরুষ মানুষ তো নয়, এ-কথা আমি জোর করে বলতে পারি।" —মন্তব্য করল জয়া।

এবার একটু বেশি বিরতি গেল। মানসী ছাতাটা ফুটপাথের ওপর দাঁড় করিয়ে আস্তে আস্তে ঘোরাচ্ছিল, তুলে নিয়ে বলল—"আমি দরকার পড়লে ছাতার এই সরু দিকটা ব্যবহার করে দেখেছি, বেশ ফল পাওয়া যায়।"

খুকখুক ক'রে একটু হেসে উঠল জয়া; অত গাম্ভীর্যের মধ্যে কথাটা প'ড়ে হঠাৎ সুড়সুড়ি দিয়ে উঠেছে। হাসি চাপতে গিয়ে একটু দুলেও উঠেছে; ভিড় না হোক, লোক তো চলছেই।

মানসী বলল—"সত্যি বলছি। দেখো না পরীক্ষা করে।" —ওর মনটা তখনও তিক্ত স্মৃতি-লগ্ন, রাগটা পড়েনি। এর পর অবশ্য ঘুরিয়ে নিল কথাটা, বর্তমান ধরেই বলল—"যেতে তো ওঠেই না পা, কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাই বা যায় কতক্ষণ? একটু যাওয়ার মতনটা হতে অন্তত আধ ঘণ্টা এখনও।"

এরপর ওরই প্রস্তাব মতো পার্কে এসে প্রবেশ করল দুজনে, একটা বেঞ্চ বেছে নিয়ে অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না একটু জবাগোছের দাঁড়ায় ভিড়টা। সুবিধা এই যে, পার্কে এসময় ভিড় নেই। অসুবিধা রোদ: চৈত্র অপরাহ্নের এই সবে পাঁচটা তো। ছাতা খুলেই বসল একটা বেঞ্চে। ভিড় না থাক, লোক চলাচল তো আছেই; কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হয়, যেন কোথাও ঠাঁই নেই, পার্কের রোদে ছাতা খুলে বসে আছে! জয়া একটু ফাঁক দেখে ঠোঁটের কোণে হেসে বলল,—"ভাববে ঝগড়া হয়েছে কর্তা-গিন্নিদের মধ্যে।" উঠে একটু ভেতরের দিকে আসতে পাওয়া গেল এই জায়গাটি।... কলকাতার মধ্যে যে এমন এক টুকরো জায়গা খালি পড়ে আছে এখনও, যেন বিশ্বাস করতে পারা যায় না। লন-মোয়ার দিয়ে পরিষ্কার করে ছাঁটা ঘাস চেপে চেপে ধরতে লাগল, দুই সখীতেই। 'শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ভাই'—বলে জয়া একটু হেলেই পড়েছিল জবার বেড়ার আড়াল দেখে, 'এই, বাড়াবাড়ি নয়!'—বলে দাবড়ি দিয়ে উঠল মানসী। ও যেমন একটু ছেলেমানুষ, এ তেমনি একটু ভারিক্কে।

এদিক ওদিক গল্প হল খানিকক্ষণ। একটু হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ঘাড় তুললেই দেখা যায় ট্রামের অবস্থা, জয়াই সামনা-সামনি বসে, বার চারেক উঠে উঠে দেখে ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়ল।

শেষের বার মানসী হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে একটু শিউরে উঠেই বলল—'ওমা, চল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে! তার মানে আধ-ঘণ্টার ওপর বসে আমরা এখানে!'

নিজেই একটু উঠে ঘুরে দেখল এবার। ওদের দিকেরই একটা ট্রাম পড়ল চোখে, বলল—এবার মনে হচ্ছে ততটা অচল নয়। ওঠা যাক, কি বলো?'

জয়াও একটু ঘাড় তুলে নিল দেখে। ঘাস, ছায়া, ফুরফুরে হাওয়া—সবটুকু যেন গায়ে মেখে নিয়ে একটু গুটিয়ে গিয়ে বলল—'আর একটু বোসই না, উঠতে ইচ্ছে করছে না। হোক না আর একটু হালকা। একটু ঠাণ্ডাও হয়ে আসবে ততক্ষণে। গিয়েও তো আবার এক ঘানি থেকে অন্য ঘানি।'

'সে-ঘানির কলু ওদিকে গরম হয়ে উঠবে না?'

কি যেন একটু ভেবে নিল জয়া, তবে মাত্র সেকেন্ড দু-তিন, তারপরেই শিউরে উঠে বলল—'ওমা, উঠবে না আবার! তিনি নিজে যে কী এক শক্ত ঘানি যদি জানতে!'

দুজনেই কথার কারচুপিতে একটু হেসে উঠল। মানসী প্রশ্ন করল—'তাই নাকি?'

'একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ। অবশ্য একতরফাই। কলুর নিজের দিক থেকে যতই এদিক ওদিক হোক, মুখটি বুজে সয়ে যাও, কিন্তু বলদের দিক থেকে এতটুকু ত্রুটি হোক দিকিন, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঠিক করে রাখতে হবে, ঘরদোর, চা-জলখাবার, যা কিছু সব। বাবু আসবেন কলেজ থেকে—যাদবপুর তো, ওই যেটুকু সময় পাওয়া যায় হাতে, তার মধ্যেই সব টিপটপ—একটু যদি কোথাও...'

'তাহলে?'—একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল, বাধা দিয়ে প্রশ্ন করল মানসী। বলল—'আজ তো প্রায় তিন কোয়ার্টার দেরি করে ফেললে, এখন যদি ওঠই।'

'ছুটি নিয়ে এলাম যে। আজ ঠিক করেই বেরিয়েছিলাম তো, হেঁটে আসব, তবু ট্রাম বাস নয়।'

'তারপর? সব টিপটপ পাওয়া?'

'সইতে হবে কলুকে, আর উপায় কি?'

'যদি রাজিই সইতে, তাহলে আর এমন শক্ত ঘানি কি?'—তার হয়ে ওকালতিই করল মানসী, বলল—'বেশ তো রিজনেবল্‌ই মনে হয় মানুষটিকে।'

'রিজনেবল্‌!'—ভ্রূ কপালে তুলল জয়া। একটু তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে ঠোঁটের কোণে চাইল।

'নয় কিসে? বেশ তো বিবেচনার কাজই করছে! এক ঘণ্টায় তোমার তো কুলুতও না এখান থেকে শ্যামবাজার হেঁটে যেতে।'

'তুমি দেখছি তাহলে সবটা না শুনে ছাড়বে না। কী সু-বিবেচকের মতন কাজই যে করতে যাচ্ছিলেন তোমার রিজনেবল্‌ মানুষটি।'

পরিচয়টা বেশ কিছু দিনের, ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে উঠেছে, কিন্তু আলাপ এ দিনের মতো এতটা মুক্ত কোন দিন হতে পারেনি, এত উঁচু পর্দায় পারেনি উঠে আসতে। অন্য অন্য দিনের যেটুকু আলাপ তা ঐ অফিসের করিডোরে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, নয়তো ট্রামের জন্য একটু তফাৎ হয়ে অপেক্ষা করবার সময়। এইটেই ওর মধ্যে একটু প্রশস্ত, গল্প যেমন একটু অন্তরঙ্গ হয়ে পড়ল তো, একটু বেশি তফাৎ হয়ে না হয় গোটাকতক ট্রাম ছেড়ে দেওয়া। ট্রামের মধ্যে সুবিধা নেই। একে তো প্রায়ই একসঙ্গে পাওয়া যায় না সীট, যদি গেলই পাওয়া তো পরিবেশ একেবারেই অনুকূল নয়। স্বভাবতই। অমন দারুণ ভিড়: তার ওপর মেয়ে-সীটের চারিদিকেই সবার কান খাড়া; মেয়েই হোক বা পুরুষই হোক। এত-কিছু রয়েছে মন বিভ্রান্ত করতে, তার মধ্যেও মন গিয়ে গিয়ে কানে জড়ো হচ্ছে—ও-দুটি মেয়ে কী কথায় এত মশগুল?

আজ এ সম্পূর্ণ এক অন্য জগৎ, হোক না তা এতটুকু। নীচে নরম, ঘন-সবুজ ঘাস, ঝিরঝিরে হাওয়ায় পিঠের ওপর কাঞ্চন-গাছের ছায়া বুলোচ্ছে, মাঝে মাঝে অতিমৃদু কি-একটা অপরিচিত ফুলের গন্ধ, নিজেদের রুমালের প্রচ্ছন্ন গন্ধও তার সঙ্গে মাঝে মাঝে যাচ্ছে মিশে। এ সব পরিবেশে মনের কপাট আপনিই যায় খুলে, বিশেষ করে প্রিয়জন যদি কাছে রইল। মনে হয় এও যেন অসম্পূর্ণ। আরও যে এক প্রিয়জন আছে—প্রিয়তম, তারে এনে বসাই এ-আসরে, তারে সাজিয়ে গুজিয়ে পূর্ণতরভাবে আরও মনের মতোটি করে নিয়ে।

জয়া আস্তে আস্তে এনে ফেলছে তারটিকে।......শুনতে চায় নাকি মানসী তাহলে সবটুকু?

মানসী একটু হেসেই কৌতুকের সুরে বলল—'শুনিইনা, না হয়।'

'বললাম তো সব? শুনে একেবারে আগুন! এত বড় বেয়াদবি! বলে, মুখ চিনে রেখেছ তার?'

খিলখিল করে হেসে উঠল মানসী, শোনার মনও মুক্তই, জুটে যায় হাসি কোথা থেকে। চোখ কপালে তুলে প্রশ্ন করল—'জিজ্ঞেস করল তাই! চল্লিশ লক্ষ লোক কলকাতায়!' না হয় অফিসের লোকই মনে করেছে, তা সেও তো হাজার কয়েক,—অফিসপাড়ার ট্রামই তো। কিন্তু সে কথা ভেবে দেখবার কি আর ধৈর্য আছে? গোঁয়ার-গোবিন্দ মানুষ......'

'তাই নাকি?'

'ওমা, ওদিকে তো ফুটবল, হকি, আর বক্সিং নিয়েই কাটিয়েছে! ঐ মানুষ যে কী করে পাস দিয়ে প্রফেসার হয়ে বেরুল আজ পর্যন্ত তো ভেবে পাই না ভাই।......বললাম—তা কি চিনে রাখা সম্ভব, না, তোমার ওই বক্সিং-করা ঘুষির জন্যে বসে আছে সে?'... তখন কি বাক্যথা হল জান!'

'হুলিয়া দেবে খবরের কাগজে!'—নিজের প্রশ্নে নিজেই হেসে উঠল মানসী,

জয়াও যোগ দিল। বেগ থেমে গেলে বলল—
—'সেও তো পদে ছিল। বলে এবার থেকে যাদবপুর থেকে সোজা এখানে চলে আসবে, ভিড়ের মধ্যে থাকবে আমার কাছাকাছি, বাঘের মত নজর ফেলে রাখবে আমার পাশে, তারপর একটু কারুর ওপর সন্দেহ হয়েছে কি বাঘের মতনই লাফিয়ে পড়ে......'

চাপা হাসিতে একেবারে লুটিয়ে পড়ল মানসী, সঙ্গে সঙ্গে জয়াও। মানসী বলে—
'ও বাবা বডিগার্ডের গার্ড করে বাড়ি আনবার এ কী ঘটা!—সমস্ত রাস্তা—যার ওপর একটু সন্দেহ—ভালো হোক, মন্দ হোক—তারই মুণ্ডুপাত করতে করতে!—সেই ভিড়ে—শ্যামবাজারে পাঁচমাথা পর্যন্ত!'......

আঁখর কেটে কেটে বলে আর লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে দুই বন্ধুতে। পথের দিকে চেয়ে জবার বেড়ার আড়ালে যায় সরে সরে—হাসির স্রোত চেপে আনে, কিন্তু একটা রোগই তো, ফুরিয়ে আসতে যেন চায় না আর; উথলে উথলে ওঠে।

অনেক কষ্টে সামলে রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ মুছে, একটু স্থির হয়ে বসল দুজনে। ছলকে উঠছেই খুকখুক করে হাসির জের। জয়া বলল—'এই অবস্থা ভাই, ভাবি—কেন মরতে বলতে গিয়েছিলাম এ-লোককে, নিজে জ্বলে মরছি, মরি। কী করে যে ঠাণ্ডা করব ভেবে পাই না, গেরোর কথা কেন বল? শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ঠিক করলাম—ট্রামে যদি আসিই তো একেবারে ভিড় কমে একটু আসবার মতন হলে। নৈলে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা; ট্যাক্সি, রিকশা যেমন হয়। তবে সে তো রোজ হতে পারে না, যেদিন নেহাতই ভিড় আর কমতে চাইছে না সেইদিনই। তাই থেকে ঠিক হয়েছে, মোটা-মুটি আর এক ঘণ্টা পর্যন্ত সময়। তাতে করে এই হবে যে, প্রায় একই সময়ে দুজনে দুদিক থেকে গিয়ে পড়ব বাসায়। চান্স বেশি আমারই একটু আগে গিয়ে পড়ার। পারি, ভালই, তাড়াতাড়ি নোব ঠিকঠাক করে, নয়তো গুণধরকে একটু অপেক্ষা করতেই হবে।'

'হল রাজি?'

'উপায় কি? নয়তো এতদূর তো গার্ড করে আনতেও পারছ না নিজের ধন। ওঠবার মুখেই যত বাঁদরামি লোকের, ওঠবার মুখেই তার ওষুধ দিতে গিয়ে সোজা লালবাজার পুলিস স্টেশনে ঢোক। কে মানা করছে?'

একটু বিরতি আবার। চিত্রটি চোখের সামনে পরিস্ফুট থেকে দুজনের মুখেই একটু হাসি ফুটিয়ে রেখেছে। মানসী হঠাৎ নিজের হাতঘড়িটা দেখে বলে উঠল—'না ভাই, অনেক দেরি হয়ে গেল তোমার নাইটের কথা শুনতে শুনতে, এবার উঠবে তো?'

আরও বেলা পড়ে এসে আরও যেন
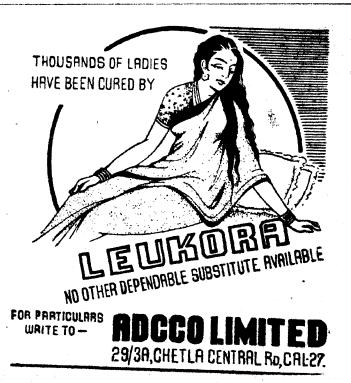
খাদ্য বুলিয়ে দিয়েছে জায়গাটার ওপর—হাওয়াটা আরও স্নিগ্ধ, বেলা পড়ে এসে সেই গন্ধটা আরও স্পষ্ট, ঘাসের কার্পেটও কি আরও নরম হয়ে গেল? জয়া বলল—'বসবে না, আর একটু?......ওই তো বেরিয়ে গেল একটা ট্রাম, এসেছে কমে, তবে......'

হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বলে উঠল—'বাঃ, দ্যাখো চালাকি! আমার তাঁর গুণপণা শুনে নিজে দিব্যি ফাঁকি দিয়ে, এবার 'ওঠ'!...... না ভাই, কই শুনিনি তো একদিনও, বলতে হবে— এই তো যাচ্ছ এক ঘণ্টা দেরি করে, তারপর? বলো, ফাঁকি দিলে চলবে না, হলই না হয় একটু বেশি দেরি; প্রথম দিনই তো?'

"ও বাবা! তাঁকে এই আসরে!"—একটু স্বপ্নালুভাবেই শুনতে শুনতে হঠাৎ বলে উঠল মানসী। তারপর হেসেই উঠল, বলল—"বক্সিং-করা ঘুষির একটি গাট্টাতেই সে 'হাড্ডি পিলুপিলায় গিয়া' হয়ে যাবে বেচারির!"

"সত্যি নাকি? এমন!"

"যেমন নাম, তেমনি মানুষ, আর তেমনই ভালোমানুষ গো-বেচারি।"

"নাম?"—দুষ্টুমির হাসি হেসে চাইল জয়া। আজকাল মেয়েরা করছেও তো নাম, অন্তত নিজেদের মধ্যে।

তবে করল না মানসী। "ঐ যে তোমাদের যশোদার ছেলের ফেভারিট খাবার...আমার আবার তাঁরও নাম করতে নেই যে, ভাসুর-ঠাকুরের নাম।"

"ননী?"—প্রশ্ন করল জয়া।

মানসী মাথা নেড়ে জানাল—না।

"মাখন?"

মাথা দোলাল মানসী। বলল—"তাই তো বলছি, যা তাতিয়ে তুলেছ আসর, সে বেচারি তো পা দিলেই গলে যাবে। থাক যেমন আছে, যেথায় আছে,"—হাসল একটু।

"অমনি পা দিলে গলে যাবে!"—রাগের ভাব করল জয়া। বলল—"না, ওসব চলবে না, বাজে কথা এনে আসল কথা চাপা দেওয়া! খুব বুঝি নরম স্বভাব?"

"আমি তো তাই ভাবছিলাম, চালিয়ে নাও কি ক'রে অমন মানুষকে!" মানসী বলল। জুড়ে দিল—"আমি হলে তো বাপের বাড়ি গিয়ে বসে থাকতাম।"

"হ্যাঁঃ, সবাই গিয়ে বসে আছে অমনি!"—একটু যেন লজ্জিতভাবেই হাসল এবার জয়া, বলল—"কেন, রবীন্দ্রনাথের মণিহারা গল্পের সেই কথাটা ভুলে গেছ?—হরিণ নিজের শিঙে শান দেওয়ার জন্যে শক্ত গাছের গুঁড়ি চায়, কলাগাছ খোঁজে না। নাও, নাও বলো, আমার হিংসে হবে না মোটেই।"

মুখে অল্প হাসি নিয়ে একটু বসেই রইল মানসী সামনের দিকে চেয়ে, যেন এ-বর্ণনার সামনে কতটা বলা, কতটা চেপে যাওয়া সমীচীন হবে একটু ভেবে নিচ্ছে।

তারপর, একবার জয়ার দিকে চেয়ে, "তাহলে যখন ছাড়বেই না"—ব'লে আরম্ভ করে দিল—

মানসীর 'তিনি' একেবারে উল্টো, শিঙে শান দেওয়ার প্রশ্নই আসে না ওর, ভোঁতা শিঙেই কাজ চলে যায়।...কথাটা বলে আড়ে চেয়ে একটু হাসে মানসী।...বলতে লজ্জাও করে। এই তো যাবে? গিয়ে দেখবে সব নিজেই গুছিয়ে গাছিয়ে হা-পিত্যেস করে বসে আছে। না, ওই যে রোজ করে তা নয়। তবে হ্যাঁ, কাজের সময় ওটা এনে দেওয়া, সেটা ধুয়ে আনা—লজ্জা করে বলতে মানসীর—সে রোগ তো আছেই, শোনে নাকি মানা করলে? তারপর একটু যেই দেরী হয়ে গেছে, আর কিছুতে হাত দেওয়া চলবে মানসীর? ভ্যানিটি ব্যাগ রেখে, কাপড় চোপড় পাল্টে সোজা বাথরুমে। সেখান থেকে বেরিয়ে একেবারে চায়ের টেবিলে। সব রেডি, শুধু টি-পট থেকে চাটুকু ঢেলে নেওয়া দুজনের পেয়ালায়।...এ হল যেদিন অল্প দেরি। আজ এতখানি হয়ে গেল তো? আধ ঘণ্টা পর্যন্ত কোনরকমে রাখবে সামলে নিজেকে—গোছগাছ করতে যেটুকু সময় লেগে যায়; তারপরেই বিছানা নেবে। ওমা, তা বুঝি জানে না জয়া?—ধরে ব'সে আছে যে অ্যাকসিডেণ্ট! আধ ঘণ্টা পরেই অ্যাকসি-ডেণ্ট; মাসে ক'বার যে অ্যাকসিডেণ্টে মরছে মানসী হিসেব আছে তার?...জবাবদিহি? কেন এত দেরি হল? রামঃ! সে তো বরং ভালোই লাগে একটু। পুরুষ মানুষ, সে তো চাইবেই—মাত্রা না ছাড়ালে মানায়ই বরং। কিন্তু এ যে মেয়েরও বাড়া। মানসী দেখবে গিয়ে হাত পা এলিয়ে পড়ে আছে।... বিশ্বাস করতে চায় না। দেখবে পরখ করে আগে। ডাক্তার মানুষ তো, স্টেথোস্কোপ পর্যন্ত বের করতে যায়। ধমক দিতে হয় বৈকি মানসীকে—বলে—'তোমার মতন আমায় তুলোয় রেখে মানুষ করেন নি তাঁরা যে নড়তে চড়তে অ্যাকসিডেণ্ট করে বসব!... কেঁদে ফেলে...'

"কান্না!"—হাসির সঙ্গে বিস্ময়ও এসে পড়ে জয়ার।

"কান্না মানে কি হাউ হাউ করে কাঁদবে বেটাছেলে?"—এবার একটু লজ্জার ভাবই এস পড়ে মানসীর হাসিতে, যেন যতটা উচিত তার চেয়ে বেশি বলে ফেলেছে বলার ঝোঁকে। শুধরে নেয়, বলে—"চোখ ছলছল করে আসে। ভয়ানক পানসে যে! শুধু মাখনই নয় তো—জোলো মাখন..."

জিভ কাটে; নামটাও যে সেই বেরিয়ে গেলই মুখ দিয়ে! হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে বলে—"নাও, এবার ওঠ।"

গল্প শেষ হয়। প্রথম দিনের কথা।

গল্পটা আপনাদের কিরকম লাগল?

আসলে কিন্তু মাখনের নামটুকুই মাখন, বাকি সব...সে বরং জয়ার 'তাঁর' সঙ্গেই মেলে বেশি; যেমন বলে গেল জয়া। শান দেওয়া নয় তো, রুক্ষ গাছে শিং ঘষতে ঘষতে ক্ষয়েই এসেছে মানসীর শিং, কত করে যে সামলে-সুমলে ঠাণ্ডা করে রাখতে হয় মানুষটাকে!

সেদিক দিয়ে বলতে গেলে বরং জয়ার 'তিনি' ঢের ভালো—ঢের! মানসীর বর্ণনা প্রায় খাপে খাপে মিলে যায়।...এক ঘণ্টার ছুটি নিয়ে আসতে হবে?—জয়াকে? ছোঃ! গিয়ে দেখবে সমস্ত নিজের হাতে টিপটপ করে রেখে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছে, হয়তো দেখবে চোখ দুটিও ছলছল।

ট্রামে যেতে যেতে জয়া সেই কথাই ভাবে। একেবারে একদম কলাগাছের মতো নরম না হয়ে একটু শক্ত হলেই ভালো হতো না? বেটাছেলে যে!

মানসী ভাবে—বেটাছেলে, হোক না সে কড়া, সেও তো যাচ্ছেই চালিয়ে কড়া হাতে রাশ কষে ধরে। তবু...একেবারে এতটা কড়া না হয়ে যদি—কাজেও নিতান্তই ননী মাখন না হোক...আছে ওরা বেশ ভালোই। যেটুকু-বা অভাব বোধ করে, সেটা রোজ পার্কে কাঞ্চনছায়ায় বসে এই করে নেয় মিটিয়ে।

আজও নেবে; তারই সূত্রপাত হলো এই।

জোড়-কলম | সতীনাথ ভাদুড়ী

চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে এই সুভেনির পুস্তিকা ডিরেক্টরগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইল।

ইহাকে কেহ যেন ওই কোম্পানীর ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন বলিয়া না ভাবেন। কারণ পুণ্যস্মৃতি স্থাপয়িতাদের স্থায়ী নির্দেশ অনুসারে, লিখিত বিজ্ঞাপন দিয়া প্রচার করা আমাদের নিয়মবিরুদ্ধ। লোকের মুখে মুখেই আমাদের সংগ্রহের বিপত্তারিণী লেখনী-গুলির অলৌকিক কীর্তিকাহিনী স্বতঃ-প্রচারিত। যাঁহাদের দরকার, তাঁহারা ঠিক খোঁজ রাখেন। গত বৎসরের আই এ এস পরীক্ষার এক সফল পরীক্ষার্থী দ্বারা ব্যবহৃত যে কলমটি আমরা সম্প্রতি আমাদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিয়াছি, ইহারই মধ্যে ছাত্রমহলে সেটির চাহিদার অন্ত নাই। এই সহযোগিতার জন্য জনসাধারণ আমাদের ধন্যবাদভাজন। তাঁহাদের আনুকূল্যে আমরা গর্বিত; কিন্তু আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, আমাদের সাহায্যপ্রার্থীরা এই প্রতিষ্ঠানের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই খবর রাখেন না। ত্রুটি অবশ্য আমাদেরই। এই রজতজয়ন্তী পুস্তিকা আমাদের সেই ত্রুটি সংশোধনের প্রয়াস মাত্র।

কোম্পানীর আদি প্রতিষ্ঠাতা দুইজন আজ স্বর্গত। চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর বৃদ্ধ বয়সে, অদম্য উৎসাহে নূতন ব্যবসায়ের বন্ধুর ক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাহস তাঁহাদের ছিল। ব্যবসায় নির্বাচনের প্রতিভাও ছিল অনন্যসাধারণ। হাতে-কলমে তাঁহারা দেখাইয়া গিয়াছেন, যে কারবারে পুঁজি কম লাগে, বিপন্নকে সেবার ভাব বজায় থাকে, লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয় না, সেইরূপ কারবারই মধ্যবিত্ত বাঙালীর পক্ষে উপযোগী। পথিকৃৎ হিসাবে হারানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণপদ চট্টোপাধ্যায় এই দুই কর্মবীরের নাম বাঙালীর ব্যবসায়িক ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকা উচিত।

ওই দুই প্রতিভাশালী ব্যক্তির ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ কি করিয়া একসঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল তাহা এক অতি বিচিত্র কাহিনী। জড়াইবার কথা নয়। দুইজনের নিবাস দুই জায়গায়। সরকারী চাকরি করিতেন বটে দুইজনই; কিন্তু বিভিন্ন বিভাগে। শুধু এক শুভক্ষণে চাকরিতে বদলির ফলে তাঁহারা এই মহকুমা শহরে আসেন। এই সময়ই তাঁহাদের প্রথম পরিচয়। তাঁহাদের জীবন যে একই সূত্রে গাঁথা একথা তাঁহারা তখন কল্পনাও করিতে পারেন নাই। হারানচন্দ্র ছিলেন এক্সাইজ্-সাবইন্সপেক্টর, আর কৃষ্ণপদ ছিলেন ক্রিমিন্যাল কোর্টের নাজির। দুই-জনেরই বয়স পঞ্চাশোর্ধে। চাকরিতে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। ছাপোষা মানুষ। উপরি রোজগার ছিল বলিয়াই কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া যাইত।

উ চ্চ প দ স্থ রাজকর্মচারীরা তখন অধিকাংশই ইংরাজ। এই মহকুমা শহরটির জল-হাওয়া ভাল। গ্রীষ্মকালে অন্য জায়গার তুলনায় গরম কম। নদীর ধারের ডাক-বাংলাটিও সুন্দর। সেজন্য সাহেব অফিসাররা গরমের সময় সরকারী কাজের অজুহাতে যখন-তখন এখানে আসিতেন।

হারানবাবুর বড়সাহেব এক্সাইজ-কমিশনার একবার এখানে টুরে আসিয়া-ছিলেন। সেইদিনই ইন্সপেক্শনের অছিলায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও এখানে আসিয়া হাজির। দুই সাহেব বিলাতে এক স্কুলে পড়িয়া-ছিলেন। সেজন্য উভয়ের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। গরমের জন্য মেমসাহেবরা তখন শৈলনিবাসে। তাই দুই নামকরা তিরিক্ষি মেজাজের সাহেব আরও বদমেজাজী হইয়া উঠিয়াছেন। দেশীয় হাকিমরা পারতপক্ষে কেহ তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে চাহেন না; নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেন অধস্তন কর্মচারীদের। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একটু কারিতকর্মা, তাঁহারা

আমার এই সুযোগে সাহেবকে নিজের নিজের কর্মপটুতা দেখাইতে সচেষ্ট।

হারানবাবুর উপরওয়ালা ইন্সপেক্টরবাবু এই ধরনের অতিমাত্রায় কর্মতৎপর ব্যক্তি। এক্সাইজ-কমিশনার আসিবার দুইদিন আগে তিনি হঠাৎ স্থানীয় দিশী-মদের দোকান ইন্সপেক্শনের ফলে আবিষ্কার করেন যে, সেখানে মদ ছাড়া, চোরাই গাঁজাও বিক্রয় করা হয়। সাংঘাতিক অপরাধ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উপরে রিপোর্ট করেন, যাহাতে ব্যাপারটা বড়সাহেবের নজরে পড়ে, ঠিক এখানে আসিবার সময়। শুনিয়া হারানবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; কারণ জবাবদিহি সম্পূর্ণ তাঁহার। সাবইন্সপেক্টরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাঁহার নাকের সম্মুখে এরূপ আইনবিরুদ্ধ কার্য হইতে পারে না। কথা মিথ্যা নয়। একজন মদের দোকানদারের নিকট হইতে প্রতি মাসে কিছু বরাদ্দপ্রাপ্য ছিল। ইন্সপেক্টরবাবুও এই টাকার অংশীদার ছিলেন। সেই ইন্সপেক্টর-বাবু যে এমনভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন তাহা হারানবাবু কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ডাকবাংলোয় এক্সাইজ্-কমিশনার সাহেবের খানা-পিনার ব্যবস্থার ভার সাবইন্সপেক্টরবাবুর উপর। পয়সা অবশ্য খরচ করে মদের দোকানদার। কিন্তু দায়িত্ব সাবইন্সপেক্টরের। মাথার উপর বিপদ; চাকরি লইয়া টানাটানি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এবারের ব্যবস্থা, অন্যবার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। আয়োজনের ভার দেওয়া হইল কলিকাতার সাহেবী হোটেলের উপর। প্রচুর কাটবয় লইয়া সেখান হইতে বাবুর্চি আসিল। মাননীয় অতিথি একে সাহেব; তাহার উপর আবার আবগারী-বিভাগের মাথা। সুতরাং আহার্যের চেয়ে পানীয়ের ব্যবস্থা শতগুণে বেশী।

জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও এক্সাইজ্-কমিশনার দুইজনের স্থান হইয়াছে ডাকবাংলোর দুই পাশাপাশি ঘরে। সকাল হইতে বিয়ার পান চলিতেছে। মধ্যে একবার গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্থানীয় নাজিরের অফিস ইন্সপেকশন করিয়া আসিলেন। অফিসের কিছু খাতাপত্র আরদালী আনিয়া রাখিল তাঁহার ঘরের টেবিলের উপর; রাত্রিতে কিংবা সকালে তিনি সময়মত এগুলিকে দেখিবেন। এখন এই নারকীয় গরমে বিয়ারই একমাত্র সান্ত্বনা।

ডাকবাংলোয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আসিলে তাঁহার দেখাশোনার ভার পড়ে স্থানীয় নাজির বাবুর উপর। এই সূত্রেই ডাকবাংলো কম্পাউন্ডে প্রাতঃকালে হারানবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাজিরবাবুর। সাহেবদের কখন কিসের দরকার পড়ে বলা যায় না; সেজন্য উভয়েরই এইস্থান ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। ডাকবাংলোর এক মোটর-গ্যারাজে উভয়ে আস্তানা লইয়াছেন। সেখান হইতে দেখা যায় না সাহেবরা ঘরের ভিতর কি করিতেছেন। সে খবর পাওয়া যাইতেছে বেয়ারাদের মারফত। অনবরত নূতন নূতন সমস্যা উঠিতেছে ও তৎক্ষণাৎ তাহার সমাধানের চেষ্টা করিতে হইতেছে। দশ মিনিট সুস্থির হইয়া বসিবার উপায় নাই। এক্সাইজ-কমিশনার সাহেবের খাস আরদালী পাঁচ টাকা লইবার পরও বড় জ্বালাতন করিতেছে। কখনও সে বলিতেছে ডিম তাজা নয়, কখনও বলিতেছে চায়ের দুধে গন্ধ। আরও দশটি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দেওয়ার পর পচা ডিম তাজা হইয়া উঠিল, নষ্ট দুধ ভাল হইয়া গেল। একবার খবর আসিল সাহেবদের গরম লাগিতেছে। অমনি খসখসের পর্দায় অবিরাম জল ছিটাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিতে হইল। দুইজন সাহেবের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবই বোধ হয় বেশী বদরাগী। কেননা, একবার দুঃসংবাদ পাওয়া গেল, পাংখা-পুলার ঢুলিবার অপরাধে তাঁহার নিকট প্রহার খাইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে নাজিরবাবু অফিসের দিকে ছুটিলেন, পালা করিয়া পাখা টানিবার জন্য দুইজন অতিরিক্ত লোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়া শুনিলেন তাঁহার অনুপস্থিতিতে নাজিরের অফিস ইন্সপেক্শন করিয়া গিয়াছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। লোহার সিন্দুকের স্টক খাতাপত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছেন এবং কিছু কাগজপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়াও গিয়াছেন। সকলের অনুমান, হয়ত তিনি পূর্বেই নাজিরবাবুর বিরুদ্ধে কোন বেনামী চিঠি পাইয়াছিলেন।

শুনিয়া নাজিরবাবুর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এই আশঙ্কাই তিনি বহুদিন হইতে করিতেছিলেন। নাজারতের সিন্দুকে একটি সোনার গহনা বহুকাল হইতে পড়িয়াছিল। মোকদ্দমার সূত্রে হয়ত কোন সময় ইহা কোর্টে দাখিল করা হইয়াছিল। কোন দাবিদার না থাকিলে নাজিরের নিকট জমা করা থাকে জিনিসগুলি সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মধ্যে মধ্যে পুড়াইয়া ফেলা হয়। সোনার গহনা অবশ্য এ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। কন্যার বিবাহের সময় অভাবগ্রস্ত নাজিরবাবু উপরোক্ত গহনার সোনাটুকু কাজে লাগাইয়াছিলেন। এই চুরি ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব আজ ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

চিন্তান্বিত হইবারই কথা। ভারাক্রান্ত মনে নাজিরবাবু যখন ডাকবাংলোর মোটর-গ্যারাজে ফিরিলেন, তখন বেয়ারা সাব-ইন্সপেক্টরবাবুকে সাহেবদের মানসিক আবহাওয়ার আধুনিকতম অবস্থার কথা জানাইতেছে। ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের ওষ্ঠের উপর একটি মাছি বসিয়াছিল। সাবান দিয়া মুখ ধুইবার পর রাগে গরগর করিতেছেন তিনি। হঠাৎ হুংকার শোনা গেল, "সাব-ইন্সপেক্টর!" হারানবাবু হন্তদন্ত হইয়া ছুটিলেন। এক্সাইজ্-কমিশনার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ।

"মাছি মারবার ওষুধ একটু জোগাড় করতে পার ?"

"ইয়েস স্যার।"

খট্ করিয়া জুতা ঠুকিয়া মিলিটারি কায়দায় হারানবাবু স্যালুট করিলেন। তাঁহার হাতে মশা-মাছির ওষুধ-ভরা পিচকারি।

ঘরে পিচকারি দিয়া ঔষধ দিবার সময় সাব-ইন্সপেক্টরবাবু শুনিলেন, বারান্দায় সাহেব দুইজন বলাবলি করিতেছেন যে, অসৎ কর্মচারিগণ সাধারণত বেশ কর্মপটু হয়। বিশেষ উৎসাহিত হইবার মত প্রশংসা নয়। তবে এই খবর নাজিরবাবুকে দেওয়া মাত্র, তিনি যে কাঁদিয়া ফেলিবেন, একথা সাব-ইন্সপেক্টরবাবু আন্দাজ করিতে পারেন নাই। কান্না আর থামিতে চাহে না। কাঁদিতে কাঁদিতেই তিনি নিজের বিপদের কথা হারান-বাবুকে জানাইলেন। তাঁহাকে জেলে যাইতে হইবে এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে পথে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এ বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। নাজিরবাবুকে কী বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া যায়, সাবইন্সপেক্টরবাবু তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

দুইজনে নীরবে মুখোমুখি হইয়া কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারা যায়। দুইজনই সমগোত্রের লোক। মাথার উপর খাঁড়া ঝুলিতেছে। কথা বলিলে, তবু সেই সময়টুকুর জন্য বিপদের ভয়টা একটু চাপা থাকে। মনের বোঝা হালকা করিবার জন্য নিজের নিজের দুঃখের কথা আরম্ভ করিতে হয়। দুইজনেরই আজ বাড়ী যাওয়া হয় নাই। বাড়ীর লোকেরা কর্তাদের বিপদের কথা সম্ভবত জানেন না; তাঁহারা শুধু জানেন যে, বড়সাহেব আসিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের ডাকবাংলো হইতে এক পা নড়িবার উপায় নাই। মুখে এই কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু উভয়ের মনে মনে ধারণা যে, এই নিজর খবরটা এতক্ষণে পাড়ায় ঢিঢিক্কার পড়িয়া গিয়াছে। হিতৈষিণী প্রতিবেশিনীরা হয়ত এতক্ষণে সহানুভূতি জ্ঞাপনের জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বিবেকবুদ্ধি যে ভদ্রলোকদের বেশী, তাঁহারা হয়ত উপদেশ বাণী শুনাইবার জন্য ডাকবাংলোয় আসিয়া হাজির হইবেন। আরও কত কথা। আসন্ন সংকটের চাপে দুইটি মন খুব কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছে।

কলিকাতার বাবুর্চি একবার আসিয়া আশ্বাস দিয়া গেল যে, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। সাহেবরা ঠিক পথে চলিয়াছে। বহু সাহেব লইয়া সে প্রত্যহ ঘাঁটাঘাঁটি করে। নিজের অভিজ্ঞতায় সে বলিতে পারে যে, যে সকল সাহেব প্রাতঃকাল হইতে শরাব লইয়া বসে, তাহাদের খুশী করা খুব সহজ। সামলানো কঠিন যাহারা দুই তিন পেগের অধিক পান করে না তাহাদের। এখানকার

সাহেব দুইজন যে ভাবে মদ্য পান করিতেছেন, তাহাতে মনে হইতেছে যে, এত কষ্ট করিয়া রন্ধিত আহার্য দ্রব্যগুলি সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত রহিয়া যাইবে।

এই আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও বাবুদের উদ্বেগের নিরসন হয় না। তাঁহাদের দুশ্চিন্তার কারণ যে আরও গম্ভীরে, তাহা কলিকাতার বাবুর্চির জানা নাই।

তবে নাজিরবাবুর বিপদের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিবার পর হইতে, নিজের বিপদকে আর সে রকম বড় বলিয়া মনে হইতেছে না সাবইন্সপেক্টরবাবুর। নাজির-বাবুকে অবধারিত শ্রীঘর বাস করিতে হইবে। সে তুলনায় তাঁহার বিপদ আর কতটুকু।

বিকালের দিকে সম্মুখের মাঠে টেবিল-চেয়ার দিবার হুকুম হইল। এতক্ষণ চলিতে-ছিল মদ্যপানের বেলেখেলা। এইবার আসল মদ খাওয়া আরম্ভ হইল। হাতপাখা দিয়া দুইজন লোক সাহেবদের পিছনে দাঁড়াইয়া অনবরত হাওয়া করিতেছে। সাহেবরা কি যেন একটা মজার গল্প করিতেছেন। মোটর-গ্যারাজ হইতে দুই জোড়া চক্ষুর নিষ্পলক চাহনি সেইদিকে কেন্দ্রিত। সাহেবরা হাসিতেছেন; মেজাজ তাহা হইলে এখনও ভাল আছে। এইটুকু ভরসা।

কলিকাতার বাবুর্চির আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হইল। সাহেবরা নৈশভোজন প্রত্যাখ্যান করিলেন না। ভাল জিনিসের কদর তাঁহারা বোঝেন।

এক্সাইজ-কমিশনার হুঙ্কার ছাড়িলেন —"সাবইন্সপেক্টর !"

"ইয়েস সার।" ছুটিয়া গিয়া স্যালুট করিয়া দাঁড়াইয়াছেন হারানবাবু।

মুখে হাসি এক্সাইজ-কমিশনার সাহেবের।

"এ সব ব্যবস্থা কে করেছে ?"

"এই অধম সেবক, সার।"

"বেশ বেশ। উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।"

"আমাকে সব বিষয়ে সাহায্য করেছেন আমার বন্ধু নাজিরবাবু।"

এতক্ষণে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের টনক নড়িল। মুখের হাসি গিলিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার নাজির ?"

"ইয়েস সার।"

"আপনার বন্ধু ?"

"না সার, বন্ধু ঠিক নয়; তবে হ্যাঁ, বন্ধুও বলা চলে। ডাকবো তাঁকে সার ?"

"না।"

হারানবাবু মোটর-গ্যারাজে ফিরিয়া অপেক্ষমান নাজিরবাবুকে জানাইলেন যে, দুই সাহেবই খুব খুশী।

সাব-ইন্সপেক্টরবাবুর মনের বল বাড়িয়াছে। মোটর-গ্যারাজের বাহিরে চেয়ার টানিয়া আনিয়া বসিলেন। এতক্ষণ তাঁহার এ সাহস ছিল না। সেজন্য সরকারী ধড়াচূড়া পরিয়া ওই গরম ঘরের মধ্যে বসিয়া অনর্থক গলদ-

"কুকুরদের এই উৎকট চীৎকার বন্ধ করতে পার না?"

ঘর্ম হইতেছিলেন। নাজিরবাবু কিন্তু কিছুতেই বাহিরে আসিয়া বসিতে রাজী হইলেন না।

ডিনারের পরের পানীয়ের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। যে বেয়ারা মদ্য ঢালিয়া দিতেছে তাহার বিশ্রাম নাই। যে দুই ব্যক্তি হাতপাখা চালাইতেছে, তাহাদেরও না। সাহেবরা শার্ট খুলিয়া শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়া বসিয়াছেন; তবু অসম্ভব গরম লাগিতেছে। কিন্তু মেজাজ ভাল আছে। হাসি গল্প চলিতেছে। সম্ভবত রসের গল্প। অন্তত সরকারী কাজ-কর্মের যে নয়, এ কথা হাসির উচ্চরোল হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

এইবার সাহেবরা গেঞ্জি খুলিতেছেন। গ্লাসে গ্লাস ঠেকাইয়া আবার নূতন করিয়া আর এক দফা আরম্ভ হইল। গলার স্বর ক্রমে উচ্চ হইতেছে। দুইজনই হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতার বাবুর্চি দুই প্লেট আহার্য ও একমুখ হাসি লইয়া মোটর-গ্যারাজে উপস্থিত। সাহেবদের সে খুশী করিতে পারিয়াছে; এখন সে নিজের প্রশংসা বাবুদের নিকট হইতে শুনিতে চায়। সেই খবর দিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাহাকে একান্তে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, খানা-পিনার জন্য নাজিরবাবু কত খরচ করিয়াছেন। সে বলিয়াছে একশ টাকা আর চারশ টাকা দিয়াছেন সাব-ইন্সপেক্টরবাবু। শত চেষ্টা করিয়াও সে নাজিরবাবুকে কিছু খাওয়াইতে পারিল না। হারানবাবুর দেখা গেল আহারে রুচি আছে; সামান্য পানীয়ের উপরও তিনি বীতস্পৃহ নহেন। যাইবার সময় বেয়ারা বলিয়া গেল যে, সাহেব দুইজনের এতক্ষণে রঙ লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

রঙ লাগুক আর নাই লাগুক গরম লাগিতেছিল ঠিকই। সাহেবরা হাফপ্যান্ট খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। আরদালী আসিয়া উঠাইয়া লইয়া গেল। মুহূর্তের জন্য নাজিরবাবু চোখ বুঁজিয়া ফেলিয়াছিলেন। চোখ খুলিলে দেখিলেন, আন্ডার উইআর পরিহিত সাহেব দুইজন মাঠে পায়চারি করা আরম্ভ করিয়াছেন।

তাহার পর ইংরাজী গানের এক কলি শুনিতে পাওয়া গেল। দুইজনে গলা মিলাইয়া গান গাহিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইংরাজী কোন নৃত্যের ধরনে পদক্ষেপেরও চেষ্টা আছে। বাবুর্চি, আরদালী, বেয়ারা, পাংখাপুলার সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাছাকাছি রাস্তার কুকুরের দল পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করিল। ডাক-বাংলার গেটের কাছে এত রাত্রিতেও জনকয়েক লোক জড়ো হইয়া গেল।

"সাবইন্সপেক্টর !"

আবার হুঙ্কার কেন ? বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছে হারানবাবুর।

"ইয়েস সার।"

"কুকুরদের এই উৎকট চীৎকার বন্ধ করতে পার না ?"

"ইয়েস সার।"

ভাবিবার সময় নাই। কিছু বিহিত না করিতে পারিলে নিস্তার নাই। নাজিরবাবুকে পাঠান হইল থানায় একটা খবর দিতে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম করিয়া বলিলে পাহারাওয়ালাদের যদি কুকুর তাড়াইবার হুকুম দেন দারোগাবাবু। থানার দারোগার এ লাইনে অভিজ্ঞতা অনেক কালের। তিনি বলিলেন, লাঠি হাতে পাহারাওয়ালাদের দেখিলে কুকুররা আরও বেশী করিয়া ডাকে।

"এখন উপায় ?"

ভগবানের নাম লওয়া ব্যতীত আর কোন উপায়ের কথা থানার দারোগার মনে পড়িল না।

সে রাত্রিতে ভগবানও বোধহয় সজাগ ছিলেন। নাম স্মরণের ফল ফলিতে দেরী হইল না। খ্যাঁকখেয়ালী কুকুরগুলো যেমন হঠাৎ ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তেমন অকারণেই ডাক বন্ধ করিয়া দিল। ধড়ে প্রাণ আসিল।

"সাব-ইন্সপেক্টর !"

আবার কি হইল ? ধাবমান হারানবাবু নিজের হৃৎস্পন্দনের ধ্বনি স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন।

"উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তোমার।"

"নো সার।"

"কী বললে তুমি ?"

"নো, নো ! ইয়েস সার"

"উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা তোমার"

"ইয়েস সার।"

"তবে কেন ইন্সপেক্টরটা তোমার দুর্নাম করবার চেষ্টা করে ?"

"জানি না সার।"

"জান না ? জানা উচিত। অবশ্য জানা উচিত।"

"ইয়েস সার।"

"আরদালী ! টেবিলের উপর থেকে ফাইলটা নিয়ে এস।"

সাব-ইন্সপেক্টরবাবুর কপালে ঘর্মবিন্দু দেখা দিয়াছে।

"এই নাও। দেখ। পড়! জোরে জোরে পড়।"

হারানবাবু জোরে জোরে পড়িলেন ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট।

"পনরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।..."

"ইন্সপেক্টর এখন কোথায় ?"

"এক্সাইজ্ ক্লাবে আছেন তিনি।"

"আমরা এখানে জেগে আছি, আর সে এক্সাইজ ক্লাবে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে ? এখনই ডেকে আন তাকে !"

"ইয়েস সার।"

উর্দি পরিয়া, কাগজপত্র লইয়া ডাকবাংলায় আসিতে আসিতে, ইন্সপেক্টরের ঘন্টাখানেক সময় লাগিয়া গেল। এ এক ঘন্টা সাহেবরা বৃথায় নষ্ট হইতে দেন নাই। তাঁহাদের নৃত্যের সুবিধার জন্য নাজিরবাবুকে ডাক-বাংলার চাপরাসীর ভাঙ্গা গ্রামোফোনটি বাজাইতে হইয়াছে। প্রতি রেকর্ড শেষ হইবার পর, সাহেবরা একবার করিয়া তাঁহাদের পূর্ণ গ্লাস নিঃশেষ করিয়াছেন। কলিকাতার বাবুর্চি নাজিরবাবুর নিকট স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এরূপ একজোড়া কাবিল সাহেব দেখিবার সৌভাগ্য পূর্বে তাহার হয় নাই।

ইন্সপেক্টর যখন আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন তখন সাহেবরা চেয়ারে উপবিষ্ট।

"তোমার মধুর স্বপ্নে ব্যাঘাত করবার জন্য আমি দুঃখিত। এস এই টেবিলের কাছে। এই নাও তোমার রিপোর্ট। পড় জোরে জোরে !"

"পনরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।......"

"কলম আছে তোমার কাছে ? নাই ?"

তাড়াতাড়িতে ইন্সপেক্টর কলম আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। হারানবাবু অতি কুণ্ঠার সহিত নিজের পকেট হইতে কলমটি বাহির করিয়া ইন্সপেক্টরের হাতে দিলেন।

এক্সাইজ্-কমিশনার সাহেব তাড়া দিলেন ইন্সপেক্টরবাবুকে—"সাব-ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে খবর পেয়ে তবে না তুমি শহরের মদের দোকান দেখতে গিয়েছিলে ? অমন করে ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছ কেন ? বুঝতে পারলে না ? এত সহজ কথাটা বুঝতে তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের এত দেরী হওয়া উচিত নয়। 'সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া'—এই কথা কয়টি ঢুকিয়ে দাও, তোমার রিপোর্ট আরম্ভের জায়গাটায়। হ্যাঁ লেখ ! হল ? এবার পড় জোরে জোরে !"

ইন্সপেক্টর কম্পিত কণ্ঠে পড়িলেন—"সাব-ইন্সপেক্টরের নিকট হইতে খবর পাইয়া, পনরই মে তারিখে আমি শহরের মদের দোকানে গিয়া দেখি যে, সেখানে গাঁজা বিক্রয় করা হইতেছে।......"

"ঠিক আছে। ওতেই হবে। চোরাই গাঁজা বিক্রয়কারীকে ধরবার কৃতিত্ব তোমাদের দুইজনেরই সমান। ডিপার্টমেন্ট একথা মনে রাখবে। এখন তুমি যেতে পার।"

ইন্সপেক্টরকে নীরবে গেট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া হারানবাবু ফিরিতেছেন। হঠাৎ আবার হাঁক শোনা গেল—"সাব-ইন্সপেক্টর !"

"ইয়েস সার।"

"তোমার নাজিরকে ডাক।"

ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবও চেয়ারে একটু যেন নড়িয়া বসিলেন।

"নাজির, এমন পরিপাটি ব্যবস্থার জন্য তোমাকেও আমাদের ধন্যবাদ জানান উচিত।"

নাজিরবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিলেন।

সাহেব তাড়া দিলেন।

"উঠে দাঁড়াও ! আমার কথার সত্য জবাব দাও। সেই সোনার গহনাটা ফেরৎ দিতে পার ?"

"সে টাকা আমি হুজুরের খানা-পিনায় খরচ করেছি আজ।"

"শুধু চোর নও; তুমি একটি মিথ্যাবাদীও।" আরদালীকে ডেকে সাহেব ঘরের টেবিলের উপর থেকে খাতাপত্রগুলো আনতে বললেন।

"নাজির বার কর সেই পাতাটা। পেয়েছ ? পড় কি লেখা আছে।"

'Gold bangles—one pair'

"কলম আছে ?"

হারানবাবু নিজের কলমটা এগিয়ে দিলেন নাজিরবাবুকে।

"গোল্ড-এর আগে রোল্ড কথাটা লিখে দেবে তুমি, বুঝেছ। রোল্ডগোল্ড জানতো ? রোল্ড গোল্ড-এর জিনিস যদি তিন বছর নাজারতে পড়ে থাকে তাহলে সেটাকে নষ্ট করে দিলে কোন অপরাধ হয় না। রোল্ড কথাটার বানান জান ? জান না ? আর, ও, এল এল ই ডি—রোল্ড। না না আমার চোখের সম্মুখে লিখতে হবে না। রেজিস্টার-খানাকে তুমি ওই মোটরগ্যারাজের মধ্যে নিয়ে যাও। রোল্ড গোল্ড কথাটা একখানা কাগজে আগে এক হাজারবার লিখবে ওই ঘরে বসে। এই হল তোমার শাস্তি। তারপর রেজিস্টারে লিখবে। তুমি একটি র‍্যাস্কাল ! যাও ! শীগগির যাও আমার সম্মুখ থেকে !"

হারানবাবু ও কৃষ্ণপদবাবু যে কলমটিকে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার সময় ব্যবহার করেন, সেই কলমটিই চ্যাটার্জি এণ্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেডের প্রাথমিক পুঁজি।

উপরোক্ত ঘটনার পরই হারানবাবু স্বপ্নাদেশ পান, ওই কলমটিকে আর্তসেবায় নিয়োজিত করিবার জন্য। তখন হইতে এই লেখনী বিপন্নের উদ্ধারকল্পে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়।

হারানচন্দ্র ও কৃষ্ণপদ উভয়েরই ব্যবসায়িক দূরদৃষ্টি ছিল অসাধারণ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা উক্ত ধরনের সেবাকার্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হন। তাহার পরই আরম্ভ হয় পয়মন্ত লেখনী সংগ্রহের কাজ। এ কাজের ভার ছিল হারানচন্দ্রের উপর। কারণ এখান হইতে অন্যত্র বদলি হইবার হুকুম আসিবার পর, তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়াছিলেন। কৃষ্ণপদবাবু পেন্সন লইবার বয়স হওয়া পর্যন্ত চাকরি করিয়াছিলেন।

স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী অষ্টোত্তর শত সুলক্ষণা লেখনী সংগৃহীত হইবার পর, আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয় চ্যাটার্জি অ্যান্ড চ্যাটার্জি প্রাইভেট লিমিটেড। ইহার পরের বিবরণ এই কোম্পানীর জয়যাত্রার ইতিহাস। সে কাহিনী আপনাদের সকলের জানা।

পুরনো এক মামলার কাহিনী

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়
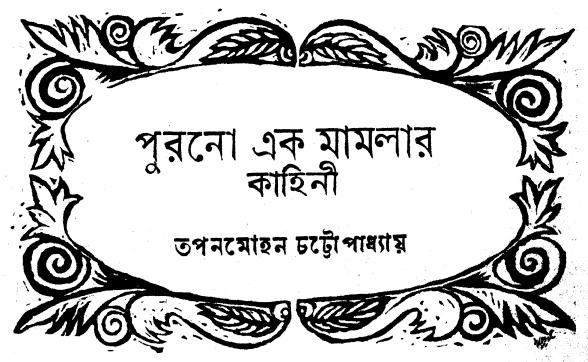
আঠারো শতাব্দীর শেষ অর্ধেকে যেসব বাঙালী ইংরেজদের আওতায় মানুষ হয়ে নিজেদের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন হলেন কান্ত মুদি। কান্তর মুরুব্বি ছিলেন আর কেউ নন—স্বয়ং ওয়ারেন হেস্টিংস। দু-জনের পরিচয় অনেক দিনের, পলাশীর যুদ্ধেরও খানিক আগের। কান্তর মুদিখানা ছিল কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির গায়েই লাগা। দোকানের সঙ্গে লেনদেন থাকার দরুন সেখানকার সাহেবরা সবাই তাঁকে অল্প-বিস্তর চিনতেন, তাঁর মিষ্টি স্বভাবের দরুন তাঁকে খানিকটা পেয়ারও করতেন। ১৭৫৩ সালে এই কুঠিরই এক ছোকরা কেরানী হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস কাশিমবাজারে আসেন। কান্ত মুদির সঙ্গে জানাশোনা সেই তখন থেকেই। ১৭৫৬ সালে ইংরেজদের কাছ থেকে কলকাতা কেড়ে নেবার আগে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি লুঠ করিয়েছিলেন, তখন সেখানকার বড়কর্তারা সবাই বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদ চালান হয়ে যান। হেস্টিংস সেই সময় কুঠির কাজে মফস্বলের কোন্-এক আড়ঙে গস্ত করতে বেরিয়েছিলেন, কাশিমবাজারে ফিরে আসতে কান্ত মুদিই তাঁকে নিজের দোকানে আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন; পরে যখন সব একটু ঠাণ্ডা হল তখন গোপনে গোপনে তাঁকে ফলতায় পাচার করেও দিতে পেরেছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার হাতে কলকাতার দখল চলে যেতে ইংরেজরা কলকাতার চল্লিশ মাইল দক্ষিণে ফলতা গ্রামে পালিয়ে গিয়ে সেই-খানেই জড় হয়ে তখন জ্যান্তেমরা অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন।

বরাতজোরে ঐ ঘটনার ষোল বছর পরে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতার গভর্নর হয়ে এলেন। আবার তার ঠিক দু-বছর পরেই সারা ভারতের ইংরেজ রাজ্যের গভর্নর-জেনারেলও হয়ে বসলেন। বড় আশ্চর্যের কথা এই যে, অত বড় পদ লাভ করেও হেস্টিংস তাঁর দুর্দিনের বন্ধু কান্ত মুদিকে ভোলেননি, তাঁর উপকার মনে করে রেখেছিলেন। কান্তকে কলকাতায় আনিয়ে হেস্টিংস তাঁকে একেবারে নিজের দেওয়ান করে বসিয়ে দিলেন। কান্ত মুদি তখন হলেন কান্তবাবু। তাঁর পিতৃদত্ত নাম কৃষ্ণ-কান্ত তার আগেই কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর কৌলিক উপাধি যে নন্দী ছিল, সেটাও অব্যবহারের জন্যে কারো স্মরণ ছিল না। তখনো পর্যন্ত বাঙালীরা ইংরেজদের দেখাদেখি কৌলিক উপাধি ব্যবহার করতে শেখেননি, সম্মানসূচক পদবী যদি কিছু পেতেন তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। বাবু পদবীর তখন মস্ত সম্মান। চেম্বার্স ডিক্শনারীর কল্যাণে বাবু কথাটা তার কৌলীন্য হারিয়ে তখন বংশজের পর্যায়ে নেবে যায়নি, তখনো বাবু শব্দের অর্থে বিদ্ঘুটে ইংরিজি লিখিয়ে কেরানীর দলকে বোঝাত না। এক সময় সম্ভ্রান্ত বাঙালী সমাজে বাবুরা কেষ্টবিষ্টু বলেই গণ্য ছিলেন, যে-সে কেউ বাবু বলে কখনো মান্য হতেন না। সারা কলকাতা শহর ঢুঁড়ে এক সময় মাত্র আটজন বাবু বের করতে পারা যেত, কারণ কুলীনের মতো বাবুরও তখন ন-রকমের গুণ থাকার প্রয়োজন হত। কিন্তু বাবু-ই হোন্ আর যা-কিছুই হোন্, বড়-সাহেবদের কাছে কান্ত যে আদরের কান্টু ছিলেন বরাবর সেই ক্যান্টুই রয়ে গিয়েছিলেন।

সেই সময় বঙ্গদেশে জায়গিরের অভাব, সবই তখন জমিদারী। অর্থাৎ, সরকারে মালগুজারি দাখিল করে জমিদারদের জমি-জমা ভোগ করতে হত। হেস্টিংস তাই কান্তবাবুকে গাজিপুর-আজিমগড়ের অন্তঃ-পাতী দুআবেরা পরগণার জাইগিরটি বর্সিশ করে দিলেন। শুধু বাংলার বাইরে এক জাইগির নয়, কান্তবাবু বঙ্গদেশেও, কি স্বনামে আর কি বেনামে, বহু জাইগিরই নিজের ভোগে এনে ফেলতে পেরেছিলেন। রংপুর জেলার বাহিরবন্দ এক প্রকাণ্ড জমিদারী। ওটা বরাবরই নাটোরের রাজ-বংশেরই ছিল, পাঁচসালা বন্দোবস্তে হেস্টিংস সেটা রানী ভবানীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে কান্তবাবুর নামেই সেটা পত্তন করে দিয়েছিলেন। মোট কথা, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কান্তবাবুর সংসার ধনেজনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, সিন্দুকে টাকায় টাকায় ছয়লাপ। কিন্তু কান্তবাবু কখনো কোনো টাইটল নেননি। যদিও হেস্টিংস তাঁকে রাজা-মহারাজা করে দিতে অনেকবার চেয়েছিলেন, তিনি কিন্তু বাবু পদবীতেই সন্তুষ্ট থেকে জীবন কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তবে একমাত্র পুত্র লোকনাথের জন্যে হেস্টিংসকে ধরে রাজা-বাহাদুর টাইটল

আদায় করে নিয়েছিলেন। মনে-মনে বোধ হয় ভয় ছিল, লোকনাথ নব্যযুগের মানুষ, পুরনো বাবু পদবীতে তাঁর হয়তো মন উঠবে না, খুঁতখুঁত করতে থাকবে। রাজা পদবী পাবার পর লোকনাথ কৌলিক নন্দী উপাধি ত্যাগ করে রায় পদবী গ্রহণ করলেন। ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত দেওয়ানি করে কান্তবাবু কাজ থেকে রিটায়ার করলেন। ১৭৮৮ সালে তাঁর কাল হয়। তখন তাঁর মুরুব্বি হেস্‌টিংসের কিন্তু মহা সঙ্কটকাল উপস্থিত। পারলামেন্ট থেকে তাঁর ইম্‌পীচমেণ্টের হুকুম হয়ে গেছে; বিচারের জন্যে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, টাকার-পর-টাকার শ্রাদ্ধ চলেছে। তাঁর পেটোয়া কান্তর ঘরে কিন্তু লক্ষ্মী তখন একেবারে বাঁধা পড়ে গেছেন।

লোকনাথ রায় বাপের এক ছেলে হওয়ায় কান্তবাবুর বিশাল সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারায় ভেঙে-চুরে চৌচির হয়ে যায়নি। তাছাড়া, জীবনের অর্ধেকের উপর সময় তিনি কঠিন রোগে পড়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়েছিলেন, পৈতৃক সম্পত্তি ওড়াবার তেমন সুযোগও পাননি। ১৮০৩ সালে তিনি যখন দেহ রাখলেন তখন তাঁরও একমাত্র পুত্র হরিনাথের জন্যে কান্তবাবু সমস্ত সম্পত্তিই বজায় রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন। হরিনাথের বয়েস তখন সবে এক বছর। তাঁর লালন-পালনের ভার পড়ল তাঁর মা রানী সুসারময়ীর উপর, তাঁর স্টেট চালাবার দায় নিলেন কোর্ট-অব-ওয়ারডস্‌। হরিনাথ পনেরো বছরে পড়তেই তাঁর মা খুব ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিলেন। সে-বিয়েতে দু-লাখ টাকা খরচ হয়েছিল। তখনকার দিনের বাংলা খবরের কাগজগুলোতে খুব ফলাও করে তার বর্ণনা দেওয়া আছে, দেখতে পাওয়া যায়। নববধূ হরসুন্দরীকে পয়মন্ত বলতে হবে, কারণ তিনি শ্বশুরবাড়িতে ঘর করতে আসার অল্প কিছুদিন পরেই বড়লাট-সাহেব লর্ড আমহার্স্ট কুমার হরিনাথ রায়কে রাজা-বাহাদুর খেতাব দিলেন। তাই নিয়ে কাশিমবাজার রাজবাড়িতে অনেকদিন ধরে খুব ধুমধাম চলেছিল। হরিনাথের সঙ্গে একই দিনে আর এক ব্যক্তি রাজা-বাহাদুরের সনদ পেয়েছিলেন, যিনি সেকালের বঙ্গসমাজে ধনেমানে বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তিনি শোভাবাজার রাজবাড়ির রাধাকান্ত দেব, যাঁর নাম, এমন কোনো বাঙালী নেই যিনি না শুনেছেন।

রাজা হরিনাথ বেশিদিন বাঁচেন নি। ১৮৩২ সালে মাত্র তিরিশ বছর বয়েসে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বহুসন্তানের মধ্যে তখন জীবিত ছিল কেবল একটি পুত্র, কৃষ্ণনাথ, আর এক কন্যা, গোবিন্দসুন্দরী। কৃষ্ণনাথের বয়েস তখন ন-বছর। রাজা হরিনাথের মা, রানী সুসারময়ী, আর তাঁর বিধবা, রানী হরসুন্দরী, দুজনে কৃষ্ণনাথের অভিভাবক হলেন। কিন্তু তাঁদের তদারকিতে কৃষ্ণনাথ তেমন ভালো করে মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। সেকালের ধনী বংশের ছেলেদের যতরকমের বদখেয়াল ছিল তার সব কটাতেই কুমার-বাহাদুর একে-একে পোক্ত হয়ে উঠলেন। শিক্ষাদীক্ষা ভালো হবে বলে কোন্নগরের মিত্র-বংশের ছেলে, হিন্দু কলেজে পড়া ইংরিজিওয়ালা দিগম্বর মিত্রকে কুমারের প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে সুবুদ্ধি হবার আশায় কৃষ্ণনাথের মা-ঠাকুরমা পনের বছরে পড়তে-না-পড়তেই তাঁর বিবাহ দিয়ে দিলেন। কন্যাপক্ষের টাকার জোর ছিল না বটে, কিন্তু কন্যা সারদাসুন্দরী অতি অপরূপ সুন্দরী। সৌন্দর্যের গৌরব অর্থের দৈন্যকে একেবারে চাপা দিয়ে ফেলল। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি এলে সারদাসুন্দরীর নাম স্বর্ণময়ী রাখা হল। সবই হল কিন্তু রানী সুসারময়ী আর রানী হরসুন্দরী যা আশা করেছিলেন সেটা হল না—কুমার-বাহাদুরের মতিগতির একটুও পরিবর্তন দেখা গেল না।

নাবালকের খোলস ছেড়ে বেরোবার আগেই কৃষ্ণনাথ তাঁর ঠাকুরমার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া বাধিয়ে বসলেন। মিত্রজা মহাশয় তাঁকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন তা জানিনে, কিন্তু সে-শিক্ষার ফলে যে কুমারের স্বভাব কিছু শুধরিয়েছিল তা বলে তো মনে হয় না। তবে অশনবসনে, কথাবার্তায়, ভাবভঙ্গিতে, চলাফেরায়, বিলাস-ব্যসনে তিনি যে একটা আস্ত ফিরিঙ্গি বনে গিয়েছিলেন সেটা পুরনো খবরের কাগজের পাতা ওলটালেই বেশ মালুম হয়ে যায়। কারণ, এইসব ব্যাপার নিয়ে তখনকার দিনের বঙ্গ-সমাজে ঢি-ঢিকার পড়ে গিয়েছিল। সম্বাদ-ভাস্করের সম্পাদক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ওরফে গুড়গুড়ে ভট্‌চাজ কুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের উচ্ছৃংখল চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর কাগজে খানিক কটূক্তি করায় কুমার-বাহাদুর তাঁর নামে মানহানির মামলা জুড়ে দিয়েছিলেন। ফলে ভট্টাচার্য মহাশয়ের দু-বছর জেল হয়েছিল বটে, কিন্তু কুমার-বাহাদুরের কেলেংকারির কথা ছেলেবুড়ো কারো কাছে আর গোপন রইল না। যাই হোক, কুমারের উড়নচণ্ডেমির দরুন স্টেটের তহবিলে যে জমা টাকা ছিল তা সবই গেল, উপরন্তু বাজারে প্রচুর টাকার দেনা হয়ে পড়ল। কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস আর টাকা দিতে চান না, মহাজনরাও আর ধার দিতে রাজি হন না। অথচ কুমারের নিত্য নতুন খেয়াল পূরণের জন্যে বিস্তর টাকার দরকার। কলকাতায় চিৎপুর রোডের উপরেই জোড়াসাঁকো অঞ্চলে কান্তবাবু এক বিরাট বাড়ি হাঁকড়ে গিয়েছিলেন। সেই বাড়ির অন্দর মহলে লোহার সিন্দুকের মধ্যে দুই বিধবা রানীর নিজস্ব বিশ লাখ টাকা নগদ মজুত ছিল। কৃষ্ণনাথের দৃষ্টি সহজেই রানীদের ঐ স্ত্রীধনের উপর গিয়ে পড়ল। তিনি দাবি করে বসলেন, সিন্দুকে যে-টাকা আছে তা স্টেটের সুতরাং সেটা তাঁরই প্রাপ্য। রানীরা বললেন, ও-টাকা তাঁদের স্ত্রীধন। কিন্তু কে কার কথা শোনে? কুমার-বাহাদুর পুলিসে খবর দিয়ে ফিরিঙ্গি সার্জেণ্ট আনিয়ে লোহার সিন্দুকে শীলমোহর করিয়ে দিলেন।

রানীরা ভালো কথায় কোনো কাজ হল না দেখে কুমারের নামে তাঁদের স্ত্রীধন চুরির এক মামলা লাগিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত মামলা যদিও আপসে মিটমাট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মা-ঠাকুরমার সঙ্গে কৃষ্ণনাথের আর কখনো বনিবনাও হয়নি। রানী সুসারময়ী সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসিনী হলেন। রানী হরসুন্দরী আর কখনো কাশিমবাজারে যাননি, কলকাতার বাড়ির এক অংশ আলাদা করে ঘিরে নিয়ে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। কিন্তু আর পুত্রমুখদর্শন তিনি করেননি। তাঁর ঘরে যে তাঁর ছেলে ম্লেচ্ছ ঢুকিয়ে জেনানা অপবিত্র করেছেন সে-অপমান তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। লেখাপড়া শিখে কৃষ্ণনাথের অবশ্য ম্লেচ্ছ-অম্লেচ্ছ কোনো জ্ঞান ছিল না। কারণ, তাঁর নিজের ম্লেচ্ছাচার এত বেশি দূর গড়িয়েছিল যে, সমাজে থেকেও তিনি একরকম একঘরে হয়ে থাকতেন, নিতান্ত টাকার জোরের দরুন জাতটা হারাননি। তিনি উলটে একেবারে বেপরোয়া হয়ে রানীদের মাসোহারা বন্ধ করে দিলেন। রানীরা তখন আর কি করেন? নিরুপায় হয়ে তাঁরাও কৃষ্ণনাথের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করলেন। ফলে, প্রায় আট লক্ষ টাকা আদালতে জমা রেখে কৃষ্ণনাথ তবে রেহাই পান। ঐ টাকার আয় থেকে রানী সুসারময়ীকে আটশো আর রানী হরসুন্দরীকে চোদ্দশো করে টাকা মাস মাস মাসোহারা দেওয়া হত।

সাবালক হতেই কৃষ্ণনাথও তাঁর পিতৃ-পিতামহের মতো ইংরেজ সরকার থেকে রাজা-বাহাদুর খেতাব পেলেন, তাতে কোনো বাধা হয়নি। প্রাইভেট টিউটর দিগম্বর মিত্রের এসব বিষয়ে কোনো হাত ছিল কিনা স্পষ্ট কিছু জানা যায় না, কিন্তু দেখা গেল, সাবালক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণনাথ তাঁকে এক লক্ষ টাকা বকশিশ করে ফেললেন। সেই টাকা দিয়ে ব্যবসা ফেঁদে মিত্রজা ভাগ্যবান হতে পেরেছিলেন। লাভের টাকায় শেষে জমিদারী কিনে কোলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে নিজের স্থান করে নিতেও পেরেছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি আগের থেকেই ছিল, তার সঙ্গে অর্থের যোগ হওয়াতে তাঁর মান-সম্মান অনেক বেড়ে গেল, ইংরেজ-সরকার তাঁকেও রাজা করে দিয়েছিলেন। রাজা হয়ে

বসে কৃষ্ণনাথ রায় কাশিমবাজার রাজবাড়িতে বেশ রাজাগিরি ফলিয়ে চলেছেন এমন সময় এক মস্ত অঘটন ঘটে গেল। রাজা-বাহাদুরের ঘর থেকে একটা বড়ো-রকমের চুরি হয়ে গেল। রাজার সন্দেহ গিয়ে পড়ল তাঁর খাস-খানসামা গোপাল দফাদারের উপর। তাকে ধরে কৃষ্ণনাথ মারের উপর মার লাগিয়ে তাকে একেবারে আধমরা করে ছাড়লেন। তখন দেশে ইংরিজি আইন পাকা হয়ে চলেছে, সর্বত্র দেওয়ানী ফৌজদারী রেভিনিউ—তিন-তিন রকমের আদালত বসে গেছে। উকিল-মোক্তারদের কল্যাণে সমাজের নিচু স্তরের লোকেরাও মামলামকদ্দমা করতে বেশ শিখেছে। গোপালের পক্ষ থেকে বহরমপুরে ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে রাজার বিরুদ্ধে মারপিটের এক নালিশ রুজু করে দেওয়া হল।

আদালত থেকে ওয়ারেন্ট নিয়ে এসেও নাজির পেয়াদারা কিছুতেই রাজাকে ধরতে পারল না। তখন বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রমোহন চাটুয্যে নিজে ওয়ারেন্ট হাতে করে নিয়ে এসে রাজবাড়ি চড়াও হয়ে কৃষ্ণনাথকে ধরে হাজতে পুরে দিলেন। চার-পাঁচদিন হাজতবাসের পর কৃষ্ণনাথ পঞ্চাশ হাজার টাকায় জামিন দিয়ে আর মামলা শুনানীর সময় আদালতে ঠিক হাজির থাকবেন বলে মুচলেকা দাখিল করে তবে ছাড়ান পেলেন। লজ্জায় কৃষ্ণনাথ আর বহরমপুরে মুখ দেখাতে পারলেন না, কোলকাতায় পালিয়ে গেলেন। চন্দ্রমোহন চাটুয্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভাগনে। ১৮৪০ সনে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথম-বার বিলেত যান তখন চন্দ্রমোহনকে তাঁর সঙ্গে নেন। বিলেত থেকে ফিরেই চন্দ্র-মোহন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি পেয়ে গেলেন। তখন ওসব পদের জন্যে পরীক্ষা-টরীক্ষার কোনো বালাই ছিল না, ভদ্রবংশের সন্তান হলেই হত, তার উপর মাঝারিরকমের একটু পড়াশুনো থাকলে তো সোনায় সোহাগা। চন্দ্রমোহন বিলেত-ফের্তা, মেজাজটা তাই তাঁর একটু রুক্ষ-গোছের। কড়া হাকিম বলে তাঁর অপযশও ছিল—রাজা-মহারাজা, ধনী-মহাজন কাউকেই তিনি তোয়াক্কা করেন না।

এর কিছুদিন পরে গোপাল দফাদার মারের চোটটা সামলে উঠতে না পেরে অবশেষে মারাই গেল। তখন চন্দ্রমোহন চাটুয্যে কৃষ্ণনাথের নামে খুনের চার্জ দিয়ে তাঁকে ধরে আনবার জন্যে এক বেকার-জামিনের ওয়ারেন্ট বের করে দিলেন। কোলকাতার বাড়ি বসে রাজা-বাহাদুর খবর পেলেন, তাঁকে ধরবার জন্যে ওয়ারেন্ট কোলকাতায় এসে গেছে, তাঁর বাড়িতে এসে পৌঁছল বলে। শুনে অবধি রাজার নাওয়া-খাওয়া গেল, ঘুম মাথায় চড়ল। তিনি তাঁর সাহেব অ্যাটর্নীকে ডাকিয়ে পাঠালেন।

এক কোণে এক চেয়ারের উপর রাজা কৃষ্ণনাথ নিশ্চল হয়ে বসে আছেন......

আটর্নি এসে দেখলেন, রাজা-বাহাদুর শুকিয়ে একেবারে আধখানা হয়ে গেছেন। কেবলি বলছেন, তিনি আর বাঁচতে চান না, যদি তাঁকে ওয়ারেন্ট দিয়ে চোর-ছ্যাঁচড়ের মতো বহরমপুরে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে তার পর আর তাঁর বেঁচে লাভই বা কি? বিলাপ-বিলচানের মাঝখানেই হঠাৎ উঠে পড়ে রাজা-বাহাদুর পাশের ঘরে গিয়ে সেখান থেকে আধ দিস্তে ভর ঠেসে-লেখা কতক কাগজ এনে অ্যাটর্নির হাতে দিয়ে জানালেন, ঐ কাগজগুলোয় বাংলায় তাঁর উইল লেখা আছে। তার পর তিনি অ্যাটর্নির কেরানী আর নিজের ফিরিঙ্গী ম্যানেজারকে ঐ উইলের সাক্ষী হতে বললেন। তাঁরা রাজার হাওল-দেওল ভাব-ভঙ্গী দেখে আর আবোল-তাবোল বকবকানি শুনে সাক্ষী হতে ইতস্তত করতে লাগলেন, কিন্তু অ্যাটর্নিসাহেব আশ্বাস দেওয়াতে শেষে রাজি হয়ে গিয়ে কাগজে সই করে দিলেন।

সেই দিনই বেলা তিনটের সময় অ্যাটর্নি সাহেব খবর পেলেন, বহরমপুর থেকে পাঠানো ওয়ারেন্ট কোলকাতায় এসে গেছে, কোলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট সেটাতে সই করে দিয়েছেন, রাজা কৃষ্ণনাথকে গ্রেফতার করার জন্যে শিগ্‌গিরই লোক যাচ্ছে। হন্তদন্ত হয়ে এসে অ্যাটর্নি সব খবর রাজাবাহাদুরকে জানিয়ে তাঁকে দু-চারদিনের জন্যে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পরামর্শ দিলেন। রাজাকে ঘাবড়াতে মানা করলেন। বললেন, জামিনের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে তিনি সব ঠিক করে ফেলেছেন। সেই শুনে, কৃষ্ণনাথ খানিকক্ষণ দিশেহারা মতো হয়ে থেকে, বাড়ির ভিতর থেকে খরচের জন্যে টাকা বের করে আনছেন বলে অন্দরে চলে গেলেন। পাঁচ মিনিট

গেল, দশ মিনিট গেল, পনের মিনিট হতে চলল, রাজা আর আসেন না তো আসেনই না। বাইরের ঘরে চুপচাপ ঠায় বসে থাকতে থাকতে অ্যাটর্নি-সাহেব একেবারে থকে গেলেন। আর থাকতে না পেরে তিনি এক খানসামাকে ডেকে রাজাবাহাদুরের খবর নিতে বললেন। খানিক পরে খোঁজ নিয়ে খানসামা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে অ্যাটর্নি-সাহেবকে ভিতরের ঘরে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে তিনি যে-দৃশ্য দেখলেন তাতে তো তাঁর চক্ষুস্থির। এক কোণে এক চেয়ারের উপর রাজা কৃষ্ণনাথ নিশ্চল হয়ে বসে আছেন, তাঁর বুক ফুঁড়ে পিস্তলের গুলি চলে গেছে। পিস্তলটা রাজার পাশেই মেঝেতে পড়ে আছে। বোঝা গেল, রাজাবাহাদুর নিজেরই হাতে নিজের উপর গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি পাকা শিকারী, হাতের টিপ তাঁর অব্যর্থ, গুলি একটুও এদিক-ওদিক হয়নি। ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। অ্যাটর্নি-সাহেব পুলিসের লোক ডাকিয়ে ময়না তদন্তের জন্যে তাদেরই হাতে লাশ সঁপে দিলেন। যথাকালে কোলকাতার করোনার-সাহেব রায় দিলেন, রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুর সজ্ঞানে ইচ্ছে করেই আত্মঘাতী হয়েছেন।

এর পর কৃষ্ণনাথের যাবতীয় সম্পত্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে দখল করে নেওয়া হল। রাজাবাহাদুর তাঁর ঐ উইলে তাঁর চাকর-বাকর ও অন্য সব আশ্রিতদের কিছু কিছু করে দিয়ে, স্বর্ণময়ীর জন্যে পনের শো টাকার মাসোহারার ব্যবস্থা করে বাকী সব সম্পত্তি গভর্নমেণ্টকে দিয়ে গেছেন, যাতে সরকার বাহাদুর ঐ সম্পত্তি থেকে বহরমপুরে কৃষ্ণনাথ ইউনিভার্সিটি বলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। রানী স্বর্ণময়ী তো আথান্তরে পড়ে গেলেন। রাজার পুত্র-সন্তান না থাকায় রানীই হলেন তাঁর ওয়ারিশ। কৃষ্ণনাথ লাখ-লাখ টাকার দেনাই রেখে গেছেন, ঘরে নগদ এক পয়সাও নেই। ক্রমশ অবস্থা একেবারে সঙিন হয়ে উঠল। একদিকে পাঁওনাদারদের দিনকের দিন তম্বিতম্বা, অন্য দিকে ঘোর অনটনের নিত্য টানাটানি। সৌভাগ্যক্রমে স্বর্ণময়ী এক অতি সৎ ব্যক্তিকে ম্যানেজারি করার জন্যে পেয়ে গিয়েছিলেন। লোকটি যেমনি কাজের, আবার ঠিক তেমনি বিশ্বাসী। নিজের যা-কিছু গহনাপত্র ছিল সে সব বিক্রিসিক্রি করে ম্যানেজারের তম্বিরে রানী স্বর্ণময়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে কৃষ্ণনাথের সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে সুপ্রীম কোর্টে এক মামলা দায়ের করে দিলেন। স্বর্ণময়ীর হাতে সামান্য যে স্ত্রীধন সম্পত্তি ছিল, তারই আয় থেকে তিনি কোনোক্রমে দিন গুজরান করতে লাগলেন।

তিন বছর ধরে একনাগাড়ে মামলা চলে অবশেষে একদিন ঐ মামলা খতম হল। ১৮৪৭ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে সুপ্রীম কোর্টের চিফ জাস্টিস সার লরেন্স পীল মামলার রায় দিলেন : রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের উইল বলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে যে কাগজ আদালতে দাখিল করা হয়েছে, সেটা রাজাবাহাদুর স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পাদন করেননি, অর্থাৎ তাঁর মাথা তখন এমন ঠিক ছিল না যে, তিনি সবদিক বুঝে-সুঝে কোনো উইল করতে পারেন। মামলার বিশদ বিবরণ আর সার লরেন্স পীলের রায়ের আগাগোড়া পুরনো ল-রিপোর্টে টোকা আছে। সেটা একবার পড়লেই জানা যায়, ওয়ারেণ্টের ভয়ে রাজাবাহাদুরের মনের অবস্থাটা তখন কি দারুণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল!

মামলা তো রানী জিতে গেলেন, কিন্তু মজা হয়েছিল আসলে এর ঠিক চোদ্দ বছর পর, ১৮৬১ সালে। সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বলে রানী স্বর্ণময়ী কৃষ্ণনাথের সমস্ত সম্পত্তি ফেরত পেয়েছেন, জমিদারীর আয় থেকে রাজাবাহাদুরের সমস্ত দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করেছেন, করে দানধ্যানও অনেক করেছেন, এমন কি ইউনিভার্সিটি না হোক, কৃষ্ণনাথের নামে একটা ফার্স্ট গ্রেড কলেজও বহরমপুরে স্থাপন করেছেন, এমন সময় রাজা লোকনাথের বিধবা রানী সুসারময়ী বেশ বুড়ো হয়েই মারা গেলেন। সুসারময়ী আর হরসুন্দরীর মাসোহারার দরুন যে-টাকা আদালতে জমা দেওয়া ছিল সে-টাকার খানিকটা, অর্থাৎ যতটা টাকার সুদে সুসারময়ীর আটশো টাকার মাসোহারার উপায় হত, ততটা টাকা আদালত থেকে ফেরত পাওয়ার জন্যে স্বর্ণময়ী সুপ্রীম কোর্টে এক দরখাস্ত দিলেন। তখন কোম্পানীর আমল গিয়ে মহারানী ভিকটোরিয়ার যুগ এসে গেছে। তাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বদলে মহারানীর তরফে বঙ্গদেশের অ্যাডভোকেট-জেনারেলের উপর নোটিস জারী হল। অ্যাডভোকেট-জেনারেল এসে আপত্তি তুললেন, ঐ টাকা রানী স্বর্ণময়ী পাবেন না, কারণ ওটা মহামান্য মহারানী ভিকটোরিয়ারই প্রাপ্য। প্রমাণের জন্যে তিনি এক বিলিতী আইনের নজির দেখালেন। শুধু তাই নয় ঐ আইনের বলে তিনি কৃষ্ণনাথের সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তিরই দাওয়া করে বসলেন।

বিলিতী একটা আইন আছে বটে, যার মতে আত্মঘাতীরা হচ্ছে খুনীদের সামিল। ক্রীশ্চানদের পবিত্র গোরস্থানে তাদের কবর হয় না, তাদের জমিজমা বাড়িঘরদের, সব স্থাবর সম্পত্তি তাদের উত্তরাধিকারীরা পেলেও তাদের অস্থাবর সম্পত্তি দেশের রাজার প্রাপ্য, হুজুর সরকারেই তা বাজেয়াপ্ত হয়। কোলকাতার সুপ্রীম কোর্টের চিফ জাস্টিস তখন সার বার্নস পিকক। তিনি রায় দিলেন : ঐরকম একটা কটমটে বিলিতী আইন যে আছে, সে-কথা তিনি স্বীকার করেন। কিন্তু এখানে কথা তা নয়, এখানে প্রশ্ন হল, সে-আইন মহারানীর হিন্দু প্রজাদের উপর প্রযোজ্য কি না? সুতরাং বিবেচনা করে দেখতে হবে, ঐ রকম কোনো আইন আগে হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কি না, কিংবা ঐ নিছক বিলিতী আইন অন্য কোনো আইনের বলে এ দেশে পরে চালু করানো হয়েছে কি না। হিন্দুদের মধ্যে ঐ রকম কোনো আইনের কথা তাঁদের কোনো শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না। আর যে দেশে সতীদাহ একটা ধর্ম, জগন্নাথদেবের রথের তলায় পড়ে প্রাণবিসর্জন করাটা একটা ধর্ম, ধরনা দিয়ে অনশনে প্রাণত্যাগ করাও এক ধর্ম, সেখানে আত্মহত্যা কিছুতেই বেআইনী হতে পারে না। আর, চার্টার, স্ট্যাটিউট, অ্যাক্ট প্রভৃতির দ্বারা অনেক রকমেরই বিলিতী আইন এদেশে আমদানী করা হয়েছে বটে, কিন্তু মান্যবর অ্যাডভোকেট-জেনারেল মহোদয় যে-আইনের নজির দেখালেন সে-রকম কোনো আইন এ দেশে কখনো প্রবর্তন করা হয়নি। তা ছাড়া, এ দেশে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে কোনোই প্রভেদ নেই। সুতরাং, এ দেশের লোকের সম্পত্তির উপরে বিলিতী উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা কোনোক্রমেই চালাতে পারা যায় না। সার বার্নস পিকক অ্যাডভোকেট-জেনারেলের আপত্তি নাকচ করে দিলেন। অনেক ভোগান্তির পর রানী স্বর্ণময়ী এবারও জিতে গেলেন।

মান্যবর অ্যাডভোকেট-জেনারেল সাহেব তবু কিন্তু ঐখানেই ক্ষান্ত দিলেন না। তিনি মামলা প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলেন। ১৮৬৩ সালে প্রিভি কাউন্সিল থেকে ঐ ফ্যাকড়ার চরম নিষ্পত্তি হল। প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যদের পক্ষ থেকে রায় দিলেন লর্ড কিংসডাউন। তিনি বললেন : না হিন্দুশাস্ত্রে, না ইণ্ডিয়ান পিনাল কোডে, কুত্রাপি আত্মঘাতীকে খুনীর পর্যায়ে ফেলা হয়নি, সুতরাং ঐ সম্পর্কে বিলিতী আইন ভারতবর্ষে দেশী প্রজাদের উপর কিছুতেই চালানো যায় না। কৃষ্ণনাথের যাবতীয় সম্পত্তি, কি স্থাবর আর কি অস্থাবর, সবই তাঁর ওয়ারিশন হিসাবে রানী স্বর্ণময়ীরই প্রাপ্য, তার কোনো অংশই মহামান্য মহারানী ভিকটোরিয়ার প্রাপ্তব্য নয়।

ঐ বিরাট সম্পত্তির আয় থেকে রানী স্বর্ণময়ী এক-এক করে বহু সৎকর্মেরই অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন, বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানে প্রচুর দানধ্যান করে গিয়েছেন। রাজা কৃষ্ণনাথের নাম বাঙালীদের কারো একজনের বড়ো-একটা এখন জানা নেই, কিন্তু রানী স্বর্ণময়ীর নাম এখনো বাঙালীর ঘরে-ঘরে চলেছে।

দ্বিতীয় শরীর

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গরমের ছুটির পর হেডমিস্ট্রেস সুধা সেনগুপ্ত যখন স্কুলে ফিরে এলেন, তখন তাঁর সিঁথিতে সিঁদুরের একটা সূক্ষ্ম রেখা—হাতের বালার সঙ্গে সাদা শাঁখা দেখা যাচ্ছে, রিস্ট্‌ওয়াচটাও নতুন। এসেই সই করলেন, সুধা মিত্র।

স্কুলে হৈ চৈ উঠল।

—একি কাণ্ড সুধাদি। আমরা জানতেও পেলুম না!

সুধা মিত্রের ফর্সা গাল রাঙা হল।

—রেজিস্টার্ড ম্যারেজ—হঠাৎ হয়ে গেল—কাউকেই তেমন খবর দেওয়া হয়নি।

স্কুলের সেক্রেটারি হেসে বললেন, অভিনন্দন। কিন্তু আমরা তো এম্‌নি ছাড়ব না। খাওয়াতে হবে।

—বেশ, কবে খাবেন বলুন।

—এখন নয়। মিস্টার মিত্র আসুন—জোড় মিলুক—তারপর।

আর একজন জুড়ে দিলেন তার সঙ্গে : দু'দিন খাওয়া আদায় করতে হবে—দুজনের কাছ থেকেই।

মাথা নামিয়ে সুধা মিত্র বললেন, বেশ, তাই হবে।

শুধু শ্যামলী সোমের মুখ থমথম করতে লাগল। এমনিতেই সে গম্ভীর, আরো গম্ভীর হয়ে বীজগণিতের পাতা উল্‌টে চলল।

সুধা সেনগুপ্ত আর শ্যামলী সোম একই কলেজের সহপাঠিনী। সুধা হৈ হৈ করতে ভালোবাসত, কলেজের ফাংশনে মণিপুরী নাচ নাচত, কলেজ স্পোর্টসেও যোগ দিত কখনো কখনো। হস্টেলের মেয়েদের লুকোনো খাবার খুঁজে বের করে নিঃশব্দে লোপাট করবার কাজে তার জুড়ি ছিল না। শ্যামলীর স্বভাব ছিল ঠিক উল্‌টো। একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্য তাকে ঘিরে থাকত সব সময়—হস্টেল আর স্কুলের মাঝখানে কৃষ্ণনগর নামে একটা সহরের অস্তিত্ব কোথাও আছে—একথা তার কোনোদিন মনে হয়নি—ঝুলন কিংবা বারদোলের মেলা, কিছুই তার ধ্যান ভাঙাতে পারেনি।

তবু আশ্চর্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল দু-জনের ভেতর। যেন বৈজ্ঞানিক নিয়ম—যেমন করে ধনাত্মক ঋণাত্মককে টানে। বি-এ পাশ করবার পর এল বিচ্ছেদ। বছর দুই পাতার পর পাতা শ্যামলীকে চিঠি লিখত সুধা—জবাব দিতে গিয়ে এক ঘণ্টা ধরে কলম কামড়ে আট লাইনের বেশি কথা জুটত না শ্যামলীর। তারপর যেমন হয়—জীবনের দুই দিগন্তে মিলিয়ে গেল দুজনে।

আরো চার বছর পরে এম-এ এম-এড্‌-হেডমিস্ট্রেস সুধা সেনগুপ্ত অ্যাপ্লিকেশনের ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে শ্যামলী সোম বি-এ বি-টির দরখাস্ত পেল। কলেজের নাম—বি-এ পাশের বছর—সন্দেহ মাত্র রইল না।

স্টেশনে নেমে শ্যামলী দেখল, প্ল্যাটফর্মে সুধা দাঁড়িয়ে।

—তুই এখানে?

—তোর জন্যেই তো।

—সত্যি?—আনন্দে শ্যামলীর চোখ জ্বলতে লাগল: তুইও বুঝি এই স্কুলে—

স্কুলের বেয়ারা এগিয়ে এল সেই সময়ে। বললে, বড়দি, জিনিসপত্রগুলো তা হলে—

—হাঁ, রিক্সায় তুলে দে। আমার কোয়ার্টারেই যাবে।

বড়দি! শ্যামলী যেন অভ্যাসেই দু-পা পিছিয় গেল: তুই—তুমি তবে—

হ্যাঁ ভাই, হেড্ মিস্ট্রেস। কী করব—বরাতের দোষ। তার জন্যে শুরুতেই তুই পর করে দিবি নাকি?

—না—না—মানে—শ্যামলী কথা খুঁজে পেলো না।

—আচ্ছা, পরে হবে ওসব। এখন তো বাড়ি চল্। আজ চার বছর ধরে কত কথা জমে আছে তোর সঙ্গে—সারারাত বকেও শেষ হবে না। আয়—আয়—

প্রায় টানতে টানতে শ্যামলীকে নিয়ে চলল রিক্শার দিকে।

সেই যে নিয়ে গেল, তারপর থেকে নিজের কাছেই রেখেছে। টীচার্স মেস্রে চলে যাওয়ার কথা দু-একবার তুলেছিল শ্যামলী, সুধা প্রায় তেড়ে এসেছে।

—কেন, এখানে কী অসুবিধেটা হচ্ছে শুনি?

—অসুবিধে আমার নয়। খামোকা তোর ওপর চড়াও হয়ে—

—চড়াও আবার কিসের? তিনটে ঘর রয়েছে আমার, কী কাজে লাগে শুনি? অন্য খরচা সবই তো দিচ্ছিস। মিথ্যে গণ্ডগোল করছিস কেন?—অভিমানে ছল ছল করে উঠল সুধার চোখ: একলা বাড়িতে থাকি—রাত্তিরে চোর-ডাকাত এসে যদি খুনও করে যায়—কেউ দেখবার নেই। আচ্ছা বেশ, ভালো না লাগলে চলে যা।

শ্যামলী হাসল: তোর কোয়ার্টারের লাগাও প্রেসিডেণ্টের বাড়ি—সামনে একশো গজ দূরে থানা।

—ডাকাত এসে গলা টিপে ধরলে কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না।

শ্যামলীও যে বিশেষ কিছু করতে পারবে তা নয়। আর ডাকাত যে এ বাড়িতে কখনো আসবে না এ-কথা শ্যামলীর চাইতে সুধা আরো বেশি করেই জানে। তবু চলে যাওয়া যায় না। সব কিছুর ওপর সুধার সেই ব্রহ্মাস্ত্র: কপাল দোষে হেডমিস্ট্রেস হয়েছি বলে তুইও যে আমায় এমনভাবে পর করে দিবি, এ আমি কোনোদিনই ভাবিনি।

শ্যামলীর আসল কাঁটাটা এখানেই। সাধারণ অ্যাসিসট্যাণ্ট টীচার হয়ে হেড-মিস্ট্রেসের বান্ধবীর ভূমিকা কেমন যেন লজ্জাকর মনে হয় তার। কলেজের দিনগুলো ছিল আলাদা—কিন্তু এখন! আর শ্যামলীর ওই দুর্বলতাটা জানা আছে বলেই সুধা বার বার এমনভাবে কথাটা তোলে যে, কাঁটাটার অস্তিত্ব প্রাণপণে গোপন করে যেতে হয় শ্যামলীকে।

তবু সাত আট মাসে অনেকখানি সহজ হয়ে এসেছিল। সুধা সেনগুপ্তের অসাধারণ পপুলারিটি এখানে—ছাত্রীরা শ্রদ্ধা করে, টীচারেরা ভালোবাসে, গভর্নিং বডি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে তাকে। তাই যেখানে সব চাইতে বেশি ভয় ছিল—অন্য টীচারদের ঈর্ষার উত্তাপ বিন্দুমাত্র টের পেতে হয়নি শ্যামলীকে।

কিন্তু এতদিন পরে আবার মেঘের ছায়া পড়েছে। সুধা সেনগুপ্ত নয়—সুধা মিত্র। সরু সিঁদুরের রেখা জ্বলছে সিঁথেয়। শুধু হেড্মিস্ট্রেস নয়—তাকে সয়ে গিয়েছিল—দুজনের মাঝখানে আর একজন এসে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে এখন। অন্য টীচারদের মতো, সেক্রেটারীর মতো শ্যামলীও খুশি হতে চেয়েছিল, বলতে চেয়েছিল 'হার্টি কন্গ্র্যাচুলেশন্‌স'—কিন্তু কিছুতেই বলতে পারল না। মনটা আশ্চর্যভাবে আড়ষ্ট আর সংকীর্ণ হয়ে উঠল তার।

সুধার ফিরতে দেরী হবে—স্কুল-কমিটির জরুরি মিটিং আছে আজকে। শ্যামলী একাই ফিরল। জামা-কাপড় বদলালো, গা ধুতে গিয়ে অনামনস্কভাবে চুল ভিজিয়ে ফেলল, তারপর ভেজা চুল মেলে দিয়ে নিজের ঘরটির জানলার পাশে বসে পড়ল তক্তপোশের ওপর। এই জানলায় বসে একটা নদী দেখা যায় কিছু দূরে—শিলাই, ভালো নাম শিলাবতী। দেখা যায় বালির চর—চোখে পড়ে খেয়াঘাটের একটুকরো খড়ের চালা। নদীর ওপারে বিকেলের লাল রঙ, সেই লালের নীচে কালো ছায়া পড়তে শুরু হয়েছে। কয়েকটি মানুষের বিন্দু, একপাল মোষ চলেছে—এখান থেকেও দেখা যায় পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে তাদের।

শ্যামলী চেয়ে রইল সেদিকেই। মনের মধ্যেও সন্ধ্যা নামছে তার।

সুধা বিয়ে করে এল, অথচ তাকে পর্যন্ত খবরটা দিল না একবার। একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারল না।

তার চেয়েও বড়ো কথা—রেজিস্টার্ড ম্যারেজ। তার মানে অনেকদিন আগে থেকেই জের চলছিল—ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটেনি। কিন্তু এই আট মাসের ভেতরে একদিনের জন্যেও সুধা মুখ খোলেনি তার কাছে। একবারও বলেনি, আরো একটা আড়াল তৈরী হয়েছে দু-জনের মাঝখানে।

ইচ্ছে করেই বলেনি হয়তো। আর শ্যামলী নিজেই তার কারণ।

মাস পাঁচেক আগের কথা। স্কুলের আর একজন টীচার বিয়ে করে রিজাইন দিয়ে চলে গেল।

সুধা বলেছিল, লীলার স্বামীকে দেখলুম ভাই। বেশ ছেলেটি। লীলা সুখী হবে।

শ্যামলী চুপ করে থেকেছিল কিছুক্ষণ। তারপর জবাব দিয়েছিল, না—সুখী হবে না—মরবে।

সুধা চমকে উঠেছিল: হঠাৎ এমন সিনিসিজম কেন রে? কেউ তোকে বিট্রে করেছে নাকি?

—না, সে দুর্ভাগ্য আমার হয়নি।

—একথা বলছিস কেন তবে?

—পুরুষ জাতটাকে জানি বলে। ওরা ওইরকম—লোভী, স্বার্থপর। মেয়েদের এক্স্‌প্লয়েট করা ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্য নেই ওদের।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারও দিন আসবে। অন্য কথা শুনতে পাব তখন।

—না, সে-রকম দিন কখনো আসবে না আমার।

বিদ্বেষটা আজকের নয়—ছেলেবেলা থেকে জমে উঠেছে চেতনার গভীরে গভীরে। সেই কৃষ্ণনগর শহরে তাদের পাশের বাড়ির ওভারশিয়ার ভদ্রলোক। প্রায়ই মাঝরাতে আকণ্ঠ মদ গিলে ফিরে আসত বে-পাড়া থেকে, তারপর স্ত্রীকে ধরে ঠ্যাঙানো। সেই যন্ত্রণার গোঙানি আর কদর্য চিৎকার রাতগুলোকে কী বীভৎসভাবে আবিল করে দিত! বৌটির মুখখানা এখনো মনে পড়ে—সাদা শঙ্খের মতো রক্তহীন মুখের রঙ—কঙ্কালসার হাতে দু-গাছা লাল কাচের চুড়ি, কুঁজো হয়ে কুয়োতলায় বসে এক পাঁজা বাসন মাজছে।

তারপর কলকাতায় বি-টি পড়বার সময়। সেই বিবাহিতা মেয়েটি পড়তে এসেছিল তাদের সঙ্গে।

—চাকরি করে সংসার চালাই ভাই, তবু চার পাঁচটা ছেলেমেয়ে। ওঁকে বলি, দোহাই তোমার—আমাকে দয়া করো, আর আমি পারি না। অনেক তো হল—এবার আমায় রেহাই দাও, আজকাল তো কত রকম অপারেশন-টপারেশন হয়েছে।

উনি বলেন, আমরা নৈহাটি-ভাটপাড়ার পণ্ডিত বংশ, এ-সব পাপ কথা মুখেও আনতে নেই।

ছেলেবেলার ঘৃণাটা আরো তীব্র হয়েছে, আরো ভালো করে শেকড় মেলেছে মনের ভেতর। সুধা সে ইতিহাস জানে না, কিন্তু শ্যামলীর মন বুঝতে পেরেছে সে। তাই হয়তো সমস্ত জিনিসটাই এমন করে তার কাছে লুকোতে হয়েছে সুধাকে। সেদিক থেকে সুধার ওপর রাগ করা যায় না। কিন্তু—

শিলাবতীর ওপর সন্ধ্যা নামল। মানুষ-গুলোকে চোখে পড়ে না আর। একটা আলো জ্বলে উঠল মিটমিট করে। খেয়াঘাটের আলো।

আলোটার দিকেই চেয়ে রইল শ্যামলী। ওই নদীটা পার হয়ে লোকগুলো কোথায়

যায়? বালির চর পেরিয়ে, মাঠ পেরিয়ে, কোথায় গ্রাম আছে—কত দূরে? চুলগুলো ভালো করে মোছা হয়নি, গায়ের ব্লাউজ অনেকখানি ভিজে গেছে, হঠাৎ শ্যামলীর শরীরে একটা শীতার্ত শিহরণ জাগল। মনে হল, কখন যেন তার শরীর থেকে আর একটা শরীর বেরিয়ে চলে গেছে, পার হয়ে গেছে শিলাই নদীর রাত্রির কালো জল, তারপর অন্ধকার বালির চর ছাড়িয়ে—বাতাসে শোঁ শোঁ করা বাবলা বনের ভেতর দিয়ে কোথায় একা এগিয়ে চলেছে সে। দিগন্তের শেষ সীমান্তেও একটি আলো নেই কোথাও—একটি গ্রামের চিহ্নও কোনোখানে চোখে পড়ে না।

শ্যামলী চমকে উঠল। আশ্চর্য—কেন এই অর্থহীন ভাবনা? এমন একটা অদ্ভুত চিন্তা কেন এল তার মনে?

ঘরে জুতোর শব্দ। একটা তীব্র আলোর জোয়ার। সুধা। সুইচটা টিপে দিয়েছে।

—কিরে, অমন করে অন্ধকারে যে?

—এমনিই। —শ্যামলী অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিতে চেষ্টা করল : এত তাড়াতাড়ি মিটিং হয়ে গেল আজ?

—কয়েকটা ফর্মাল ব্যাপার ছিল।—সুধা হঠাৎ বসে পড়ল শ্যামলীর পাশে, দু-হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল তার : খুব রাগ করেছিস আমার ওপর—না?

—রাগ করব কেন?

—বিয়ের কথা তোকে তো আগে বলিনি।—সুধা দ্বিধা করল একটু : সত্যি বলতে কি, অনেকবার বলবার জন্যে মুখ চুলবুল করে উঠেছে, কিন্তু সামলে নিয়েছি সঙ্গে সঙ্গেই। তোকে তো জানি। বলে বসবি—দাউ টু ব্রুটাস?

শ্যামলী জোর করে হাসল : আমাকে এতটা মারাত্মক ভাবলি কেন তুই? আমার নিজের মত যা-ই হোক, সেটা তোর ওপর কেন আমি চাপিয়ে দিতে চাইব?

—তাই তো নিয়ম ভাই। নিজের চোখ দিয়েই সবাই অন্যকে দেখে। তা হলে তুই রাগ করিসনি তো? আজ সকালে এসে পৌঁছোনোর পর থেকে তোর সামনে কী যে ভয়ে ভয়ে আছি—

—কী পাগলামি করছিস সুধা। কী করে বিয়ে হল তাই বল্।

সুধার বিয়ের ইতিহাসে একবিন্দু কৌতূহল ছিল না, তবু শ্যামলীর মনে হল, তার কাছে এই কথাটা শোনবার জন্যেই সুধা অপেক্ষা করে আছে। আর ঠিক তাই ঘটল। সুধা আর খাট ছেড়ে উঠল না, স্কুলের জামা-কাপড় ছাড়ল না, শ্যামলীর কতগুলো হোম টাস্কের খাতা ছিল—সেগুলো দেখতে দিল না তাকে; ঝি-কে দিয়ে বার-তিনেক চা আনাল, তারপর গলার স্বরে সুখ আর লজ্জা মিশিয়ে সমস্ত কাহিনীটা বলে যেতে লাগল।

আলাপ হয়েছিল ইউনিভার্সিটিতে। পাশ করবার পরেও সম্পর্ক মুছে গেল না, আরো ঘন হয়ে উঠল দিনের পর দিন। কিন্তু একটা রোজগারের সুরাহা না হলে ছেলেটির সাহসে কুলোয় না। ইকনমিকসে এম-এ, এতদিনে ব্যাংকে মোটামুটি ভালো চাকরি পেয়েছে একটা।

বাধা? ছিল বইকি। সুধার বাপ ভয়ংকর কনজারভেটিভ, কিছুতেই যাবেন না জাতের বাইরে! 'আজকের দিনেও কী মেণ্টালিটি ভেবে দ্যাখ্!' মা আপত্তি করেন নি, কিন্তু বাবার অমতেই সিভিল ম্যারেজটা সেরে নিতে হয়েছে ছুটির ভেতরে।

'লোকটাকে দেখলে তোর মায়া হবে শ্যামলী!' সুধার স্বরে সত্যিকারের সুধা ঝরে পড়ল : 'কী হোপ্‌লেসলি ছেলেমানুষ। মেসের চাকর নতুন জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে দেশে চলে গেল, চোখের সামনে দেখেও একটা কথা বলতে পারল না। তিন মাসের ভেতর দু-বার ট্রামে পকেট মেরে দিয়েছে। বন্ধুরা টাকা ধার নেয়, কেউ ফেরৎ

—কিরে, এমন করে অন্ধকারে যে?

দেয় না, অথচ মুখ ফুটে চাইতে পারে না কোনোদিন। বল্‌তো ভাই, আমি কী করি এই ভোলানাথকে নিয়ে?'

মাথার ভেতর কেমন একটা যন্ত্রণা হচ্ছে শ্যামলীর। দূরে নদীর দিকটা যেখানে অন্ধকারে কালো হয়ে গেছে, সেখান থেকে খেয়াঘাটের আলোটা যেন তার চোখে তীরের মতো বিঁধছে। অনেকক্ষণ তো হল, তবু কেন চুপ করতে পারে না সুধা?

ভদ্রতার খাতিরেই বলতে হল: সেই ভোলানাথকে তবু ফেলে চলে এলি?

—কী করব ভাই। এক বছর কষ্ট করতেই হবে। ওঁর চাকরিটা কন্‌ফার্ম না হলে কলকাতায় ফস করে একটা বাসা বাঁধা—বুঝিস তো? তবে চেষ্টা আমিও করছি। কলকাতার একটা স্কুলে যদি কিছু জোটাতে পারি, তা হলে আর অসুবিধে থাকে না।

অর্থাৎ, তৎক্ষণাৎ চলে যেতে পারে এখান থেকে। শ্যামলীকে অনায়াসে পেছনে ফেলে চলে যাবে, তার কথা মনেও পড়বে না একবার। অথচ, স্টেশনে নামবামাত্র তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'ভাই, তুই এখানে আসবি জেনে আনন্দে তিন রাত আমি ঘুমুতে পারিনি।'

ভিজে ব্লাউজটার ছোঁয়ায় আর একবার শিউরে উঠল শরীর। আর একবার মনে হল, নদীর ওপারে সেই অন্ধকার মাঠটার ভেতর দিয়ে, সেই রাত্রির হাওয়ায় শন্‌শনানি জাগা বাব্‌লা বনের ভূতুড়ে ছায়ার তলা দিয়ে তার আর একটা নিঃসঙ্গ শরীর কোথায় কতদূরে এগিয়ে চলেছে—সেই পথটার কোনো শেষ নেই, সেই অন্ধকারটার কোনো সীমা নেই কোথাও।

তবু আরো এক মাস ধরে ধীরে ধীরে সয়ে এল শ্যামলীর। সয়ে এল মোটা মোটা খামগুলো আসবার সঙ্গে সঙ্গে চোরের মতো সুধার ঘরের মধ্যে পালিয়ে যাওয়া, ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার পর তার চোখে একটা চঞ্চল আলো, ফর্সা গাল দুটিতে রক্তের ছোপ। শ্যামলীকে বার-বার কী বলতে গিয়েও অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেওয়া।

একটা তীব্র বিরক্তির জোয়ার আসে মনে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েস হল সুধার, একটা স্কুলের হেড্‌মিস্ট্রেস—অথচ চোখে-মুখে কিশোরীর মতো এমন ভাব ফুটে বেরোয় যে শ্যামলীর গা জ্বালা করতে থাকে। ন্যাকামো ছাড়া কী আর! আট-দশপাতা ধরে কী-ই বা লেখবার আছে চিঠিতে আর সে-চিঠি পড়বার পরে এমন ছটফট করবারই বা কী মানে হয়।

এই সময় টীচার্স মেসে চলে গেলে মন্দ হয় না। এখন শ্যামলীকে না হলেও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হবে না সুধার। সেই কথাটা বলবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল শ্যামলী, হঠাৎ জ্বরে পড়ল।

জ্বরটা সাংঘাতিক কিছু নয়—ইনফ্লুয়েঞ্জা। কিন্তু দারুণ দুর্বল করে ফেলল। সুধা বললে, কেন মিথ্যে স্কুলে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছিস? পড়ে থাক দিন চারেক।

তৃতীয় দিনে একা পড়ে থাকতে অসহ্য লাগল। বাইরে জ্বলন্ত দুপুর, শিলাবতীর দিকে ধুলোর ঘূর্ণি উঠেছে দেখা যায়। জ্বরটা সামান্য, মাথায় যন্ত্রণা রয়েছে, কিন্তু বিছানায় শুয়ে থাকতে জ্বালা করছে সারা শরীর। স্কুল থেকে গোটা কয়েক নতুন ইংরেজি বই এনেছে সুধা—তারই একটা এনে নাড়াচাড়া করা যাক।

শেলফ থেকে বইখানা বার করতেই ফিকে নীল রঙের খাম পড়ল একখানা। ছি ছি, কী অসাবধানী। এ-সব চিঠি কি এমন করে বাইরে রাখতে হয়! প্রায়ই তো অন্য টীচারেরা সুধার কাছে এ-ঘরে আসে, বইপত্রও নাড়াচাড়া করে, তাদের কারো হাতে যদি—

চিঠিসুদ্ধ বইখানা রেখে দিতে গিয়েও শ্যামলী থামল। সারা শরীরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার অস্বস্তি, মাথার মধ্যে যন্ত্রণা, বাইরের তীব্র রোদের একটা চাপা উত্তাপ এসে যেন ছড়িয়ে গেল তার জ্বালাধরা রক্তের ভেতর। শ্যামলী চেষ্টা করল, বার বার চেষ্টা করল, ঠোঁটের ওপর দাঁতের চাপ দিয়ে নিজেকে রক্তাক্ত করতে চাইল, তবু সে পারল না—কিছুতেই পারল না। খামখানা যখন খুলল, তখন তার হাত দুটো থর থর করে কাঁপছে।

এই রোদ—এই জ্বর—স্নায়ুর ভেতরে এই জ্বালা না থাকলে সব অন্যরকম হয়ে যেত। ওই খামখানা দেখবামাত্র শ্যামলী ছুটে পালাত এই ঘর থেকে। কিন্তু নেশার ঘোরে সে সেই আটপাতার চিঠিখানার সবটা পড়ে গেল। পড়তে পড়তে বার বার চোখ বুজে গেল, বার বার নিজেকে বলতে হল, আমি পড়ব না—পড়ব না—পড়ব না, তবু তিনবার পড়ে ফেলল চিঠিটা। তারপর হঠাৎ যেন নেশাটা ছুটে গেল তার, দৌড়ে পালিয়ে গেল নিজের ঘরে, বিছানায় উবুড় হয়ে পড়ে মাথার বালিশ ভিজিয়ে দিতে লাগল চোখের জলে। 'এ আমি কী করলুম—এ কী অধঃপতন হল আমার।'

বিকেলে যখন সুধা ফিরল, তখন তার দিকে চাইতে পর্যন্ত পারল না শ্যামলী। নিজের অপরাধের ভারে যেন লুকোবার জায়গা পর্যন্ত খুঁজে পেলো না কোথাও।

—কি রে, মুখ ঢেকে শুয়ে আছিস কেন অমন করে? সুধা ভয় পেয়ে বললে জ্বর বাড়ল নাকি? আমাদের ডাক্তারবাবুকে খবর দেব? ডাক্তারবাবু খানিকটা ঘরের লোক। স্কুলে হাইজিন পড়ান।

—না, জ্বর বাড়েনি। এমনি শুয়ে আছি।

—তবে অমন করে চাদরচাপা দিয়েছিস কেন? মুখ খোল্—মুখ খোল্। কাউকে অমনভাবে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকতে দেখলে বাপু আমার দারুণ ভয় করে।

—আমাকে একটু ঘুমুতে দে সুধা।

—আচ্ছা, ঘুমো তবে।

একটা কুৎসিত আত্মগ্লানি[illegible] দিয়ে বিকেল কাটল, সন্ধ্যা কাটল, যন্ত্রণাভরা ছাড়া-ছাড়া ঘুমের ভেতর দিয়ে রাত কাটল। সারা সকাল ধরে জোর করেই টীচার্স মেসে চলে যাওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী করল শ্যামলী। তারও পরে সাড়ে দশটায় স্কুলে বেরিয়ে গেল সুধা, শ্যামলীকে খাইয়ে দিয়ে ঝি তার ভাত নিয়ে বাড়ি চলে গেল, আর ধীরে ধীরে হেড্‌মিস্ট্রেসের কোয়ার্টারের ওপর নির্জন দুপুর নামল। শিলাইয়ের জল আর বালির চর জ্বলতে লাগল রোদে, হাওয়ায় একটা মাদক উত্তাপ আসতে লাগল। জ্বর ছিল না তবু জ্বরের যন্ত্রণা শরীরের প্রতিটি রক্তবিন্দুকে বিদ্ধ করতে লাগল, আর মাথার ভেতরে ধীরে ধীরে সব বিশৃঙ্খল হয়ে যেতে লাগল শ্যামলীর।

সুধার ঘরটা তাকে টানছে। আগুন যেমন করে টানে পতঙ্গকে। যেমন করে পাহাড়ের খাড়াই টানে অতলের দিকে। বার বার বিছানা ছেড়ে উঠল শ্যামলী, বারে বারে বসে পড়ল। তারপর বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা কথা জেগে উঠল মনে। কেন এত সংকোচ? কিসের তার দ্বিধা?

চিরকাল বান্ধবীরা এ-ওর চিঠি দেখে—দেখায়। নিজেদের ভেতর কোনো লজ্জার আড়াল রাখে না তারা। এ ছবি সে তো নিজেদের বাড়িতেই দেখেছে, তাদের হস্টেলের দুটি বিবাহিতা মেয়ের কথাও সে ভোলেনি!

বিদ্যুৎ নয়, যেন তলোয়ার ঝলকে গেল একখানা। সমস্ত দ্বিধাকে দু'টুকরো করে দিয়ে গেল। সে-চিঠি দেখেছে জানলে সুধা রাগ করবে না, বরং তার কাছ থেকে একটু প্রশ্রয় পেলে নিজেই দেখিয়ে যেত এর আগে।

শ্যামলী উঠে দাঁড়ালো। এবার আর পা কাঁপল না, মন টলল না।

না—বইয়ের ভেতরে আর চিঠি নেই।

তীব্র উত্তেজনা আর নৈরাশ্যে শ্যামলীর মনে আগুন জ্বলতে লাগল। আকণ্ঠ পিপাসার সামনে কে যেন জলের পাত্রটা সরিয়ে নিয়েছে এমনি মনে হল তার। অসহ্য অন্তর্জ্বালায় দাঁতে দাঁত চাপল সে। বাক্সের ভেতরে চিঠি লুকিয়ে রেখেছে সুধা? তার কাছে যে চাবির রিং আছে, তাই দিয়ে চেষ্টা করে দেখবে নাকি একবার?

কিন্তু তার আগে—আশ্চর্য নির্ভুল অনুমান! বিছানার তোষকের নীচেই পাওয়া গেল। আরো চারখানা।

সব ক'টাই একদিনে পড়বে? কিছু রাখবে না ভবিষ্যতের জন্যে?

কিন্তু আবার কবে সময় হবে কে জানে। সহজে কি সুযোগ পাওয়া যাবে আর? কাল তার স্কুলে জয়েন করতে হবে। জ্বালাই।

ফেলে রাখা চলবে না।

তা ছাড়া আরো চিঠি তো আসবে সুধার। আর প্রায়ই শনি-রবিবারে স্কুলের পরে রাত সাত-আটটা পর্যন্ত তার কমিটি মিটিং থাকে।

শ্যামলী খাম খুলতে লাগল। একখানার পর একখানা।

দিন বয়ে চলল। আকাশ ছেয়ে বর্ষার কালো মেঘ এল, শিলাইয়ের সাদা জল গেরুয়া রং ধরে বালুচর ছাপিয়ে বয়ে গেল, খেয়াঘাটের চালাটাকে কোন্‌দিকে সরিয়ে নিলে কে জানে। স্কুলে মাঝে মাঝে রেনি-ডে হতে লাগল আর চায়ের সঙ্গে গরম ফুলুরির ফরমাশ দিয়ে শ্যামলীকে উজ্জ্বল চোখে বার বার কী বলতে গিয়েও সামলে নিতে হল সুধাকে। শেষ পর্যন্ত :

—দিনটা বেশ, না রে শ্যামলী?

—হুঁ, ছুটি পাওয়া গেল।

—ধেৎ, ছুটির জন্যে নয়। অঙ্ক কষে কষে একেবারে প্রোজেইক হয়ে গেছিস তুই।—সুধা গুনে গুনে করতে লাগল :

'শাওন আয়ি সখি কাহারে নাগরিয়া
দিমিকি দিমিকি দিমি বোলত গগন রে—'

শ্যামলী বিষাদ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ঠিক বুঝতে পারে না আজকাল কেন তার সুধাকে এত খারাপ লাগে মধ্যে মধ্যে। মনে হয় সুধা বড় বেশি তরল, বড় বেশি অগভীর। এত চঞ্চল, এমন ছটফটে মন নিয়ে সত্যিই কি সে ভালোবাসতে পারে কাউকে? কলকাতা থেকে যে নির্বোধ মানুষটা মৃদু সুগন্ধি জড়ানো ফিকে নীল চিঠির কাগজে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় আট-দশপাতা করে প্রেমের উচ্ছ্বাস তাকে পাঠায়, সেই চিঠিগুলো সম্পূর্ণ বোঝবার মতো মন কি সুধার আছে?

'মত্ত মোর রোয়ে—রোয়ে-রে দাদুরিয়া—'

কী ভেবে গান বন্ধ করল সুধা। চেয়ে দেখল শ্যামলীর দিকে।

—এই, তোর হয়েছে কী বলতো? দিনের পর দিন যে আরো বেশি করে মাস্টারনি হয়ে যাচ্ছিস।

—মাস্টারি করতে গেলে মাস্টারনিই তো হওয়া দরকার।

—মোটেই না। তা হলে তো কোর্ট থেকে ফিরে উকিলকে স্ত্রীর সঙ্গে মামলা করতে হয়। একটা আলাদা জীবন থাকবে না তার?

—সকলের থাকে না। আমি দুটোকে একসঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি।

বলেই থমকে গেল শ্যামলী। মিথ্যে কথা বলেছে সুধার কাছে। যেদিন থেকেই চিঠি চুরি করে পড়া শুরু করেছে, সেদিন থেকেই আর একটা জীবন আরম্ভ হয়েছে তার। শ্যামলীর মুখ লাল হয়ে উঠল। মিথ্যের লজ্জায় মুহূর্তে নিজের কাছে কুঁকড়ে গেল সে।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল সুধা, তার আগেই গেটের সামনে তালিমারা ছাতা দেখা দিল একটা। তারপর গেট খুলে, ছোট লনটির ঘাসের ভেতর থই-থই জলে রবারের জুতো ছপ ছপ করতে করতে হলদে পোশাক আর হলদে ব্যাগ নিয়ে দেখা দিল ডাকপিয়ন।

সুধা এক লাফে উঠে দাঁড়াল; হৃৎপিণ্ড দুলে উঠল শ্যামলীর—ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল কানের ভেতর। এই প্রথম নয়। আজ তিন সপ্তাহ ধরে পিয়ন আসবার সময় হলেই এমনি করে রক্তে তার ঢেউ ওঠে, এমনি করেই বুকের ভেতরে ঝড় দেখা দেয় তার। সুধার মতোই সে-ও ঠিক জানে কবে সেই মোটা খামখানা আসবে, মৃদু-সুরভিত নীল চিঠির কাগজে পাতার পর পাতা জুড়ে মুক্তোর মতো হরফে লেখা থাকবে একটি আকুল মানুষের উচ্ছ্বাস। ইকনমিকসের এম-এ ব্যাংকে চাকরি করে—কী করে লেখে এত ভালো ভালো কথা, কোথায় পায় এত সব?

শ্যামলী জ্বলন্ত চোখে চেয়ে রইল। চিঠিটা পেয়েছে সুধা। চা-টা একটুখানি খেয়েছিল, সেটা সেইভাবেই পড়ে রইল, চিঠি নিয়ে চলে গেল নিজের ঘরে।

আর বসে রইল শ্যামলী। চিঠিটা সুধাকেই লেখা—সুধাই আগে পড়বে সেইটেই স্বাভাবিক; কিন্তু কিছুতেই মনের জ্বালাটাকে শান্ত করতে পারল না। সুধা তরল, কখনো গভীর হতে পারে না—কৌতুক আর চঞ্চলতায় চোখ দুটো তার ছল ছল করছে সব সময়ে। এই চিঠিটাকে সম্পূর্ণ বোঝবার মতো মন আছে তার—হৃদয় আছে? দূরের কলকাতা থেকে একটি নিঃসঙ্গ বিরহী মানুষের কান্না কি তার
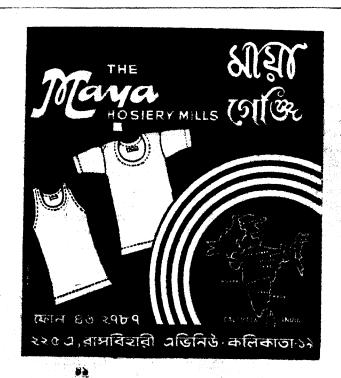
মনের কাছে কখনো পৌঁছায়? এইসব চিঠি পড়বার পর কোনোদিন তো সে দেখেনি সুধা ঘুমভাঙা রাত কাটাচ্ছে জানলার ধারে, কোনোদিন চোখে পড়েনি মাঝ রাতে জ্যোৎস্নার আলোয় সে পায়চারী করছে বাইরের লনের ভেতর। রাত এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত সে একটানা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, ঘুম ভাঙলে শোনা যায় গানের গুনগুনোনি, তারও পরে কানে আসে তার উজ্জ্বল গলার ডাক : এই—আয়—আয়—চা-টা জুড়িয়ে গেল যে।

সুধার কাছে চিঠি পাওয়াটা শুধু অভ্যাস। যেমন অভ্যাস তার স্কুলের রুটিন, তার গভর্নিং বডির মিটিং।

প্রথম প্রথম শ্যামলী নিজেকে জিজ্ঞেস করত : সুধা যা খুশি করুক—সে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তা নিয়ে তোমার এত দুর্ভাবনা কেন? কিন্তু ভাবনাটাকে কোনো মতেই সরিয়ে দেওয়া যায় না বলেই শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে জবাবদিহির দায় সম্পূর্ণ মিটিয়ে দিয়েছে সে। এখন মধ্যে মধ্যে সুধাকে তার খারাপ লাগে, অসম্ভব খারাপ লাগে। দূরের মানুষটিকে কোনোদিন সামনে পেলে শ্যামলী সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসত : এমন করে তুমি কেন লেখো ওকে—ওকি তোমার কথা বুঝতে পারে কখনো?

সুধা ছুটে এল ঘর থেকে।

- শ্যামলী --শ্যামলী।

শ্যামলী চোখ তুলল।

—দারুণ খবর আছে ভাই। ও আসছে।

হৃৎপিণ্ডে আবার ঝড়ের মাতন উঠল। শ্যামলী কথা বলতে পারল না।

—পরশু এসে পড়বে। বিকেলের ট্রেনে।—খুশিতে সুধা ঝলমল করতে লাগল : ছুটি নিয়েছে দুদিন। আমাকেও ছুটি নিতে হবে শনিবারটা আর রবিবারের মিটিংটাও—

শেষ পর্যন্ত শ্যামলীর কানে গেল না। উঠে দাঁড়ালো।

—তা হলে আমি টীচার্স মেসে—

—টীচার্স মেসে কেন?

—তোর স্বামী আসছেন। আমি আর এখানে—

—বাজে বকিসনি। তিনটে ঘর রয়েছে, তুই থাকলে অসুবিধে কিসের? বরং—সুধা অভ্যাসমতো এসে শ্যামলীর গলা জড়িয়ে ধরল : তুই থাকলে আমার পতি দেবতাটিকে দুটো একটা রান্না করে খাওয়ানো যাবে। আমাকে তো জানিস—ডাল, আলু সেদ্ধ আর কোনোমতে একটা মাছের ঝোল ছাড়া আর কিছু আমি রাঁধতে জানি না।

পতিদেবতা কথাটা অদ্ভুত রকমের কুশ্রী ঠেকল কানে। আর গলার পাশে সুধার হাতটা যেন সাপের পাকের মতো মনে হল, ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও শ্যামলী পারল না।

সুধা স্টেশনে গেছে। চাইতে হয়নি, ভালোমানুষ সেক্রেটারী উপযাচক হয়েই পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজের গাড়ীটা। বলেছেন, মিস্টার মিত্র স্টেশন থেকে রিক্সা করে আসবেন তাতে কি আমাদের সম্মান থাকে!

শ্যামলী বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। সুধার কথা সে জানে না—কিন্তু আজ দুটো দিন কীভাবে যে তার কেটেছে! কৌতূহল? নিশ্চয় কৌতূহল। এমন করে যে চিঠি লিখতে পারে—কেমন দেখতে সে মানুষটি? সুধার কাছ থেকে তার কোনো বিবরণ সে শোনেনি, সে-ই প্রশ্রয় দেয়নি সুধাকে। কিন্তু শ্যামলীর মনের সামনে একটা চেহারা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল, গায়ের রঙ ফর্সা নয়—খানিকটা স্নিগ্ধ-শ্যামল। একটা শান্ত ভীরুতা আছে চরিত্রে—যতই আট পাতা ধরে চিঠি লিখুক, স্বভাবে স্বল্প-ভাষী, একটুখানি লাজুক হাসিতেই অর্ধেক কথার জবাব দেয় সে।

সুধার সঙ্গে তার মেলে না—একেবারেই না। অথচ—

বেলা পড়ে আসছে—অবসন্ন বিকেল কালো হয়ে উঠছে লনের ঘাসের ওপর। হাতের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখল শ্যামলী। অন্তত আধ ঘণ্টা আগে ট্রেনটা এসে গেছে স্টেশনে। এত দেরী করছে কেন তবু ও?

মোটরের আওয়াজ কানে এল তখন।

একটা অর্থহীন ভয় আর লজ্জায় শ্যামলীর মনে হল, ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যায় সে। কিন্তু গেল না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল।

গাড়ীটা এসে দাঁড়াল গেটের সামনে। সুধা নেমে এল—একাই। মুখ ভার হয়ে আছে তার।

শ্যামলীর পাশে এসে ক্লান্ত বিমর্ষ গলায় বললে, এল না রে। ট্রেন চলে যাওয়ার পরে ফিরে আসছি, পথে পিয়ন একটা টেলিগ্রাম দিলে। কী কতগুলো জরুরি কাজে ব্যাঙ্ক ওকে আটকে দিয়েছে লাস্ট মোমেণ্টে। নেক্সট উইকে আসতে পারে হয়তো।

রেলিং চেপে ধরে শ্যামলী দাঁড়িয়ে রইল। একটা দুর্বোধ যন্ত্রণায় দুটো চোখ যেন তার বন্ধ হয়ে আসছে। কিসের ঘোরে সে এমন করে কাটালো দুটো দিন? সব মিথ্যে—সব নিরর্থক হয়ে গেছে। বিকেলের ছায়ার ওপর কোথা থেকে আছড়ে পড়েছে জমাট কালো একটা অন্ধকারের পিণ্ড—আকার-হীন একটা জন্তুর মতো সেটা গড়িয়ে আসছে শ্যামলীর দিকেই!

একটা নিশ্বাস ফেলে সুধা বললে, কী হোপ্‌লেস লোক। রাগ করে চিঠির জবাব দেব না—তা হলেই পত্র পাঠে না ছুটে আসছে। মাঝখান থেকে তুই-ই খেটে মরলি, এত রকম খাবার তৈরী করলি ওর জন্যে। মরুক গে—ওর বরাতে আছে বোর্ডিংয়ের ডাঁটাচচ্চড়ি, বসে বসে তা-ই চিবোক, ওগুলো আমরাই শেষ করে দেব।

বলতে বলতে সুধার চোখ পড়ল শ্যামলীর দিকে। যেন এতক্ষণে নজর পড়ল তার। আর তৎক্ষণাৎ নিজের দুঃখ ভুলে গিয়ে তার স্বাভাবিক কৌতুকে সে উছলে উঠল।

—আরে—আরে, তুই যে আজ দারুণ সেজেছিস। এর আগে তো এমন কোনো-দিন দেখিনি। তুই যে কখনো সেণ্ট মাখতে পারিস এ তো আমার স্বপ্নেও জানা ছিল না।—সুধা খিল খিল করে হেসে উঠল : মনে হচ্ছে, আমার নয়—তোরই বর আসছে আজকে।

আর বলেই সুধা স্তব্ধ হয়ে গেল। সাদা হয়ে গেছে শ্যামলীর মুখ—তাকানো যাচ্ছে না তার দিকে!

তৎক্ষণাৎ অনুতাপে মরমে মরে গেল সুধা।

—রাগ করিসনি ভাই, ঠাট্টা করছিলুম। জানি এ সব ঠাট্টা তোর একেবারে ভালো লাগে না, কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে—আমাকে মাপ কর ভাই শ্যামলী—

কিন্তু ততক্ষণে দড়াম করে শ্যামলীর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। আর বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে শ্যামলী—ক্লান্ত জন্তুর মতো নিশ্বাস ফেলছে ঘন ঘন, যেন প্রাণপণ শক্তিতে বাইরের পৃথিবী থেকে নিজেকে বাঁচাতে [illegible] সে। এক মুহূর্তে সে যেন নগ্ন হয়ে গেছে। সুধার কাছে—পৃথিবীর কাছে—নিজের কাছে। সুধার একটিমাত্র কথায় সমস্ত আবরণ উড়ে সরে গেছে তার, ভেতরকার সেই সর্বনাশা ভাঙনটার দিকে পলকহীন আগুন-ঝরা চোখে চেয়ে রইল সে।

সুধার ফিরতে রাত হল। নিরাশ বিষন্ন মনটাকে খানিক সহজ করবার জন্যে সে টীচার্স মেসে আড্ডা দিতে গিয়েছিল।

বাড়ী ফিরতেই ঝি একটা চিঠি দিলে।

শ্যামলীর চিঠি। জরুরি একটা কাজে সন্ধ্যার ট্রেনেই তাকে যেতে হচ্ছে কলকাতায়। সেই সঙ্গে একখানা এক মাসের ছুটির দরখাস্ত। উইদাউট পে হলেও ক্ষতি নেই!

সমস্ত জিনিসটার একটা অর্থ নিজের মতো অনুমান করে নিয়ে যখন অনুতাপে সুধা নিথর হয়ে বসে আছে, তখন অন্ধকার কালো মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটেছে ট্রেনটা। সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে একটা আকার-হীন তমসা-পিণ্ডের মতো কী যেন গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে আসছে শ্যামলীর দিকে, আর কয়লার গুঁড়োয় আচ্ছন্ন অপলক চোখের দৃষ্টি মেলে রেখে শ্যামলী যেন একটু একটু বুঝতে পারছে, কেন তার দ্বিতীয় শরীরটা শিলাবতী পার হয়ে বাঁধের সেই পথটা ধরে এগিয়ে চলেছিল—যে-পথের কোনো শেষ নেই, যে-পথ কোনোদিন তাকে কোথাও নিয়ে যাবে না।

ঘুষঘাস

শিবরাম চক্রবর্তী

ভদ্রলোক পুরু কাঁচের দরজা ঠেলে শো-রুমে ঢুকলেন। বিরাট শো-রুম।
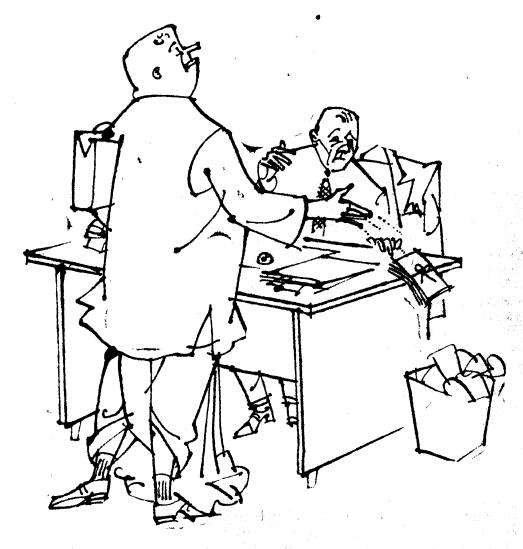
দোরগোড়ার ঝকমকে পাপোষে জুতোর তলা মুছে এগিয়ে গেলেন ভেতরে। শো-রুমের একধারে টেবিল চেয়ার নিয়ে ম্যানেজার বসেছিলেন, এগিয়ে গেলেন তাঁর কাছে।

'আমার নাম ইন্দ্রনীল রায়।' বললেন তিনি : 'পাঁচ বছর আগে আপনাদের কোম্পানিতে আমার মোটরের অর্ডার দিয়েছিলাম। কবে গাড়িটার ডেলিভারি আশা করতে পারি দয়া করে যদি জানান......'

'কোন মডেলের?' জানতে চাইল ম্যানেজার।

রাস্তার ধারের কাঁচের জানালার কাছে প্রবাল রঙের যে গাড়িটা ছিল, তার দিকে আঙুল বাড়িয়ে ইন্দ্রনীল বললেন, 'ঐটে'।

ম্যানেজার ডেস্কের ওপরে যে অর্ডার বইটা পড়েছিল সেটা খুলে দেখলেন :

'পাঁচ বছর আগে অর্ডার দিয়েছেন বলছেন? ইন্দ্রনীল রায় সদানন্দ রোড...?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সদানন্দ রোডের ইন্দ্রনীল রায়... আমিই দিয়েছিলাম অর্ডার......'

'হুম্।...আজকাল গাড়ি একদম আসতে পাচ্ছে না। ভারত সরকারের আমদানি-রীতির কি রকম কড়াকড়ি জানেন তো! ঐ গাড়িটা সবে আমরা পেয়েছি...সাত বছর আগে এক ভদ্রমহিলা অর্ডার দিয়েছিলেন, আগামীকাল তাঁকে ডেলিভারি দিতে হবে গাড়িটা...খুব দুঃখিত আমরা...কোন উপায় নেই। আপনাকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই ধরুন, পাঁচ মাস কি ছ' মাস।'

'এখনও পাঁচ ছ মাস?' ক্ষুব্ধ নিশ্বাস পড়ল ইন্দ্রনীলের।—'তাহলে পাবার আর কোন আশাই নেই ধরতে হবে।'

'না না, সেকথা কেন বলছেন! সবাইকেই তো আমরা ডেলিভারি দিচ্ছি। যেমন যেমন অর্ডার বুক করা রয়েছে, আর যেমন যেমনটি পাচ্ছি, যোগান দিচ্ছি আমরা। খদ্দেরদের সন্তুষ্টিবিধানের কোন ত্রুটি নেই আমাদের। এর পরের জাহাজে ঐ মডেলের যে-গাড়িগুলি আসবে, তার একটি আপনার...?'

'আর এসেছে!' ভগ্ন কণ্ঠে ধ্বনিত হল তাঁর : 'নতুন মডেলের অমন গাড়ি আমার বরাতে নেই বুঝছি! ভেবেছিলাম এই পুজোর ঐ গাড়িতে করে বৌকে নিয়ে কাশ্মীরে বেড়াতে যাব...কলকাতা থেকে

সোজা শ্রীনগর। সেইজন্যে এতদিন ধরে এক্‌স্‌ট্রা কিছু টাকাও জমিয়েছিলাম। কিন্তু কী হবে আর সেই টাকায়?......'

বলে নিজের অ্যাটাচীকেসের মুখ খুলে থাক-বাঁধা এক গোছা একশ টাকার নোট তিনি বার করলেন—'কী হবে আর এই টাকায়! বলুন! এ জন্মে আর কাশ্মীর যাওয়া হবে না আমাদের! চুলোয় যাকগে...

বলে নোটের গোছাটা টেবিলের তলার বাজে কাগজের ঝুড়িতে একান্ত অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ইন্দ্রনীল।

দিয়ে পাপোষে পা ঘষে বেরিয়ে গেলেন শো-রুমের থেকে।

বাড়ি ফিরে সোফায় গা এলিয়ে বসেছেন কি না, টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।

'হ্যালো...'

'আপনি কি মিস্টার রায়? ইন্দ্রনীলবাবু কি আপনি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই। বলুন।'

'মোটর কোম্পানি থেকে ফোন করছি আমি।...একটু আগে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছিল আমাদের শো-রুমে...'

'হ্যাঁ, আমিই গেছলাম একটু আগে...'

'হ্যাঁ, দেখুন। এক্ষুনি আমরা সেই মহিলাটিকে ফোন করেছিলাম......যাঁকে কাল ঐ গাড়িটা ডেলিভারি দেবার কথা। তা তিনি বললেন, আরো পাঁচ ছমাস তিনি অনায়াসে অপেক্ষা করতে পারবেন...এমন কিছু তাঁর তাড়া নেই। তাছাড়া আপনার সপরিবারে মোটরে কাশ্মীর যাবার কথাও বলেছিলাম তাঁকে। তা তিনি গাড়িটা ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। তা, আপনি কি গাড়িটা এখন নিতে চান?'

'এক্ষুনি।'

'তাহলে চেক বই নিয়ে চলে আসুন এই দণ্ডে। আমি এধারে কাগজপত্র সব ঠিক করে রাখছি।'

'ধন্যবাদ...ধন্যবাদ!' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ইন্দ্রনীল।

চেক বই নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ইন্দ্রনীল মুহূর্ত বিলম্ব না করে। আধঘণ্টার মধ্যেই লেনদেন চুকে গেল। গাড়ির দাম ষোলো হাজার পাঁচশো প্লাস সেলট্যাক্স দিয়ে দশ পয়সার রেভিনিউ স্টাম্পে রসিদ বুঝে নিলেন তিনি।

তারপরেই গাড়ি নিয়ে ময়দানে কয়েক পাক খেয়ে বাড়ির দিকে পাড়ি দিলেন ইন্দ্রনীল।

আহা! এই গাড়িটার ওপর লোভ তাঁর কতদিনের? শোরুমের পাশ দিয়ে যেতে যেতে এর দিকে তাকিয়ে কতবার না তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, ঘুষি মেরে ম্যানেজারের নাক ভেঙে দিয়ে গাড়ি নিয়ে সরে পড়েন। উধাও হয়ে যান গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে সোজা।

কিন্তু, ঘুষি দিতে হল না। সামান্য কয়েক হাজারের ঘুষ দিয়েই কার্যোদ্ধার হয়ে গেল।

ঘুষঘাসে কাজ হাসিল হয় জানে সবাই। কিন্তু মনে করুন, ঘুষের বদলে খালি ঘাস দিয়ে এই কালোবাজারেও কি কোন গোরুকে খুসি করা যায়? হাসি পায় ইন্দ্রনীলের। না, তাঁকে ঘুষি দিতে হয়নি।

ঘুষ? হ্যাঁ, ঘুষ দিতে হয়েছে বটে। কিন্তু তা না দিয়ে উপায় কি—এই বাজারের এখনকার যা দস্তুর।

বাড়ি ফিরে বৌকে নিয়ে লেকের ধারে কয়েক চক্কর ঘুরলেন আবার।

আহা, এমন গাড়িতে এই পুজোয় তাঁরা দুজনে সারা ভারত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবেন, দেখে দেখে চেখে চেখে চলে যাবেন—ভূভারত পেরিয়ে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে......

স্বপ্ন দেখলেন দুজনে।

পরদিন বিকেলে আপিস থেকে ফিরে জামা কাপড় ছাড়েননি তখনো, টেলিফোন বেজে উঠল......

'হ্যালো......'

'আপনি কি ইন্দ্রনীলবাবু'

'হ্যাঁ বলুন।'

'আমি এর আগে দুবার ফোন করেছি আপনাকে......'

'আমি বাড়ি ছিলাম না। আপিস থেকে আসছি এই মাত্তর।'

'দেখুন, আমি সেই মোটরকার কোম্পানির থেকে বলছি......'

'চমৎকার মোটর মশাই আপনাদের! এমন গাড়ি আর হয় না......'

'কিন্তু দেখুন, একটু ভুল হয়ে গেছে...'

'না, ভুল কিসের! আমার চেক ক্যাশ হয়েছে খবর নিয়েছি ব্যাঙ্ক থেকে। আপনাদের রসিদেও কোন ভুল নেই। আপনাদের কোম্পানির রীতিমতন স্ট্যাম্প-মারা রসিদ রয়েছে আমার কাছে......'

'না না, সেকথা নয়। সেকথা বলছি না। আপনি কাল যে নোটের গোছা ফেলে গেছলেন এখানে......'

'হ্যাঁ বলুন।'

'সেগুলো বাজারে চলছে না......নিতে চাইছে না কেউ...।

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কেও পাঠিয়েছিলাম। নোটগুলো। তারা জানিয়েছে যে, এগুলো ইংরেজ আমলের নোট, অনেক আগেই ভাঙিয়ে নেওয়া উচিত ছিল, তার তারিখ কবে তামাদি হয়ে গেছে...এখন আর ও নোট চলবে না।'

'চলবে না ঠিকই।' বললেন ইন্দ্রনীল। 'ঠিকই বলেছে ব্যাঙ্ক।'

'কোন কাজেরই নয় ওগুলো।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠ গুঞ্জন করে উঠল টেলিফোনের ওধারে। কিন্তু ইন্দ্রনীল একটুও দুঃখিত নন। কালো বাজারের কালোরাতের ওপর কালো টেক্কা মারতে পারায় তাকে বরং একটু খুসিই বোধ হয়। সোনার বদলে পিতলটি চালানোর জন্য মোটেই তাঁর কোন গিলটি কন্‌শেন্স নেই।

'জানি তো। তাই তো আমি বাজে কাগজের ঝুড়িতেই ওগুলো ফেলে দিয়ে এসেছিলাম। আচ্ছা...নমস্কার!'

নেপথ্যলোক

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

লেটারবক্সটা খুলে দেখেছিস? সকালের ডাকে চিঠিপত্র কি কিছু এল?'

বেলা সাড়েআটটায় বিছানা ছেড়েছেন নীলাম্বর। তবু যেন দেহের জড়তা কাটতে চায় না। বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারে ফের শরীর এলিয়ে দিয়েছেন। খবর পড়বেন বলে কাগজখানা তুলে নিয়েছেন। তাতে মুখ আর বুক দুইই ঢাকা পড়েছে। হাঁটুর নিচ থেকে পা দুখানি শুধু দেখা যায়। রং ভারি সুন্দর। মাজা গৌর বর্ণ। গড়নে কোথাও কোন খুঁৎ ধরেনি। বিশেষ করে পাতা দুটি ভারি সুন্দর। দুখানি পা জুড়ে রাখলে মনে হয় সত্যিই যেন একটি ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের আধখানা কেউ রেখে দিয়েছে। শুঁড় তোলা কটা রঙের পুরোন চটি জোড়া দেখা যাচ্ছে ইজিচেয়ারের তলায়।

'কী রে চিঠিপত্র কিছু এল? কথা বলছিস না যে?'

কাগজখানা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে সামনের দিকে তাকালেন নীলাম্বর চৌধুরী।

মেয়ের হাতে চায়ের কাপ। প্রসন্নভাবে একটু হাসলেন নীলাম্বর। মেয়ে তাঁর রঙ পায়নি। কিন্তু গড়নের অনেকখানি পেয়েছে। রঙ ময়লা কিন্তু মুখশ্রী ওরও বেশ সুন্দর। নাক চোখ বেশ ভালো। ছিপ-ছিপে দোহারা চেহারা। কালোর ওপর বেশ দেখতে তাঁর মেয়ে সবাই সে কথা বলে। আর বলে বড় ভালো মেয়ে। নীলাম্বর একটু হাসলেন। এর চেয়ে ভালো কথা দুনিয়ায় আর নেই। সোনার মেডেল, রুপার মেডেল, সার্টিফিকেট, মানপত্র, সরকারী বেসরকারী উপাধি সব কিছুর চেয়ে বড় সুখ্যাতি এই ভালোত্ব। পাড়াপড়শীর মুখের এই কটি মাত্র শব্দ। সেই সুখ্যাতি নীলাম্বর পাননি কিন্তু তাঁর শ্যামলী পেয়েছে।

'চা এনেছিস? দে।' হাত বাড়ালেন নীলাম্বরঃ 'আর চিঠিপত্র?'

শ্যামলী বলল, 'এসেছে বাবা, তোমার চিঠিও এসেছে। এনে দিচ্ছি।'

ভারি বাধ্য, অনুগতা মেয়ে। তবু তার গলায় একটু যেন অসহিষ্ণুতা ফুটে

উঠেছে। কুঞ্চিত হয়েছে যুগল ভ্রু।

মেয়ের এই বিরাগ, মৃদু ক্রোধটুকু লক্ষ্য করলেন নীলাম্বর, তারপর ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কোত্থেকে এসেছে?'

শ্যামলী বলল, 'একখানা ইলেকট্রিক বিল, আর একখানা তোমার লাইফ ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ামের নোটিশ—।'

নীলাম্বর অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'আর? আর কিছু আসেনি?'

শ্যামলী গম্ভীরভাবে বলল, 'হ্যাঁ এসেছে। রূপমহল থেকে তোমার একখানা কার্ডও এসেছে। তাঁরা বুকপোস্টে পাঠিয়েছেন। এ কার্ড তুমি না পেতেও পারতে। ধরে নাও পাওনি।'

নীলাম্বর মেয়ের দিকে তাকালেন। দেখতে নরম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কী শক্ত। আর কী কড়া শাসনের ভঙ্গি। এই ভঙ্গি, গলার স্বরের এই দৃঢ়তা ওর মার কাছে থেকে পেয়েছে। মায়ের হাত থেকে এখন মেয়ে নিয়েছে শাসনদণ্ড।

নীলাম্বর নরম গলায় বললেন, 'মলি, কার্ডখানা নিয়ে আয়। তোর কথা আমি অস্বীকার করছিনে। বুকপোস্টের চিঠি। এসে না পৌঁছতেও পারত। কিন্তু যখন এসেই গেছে দেখি না, কী লেখা আছে কার্ডে। দেখলেই যে আমি যাব, ওদের ওই অবহেলার ডাকে সাড়া দেব তা ভাবিস নে। কার্ডখানা দেখতে দে আমাকে।'

শ্যামলী বলল, 'বেশ দেখ।'

ইলেকট্রিক বিল, প্রিমিয়ামের নোটিশ আর রূপমহল থিয়েটারের সেই কার্ডখানা এনে শ্যামলী বাবার হাতে দিল। বিরক্ত হয়ে বিল আর নোটিশটা চেয়ারের হাতলের ওপর রেখে দিলেন নীলাম্বর। তারপর শাদা খামটি খুলে নিমন্ত্রণ পত্রটি বের করলেন। নতুন নাটক হচ্ছে রূপমহলে। আজ সন্ধ্যায় প্রথম অভিনয়। তারই নিমন্ত্রণ। ছাপানো তরফে রূপমহলের ম্যানেজমেণ্ট এই শুভ অনুষ্ঠানে নীলাম্বরের উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন। কার্ডখানা নীলাম্বর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন আর কোথাও কিছু নেই। কেউ কোথাও হাতে লেখেনি, 'এসো কিন্তু ভাই।'

নীলাম্বর কার্ডখানা রেখে দিলেন। তারপর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই ঠিকই বলেছিস মা। এ ধরনের নিমন্ত্রণে যাওয়া যায় না।'

শ্যামলী খুসি হয়ে বলল, 'তুমি যেয়ো না বাবা। তোমার কি কোন মানসম্মান নেই? সেদিনও তুমি ওই থিয়েটারের সর্বেসর্বা ছিলে। তুমিই ওই থিয়েটারকে দাঁড় করিয়েছ। কী না করেছ তুমি রূপমহলের জন্যে? আজ যদি রতনবাবু সে কথা ভুলে যান তুমিই বা ভুলতে পারবে না কেন?'

নীলাম্বর বললেন, 'ঠিক বলেছিস মলি। আমিও ভুলব। ভুলব কি ভুলে গেছি।'

'বেশ করেছ বাবা। ভুলে যাওয়াই ভালো।'

শ্যামলী ভিতরে চলে যাচ্ছিল, নীলাম্বর তাকে ফের ডাকলেন, 'আর শোন?'

'বলো।'

নীলাম্বর মৃদু হাসলেন, 'রূপমহলের এবারকার ভূমিকালিপিখানা দেখেছিস?'

শ্যামলী এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'ও আর দেখে কী হবে বাবা।'

নীলাম্বর বলতে লাগলেন, 'সভাপতি প্রধান অতিথি গণ্যমান্য সব ব্যক্তি। দুজনেই মিনিস্টার। একজন সেণ্টারের আর একজন এখানকার। জাঁকজমক আড়ম্বর কত বেড়েছে তাই দেখ। কিন্তু আসলে যা অভিনীত হবে সে বস্তুটি কী, সে বস্তুটি কার? নাট্যকার হলেন অতনু মুখোপাধ্যায়। নাম শুনেছিস কখনো?'

শ্যামলী বলল, 'না বাবা। বোধহয় ছদ্মনাম টেদানাম হবে।'

নীলাম্বর হেসে বললেন, 'আরে না পাগলী না। ও নামের এমনই মহিমা যে, আসলকেই ছদ্মনাম বলে মনে হয়। কেই বা শুনেছে ওর নাম? আর কেই বা পড়েছে ওর নাটক? নাম দিয়েছে আবার প্রতিধ্বনি। কোন বিদেশী লেখকের প্রতিধ্বনি, শুনলেই বোঝা যাবে। আজকাল তো এইসবই হচ্ছে।'

শ্যামলী বলল, 'থাক বাবা। আমাদের ওসব আলোচনা করে কী হবে। আমরা তো কেউ আর দেখতে যাচ্ছিনে।'

নীলাম্বর নিজের মনে একটু হাসলেন। তাঁর মেয়ে আবার এসব পছন্দ করে না। অন্যের নিন্দামন্দ ভালোবাসে না। ওর নীতিজ্ঞান রুচিবোধে বাধে। প্রথম যৌবনে ছেলেমেয়েরা একটু নীতিপাগলা হয়। নীলাম্বর নিজেও ও বয়সে কম গোঁড়া ছিলেন না। তারপর যত বয়স বেড়েছে তত গোঁড়ামি ভেঙেছে।

'নাট্যকারের তো ওই নমুনা। আর পরিচালকের নাম শুনেছিস? সদানন্দ সর্বাধিকারী।'

শ্যামলী বলল, 'শুনেছি যেন কোথায়। কাগজে-টাগজে বেরিয়েছে মাঝে মাঝে। আমি তো তেমন খোঁজ রাখিনে বাবা।'

নীলাম্বর বললেন, 'খোঁজ রাখলেও যেন কত খোঁজ পেতিস! বয়স বছর তিরিশেকের বেশি নয়। এতকাল অ্যামেচার ক্লাবটাব চালিয়েছে। পাবলিক স্টেজে এসেছে হালে। এসেই একেবারে সর্বাধিকারী। যুগান্তর এনেছে স্টেজ ডাইরেকশনে। হবে। পাবলিসিটিতে কী না হয়। ঢাক পেটাতে পারলে মূর্খকেও পণ্ডিত বলে—।'

শ্যামলী এবারও বাধা দিল, 'থাক না বাবা, ওসব আলোচনায় আমাদের লাভ কি।'

নীলাম্বর বললেন, 'আর প্রধান অভিনেত্রী কে জানিস? শ্রীমতী সুরশ্রী হালদার। ওর নাম অবশ্য আজকাল সবাই জানে। কিন্তু কার জন্যে জানে? এই নীলাম্বরের জন্যে। আজ সেই নীলাম্বর চৌধুরীকেই সে চেনে না।'

শ্যামলী এবার ফের ধমক দিল, 'বাবা, তোমাকে বলিনি, ওই মহিলার কোন আলোচনা আমাদের বাড়িতে আর হবে না।'

উত্তেজিতভাবে নীলাম্বর উঠে সোজা হয়ে বসলেন, 'মহিলা, ও আবার মহিলা?'

ভিতরের ঘরের পর্দা সরিয়ে এবার যিনি নীলাম্বরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁকে কিন্তু মহিলা বলে না মেনে উপায় নেই। যদিও তাঁর পরনে লাল পেড়ে শাদা খোলের শাড়ি, শাদা ব্লাউজ, হাতে হলুদের দাগ, এই মাত্র রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তবু তিনি যে রাঁধুনী নন, এ বাড়ির গৃহিণী তা তাঁকে দেখলেই চেনা যায়। মেয়ের মত লম্বা নন তিনি, বরং একটু বেঁটেই। সেই তুলনায় স্থূলাঙ্গী। পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে বয়স। এরই মধ্যে সামনের দিকের চুলে অল্পসল্প পাক ধরেছে। মুখের শ্রীটুকু এখনো মেদে একেবারে ঢাকা পড়েনি। কিন্তু শ্রীর চেয়ে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা অশান্তি উদ্বেগ যে তাঁর ওপর দিয়ে গেছে সেই চিহ্নই যেন বেশি করে চোখে পড়ে।

ইন্দিরা স্থিরদৃষ্টিতে স্বামীকে একটু দেখে নিলেন। তারপর মনের রাগ আর বিরক্তি ঠোঁটের হাসিতে ঢেকে বললেন, 'কী ব্যাপার। অত চটাচটি কিসের জন্যে। কার সঙ্গে যুদ্ধ করছ?'

নীলাম্বর বললেন, 'তোমার সঙ্গে নয়।'

ইন্দিরা বললেন, 'তা জানি। আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে আর কী হবে? আমি কি আর বেঁচে আছি?'

তারপর মেয়ের দিকে তাকালেন ইন্দিরা, 'মলি, তোর অফিসের বেলা হয় না? নাইতে যা এবার। এরপর তো কোনরকমে নাকে মুখে দুটি গুঁজে ছুটবি। আমার রান্না কখন হয়ে গেছে। লক্ষ্মী, সোনা, যা নাইতে যা এবার।'

শ্যামলী চলে যাওয়ার আগে বলল, 'বাবা, তুমি কিন্তু তাহলে আমাকে কথা দিচ্ছ, কিছুতেই যাবে না সেখানে। আমি অফিস থেকে ফিরে আসি। আজ তাড়াতাড়িই আসব। এসে তুমি আমি মা তিনজনে কোথাও বেড়াতে বেরোব।'

নীলাম্বর মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা।'

শ্যামলী চলে গেল।

খোলা বারান্দায় রোদ এসে পড়ছিল। ক্যাম্বিশের সবুজ রঙের চট খাটানো ছিল। দড়ি খুলে সেই চট নামিয়ে দিলেন ইন্দিরা। খানিক দূরে একটি চামড়ার কাজ করা সুন্দর একটি মোড়া রয়েছে। সেটি টেনে নিয়ে ইন্দিরা স্বামীর পায়ের কাছে বসলেন।

নীলাম্বর বললেন, 'কী ব্যাপার। এত ভক্তির ঘটা যে, আমি কি অত ভক্তির যোগ্য?'

ইন্দিরা বললেন, 'যোগ্যই তো ছিলে।'

'এখন তো আর নেই!'

ইন্দিরা বললেন, 'তা যদি না থাকো, ভেবে দেখ সেটা কার দোষ।'

ফের উত্তেজিত হয়ে উঠলেন নীলাম্বর। গলা চড়িয়ে নিজের বুকে চাপড়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার আমার আমার। আমি দৈবকে দোষ দিইনে, অদৃষ্টের দোহাই পাড়িনে, সমাজ ব্যবস্থাকে দায়ী করিনে। সমস্ত দায় আমার, সমস্ত দোষ আমার। হল তো?'

কিন্তু ইন্দিরা স্বামীর পুরুষকারের দম্ভে ভুললেন না। বললেন, 'এখন তো স্টেজে নামা ছেড়ে দিয়েছ। এখন বাড়িতে বসে বসেই অ্যাকটিং চলে। তুমি অ্যাক্ট করতে থাকো, আমি মেয়েকে খেতে দিই গিয়ে।'

নীলাম্বর স্ত্রীর খোঁচায় আরো ক্রুদ্ধ হলেন, বললেন, 'এর মধ্যে অ্যাকটিং-এর কিছু নেই। সত্যি কথাই বলছি। যেটুকু যা করেছিলাম নিজের ক্ষমতায় করেছিলাম, আবার আবার নিজের ইচ্ছেয় সব ধূলিসাৎ করে দিয়েছি।'

ইন্দিরা আর দাঁড়ালেন না। যেতে যেতে বললেন, 'বেশ করেছ। খুব বাহাদুরের কাজ করেছ।'

নীলাম্বর স্ত্রীর এই শ্লেষের হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারলেন না। না পেরে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগলেন।

একটু পরে ইন্দিরাই আবার ট্রেতে করে পাঁউরুটি ডিম সিদ্ধ সেই সঙ্গে আরো এক কাপ চা নিয়ে এলেন।

নীলাম্বর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ও সব আবার কেন'। ওসব আমি কিছু খাব না। নিয়ে যাও সব।'

কিন্তু ইন্দিরা কিছুই সরিয়ে নিলেন না, হেসে বললেন, 'রাগ করছ কেন, খাও। আর এক কাপ চা পড়লেই মন মেজাজ ভালো হয়ে যাবে।'

নীলাম্বর স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'ইন্দু, অনেক মেয়েকে হাতে ধরে অভিনয় শিখিয়েছি। তোমাকে তো সেভাবে কিছু শেখাইনি। তুমি কী করে এমন পাকা অভিনেত্রী হলে? কী করে এসব শিখলে!'

ইন্দিরা স্বামীর দিকে তাকালেন। খোঁটাটা হজম করতে একটু সময় নিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'প্রাণের দায়ে শিখেছি।'

ইন্দিরা ফের ভিতরে চলে গেলেন। নীলাম্বর ভাবলেন যাক একটু ঘা তাহলে দিতে পেরেছেন। মনে মনে খুসি হলেন নীলাম্বর। স্বামীর ওপর ইন্দিরার শ্রদ্ধা প্রেম আর সেবাযত্ন সব মিথ্যা, সব ভুয়ো—এমন ইঙ্গিতে তিনি যেমন রাগ করেন, যেমন দুঃখ পান তেমন আর কিছুতে পান না। তাই স্ত্রীকে আঘাত দিতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ তোলেন নীলাম্বর। হয়তো অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। বাইরের জনপ্রিয়তা যেমন তিনি হারিয়েছেন, প্রায় বিস্মৃত, নির্বাসিত হয়েছেন, কিংবা নিজেই রঙ্গলোক থেকে নির্বাসন বরণ করে নিয়েছেন, নিজের পরিবারেও কি তেমনি অনেক কিছু হারান নি? স্ত্রীর কাছে, ছেলের কাছে, মেয়ের কাছে সেই শ্রদ্ধা আর সম্মান কি তিনি দাবি করতে পারেন? কি বিনা দাবিতে পান? ছেলে নীলাম্বুজ কদাচিৎ চিঠিপত্র লেখে। তাঁর কাছে প্রায় লেখেই না। মার কাছে লেখে, বোনের কাছে লেখে। অবশ্য পরিবারের ওপর আকর্ষণ তার এমনিতেই কমে গেছে। একটি জার্মান মেয়েকে বিয়ে করে বার্লিনে সে নিজের ঘর সংসার পেতেছে। পুত্রেরও পুত্রলাভের খবর পেয়েছেন নীলাম্বর। সে এখন অনেক দূরে। অবশ্য এই দূরত্ব সে দেশে থেকেও রাখতে পারত। একই বাড়িতে থেকেও সে এমনি দুস্তর ব্যবধান গড়ে তুলতে পারত। ইন্দিরাও কি পাশে থেকে এত কাছে থেকে মাঝে মাঝে বিচ্ছেদসিন্ধুর ওপারে পড়ে থাকেন না?

আর মলি? তাঁর মেয়ে শ্যামলী? তার সঙ্গেও কি সেই সহজ সরল সম্পর্ক অবিকল অক্ষুণ্ণ আছে? স্ত্রী তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেন বলে অভিযোগ করলেন নীলাম্বর, কিন্তু মেয়ে? সেও কি সেই একই ধরনের অভিনয় করে না? শ্রদ্ধা না এলেও শ্রদ্ধা দেখায়, ভক্তি না এলেও ভক্তির ভান করে। বাপের ওপর কিছু সহানুভূতি আর কিছুটা অনুকম্পা হয়তো এখনো বজায় রেখেছে শ্যামলী কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। নীলাম্বর নির্মমভাবে মনে মনে স্ত্রী আর মেয়ের আচরণ খুঁটে খুঁটে বিশ্লেষণ করেন।

'কিছু খেলে না বাবা?'

অফিসের বেশে তৈরি হয়ে এসেছে শ্যামলী। আঁটসাট করে শাড়ি পরা। ছুটোছুটি করে ভিড় ঠেলে বাস ধরবে। হাতে শুধু একটি ঘড়ি। গয়নাগাটি কোথাও কিছু নেই। একেবারে নিরাভরণা। কী যে স্টাইল হয়েছে আজকাল মেয়েদের। কিছুকাল আগেও গাড়ি ছিল। বিক্রি করে দিতে হয়েছে। থাকলে হয়তো সেই গাড়িতে করেই ওকে অফিসে পাঠাতে পারতেন নীলাম্বর। ওর এত কষ্ট হত না।

শ্যামলী হাতঘড়ির দিকে একটু চোখ বুলিয়ে ফের এক মিনিট দাঁড়াল। আর একবার অনুরোধ, 'খেয়ে নাও বাবা।'

নীলাম্বর একটু বিরক্ত হয়ে বললেন,

'অনেক খেয়েছি মা, অনেক খেয়েছি। আর ইচ্ছে নেই।'

শ্যামলী বলল, 'ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হয় বাবা। শরীরের জন্যে খেতে হয়। খেয়ে নাও। আমি যাচ্ছি। তাড়াতাড়িই ফিরব। আমি না আসা পর্যন্ত আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমরা একসঙ্গে বেরোব।'

নীলাম্বর ঘাড় কাত করে বললেন, 'আচ্ছা।'

শ্যামলী বারান্দা থেকে পথে নামল। অন্তত মিনিট সাতেক ওকে হাঁটতে হবে বাস ধরার জন্যে। কষ্ট হয় মেয়ের। কিন্তু যাতায়াতের এই কষ্ট ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। যৌবনে কোন কৃচ্ছ্রতাই দুঃসাধ্য নয়। প্রথম বয়সে নীলাম্বরও কম কষ্ট করেন নি। ওর কষ্ট কিসের। ও তো কোন ঘা খায়নি। অফিসে যায়, অফিস থেকে আসে। বাকি সময় বই পড়ে, ঘর সংসারের কাজে মাকে সাহায্য করে। কখনো বা মা আর মেয়েতে বসে গল্প করে। তখন মাই ওর বান্ধবী। অবশ্য সমবয়সী কলেজের পুরোন সহপাঠিনী, কি অফিসের কলীগ—দু-একটি মেয়েবন্ধুও ওর আছে। তারাও কচিৎ কখনো আসে। এসে ওর সঙ্গে গল্প করে যায়। এখনো বেশ সহজ সরল স্বাভাবিক ওর জীবন। কোন ছেলের সঙ্গে এখনো তেমনভাবে মিশতে দেখেননি নীলাম্বর। মিশলেই জটিলতা বাড়বে। অবশ্য তাঁর চোখের আড়ালে কী হয় না হয় তা নীলাম্বর জানেন না। জীবনের তিনি অনেক কিছু জেনেছেন। তবু নিজের মেয়ের মনে কী আছে তা পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়। ভবানী ভ্রূকুটি ভঙ্গীং ভবঃ বেত্তি ন ভূধরঃ। নীলাম্বরের ভূমিকা এখানে ভূধরের। তবু তাঁর ভবানী তাঁকে ভালোবাসে। 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো' এ অনুরোধ কতবার কতজনের মুখে কতরকমভাবে শুনেছেন নীলাম্বর, আবার নিজের মেয়ের মুখেও শুনলেন। অবশ্য ওর মুখে এ কথার মানে আলাদা, স্বাদ আলাদা। এই স্বাদ ভারি মধুর। এই মুহূর্তে ওই মাধুর্যের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। স্ত্রীকেও বৃথাই খোঁচা দিয়েছেন নীলাম্বর। কৌতুক করেই দিয়েছেন। মনে মনে জানেন, আজ সকালে ইন্দিরার এই সেবা যত্নের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। অনেক ঘাতপ্রতিঘাত ভাঙচুরের মধ্যেও এই যে পারিবারিক সম্পর্কটুকু আছে, মন ফিরে ফিরে তাকেই ভিত্তি করতে চায়, তার কাছেই আশ্রয় খোঁজে। শুধু কি আশ্রয় চান, আশ্রয় কি দেনও না নীলাম্বর? যে যাই বলুক স্ত্রী আর ছেলে মেয়েকে কম ভালোবাসেন না তিনি। যখন বাসেন তখন তীব্র আবেগ আর প্যাশনের সঙ্গেই ভালোবাসেন। একজন লেখক বন্ধু তাঁকে বলেছিলেন, 'স্নেহ প্রেম বন্ধুত্ব তোমার সবই জান্তব।'

জান্তব। হয়তো তাই। নীলাম্বর ভাবেন এক একজনের ভালোবাসার ধরন একেকরকম। স্ত্রী আর মেয়েকে নিয়ে জীবনটা বেশ কাটতে পারত। দুটি নারী দুই ভিন্নতর স্বাদে জীবনকে ভরে রাখতে পারত। কিন্তু তা হল না। তাঁর এক মন চাইল সহজ সরল স্বাভাবিক সম্ভ্রান্ত জীবন, আর এক মনের বিচিত্র বাসনা তাঁকে কাঁটায় ভরা বিঘ্নসংকুল পথে পথে ঘোরাল। পৌরাণিক আধুনিক ঐতিহাসিক সামাজিক নানা নাটকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করেছেন নীলাম্বর। কখনো সৎ চরিত্রের ভূমিকায় কখনো খল অসৎ চরিত্রের। প্রতিবারই হাততালি পেয়েছেন দর্শকদের। নানা রূপসজ্জায় তাঁর আসল রূপটি কি হারিয়ে গেছে! নাকি এই বিশ্বরূপই তাঁর নিজের রূপ? তিনি একই সঙ্গে ভালো আর মন্দ, সহজ আর জটিল, মহৎ আর ক্ষুদ্রতম?

খামের ভিতর থেকে থিয়েটারের ভূমিকালিপিটি আবার বার করে কী ভেবে সেখানা আবার খুলে নিলেন নীলাম্বর। নামগুলির ওপর চোখ বুলোতে লাগলেন। নায়কের ভূমিকায় নীরদবরণ আর নায়িকার ভূমিকায় সুরশ্রী হালদার। নীরদকে রতনবাবু অন্য দল থেকে নিয়ে এসেছেন, কিন্তু সুরশ্রী তাঁর নিজের হাতে গড়া। নামটা পর্যন্ত তিনি নিজে দিয়েছেন। সেই নাম আজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু সুরশ্রীর বোধহয় সে কথা মনেও নেই। শুধু কি নামই দিয়েছিলেন? কিন্তু সুরশ্রী সব ভুলেছে। ভুলেছে নীলাম্বর না হলে থিয়েটারে তার আসাই হত না। এল যখন কতই বা ওর বয়স? বড় জোর ষোল সতের। লেখাপড়া কিছু জানত না, অভিনয়েরই বা কী জানত। কিন্তু তালতলা অ্যামেচার ক্লাবে সেই সামান্য একটি সহচরীর ভূমিকায় ওকে দেখেই নীলাম্বর চিনতে পেরেছিলেন, মেয়েটির মধ্যে ক্ষমতা আছে। অসামান্য রূপবতী নয়, কিন্তু শ্রী আছে। তীক্ষ্ণতা আছে। তখনো ও গাইতে জানে না। কিন্তু কণ্ঠে স্বর আছে। নীলাম্বর খোঁজ নিলেন। বেনেপুকুরের অন্ধকার গলির পুরোন বাড়ির একতলা ঘরে ওরা থাকে। বিধবা মা আর ওই কুমারী মেয়ে। কুমারী অবশ্য তখনো ছিল না। ওর মা ওকে থাকতে দেয়নি। জীবনের লেনদেন তের বছর বয়স থেকেই শুরু করেছিল সুরশ্রী। পরে শুনেছিলেন। কিন্তু প্রথম দিন দেখেই জাত চিনেছিলেন তিনি। কিন্তু জাত দিয়ে কী হবে? স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি। এমন আরো কত রত্ন আরো কত অখ্যাত কুখ্যাত স্থান থেকে নীলাম্বর কুড়িয়ে এনেছেন। এনে দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। অবশ্য সবই মণিমাণিক্য ছিল না। তাদের মধ্যে অনেক ঝুটোমুক্তোও ছিল। ঝুটোর সংখ্যাই বেশি। কিন্তু তখন অসাধারণ আত্মবিশ্বাস নীলাম্বরের। ধুলোমুঠি তাঁর হাতে সোনামুঠি হয়ে ওঠে। রতন বিশ্বাস তখন তাঁর হাতে থিয়েটারের সব ভার ছেড়ে দিয়েছেন। নাটক নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিনেতা অভিনেত্রী বাছাই, পরিচালনা, তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা সবই এক হাতে করেন নীলাম্বর। রূপমহলে তাঁর তখন একনায়কত্ব।

মনে আছে প্রথম সাক্ষাতের দিনে তাঁর সেই ভাবী নায়িকা তক্তপোষের ওপর একটা নীল রঙের ময়লা চাদর গায়ে জড়িয়ে পড়েছিল। ও অসুস্থ শুনে নীলাম্বর চলে আসতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওর মা বলল, 'না না, আপনি এমন করে ফিরে গেলে সুখলতা দুঃখ পাবে।'

বসবার ঘর থেকে ভিতরের ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল সুখলতার মা।

'সুখি, একটু উঠতে পারবি? নীলাম্বরবাবু এসেছেন।'

'নীলাম্বরবাবু? এখানে?'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসেছিল সুখলতা। তক্তপোষ থেকে। নেমে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সামনে। জ্বরতপ্তা সেই তন্বী দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটিকে নীলাম্বরের মনে হয়েছিল বিদ্যুৎলতা। সেই বিদ্যুৎ মাথা নিচু করে সেদিন তাঁর পদস্পর্শ করেছিল, বলেছিল, 'আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি।'

নীলাম্বর বলেছিলেন, 'তুমি উঠলে কেন। তোমার জ্বর। শুয়ে থাকো তুমি।'

সে মৃদু হেসে বলেছিল, 'আমার জ্বর সেরে গেছে।'

কী মিষ্টি গলা। আর সেই শাদা সুন্দর সুগঠিত দাঁতের সারি। 'জ্বর সেরে গেছে' এ কথার মধুর ব্যঞ্জনাটুকু বুঝে নিতে নীলাম্বরের দেরি হয়নি। তবু তিনি তার কপালে হাত রেখেছিলেন, 'কই দেখি।'

বেশ জ্বর তখন ওর গায়ে। সেই জ্বর সর্বাঙ্গে, মনে সংক্রামিত হয়েছিল নীলাম্বরের। সুখলতার মা তখন নীলাম্বরকে আপ্যায়নের জন্যে চা খাবার পান সিগারেট আনাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

আর সেই নীল রঙের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, সুখলতা তাঁর পায়ের কাছে বসেছিল।

নীলাম্বর বলেছিলেন, 'তুমি আসবে আমাদের রূপমহলে?'

সুখলতা হেসে বলেছিল, 'তা হলে তো স্বর্গ পাই।'

সেই রূপের স্বর্গে রসের স্বর্গে ওকে নিয়ে এসেছিলেন নীলাম্বর। ওর নামান্তর রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। জন্মান্তরও।

আদিতে অবশ্য মোহ। মোহসঞ্জাত

ময়ূরময়ূরী — শিল্পী : ইন্দ্র দুগার

বাসনা, না কি বাসনারঞ্জিত মুগ্ধতা! কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মোহ তো সেদিন শুধু মোহেই শেষ হয়নি। নতুন নতুন নাট্যরসসৃষ্টির মূলকে সিঞ্চিত করেছে। হাজার হাজার দর্শককে আনন্দ দিয়েছে। রতনবাবুর রূপমন্ডলকে রূপোয় মুড়ে ফেলেছে। শুধু একবার নয় বহুবার। পঙ্ককে ভয় করেন নি নীলাম্বর। জানতেন তার থেকে পঙ্কজের জন্ম হবে। বেনেপুকুরকেও তিনি পদ্মপুকুর করে তুলেছিলেন।

'কী হল? নামটুকু বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' ইন্দিরা ফের এসে সামনে দাঁড়ালেন।

চমকে উঠলেন নীলাম্বর। স্মৃতিচারণ বন্ধ হল। থিয়েটারের ছাপানো শাদা কার্ড আর গোলাপী ভূমিকালিপি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ইন্দিরা পরিহাসের সুরে বললেন, 'আহা ও কি, ও কি, ও কী করছ? চোরের ওপর রাগ করে কেউ কি মাটিতে ভাত খায়? আমি এই চোখ বুজে রইলাম। তুলে নাও। নামাবলী গায়ে জড়িয়ে রাখো। আহা তাতেও শান্তি।'

নীলাম্বর স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন! একটু হাসলেন নীলাম্বর, 'হাতী যদি পাঁকে পড়ে, চামচিকেয় লাথি মারে।'

ইন্দিরা বললেন, 'ছি ছি ছি। তোমার হল কি? তুমি কি আজকাল ঠাট্টা তামাসাও বোঝ না?'

এগিয়ে এসে স্বামীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন ইন্দিরা। লজ্জিত ভঙ্গীতে হাসলেন একটু, 'কতকাল পরে বলতো।'

নীলাম্বর বললেন, 'কতকাল পরেই বটে। কিন্তু তোমার কোনটুকু তামাসা ইন্দু? আগেরটুকু না এই শেষেরটুকু?'

ইন্দিরার দুটি চোখ ছলছল করে উঠল। তিনি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'তুমি—তুমি একটি পাষাণ।'

মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন ইন্দিরা।

নীলাম্বর চুপ করে রইলেন।

অনেক—অনেককাল আগে বিয়ের সেই প্রথম দ্বিতীয় বছরে নীলাম্বরের মা ইন্দিরাকে শিখিয়ে দিতেন 'স্বামীকে প্রণাম কোরো।'

মফঃস্বল শহরের বাড়ি থেকে প্রতিবার কলকাতায় আসবার সময় নীলাম্বরকে স্ত্রীর প্রণাম নিয়ে আসতে হত। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হলে মা দুজনকেই বকতেন। বলতেন, 'আমি যতদিন আছি এ নিয়ম তোমাদের মানতে হবে। শোননি রবিঠাকুরের গান, আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ, সংসার কাজে। ভোরবেলায় বিছানা থেকে উঠে স্বামীকে প্রণাম করে তবে ঘর থেকে বেরোবে।'

লেখাপড়া জানতেন মা। শহরের কয়েকটি রাজপরিবারের সঙ্গে মামাদের বন্ধুত্ব ছিল। মা নিজেও যেতেন সে সব বাড়িতে। বই চেয়ে এনে পড়তেন।

নীলাম্বর হেসে বলতেন, 'মা ও গানের ও অর্থ নয়।'

মা বলতেন, 'গানের কি কেবল একটি অর্থই থাকে বাবা?'

কিন্তু মা বেঁচে থাকতেই সেই সেকেলে নিয়ম ভেঙে দিয়েছিলেন নীলাম্বর। স্ত্রী শুধু শয্যায় সম অংশভাগিনীই তো নয়, সংসারের সর্বত্র তার সম অধিকার। বয়সে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে অভিজ্ঞতায় যে অসমতা আছে প্রেম প্রীতি সখ্য তা দূর করে দিক। নীলাম্বর ছিলেন এই আদর্শের অংশীদার।

স্ত্রীর প্রণাম নেননি নীলাম্বর, কিন্তু তরুণী অভিনেত্রীদের প্রণাম নিয়েছেন। স্টেজে উঠবার আগে তারা নিত্য নীলাম্বরের পায়ের ধুলো নিত। বিদায় নেওয়ার সময়ও তারা ধুলো নিয়ে গেছে। কিন্তু শুধু যদি তাদের প্রণম্যই হয়ে থাকতে পারেন নীলাম্বর, শুধু যদি পাথরের দেবতার মত পুজো পেয়ে তুষ্ট থাকতেন কোন কথা ছিল না। কিন্তু তা পারলেন কই। যাদের প্রণাম নিয়েছেন, তাদের কারো কারো পায়ের তলায়

নিজেকেও নামিয়ে এনেছেন। তাদেরও কারো কারো কোমল সুন্দর দুটি পা কোন কোন উজ্জ্বল রাতে নিজের কোলে তুলে নিয়েছেন। কেউ আপত্তি করলে বলেছেন, 'তুমি রূপ-লক্ষ্মী, রসলক্ষ্মী, তুমি তো সামান্য নও।'

ইন্দিরা আর সামনে এলেন না। আড়াল থেকেই তাগিদ দিলেন, 'দোহাই তোমার এবার নাইতে যাও। ঠান্ডা ভাত নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকব?'

বারান্দা থেকে এবার ঘরে এলেন নীলাম্বর। শোবার ঘর মাত্র দুখানি। জিনিসপত্রে একেবারে ঠাসা। একটি দোতলা বাড়ির আসবাবপত্র অনেক ছেড়ে দিয়ে কিছু বা আত্মীয় বন্ধুর বাড়িতে ছড়িয়ে দিয়ে, বেছে বেছে ইন্দিরা বাকি জিনিসগুলি নিয়ে এসেছেন। সে বাড়ি নীলাম্বরের নিজের ছিল, এ বাড়ি ভাড়া। অনেক খুঁজেপেতে শহরতলীর নিরিবিলি গলিতে এই একতলা বাড়িটি পছন্দ করেছেন নীলাম্বর। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গ থেকে বেশ দূরে থাকতে পারবেন। অবশ্য তারা আজ নিজেরাই দূরে সরে গেছে। তবু জনচক্ষুর বিশেষ করে স্বজনচক্ষুর আড়ালে এখন অজ্ঞাতবাস করতে চান নীলাম্বর। পান্ডবের অজ্ঞাতবাসে একবার তিনি কীচক হয়েছিলেন, আর একবার অর্জুন। এখনো তিনি সব্যসাচী, শুধু গান্ডীবটি নেই।

বাথরুমে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন নীলাম্বর। বালতির পর বালতি জল ঢাললেন গায়ে মাথায়। যেন মনের সমস্ত উত্তাপ গ্লানি ক্লেদ ধুয়ে ফেলতে চান।

স্নান সেরে ধোয়া কাপড় পরে খালি গায়ে খেতে এলেন নীলাম্বর।

সেই প্রথম যুগে ইন্দিরা বলতেন, 'তোমার আবার জামার দরকার কি। গায়ের যা রঙ তোমার। খালি গায়েও মনে হয় রঙীন জামা পরে আছ।'

নিজের রঙের সুখ্যাতি তারপর রঙ্গ-জগতের আরো অনেকের মুখে শুনেছেন নীলাম্বর, স্ত্রীর সেই মুগ্ধ চোখ দুটির কথা আজ ফের তাঁর মনে পড়ল।

নীলাম্বর বললেন, 'ও কি, শুধু একটি জায়গা করেছ কেন ইন্দু। তোমার ভাতও বেড়ে নাও। আমরা একসঙ্গে বসে খাব।'

ইন্দিরা গম্ভীর ভাবে বললেন, 'না তুমি আগে খেয়ে নাও।'

নীলাম্বর এগিয়ে এসে স্ত্রীর কাঁধে হাত দিলেন, 'আবার আগে পরে কেন। এসো আমরা এক পাতে বসে খাই। মনে আছে সেই প্রথম প্রথম গুরুজনদের লুকিয়ে লুকিয়ে—। আজ আর তার দরকার নেই।'

আজ নীলাম্বরের খোলা জায়গায় থাকাও যা লুকিয়ে থাকাও তাই। আজ গুরুজনরা লোকান্তরে লঘুজনরা স্থানান্তরে। আজ তাঁর ড্রাইভার নেই, দারোয়ান নেই, ঝি নেই, ঠাকুর নেই, চাকর একটি ছিল, ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। আজ আর কাউকে লুকোবার কোন কথাই ওঠে না।

কিন্তু ইন্দিরা স্বামীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'না।'

নীলাম্বরের মনে পড়ল, তখনকার দিনে ইন্দুর মান ভাঙানো কত সহজ ছিল। এ মুহূর্তের মান ও মুহূর্তে ভাঙত। যেন একটি রঙীন বুদ্‌বুদ্‌। চোখের জলের সঙ্গে মুখের হাসির দূরত্ব ছিল সামান্য। আজ আর সেদিন নেই। আজ জীবন বড় কঠিন। আজ বুক ভেঙে খান খান হলেও মান ভাঙে না।

একাই খেয়ে নিলেন নীলাম্বর। ইন্দিরা খেলেন কি খেলেন না তাঁকে দেখতে দিলেন না। ঘরে গিয়ে খিল দিলেন। শুয়ে শুয়ে বই পড়বেন। নীলাম্বর জানেন, আজকাল নাটক নভেল আর বেশি পড়েন না ইন্দিরা। পড়েন মহাপুরুষ প্রসঙ্গ। ক্ষুদ্র পুরুষের সঙ্গ এড়াবার এছাড়া আর কী উপায় আছে।

নীলাম্বর নিজের ঘরে চলে এলেন। একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে চুরুট ধরালেন। এ ঘরে তিনি আজকাল একাই থাকেন। এই রঙ্গমঞ্চে তিনি এখন একক। সংলাপ নেই, আছে শুধু স্বগতোক্তি। দেয়ালে এখনো দু-তিনখানা বাঁধানো মানপত্র টানানো আছে। শ্যামলী নামিয়ে ফেলতে দেয়নি। জানলার নীচে বড় একটা বেতের ঝুড়িতে পুরোন চিঠিপত্রের রাশ। অনুরাগীদের, বেশীর ভাগ অনুরাগিণীদের স্তবস্তুতিও। অনেক হারিয়ে গেছে, তবু সব যায় নি।

দেয়াল ঘেঁষা গোটা তিনেক আলমারি। আলমারি ভরা বই। এ দেশের ও দেশের এ যুগের সে যুগের সাহিত্য, বিশেষ করে নাট্য সাহিত্যের সংগ্রহ পড়েছেন নীলাম্বর। তবু আরো কত বাকি।

শব্দ শাস্ত্র অনন্ত, রঙ্গসমুদ্র অপার। নতুন পাঠে নতুনতর স্বাদ। পড়ে পড়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বাক্যের মধ্যে রস, শব্দের মধ্যে রস, অক্ষরে অক্ষরে রস-ক্ষরণ। এই রসের স্বাদ যে পেয়েছে সে কেন অন্য রসের সন্ধান করে, কেন অসার সুরা-সার চায়, কেন সঙ্গসুধা খোঁজে। কিন্তু জীবনের তৃষ্ণা বিচিত্র। সেই ভোগবতীর স্রোত সহস্র পথে সহস্র খাতে বয়ে চলতে চায়। নীলাম্বর আজ বুঝতে পেরেছেন, চাইলেও তা বইতে দিতে নেই। জীবন তাহলে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়। কোন সৃষ্টিই সম্ভব হবে না। যিনি স্রষ্টা তাঁর সম্ভোগ শুধু সৃষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তার বাইরে যাবে না। কিন্তু এ সব নীতি কথা তো মানুষ শিশু-বয়স থেকে কণ্ঠস্থ করে। কিন্তু ক'জন মানে? মানতে পারে কজন? নিজের মধ্যে যে দুজন ভিন্ন সত্তা আছে, তাদের একজন মানে, একজন মানে না, এক-জন গড়ে, একজন ভাঙে।

শুধু বই থাকলেই হয় না। বইয়ের পাতা খুলতে জানা চাই। জানলার বাইরে একটি জীর্ণ দেয়াল। দেয়ালের ওপারে যে ক'টি নারকেল গাছ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে তারা সতেজ, তারা চিরসবুজ। গাছগুলিতে কখনো ফল ধরে কিনা নীলাম্বর লক্ষ্য করেন নি, কখন ধরে, কারা কখন পেড়ে নিয়ে যায় নীলাম্বর জানেন না। হয়তো ফল ধরে না, হয়তো ওরা চির নিষ্ফলা। কিন্তু তা নিয়ে কোন কিছু মনে হয় না নীলাম্বরের। এই যে সবুজের সমারোহ এই কি যথেষ্ট নয়। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে, নীলাম্বর চেয়ে চেয়ে দেখেন। রোজ নয়, কখনো কখনো। কিন্তু যখন দেখেন, দেখবার মত চোখ থাকে মন থাকে তখন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয় শুধু এই পাতা নড়া দেখে দেখেই সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়। বইয়ের পাতা থেকে গাছের পাতা, গাছের পাতা থেকে বইয়ের পাতা। কিন্তু চোখের পাতা খুলতে জানা চাই।

শহরের বাইরে এসে বিস্তীর্ণ আকাশ পেয়েছেন নীলাম্বর। কিন্তু সে আকাশ কদাচিৎ চোখে পড়ে। ভুলেই যান যে আকাশ আছে আর তার দিকে তাকাতে হয়। নিজের নামেরও যে ওই মানে তাই বা ক'দিন মনে পড়ে? জীবনের কোন মানে আছে কিনা সে জিজ্ঞাসাই বা মনে জাগে ক'দিন? নীলাম্বর কতদিন এই জানলায় বসে সোনালী বিকেল দেখেছেন। কত যে বিচিত্র রং আর বিচিত্র রূপ তার সীমা নেই। থিয়েটারের গ্রীনরুমে আর কতটুকু রঙ ছিল? তারপর সব রঙ ঢেকে দিয়ে আঁধারের কালো পর্দা নেমে আসে। সবুজ গাছগুলি এখন পটে আঁকা কৃষ্ণপুত্তলী। তাদের মাথার ওপর দিয়ে তখন আকাশ দেখা যায়। আর আকাশের অন্তর্গত তারা। অক্ষরে অক্ষরে গাঁথা এও যেন এক সুবিশাল আদিহীন অন্তহীন গ্রন্থের দিগন্তজোড়া পাতা। ওলটাবার দরকার নেই। রোজই একই পাঠ। তবু পড়তে জানলে নিত্য নতুন স্বাদ। মনে হয় সকালের বিকালের সন্ধ্যার আর গভীর রাতের এই আকাশ। দেখে দেখেও বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারেন নীলাম্বর। কিন্তু এই প্রশান্ত নির্মল নিরাসক্ত মন কি অষ্টপ্রহর থাকে?

শুধু নারীর মধ্যেই রূপ দেখেছেন নীলাম্বর, এ কথা ভুল। জলে স্থলে আকাশে বস্তুতে প্রাণীতে বিচিত্র রূপও কি তিনি দেখেন নি?

তবু নারীর রূপ তাঁকে যতখানি আকর্ষণ করেছে, মত্ত করেছে তেমন আর কিছুই করতে পারেনি। কিন্তু নারী তো শুধু দৃশ্যপটই রচনা করেনি। জীবনের মঞ্চে সে

সজীব সক্রিয় ভূমিকায় নেমেছে। কখনো দুখানি হাতে তাঁকে টেনেছে, কখনো দুখানি হাতে ধাক্কা দিয়ে দূরে ফেলে দিয়েছে। নারী শুধু ল্যান্ডস্কেপ নয়, তার স্বতন্ত্র সত্তা, ইচ্ছা, রুচি, অভিরুচি আছে।

নীলাম্বর নিজের অতীতকে চিরে চিরে দেখেন। তাঁর যে রূপসৃষ্টি তার মূলেই কি এই রূপতৃষ্ণা? দুইটির মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? কিন্তু শুধু রূপবোধ, শুধু সৌন্দর্যের অনুভূতির দোহাই পেড়েই কি পার পাওয়া যায়? শুধু রূপই যে তাঁকে টেনেছে একথা তো তিনি বলতে পারেন না। কত কুরূপাও তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তবে কি রূপ নয়, সৌন্দর্য নয়, আসক্তিই সব, অভ্যাসই সব? কিন্তু অভ্যাসের মধ্যে শুধু বন্ধন আছে, তার মধ্যে মুক্তির স্বাদ কই, তার মধ্যে নিত্যনবীনতা কই? আবার মনে হয়, এ শুধু তাঁর শ্রান্ত ক্লান্ত পরাজিত মনের মুহূর্তের চিন্তা। প্রতিটি নতুন মুখ কি তাঁকে নতুন সুখ দেয়নি? প্রতিটি প্রণয়কে মনে হয়নি কি প্রথম প্রণয়?

ওই সুরশ্রীকেও অসামান্যা রূপবতী কেউ বলবে না। রূপসজ্জার পরে ওকে যেমন দেখায়, বিনা সজ্জায় তেমন নয়। বলতে গেলে সব মেয়েই তাই। সব মেয়েই সজ্জা-নির্ভর, আর সব নারীই শুধুমাত্র রজনী-গন্ধা। কমলিনীর সাক্ষাৎ কদাচিৎ মেলে, দৈবাৎ ভাগেই কুমুদিনী।

অনেক বন্ধু তাঁকে বলেছেন, 'ওই সুরশ্রী না ডিম্বশ্রী ওকে নিয়ে অত কেন? ওর মধ্যে তুমি কী পেলে?' নীলাম্বর জবাব দিয়েছেন, 'কী পেয়েছি দেখতে হলে আমার দুটি চোখ তোমার ধার নিতে হবে।'

পানরসিক কেউ থাকলে হেসে বলেছেন, 'না বন্ধু, তোমার গ্লাসটি ধার নিলেই চলবে।'

কিন্তু নীলাম্বর জানেন, শুধু গ্লাসের মহাত্ম্য নয়। মদ না খেয়েও কতদিন তিনি রয়েছেন। মত্ততা যায়নি। পথ থেকে এমন অনেককে তিনি কুড়িয়ে এনেছেন, যারা সত্যিই ঘরে আসবার যোগ্য নয়। যাদের কোন বাজারদর নেই, তাঁর আদরটুকুর মধ্যেই তাদের অমূল্যতা।

ওই সুরশ্রীও তাই। নীলাম্বর শুধু ওর ফ্ল্যাটভাড়া দেননি, ঝি চাকর রেখে দেননি, আরো অনেক কিছু দিয়েছেন। ওকে লেখা-পড়া শিখিয়েছেন, অভিনয় শিখিয়েছেন। সেই সঙ্গে বাসনারঞ্জিত ভালোবাসাও দিয়ে-ছিলেন। নীলাম্বর জানেন, পুরুষরা দিয়ে দিয়েই পায়। আর মেয়েরা শুধু নিতে জানে। যার আছে সেই দেয়। তার কত দান অপাত্রে যায়, কত মুক্তো উলুবনে ছড়িয়ে পড়ে, তবু উজাড় হবার অভ্যাস ছাড়ে না। নিজের আচরণের সমর্থন খোঁজেন নীলাম্বর। তারা দিতে দিতে নিঃস্ব হয়, তবু দিতে ছাড়ে না। তারা লুপ্ত হয়, নিশ্চিহ্ন হয়, আগুনে দগ্ধ হয়, তবু পতঙ্গবৃত্তি ছাড়ে না।

সুরশ্রীকেও দিয়েছিলেন নীলাম্বর। দুহাত ভরেই দিয়েছিলেন, কোন কার্পণ্য করেন নি। কার্পণ্য তাঁর স্বভাবে নেই। মিতাচার মিতব্যয় তাঁর স্বভাবে নেই। তিনি মূর্তিমান অমিতাচারী।

দুহাতে দিয়েছেন নীলাম্বর। দুহাতে নিয়েছে সুরশ্রী। সেও কিছু দিয়েছে বইকি। নীলাম্বর অকৃতজ্ঞ নন। সুরশ্রী তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে, তাঁর বহু সৃষ্টির মূলে উৎসাহ দিয়েছে। অনেক সময় না জেনেই দিয়েছে। ওদের দান ওইরকমই। গাড়ি বাড়ি আসবাব অলঙ্কারের মত তা চোখে দেখা যায় না। তবু যে দেখতে জানে সেই দেখে, যে পেতে জানে সেই পায়। পুরুষরা বস্তুর মাধ্যমে দেয়, ভাবের মাধ্যমে পায়। এ এক অদ্ভুত বিনিময় ব্যবস্থা। নিঃসন্দেহে দেহ দেখেই তারা মত্ত হয়, উন্মত্ত হয়, তবু দেহকে আঁকড়ে ধরে তারা দেহাতীতের স্বাদ খোঁজে। নীলাম্বর ভাবেন, মেয়েরা বোধ হয় অত হয় না। কিন্তু মত্ততা দেখতে ভালোবাসে। পুরুষের মত্ততার মধ্যে তাদের অহংবোধ তৃপ্ত হয়। প্রত্যক্ষতায় তাদের লজ্জা, পরোক্ষতায় পরিতৃপ্তি।

সুরশ্রীকে নীলাম্বর দিয়েওছেন পেয়েও-ছেন। আরো দিতেন, আরো পেতেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, যা ভিতরের বস্তু তা বাইরের আঘাতে ভাঙল। ভেঙে দিলেন, রতনবাবু, ভেঙে দিল বৈষয়িক বিপর্যয়। নীলাম্বরের নির্বাচিত পর পর দুখানি নাটক সাধারণ দর্শকরা নিল না। তারাই তো প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তৃতীয়খানাতেও কোনরকমে লোকসানটা বেঁচে গেল। তারপর রতন বিশ্বাসের সঙ্গে ঝগড়া। তিনি বললেন, 'দোষটা দর্শকদের নয়, দোষটা তোমার। তুমি নিজের খেয়াল-খুসি মত চলেছ। তাতে ওরা কেন খুসি হবে?'

নীলাম্বর বলেছিলেন, 'শুধু যদি ওদের খুসির কথাটাই আগে ভাবি, তাহলে তো নতুন কিছুই করা যায় না। কিসে খুসি হতে হবে ওদের তা শেখানোটাও আমাদের কাজ।'

রতনবাবু বললেন, 'তাহলে এসো, থিয়ে-টারের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমরা পাঠশালা খুলি। ছাত্র পড়াই।'

তারপর নীলাম্বরের চরিত্রের আরো অনেক খুঁৎ, আরো অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি বার করলেন রতনবাবু। যা থিয়েটারের বেশির ভাগ অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যেই থাকে, সফল হলে সে-সব দোষের কথা মনে রাখে না, কিন্তু অসফল হলে পাঁচ বছরের ছেলেও সেইদিকে তর্জনী বাড়ায়।

কত অভিযোগই না এসেছে। রিহার্সালে গাফিলতি করেছেন নীলাম্বর। দিনের পর দিন কামাই করেছেন। যুধিষ্ঠিরের ভূমিকাতেও নাকি স্টেজে তাঁর পা টলেছে। গলায় জড়তা ধরা পড়েছে। সব অতি-রঞ্জিত। টাকাকড়ির গরমিলের গুজবও তাই। শেষ পর্যন্ত রতনবাবু রূপমহলের অন্দরমহলের আর একজনকে নিয়ে গেলেন। নীলাম্বরকে বললেন, 'তুমি বরং কটা দিন বিশ্রাম করো। ছুটি নাও।'

নীলাম্বর চিরদিনের মত ছুটি নিয়ে চলে এলেন। অবশ্য সহজে আসেননি।

সুরশ্রীকে বললেন, 'এসো আমরা নতুন

কিছু গড়ে তুলি।'

গড়ে তুলবার কম চেষ্টা করেন নি নীলাম্বর। বার বার লোকসান দিয়েছেন। তবু দাঁতে দাঁত চেপে বলেছেন, 'যতবার পড়ব ততবার উঠব।'

কিন্তু ওঠা আর হয়নি। মঞ্চ গড়বার শক্তি আর মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার শক্তি ভিন্ন ধরনের।

শেষে একদিন সুরশ্রী বলল, 'এভাবে বসে থাকলে সব যে ভুলে যাব।'

নীলাম্বর বললেন, 'আমিই তো আছি। আমি তোমাকে ভুলতে দেব কেন।'

কিন্তু অত সহজে সুরশ্রীকে ভোলানো গেল না। তার যশ চাই, অর্থ চাই, প্রতি রাত্রে হাততালি চাই। শুধু একজনের হাতের মধ্যে হাত রেখে মুখোমুখি বসে থাকলে তার চলবে কেন?

নীলাম্বর অভিমান করে বললেন, 'বেশ যাও।' তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে রঙ্গিণী থিয়েটারে চলে গেল। সে যা চেয়েছিল তাই পেল। তার বেশিই পেল হয়তো।

নীলাম্বর যা পেয়েছিলেন তা হারাতে লাগলেন। একজনের আরোহণ আর এক-জনের ক্রমাগত অবরোহণ। বছর পাঁচেক ধরে সেই পালা চলল। তারপর সব নিশ্চল।

জীবন যেন পাশার দান। পাশা যখন হারায় তখন সাধ্য নেই কারো জিতবার। জীবনের মত বড় জুয়াড়ী দ্বিতীয় আর কেউ নেই। নীলাম্বর ভাবেন মাঝে মাঝে।

এক সময় পাশা খেলার প্রচণ্ড নেশা ছিল নীলাম্বরের। কিছুতেই হার মানতে চাইতেন না। অনেক ভেবে চিন্তে গুটি চালতেন। তিনি যে পাকা খেলোয়াড় এ সুখ্যাতি সবাই করত। তবু মাঝে মাঝে হেরে যেতেন নীলাম্বর। দানে হারতেন। নিজের হাতের দান খারাপ পড়লে কিছু উপায় ছিল না। কিন্তু সংগীর পাশার খারাপ দান পড়লে তিনি তাকে শুধু মারতে বাকি রাখতেন। কম বয়সী ছোকরা কেউ হলে কান মলে তাকে তুলে দিতেন আসর থেকে।

আজ অদৃশ্য হাতের কানমলা তিনি নিজে খাচ্ছেন। অদৃশ্য হাতের? অন্যের হাতের? না নীলাম্বর তা স্বীকার করেন না। শাস্তি যদি পেয়ে থাকেন সে শাস্তি তাঁর নিজের হাতের, ডুবে যদি থাকেন—স্বখাত সলিলে। এই স্বীকৃতির মধ্যেই পৌরুষ। এই তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট অহংকার। জীবন হয়তো একেবারে পাশার দান নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের মত এরও কতকগুলি নিয়ম আছে। তার নামই কি নৈতিক নিয়ম! সে কি গণিতের নিয়মের মতই অমোঘ? জীবনও কি দাবা পাশার ছক? চালে ভুল হলে আর রক্ষা নেই।

'বাবা, পাঁচটা বাজে আর কতক্ষণ ঘুমোবে? চা টা খাবে না? ওঠ এবার।'

শ্যামলীর ডাকে ঘুম ভাঙল নীলাম্বরের। ঘুম? তিনি কি তাহলে ঘুমোচ্ছিলেন? তিনি যা দেখছিলেন, তা কি তাহলে সত্যি নয়? বাস্তব নয়?

নীলাম্বর বললেন, 'কখন এলি মলি।'

শ্যামলী বলল, 'অনেকক্ষণ হল। ছুটি নিয়ে আগেই চলে এসেছি।'

নীলাম্বর হাসলেন, 'পাছে আমি পালাই সেইজন্যে? আমাকে পাহারা দিবি, ধরে রাখবি?'

শ্যামলীও হাসল, 'তা দরকার হলে দিতে হবে বই কি।'

নীলাম্বরের মনে পড়ল এক সময় পাহারা ওরা কম দেয়নি। স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে কম চৌকিদারী করেনি। ঘুমে ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে কতদিন তাঁর দুটি ছেলেমেয়ে সন্ধ্যার পর থেকে অজস্রবার ঘরবার করেছে। পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভেবেছে বাবা কখন ফিরবেন, কী মূর্তিতে কী কাণ্ড করে ফিরবেন।

শ্যামলী বলল, 'অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছ বাবা।'

নীলাম্বর বললেন, 'ভারি সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখছিলাম।'

শ্যামলী বলল, 'কিসের স্বপ্ন বাবা?'

নীলাম্বর ভয়ে ভয়ে একটু হাসলেন, 'শুনলে তো রাগ করবি। সেই থিয়েটারের স্বপ্ন।'

শ্যামলী মুখ ভার করে বলল, 'তুমি আর কী দেখবে।'

নীলাম্বর বললেন, 'যা বলেছিস। ছেলেবেলা থেকে ওই তো কেবল দেখে এসেছি। স্কুল পালিয়েছি পরীক্ষার সময় পর্যন্ত থিয়েটার দেখা বাদ দিইনি। তবু পাশ করেছি। শুধু অভিনয় দেখেছি আর অভিনয় করেছি। জীবনে আর কিছুই করিনি। শুধু মাঝখানে বছর দুয়েক কেরানীগিরি করেছিলাম। কিন্তু সেই কলম পেশা কিছুতেই পোষাল না। আবার কি যাব অফিসে? এই বয়সে কেউ কি নেবে?'

শ্যামলী বলল, 'কী দরকার বাবা? আমিই তো আছি।'

নীলাম্বর ভাবলেন, তা ঠিক। ওরা এখনো আছে। শেষ পর্যন্ত জীবনে এমনি দুজন একজনই থাকে। সেই পুরোন বন্ধন, সেই চিরন্তন আশ্রয়।

শ্যামলী বলল, 'যাই তোমার চা নিয়ে আসি।'

যে স্বপ্ন দেখেছিলেন নীলাম্বর, মেয়ের কাছে তা বলতে ভরসা পেলেন না।

থিয়েটারের সেই গ্রীনরুম। কী নাটক মনে পড়ছে না। কিন্তু তিনিই প্রধান অভিনেতা। নবীন যুবকের সর্বাংগে রাজ-সজ্জা। আর সেই নাটকের নায়িকা, একটু বাদেই মঞ্চের ওপর যার সংগে সেই রাজপুত্রের মধুর মান অভিমান, প্রণয় সম্ভাষণ শুরু হবে, মঞ্চে উঠবার আগে সে নিচু হয়ে নীলাম্বরকে প্রণাম করছে। নীলাম্বর মঞ্চে প্রণয়ী, গ্রীনরুমে শিক্ষা-গুরু। প্রণতা সেই তরুণী নারীটির রূপের তুলনা নেই। দীর্ঘ বেণী পিঠে প্রলম্বিত। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই প্রণত অবনত ভঙ্গিটি চিনতে আর বাকি নেই নীলাম্বরের। সেই পুষ্পিতা পদ্মিনী নারী নিজেই যেন অতনুর পুষ্প-ধনুর আকার নিয়েছে।

যবনিকার ওপাশে প্রেক্ষাঘরে উজ্জ্বল আলোর জোয়ার। সে ঘর জনসমাগমে ভরে উঠেছে। উৎসুক অধীর নাট্যামোদীর দল অপেক্ষা করছে। এবার যবনিকা উঠবে।

শ্যামলী ফের চা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। হেসে বলল, 'মনে আছে তুমি আজ আমাদের সংগে বেরোবে? মুখ হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নাও বাবা।'

'তৈরি হয়ে নেব?'

'নেবে না?'

'তোর মা যাবে তো?'

'না গেলে ছাড়বে কে? তুমি আর আমি দুজনে জোর করে নিয়ে যাব। যাই মাকে তাড়া দিয়ে আসি।'

চা শেষ করে কাপটি নামিয়ে রাখলেন নীলাম্বর। বড় অকৃতজ্ঞ সুরশ্রী। ঘুরে ফিরে আবার সেই রতনবাবুর থিয়েটারেই যোগ দিয়েছে। যেখানে অর্থ সেখানে সুরশ্রী, যেখানে যশ সেখানে সুরশ্রী। যেখানে তরুণ চারুদর্শন নট সেখানে সুরশ্রী। এই মুহূর্তে নীলাম্বরের মনে পড়ল না তিনিও তাই ছিলেন।

কিন্তু কেউ কেউ বলে সুরশ্রী তাঁকে ভুললেও তাঁর সেই অভিনয়ের ধারাকে ভুলতে পারে নি। তারপর অনেকের অনেকরকম হাতের ছাপ ওর ওপর পড়েছে। কিন্তু নীলাম্বরের ছাপ নাকি এখনো ধুয়ে মুছে যায়নি। কেউ কেউ বলে তা আজও স্পষ্ট অপরিম্লান। বড় দেখতে ইচ্ছা করে। অনেক-দিন ওর অভিনয় দেখেন নি নীলাম্বর। আরো কত নিপুণা হয়েছে বড় দেখতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু কী করে যাবেন নীলাম্বর? বুক পোস্টে পাঠানো একখানা কার্ড সম্বল করে কী করে যাবেন? অত তাচ্ছিল্যের আমন্ত্রণে কী করে সাড়া দেবেন? চাকরবাকর কেউ থাকলে, এই কার্ড দিয়ে তিনি তাকে পাঠিয়ে দিতেন। উচিত জবাব হত।

নীলাম্বর আরো কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। মেয়ে বোধহয় এবার সাজতে গেছে। মাকে রাজী করাতে পেরেছে কিনা কে জানে। ইন্দিরা আজকাল আর সহজে বেরোতে চান

মা। বলেন, 'কোন্ মুখে বেরোব।' নীলাম্বর তো আর সে কথা বলতে পারেন না। তাঁকে কতবার কতজনের মুখ ধার করতে হয়েছে। সেই সব ধারকরা মুখই যেন তাঁর নিজের মুখ। যখন নিজের কথা একেবারে ভুলে সেই সব পরের মুখে কথা বলেছেন নীলাম্বর তখনই বেশি সার্থক হয়েছেন। এখন আর তা হবার জো নেই। এখন নিজের ওপর নিজে চেপে বসেছেন। এখন নীলাম্বর চৌধুরীর ভূমিকায় নীলাম্বর চৌধুরী। সে ভূমিকা তুচ্ছ নগণ্য। কিন্তু এতকাল তিনি যা দিয়েছেন তা কি কিছুই গণ্য করবার মত নয়? তবু লোকে ভুলে যাবে, সবই ভুলবে। দেহপট সনে নট সকলই হারায়। তিনিও হারাবেন। হয়তো এরই মধ্যে সব হারিয়ে বসে আছেন। পটোত্তলনের পর পটোত্তলন হচ্ছে। কে কাকে মনে রাখে। মনে রাখাটাই যে বিচারের সব চেয়ে বড় মাপকাঠি তাইবা কে বলল। তুমি যদি এক মুহূর্তের জন্যেও কিছু দিয়ে থাকো সেই মুহূর্তটিকে তুমি পেলে। সেই মুহূর্তটিতে তুমি অমর। সিদ্ধিতে নয়, সাধনার সেই বিরল মুহূর্তগুলির মধ্যেই অমরত্ব। তারপর জীবনভর অসংখ্য মৃত্যু আর অসংখ্য মুহূর্ত, অসংখ্য মুহূর্ত আর অসংখ্য মৃত্যু। যাঁরা ক্ষণজন্মা তাঁদের ক্ষণে ক্ষণে জন্ম, ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি। যারা ক্ষণজীবী, একটি কি দুটি শুভক্ষণই তাদের সারাজীবনের সম্বল।

নীলাম্বর উঠে পড়লেন। বেরিয়ে এলেন উঠোনে। পাঁচিলের ধার দিয়ে ফুলের টব পেতেছে শ্যামলী। কিছু বা আর্কিড। শখ আছে মেয়ের। অফিসের কেরানীগিরির পর যতটুকু সময় পায় উদ্যানচর্চা করে। একটি ফুলকে ফুটিয়ে তোলাই কি কম সৃষ্টি? তাতে কি কম আনন্দ?

দেয়ালের ডানদিকে আর একখানি ছোট ঘর। ভজনের বাসগৃহ। ভজন কালই ছুটি নিয়ে চলে গেছে। দোরটা খোলা।

নীলাম্বর আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলেন। ওর ঘরেও সিনেমা অ্যাকট্রেসদের ছবি টাঙানো। হাসলেন নীলাম্বর। প্রভু ভৃত্য কেউ মুক্ত নয়। উত্তর দক্ষিণ জুড়ে একখানি দড়ি টানানো। তার ওপর ছেঁড়া ময়লা জামা আর পাজামাটা ফেলে গেছে। বাবু কম নয় ভজন। বেশ নবাবী আছে। কিছুদিন বাদে বাদেই নতুন জামা কাপড়ের টাকা শ্যামলীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। মাসে দুবার সেলুনে যাবার পয়সা চায়।

হঠাৎ কী হল, ওর সেই ছেঁড়া জামাটা তুলে নিলেন নীলাম্বর। ঘৃণা নেই, অপ্রবৃত্তি নেই সেই জামা পরলেন। দোর ভেজিয়ে দিয়ে পরে নিলেন পাজামাটাও। ঘরের কোণে একরাশ ঝুল। দুহাতে তুলে নিয়ে মুখে মাখলেন। এবার মুখ দেখাতে কোন অসুবিধে নেই।

গ্রীনরুমে মেকআপ শেষ হল। এবার মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়ালেন নীলাম্বর। দেয়ালের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়ালেন বারান্দার সামনে। চাকরের গলার অবিকল নকল করে ডাকলেন, 'ঠাকরুণ। কত্তাবাবুর কাটখানা দিন।'

ইন্দিরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বিকেলে গা ধুয়েছেন, চুল বেঁধেছেন, নীল পেড়ে শাড়ি পরনে। কপালে সিঁদুরের টিপ। প্রথমে একটু চমকে উঠলেন, তারপর স্বামীকে চিনতে পেরে হেসে মুখে আঁচল চেপে বললেন, 'ও কি সঙ হয়েছে?'

নীলাম্বর বললেন, 'যাক জন্ম সার্থক। তবু একটু হাসি দেখলাম মুখে।'

তারপর ফের ভজনের গলার অনুকরণ করে বললেন, 'কত্তাবাবুর কাটখানা দিন। থিয়েটার দেখে আসি, বড় বাহারের থিয়েটার নাকি হচ্ছে আজ?'

ইন্দিরার দেওয়ার অপেক্ষা রাখলেন না নীলাম্বর। সকাল থেকে যে কার্ডখানা চেয়ারের তলায় পড়েছিল, হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে সেখানা কুড়িয়ে নিলেন। তারপর ফের একটু হেসে বললেন, 'যাই ঠাকরুণ।'

এবার ইন্দিরার মুখ ফের শক্ত হয়ে উঠল। তিনি কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'তবু তুমি যাবেই।'

অসহায়ভাবে তিনি মেয়েকে ডাকলেন, 'মলি দেখ এসে। তোর বাবার কাণ্ড দেখ এসে।'

চুল বাঁধছিল শ্যামলী। ডাক শুনে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। তারপর বলল, 'এ কী ব্যাপার!'

ইন্দিরা মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন, 'উনি চাকর সেজে থিয়েটারে যাচ্ছেন।'

শ্যামলী বলল, 'বাবা, তুমি কি পাগল হলে?'

ইন্দিরা বললেন, 'পাগল নয়, উনি ফের মাতাল হয়েছেন। মলি, ওঁকে ধরে নিয়ে যা। ধরে নিয়ে বেঁধে রাখ।'

শ্যামলী এগিয়ে এসে বাবার হাত ধরল। বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

কৌতুকের হাসিটুকু গোপন করে নীলাম্বর পরম অনুগত বালক হয়ে গেলেন। মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন বাথরুমে। শ্যামলী সাবান জল দিয়ে নিজের হাতে বাবার মুখের কালিঝুলি ধুয়ে দিতে লাগল।

ধরা পড়া দুষ্ট দুরন্ত ছেলের মত নীলাম্বর শান্তভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শ্যামলী বলল, 'ছি ছি ছি কত কালি মেখেছ বল তো!'

নীলাম্বর বললেন, 'সব কালি কি ধুয়ে দিতে পারবি মা?'

শ্যামলী এ কথার কোন জবাব না দিয়ে ঘরে এসে আলমারি খুলল। ধোয়া জামা-কাপড় বের করে নীলাম্বরের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যেতে হয় ভদ্রবেশে যাও।'

ইন্দিরা দোরের কাছ থেকে বললেন, 'আর বলে দিস ভদ্রবেশে ফিরেও যেন আসেন।'

কিন্তু ধোয়া জামাকাপড় আর পরলেন না নীলাম্বর। লুঙ্গি পরলেন, গেঞ্জি পরলেন।

শ্যামলী বলল, 'ও কি, যাবে না?'

নীলাম্বর বললেন, 'পাগল নাকি? আমার যাওয়া হয়ে গেছে। তার চেয়ে আয় তিনজনে বসে দুহাত তাস খেলি।'

ইন্দিরা ঠোঁট উলটে বললেন, 'ঈস্, তোমার সঙ্গে তাস খেলবে কে?'

নীলাম্বর স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি গো তুমি।'

শ্যামলী তাড়াতাড়ি নিজেই আড়ালে চলে গেল। বাবা কি কাণ্ড করে বসেন তার ঠিক নেই। উনি এখন স্টেজে উঠেছেন। শ্যামলী তাঁর কাছে অডিয়েন্স ছাড়া আর কেউ নয়।

চেয়ারটা গুটিয়ে নিয়ে বারান্দায় রঙীন মাদুর পাতল শ্যামলী। মাকে জোর করে এনে তাসের আসরে বসাল। মা আর মেয়ে এক পক্ষে। নীলাম্বর একা।

তাস সাফল করে বেঁটে দিতে লাগল শ্যামলী।

সেই অবসরে নীলাম্বর বাইরের দিকে তাকালেন। এখান থেকে রাস্তা দেখা যায়। দুদিকে সবুজের দৃশ্যপট। মাঝখান দিয়ে সাদা রাস্তা। ওই রাস্তা কোন্ এক রঙ্গ-মঞ্চের ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। আজ আর হল না। আর একদিন যেতে হবে। কমপ্লি-মেণ্টারি কার্ডে নয়, টিকেট কেটেই যাবেন নীলাম্বর। সবচেয়ে সস্তা দামের টিকেটে সব চেয়ে পিছনের সারিতে বসবেন। কত নতুন আর্টিস্ট সব এসেছেন। তাঁদের নাকি সব নতুন নতুন ধারা, সবটা হয়তো নিতে পারবেন না নীলাম্বর। একটা জেনারেশনের তফাৎ হয়ে গেছে। কিন্তু খানিক খানিক নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। আর যেখানে ভালো লাগবে সেখানে হাততালি দেবেন। জোর হাততালি দেবেন। এতদিন পেয়েছেন, এবার তাঁর দেওয়ার ভূমিকা। এ ভূমিকায়ও উৎরানো চাই।

শ্যামলী বলল, 'তাস দিয়েছি বাবা। তাস নাও তোমার।'

নীলাম্বর একটু হেসে তাসগুলি গুছিয়ে তুলতে লাগলেন।

অমল—বাবা, বাড়ীতে যে আসে, যার সঙ্গে পথে, পার্কে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে দেখা হয় তার কাছে সব জায়গাতেই আমার গুণকীর্তন করে এত বড়াই করেন কেন? সোনার চাঁদ, হীরের টুকরো, কুল-তিলক—এইরূপ সব বিশেষণ দিয়ে আমার কথা বলেন। কী এমন করেছি বা হয়েছি যে, আমার গৌরব করে আপনি অপ্রকৃতিস্থ ও ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে পড়ছেন? আমি যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না। সেদিন একটা দোকানে উঠতে গিয়ে আমার কানে গেল—'ঐ কুলতিলক' আসছেন।'

পিতা—তোমার কানে তোলা হয়েছে দেখছি। যত সব হিংসুকের দল ফেলকরা বেকার ছেলেদের বাপেরা হিংসায় মরছে—সত্য কথা বলবার উপায় নেই।

অমল—যদি তাদের হিংসুকই মনে করেন, তাহলে তাদের মনে হিংসে জাগাবার জন্য তাদের কাছে ওসব বলেন কেন? আমি নানা পরীক্ষায় কি ফল করেছি সবাই তা জানে। সে কথা বারবার শুনিয়ে লাভ কি? আত্ম-তৃপ্তির উল্লাসের আবেগে অতিরঞ্জনও অত্যুক্তি হয়ে যায় যে। প্রথম পরীক্ষা দুটোয় বৃত্তি পেয়েছিলাম, অনেকেই পায়। বি-এ অনার্সের ফার্স্ট ক্লাস পাইনি সামান্যের জন্য। ফার্স্ট ক্লাস একজন পেয়েছিল। এম-এ পরীক্ষায় অবশ্য ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম—তাও ফোর্থ হয়ে। ৩।৪ মার্ক কম পেলেই সেকেণ্ড ক্লাস হয়ে যেত। এ-তো একটা অসামান্য ফল নয়। কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় নয়জনের নীচে আমার স্থান ছিল। বছর বছর বহু ছেলেমেয়েই আজকাল ফার্স্ট ক্লাস পায়। কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতেও সাফল্য লাভ করে।

কখনো কোন পরীক্ষায় ফার্স্ট ছাড়া সেকেণ্ড হয়নি এমন ছেলেও আছে—তার বাপ তো নিজের ছেলের অসামান্য সাফল্য ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে প্রচার করে না।

আপনার পরিচয়ের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে হয়ত বেশি ছেলে আমার মতো সাফল্যলাভ করেনি। কিন্তু আমার পরিচিত বহু ছেলে-মেয়েই আমার চেয়ে ঢের বেশি ভালো ফল করেছে। গুণানুযায়ী যে তালিকা বেরোয় কৃতী ছাত্রদের, প্রকৃতপক্ষে সে তালিকার দশজনের মধ্যে বিদ্যার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাদের খাতাগুলো অন্য কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পরীক্ষা করলে কে নীচে নামবে, কে উপরে উঠবে তার ঠিক নেই। যতটা বিদ্যা জীবনের অঙ্গীভূত হয় ততটাই খাঁটি। তার কষ্ঠী পাথর সরকারী চাকরিতে নেই—আছে অধ্যাপনায় ও গ্রন্থরচনায়। তাই বিদ্যার গৌরব করতে আমার লজ্জাবোধ হয়। পরীক্ষার ব্যাপারে দৈবের উপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়।

ভবিষ্যতে আমি কত মাহিনা পাব—কোন্ কোন্ উচ্চপদে আমি অধিষ্ঠিত হব—কোন্ সর্বোচ্চ পদ তিন হাজার টাকা বেতন নিয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে—এসব কথা কোথাও বলবেন না। সরকারী কাজের চেয়ে বে-সরকারী অনেক কাজে ঢের বেশী মাহিনা হয়—অথচ তার জন্য প্রথম বিভাগে এম-এ পাস করতে হয় না। সরকারী চাকরি এমন একটা লোভনীয় বস্তু নয়—যার গৌরবে আত্মহারা হয়ে পড়তে হবে।

পিতা—সরকারী কাজে যে মান-মর্যাদা বেসরকারী কাজে কি তা আছে, বাবা? তুমিও রিটায়ার করে বেসরকারী কাজে দ্বিগুণ মাহিনা পাবে—এদিকে পেনসনও পাবে।

অমল—সরকারী কাজে মানমর্যাদা যা-ই থাকুক, তা বজায় রাখতে যে ফতুর হতে হয়।—খুব কি লাভ হয়, বাবা? আপনি বংশের—এমন কি দেশের মুখ উজ্জ্বল করার কথাও বলেন; বেশি মাইনে পেলে বা ভালো করে পাস করলেই কি দেশের, দশের, সমাজের বা বংশের মুখ উজ্জ্বল করা যায়? মুখ উজ্জ্বল করতে হলে যার মুখ তাকে কিছু দান করতে হয়—শুধু চাকরি করে কি কিছু স্থায়ী সম্পদ দান করা যায়? একটা বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক হলেও সমাজকে যা দিতে পারতাম, এ চাকরিতে তা পারব না। নিজ সমাজ ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন বরং আপনার ভাইপো, কমলদা।

পিতা—দূরে—দূর!—সে-ত একটা খবরের কাগজের আফিসে চাকরি করে, বি-এও পাস করেনি।

অমল—সে বি-এ পাস করেনি বটে, কিন্তু বিশখানা বই লিখেছে—সে সারা দেশের প্রীতি-শ্রদ্ধার পাত্র। তার পরিচয়ে—তার ভাই বলে আমি সর্বত্র পরিচিত। আমাকে কে বা চেনে? বাংলা কাগজে তার বক্তৃতা, বই-এর প্রশংসা। ছবি বেরোয়—আপনি তো বাংলা কাগজ পড়েন না। এসব খবর জানতে পারেন না। কমলদার অসামান্য প্রতিষ্ঠার আমি গৌরব অনুভব করি। ছ' মাস অন্তর তার বই-এর সংস্করণ হয়। তাছাড়া, সিনেমায় তার বই-এর ছবি দেখানো হয়। সে সারা দেশকে শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ বিতরণ করছে।

পিতা—তাই নাকি? কই। সিনেমার পাস তো দেয় না। যাই হোক, তার মাহিনা আর কতই হবে?

অমল—মাহিনা তার আজকাল নেহাৎ কম নয়। তাছাড়া, তার প্রত্যেক লেখার দক্ষিণা আছে, বই বিক্রীর যথেষ্ট আয় আছে। সিনেমায় বই-এর ছবি হলে মোটা টাকা পাওনা আছে। তার যে আয় এখন হয়েছে, আমার চাকরির আয় কোনদিন তা হবে কিনা সন্দেহ!

পিতা—বলিস কি রে! এ তো খুব সুসংবাদ। বেশি লেখাপড়া না শিখেও সে এত রোজগার করছে! তা ছাড়া, বই লিখছে! কি লেখে সে? কি জানে সে?

অমল—গল্প, উপন্যাস,—

পিতা—তাই বল, তাই ভাবছি লেখাপড়া না শিখে আবার কি লিখবে? মিথ্যে গল্প বানায়।

অমল—লোকে আপনাকে অমলের বাবা বলে চিনবে না, কমলের কাকা বলেই চিনবে, আমাকে চিনবে কমলের ভাই বলে।

পিতা—কই? ইদানীং তো আর আসেও না। আগে আসত মাঝে মাঝে।

অমল—দমদম থেকে বালিগঞ্জে আসা তো সহজ নয়—তাছাড়া, তার অবসরই নেই। তারপর আপনার ভাগ্নে অনিলদারও গৌরব করতে পারেন।

পিতা—সে তো বি এস-সি পড়তে পড়তে ছেড়ে দিল। তার আবার গৌরব কি? সে তো বখাটে হয়ে গেছে।

অমল—সে এখন একজন সিনেমা আর্টিস্ট, অভিনয় বিদ্যায় তার নাম সুপ্রসিদ্ধ

—তাকে দেখবার জন্য পথে লোকের ভিড় জমে।

পিতা—আরে রামঃ রামঃ। তবে তো সে অধঃপাতে গিয়েছে বল।

অমল—আপনার ধারণা ভ্রান্ত, বাবা। তাছাড়া, সে সঙ্গীতবিদ্যাতেও পারদর্শী। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসই শুধু বিদ্যা নয়, অভিনয়বিদ্যা সঙ্গীতবিদ্যাও বিদ্যা। এই দুই বিষয়ে যদি এম-এ থাকত তবে অনিলদাদা প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হতেন। সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় তাঁর ছবি। অনিলদা দেশের আপামর সাধারণের ভালবাসার পাত্র। এ লাইনে অনিলদা অল্পদিনের মধ্যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সারা দেশকে তিনি আনন্দদান করছেন ব'লে তিনি বরং দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

পিতা—তা তো হ'ল—তার আর্থিক আয়টা কি? সেটাই বড় কথা।

অমল—আপনারা মাহিনা দিয়েই সকলের আয়ের মাপ করেন—মাহিনার মানদণ্ডে এঁদের আয় মাপা যায় না। এই বললেই যথেষ্ট হবে—অনিলদা মোটর কিনেছেন—যা বিশ বছর পরেও আমি কিনতে পারব কিনা সন্দেহ।

বাবা—অনিল সিনেমায় নেমেছে শুনে মনটা খারাপ হলো বটে, তবে আয়ের কথা অনুমান করে আশ্বস্ত হ'লাম। যাই হোক বাবা বিদ্যার গৌরবটা যাবে কোথা? বিদ্যায় তুমি তাদের অতিক্রম করেছ। সেটাই আসল গৌরব।

অমল—বিদ্যার মর্যাদাই যদি স্বীকার করতে হয় তা হলে দাদার গৌরব কেন করেন না? বিদ্যা তো তাঁর আমার চেয়ে কম নয়, বরং বেশী।

পিতা—সে তো একজন স্কুল মাস্টার, মাত্র তিন বছর হেডমাস্টার হয়েছে—তাও সরকারী স্কুলে নয়। সে বৃত্তিও পায়নি, অনার্সও পায়নি।

অমল—এখানেও আপনার ভ্রান্ত ধারণা। দাদাও এম-এ পাস এবং ইংরাজীর এম-এ। ইংরাজীতে ফার্স্টক্লাস পাওয়া খুবই শক্ত! ৮।১০ মার্কের জন্য তিনি ফার্স্ট ক্লাস পাননি। তাছাড়া, তিনি বি-টি। আমার অধ্যাপকদের অনেকেই সেকেন্ড ক্লাস এম-এ। তাই বলে কি আমি তাঁদের চেয়ে বিদ্বান্? দাদা ইচ্ছা করলে অনায়াসে কলেজে যেতে পারেন। আমার যা-কিছু বিদ্যা তা তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। তিনি আমাকে বি-এ পর্যন্ত পড়িয়েছেন—ইকনমিকসে এম-এ না পড়ে ইংরাজীতে এম-এ পড়লে তিনিই পড়াতে পারতেন। আমি তাঁর মতো ইংরাজি লিখতেও পারি না, বলতেও পারি না। প্রাইভেটে পরীক্ষা না দিলে তিনি নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণী পেতেন। তিনি টিউশনী করেন কলেজের ছেলেদের। তাঁর কোচিং ক্লাসে বি-এর ছাত্রছাত্রীরাই পড়ে। শিক্ষাবিভাগে থাকার জন্য তাঁর অধীত বিদ্যার রীতিমত অনুশীলন হচ্ছে। সরকারী চাকরিতে ঢুকে আমি অল্পদিনের মধ্যেই সব ভুলে যাব এবং সাধারণ বি-এর স্তরে নেমে যাব। তাঁর আয়ও সামান্য নয়, তাঁর আয়কে অতিক্রম করতে আমার বহুদিন লাগবে। এত বড় সংসারটাকে তিনি বারো বছর চালাচ্ছেন—ভাইবোনদের এডুকেশন দিয়েছেন—এখনও দিচ্ছেন।

বাবা—তারই তো সংসার, তার অনেকগুলি ছেলেপুলে। কি আয় করে তার খোঁজও রাখি না। তার আয়েই তো সংসার চলছে। আমার পেনসনের টাকা সে নেয় না।

অমল—তারই সংসার বলছেন কেন? সংসার তো আপনারই। মা রয়েছেন, বিমল কলেজে পড়ছে, কমলার বিয়ের কথা আপনাকে চিন্তা করতে হচ্ছে। আমার যে এতো গৌরব করেন—আমি তো জেলায় জেলায় ঘুরব। পদপদবীর মান রাখতেই আমাকে ফতুর হতে হবে—আমি যে কি দিতে পারব তা এখনও জানি না। অফিসারের ঠাট-বাট চাল-চলন বজায় রাখতে কি যে ব্যয় হবে ধারণাই আমার নেই। 'হীরের টুকরা' হয়ত পরিবারের শোভা বর্ধনই করবে। আপনি ও মা দুজনেই মেজো বৌ-এর প্রশংসা করে বেড়ান শতমুখে নানাস্থলে,—প্রশংসার সে কি করেছে?

বাবা—সে বি-এ পাস। বড়লোকের আদরের মেয়ে, স্বর্ণপ্রতিমা, তবু কিছুমাত্র অহংকার নেই।

অমল—বি-এ পাস করা মেয়ে তো এখন ঘরে ঘরে। তার আবার অহংকার কি? বড়লোকের মেয়ে হলেও তার অহংকার নেই, বলছেন, হয়ত সে তা বুদ্ধিবলে গোপন করতে পারে। গরিবের ঘরে আসতে হ'লে অলংকারের সঙ্গে বাক্সভরে অহংকারকে আনা চলে না—এতে আবার সুখ্যাতির কি আছে? আর ক'দিনই বা সে এসেছে! তার চরিত্র বিচারের সময়ই আসেনি। তাকে তো রান্নাঘরে ঢুকতে দিলেন না—বাড়ির কোন কাজ করতে দিলেন না। কাজ যে করে তারই ভুলত্রুটী হয়, যে পিতৃ-দত্ত সোফায় বসে তোফা আরাম করতে সুবিধা পায় তার তো কোন ত্রুটী হওয়ার কথা নয়। লক্ষ্মীস্বরূপিনী মহীয়সী মহিলা আমার বৌদিদি। দুবেলা সকলকে রেঁধে খাওয়াচ্ছেন। ছেলেপুলের বায়না আবদার, ঝক্কি সবই সইছেন, যারই রোগবালাই হোক তারই শুশ্রূষা করছেন, আপনাদের সর্বদা সেবা করছেন, ছোটভাই-এর মতো স্নেহের চোখে দেখে আমাদের মানুষ করলেন, কোন আরাম, বিলাস, বিশ্রাম নেই—কই একদিনের জন্য কখনও তো তাঁর সুখ্যাতি করেন না কুত্রাপি। বরং সামান্য ভুলচুক হলে তাঁকে মা তিরস্কার করেন। তিনি নীরবে সহ্য করেন, আমার চোখে জল আসে।

বাবা—তারই তো সংসার। তার যা কর্তব্য তাই করছে, এর আবার সুখ্যাতি কিসের? গরিবের মেয়ে সে, গৃহকর্ম তারই তো সব জানা থাকার কথা। হিন্দু বিধবা একাদশী করলে কি কেউ তার সুখ্যাতি করে? বড়বৌ লেখাপড়া বিশেষ জানে না, ছেলেপুলের মা, সে সংসারের ভার নিয়ে খেটেপুটে তা ঠিকমত চালাবে—এই ত স্বাভাবিক—তার জন্য গুণগান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ধন্যবাদ বা সাধুবাদ দান বাঙালী হিন্দু সমাজের প্রথা নয়।

অমল—আপনার মেজো বৌয়ের কাছে সেবা-যত্ন কিছুই পাবেন না। ও ঘুরবে আমার সঙ্গে স্থান হতে স্থানান্তরে। বড়লোকের বাড়িতে আমার বিয়ে দিয়ে অনেক বিলাসদ্রব্য নিলেন, ওসব আমার সঙ্গে যাবে না—এখানে একটা ঘর দখল করে পড়ে থাকবে। আমার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন তেজস্বী দাদা ওসব নিজেও স্পর্শ করবেন না—কাউকে ব্যবহার করতেও দেবেন না। ওসব আপনার 'হীরের টুকরো' বিক্রীর মূল্য। রেখে দিন ওসব, কমলার বিয়েতে কাজে লাগবে। আমার যে বিদ্যার আপনি গৌরব বোধ করেন—সে বিদ্যার মর্ম আমার শ্বশুরকুল উপলব্ধি করেনি—ও'রা দেখেছিলেন আমার চাকরি ও প্রসপেক্ট। একজন অধ্যাপকের ঘরে বিয়ে দিলে সে বধূ এবাড়ির উপযুক্ত বধূ হত। আপনি খুঁজেছিলেন আপনার সোনার চাঁদের সহযোগিনী স্বর্ণপ্রতিমা। মনে রাখবেন, সেবার জন্য বড়বৌ ও বাড়ির শোভার জন্য এই মেজো বৌ। আমাকে হীরের টুকরো মনে করে সমর্পণের জন্য উপযুক্ত পাণিই খুঁজেছিলেন—নিজের পরিবারের লাভালাভের কথা ভাবেননি। মনে রাখবেন, আপনার আসল হীরের টুকরো, আমার দাদা আর বৌদিদি।

দাম্পত্য জীবনে শাসক শাসিতা সম্পর্ক আর নেই। ব্যয় সম্বন্ধে কতটা শাসন নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে বলতে পারি না। বড়লোকের মেয়ের চাল ও সরকারী অফিসারের চাল, এই দো-চালার মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে।

মাধোজি সিন্ধিয়া—ভারতভাগ্যের স্থপতি, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো।

সর্দার প্যাটেল—এ যে মহারাজ সিন্ধিয়া! আজ আমার কি সৌভাগ্য।

মাধোজি সিন্ধিয়া—সৌভাগ্য আমার, আজ দুই শতাব্দী ধরে যে মানুষটিকে সন্ধান ক'রে ফিরছি এতদিনে তার দেখা পেলাম।

প্যাটেল—কেন মহারাজ, তুমি নিজেই কি সেই মানুষটি নও।

সিন্ধিয়া—আধখানা মাত্র।

প্যাটেল—আধখানা কেন?

সিন্ধিয়া—আকাঙ্ক্ষায় আমি সেই মানুষ, কীর্তিতে নই।

প্যাটেল—আরও একটু বুঝিয়ে বলো।

সিন্ধিয়া—আমি যা করবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলাম তোমার মধ্যে তার সিদ্ধির মূর্তি দেখতে পাচ্ছি।

প্যাটেল—এমন কথা এমন লোকের মুখে! সৌভাগ্যের এ যে শেষ সোপান। তবু——

সিন্ধিয়া—থামলে কেন?

প্যাটেল—তবু বহুলোকে আমাকে ভুল বুঝেছে।

সিন্ধিয়া—বহুতর লোকে কি তোমাকে ঠিক বোঝেনি, সাধুবাদ করেনি?

প্যাটেল—কিন্তু লোকেই বা ভুল বুঝবে কেন?

সিন্ধিয়া—সব লোকে সমান বুঝবে এমন কোন্ কাজ আছে?

প্যাটেল—তা বটে। ইংরেজ সরকার এই বলে বরাবর ভয় দেখিয়ে এসেছে যে, হিন্দুস্থানের তিনশ ষাটটা সামন্তরাজ্য রাষ্ট্র-তরণীতে তিনশ ষাটটা ছিদ্র। জল উঠে ভরাডুবি হতে বেশি সময় লাগবে না।

সিন্ধিয়া—তবে তাদের হাতে নৌকা ভাসমান ছিল কি ভাবে?

প্যাটেল—ছিদ্রগুলো বন্ধ করে রেখেছিল, রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় এই তারা বুঝিয়ে এসেছে।

সিন্ধিয়া—যাওয়ার আগে ছিদ্রগুলো খুলে দিয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও বুঝিয়েছে। কি বলো?

প্যাটেল—ভাষায় না বললেও ভাবে বলেছে।

সিন্ধিয়া—কিন্তু নৌকা যখন ভাসমান অবস্থাতেই রইলো তখন কি বলল?

প্যাটেল—বলল ও ভাসা ভেসে থাকা নয়, তলিয়ে যাওয়ার ভূমিকা।

সিন্ধিয়া—এ-ও একপ্রকার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কি বলো?

প্যাটেল—নেহাৎ মিথ্যা বলোনি।

সিন্ধিয়া—পরিহাস নয় সর্দার, অবস্থার প্রতিকূলতাকে নিজের অনুকূলে এনে ফেলাই রাজনীতির চরম। ইংরেজের জুড়ি নেই এ বিদ্যায়। দেখো না কেন, একটা দেশকে যখন তারা অধিকার করে, তখন হয় বীরত্ব, আবার একটা দেশকে যখন ছেড়ে যায়, হয় মহত্ত্ব। ইংরেজ সৈন্য এগিয়ে গেলে হয় কৌশল, পিছিয়ে এলে ততোধিক কৌশল। ওরা বুঝতে পারে না কখন পরাজিত হল, তাই সর্বদাই শেষ জয়টা ওদের সুনিশ্চিত।

প্যাটেল—তুমি ওদের ধাত ঠিক বুঝেছ দেখছি।

সিন্ধিয়া—দুঃখ এই যে, যথাসময়ে বুঝতে পারিনি। শেষ লড়াইটা যে হবে কোম্পানির সঙ্গে, একথা বুঝলাম সময় পেরিয়ে গেলে। পেশবা আর পেশবার অধীনস্থ আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে আমাদের প্রথম ও শেষ লড়াই মুঘলের সঙ্গে, আফগানের সঙ্গে, জাঠের সঙ্গে, রোহিলার সঙ্গে, রাজপুতের সঙ্গে, সবারই সঙ্গে কেবল কোম্পানির সঙ্গে নয়।

প্যাটেল—কিন্তু ইতিহাস বলছে যে, কার্যত মহারাষ্ট্রের হাত থেকেই হিন্দুস্থানের রাজগী কেড়ে নিয়েছে।

সিন্ধিয়া—নিয়েছে বই কি।

প্যাটেল—তবে?

সিন্ধিয়া—তবে আর কি, গৌণের সঙ্গে লড়াই শেষ ক'রে আবিষ্কার করলাম যে, সবচেয়ে বড় লড়াইটাই তখনো বাকি, তখন আর শক্তি নাই।

প্যাটেল—মহারাজ, ঐখানে বোধ করি আমাদের জিত, মুখ্য গৌণ গোড়া থেকেই আমাদের ঠিক ছিল।

সিন্ধিয়া—তার কারণ তোমাদের সময়ে মুখ্যই ছিল সব, গৌণ বলে কিছু ছিল না।

প্যাটেল—একথা সত্য নয় মহারাজ, গৌণ ছিল।

সিন্ধিয়া—তবে তাদের সঙ্গে লড়াইটাও বাকি আছে তোমাদের।

প্যাটেল—হয়তো। তবে সে গৌণ ঘরের।

সিন্ধিয়া—সর্দার, ঘরের গৌণ মুখ্যের চেয়েও মারাত্মক।

প্যাটেল—যদি সত্যি বাকি থাকে, লড়তে হবে।

সিন্ধিয়া—লড়তে হবে বই কি। তবে আপাতত যে লড়াই শেষ করেছ তার জন্যে অভিনন্দন গ্রহণ করো।

প্যাটেল—ইংরেজ হিন্দুস্থান ছেড়ে গিয়েছে।

সিন্ধিয়া—সেটা বড় কথা হলেও শেষ কথা নয়। তোমাদের আসল জয় ঘটেছে অন্যত্র, ইংরেজ বর্জিত হয়েও রাষ্ট্রতরণী বানচাল হ'য়ে যায়নি, ঐক্যবন্ধভাবে ভাসমান আছে। সর্দার, এই জয়টাই চরম আর তোমার একক কীর্তি।

প্যাটেল—তোমার মতো লোকের মুখে এমন প্রশংসা লুব্ধ ক'রে তুলছে মনকে। কিন্তু না, এ কারো একক কীর্তি নয়, সকলের সামগ্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এই সমগ্রতা।

সিন্ধিয়া—হ'তে পারে, তবু তুমিই তাদের মুখপাত্র।

প্যাটেল—অসম্ভব নয়।

সিন্ধিয়া—হাসলে কেন?

প্যাটেল—খণ্ডতার আসনে ব'সে আমি সাধনা করেছি এই অখণ্ডতার—সেই কথা মনে পড়ে হাসি এলো।

সিন্ধিয়া—বুঝিয়ে বলো।

প্যাটেল—যেযুগে আমি জন্মেছিলাম সে ছিল বিশ্ববোধের যুগ, ওরা বলতো আন্তর্জাতিকতা, সর্বজাতীয়তা, এমন আরও কত কি শ্রুতিমধুর অর্থহীন নাম। আমি কর্ণপাত করিনি ও সব কথায়, ছায়াপাত করেনি ও সব আমার মনে। ওরা যখন বিশ্বজোড়া আসন তৈরি করছিল আমি বেছে নিয়েছিলাম একখানি ছোট মাপের আসন।

সিন্ধিয়া— কী তার নাম?

প্যাটেল—অদ্য ও অত্র।

সিন্ধিয়া—অদ্য ও অত্র বলতে কি বুঝেছিলে?

প্যাটেল—পায়ের তলায় যেটুকু জমি

লদাখ সীমান্ত   শিল্পী ঃ রবীন ভট্টাচার্য

আছে, সেই আমার অস্ত্র আর মনের সম্মুখে যেটুকু সময় আছে, সেই আমার অদ্য। লোকে পরিহাস করেছে, বলেছে সেকেলে, বলেছে রক্ষণশীল, বলেছে ক্ষুদ্রমনা। আমি জানতাম, বৃহৎ ফাঁকির চেয়ে ক্ষুদ্র সত্য ভালো, জানতাম এক আকাশ শূন্যতার চেয়ে একটি মাত্র তারার মূল্য অধিক।

সিন্ধিয়া—কি তোমার সেই তারা?

প্যাটেল—হিন্দুস্থান। লোকে পরিহাস ক'রে বলেছে যে, তুমি হিন্দুস্থানের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ্ টাকার স্বপ্ন দেখছ, বলেছে ইংরেজের শাসনের গুণে বস্তুত যা শতখণ্ড তা এক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, বলেছে ইংরেজ শাসনের কাঠামো অপসারিত হ'লেই ভেঙে পড়বে তোমার স্বপ্নের স্তূপ।

সিন্ধিয়া—ও সব ইংরেজের শেখানো বুলি।

প্যাটেল—নিঃসন্দেহ। তবে পরের বুলি যখন নিজের বলে বোধ হয় তখনি তো কলির সন্ধ্যা।

সিন্ধিয়া—কিন্তু যখন ওরা দেখলো যে ইংরেজ গেল অথচ হিন্দুস্থান শতখণ্ড হ'য়ে গেল না, তখন কি বলল?

প্যাটেল—বলল, আমরা আগেই জানতাম।

সিন্ধিয়া—আগেই জানতাম বলবার লোক চিরকাল আছে দেখছি।

প্যাটেল—আর চিরকাল থাকবে দেখে নিয়ো।

সিন্ধিয়া—আমি যখন গোলাম কাদিরকে পরাজিত করে বন্দী করলাম লোকে বলল, আগেই জানতাম, আবার যখন রাজপুতদের কাছে পরাজিত হ'লাম, লোকে বলল, আগেই জানতাম।

প্যাটেল—ওরা জানে আগে, কেবল বলে পরে।

সিন্ধিয়া—তা জানুক ক্ষতি নাই। আমি ভাবছি কি জানো সর্দার, আমার ব্যর্থতার কি কারণ?

প্যাটেল—হয় তো কাল তোমার অনুকূলে ছিল না।

সিন্ধিয়া—কাল অনুকূলও নয়, প্রতিকূলও নয়, বুদ্ধিবলে তাকে অনুকূলে নিয়ে আসতে হয়, আবার বুদ্ধির অভাবে সে প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে।

প্যাটেল—মহারাজ সিন্ধিয়া, বুদ্ধির অভাব তোমার ছিল না, অষ্টাদশ শতকের গোধূলির আলো-আঁধারির মধ্যে চোখে পড়ে সন্ধ্যাতারার মতো দীপ্যমান তোমার বুদ্ধির জ্যোতি।

সিন্ধিয়া—মিথ্যা বিনয় ক'রে লাভ নেই, না, বুদ্ধির অভাব কোনকালেই আমার ছিল না। তৎসত্ত্বেও একটি জিনিস বুঝতে পারিনি।

প্যাটেল—কি সেটা?

সিন্ধিয়া—ইতিহাসের ইঙ্গিত। পশ্চিমের ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছিল হিন্দুস্থানে, বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারিনি যে হিন্দুস্থানের নূতন সিংহাসন তৈরি করতে শুরু করেছে বণিক ইংরেজ। আমরা ব্যস্ত ছিলাম জাঠ, রাজপুত, আফগান, রোহিলা মুঘলিয়াদের নিয়ে, কে জানতো যে এরা নূতন যুগের মানুষ নয়, অতীতের কঙ্কাল।

প্যাটেল—বৃথা আত্মগ্লানি অনুভব করো না মহারাজ, এ কথাটা সেদিনে কেউ বুঝতে পারেনি।

সিন্ধিয়া—যথার্থ বলেছ, কেউ বুঝতে পারেনি, তাই বাদশা শাহ আলম কোম্পানিকে দিয়েছিল দেওয়ানী সনদ, আবার লর্ড লেক দিল্লি অধিকার করলে, মারাঠা শাসন মুক্ত হ'ল ভেবে আনন্দিত হয়েছিল ঐ বাদশা শাহ আলম।

প্যাটেল—তবেই দেখো, তুমি একা দায়ী নও।

সিন্ধিয়া—অবশ্যই নই, তবু নিজের অবিবেচনাকে ক্ষমা করতে পারি কই। তবে একথা অস্বীকার করবো না যে, তোমার মতোই আমিও চেয়েছিলাম ক্ষুদ্র খণ্ড সামন্ত রাজ্যের ছিদ্রগুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে হিন্দুস্থানের তরণীকে নিরাপদ ক'রে তুলতে।

প্যাটেল—পারলে না কেন মহারাজ?

সিন্ধিয়া—অবিবেচনার কথা তো আগেই বলেছি, তা ছাড়া——

প্যাটেল—তাছাড়া আর কিছু আছে?

সিন্ধিয়া—আমাদের জানা এমন আর কোন ভিত্তি ছিল না, যার উপরে এই বিপুল রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারি।

প্যাটেল—বলো কি, কিছুই ছিল না?

সিন্ধিয়া—ছিল, তবে না থাকারই সামিল, একেবারে না থাকলেই বোধ করি ভালো ছিল।

প্যাটেল— কি সেই বিচিত্র বস্তু?

সিন্ধিয়া—অহং।

প্যাটেল—মানে?

সিন্ধিয়া—ব্যক্তিগত স্বার্থ। আমি ভেবেছি সিন্ধিয়ারাজ স্থাপন করবো, হোলকার ভেবেছে হোলকাররাজ স্থাপন করবে, গাইকোয়াড় ভেবেছে গাইকোয়াড়রাজ স্থাপন করবে, আর খোদ পেশবা ভেবেছে পেশবা সাম্রাজ্য স্থাপন করবে। অর্থাৎ জাঠ, রাজপুত, রোহিলা, আফগান সামন্তের পরিবর্তে সিন্ধিয়া, হোলকার, গাইকোয়াড় আর পেশবা। প্রভেদ কি? পুরাতন সামন্তের বদলে নূতন সামন্ত, পুরাতন ছিদ্রের বদলে নূতন ছিদ্র। সর্দার, পুরাতন ও নূতন ছিদ্রের প্রতি জল সমান নিরপেক্ষ। জল উঠে নৌকা ডুবে গেল। সেই ডোবা নৌকা উদ্ধার করলো ডুবুরী ইংরেজ। ওরা সমুদ্রচারী জাত, ডোবা নৌকা তুলতে ওদের জুড়ি নেই।

প্যাটেল—মহারাজ অষ্টাদশ শতকের আশ্চর্য প্রত্যক্ষ চিত্র তুমি অংকিত করেছ।

সিন্ধিয়া—এবারে বিংশ শতাব্দীর চিত্র তুমি অংকিত করো।

প্যাটেল—তুলি ধরবার দক্ষতা নেই আমার হাতের।

সিন্ধিয়া—জানি তোমার বাহু গঠিত হয়েছিল তলোয়ার ধরবার জন্যে। অষ্টাদশ শতকে জন্মগ্রহণ করলে তুমি হতে যোদ্ধা, আর খুব সম্ভব আমাদের মতোই রাজ্য স্থাপন করতে।

প্যাটেল—মহারাজ, আমার হাতে তুলিও চলে না, তলোয়ারও চলে না।

সিন্ধিয়া—তবে?

প্যাটেল—আমি আড়ালে বসে সুতো টানতে পারি।

সিন্ধিয়া—সে আবার কি রকম?

প্যাটেল—হিন্দুস্থানের সামন্তরাজগণ খেলার পুতুল বই নয়, ইংরেজ আড়ালে বসে সুতো টানতো, তারা চলতো ফিরতো কথা বলতো আর ক্ষণে ক্ষণে অখণ্ড হিন্দুস্থানের প্রতিকূলে গর্জন করে উঠতো। ব্যাপারটা

ওতাসা ভেসে থাকা নয়,
তলিয়ে যাওয়ার নামান্তর

আমি গোড়া থেকেই লক্ষ্য করেছিলাম। তারপরে হিন্দুস্থানের মহা সূত্রধার ইংরেজের বিদায় মুহূর্ত আসন্ন হয়ে উঠতেই আমি গিয়ে ধরলাম সেই সুতোগুলো, দিলাম উল্টো দিকে জোরে টান, সবাই এক বাক্যে গর্জন করে উঠল অখণ্ড হিন্দুস্থানের অনুকূলে।

সিন্ধিয়া—কি আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম বাহুবলে তুমি অসাধ্য সাধন করেছ।

প্যাটেল—বাহুবল যে আমার ছিল না এমন নয়, তবে প্রয়োজন হয় নি। তা ছাড়া বাহুবল প্রয়োগ করবো কার উপরে? পুতুলের সঙ্গে তো লড়াই চলে না।

সিন্ধিয়া—আর একটা কথা খুলে বলো। এত বড় রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করলে যে ভিত্তির উপরে, তা নিশ্চয় খুব মজবুৎ আর প্রশস্ত।

প্যাটেল—মজবুৎ আর প্রশস্ত বলেই বিশ্বাস, তবে এখনো প্রমাণ হতে বাকি আছে।

সিন্ধিয়া—আর যাই হোক ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

প্যাটেল—নিশ্চয়ই নয়।

সিন্ধিয়া—পরম নিশ্চিন্ত হলাম।

প্যাটেল—আমি তত নিশ্চিন্ত নই, মহারাজ।

সিন্ধিয়া—কেন?

প্যাটেল—ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তি সঙ্কীর্ণ হলেও দৃঢ় হতে বাধা নেই, ততখানি আবার সার্বজনীন স্বার্থের [illegible] হওয়া সত্ত্বেও শিথিল হতে [illegible]

সিন্ধিয়া—পারে বই কি। বাসুকির ফণাও তো বিচলিত হয়।

প্যাটেল—যে সুতো টেনে ইংরেজ নাচিয়েছে, আমি নাচিয়েছি, সেই সুতোগুলো যদি আবার কখনো অভিসন্ধিপরায়ণ সূত্রধারের হাতে পড়ে তবে কি হবে বলা যায় না।

সিন্ধিয়া—আশা করি তেমন দুশমন আর দেখা দেবে না হিন্দুস্থানের রঙ্গমঞ্চে।

প্যাটেল—বলা যায় কি। ইতিহাসের সমুদ্রতরঙ্গ কত অপ্রত্যাশিত বস্তু নিক্ষেপ করে জীবন-সৈকতে।

সিন্ধিয়া—তবু সুনিশ্চিত যে, আর সমুদ্র পার হয়ে সূত্রধার আসবে না।

প্যাটেল—কিন্তু পর্বত ভেদ করে? কিংবা দুর্বুদ্ধিই হয় তো গ্রহণ করবে সূত্রধারের পদ।

সিন্ধিয়া—না, সর্দার আজ আনন্দের দিনে ওসব অমঙ্গল চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবো না। কি হতে পারে তা ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে যা হয়েছে তার জন্যে তোমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি, জয়তু ভারত ভাগ্যের মহাস্থপতি।

প্যাটেল—মহারাজ, আমি কৃতার্থ হলাম।

পোকা

বনফুল

নিখিলরঞ্জন পোকার শত্রু ছিল। পোকা দেখিলেই মারিয়া ফেলিত। ছেলে-বেলা হইতেই তাহার এই অভ্যাস। মানুষের যেমন মুদ্রা-দোষ থাকে অনেকটা তেমনি। কোথাও পোকা দেখিলে তাহাকে না মারা পর্যন্ত সে স্থির থাকিতে পারিত না। ছেলেবেলায় সে বাড়ির আশেপাশে ঘুরিত পোকা ধরিবার জন্য। প্রজাপতি বা উড়ন্ত-পোকাদের প্রায়ই ধরিতে পারিত না, ধরিত সেই সব পোকাদের যাহারা পাতার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, কিংবা ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে। শশা বা ঝিঙের লতায় একরকম গোল গোল লাল পোকা থাকে। নিখিল সেগুলিরই বিশেষ শত্রু ছিল। কিছুদিন পরে কিন্তু আর এক ধরনের পোকার বিরুদ্ধে সে অভিযান শুরু করিল। পোকাগুলি ছাই-ছাই রঙের, সর্বাঙ্গ শক্ত খোলায় আবৃত। চোখ দুটি নিষ্ঠুর। একটি ছেলে নিখিলকে পোকাটির বিষয়ে জ্ঞান-দান করিল।

"ভয়ানক পাজি পোকা এগুলো। এদের কান-কটারি পোকা বলে। এরা সুযোগ পেলেই কানে ঢোকে। সাংঘাতিক পোকা"—নিখিল তৎক্ষণাৎ পোকাটিকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল। এবং তাহার পর হইতেই ওই পোকা দেখিলে পিষিয়া মারিয়া ফেলিত। কত পোকা যে মারিয়াছিল তাহার আর ইয়ত্তা নাই। বস্তুত বাল্যে এবং কৈশোরে পোকা-নিধনই তাহার একমাত্র ব্যসন (hobby) ছিল।

(২)

নিখিলরঞ্জন যখন কলেজে পড়িতে গেল তখন তাহার এই ব্যসনে খানিকটা ছেদ পড়িয়াছিল। কারণ পাড়াগাঁয়ে পোকার যত প্রাদুর্ভাব কলিকাতা শহরে তত নয়। কলিকাতার মানুষরাই পোকার মতো চারি-দিকে কিলবিল করিতেছে। তবু মাঝে মাঝে দেখা যাইত, রাত্রে নিখিলরঞ্জন রাস্তার ল্যাম্পপোস্টগুলির দিকে ঊর্ধ্বমুখে চাহিয়া আছে। রাস্তার আলোগুলিকে কেন্দ্র করিয়া অনেক পোকার ভীড়। কিন্তু সেগুলি তো নাগালের বাহিরে। নিখিলরঞ্জন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার মেসে ফিরিয়া যাইত। একদিন সহসা অনুভব করিল, তাহার কামিজের ভিতর একটা পোকা

ঢুকিয়াছে, পিঠের দিকে সড়সড় করিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। তাড়াতাড়ি কামিজটা খুলিয়া ফেলিল, দেখিল পোকাই, সেই ছাই-ছাই রঙের কান-কটারি পোকা। সঙ্গে সঙ্গে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল সেটাকে। আরও মাসখানেক পরে যাহা ঘটিল তাহা একটু অদ্ভুত। নিখিলরঞ্জন একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ। গামছাটি নিজের হাতে কাচিয়া শুকাইতে দেয়। পরিষ্কারভাবে নিজের বিছানা নিজেই করে। মশারিটি ঝাড়িয়া স্বহস্তে টাঙায় সেটি রোজ। একদিন রাত্রে শুইয়া আছে, চোখে ঘুমটি সবে লাগিয়াছে, এমন সময় তাহার মনে হইল, ঘাড়ের নীচে কি যেন সুড়সুড় করিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া টর্চ জ্বালিল। কিছু দেখিতে পাইল না প্রথমে। তাহার পর বালিশ উলটাইয়া দেখিল, একটা পোকা তর তর করিয়া পলাইতেছে। ছাই ছাই রঙের সেই পোকা! পোকাটার কেমন যেন একটা স্পাই-স্পাই ভাব। এদিক ওদিকে ক্রমাগত লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিল, সহজে তাহাকে ধরা গেল না। কিন্তু নিখিল ছাড়িবার পাত্র নয়। পোকাটাকে অবশেষে সে ধরিয়া ফেলিল এবং তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল সেটাকে। মরিবার সময় পোকাটা অদ্ভুত শব্দ করিল একটা। 'কি'—চু'' শব্দটা ছুঁচের মতো নিখিলের কানে গিয়া বিঁধিল। ইহার পরই সে চোখ তুলিয়া দেখিল, মশারির চালে আর একটা পোকা রহিয়াছে। নিখিলের মনে হইল, কেমন যেন ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে। ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেই উড়িয়া গিয়া তাহার কপালে আঘাত করিয়া অন্যত্র বসিল। নিখিলের মনে হইল পোকাটা যেন আক্রমণ করিল তাহাকে। রুখিয়া উঠিল সে। কিন্তু হাত বাড়াইয়া যে-ই পোকাটাকে ধরিতে যায়, অমনি সে সরিয়া পড়ে। কিন্তু মানুষের সঙ্গে পোকা পারিবে কেন। খানিকক্ষণ পরে নিখিল তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং দুই আঙুলে দিয়া পিষিয়া মারিল। এ পোকাটাও শব্দ করিল—"কি'-চু"। নিখিল দেখিল ঘরের ছাতে কয়েকটা পোকা বসিয়া রহিয়াছে। নিখিলের মাথায় রক্ত চড়িয়া গিয়াছিল। সে বিছানা হইতে বাহির হইয়া ঝাঁটা হাতে টেবিলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। পোকাগুলি মেঝেতে পড়িবামাত্র লাফাইয়া নামিয়া যতগুলিকে পারিল পা দিয়া পিষিয়া মারিল। প্রত্যেক পোকাটাই মরিবার আগে অন্তিম আর্তরব করিল—'কি'—চু'। সব পোকাগুলোকে নিখিল মারিতে পারে নাই। একটা পোকা জানলা দিয়া উড়িয়া গেল।

কিন্তু ইহার পর হইতে নিখিল লক্ষ করিল, ওই ছাই-ছাই পোকাগুলো যেন তাহার পিছু লইয়াছে। রোজই দেখিতে পায়—হয় ঘরের কোণে, না হয় বইয়ের শেলফে, না হয় আর কোথাও একটা না একটা বসিয়া আছে। নিখিল অবশ্য দেখিলেই মারিয়া ফেলে। কিন্তু ইহাও সে অনুভব করে, দুই একটা সরিয়া পড়িতেছে। আবার একদিন মশারির ভিতর দুইটা পোকা দেখা দিল। নিস্তার অবশ্য পাইল না, কিন্তু নিখিল চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইতে লাগিল, উহাদের একটা মতলব আছে। মরিবার সময় 'কি'—চু' করিয়া যে শব্দটা করে তাহা শব্দ-তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া কি অন্য পোকাদের খবর দেয়? নিখিল সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিল। একদিন

সে সবিস্ময়ে দেখিল তাহার ক্লাসে ডেস্‌কের উপরও দুইটা পোকা বসিয়া আছে। তাহাদের সংগে সংগে মারিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।..... হঠাৎ একদিন গভীর রাতে দারুণ যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙিয়া গেল তাহার। কানের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা! কানের ভিতর পাটি-কলের মতো কি যেন চালাইয়া চলিয়াছে কে। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া কানে খানিকটা স্পিরিট ঢালিয়া দিল। স্টোভ জ্বালাইবার জন্য এক শিশি মেথিলেটেড স্পিরিট হাতের কাছেই থাকিত। তবু যন্ত্রণা থামে না। তারস্বরে কাঁদিতে লাগিল বেচারা। সকালে ডাক্তার কানের ভিতর হইতে একটা মরা বড় পোকা বাহির করিলেন। ছাই-ছাই রঙের কান-কটারি পোকা।

ইহার পর নিখিলের খরচ বাড়িয়া গেল। কানে গুঁজিবার জন্য তুলো কিনিতে লাগিল। রাতে শুইবার সময় কানে তুলা তো দিতই, অনেক সময় দিনেও দিত। তাছাড়া, পোকা তাড়াইবার যে সব ঔষধ আজকাল বাজারে বাহির হইয়াছে সেগুলিও কিনিত সে। নিজের বিছানায়, বসিবার জায়গায়, বইয়ের শেল্‌ফে, ঘরের কোণে কোণে, প্রায় সর্বদাই সেই ঔষধ ছিটাইয়া বসিয়া থাকিত। কিন্তু তবু সে লক্ষ্য করিত, ঔষধের নাগালের বাহিরে ছাই ছাই রঙের পোকারা হয় ঘাপটি মারিয়া বসিয়া আছে, কিংবা ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। বলা বাহুল্য, নিখিল পারতপক্ষে তাহাদের রেহাই দিত না। ধরিতে পারিলেই পিষিয়া ফেলিত। কেহ গণিয়া দেখে নাই, কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে নিখিল তাহার সারা-জীবনে কয়েক সহস্র পোকাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তবু পোকা আসিতেছে। নিখিল কিছুতেই তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতেছে না।

(৩)

অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। নিখিলের কর্মজীবন শুরু হইয়াছে। বি এ পাশ করিবার পর কোথাও সে চাকরি জুটাইতে পারে নাই। অবশেষে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের পয়সায় সে চাল-ডালের ব্যবসাতে নামিয়াছে। সেদিন সে মাল খরিদ করিবার জন্য ঘুসকরায় যাইতেছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন একটি সম্পূর্ণ খালি থার্ড ক্লাস কামরা পাইয়া গেল। কামরাটিতে উঠিয়া সে সব জানালাগুলি তুলিয়া দিল। বাহিরে বৃষ্টি হইতেছিল। আজকাল সে কানের তুলা প্রায় ফেলেই না। দুই কানেই তুলা গোঁজা ছিল। কামরায় কেহ নাই দেখিয়া সে পোকা-প্রতিষেধক একটা ঔষধ বাহির করিয়া সেটা চারিদিকে ছড়াইয়া দিল। তাহার পর বিছানা বাহির করিয়া সেটাও ভাল করিয়া ঝাড়িয়া একটা বেঞ্চে বিছাইয়া ফেলিল। হাতঘড়িতে দেখিল রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ভাবিল, এইবার শুইয়া পড়া যাক। ঔষধটা আর একবার ছিটাইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—না, একটি পোকাও কোথাও দেখা যাইতেছে না। পোকার সম্বন্ধে সে সর্বদাই সচেতন আছে। লক্ষ্য করিয়াছে, একটু অসাবধান বা অন্যমনস্ক হইলে সেই ছাই-ছাই রঙের পোকারা তাহার কাছাকাছি ঘোরা-ফেরা করে। শুইবার পূর্বে নিখিল কামরার জানলাগুলো আর একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। না, সব ঠিক আছে। কোথাও ফাঁক নাই। শুইয়া পড়িল।

"কিঁচ্‌—কিঁচ্‌—কিঁচ্‌—কিঁচ্‌—"

নিখিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। সেই পোকার আওয়াজ না? চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, পোকা তো একটাও নাই। কিঁচ্‌ কিঁচ্‌ শব্দটা কিন্তু ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। লক্ষ লক্ষ পোকার অন্তিম আর্তনাদ যেন সহসা একযোগে মূর্ত হইয়া উঠিল তাহার মানস-পটে। ক্রমশ কোলাহলে পরিণত হইল তাহা। একটু পরেই নিখিল অনুভব করিল —ছররার মতো কি যেন তাহার চোখে মুখে সবেগে লাগিতেছে। একটা আধটা নয় অসংখ্য ছররা। দুই হাত দিয়া মুখ ঢাকিল। কিন্তু হাতেও ছররা আসিয়া লাগিতে লাগিল। অসহ্য যন্ত্রণা! হাত সরাইয়া লইতে হইল। দুই হাত বাড়াইয়া সে তখন দেখিবার চেষ্টা করিল ছররার মতো কি ওগুলো। কিন্তু কোন কিছুই তাহার হাতে ঠেকিল না। কামরার বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার।

"কিঁচ্‌—কিঁচ্‌—কিঁচ্‌—কিঁচ্‌—

আর্তনাদের শব্দটা যেন উল্লাসের ধ্বনিতে পরিণত হইল। তাহার মনে হইল মুখটা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেছে। সহসা দুই চোখে যেন দুইটা ছররা আসিয়া লাগিল। পড়িয়া গেল সে। তাহার পর অনুভব করিতে লাগিল, কে যেন কানের তুলা টানিয়া বাহির করিতেছে। মনে হইল, নাকের ভিতর দিয়া কি যেন ঢুকিতেছে। ইহার পরই নিখিল জ্ঞান হারাইল। সকালে তাহার মৃতদেহটা যখন পাওয়া গেল তখন সকলে দেখিতে পাইল তাহার নাক ও কানের ভিতর হইতে ছাই-ছাই রঙের ধোঁয়া বাহির হইতেছে, ক্রমাগত বাহির হইতেছে। কি ব্যাপার কেহ বুঝিতে পারিল না। ডাক্তার বলিলেন, 'শকে' মৃত্যু হইয়াছে।

স্থান কাল পাত্র

*

সন্তোষ কুমার ঘোষ

তে রাস্তার ত্রিবেণী, মধ্যিখানে ঠিক গোল নয়, বরং ডিমেল, একটি চর। কতকাল ক্ষৌরী হয়নি, একমাথা ঘাস নিয়ে জেগে আছে।

হনহন্ হেঁটে তিনি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর অনেক—অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে ইতস্তত করতে দেখা গেল।

ওই তিন দিকের তিন রাস্তার একটা ধরেই তিনি এখানে এসেছেন, তবু বোঝাই যায়, রাস্তা তাঁর চেনা নেই। চেনা থাকলে অস্বাচ্ছন্দ্য স্পষ্ট হত না, পথপ্রয়াগে অতক্ষণ ঠায় দাঁড়াবেনই বা কেন।

একলা, তবু ঠিক একলা নন, নজর করলে ঠাহর হবে—দুজন। তিনি আর তাঁর অবিকল ছায়া। পায়ের জুতোর গোড়ালি দিয়ে তিনি ছায়াটির গোড়ালি মাড়িয়ে রেখেছিলেন, পা একবারও তুলছিলেন না। যেন ভয়ে। যেন পা তুললেই ওই ছায়া ফসকে যাবে, পালাবে। ইনি সত্যিই একেবারে একলা হবেন।

ওই ভদ্রলোক, যিনি টুপিটাকে টেনে টেনে তাঁর সামনের দিকটা ঝুলবারান্দার মত করে ফেলেছেন, চোখ ঢাকা, ভুরু কিংবা পাতা কিছু দেখা যায় না। বর্ষা নেই, তবু গায়ে আজানুঝুল বর্ষাতি, পরনে ছাই-ছাই প্যান্টালুন, তবে কড়াভাঁজের মেজাজ কবেই খোয়ানো। পায়ে পুরু চামড়াওয়ালা কোনও জন্তুর ফিতেদার-জুতো। নিচু হয়ে বাঁধতে যাবেন, ফিতে ছটাস করে ছিঁড়ল।

তেরাস্তার চরে তিনি অনুপায় বসে পড়লেন। ঢলঢলে প্যান্টালুনে, ক্রীজের দেমাক নেই, ভাগ্যিস। বর্ষাতিটা খুলে ঘাসে পরিপাটি বিছিয়ে নিলেন, ঝুলবারান্দা টুপি খুলে ভুরু কুঁচকে সূর্যস্পশ্য হলেন। উদ্দেশ্য, দিকের আন্দাজ নেবেন। ওই টুপি সর্বার্থসাধিকা, তাঁকে খানিক হাওয়া করল, মাছি তাড়াল, শেষে আড়াল করল আকাশের কাঁসার কলসটা। কেননা, মেঘের ফাটল দিয়ে ওই কলসীর কানা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রোদ চুইয়ে চুইয়ে ঝরছিল। জিরোবেন বলে কনুইয়ে হাত রেখে তিনি যেই কাত হলেন, তাঁর উল্লিখিত ছায়াটাও তৎক্ষণাৎ তাঁরই পাশে গুটিশুটি বোবা বউ হয়ে শুল।

তখন ভরদুপুর। যখন কোথাও কিছু চলে না, গাড়ি না ঘোড়া না; একঠ্যাঙাড়ে গাছগুলো রা কাড়ে না; বহতা সময় যেন ভাটালাগা, বাউন্ডুলে একটা কি দুটো চিল ঘুরে ঘুরে ছোঁ-মন্তর পড়ে আর শুখাভুখা কয়েকটা ক্যাক্‌ড়াপুতুর পাতা খামোখা ওড়ে, সেই দুপুর।

জানতেন না, তিনি যেই ঘুমোবেন, আষাঢ়ে আকাশে রোদের জালাটা অমনি গুম হবে। ময়লা মেঘ দিনটাকে অপঘাতের লাশের মত, বস্তার মত, জবরদস্ত বাঁধবে।

ঝিমুনি ছুটলে হাই তুলতে যাবেন, গাল-চোয়ালের রগে রগে টান লাগল, হাত তুলে

আড়মোড়া ভাঙবেন—আরে বাস, হাড়ে হাড়ে সঙ্গে সঙ্গে খট-খট-খটাস। তিনি যে জ্যান্ত তারই প্রমাণ দিতে ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি হাতের পাতায় হাত ঘষে খুব কম ফারেন-হাইটের ঈষদুষ্ণ ভাপ তৈরি করে নিলেন, চাপ চাপ থাবড়া মেরে মাখিয়ে দিলেন নাকে-চোখে। গলায়, ঘাড়ের তলায় সুড়সুড়ি—জলজ ঘাস। নাকে মৃদু একটু সুখ—ঘাসের সুবাস।

তিনি এখানে কেন, কোথায় ছিলেন, কোথায় যাবেন, ঠিক এই মুহূর্তে সব ঝাপসা ঠেকছে, অবশ বিচার-বোধ কোন কিছুই ঠিক খামচে ধরতে পারে না।

হাওয়া খুব চকচকে ছুরিতে-কাটা পেনসিলের সিসের মত হয়েছিল, বিঁধছিল। কয়েকটা ঘাস হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে আনলেন তিনি; [illegible] চটকে চটকে সবুজ রস নিংড়ে [illegible] করে চাঙ্গা হতে চাইলেন।

শেষ পর্যন্ত উক্ত ভদ্রলোক সমস্ত ইচ্ছাকে তলব করে কোমর অবধি খাড়া করতে পেরেছিলেন। পা দুখানা তখনও ছড়ানো, কোথায় যেন চিনচিনে কোনও যন্ত্রণা। গোয়েন্দা আঙুল চালান হয়ে গেল মোজার তলায়, একটা পরিপুষ্ট-পরিপুষ্ট জোঁক তুলে আনল। জোঁকটাকে থেঁতলে দেওয়া যেত, কিন্তু দিলেন না। হেতু, শিরশির করছিল। সনাক্ত করা যায় না এমন একটা ভয়। চরাচরে তিনি একা, তাঁর জ্ঞানমতে ওই জোঁকটাই দ্বিতীয় প্রাণ। পরম নির্ভয়ে শিশু যেমন অন্ধকারে মায়ের স্তন ঠোঁটে-জিভে চেপে রাখে, তিনিও তেমনই তুলতুলে জোঁকটাকে কিয়ৎকাল দু' আঙুলে ধরে রইলেন।

তবু রক্ত ঝরছিল, টপ টপ টপ। মোজা ভাসছিল। কাছাকাছি জলাশয় আছে কিনা সেই সন্ধানে তাঁকে উঠতেই হল। জলাশয় নয়, রাস্তার নানা সাইজ কিপটে গর্তগুলি জল বাঁচাচ্ছে। সেই জলে পা ধুতে নুয়ে পড়ে তিনি দুটি জলা ফুল ফোটালেন। ফুল নয়, তাঁরই দুটি চোখ।

জবুজবে আষাঢ়ে আকাশটা এখন জটা-জুট বাঁধা, ভয়ংকর সন্ত। যতবার দেশলাই জ্বালেন ততবার হাওয়ার রাক্ষস হা-হা হাসে, ফস্ করে জ্বলে-ওঠা আলোর ফোঁটাকে আঁতুড়ে টিপে মারে।

ক্রমশ-অন্ধকার পরিবেশে তিনি রোমশ ভয়ের অধিকারভুক্ত হয়ে পড়ছিলেন। আমাকে আমার স্থানকালে স্থাপিত করে দাও। নিজেকে স্থান এবং কাল থেকে বিচ্যুত পাত্রের মত ঠেকছিল বলেই তিনি এই আর্ত প্রার্থনায় ব্যক্ত হলেন। গন্ধে অন্ধকার মর্গে কাটা মুণ্ড কি এভাবেই গড়িয়ে গড়িয়ে ধড় হাতড়ায়, তিনি এখন যেভাবে রাস্তা হাতড়াচ্ছেন?

কেননা, বৃষ্টি আসছিল। ভিজেকাঁথা ভাপ্সা পরিবেশ, আকাশ বারেবারে অস্থির ছুরির ঝিলিকে ফালাফালা করে কাটা। এক কোণে সবেমাত্র ধকধকে তারাটাকে সবলে খুবলে তুলে কে ছুঁড়ে মারল, তিনি চোখ বুজলেন, তবু কপালে বড় একটা ফোঁটা পড়ল। কয়েক যোজন পথ পাড়ি দিতে গিয়ে জ্বালা জুড়িয়ে তারাটা জল হয়ে গেছে।

তিন দিকের তিনটি পথ তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। উজ্জ্বলন্ত একটি ত্রিশূল যেন এখানে প্রোথিত অথবা শায়িত:। ওর একটি ধরে তিনি এসেছেন, একটি ধরে এগিয়ে যেত হবে, কিন্তু কোনটি।

টুপিটাকে আরও টানটান করে তিনি ভাবছিলেন, একটা টাকা তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে পথের ঠিকানা ঠিক করা যায় কি না। একটা আধুলিরও যে মোটে দুই পিঠ। তিন দিকের একটিকে কী করে বাছন।

সময়ও ছিল না। দেখতে দেখতে এক ঝাঁক তীরন্দাজের মত বৃষ্টি এল, তারা দাঁড়াল না; তাদের রেকাবে পা, জিন বাঁধা, ইতস্তত দু' দশটা তীর, তার পরই চটপট লোপাট।

বর্ষাতির যত ফুটো, এতদিনে সব যেন জানাজানি হয়ে গেল। বর্ষাতি তো নয়, ঝাঁঝরি। শীত-ভয়, অন্ধকার সব পিল পিল করে ঢুকছে।

'তবে তাই হোক' একবার বিজলীর লেখা পড়ে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমি এগোই। আর খানিক থাকলে জলে ভিজে কাক হব, কনকনে ঠাণ্ডায় মরব। পথ চিনি বা না চিনি, আন্দাজে একটা ধরি। ধড়ছুট মাথার খুলির মত স্থানকালের দিকে গড়াই।'

জুতোর ছেঁড়া ফিতের গিঁট বেঁধে ফিট-ফাট তিনি, (থেকে থেকে আকাশের ধমকে আর চমকে তখনও ব্যতিব্যস্ত) একটি রাস্তায় পা বাড়ালেন।

মোরমের রাস্তা, কিন্তু নুড়িগুলি নরম, চোরের মত মুখ বুজে জুতোর চাপ হজম করে গেল।

এই আলকাতরা রাতে উত্তর নেই দক্ষিণ নেই ঊর্ধ্ব নেই অধঃ নেই, অতিবিশ্বস্ত ছায়াটাও কখন যেন সঙ্গ ছেড়েছে।

না লোক, না আলোক, না আলয়। এ-রাস্তা যারা বানিয়েছে তারা দুধারে গাছের ছায়ার ব্যবস্থা কেন করেনি কিংবা করেছিল ছাগলে মুড়িয়ে গিয়েছে এসব ভাবনাকে বেশি সময়ও দিতে পারছিলেন না তিনি, কারণ হুঁশিয়ার হয়ে পা ফেলতে হচ্ছিল, নামগোত্রহীন একটা আতঙ্ক কখনও গায়ের প্রত্যেকটি রোমকে খাঁটার কাঠি কখনও বুকের কলজেকে কামারশালের হাঁপর করে দিচ্ছিল।

কাল তখন সমস্ত স্থানে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কতক্ষণ হেঁটেছিলেন তিনি, হোঁচট খেয়েছিলেন ক'বার এ-সবের কোন পরিমাপ ছিল না।......

তবু এক সময় প্রবল বায়ুতাড়িত পত্রবৎ এই কথিত পথিককেও থমকে দাঁড়াতে হল। কারণ দূরে, অনেক দূরে, দৃষ্টিপরাতের কিনারে একই সঙ্গে কয়েকটা জোনাকিকে তিনি হঠাৎ জ্বলে উঠতে দেখলেন।

মিটমিটে জোনাকিগুলো ক্রমশ টিমটিমে আলো হল। সমস্ত শরীরটাকে টান টান করে ক্ষণেক তিনি ওদিকে চেয়ে রইলেন। যেন অদৃশ্য কোন ধনুকের প্রতীক্ষা, যে ধনুকে জ্যা আরোপিত। ছিলায় পা রেখে শরীরটাকে তরুণ তীর করে তিনি ওই আলোগুলোর দিকে ছুটিয়ে দেবেন।

তবু শরীরটাকে জুতসই রকমের উৎক্ষেপণীয় বোধ হল না। মাথা ভারী, গলা ভারী, জুতো ভারী, যেতে হয় তো ঘষটে যেতে হবে।

আলোগুলো তাঁকে নিয়ে তখন এক মজার খেলা শুরু করেছিল, একটার পর একটা নিবছিল। শেষে যখন মোটে একটা বাতিই বাকী, তখন—

আকাশ ভীষণ একটা মোষের মত গজরাচ্ছে। এদিকে-ওদিকে গনগনে আগুনে ঝলসে ঝলসে উঠছে। মোষটা টের পেয়েছে কারা যেন ওকে শিকে ফুঁড়ে কাবাব বানাবে।

মাঝারি একটা গাছ যেন ছেঁড়া পাতার ছাতা, তার তলায় দাঁড়িয়ে তিনি কোথায় এলেন ঠাহর করতে চাইলেন। দেরি হল না; দিনে গঞ্জ রাতে নিশুতি যে-সব জায়গা এ তারই একটা। সব ঝাঁপ বন্ধ, ছোট একটা দোকানের ঝাঁপ কেন কে জানে তখনও খোলা। একটা লোক আগুনে রুটি সেঁকছে। ভাপে-তাপে প্রফুল্ল রুটির রূপ তাঁকে ক্ষুধা ইত্যাদির বিলুপ্ত বোধ প্রত্যর্পণ করল। তিনি প্রলুব্ধ হলেন। অথচ প্রার্থনা করা যায় না। জামাচামড়া সব জলে ভারী, সেঁকে নিতে পারলেও মন্দ হত না।

"হোটেল?" তিনি জানতে চাইলেন। ঝাঁপের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে খুব অন্তরঙ্গ ঢঙে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, লোকটা চমকে উঠল।

"হোটেল? না হোটেল এ-তল্লাটে কোথায়। হোটেল চান তো সিধে এই পথ ধরুন।"

সেঁকা রুটি ছিঁড়তে ছিঁড়তে লোকটা এগিয়ে এল—তিনি একটু হঠলেন। কারও চোখ যে জিভের মত হয়ে সারা দেহ চাটে, এই প্রথম জানলেন।

হোটেল নয়, এ-তল্লাটে হোটেল নেই। লোকটা সিধে রাস্তা দেখিয়ে দিল। কাছে-পিছে কোথাও-কোন ইস্টিশন আছে কিনা জেনে নিতে পারলে ভাল হত।

রাতটা থাকবেন? কোথা থেকে আসছেন? একটার পর একটা প্রশ্ন করে করে লোকটা যেন ও'কে খুঁচিয়ে তুলতে চাইছে। নিতান্ত নেতিয়ে না থাকলে তিনি খোঁচায় চাঙ্গা হতেন।

কোথায় যাবেন, কোথা থেকে আসছেন?

হায়, তা যদি মনেই থাকবে তবে এই দুর্দশা কেন। পিরেন, কোট, ওভারকোটের সব পকেট উল্টে-পাল্টে তদন্ত তিনি কি করেননি। টুকরো-টুকরো কত চিরকুট, কিন্তু কোথাও কোন হদিশ নেই।

কোথায় ছিলেন? ঝাপসা-মতন মনে পড়ে যেন, কোথাও জমজমাটি কিছু ছিল। লোকে লোকারণ্য, লাল শালুর ফটক ছিল, পত্‌পত্‌ পতাকা উড়ছিল। তিনি সেখানে পৌঁচেছিলেন। উঁচুমতন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আখড়া, ভিতরে হাসি-হল্লার ফোয়ারা। বুড়ো আঙুলে ভর করেও সুবিধে হল না। পাঁচিলের খাঁজে রাখতে গিয়ে পা হড়কে গেল। ঘুর ঘুর করে ঘুরলেনই কতবার। শেষে মরীয়া হয়ে ফটকের সামনে নিজেকে খাড়া করে দিলেন।

"টিকিট কই টিকিট?"

কড়া চেহারার একটা লোক চওড়া কব্‌জি বাড়িয়ে ফটক আগলাচ্ছে আর রাশভারী গলায় হাঁকছে, টিকিট কই—টিকিট?

মুষড়ে পড়ে তিনি পকেট হাতড়ে মিয়োনো একটা কাগজের টুকরো বার করলেন, লোকটা পলকে দেখেই সেটাকে মুচড়ে ফেলে দিল।

'এ-তো টিকিট নয়, এ চলবে না।' বলেই লোকটা অন্য দিকে চেয়ে, হাত আকাশপানে, যেন সুর করে করে চেঁচিয়ে গেল,—'টিকিট কই—টিকিট!' ওর ভিতরে কোথাও দম-দেওয়া একটা ডিস্‌ক ঘুরপাক খেতে খেতে ওই আওয়াজ তুলছে, দম না ফুরোলে থামবে না।

পিছনের লোকগুলো ততক্ষণ তাঁকে পাশে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গেছে। তিনি খানিক টিকিটঘর খুঁজলেন, ভারী চমৎকার একটা ঘ্রাণ, বোধ হয় ওই মজলিস/মাইফেল/মেলার ভিয়েনে চড়ানো মশলা-মাংসের। তলপেট তালে-তালে ওঠাপড়া করল। আর খুব সুরেলা একটা গান—বুক তোলপাড় হল। একই সঙ্গে দুটি উদ্বেল অনুভূতির তাল সামলাতে সামলাতে তিনি অধীর হলেন। টিকিট-ঘর?

কিন্তু কোথায় টিকিট-ঘর? ঘুলঘুলি বন্ধ। ধপাস করে বসে পড়তে পারতেন, কিন্তু দয়াপরবশ হয়ে কে যেন একটা টুল এনে দিল।

'টিকিট-ঘর কখন খুলবে?' বোবামি ঘুচিয়ে তিনি তাকেই বোকার মত জিজ্ঞাসা করলেন।

"আর খুলবে না। আজ তো না।"

"খুলবে না কেন?"

"সব টিকিট বিক্রী হয়ে গেছে।"

"ও।" রুমালে তিনি ঘাম আর হতাশা একসঙ্গে মুছলেন। —"তাহলে এখানে একটু বসি?"

—"বসুন না, যতক্ষণ খুশি।" সদাশয় লোকটা তাঁকে ঢালাও ফরমান দিল।—

—"অনেকেই তো বসে, যারা ভেতরে যেতে পায় না, তারা। ভেতরে যাবার টিকিট সবাই তো পায় না।"

"বাইরে বসলে কিছু কি মেলে?"

"কেন, খাবার মেলে। বাইরেও কেনা-বেচা হয়। তা-ছাড়া ভেতরে ওরা যখন জোরগলায় গান ধরে, শোনা যায়। আর—" লোকটা এখানে একটু থেমে খুব গোপন খবর দেবার মত স্বরে যোগ করল, "আর, ঐ পাঁচিলের এখানে ওখানে ছোট ছোট ফোকর আছে, নজর রাখলে একটু-আধটু দেখাও যায়। বাইরেও মজা কিছু কম নেই।"

"তা-হোক," একরোখা বালকের মত মাথা নেড়ে নেড়ে তিনি বললেন, "বাইরে আমি বসব না।"

কোথা থেকে এসেছেন তার-পুরোপুরি খেই এতেও মিলল না। কয়েকটা ধাপ ফাঁকাই রইল।

টলতে টলতে উঠে এসেছিলেন কি, রাস্তায় কোনও জলসত্রে আঁজলা পেতে-ছিলেন? সেখানে তারা কি জল না, একটা
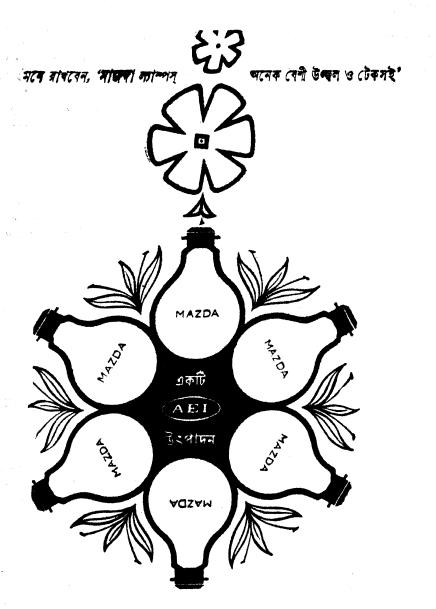
ভাঁড়ে করে সরবত তুলে দিল? খুব ঘোরালো রঙের সরবত, মিঠে-মিঠে তার ঝাঁঝ, চক্‌চক্‌ চুমুক দিতেই কি মাথা ঘুরল আর হদিশ রইল না?

পরে কোনও সত্রে, ইস্টিশনের একটা ওয়েটিং-রুমও মিলে গেল বুঝি, কোঁচে গা এলিয়ে দিলেন? খাঁ-খাঁ দুপুর, গমগম হল্‌ঘর, গাড়ি থামে, গাড়ি ছাড়ে, ঢং ঢং ঘণ্টা, ইঞ্জিন ভোঁস ভোঁস অধীর, হুইস্‌লের মিহি শিষের পরই মোটা গলায় সিটি। মুসাফিরের জোয়ার, মুসাফিরের ভাঁটা, তকমা-আঁটা মুটে কত মোটঘাট নামাল, কত তুলে পিটটান দিল। তিনি একটু সন্ত্রস্ত ছিলেন, রেলের উর্দি দেখলেই চমকে উঠছিলেন, যদি হাত বাড়ায়, কই টিকিট, আপনার টিকিট? বলে এখানেও ধমক লাগায়!

আড়ষ্টতা আস্তে আস্তে কমছিল, কিন্তু অধৈর্য বাড়ছিল। এই ওয়েটিং-রুমটাও আসলে স্টেশনের কোন অংশ নয়, বাইরের বস্তু। এখানে ওরা শুধু বসতে দেয়। গাড়ি আসে, গাড়ি যায়, ওরা পিলপিল ছোটে, খটাং খটাং সিগনালে ওঠে-নামে নিশান ওড়ে, কিন্তু কেউ কাউকে ডাকে না। তাঁকেও ডাকবে না, যদি প্রলম্বশেষের আলোর বিকেল অবধি এখানে পড়ে থাকেন, তবু না।

ভাবতেই তিনি ভয় পেয়েছিলেন, কুলকুল ঘাম ছুটেছিল, যদিও সময়টা শীতের শেষ আর আকাশে অকাল-মেঘের টুকরোগুলো এ ওকে ডাকাডাকি করে যার-যার জায়গা বুঝে পড়ে নিতে বলছিল।

"আমি ভিতরে যাব। যাব আমি যাবই"—মন স্থির করতে তাঁর লহমার বেশি লাগেনি, তবু কোন্ ইস্টিশনের টিকিট কাটবেন, গাড়িই বা কখন এ-সবের ঠিকঠিকানা ছিল না বলে বুকিং-অফিসের সামনে তাঁর আঙুল-গুলো কাঁপছিল।

আর তখনই তাঁর কানের কাছে মুখ নুইয়ে কে যেন কী বলল, তিনি স্পষ্ট শুনলেন একটা ইস্টিশনের নাম। "ওখানে তোমার জন্যে ওরা অপেক্ষা করছে" দৈব-বাণীর মত শোনা গেল।

তবে আমি এখানে কেন, ঠিকানা যদি পেয়েই ছিলাম তবে ভুল ইস্টিশনে নামলাম কেন! হঠাৎ কালোর কালো ঢাকল, ইঞ্জিন চিৎকার করে থামল, একটা ভুতুড়ে বিকেল গাড়িটাকে গিলবে বলে ধেয়ে এল আর তাই কি আমি ভয় পেলাম, বিরল-লোক, বিরস-তৃণ আকস্মিক প্রান্তরে নেমে পড়লাম? তারপর থেকে চলছি তো আমি চলছিই, পথ চিনি না পথ ফুরোয় না। ....

ফোঁটা ফোঁটা জল অঝোর হয়ে নামল। ওই দুরন্ত দোকানীর সেঁকা রুটির গন্ধ ছাড়িয়ে খানেক গজ এগিয়ে-ছিলেন—তখন। লোকটা বলেছিল সিধে রাস্তা, কিন্তু খানিক পরেই একটা বাঁক দেখা গেল, উপরন্তু একটা ছায়া। একটা ঝোপড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল।

ছায়ার মুখ দেখা গেল না, মুখ আছে কিনা তারও ঠিক নেই, তবু হাতের ইসারা স্পষ্ট। ভিতরে যেতে বলছে।

ভিতরে? আমি যাব ভিতরে? ছায়া মানুষের অনুসারী লোকে বলে, আমি কি মানুষ হয়ে এই ছায়ার অনুসরণ করব?

পা সরছিল না, তিনি ইতস্তত করছিলেন। যে-ইস্টিসনের নাম শুনেছিলেন এটা কি সেই ইস্টিসন? নয় যে, নিশ্চিত। তবে কেন এখানে থামবেন। কোথায় না তাঁর যাবার আছে, কোথায় না কারা তাঁর অপেক্ষায় আছে?

বড় দেরি হয়ে গেল।

তখনও অঝোরে বৃষ্টি, তবু তিনি চলছিলেন। ক্রমশ শহরের চেহারা দেখা দিচ্ছে, দুধার বাড়ি দু ভাগে ফাটিয়ে সিঁথির মত রাস্তা চলে গেছে, মুখেই একটি ফলক তাতে বড় বড় হরফে একটি শহরের নাম

"পৌর এলাকা এখানে আরম্ভ।"

নামটা পড়েই তিনি চমকে উঠলেন। আরে, এ-তো সেই শহরের নাম, যেখানকার কথা তাঁকে কেউ কানে কানে জপেছিল, যেখানে যাবেন বলে তিনি টিকিট কিনেছিলেন কিন্তু তালগোলে নেমে পড়েছেন অন্যত্র; যেখানে তাঁর জন্যে তারা অপেক্ষা করে আছে।

একটা বাড়ির চুড়োয় ঘড়িতে সময় দেখলেন সওয়া সাত। তাই তো রাত আসলে তো বেশি হয়নি, তবু সব কেন এমন নিঝুম—শীতে-বর্ষায় জড়োসড়ো পৃথিবী সাততাড়াতাড়ি আপনাতে আপনি সেঁধিয়ে গিয়েছে।

সোজা টান টান রাস্তা, কিন্তু পেরোবেন কী করে, যা হুড়মুড় সময়-বুঝে বৃষ্টি। একশা করে দিচ্ছে। এ-রাস্তা কতদূর গিয়ে শেষ হয়েছে ঠিক নেই, আদৌ কোথাও গিয়ে ঠেকেছে কিনা?

রাস্তাটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে তিনি ছুটতে ছুটতেই লক্ষ্য করেছিলেন। গাড়ি-বারান্দা নেই, ঝুলবারান্দাও না—কেমন-যেন কামানো ঘাড়-গাল-গলার মত। কোথাও জিরোবার উপায় নেই, মাথাটা খানিক যে বাঁচিয়ে নেবেন তার জো কী!

দাঁড়াতে দেয় না, এ-রাস্তা খালি ছোটে, সবকাকে ছোটায়।

দরজা জানালাও সব বন্ধ। এতক্ষণ বাইরে ছিলেন, না-মানুষ, না-মাছি প্রান্তরে সেখানে তবু এই বাসী-মড়া বিষণ্ণ শূন্যতার মানে হয়। কিন্তু এ-কেমন শহর, কোন্ জন্মে কে দেখেছে সন্ধ্যা হতে না হতে সব পাট চুকে বুকে গেল, বোবা-কালা-কানা বনে জ্যান্ত শহরটা কিনা খিড়কিতে খিল তুলে তক্তপোষে পা তুলে বসল!

একটা রকে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন, সুবিধা হল না। কুকুরের নোংরা। তা-ছাড়া ছাট লাগছিল সমানে। এর চেয়ে সরাসরি ভিজে চুপসে যাওয়া ভাল।

কান্না পাচ্ছে, মাথার যন্ত্রণা বাড়ছে, হাসিও পাচ্ছে তত। রাস্তাটার ন্যাড়া-ন্যাড়া চাঁচাছোলা চেহারা দেখে। কোন্ স্থপতির নির্দেশ, কোন্ নগরপিতাদের মঞ্জুরি!

বৃষ্টির ফোঁটা আশেপাশে সামনে সমানে পিচের ওপর পড়ে তিড়িং-তিড়িং লাফাচ্ছিল। শীত সারিসারি পিঁপড়ের মত একেবারে জামা-কাপড়ের ভিতরে ঢুকে গিয়ে-ছিল।

ভয়ে ভয়ে একবার তিনি একটা বাড়ির দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিলেন। খুলল না। খানিক এগিয়ে ফের জানান-ঘুন্টি টিপলেন আর-এক দরজায়। সিঁড়িতে থপথপ শব্দ, ব্যস্ত পায়ে কে নেমে আসছে। কপাট একটু ফাঁক হল, কম্বলমুড়ি দেওয়া একটা লোক একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল কে, বোধহয় সঙ্গে সঙ্গে সাবস্ত করল, অচেনা লোক, আর দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

ভিতরে কোন ঘরে আলো জ্বলছে কিনা, তাস-পাশার আসর বসেছে কিনা, কিংবা বেহালায় করুণ সুরের ঝড় তুলছে কিনা, তার আভাসটুকুও পাবার সুযোগ হল না।

অথচ একটু উত্তাপ, একটু শব্দ একটু হাসি প্রাণ পানের জন্য তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু ভিতরে কোথাও ঢোকা যাবে না।

[দুই]

গম্বুজওয়ালা প্রকাণ্ড সেই বাড়িটি আরও পরে চোখে পড়ল। বাড়ি না তো যেন নটবর, গম্বুজটা ঠিক টোপর। গলায় লাল, নীল, সবুজ আলোর মালা পরতে পরতে ফটকে ফুর্তিতে টইটম্বুর।

এই প্রথম একটা গাড়ি-বারান্দা পাওয়া গেল। অনেক লোকের জটলা, তারা উত্তেজিত, কিংবা শ্রান্ত কিংবা নির্বিকার কিছু বোঝা গেল না, কারণ কেউ বিশেষ কথা বলছিল না। দু'একজনের হাতে সিগারেট, দু'এক-জনের মুখে পান। একটু এগিয়ে কেউ কেউ পিক ফেলেও আসছে, হাত বাড়িয়ে পরখও করছে, বৃষ্টি থামল কিনা।

তিনি গিয়ে দাঁড়াতেই সব চোখ এক সঙ্গে খোঁজবাতির মত ঘুরে গিয়ে তাঁর ওপর পড়ল। অনেক মাথার আড়ালে যারা তাঁকে দেখতে পেল না তারা তাদের ঠেকিয়ে কী-একটা দারুণ কিছু ঘটছে স্থির করে রেখে গেল।

কারণটা তিনি নিজেই অনুধাবন করলেন। কারণ তিনি নিজেই—তাঁর পোশাক। জবরজঙ বর্ষাতিটা এখানে বেখাপ্পা, আর অদরকারী, যদিও অল্প ছাট আছে,

নইলে এই আটক লোকগুলো কখন বেরিয়ে পড়ত, তবু ফোঁটা কিন্তু গায়ে লাগছে না, অতএব ওটাকে মোচন করাই ভাল।

বর্ষাতি খুলে তিনিই সেটাকে কনুইকে সমর্পণ করে হালকা হলেন। আর তখনই তাঁর মনে স্বাভাবিক কৌতূহল দেখা দেল।

এরা সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, এখানে জটলা করছে অথচ ভিতরে যেতে চায় না কেন, সারি সারি ভাবলেশহীন মুখের দিকে চেয়ে তিনি রহস্যটার মানে পড়ে নিতে চাইলেন।

হতে পারে ওরা ভিতরেই ছিল, বহুক্ষণের ক্লান্তি ওদের বাইরে ঠেলে দিয়েছে।

হতে পারে, ওদের টিকিট নেই। ভিতর ওদের নেয়নি।

'আমাকে কি নেবে, টিকিট তো নেই আমারও'—এই আত্মবিচারে আবিষ্ট ভদ্রলোক ধীরে ধীরে ভিতরের দিকে পা বাড়ালেন।

এক ধাপ উঠেই একটা ঘেরা ঘর—লাউঞ্জ মতন। সেখানে আরও চড়া আলো, চোখে চোখে চাপা দীপ্তি, ফূর্তির ফুৎকার।

কাচের কেসে বাঁধানো কয়েকটা ছবি, চেনা-চেনা ঠেকল, তবু চেনা গেল না।

এখানেও একটা কাউণ্টার, কিন্তু বোবা, অন্ধ। ফোকর বন্ধ। তবু অসুবিধা হল না। এগিয়ে যেতে যেতে তিনি একটা আবলুশ-কালো দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন, কী সৌভাগ্য, দরজাটা আধভেজানো, ভিতরে যাই থাকুক, আবরু একটা-মোটে পুরু মখমল পর্দা।

সসংকোচে পর্দা ঠেলে তিনি ভিতরে উঁকি দিলেন। ঘরখানি অন্ধকার—যে-রাস্তা তিনি খানিক আগে পাড়ি দিয়ে এসেছেন তার চেয়েও।

তবু পা বাড়ালেন। কেউ বাধা দিল না। মাটিতে পাথা একসার আসনের পিঠে আন্দাজের ভুলে ঠোকর না খেলে কেউ হয়ত দিতও না।

তখনই ওই অন্ধকারে আরণ্যবাঘের চোখের মত একটা টর্চ জ্বলে উঠল। ধপধপ জুতো, বোধহয় ক্যাম্বিসের, পায়ে একটা লোক কিংবা লোকের ছায়া কারণ এই ছমছমে ভুতুড়ে ঘরে সব মানুষই মায়া অথবা ছায়া-প্রতিম ছুটে এল। টর্চটা রাখল তাঁর মুখে, তৎক্ষণাৎ 'ঠকাস' করে একটা আসন খুলে দিয়ে বলল, 'বসুন'।

চাপা গলা, মুখে তিনপরত কাপ, থাকলে যে-আওয়াজ বেরোয়।

'বসুন। এত দেরি করে এলেন? কখন শুরু হয়ে গেছে!'

এতক্ষণে নিশ্চিত বোঝা গেল, যা ভেবে-ছিলেন তাই, এটা একটা প্রেক্ষাগৃহ।

কেউ টিকিট চাইল না। তিনি কৃতজ্ঞ বোধ করলেন। আসনে ডুবে গিয়ে সারা দিনে এই প্রথম গা ঢেলে দিতে পারলেন। যেন আলসেমির পিরিচে আরামের চা ঢেলে নিয়ে চুকচুক চুমুক দিচ্ছেন।

এতক্ষণ মৃদু একটা সংগীতের সুর বাজ-ছিল, মঞ্চ হঠাৎ যেন জোরালো আলোয় জাগ্রত হয়ে উঠল। বাজনা থামল।

পিছনে একটা সীন, হয়ত রাজপথ, হয়ত নদীতীর, হয়ত শয়নকক্ষ, কিন্তু এতদূরে থেকে সবই নিষ্প্রভ ধূসর, দৃশ্যটা কী ঠিক ঠাহর হল না।

জনকয়েক লোক একবার এসে হাত-পা নেড়ে একচোট হেসে কথার তুবড়ি ছুটিয়ে দিয়ে সরে পড়ল, তার এক বর্ণ তিনি উদ্ধার করতে পারলেন না। নিজের কাছে নিজেরই বোকামি ধরা পড়ল ভেবে তাড়াতাড়ি পকেটে রুমাল খুঁজলেন।

দৃশ্যান্তর। একটি মেয়ে একলা বসে কী লিখল, দু'পা এগিয়ে চেঁচিয়ে কাকে ডাকল, সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব ঘটল একটি পুরুষের, মধ্যবয়সী কিন্তু মজবুত গড়নের, থুতনিতে ঘন কালো দাড়ি।

মেয়েটি নিশ্চয় একেই ডাকেনি, নতুবা, স্পষ্টতই ভীতভাবে পিছিয়ে যাবে কেন।

লোকটি কর্কশ গলায় কী বলল, মেয়েটি তার জবাব দিল, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, কিন্তু চোখে ফুলকি, লোকটি তখন অট্টহাস্য করল।

তারপর মঞ্চ ক্রমশ মলিন হয়ে এল, কী ঘটতে থাকল ঠিক বোঝা গেল না, চাপা গলায় কথা কাটাকাটি (এখান থেকে সব কথাই চাপা)।

অস্বস্তিতে কৌতূহলে তাঁর চোখ জ্বলছিল, দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

হঠাৎ চেয়ে দেখেন, মঞ্চে কেউ নেই, প্রবল, কালা করে দেওয়া করতালিতে প্রেক্ষা-গৃহ ফেটে পড়ছে।

তিনি কুণ্ঠিত হলেন। টর্চ জ্বালিয়ে যে লোকটি বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, ঈষৎ পূর্বেও তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন, এখন চটে গেলেন।

তোমরাই এ পথে একমাত্র গাড়িবারান্দা রেখেছ, ভিতরে ঢুকতে দিলে যদি, বসতেও আসন দিলে, তবে এত পিছনে কেন, এখান থেকে সব ঝাপসা লাগে, কানে তো বর্ণবোধও হয় না।

আশে-পাশে চোখ ঘুরিয়ে তিনি টর্চদারকে খুঁজলেন, কিন্তু অন্ধকারে কোথায় সে যে উবে হয়ে আছে!

সময় বইছিল, সাহস পাল খুলছিল, তিনি হামাগুড়ি—না, বরং কতকটা কুর্নিশের ভঙ্গিতে গুটি গুটি এগিয়ে গেলেন।

বেশি নয়, অন্ধকারের সুযোগেও তিন-চারটের বেশি সারি টপকাতে ভরসা হল না। মধ্যে আলপথের পাশেই একটা সীট খালি দেখে সেখানেই বসে পড়লেন।

পাশে যে-লোকটি ছিল, সে আড়চোখে একবার চাইল শুধু, কথা বলল না। কাঁচুমাচু তিনি কী একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন, আসনের নতুন প্রতিবেশী তার ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল,—শ্‌শ্‌শ্‌!

আর একটি দৃশ্য—কিংবা অংক?—শুরু হয়ে গেছে। তিনি চক্ষুকর্ণ ইন্দ্রিয়াদির অনুভূতি ছুঁচলো করে বসলেন।

নতুন দৃশ্য। নতুন আমের পাতার রঙের মত বেগুনি-তামায় মেশানো আলোয় ওরা মঞ্চ মুড়ে ফেলেছে, দিনমানের কোন সময় সেটা ওই আলো থেকেই বুঝে নিতে হবে।

বেগুনি ফিকে হয়ে হয়ে ক্রমে তামা প্রকট হল, মাজা-মাজা একপ্রকার প্রগাঢ় আলো। সেই আলোয় একটি মূর্তি স্পষ্ট হল।

মধ্যবয়সী সেই মানুষটি, যাকে আগেও একবার দেখেছিলেন। তখন বলিষ্ঠ বোধ হয়েছিল এখন বলিষ্ঠ না দুর্বল, সে-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য। চিবুকের নিম্নভাগে কাঠিন্য তর্কাতীত, কিন্তু চোখের কোলে বিমর্ষ কয়েকটি রেখা, ঠোঁটের কোণে বক্র অবিশ্বাস। তার নিজের প্রতি? বিশ্ব-সংসারের প্রতি?

দূরবীনের পরকলা পেলে এই গল্পের নায়ক ভদ্রলোক পরখ করতেন, আর একটু খুঁটিয়েও দেখা যেত। যেন চেনা-চেনা, যেন ওই মুখ কবে যেন কোথায় দেখা।

তখন ধীর পায়ে যে-রমণী ঢুকল, ঈস কী বীভৎস মেকাপ, তিনি চাপা চিৎকারে ধিক্কার দিলেন, পাশের আসনের দর্শনি তৎক্ষণাৎ তিরস্কার হল।

গালের হাড় উঁচু, পাতা কেটে চুল পাকানো, ঠোঁট পানের রসে রক্তাক্ত, ছি এমন সাজের রুচি একালে?

মেকাপ তো থিয়েটারে সবাই নেয়, তবু এর সজ্জা আর প্রসাধন অকপট প্রকট। পাউডার ঘষে ঘষে বয়স মুছতে চেয়েছে।

লোকটি মেয়েটিকে দেখে প্রথমে চমকে উঠল, পরেই আহ্লাদিত হবার ভাণ করে উঠে দাঁড়াল।

—তুমি!

তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন, "আমি, আমি, আমি! আমিই তো।" একটু বসা, একটু মোটা ধরনের গলা, যারা রাশভারী বা পোড়খাওয়া সেই মধ্যবয়সিনীদের যেমন হয়।

—"কিন্তু এখানে এখন—"

"কোনখানে কখন তবে সুরথ?"—একটু আগে যে-স্বর মোটা মনে হয়েছিল, তীব্র-নিখাদে তাই বেজে উঠল।

মঞ্চের সুরথ নামে সম্ভাষিত প্রৌঢ়টিকে শিউরে উঠতে দেখা গেল।

—না, মানে তা নয়। আশা করিনি কিনা, তাই। তুমি আজকাল কোথায়, অনেক দিন খবর দাওনি—

—থামো, নাওনি বল। আর, আশা করনি বোলো না। কথাটা আশংকা।

—আঃ (বিব্রত সুরথ ক্লান্তিতে করুণ তবু পরিহাসে তরল হবার প্রয়াসী)—তুমি ঠিক

সেই রকম। শব্দ নিয়ে খুঁতখুঁতি। ঠি-ক সেই রকম।

—না। ঝনঝন অনেক বাসন একই সংগে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। একটি বিদ্রূপ বিদ্যুৎ হয়ে কেবলই ঝলসাতে থাকল।—না, আমি ঠি-ই-ক সেই রকম আর নেই সুরথ। ঠিক কেন, একটুও না। সে তুমিও জানো। দ্যাখ, দ্যাখ, আমি কি ঠি-ক এই রকম ছিলাম, অ-বি-ক-ল! সুরথ তুমি কি তখন আমার হাতের এই কালশিরা দেখতে পেতে? নীল মাকড়শার জাল দ্যাখ। আমার চোখ—(বলতে বলতে মহিলা তাঁর চোখের পাতার নিচের দিকটা টেনে ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।)—এ কি ঠিক এই রকম ছিল। না, সুরথ, না। তুমি নিজেও জানো, না। ঢলঢল সায়র শুকিয়ে খোঁদল হয়েছে। আর আমার এই বুক—

সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে এক সংগে সব নিশ্বাস রহিত হল। তাঁরও। তাঁর দেহে রোমাঞ্চ দেখা দিল, কপালে ঘাম।

মঞ্চের নায়কও চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। কয়েকটি মুহূর্ত পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর করে আছে। তবু অঘটন ঘটল না। মহিলার হাত কঠিন হয়ে বুকের বোতাম স্পর্শ করেছিল মাত্র। শিথিল হয়ে পলকে নেমে এল।

হাত হঠাৎ প্রসারিত করে দিয়ে মহিলা আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাতে থাকলেন—"দাও, দাও, দাও, ফিরিয়ে দাও।"

দেয়ালে, দেয়ালে 'দাও-দাও'র আকুতি প্রতিহত হতে থাকল।

—কী দেব, কী দেব তোমাকে মৃণাল! বয়স? শরীর? সে তো আমার সাধ্যের বাইরে।

হাত প্রসারিতই রইল, মহিলার দৃষ্টি ক্রমশ সুস্থ, অংগভংগীর চাঞ্চল্য ক্রমশ স্থির হয়ে এল।

অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায়, কথা কটিকে যেন বরফজলে চুবিয়ে জিভের ডগায় পুরে চুষে চুষে ছিটিয়ে দিলেন—

—না। বয়স না। শরীর না। সে আমি ফিরে পাব না জানি। তুমি তা ফুরিয়ে ফেলেছ, উড়িয়ে দিয়েছ। কিন্তু আর যা তুমি, নিষ্ঠুর তুমি সুরথ ছিনিয়ে নিয়েছিলে, তা-তো তুমি নিজে ব্যবহার করনি, পুষে রেখেছিল, কই কই, কোথায় তা সুরথ? ফিরিয়ে দাও, দা—ও!

—কী, মৃণাল, কী? অভিভূত আর্ত পুরুষকণ্ঠে মঞ্চ মথিত হল—কী, কী, কী। পরক্ষণেই মঞ্চের নায়ক হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিল—নেই, নেই, কিছু নেই।

'আছে।'

দর্শকের আসনে উপবিষ্ট তিনি এই সময় অদ্ভুত এক কীর্তি করে বসলেন। বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'আছে।'

উত্তেজনার আধিক্যে তিনি আবার সীট ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন, কী করছেন জ্ঞান ছিল না। একটার পর একটা সারি পেরিয়ে তিনি একেবারে সমুখের একটি নরম আরামকায় আসনে বসে পড়লেন।

তাঁর বুকের মধ্যে হাতুড়ি পড়ছিল।

(আমি জানি। আমার সব মনে পড়েছে। এ-নাটক আমারই লেখা। তাই প্রথম থেকেই চেনা-চেনা লাগছিল, তাই অথৈ পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এলাম। আমি জানতাম, আমারই নাটকের আজ অভিনয়, কোথায় কে যেন খবর দিয়ে রেখেছিল, ওরা আমারই প্রতীক্ষায় ছিল।

তাই ওরা আমাকে বিনাবাক্যে ভিতরে ঢুকতে দিল, খাতির করে বসাল, এই যে আমি একেবারে আগের সারিতে চলে এলাম—বাধা দিল না তো!

আমিই তো নাট্যকার, তাই সব গড়গড় বলে দিতে পারি, আমার কাছে কোনও রহস্য নেই। ওই মহিলা কী চাইছে জানি, লোকটা যা ফিরিয়ে দিতে পারছে না, তা-ও।

ওই দ্যাখ দৃশ্যান্তর শুরু হয়ে গেল, ব্যাপারটা ক্রমশ নিরতিশয় স্পষ্ট।)

এ দৃশ্যেও মঞ্চের ঠিক কেন্দ্রে সেই একই লোক, তাকে এত কাছে থেকে আরও বুড়ো লাগছে। একটির পর একটি মেয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে, তারা নির্বাক, তাদের চাহনি নির্বিকার, একটি অমোঘ, নিয়ন্ত্রিত রীতিতে পা ফেলা ছাড়া তাদের আর কোন ভূমিকা নেই—শুধু তাদেরও একটি করতল লোকটির দিকে প্রসারিত।

তারাও মিলিয়ে গেল, রয়ে গেল শুধু একজন। সে-ও উইংস পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু কার ইসারায় আবার পা টিপে টিপে ফিরে এল।

মজা পেয়ে দর্শক ভদ্রলোক স্বগতই তালুতে জিভ ঠেকিয়ে একটি আহ্লাদসূচক অব্যয়ের জন্ম দিলেন। এত কাছে না বসলে তো অভিনেত্রীর ভুলটা তাঁর চোখে পড়ত না। আড়ালে যে ছিল তার ছায়াটাও যেন দেখতে পেলেন।

নবীনা এই মেয়েটি বয়সেও নবীনা, কমলা রঙের শাড়িতে ওকে বেশ মানাত, তবু ছাই-ছাই রঙের শাড়ি পড়েছে—তার নিশ্চয় কোন তাৎপর্য আছে।

লোকটি করতলে মাথা গচ্ছিত রেখেছিল। লম্বা লম্বা চুল, তবু পাতলা, টাকের আভাসও দেখা যায়। প্রথম সারি, মঞ্চের এত ঘনিষ্ঠ বলেই এই বিরল সুযোগ, প্রায় কিছু অগোপন থাকে না।

ওই তো ড্যাবডেবে গোটা কতক গোল গোল আলো রাখা, কী বিকট, কী প্রখর, এর নামই কি পাদপ্রদীপ, কোথাও ছায়ার লেশ রাখেনি।

উইংস-এর চটে পেরেক ঠোকা, স্পষ্ট দেখা

যায়, ওপর থেকে ঝালরের মত ঝোলানো 'স্কাই'-এর আড়ালে আড়ালে অশেষ তার আর দড়ির কারিকুরি।

কিন্তু মেয়েটি থমকে আছে কেন—*নির্ঘাত পার্ট* ভুলেছে, দ্যাখ না, কেমন অসহায়ের মত নেপথ্যের দিকে চেয়ে আছে।

'এই!' মেয়েটি এতক্ষণে রিনরিনে গলায় বলে উঠল।

কিন্তু তার আগেই তিনি চাপা পুরুষ গলার স্বর শুনতে পেয়েছেন—'এই'।

প্রমটারের। আধখোলা বই হাতে নিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটি মেঝেয় পা ঠুকল, ধুলো উড়ল, বিরক্ত তিনি বিরক্ত হাঁচি চাপলেন। সামনে বসার এ-ও এক সেলামী।

মঞ্চে সবুজ ছায়া পড়ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে তিনি দেখে নিলেন, আলোকসম্পাতকারী কোন্ চাকতি পরাচ্ছে।

'এই!'

মঞ্চের নায়ক মাথা তুলল। তার দৃষ্টি ঘোলাটে, মুখে বসন্ত-কিরণের কয়েকটা কালচে ক্ষত।

'কে?' লোকটি ঘুমের মধ্য থেকে জবাব দিল, কিন্তু তারিফ করতে হয় ওর স্বরক্ষেপের, যেন গম্ভীর গম্বুজ তৈরি করছে।

'কে? ও, মল্লিকা, তুমি? কী চাও?' বলতে বলতে প্রৌঢ় নায়কের চোখে আবার ভীষণ ভয়ের লক্ষণ দেখা দিল, 'তুমি, তুমিও? আত্মা ফেরত চাও, না?'

"চাই। সেই কড়ারই তো ছিল, মনে নেই? মনে নেই, প্রথম যেদিন এলাম, তুমি একটু-একটু করে টানলে। দৃষ্টি দিয়ে, ব্যক্তিত্ব দিয়ে, স্বর দিয়ে। তোমার কাছে কী চুম্বক আছে সুরথ, তুমি জানো না। তবু জোর করে নিজেকে ছিঁড়ে পালালাম।"

"পালালে, মল্লিকা!" আহত মুখভঙ্গি, ভাঙা-ভাঙা প্রৌঢ় স্বর।

"পালালাম। তবু সুরথ, আবার তো ফিরে এলাম। একটু পিছনো একটু এগোন। ছোট-ছোট ঢেউ-এর মত।"

"শেষবার ঢেউয়ের মতই এই ঘরে ভেঙে পড়লে।"

"পড়লাম সুরথ। সেদিন ভীষণ হাওয়া। সেদিন দরজায় জানালায়, কাঁচে-কাঁচে ভীষণ আওয়াজ। তুমি দু'হাতে আমার কাঁধ বিঁধিয়ে দিয়ে আমার মুখে সম্মোহনী দৃষ্টি রাখলে। কী ঠাণ্ডা দৃষ্টি, গলা কী প্রগাঢ়। কী বলেছিলে মনে আছে?"

"কী মল্লিকা!"

"হাত বাড়িয়ে সেদিনও বলেছিলে, দাও!"

"আর তুমি?"

"আমার বুক তখন ঝড়ের নদী হয়ে গেছে, চোখের পাতা দপদপ, বুজে-আসা গলায় বলেছি, 'দিতেই তো এসেছি।' আর তখন, কী নিষ্ঠুর, কী হিংস্র দ্যুতি, হালকা-চাপা গলায় হাসতে থাকলে। তোমার চোখ কৌতুকে নাচছিল। তুমি বললে, না না এ নয়, এ নয়, শুধু শরীর নয়। আমার দক্ষিণাও চাই। ভীত উৎসুক হয়ে বলে উঠলুম, কী দক্ষিণা চাও তুমি? তুমি দীর্ঘ স্বর যতটা সম্ভব দীর্ঘায়িত করে বললে, 'আ—ত্মা।' বুঝতে পারলুম না। তুমি কানের কাছে মুখ এনে বললে, হাঁ আত্মা। আমার এখানে যারা শরীর দিতে আসে, তাদের কাছে আমি ওটা আগে থেকে চেয়ে নিই। আত্মা মানি'—শরীরের জামিন আত্মা।"

"থামো, মল্লিকা, থামো," মঞ্চের নায়ক সভয়ে দু'হাত তুলে বলে উঠল, "থামো। আমি আর শুনতে পারছি না।"

তার কর্কশ কণ্ঠ খোলামকুচির মত গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মেয়েটির পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

"থামব না। আজ আমি বলব। কী ছুরির মত তোমার ঠাট্টা, কী বিশ্রী তোমার উপমা। আজ আমাকে থামতে বলছ, কিন্তু সেদিন তো তুমি থামোনি। বলেছ, তোমাকে গ্রহণ করার আগে যেমন আবরণের খোলসটা খসিয়ে নেব মল্লি, তেমনই ভিতর থেকে তোমার আত্মাও বের করে নেব যে! ওই সঙ্কেতই হয়েছিল, তবু তুমি একটা উপমার লোভ সামলাতে পারলে না। বললে, কোন-কোন ফল আছে না!—যা খেতে হলে আমরা শুধু খোসা ছাড়াই না, ভেতরের আঁটিটিও বের করে নিই।"

টিক-টিক টিক। ভদ্রলোকের হাতের ঘড়িটা টোকা দিয়ে দিয়ে সময়ের ফোঁটাগুলোকে ঝেড়ে ফেলছিল। মঞ্চে আর কিছু নেই। মেয়েটি কখন চুপ করে গেছে, লোকটি নিষ্পন্দ, ম্রিয়মাণ। কিন্তু মুখে 'রা' নেই কেন। ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, মেঝেয় পা ঘষতে থাকলেন অক্ষম আক্ষেপে। তিনি জানেন, এর পরের অংশটুকু ওই প্রৌঢ় নায়কের, কিন্তু—

যা ভয় করছেন, তাই। অভিনেতা পার্ট ভুলে গেছে। আড়চোখে চাইছে নেপথ্যের দিকে—এ অবস্থায় প্রমটার একমাত্র সহায়।

আলো নিবু-নিবু হয়ে এসেছে, এই চরম মুহূর্তে সব ডোবে-ডোবে।

প্রেক্ষাগৃহে গুঞ্জন, তাঁর নিজের গায়েও ঘাম কুলকুল। পারলে চেঁচিয়ে ওঠেন, পারলে ওই প্রস্তরীভূত পদার্থ, মঞ্চের নায়কটাকে ঠেলে সরিয়ে নিজেই মঞ্চটি দখল করে নেন।

তাঁর যে সব মুখস্থ, এ-যে তাঁরই পার্ট।

(না, আমি চেঁচাইনি, মঞ্চে উঠিনি, শুধু চুপে চুপে সরে এসেছি। এখন রুমালের ভাঁজে কপালের ঘাম শুষে নিচ্ছি।

না, আমি আর ভিতরে যাব না। এই বাইরেটা বড় ঠাণ্ডা, এই গাড়ি বারান্ডাই ভাল। একেবারে বাইরে কিছু মেলে না, সব যেন খাঁ-খাঁ, কিন্তু খুব কাছেও যেতে নেই। তাহলে সীনের দড়ি নজরে পড়ে, ফুটলাইটের পোয়াতিপেট ডুম টসটস করে, প্রমটারের গলা শোনা যায়। ওখানে প্রমটার—সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর। স্রষ্টা আমারও কোনও ভূমিকা নেই। কুশীলবেরাও খেলার পুতুল।

প্রমটার যদি ফিরে এসে শ্রুতিধর বইটা খুলে বসে থাকে তবে অভিনয় হয়ত আবার শুরু হয়ে থাকবে। এর পরে কী আছে, আমি তো জানি। আলো আরও মলিন হবে, লোকটা তখন নড়ে বসবে। আবার ফিরে আসবে ওই ছায়া-শরীর মেয়েরা, চক্রাকারে ওকে প্রদক্ষিণ করে ক্রমে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে বলতে থাকবে—দাও, দাও, দাও। আর তীরবিদ্ধ জন্তুর মত লোকটি লুটিয়ে পড়বে।)

তাকে তবু মাথা তুলতেও হবে। ছায়া-রমণীরা পিছিয়ে যেতে যেতে অঙ্কিত দৃশ্য-পটের অন্তর্গত হয়ে যখন পড়বে—তখন।

ভগ্নকণ্ঠ একটি সংলাপ ছোট ছোট তরঙ্গবলয় সৃষ্টি করে যাবে, আমি জানি। উন্মত্ত, আবিল দৃষ্টি তুলে লোকটি জিজ্ঞাসা করবে, 'হে রমণীবৃন্দ, তোমাদের আত্মা তোমরা ফিরে পেতে চাও কেন?'

হালকা হাততালি দিয়ে দৃশ্যপটভুক্ত মেয়েরা বলে উঠবে, আ-হা! অন্য লোকে প্রবেশ করব বলে। তোমার না-হয় ইচ্ছা, প্রয়োজন সব ফুরিয়েছে। কিন্তু আমরা কোথায় যাব। সেখানেও যদি ছাড়পত্র চায়! সুরথ, আত্মাই হল সেই ছাড়পত্র।

তখন নিরুপায় অন্তিম একটি স্বগত উৎসার—'এই সব মেয়েদের আত্মা আমি যৌবনকালে হরণ করেছি। আজ এরা এক-যোগে গচ্ছিত আত্মাগুলি ফিরে চায়। কিন্তু হায়, এই বয়সে আমি যার যা তাকে তা কী-করে বুঝে পড়ে দেব। যা কেড়ে নিয়েছিলুম, তা যে আমার কাছেও নেই, আত্মা আলাদা ভাবে থাকে না। কবে উবে গেছে। তখন কী জানি, শরীরের বাইরে এলেই আত্মা আর নেই!'

'এই মরীয়া পাওনাদারেরা আমাকে ঠোকরাচ্ছে, কী করি, আমি এখন কী করি।' অস্থির হয়ে নিজের চুল মুঠি করে ধরা লোকটির নেত্র অকস্মাৎ উৎপ্রভ হবে—'আছে, একটা রাস্তা এখনও আছে। আমার নিজেরও না একটা আত্মা ছিল? সেটাকে তো উপড়ে এনে খণ্ড খণ্ড করে ওদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি।'

থমথম করছে অত বড় রাজবাড়ির মতো বাড়ি।

নিস্তব্ধ। যেন মরা বাড়ি।

পা টিপে টিপে চলছে চাকর-বাকর। এক বাড়ি লোক। বাড়ির লোক তো আছেই, তার উপর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব। কিন্তু কারও মুখে শব্দ নেই। যে কথা বলছে, সেও ফিসফিস করে।

দোতলার বড় হলঘরে সোফা-ভর্তি মেয়েদের ভিড়। সবাই স্তব্ধ। কি হয়, কখন কি হয়।

কোথাও খুট করে একটু শব্দ হলে চমকে উঠছে সবাই। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করে উঠছে। মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে যাচ্ছে।

কি হল আবার! শব্দ কিসের!

ভগবান!

মনে মনে সবাই ভগবানকে ডাকছে।

ডাকবে না? সেন বাবুদের কাছে ঋণী নয় কে? পিতৃদায়-মাতৃদায়-কন্যাদায়, রোগ-শোক-দারিদ্র্য, যে কোনো বিপদে পড়ে যে এসে সেনবাবুর কাছে হাত পেতেছে, সে রিক্ত হস্তে ফিরে যায় নি। তাঁর সহৃদয়তা এবং দানশীলতায় সকলেই মুগ্ধ।

বৎসরের বেশির ভাগ সময় থাকেন তিনি অবশ্য কলকাতাতেই। কিন্তু দেশের বিরাট প্রাসাদও একেবারে ত্যাগ করেন নি। প্রায়ই সেখানে যান।

দেবসেবা, অতিথিশালা, উচ্চ বিদ্যালয়, হাসপাতাল,—সে একটা বিরাট ব্যাপার। সমস্তেরই মূলে তাঁরই বদান্যতা। সে সমস্তর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে মাঝে মাঝে,—কখনও একা, কখনও বা সপরিবারে গ্রামে তাঁকে যেতেই হয়।

খামখেয়ালি এবং চরিত্রগত আরও নানা দোষ সত্ত্বেও সাধারণ লোকে সেজন্যে তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

সুতরাং তাঁর একমাত্র পুত্রের এত বড় অসুখে যে বাড়ির ভিতরে এবং বাহিরে যে গভীর শোকের ছায়া পড়বে তাতে আর সন্দেহ কি! বহু লোক আসছে-যাচ্ছে, খোঁজ নিচ্ছে। সকলের মুখে নিদারুণ দুশ্চিন্তা। কি হবে? কি হবে?

বহুদিন ভদ্রলোক অপুত্রক ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, এমন কি তাঁর স্ত্রী পর্যন্ত তাঁকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের জন্যে প্ররোচনা দিয়েছিলেন। সকলের অনু-

রোধ-উপরোধ তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কি হবে এই বিপুল সম্পত্তির?

কি আবার হবে? বাদশাহী চলে যায়। সেনবাবুদের ধনসম্পদ সে তুলনায় কতটুকু?

কিন্তু এত বড় বংশটা লোপ পাবে?

সেনবাবু হা হা করে হাসতেনঃ কত বড় বংশ হে? চন্দ্রবংশ-সূর্যবংশের মত তো আর নয়।

সেনবাবু প্রথমা স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে সম্মত হননি। তখন তাঁর স্ত্রী দেবতার শরণ নিলেন। গৃহদেবতা রাধামাধব থেকে শুরু করে কালীঘাটের মা কালী, তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথ এবং কাশীর বিশ্বনাথ, দূরে এবং নিকটে যত দেবতা আছেন, সকলে। ব্রত-নিয়ম এবং যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন আছে, কিছুই বাকি রাখলেন না।

অবশেষে দেবতা মুখ তুলে চাইলেন বোধ করি। তাঁদের কৃপায় সেন বংশে বংশধর সন্তান এল। যখন সকলে সন্তানের আশা ছেড়ে দিয়েছিল সেই সময়। অনেকখানি পরিণত বয়সে।

আট বৎসর পরে সেই বংশধর সন্তান আবার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। সাতদিন ধরে যমে-মানুষে লড়াই চলছে।

কলকাতা শহরের দিকপাল ডাক্তারদের কেউ আসতে বাকি নেই। সকলে পৃথকভাবে এসেছেন, একযোগেও এসেছেন। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করেছেন। কিন্তু রোগের উপশম করতে পারেন নি। কাল রাত্রে তাঁরা এসে একরকম জবাবই দিয়ে গেছেন।

রোগীর বিছানার দু'পাশে সেনবাবু এবং সেনগৃহিণী ঠায় বসে। এক ফোঁটা জল কেউ মুখে দেননি।

এবারে কি?

কবিরাজ? হোমিওপ্যাথ? কি?

সেনগৃহিণী নিস্তব্ধ। সেনবাবু নিস্পৃহ-ভাবে বললেন, যা হয় কর।

ম্যানেজার নিজে ছুটলেন গাড়ি নিয়ে। তাঁর জমিদারী মেজাজ। শহরের সবচেয়ে বড় যে হোমিওপ্যাথ তাঁকে তুলে নিয়ে আসতে হবে। যত টাকা লাগে। মুহূর্ত-কালের মূল্য অনেক।

নিরিবিলি একসময় সেনবাবু ডাকলেন, বড়বৌ!

গৃহিণী নিঃশব্দে মুখ তুলে চাইলেন।

গলা ঝেড়ে সেনবাবু বললেন, ডাক্তার-কবরেজ কিছু নয়। তাঁদের কাছ থেকে আমরা তো খোকনকে পাইনি। যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি তাঁদের ডাক। তোমার ডাক একবার তাঁরা তো শুনেছিলেন। এবারও শুনতে পারেন।

গৃহিণী সাড়া দিলেন না। শুধু চোখ বন্ধ করলেন। স্বামীর মতো তিনিও বোধ-করি বুঝেছেন যে, মানুষের উপর আর ভরসা না করাই ভালো। মানুষ যা করবার করলে, করছেও। তার বেশি আর তার ক্ষমতা নেই। খোকনের অসুখ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে।

তবু হোমিওপ্যাথ এলেন।

শহরের সব চেয়ে বড় হোমিওপ্যাথ। তাঁর একটি ফোঁটা ঔষধে দুরন্ত রোগ সেরে যায়।

প্রবীণ চিকিৎসক। দীর্ঘ দেহ কিছুটা বয়সের, কিছুটা প্র্যাকটিসের চাপে একটু ঝুঁকে পড়েছেন। কোট-পেণ্টুলান নয়, পরণে ধুতি-পাঞ্জাবী চাদর।

চশমাটা মুছে নিয়ে অনেকক্ষণ রোগীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। নাড়ি দেখলেন, বুক দেখলেন এবং অনেক প্রশ্ন করলেন।

রোগী দেখে এবং প্রশ্নের উত্তর শুনে তাঁর মুখ খুব প্রসন্ন হলো বলে বোধ হলো না।

অসহায়ভাবে চারিদিকে একবার চাইলেনঃ ওদিকে সেনগৃহিণী মুদ্রিত নেত্রে বসে। ডাক্তারের উপস্থিতি তিনি টের পেয়েছেন বলে মনে হল না।

এদিকে সেনবাবু নিস্পন্দ বসে। তাঁর দেহটা রক্ত-মাংসের কি পাথরের কে বলবে?

দ্বারপ্রান্তে এবং দ্বারের বাইরে প্রশস্ত দালানে দাসী-চাকর, আমলা-কর্মচারী আর আত্মীয়-স্বজনের লোকারণ্য।

ডাক্তার একটি ফোঁটা ওষুধ রোগীর মুখে দিলেন।

অনেক টাকা ফি নিয়েছেন। বললেন, আমি নীচের ঘরে অপেক্ষা করছি। ঘণ্টা-খানেক পরে আবার আসব।

আধঘণ্টার মধ্যেই রোগী চোখ মেলে চাইলে, যে রোগী নিঃসাড়ে পড়েছিল।

খবর পেয়ে ডাক্তার ব্যস্তভাবে উপরে এলেন। রোগী চোখ মেলে চাইছেই বটে। চোখের দৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কম অস্বাভাবিক। দেহে একটু চনমনে ভাবও এসেছে।

ডাক্তার নাড়ি দেখলেন। বুক পরীক্ষা করলেন। মনে হল ঔষধের ফল দেখে তিনি একটু উৎসাহিতই হয়েছেন।

তিনি আবার এক ফোঁটা দিলেন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই একজন প্রশ্ন করলেন, কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু।

ডাক্তারবাবু তার দিকে একপলক নিঃশব্দে চেয়ে থেকে উত্তর দিলেন, নিশ্চয় করে কিছু বলবার সময় এখনও আসেনি। তবে এসে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে ভালো। মনে হচ্ছে ওষুধটা ধরেছে। দুপুরে টেলিফোনে রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে কেউ একজন খবর দেবেন। তিনটেয় আমি আবার আসব। সেবারে আর ফি দিতে হবে না।

তার মানে কেসটি সম্বন্ধে ডাক্তারের কৌতূহল এবং উৎসাহ জেগেছে। অর্থ স্বার্থ ছাড়াই কেসটি তিনি একটু নেড়েচেড়ে দেখতে চান।

তিনি চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

বিকেল তিনটেয় নিজে থেকে এসেছেন। সংগে ঔষধের বাক্স আর কতকগুলো মোটা মোটা বই।

তখন রোগীর অবস্থা অনেকটা ভালো। চোখের দৃষ্টি বেশ স্বচ্ছ। নিজে চেয়ে জল খেয়েছে। বাপ-মার দিকে চেয়ে কথা বলেছে।

তখন বাপ-মার মুখে হাসি ফুটেছে। বুকে আশা জেগেছে। দুজনেরই বিশ্বাস হয়েছে, ঠাকুর সেনগৃহিণীর প্রার্থনা শুনেছেন। এই ডাক্তারটি ভগবৎপ্রেরিত।

বাড়ির ভিতরের এবং বাহিরের গুমোট-ভাব কিছুটা কেটেছে। এখন আর কেউ পা টিপে টিপে হাঁটছে না। মাঝে মাঝে মৃদু হাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে। চাকর-দাসীরা স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে। ঠাকুর রান্নাঘরে জোরে জোরে খুন্তি নাড়ছে।

এ যাত্রা খোকন বুঝি বেঁচে গেল।

ডাক্তার এসে ভালো করে দেখলেন। রোগীর সংগে কিছু হাস্য-পরিহাসও করলেন। তাঁরও মুখ কিছু ফর্সা বোধ হল। মেঘ সম্পূর্ণ কাটে নি কিন্তু পাৎলা হয়েছে এই রকমের ফর্সা।

—ডাক্তারবাবু, আমি ভালো হয়ে গেছি, না?

—হাঁ বাবা, তুমি ভালো হয়ে গেছ।

—পরশু থেকে আমার পরীক্ষা। দিতে পারব না?

—নিশ্চয় পারবে। আর কয়েকদিন পরে ফুটবল পর্যন্ত খেলতে পারবে।

খোকনের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলঃ ফুটবল খেলতে পারব?

—পারবে না? আর ক'দিন পরেই তো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

—আর ক'দিন পরেই? —খোকন কি যেন চিন্তা করলে,—কিন্তু আমি উঠতে পারছিনে তো।

—তখন পারবে। এই ওষুধটুকু খেয়ে নাও দিকি।

ঔষধ খাইয়ে ডাক্তারবাবু নীচের ঘরে এসে বসলেন। নোটবুকে কি কি টুকতে লাগলেন। তারপরে বই খুলে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

সে-রাত্রি ডাক্তারবাবু ওখানেই রইলেন। কেন রইলেন কেউ ভেবে পাচ্ছিল না। ভদ্র-লোকের কি মাথা খারাপ?

রোগী তো এখন ভালো।

হাসছে। যে আসছে তারই সংগে কথা বলছে। জ্বরও বেশ দ্রুতবেগে কমে আসছে।

ম্যানেজার এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তার-বাবু, রাত্রে কি এখানে থাকবেন বলছেন?

ডাক্তার ঘাড় নিচু করে বইএর পাতা

উল্টোচ্ছিলেন। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

—রোগী তো এখন অনেক ভালো।

—মোটেই না। এ অবস্থাটা ভেবেছিলাম, রাত বারোটার পর আরম্ভ হবে। কিন্তু তার আগেই আরম্ভ হয়ে গেল।

ম্যানেজার অবাক হয়ে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে। কি বলছেন উনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। ভদ্রলোকের কি নেশা করার অভ্যাস আছে?

ডাক্তারবাবু বলে চললেন, ঠিক এই লক্ষণ-গুলো কোথায় যেন পড়েছি। কিন্তু কিছুতে খুঁজে পাচ্ছি না। সেই হয়েছে মুস্কিল। নইলে—

নইলে কি হতে পারত তা শেষ না করেই আবার ব্যস্তভাবে বইতে মন দিলেন।

না। সেই লক্ষণগুলি এবং তার প্রতিকার কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তিনি যে কোথাও পড়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। স্পষ্ট মনে আছে। কিন্তু কোথায় পড়েছেন? বইতে, না কোনো জার্নালে?

ডাক্তারবাবু একবার বই খোঁজেন, একবার অস্থিরভাবে পায়চারি করেন আর একবার উপরে গিয়ে রোগীকে পরীক্ষা করে আসেন। প্রয়োজন বোধ করলে ঔষধও দেন।

আপাতদৃষ্টিতে রোগী ভালো। মাঝে মাঝে অসাড়ে ঘুমচ্ছে, মাঝে মাঝে চোখ মেলে চাইছে। কখনও কখনও ক্ষীণকণ্ঠে দুয়েকটা কথাও বলছে।

রাত্রি বারোটায় যখন তিনি উপর থেকে নেমে এলেন তখন আর তাঁর মনে কোনো আশা নেই। বই বন্ধ করে ফেললেন।

আর আটকানো গেল না।

আট-নয় ঘণ্টা ধরে যমের সংগে তিনি অশ্রান্তভাবে যুদ্ধ করলেন। শেষে হেরে গেলেন।

হেরে যেতেন না। এখনও তাঁর বিশ্বাস, সেই রেমিডিটি যদি খুঁজে পেতেন তাহলে এই রোগীকেও তিনি বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু রেমিডি খুঁজে পাওয়া গেল না। শত চেষ্টাতেও না।

একবার মনে হয়েছিল, ছুটে বাড়ি ফিরে জার্নালগুলো ঘেঁটে দেখবেন। কিন্তু জার্নাল কি একটা? একটা পাহাড় বিশেষ। হাতে সময় নেই। এই অল্প সময়ের মধ্যে তার থেকে রেমিডি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

দুঃখে, হতশ্বাসে তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

ভোরের দিকে সব শেষ হয়ে গেল।

তখন চিন্তা হল কর্তা-গিন্নিকে নিয়ে।

গৃহিণী সেই যে অজ্ঞান হয়ে গিয়ে-ছিলেন, জ্ঞান ফিরল পরদিন সন্ধ্যাবেলায়। তারপরে চলল এই জ্ঞান ফেরে, এই অজ্ঞান হয়ে যান।

এমনি দিনকয়েক ধরে। ডাক্তার আসেন, ইনজেকশন দেন, চলে যান।

সেনবাবু ম্যানেজারকে ডেকে বললেন, ডাক্তার ডাকছেন কেন? ডাক্তার ডাকবেন না।

ম্যানেজার অবাক।

—না, ডাক্তার ডাকবেন না। যতদিন অজ্ঞান থাকবেন, ততক্ষণই ভালো থাকবেন। জ্ঞান হলেই যন্ত্রণা। কিন্তু আমি কি করি বলুন তো? আমি তো কিছুতেই অজ্ঞান হতে পারছি না।

তাঁর জন্যে সত্যিই সকলের মনে ভয় হল। বয়স্যেরা বুঝতে পারে না ওঁকে নিয়ে কি করা যায়।

ম্যানেজার কর্মিৎকর্মা লোক। একজন বয়স্যকে ডেকে ইঙ্গিতে বললেন, ওখানে নিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।

ওখানে মানে নীলার ওখানে। সেনবাবু আদর করে ডাকেন নীলা-নাগিনী। গত দশ বৎসরকাল তাঁর রক্ষিতা। দশ বৎসরকাল প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বয়স্যদের নিয়ে ওখানে যান। রাত্রে প্রমত্ত অবস্থায় ফেরেন।

নীলা চমৎকার গাইতে পারে। সুন্দর কথা বলতে পারে। দশ বৎসরের সাহচর্যে সেনবাবুকে সে যেমন জানে, এমন আর কেউ নয়।

বয়স্যদের মনে হল, কর্তাকে সে হয়তো সামলাতে পারে। কাঁদাতে পারে, হাসাতে পারে।

কর্তার এখন কাঁদা প্রয়োজন।

ভুলিয়ে কর্তাকে তারা সেখানে নিয়ে গেল।

নীলা দুঃসংবাদ আগেই পেয়েছিল। কর্তাকে শান্তভাবে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে বসাল। গ্লাসে মদ ঢেলে তাঁর সামনে রাখল। তারপর হার্মোনিয়াম নিয়ে একটি গান ধরল।

অত্যন্ত করুণ একটি গান।

দুই এক চুমুক খেতে খেতেই কর্তা কিছুটা যেন স্বাভাবিক হলেন।

তারপরে কী কান্না।

এই ক'দিনে যত কান্না বুকের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়েছিল, ঝর্ণার ধারার মতো অনর্গল স্রোতে তা যেন প্রবাহিত হতে লাগল। তার যেন আর শেষ নেই।

নীলা আর এক গ্লাস ঢেলে দিলে। আরও এক গ্লাস। সেনবাবু বাধা দিলেন না। তাঁর বুকের মধ্যে যত অশ্রু জমে বরফ হয়ে গিয়ে-ছিল, তা গলাবার জন্যে এই তরল অনলের যেন প্রয়োজন বোধ করছিলেন।

গান চলছিল একটার পর একটা।

এমন সময় বাড়ির ঝি একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এল। খোলা টেলিগ্রাম। ও-বাড়িতে এসেছিল। ম্যানেজার জরুরী বিবেচনায় এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—কিসের টেলিগ্রাম? পড় তো হে।

তাঁর কণ্ঠস্বরে বিরক্তি। সবাই উদ্বেগে স্তব্ধ। আবার কি দুঃসংবাদ কে জানে।

জনৈক বয়স্য টেলিগ্রামটা পড়ে লাফিয়ে উঠল।

—কি ব্যাপার?

—সুপ্রীম কোর্টে আমাদের যে মামলাটা চলছিল তাতে আমাদের জিৎ হয়েছে।

—অ্যাঁ?

সেনবাবু অকস্মাৎ হাসতে আরম্ভ করলেন: বল কি হে, জিতে গেছি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিলেত থেকে আমাদের ব্যারিস্টার কেব্‌ল্ করছে।

—তাই নাকি!

কর্তা আবার উচ্চহাস্য করে উঠলেন: ব্যাপারটা কি দাঁড়াল বুঝতে পারছ? দেবী-গাঁয়ের জমিদারটা একেবারে ফকির হয়ে গেল। আর কিছু রইল না। সম্পত্তিটা তো গেলই। তার ওপর পর্বতপ্রমাণ দেনা! হাঃ, হাঃ, হাঃ।

কর্তার হাসি আর থামে না। উচ্চ হাস্যে ঘর ফেটে যাবার অবস্থা। হাসতে হাসতে ফরাসে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। ও-প্রান্ত থেকে এ-প্রান্ত। আবার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

তারপর হঠাৎ হাসি থেমে গেল। সেনবাবু আর উঠলেন না।

কালাচাঁদ-কাকা আমসত্ত্বের সঙ্গে চিঠিও দিয়েছেন একটা। ঠিকানা মিলিয়ে দেখলাম, এই বাড়ি বটে। কড়া নাড়ছি। চুপচাপ। নেড়েই যাচ্ছি। হঠাৎ একবার সাড়া এলো, কে?

রীণারই গলা, সন্দেহ নেই। নাম বললাম। পাঁচ বছর হলেও ভুলবার কথা নয়, তবু গ্রামের নাম বলি ঃ অমুক জায়গা থেকে আসছি। তোমার মামা ক'খানা আমসত্ত্ব পাঠিয়েছেন।

রীণা বলল, ওরে গগন, দোর খুলে বৈঠকখানায় বসা। আসছি আমি পঙ্কজ-দা।

কোথায় গগন, কেউ সাড়াশব্দ দেয় না। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি। ভাগ্যিস রেনকোট নিয়ে এসেছিলাম অসিতের বাসা থেকে। হা-পিত্যেশ দাঁড়িয়ে আছি। রীণার ব্যাপার না হলে কখন চলে যেতাম! পাঁচ বছর, বাদে বিবাহিত রীণা কেমন হয়েছে দেখবার লোভ। ভাল ছেলের সঙ্গে রীণার বিয়ে হয়েছে। গ্রাজুয়েট, জাপানি এম্ব্যাসিতে কাজ করে, ভাল মাইনে পায়। বাসা করে স্বামী-স্ত্রী পরম সুখে আছে। কালাচাঁদ-কাকাই সব বললেন। সুযোগ যখন হয়েছে, সুখ দেখে যাই। কপাল ভালো মেয়েটার, আমার ঘাড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে।

ইস্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছি সেই পাঁচ বছর আগে। পড়াশুনোয় রীতিমত ভালো, তার উপরে তিন তিনটে প্রাইভেট-মাস্টার। স্কলারশিপ যদিই বা ফসকে যায়, একগাদা লেটার পাবো নির্ঘাৎ। এই সময়ে কালাচাঁদ-কাকার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বোন-ভাগনি এসে পড়ল। রীণা ও তার মা। বয়সে কিশোরী তখন রীণা, রাজকন্যার মতো রূপ। পাড়াগাঁয়ে এমন সুন্দর মেয়ে কদাচিৎ চোখে পড়ে। মেয়েদের মধ্যে যেমন হয়ে থাকে—শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেলে মা কালাচাঁদ-কাকা ও রীণার মায়ের কাছে প্রস্তাব পাড়লেন ঃ বিয়েথাওয়া এখনই যে হচ্ছে তা নয়। পঙ্কজ কত পড়বে এখনো, বিলেত পাঠিয়ে ব্যারিস্টার করে আনবেন ও'র বড় ইচ্ছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে থাকুক, বিলেত রওনা হবার ঠিক আগেই শুভকর্ম। মেম বিয়ে করে যাতে না ফিরতে পারে।

সকল দিক দিয়ে আমি অতিশয় সুপাত্র, তাঁদেরও আপত্তির কথা নয়। বাবা আরও একপা এগিয়ে বললেন, মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। মুখের কথা নয়, আমি একখানা গয়না দিয়ে আশীর্বাদ সেরে রাখব। তারিখ ঠিক হল। ঠিক তার তিনদিন আগে বিনামেঘে বজ্রাঘাত, কলেরা হয়ে বাবা মারা গেলেন। রীণারা চলে গেল। যে রকম নবাবি চালচলন বাবার, কত লক্ষ টাকা রেখে গেছেন তার জন্যে সকলে কৌতূহলী। রেখে গেছেন একরাশ দেনা। ধার করার কৌশল, বোঝা যাচ্ছে, আশ্চর্য রকম রপ্ত করেছিলেন। ভিতরের অবস্থা উত্তমর্ণেরা বিন্দুমাত্র টের পায়নি, ধার দিয়ে কৃতার্থ হত যেন তারা। উত্তমর্ণ কি, আমার মা অবধি কোনদিন ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি।

তাহলেও পাত্র হিসাবে আমি সত্যিই তো ভালো—কালাচাঁদ-কাকা বললেন, কুছ পরোয়া নেই। পঙ্কজের পড়ার খরচা রীণার বাপই দেবেন। ব্যারিস্টার না-ই বা হল, ওকালতি পড়ে উকিল হয়ে সদরে বসতে পারবে। কপালে থাকলে উকিল থেকে হাকিম।

কিন্তু আমার মা বেঁকে বসেছেন ঃ অপয়া মেয়ে, কালাচাঁদ। আশীর্বাদের মুখে এই সর্বনাশ—ও মেয়ে বউ হয়ে ঘরে এলে বাড়িসুদ্ধ নিপাত যাবে।

ওদিকে রীণার মা-ও নাকি যাচ্ছেতাই করে বলছেন ঃ খুব রক্ষে হয়েছে। রীণার কপালজোর। কী ধাপ্পাবাজ ছিল ভদ্রলোক! ঠাকুরপ্রতিমার মতো—উপরে রংচং ভিতরে খড়। বিসর্জনের পর তবেই ধরতে পারা গেল।

কালাচাঁদ-কাকা ফলাও করে এই সব বলে বেড়াচ্ছেন। হয়তো বা নিজেরই রচনা, রীণার মা কিছু জানেন না। মায়ের অপমানের কথায় তিনি প্রতিহিংসা নিচ্ছেন। আমারও পড়াশোনার ঐখানে ইস্তফা। মা আর ছোট ছোট ভাইবোন তিনটে—সমস্ত দায় আমার মাথায়। গ্রামের ইস্কুলে চাকরি নিলাম। কিন্তু যা বাজার পড়েছে, চালাবার উপায় দেখিনে। চাকরির চেষ্টায় কলকাতা এসেছি। আশাও পেয়েছি। অসিতদের ওখানে উঠেছি। যখন গ্রামে থাকত, একসঙ্গে পড়েছি তার সঙ্গে, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারই মধ্যে রীণার বাসায় এই আমসত্ত্ব দিতে আসা।

কিন্তু কি হল এদের গগনের—রীণারই বা খবর কি? কারো যে সাড়া পাইনে। বিরক্ত হয়ে বিষম জোরে কড়া নাড়ি আবার। রীণা বলে ওঠে, কী আশ্চর্য, এখনো দোর খোলে নি? দাঁড়ান—একটুখানি দাঁড়ান পঙ্কজ-দা। আমি যাচ্ছি।

যাচ্ছি-যাচ্ছি করে—কী ব্যাপার? রাস্তা থেকে জানলা বেশ খানিকটা উঁচু। দেয়াল বেয়ে উঠে উঁকি দিই। তোলপাড় ভিতরে। ধোয়া সুজনি চাপা দিচ্ছে বিছানার উপর। ন্যাকড়া ভিজিয়ে চেয়ারটা মুছছে। জিনিসপত্র নাড়ানো সরানো চলছে। দুখানা হাত নিয়ে দশহাতের কাজ করছে রীণা। অপরিচ্ছন্ন গৃহস্থালী আমার চোখে পড়তে দেবে না। নতুন কিছু নয়। সাজগোজে ক'জন আমরা সর্বক্ষণ চমকদার হয়ে থাকতে পারি বলুন। অতিথি এলে তাই হুড়োহুড়ি লেগে যায়। আমি মানুষটার জন্যেই এত, অতএব নিজের

দিকেও একবার নজর ফেলে দেখি। না, ভালোই। চাকরির ব্যাপারে ভালো ভালো লোকের কাছে যেতে হবে, সে জন্য জামায় কাপড়ে ফুটোফাটা নেই। উপরন্তু ধোবার বাড়ির কাচানো। পথের কাদায় জুতোর পক্ষে সুবিধা হয়েছে—আনকোরার নতুন হোক আর পুরোনো-জরাজীর্ণ হোক, কাদা মেখে গেলে সব জুতোরই এক চেহারা। পাঁচ বছর আগে বাবার আমলে যে বেশে দেখাশোনা হত, তার চেয়ে খুব বেশি নিরেশ নয়। তার উপরে রেনকোট দারিদ্র চাপা দিয়ে একটা অভিজাত চেহারা এনে দিয়েছে।

খুট করে দরজা খুলে বীণা বেরুল। লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে, দেখুন দিকি! আমি জানি, বসিয়েছে এনে আপনাকে। একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছি, সেই ফাঁকে গগন সম্বা দিয়েছে। ঠাকুরের দেশ থেকে লোক এসেছে, সে অবশ্য বলেকয়ে ছুটি নিয়ে গেছে। চাকরবাকরের যা অবস্থা হয়েছে কলকাতায়—

লম্বায় চওড়ায় বড় জোর হাত পাঁচেক—নাকি বৈঠকখানা সেইখানে। সেখানে নিয়ে বসাল। লাগোয়া শোবার-ঘরটা এবং স্নানঘরই। বাকি ঘুমিয়ে ছিলে বুঝি বীণা? তাই হবে—নইলে এতক্ষণ তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে

কী করি, আমার কাপাটিও তো ঘটিয়েছে। একা একা ঘুম পেয়ে যায়। দাদাদের চাকরি—বাড়ি ধরা কাজ ওদের নয়। সকাল সকাল ফিরতে পারল তো চৌরিঙ্গিপাড়ার কোন একটা সিনেমায় ঢুকে বসলাম। সংসারের কাজকর্ম লোকজনে করে। আমার কি কাজ বলুন ঘুমোনো ছাড়া? কিছু মনে করবেন না পঙ্কজ-দা। গগন নেই আমি তো জানিনে। বড্ড ঘুমকাতুরে আমি—ঘুম ভাঙলেও ঘোর কাটতে চায় না।

সে তো স্বচক্ষে দেখা বীণা। সেই যে সেবার কালাচাঁদ-কাকার বাড়ি দুপুরে খেয়ে ঘুমুলে, কেউ ডেকে দেয় নি, রাতে খাওয়ার আগে উঠলে। বেকুব হয়ে তুমি তো কেঁদেই ফেললে একেবারে।

মুখ টিপে হেসে বীণা বলে, আপনাদের সব কেমন মনে থাকে পঙ্কজ-দা। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বীণা স্বাস্থ্যশ্রীর ঘর দুটি কেমন আহা-মরি করে তুলেছে। নিজেও। পাঁচ বছর আগে রূপসী কিশোরীকে দেখতাম, পরিপূর্ণ যৌবনে বীণা আজ অপরূপ। লম্বা-হাতা ব্লাউজ পরেছে। হঠাৎ এক সময় হাতা খানিকটা সরে গিয়েছে—দেখি, সুগৌর বাহুর উপর কটকটে কালো দাগ। জায়গায় জায়গায় ঘা এখনো দগদগ করছে।

শিউরে উঠে বলি, কি হয়েছে বীণা?

এই? তাড়াতাড়ি হাত ঢেকে ফেলে বীণা হেসেই খুন: বলেন কেন! সিনেমা দেখে ফিরছি দুজনে। বাস থেকে নেমে এইটুকু হেঁটে আসছি। ঘুম ধরেছে আমার।

চলতে চলতে পথের ধারে কাঁটাতারের বেড়ার উপর। সেই রাত্রে কোথায় ডাক্তার, কোথায় অষুধ-ব্যাণ্ডেজ—ডাক্তারবাবু শুনে মুখ টিপে হাসছেন, লজ্জায় আমি মুখ তুলতে পারিনে।

আমসত্ত্বর পুঁটুলি দিয়ে বললাম, সিঁদুরে গাছের আমের আমসত্ত্ব। কলকাতায় আসছি শুনে কালাচাঁদ-কাকা বললেন, এই আমসত্ত্ব বীণা বড় ভালবাসে। নিয়ে যাও ক'খানা।

বীণা খুব তারিপ করে: যেমন গোলাপ ফুলের মতন রং, তেমনি সুবাস। খেয়ে ভালো বলেছিলাম, মামা সেই কথা মনে করে রেখেছেন। কত যে ভালবাসেন মামা। সব কথা কেমন মনে থাকে আপনাদের।

বলতে বলতে হাসি-ভরা চোখ দুটো বুঝি ছলছলিয়ে আসে। তারপরে আমার কথা উঠল: কলকাতায় কি মনে করে পঙ্কজ-দা?

ক্যালকাটা ট্রেডিং করপোরেশনে চাকরি নিচ্ছি একটা।

গাঁয়ের ইস্কুলে মাস্টারি করেন শুনে-ছিলাম।

বীণার কণ্ঠে যেন তাচ্ছিল্যের সুর। না-ও হতে পারে। যৎসামান্য মাইনে বলে আমারই মনে হয় ঐ রকম। গর্বিত কণ্ঠে বলি, ইস্কুলের শিক্ষক আমি। আছি বেশ ভালোই। মানুষ গড়ে তোলার মহাব্রত। একশ টাকা করে দেয়। ট্রেডিং করপোরেশনে অবশ্য তিনশ—

বীণা বলে, ভুল করছেন পঙ্কজ-দা। একশ টাকা অনেক ভাল ছিল। গাঁ-ঘরের শান্তির জীবন। কলকাতা পাজি জায়গা।

সায় দিয়ে বলি, সে তো বটেই। নিজের বাড়িতে থেকে ক্ষেতের চাল খেয়ে একশ টাকা নিতান্ত কম হল না। টাকার জন্যে নয় বীণা। ভাল লাইব্রেরি নেই পাড়াগাঁয়ে, পড়া-শুনোর অসুবিধে। না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু না পড়ে যে পারিনে। কিছু না হোক কলকাতায় থেকে দেদার পড়তে পারব। সে-ই আমার বড় লোভ।

কথাবার্তার মাঝখানে বীণা উঠে পড়ল: নাঃ, গগনই ডোবাল। একটা পানের দোকান আছে, সেইখানে আড্ডা জমায়। দেখে আসি আমি।

বাস্ত হচ্ছে কেন বুঝতে পারি। মিষ্টি-মিঠাই কিছু আনাবে। গগন গায়েব, ঠাকুরটা ছুটি নিয়ে বেরিয়েছে। সত্যি বড় মুশকিলে পড়েছে বীণা।

কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে যে টিপটিপ করে—

খুলে-রাখা সেই রেনকোট গায়ে চাপিয়ে বীণা ততক্ষণে রাস্তায় নেমেছে: চলে যাবেন না কিন্তু পঙ্কজ-দা। এক্ষুনি আসছি।

একলা ঘরে হাসি পায় এখন আমার। বাবার দিব্যদৃষ্টি ছিল, তাই ব্যারিস্টার করতে চেয়েছিলেন। ব্যারিস্টার না হলাম, উকিল। অন্ততপক্ষে একটা মোক্তার হলেও আমার পয়সা খায় কে? একশ টাকার মাস্টারি, ট্রেডিং করপোরেশনে তিনশ টাকার চাকরি—বাতাসের উপর অবলীলাক্রমে কেমন এক বিশতলা ইমারত বানিয়ে দিলাম।

বাবার সঙ্গে ইস্কুলের সেক্রেটারির দহরম-মহরম ছিল। তাঁকে গিয়ে ধরে পড়লাম: বাবা চলে গিয়ে বড্ড বিপাকে পড়েছি, উপায় একটা করতেই হবে।

তাই তো হে, মুশকিলে ফেললে। নতুন নিয়মে গ্রাজুয়েটের নিচে মাস্টার হয় না। যাক গে, প্রাইমারি সেকসনে নিয়ে নিচ্ছি তোমায়। মাইনে পঁচিশ।

স্বর্গ হাতের মুঠোয় পেয়েছি তখন।

সেক্রেটারি বললেন, কিন্তু চাঁদা কেটে নেওয়া হবে কুড়ি টাকা। সই করবে পঁচিশ, পাবে কুড়ি বাদ দিয়ে যে টাকা থাকে। মুখ কাচুমাচু করো কেন হে ছোকরা—সকাল আর সন্ধ্যা তোমার রইল, সেই তো আসল। মাস্টার না হলে চিনবে কে তোমায়, টুইশানি কে দিতে যাবে? ইস্কুলের কাজ মানেই হল মাছ-ধরা পুকুরের ধারে হুইল-ছিপ হাতে নিয়ে বসা। ক্ষমতা থাকে টেনে টেনে মাছ তুলে নাও। তার জন্য টিকিট লাগছে না, উল্টে পাঁচ টাকা করে পাচ্ছ।

অতএব ছিপ ধরেই আছি পাঁচ পাঁচটা বছর। ক্লাসে পড়ানোর সময় মনে জানি, চার ফেলা হচ্ছে মাছ লাগানোর জন্য—ভাল পড়িয়ে নাম করতে পারলে টুইশানি গাঁথবার সুবিধা। কিন্তু বাজার খারাপ হয়ে এখন আর এমন অনিশ্চিত আয়ের উপর চলছে না। অসিতের বাপ পঞ্চানন তালদার ট্রেডিং করপোরেশনের বড়বাবু। বৈষয়িক গোল-মাল মেটাতে গ্রামে এসেছেন। নিরুপায় হয়ে

তাঁর কাছে পড়লাম: অসিতকে চাকরি দিয়েছেন, আমাকেও যে ভাবে হোক নিয়ে নিন।

অসিতের সঙ্গে আমার গলায় গলায় ভাব, হালদারমশায় জানেন সেটা। এক কথায় কেটে দিলেন না। বললেন, তোমার যে বিদ্যে দু রকমের চাকরি হতে পারে আমাদের অফিসে।

লোলুপ কর্ণদ্বয় উদ্যত করে আছি।

এক, জেনারেল ম্যানেজার। যিনি আছেন, একটা পাশও নন। কোন রকমে ইংরেজিতে নাম সই করেন। মাইনে আড়াই হাজার। কিন্তু এ চাকরি হবে না বাপু, অন্য কোয়ালিফিকেশনও চাই। সিনিয়র পার্টনারের শালা হতে হবে।

চুরুটে একটা বড় টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, আর হতে পারো ম্যানেজারের আরদালি। মাইনে পঁচিশ টাকা। কিন্তু তার জন্য তদ্বির লাগবে। তদ্বিরের মানে বুঝেছ তো? টাকা।

কলকাতায় ফিরে ছেলের সম্বন্ধে কথা তিনি ভোলেন নি। চিঠি দিলেন, চাকরি একটা ঠিক করেছি। আরদালি ঠিক নয়, তার কিছু উপরে। টাইম-কিপার। মাইনে পঁচাত্তর। তদ্বির লাগবে চার মাসের মাইনে। নগদ নিয়ে শিগগির চলে এসো। দেরি হলে থাকবে না।

তিন শ টাকা—কিন্তু তিনটে টাকারও তো জোগাড় নেই। অসিতকে কাকুতিমিনতি করে লিখলাম: চাকরে মানুষ তুমি, টাকাটা ধার দাও। চাকরি ফসকে গেলে সবসুদ্ধ না খেয়ে মরব। অসিতের জবাব: চলে এসো কলকাতা। পৌঁছানো মাত্র দশটাকার দু খানা নোট হাতে গুঁজে দিল, এবং গ্রামের কৃতী যাঁরা শহরে আছেন তাঁদের ঠিকানা। বলে, এক মাসের সিনেমা-দেখা আর কাটলেট-খাওয়া বন্ধ করে এই দিলাম। এ বাজারে একলা কেউ অত টাকা দেবে না। ঠিকানা দিয়েছি, তিল কুড়িয়ে করোগে। বাবাকে ধরলে তিনিই কোন না বিশ-পঁচিশ দেবেন। আমার এই টাকার কথা বোলো না তাঁকে, খবরদার!

সেই ঘোরাঘুরি এখন কদিন ধরে চলবে। রীণারা বড়লোক শুনেছি, তার কাছেও কৌশলে কথাটা পাড়ব ভেবেছিলাম। অথচ উল্টোটাই হয়ে গেল। যেন কোন খাস্তে-খাঁ এসেছি আমি—কোন অভাব নেই। একটি মাত্র ক্ষোভ, যথোচিত বই পড়তে পারিনে।

আধা-বুড়ো শীর্ণদেহ একটা লোক উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে: বাড়ির সব লোক কোথা?

হিমাংশুবাবু তো অফিসে এখন—

আর বলতে দেয় না। হি-হি করে লোকটা হেসে উঠল: কোন আপিস মশায় হিমাংশু ঘটকের। কে চাকরি দিল? বেড়ে ভাঁওতা দিয়েছে। বউটা বলল বুঝি—তিনিই বা কোথা? বড় ল্যাঠা হল—দেখলেই পালাবে। বলি বাড়িটা তো আমার নয়, মনিব ঠেকাই আমি কেমন করে?

পালায় নি। চাকরটা কোথায় বেরিয়েছে, তাকে খুঁজতে গেল। এক্ষুনি এসে যাবে।

এই দেখুন, চাকরও রেখেছে বুঝি হিমাংশু? ঝি-চাকর-ঠাকুর সব-কিছু এখন পরিবারে এসে ঠেকেছে। দিনরাত্তির মুখ বুজে খাটে, মদ খেয়ে এসে নৃশংস পশু ধরে ধরে সেই লক্ষ্মীপ্রতিমা ঠেঙায়। ঠেঙিয়ে সর্ব-দেহ চাকা-চাকা করেছে। দেখে এক এক-সময় রোখ চেপে যায়—জানিয়ে দিই মনিবকে, ভাড়া তিন মাসের জায়গায় চার মাস বাকি ফেলেছে। উচ্ছেদের নোটিশ দিক ঠুকে, ঘর খালি করে পথে গিয়ে উঠুক। কিন্তু বউটিও যে ঐ সঙ্গে যাবে—সেই জন্যে পারি নে।

কাছে বসিয়ে সবিস্তারে শুনি। বাড়ি-ওয়ালার বিল-সরকার ইনি। উচ্ছেদ করতে পারলে মনিব তো বগল বাজাবে—পাঁচশ টাকা সেলামি, ভাড়া ডবল। কিন্তু গরিব হয়ে আর এক গরিবের সর্বনাশ করা উচিত নয়। এদ্দিন চেপে রেখেছে, আর বুঝি পারা যায় না। তারও তো চাকরির ভয়। এক মাসের ভাড়াও যদি দিয়ে দিত। দেবার উপায় নেই, সেটা অবশ্য জানা—

বাইশ টাকা ভাড়া। অসিতের সেই নোট দুটো পকেটে আছে। রাস্তা খরচ যা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, তাই থেকেও দু টাকা হয়ে যাবে। রাণীর মা সেই বলে বেড়াতেন: মেয়ের কপালজোর—খুব রক্ষে হয়েছে আমার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে। প্রতিহিংসার একটা বড় সুযোগ। অভাব আমার নিত্য-দিনের, এ সুযোগ ছাড়া যায় না—

লিখুন রসিদ সরকারমশায়।

রসিদ দিয়ে লোকটা চলে গেল। মনের উৎকট জ্বালায় আমি তার উল্টো পিঠে আবার লিখি: ভাড়াটা আমি দিয়ে যাচ্ছি। কিছু মনে কোরো না রীণা। এমনও ঘটতে পারত, তোমার সকল দায়দায়িত্ব আমার উপর। ভাড়া তাহলে আমিই দিতাম। কপাল-জোর অবশ্য রক্ষে হয়ে গেছে।

সুজনির নিচে রসিদটা রেখে কিছু চাপা দিয়ে দিই। শোওয়ার সময় হাতে পড়বে। সুজনি তুলতে গিয়ে—ছিঃ-ছিঃছিঃ, নোংরা শতচ্ছিন্ন এমনি তোষক-বালিশ তো শ্মশানে মড়ার সঙ্গে বিদায় করে দেয়, মানুষে শুয়ে থাকে ভাবা যায় না। সদ্য পাট-ভাঙা বাহুল সুজনিতে ঢেকে দিয়েছে। এঘর-ওঘর ঘুরে আরও দেখছি। উপুড়-করা বালতিটা তুলতে মদের খালি বোতল কয়েকটা—ঢাকা দাও, রীণাকে দেখা যাচ্ছে রাস্তায়, যেমন ছিল সমস্ত ঢেকেঢুকে রাখো।

পাতার ঠোঙায় মিষ্টি এনেছে। রীণা বলে, নগনকে কোথাও পেলাম না। চাকর-বাকর এমনি হয়েছে কলকাতায়। নিজে দোকানে চলে গেলাম।

বেশ করেছ রীণা। আপনা হাত জগন্নাথ। যা দিনকাল পড়েছে, পরের উপর নির্ভর যত কম করা যায়।

ক্ষিধে পেয়েছিল, পরিতুষ্ট হয়ে খেয়ে উঠে পড়লাম। রীণা বলে, চাকরিটা হলে আবার কিন্তু আসবেন।

নিশ্চয়। বড় আনন্দ পেয়ে গেলাম। দিব্যি আছ দুটিতে। কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড় থাকে সুখে—

কলকণ্ঠে রীণা বলে, উচ্চবৃক্ষ আর পেলাম কোথা? একতলার ঘর। বাড়ির যা দুর্ভিক্ষ কলকাতায়! উপরের ফ্ল্যাটটা নেবার কত চেষ্টা করছি। ওরা একশ টাকা দেয়, দেড়শ অবধি বলেছি। কিন্তু ভাড়াটে উচ্ছেদ করে কেমন করে?

ট্রামে উঠে রেনকোট খুলে রাখছি—পকেটে কী যেন ঠেকল। সর্বনাশ করেছে, অসিতকে লেখা সেই চিঠি রেনকোটের পকেটে রেখেছে হতভাগা। পড়ে দেখে নি তো রীণা? চিঠির ভাঁজে রীণার কানের গয়না। কী সর্বনাশ, চিঠির উল্টো পিঠে রীণা যে আমারই মতন করে খানিকটা লিখে রেখেছে:

আপনার এতবড় দায়। কিন্তু টাকা আমাদের বাড়ি থাকে না—ব্যাঙ্কে রেখে দেয়। মানুষটি কখন অফিস থেকে ফেরে, স্থিরতা নেই। ঝুমকো দুটো দিলাম, এ জিনিস কেউ পরে না আজকাল, বিক্রি করে দায় সারবেন। কিছু মনে করবেন না পঙ্কজ-দা। একদিন ঘনিষ্ঠ হতে হতে বেঁচে গিয়েছি—হলে কি দায়ে-বেদায়ে আমার গয়না নিতেন না?

একটি মনিব্যাগ ও একখানি হাসি

রমাপদ চৌধুরী

দেবতোষ ভেবেছিল এখানে সব আছে। এখন ভাবছে সব বোধহয় কোথাও নেই। সেই যে ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে একটা বেশ মজার খেলা দেখেছিল। একটা লোক বসেছে সামনে শতরঞ্চি বিছিয়ে। তার ওপর আধ ডজন চীনেমাটির বাটি সারি দিয়ে উপুড় করে বসানো। লোকটা চার-পাশের ভিড়ের সামনে একটা ঘুঁটি মেলে ধরেই সেটা একে একে সব কটা বাটির নীচে চালান করে দেওয়ার ভান করছিল। কোন্ বাটিটার নীচে সত্যি সত্যি সেটা চালান করেছে কেউ বলে দিতে পারলে ডবল পয়সা পাবে, না পারলে বাজির টাকাটা গেলো। ভিড়ের মধ্যে মাথা সেঁধিয়ে ভিতরে ঢুকে অনেকক্ষণ সেই মজার খেলাটা দেখেছিল দেবতোষ। যে বাটিই তোলা হয়, সেটাই ফাঁকা। শেষে সন্দেহ হতে একজন রেগে গিয়ে পর পর সব কটা বাটি উল্টে দিয়ে দেখে ঘুঁটি নেই কোনটার মধ্যেই। হাতসাফাই বলে।

ওরে এক ভগবানের হাতের হাতসাফাই নাকি!

কথাটা মনে হতেই দেবতোষ নিজের মনেই হেসে ফেললো।

অরুণা খাটের এককোণে ঠেস দিয়ে হাঁটু তুলে বসে এক মনে প্লাস্টিকের সুতোয় পুঁতির পর পুঁতি গেঁথে চলেছিল। কটা দিন আহার-নিদ্রা ভুলে একটা পুঁতির ব্যাগ করায় মেতে উঠেছে অরুণা। তাই কোনদিকে ওর চোখ নেই।

কিন্তু এক ফাঁকে কখন ও চোখ তুলে তাকিয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে দেবতোষের আপনমনা হাসিটা চোখে পড়ে গেছে।

—কি, হাসলে যে! অরুণা নিজেও হাসলো।

দেবতোষ লজ্জা পেলো।—কই, না। পরে ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে বললে, এমনি।

অরুণা ঠোঁট উল্টে বললে, বুঝেছি বুঝেছি। এখন হাসছো তো, ব্যাগটা তৈরী হোক, তখন দেখবে কি সুন্দর হবে। কথাটা বললো বটে, কিন্তু চোখ তুললো না, হাত থামলো না।

দেবতোষ যেন বাঁচলো। যাক, অরুণা তাহলে ভেবেছে ওকে রাতদিন পুঁতির মালা গাঁথতে দেখেই হেসেছে ও।

দেবতোষ এবার ডেকচেয়ারে বসে বসেই পা দোলাতে লাগলো। একবার ইচ্ছে হলো বাবুকে ডেকে তোলে ঘুম থেকে। বিছানায় ওপর রবার ক্লথ, রবার ক্লথের ওপর কাঁথা, তার ওপর ক্ষুদে বালিশটায় মাথা রেখে গুটিকুটি ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারা, মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো চুল। তাকিয়ে দেখতে বেশ লাগে। দেবতোষের হাত নিসপিস করে, বাবুকে একটু চটকে পেসে আদর করতে। কিন্তু কাছে যাবার উপায় নেই, অরুণা খাঁই-খাঁই করে উঠবে। ঘুম পাড়াতে পারো

না, ঘুম ভাঙাতে ওস্তাদ। আরো কত কি বলবে।

দেবতোষ তাই নিজের মনেই হাঁটু দোলাতে লাগলো ডেকচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে। একবার অরুণার দিকে তাকালো।

দিন কয়েক হলো ঘরের বালবটাকে চল্লিশ থেকে পঁচিশ ওয়াটে নামিয়ে দিয়েছে। বারান্দার, কলঘরের আরো কম। মাসের শেষে ইলেকট্রিকের বিলটা যদি দুটো টাকাও কমে।

বইটই পড়তে একটু অসুবিধে হয় বটে, কিন্তু অল্প আলোয় ঘরটা বেশ লাগছে। মেঝের ওপর অরুণার ছায়া পড়েছে, ঠিক একটা আঁকা ছবির মত। হাঁটু ভেঙে বসেছে অরুণা খাটের কোণায় ঠেস দিয়ে, মাথাটা ঈষৎ নুয়ে আছে, চোখ দুটো হাঁটুর ওপর রাখা পুঁতি-গাঁথা প্লাস্টিকের সুতোয়। মুখে একটা চাপা হাসি।

পুঁতির পর পুঁতি গাঁথতে গাঁথতে অরুণা চোখ না তুলেই বললে, উল বুনলে রাগ, সেলাই করতে গেলে রাগ—রাগ নয় নাই বানাতাম, সময়টা কাটে কি করে বলো তো?

দেবতোষ হাসলো। কি আর জবাব দেবে। সারা দুপুর ও যখন আপিসে থাকে, তখন দিব্যি ঘুমিয়ে কাটাবে অরুণা, আর দেবতোষ ফিরে এলেই অরুণার কাজ।

তবে, দেবতোষের হঠাৎ মনে হলো, কথাটা মিথ্যে বলেনি অরুণা। সত্যি, ইদানীং বড় একা একা লাগে। অরুণা আছে, তবু। এক বাবু যখন জেগে থাকে সে-সময়টুকুই দিব্যি কেটে যায়।

দেবতোষ হঠাৎ চিৎকার করে ডাকলে, বা-বু-উ!

—এই! কপট রাগে চোখ পাকালো অরুণা। —খবরদার বলছি।

ঠোঁট বাঁকালো দেবতোষ।—উঁর বাপস্! ভস্ম করে দেবে নাকি।

—অমন আদর সবাই পারে, কই কাঁদে যখন ভোলাতে তো পারো না।

দেবতোষ কোন উত্তর দিলো না। ডেক-চেয়ারে দুহাতের আড়াআড়িতে মাথাটা রেখে আরো জোরে জোরে হাঁটু দোলাতে শুরু করলে। আপিসের নিবারণবাবুর কথাটা হঠাৎ একবার মনে উঁকি দিয়ে গেল। বয়স পঁয়তাল্লিশ, কনফার্মড ব্যাচেলার। সন্ধ্যে হলেই এক বোতল বীয়ার নিয়ে 'বারে' গিয়ে বসেন। দেবতোষ একদিন আপত্তি করেছিল, এভাবে পয়সা উড়িয়ে কি লাভ হয় মশাই? নিবারণবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, আপনাদের কি বলুন বৌ-ছেলের সঙ্গে গালগল্প করে সময় কেটে যায় আপনাদের।

নিবারণবাবুর কেন, সকলেরই তাই ধারণা। বিশেষ করে দেবতোষের যখন বয়স কম, সবাই ভাবে, দিনরাত বুঝি ওরা প্রেমালাপ করছে। একবার এসে দেখে যাক না তারা, এই যে এতক্ষণ চুপচাপ বসে আছে দুজনে, ক'টা কথা হয়েছে।

পরক্ষণেই দেবতোষের মনে হলো, না, এটা ভুল। কথা না হলেও একই ঘরে, এক ছাদের নীচে ওরা তিনটি প্রাণী তো রয়েছে। ইচ্ছে হলে কথা তো বলতে পারে। আর সেটুকুই অনেকখানি সান্ত্বনা। কেন কোনদিন আপিস থেকে ফিরে যখন দেখেছে অরুণা দোকানে দু'একটা জিনিস কেনাকাটা করতে গেছে, তখন ওই একটা ঘণ্টা কি কম অসহ্য লেগেছে! কিংবা সেই চুঁচড়োর বাড়িতে যখন অরুণা থাকতো, দেবতোষ ডেলী প্যাসেঞ্জারী করতো, বাবা-মা পিসীমা আর বোনরা যখন কাছে কাছে থাকতো বলে অরুণাকে নাম ধরে ডাকতে পেতো না বাড়ি ফিরে, কিংবা দুটো কথা বলতে পেত না, তার তুলনায় এই চুপ-চাপ বসে থাকাও ভালো।

ভালো? উহুঁ। তা নয়। সুখ বোধহয় কোথাও নেই।

বাবা-মার সঙ্গে একটু মনোমালিন্য করেই এখানে বাসা নিয়ে উঠে এসেছে দেবতোষ, সংসার পেতেছে। পিসীমাও দুটো কাটাকাটা কথা শুনিয়েছে। তবু উঠে এসে, প্রথম প্রথম বেশ ভাল লেগেছিল। অরুণারও। ঘোমটার বালাই নেই, ফিসফিস গলায় কথা বলার প্রয়োজন নেই, সিনেমায় যেতে হলে, কি বেড়াতে বের হবার আগে কথাটা মার কানে তোলবার জন্যে আধ ঘণ্টা ধরে শলা-পরামর্শের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সেই বেশ-বেশ ভালো লাগার দিনটা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাবে তা কি ভেবেছিল ওরা!

এর মধ্যেই কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে। কেউ একজন দিনকয়েক বেড়াতে এলে ভাল হতো। একঘেয়ে লাগছে, না কি ওদের আনন্দের ভাগটা আরো একজনকে না দিয়ে আনন্দ নেই!

অরুণা বোধহয় কিছু ভাবছিল। হাত কাজ করলেও মন তো স্থির হয়ে থেমে থাকে না।

অরুণা হঠাৎ বললে, দিদি আজো চিঠির জবাব দিলো না। ওরা বোধহয় আসবে না।

দেবতোষ সাড়া দিলো না এ-কথার।

- না আসে না আসবে, আমরাও আর যাবো না। অরুণার গলায় ঝাঁঝ।

দেবতোষ এতক্ষণে বললে, আমি জানতাম। অণিমাদের মত বড়লোক হতাম তো দেখতে এত সাধাসাধির দরকার হতো না, নিজে থেকেই কতবার এসে ঘুরে যেতেন।

—সে-কথা শোনাবো না ভেবেছো দেখা হলে? পুঁতিগুলো কাপড়ের ছোট্ট থলেটায় ভরে সেটা পাশে সরিয়ে রাখলো অরুণা। প্লাস্টিকের সুতোগুলো গুটিয়ে রেখে ভাত হয়েছে কিনা দেখতে গেল।

ছোট ছোট দু'খানা ঘর, পাশে একফালি বারান্দা। বারান্দায় তোলা উনোনে ভাত ফুটছে। ঢাকনিটা সরিয়ে খুন্তি করে গোটা কয়েক ভাত তুলে বুড়ো আঙুলে টিপে টিপে দেখলে অরুণা, তারপর হাঁড়ি ঢাকা দিয়ে ঘটির জলে হাত ধুয়ে আবার এসে বসলো।

বললে, গরীবকে কেউ পোঁছে না।

ক্ষোভের সুর ফুটলো। নতুন বাসা করার পর থেকে অরুণা চিঠি লিখে লিখে হয়রান হয়ে গেছে। বৌদিদের লিখেছে, দিদিকে লিখেছে, এমন কি মেজ ননদকেও। সকলেই সান্ত্বনা দিয়েছে, যাবো, যাবো। কারো ছেলে-দের পরীক্ষা, মেয়ের অসুখ, দাদার মামলা, তোর জামাইবাবুর কাজের চাপ।

অথচ অরুণাদের এত একা একা, একঘেয়ে লাগছে, এ-সময়ে কেউ এলে ওরা দুটো দিন ফুর্তিতে কাটাতে পারতো।

দেবতোষের ইচ্ছে কেউ ওরা আসুক, দুটো দিন থেকে যাক। ও মনে মনে ভেবেও রেখেছে, কেউ এলে কিভাবে আদরযত্ন করবে।

অরুণার কথা শুনে অরুণার দাদা-বৌদি, দিদি-জামাইবাবুর ওপর ওরও অভিমান হলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর চিঠি-পত্র দেবে না, বিজয়ার পরও না।

পরক্ষণেই বললে, তোমার দিদিকে আমি একটা চিঠি দিয়ে দেখি, কি বলো!

চিঠি দিতে হলো না। তার আগেই চিঠি এলো। অমুক ট্রেনে অমুক দিন যাচ্ছি তোমাদের কাছে।

চিঠি পেয়ে কি ফুর্তি দুজনের। বাবুকে কোলে নিয়ে অরুণা বললে, বাবু, কে আসছে জানিস? বলো মাসী।

আধো আধো কথা ফুটেছে বাবুর। ও চোখ গোল গোল করে তাকালো অরুণার মুখের দিকে। তারপর বললে, বলো মাসী।

হ্যাঁ, বড় মাসী আসবে, মণ্টু দাদা আসবে তোর, রিনা দিদি আসবে, বড় মেসো আসবে।

দেবতোষের মুখে হাসি। পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়ায় এই একতলার ছোট ছোট দু'খানা ঘর, আর এক ফালি বারান্দা পেয়ে যেদিন নতুন সংসার পাততে এসেছিল ওরা, সেদিনও হয়তো এত আনন্দ হয় নি, এত স্বপ্ন দেখেনি।

দেবতোষ বললে, ক'টার ট্রেনে আসবে লিখেছে, দেখতো।

—সকালে আটটা-নটায়। কোন ট্রেন ঠিক করে লেখেনি।

দেবতোষ বললে, তা হলে আটটার সময়েই স্টেশনে যেতে হবে, ওই ট্রেনে না আসে তো পরের ট্রেন দুটোও নয় দেখে আসবো।

—আপিসের দেরী হবে না? অরুণা জিগ্যেস করলে।

দেবতোষ হাসলো।—হয় হবে।

সত্যি সত্যিই গোয়ালা যখন দুধ দিতে এলো সকালে, তখনই দেবতোষ স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

আর অরুণা গয়লাকে বললে, আজ থেকে সকালে একপো, বিকেলে একপো দুধ বেশী

দিও। ভাল দুধ দিও কিন্তু, খোকার মাসী আসছে, দাদা-দিদি আসছে।

দাদা-দিদির একজনের বয়স আট, আরেক-জনের ছয়।

দেবতোষ ঘরের ভেতর থেকেই বললে, একপো নিলে হবে নাকি, দেড়পো করে বেশী দিতে বলো।

অরুণারও তাই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সাহস পায় নি। দেবতোষের কথায় সায় দিয়ে বললে, হ্যাঁ তাই। দেড়পো করে বেশী দিও।

ঠিকে ঝি সুনন্দা এসেছিল বাসন মাজতে। নামটা অরুণার পছন্দ নয়। প্রথম প্রথম ডাকতে গেলেই হেসে ফেলতো। নিজের নাম সুনন্দা! তাই বদলে করেছে নন্দ।

অরুণা বললে, নন্দ, বাজারটা আজ তোমাকে করে দিতে হবে। দিদি আসবে আজ, তাই ওকে স্টেশনে যেতে হয়েছে।

দেবতোষ তখন স্টেশনে চলে গেছে, আর অরুণা থেকে থেকেই ঘড়ি দেখছে, সময়ের হিসেব কষছে।

—মাছ দেড়পো এনো, ভালো হয় যেন।

আরও টুকিটাকি পাঁচটা জিনিসের ফর্দ দিয়ে দুটো টাকা তার হাতে দিল অরুণা। অন্যদিন দেবতোষ নিজে বাজার গেলেও এক টাকার বেশী পায় না।

সুনন্দা বাজারে চলে যেতেই আরেকবার ট্রাংকটা খুললো অরুণা। টাকার ব্যাগটা বের করে নোটগুলো গুনে দেখলো। একটা তৃপ্তির হাসি ফুটলো মুখে। আরেকটু হলেই হয়তো গুনগুনে এক কলি গান গেয়ে উঠতো।

মাসের মাঝামাঝি। ভাগ্য ভালো দিদি-জামাইবাবু শেষের দিকে আসছে না।

ট্রাংক বন্ধ করে ঘড়িটা দেখে সবে বাথরুমে ঢুকেছে অরুণা, অমনি জামাই-বাবুর মোটা গলার ডাক শুনতে পেল।

—কই, মেমসাহেব কই?

খটাং করে বাথরুমের দরজা খুলে ব্লাউজটা আবার পরতে পরতে ছুটে এলো অরুণা। এক মুখ হাসি নিয়ে।

—এই কি অভ্যর্থনার রীতি নাকি। আমি ভাবলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আছো রাস্তার দিকে চেয়ে।

অরুণা ততক্ষণে দিদি-জামাইবাবুকে প্রণাম করে দিদির বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দিদিকে জড়িয়ে ধরে বুক জুড়িয়েছে। তারপর রিনাকে কোলে তুলে নিয়েছে।

দিদি বললে, বাবু কোথায়?

—নন্দ, মানে ঝি বাজার গেছে, নিয়ে গেছে তাকে। এক্ষুনি আসবে।

শোবার ঘরে নিয়ে এসে সবাইকে বসালো অরুণা। দিদির স্যুটকেশ দু'খানা খাটের তলায় গুঁজে দিলো। তারপর ইশারায় দেবতোষকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, নন্দ নেই, মিষ্টি নিয়ে এসো।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলে দেবতোষ,

ততক্ষণে জামাইবাবুকে প্রণাম করে..
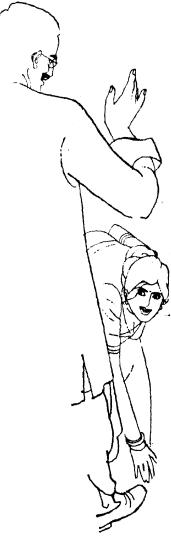
তারপর বেরিয়ে গেল।

অরুণার তখন কি ফুর্তি, কি ফুর্তি!—কতদিন পরে দেখা বল্‌তো দিদি। মণ্টু কত লম্বা হয়েছে।

জামাইবাবুকে বসিয়ে রেখে একখানা শাড়ী দিলো সে দিদিকে। দিদি কাপড় বদলে আসতেই বারান্দায় বসে পড়ে দু'জনে চাপা গলায় গল্প শুরু করলে। তাদের বাড়ির খবর, বাবা-মা, মেজজামাইবাবু কখন এসে-ছিল, জ্যাঠা মশাইয়ের ছেলেরা কি অভদ্র ব্যবহার করছে বাবার সঙ্গে, মাসতুতো বোন নীলিমা আর নীলিমার বরের কি গর্ব, দেবতোষের সম্পর্কে কি ঠাট্টা করেছে। এক পৃথিবী কথা জমে আছে, সব একে একে, এক্ষুনি না বের করে দিতে পারলে শান্তি নেই।

দেবতোষ আপিস চলে যাওয়ার পরে, জামাইবাবুর খাওয়া শেষ হতেই খাটে তাঁর বিছানা ঠিক করে দিয়ে খেতে বসলো দু'জনে। আবার গল্প, গল্প, হাসি কৌতুক।

একবার চেঁচিয়ে বললে, কি মশাই, নাক ডাকাচ্ছেন নাকি?

হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখলে জামাইবাবু খাটে শুয়ে তখনও জেগে বসে আছে, সিগারেট খাচ্ছে।

ওপাশে নীচে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো দু'জনে, পাশে বাবু। খাটে জামাইবাবুর পাশে মণ্টু আর রিনা।

কি আনন্দ, কি আনন্দ। কতদিন দিদির সঙ্গে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে পায়নি অরুণা। দিদিকে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পায় নি।

দুটো দিন পরম আনন্দে কেটে গেল। শুধু তৃতীয় দিনে ব্যাগ বের করে বাজারের টাকা দিতে গিয়ে একটু খিচখিচ করে লাগলো যেন। নোটগুলো গুনে দেখলো।

একশো আশিটাকা হাতে পায় দেবতোষ। মাইনে দুশোর সামান্য বেশী হলে কি হবে। প্রফিডেন্ট ফাণ্ড, স্টাফ ইন্সিওরেন্স, লাইব্রেরীর চাঁদা—অতশত হিসেব রাখে না অরুণা।

মাইনের টাকাটা এনে প'য়তাল্লিশটা টাকা—কড়কড়ে নোট ক'খানা বাড়িওয়ালার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বুকটা চড়চড় করে ওঠে। তার ওপর মাসকাবারী বাজার, গয়লা। টাকা সের দুধ। সব মিটিয়ে এর মধ্যেই সাতখানা নোটে এসে ঠেকেছিল।

মনে মনে দু'বেলার বাড়তি দেড়পো করে দুধের দামটা হিসেব করলো যেন একবার। সেটা অবশ্য পরের মাসের ভাবনা। কিন্তু এই দুটো দিনেই আরো দু'খানা দশ টাকার নোট ভাঙানো হয়ে গেছে। অবশ্য সবটাই খরচ হয়নি, ছ'সাত টাকা আছে তার। কিন্তু সাত-খানা দশ টাকার নোট তো আর নেই। পাঁচ-খানা হয়ে গেছে। খুচরো ছ' টাকা তো ইলেকট্রিকের বিল দিতেই চলে যাবে।

দূর, ওসব এখন ভেবে লাভ নেই। ভারী তো দু'চারদিনের জন্যে এসেছে ওরা।

অরুণা ফিসফিস করে দেবতোষকে বললে, একপো ঘি এনো আজ, বিকেলে জলখাবার ওই রুটি পাঁউরুটি ওদের রোজ রোজ দিতে ইচ্ছে হয় না, দু'খানা লুচি ভেজে দেবো।

—বেশ তো। দেবতোষও যেন দিলদরিয়া হয়ে গেছে। হিসেব করে বললে, পাঁচ টাকার নোটটাই দাও।

অরুণার ভয় ছিল, দেবতোষই হয়তো অসন্তুষ্ট হবে, বলবে, এভাবে খরচ করলে বাকী মাসটা চালাবো কি করে। এমনিতেই তো মাসের শেষ দিকে খিটিমিটি কথা-কাটাকাটি চলে। হিসেব বোঝাতে না পেরে, কিংবা আজেবাজে খরচ করার খোঁটা খেয়ে

এক একদিন রাগ করে নীচে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে শোয় অরুণা। ভালভাবে কথা বলে না। প্রতি মাসেই বলে, টাকা-পয়সা নিজের হাতে নাও, আমি অত হিসেব দিতে পারবো না। দেবতোষ রেগে গিয়ে বলে, ঠিক আছে, তাই নেবো। কিন্তু মাইনের পর নতুন ঝকঝকে নোট ক'খানা হাতে এলেই সব রাগ জল হয়ে যায়, সব প্রতিজ্ঞা ভুলে যায়। হাসি মুখে টাকাগুলো অরুণার হাতে দেয়, আর হাসি মুখেই হাত পেতে নেয় অরুণা।

এমন তো কতদিন ধরেই দেখে আসছে, তাই ভয় ছিল, দেবতোষ হয়তো বলবে, একটু হাত টেনে খরচ করো।

সে-কথা বললে লজ্জায় মরে যেত অরুণা। দিদি-জামাইবাবুর কাছে ছোট হয়ে যেত। দু'দিনের জন্যে এসেছে, তাছাড়া এরা তো এত টানাটানির মধ্যে সংসার চালায় না। বেড়াতে এসেছে বলে না-খেয়ে থাকবে নাকি?

শোয়ার ব্যবস্থাটা অবশ্য দিব্যি চলে যাচ্ছে। একখানাই খাট, একখানাই ভালো ঘর। সেটাই ওদের ছেড়ে দিয়েছে। জামাইবাবু খাটে শোয়, ছেলেমেয়েকে নিয়ে দিদি শোয় মেঝেতে। আর এ-ঘরে মাদুরের ওপর চাদর পেতে ওরা দু'জন।

দেবতোষ একটু আয়েসী মানুষ, অরুণা বুঝতে পারে ওর অসুবিধে হচ্ছে, তবু বলছে না কিছু। শীতকাল হলে কি ঝামেলাই না হতো। না, একমাস কয়েকটা টাকা বাঁচিয়ে একখানা বাড়তি তোশক করাতে হবে। লোকজন এলে বড় অসুবিধে হয়।

রবিবারে দেবতোষ বললে, আজ মাংস আনি, কি বলো?

অরুণা একটু চুপ করে রইলো চারখানা মাত্র নোট হাতে নিয়ে। এদিকে চাল তেল সব ফুরিয়ে এসেছে। ওদের দুটি প্রাণীর মাসকাবারী বাজারে এতগুলি লোকের কত-দিনই বা চলে।

বাজার থেকে ফিরে মুটের মাথা থেকে চালের থলেটা নামাতেই দিদি হেসে বললে, কি রে অরুণা, দু'দিনেই সব শেষ করে দিলাম নাকি?

অরুণাও হাসলো।—কম খাচ্ছো নাকি, ফতুর করে ছাড়বে।

দেবতোষ, জামাইবাবু সকলেই হো হো করে হেসে উঠলো।

নিছক ঠাট্টা করেই কথাটা বললে অরুণা।

জামাইবাবু দিদিকে বললে, এই বেলা ভালোয় ভালোয় সরে পড়ো। এরপর প্রহারেণ......

দিদি হাসলে, পরশু দিন তো যাবো বাবা, এ দুটো দিন......

—ইস্, যেতে দিলেই হলো কিনা। পরের রবিবারে ভাবা যাবে ওসব কথা। অরুণা সহাস্যে বলে উঠলো।

জামাইবাবু বাধা দিলো।—আমার ছুটিই বিষ্যুৎবার অবধি।

—না জামাইবাবু। জামাইবাবুর হাতখানা ধরলো অরুণা।

অনুনয়ের স্বরে বললে, প্লীজ।

দেবতোষও হেসে ফেললে।

অরুণা জামাইবাবুর হাতখানা চেপে ধরলে।—কতদিন পরে এলেন, দিদির সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে ঠিক নেই। তাছাড়া চিড়িয়াখানা যাবো, বোটানিক্‌সে যাবো..

রবিবার বিকেলেই বেরিয়ে পড়লো সকলে, বোটানিক্‌স যাবার জন্যে। ট্রাংক খুলে ব্যাগটা বের করলে অরুণা। তিনটি মাত্র নোট। দুটো দেবতোষের পকেটে দিয়ে দিলো। যদি হঠাৎ দরকার হয়!

দিদি-জামাইবাবু বললে, ট্যাক্সি দেখো একটা।

দেবতোষের ইচ্ছে ছিল ট্যাক্সিতে যাবার, কিন্তু সাহস হলো না। অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে যাবে। ভাড়াটা হয়তো ওরাই দিতে চাইবে, কিন্তু দেবতোষকেও তো পকেট থেকে টাকা বের করতে হবে। যদি দিতেও হয় ওকেই?

তাই মনে মনে একটা অজুহাত ভেবে রেখেছিল দেবতোষ।

বললে, ট্যাক্সিতে তো চারজনের বেশী নেবে না।

অরুণাও সায় দিলো।—হ্যাঁ, বাসেই চলুন।

দেবতোষ খুশী হলো। যাক, অরুণার তা হলে বুদ্ধি আছে। থাকবারই কথা, ও কি আর হিসেব রাখছে না খরচের। এর পর আরো দশটা দিন চালাতে হবে। ওরা চলে যাওয়ার পরেও।

টিফিন-কেরিয়ারে লুচি আর আলুর দম করে নিয়ে গিয়েছিল অরুণা। গাছের ছায়ায় ছায়ায়, গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে এক জায়গায় বসে খাওয়া-দাওয়া করলো সবাই মিলে। গল্প করলো। হাসি, রসিকতা।

সারাদিন হেঁটে হেঁটে শরীরে আর শক্তি নেই কারও।

ফেরার পথে ট্যাক্সিই করতে হলো। জামাইবাবু ভাড়া দিতে যেতেই রেগে গেল অরুণা।—ভাল হবে না কিন্তু।

ফিরে এলো ক্লান্ত হয়ে। অরুণাও ক্লান্ত।

দিদি বললে, আমি উনোন ধরাচ্ছি, তুই একটু শুবি যা। তোকে আর এদিকে আসতে হবে না।

তাও কি হয়। অরুণা কাছে বসে রইলো। দু'একটা সাহায্য করলে। খাওয়ার পরও গল্প করলো অনেক রাত অবধি।

তারপর অরুণা এসে পাশে শুয়ে পড়তেই দেবতোষ ফিসফিস করে বললে, দাদা কি বললেন? কবে যাবেন?

—শুক্রবার সকালে।

—তুমি কি বললে?

অরুণা বোধহয় হাসলো।—কি আর বলবো, ছুটি নেই যখন।

—হুঁ। মিছিমিছি লোকের অসুবিধে করে কি লাভ? হয়তো কাজের ক্ষতি হবে।

অরুণা চুপ করে রইলো। তারপর চাপা গলায় বললে, আমি তো আর কিছু বলিনি।

একটু পরে অরুণা ফিসফিস করে বললে, গোটা কুড়িক টাকা ধার এনো। সব তো ফুরিয়ে গেছে।

—ফুরিয়ে গেছে? চমকে উঠলো দেবতোষ। বোধহয় বিরক্ত হলো।

দেবতোষের একটা দীর্ঘশ্বাস শুনলো অরুণা।—দেখি।

অরুণা অসহায়ের মত বললে, ট্যাক্সি ভাড়াই তো লাগলো ছ' টাকা।

পরের দিন সকালে আবার হাসি-আনন্দ। রঙ্গ রসিকতায় মেতে উঠলো দুই বোন। যেন কোন টাকার চিন্তা নেই, শোয়া থাকার অসুবিধে নেই।

দিদি বললে, চলে যেতে হবে ভাবতেও এত খারাপ লাগছে।

—সত্যি। আবার যে কবে দেখা হবে।

মুখে বললো বটে অরুণা, দুঃখও হলো, তবু মনে মনে একটা আতংকও রয়েছে। আবার না দু'পাঁচ দিন থাকতে রাজি করিয়ে ফেলে ও নিজেই।

এতদিন ধরে আশায় আশায় বসে থেকেছে, দিদি-জামাইবাবু আসবে, মণ্টু-রিনা আসবে, কত স্বপ্ন বুনেছে, দু'বোনে গল্প আর গল্প, হৈ-হল্লা করে কাটাবে। কিন্তু দশটা দিনও কাটলো না, এর মধ্যেই যেন ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে অরুণা। দেবতোষ হয়তো রাগছে মনে মনে। ভাবছে, গেলে বাঁচি। সত্যি, এত খরচ কি ভেবেছিল ওরা।

এক একটা নোট ভাঙাতে না ভাঙাতে খরচ হয়ে যায়।

যদি অনেক টাকা থাকতো অরুণার, বাড়ি-গাড়ি, সত্যি কত ফুর্তিতেই না কাটাতে পারতো। জামাইবাবুর ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার অজুহাতটা কিছুতেই শুনতো না।

কিছুতেই না।

কিন্তু শুক্রবার সকালেও অরুণা মুখ ফুটে একবার বলতে পারলো না, আর দুটো দিন থেকে যান জামাইবাবু।

সমস্ত সংসারটা, হিসেবের খাতাটা যেন এ-ক'দিনেই ওলটপালট হয়ে গেছে। ওরা চলে গেলে হয়তো আবার সব গুছিয়ে নিতে পারবে। দুশ্চিন্তা ঘুচে যাবে।

দেড়পো করে দুধ বাড়তি নেওয়া হয়েছে। সাত-আট টাকা বেশী দিতে হবে পরের মাসের মাইনে পেয়ে। সে-মাসেও কি গুছিয়ে নিতে পারবে!

এতদিন একা একা দুঃসহ লেগেছিল, এখন যেন আবার একা হতে পারলেই শান্তি।

শুক্রবার সকালেই ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। স্যুটকেশ দুটো তুলে দিলো দেবতোষ।

হাসি হাসি মুখে রসিকতা করলো জামাইবাবু।—খুব ক'দিন জ্বালিয়ে গেলাম, এবার দুটিতে নিশ্চিন্ত হবে।

কিন্তু এ কি! অরুণা হেসে উঠে কোন উল্টো ঠাট্টা ছুঁড়লো না। শুধু জলে ভাসা দুখানা বড় বড় চোখ মেলে তাকালো জামাইবাবুর দিকে, তারপর দিদিকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলো।

—চলে যাচ্ছিস দিদি, আবার যে কবে...

কথা শেষ করতে পারলো না অরুণা। ওর বুকের ভেতর থেকে একটা প্রচণ্ড ব্যথা যেন বেরিয়ে আসার পথ পাচ্ছে না।

দিদি সান্ত্বনা দিলে সজল চোখে।—ছিঃ, কাঁদিস না, এই তো এইটুকু পথ, আবার আসবো। তোরাও যাবি, যাবি কিন্তু।

জামাইবাবুও ঠাট্টা ভুলে গম্ভীর হয়ে গেছে।—না গেলে আর আসবোই না। গিয়ে থাকতে হবে কিন্তু বেশ কিছুদিন, বুঝলে দেবতোষ।

দিদি-জামাইবাবুকে প্রণাম করলে অরুণা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো। হর্ন দিয়ে ট্যাক্সিটা সোঁ করে এগিয়ে গেল, গলির মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর সংগে সংগে সমস্ত বুক খাঁ খাঁ করে উঠলো অরুণার।

সমস্ত বাড়িখানা, দুখানা ছোট ছোট ঘর একটা বিরাট নির্জন হলঘরের মত, পরিত্যক্ত একটা পোড়ো বাড়ির মত খাঁ খাঁ করে উঠলো।

অরুণা বাবুকে খাটের উপর বসিয়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাসের স্বরেই যেন বললে, এত খারাপ লাগছে, সমস্ত বাড়িটা......

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলো। কথা বললো না কেউ। কথা হারিয়ে গেছে।

জানালার ধারে গিয়ে চুপটি করে বসে রইলো অরুণা বাবুকে কোলে নিয়ে।

দেবতোষের গলার স্বরও ভারী হয়ে এলো।—কো-অপারেটিভ থেকে গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার নিলেই হতো। তবু তো রবিবার অবধি থাকতেন ওঁরা।

অরুণা বিষণ্ণ হাসি হাসলে।—সত্যি!

তারপর শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বাবুর হাত থেকে দিদির দেওয়া দুটাকার নোটটা কেড়ে নিয়ে শাড়ির খুঁটে বেঁধে রাখলে।

এই যে নতুন
টিনোপাল প্যাক
এটি আপনিই কেবল
খুলতে
পারবেন !
Tinopal
টিনোপাল এখন
রঙিন চমৎকার নতুন প্যাকে
সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে !
পিলফারপ্রুফ সীল
প্যাক এমনভাবে সীল করা
যে কেবল আপনিই
খুলতে পারবেন…
সামান্য একটু টিনোপাল
ব্যবহার করলে সাদা
জামাকাপড় সবচেয়ে
বেশী সাদা হয়ে ওঠে।
টিনোপাল এদের রেজিষ্টার্ড ট্রেডমার্ক
ভারতে প্রস্তুতকারক : সুহৃদ গায়গী লিমিটেড,
এক্সপ্রেস বিল্ডিং, চার্চগেট, বোম্বে-১—বি.আর.

নীরজা / বিমল কর

আজ বিকেলেও নীরজা আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল। গত কয়েকদিন থেকে আমি ওকে এখানে দেখছি। কাল একটু বেশী বেলায় নীরজা রিকশা চেপে যাচ্ছিল। রিকশা দেখে আমার মনে হল, ও কুঞ্জবাবুর আনন্দভবনে এসে উঠেছে।

নীরজা আজ বিকেলে যখন আমার বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল তখন আমি বারান্দায় বসে। বারান্দার পর বাগান, বাগানের শেষে কাঁটাগাছের বেড়া। বেড়ার ওপাশে রাস্তা। রাস্তাটা সোজা স্টেশনের ওভারব্রিজ পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

আমার এই বাড়ি বেশ ছোট; সবচেয়ে এর দীন দশা। টালির ছাদ, মামুলি ভাদের ঘর, জাম কাঠের দরজা জানলা। বাগানে কিছু দেশী ফুলের গাছ, কাঠের ভাঙা ফটক ঘেঁষে বুনো লতার ঝোপ। শীত এসে পৌঁছবার আগে আগেই বেগুনী রঙের ছোট ছোট ফুল ধরে লতায়। এখন হেমন্ত শেষ হয়ে এসেছে বলে ওই বুনো ফুল ফুটতে শুরু করেছিল।

বিকেলে যখন নীরজা যাচ্ছিল, আমার মনে হল, সে কয়েক পলকের জন্যে আমার বাড়ির দিকে তাকিয়েছিল। শীতের বাতাস আসার সময় হলে এখানে চেঞ্জারের ভিড় হয়। শরীর সারাতে বা বেড়াতে এসে যারা এদিকের বাড়ি ঘরে ওঠে তারা পথ দিয়ে যেতে যেতে আমার বাড়ির দিকে অবাক হয়ে তাকায় দু পলক। আমার পাশাপাশি সব ক'টা বাড়িই প্রায় প্রাসাদতুল্য। ঐশ্বর্য, সমারোহ, সৌন্দর্য—তাদের কোনো অভাব নেই। আমার বাড়িটি এখানে তাই বেমানান, বিসদৃশ।

নীরজার মতনই অনেকটা। নীরজাকে যখন আমি প্রথম দেখি তখন আমারও মনে হয়েছিল, অমন উৎফুল্ল জ্যোৎস্নার মতন সুন্দর মুখে কেমন করে মরা মাছের চোখের মনির মতন অদ্ভুত একটি আঁচিল হল। নীরদার বাম গালে নাকের কাছটায় ওপর-ঠোঁট ছুঁয়ে আঁচিলটা ছিল। কালোর সঙ্গে ঈষৎ রক্তের আভা মেশানো।

ওই আঁচিল এবং মাছের চোখের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে বের করার চেষ্টা আমি কোনো দিনই করিনি। নীরজাই আমায় বলেছিল কথাটা। বলেছিল, তার মামা, যিনি নেপালের রাজদরবারে চাকরি করতেন, তিনি বলেছিলেন, ওই আঁচিল খুব সুলক্ষণযুক্ত, মীনাক্ষী চিহ্ন রয়েছে ওতে।

নীরজা নানা সুলক্ষণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিল। ওদের পরিবারের লোকজনের কাছে আমি গল্প শুনেছি, নীরজা সরকারী স্টীমলঞ্চের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তার বাবা পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে যখন বাসা বদল করতে নদী পার হচ্ছিলেন তখন নীরজা ভূমিষ্ঠ হল। ভগবানের অসীম কৃপা, এই জন্ম এত স্বাভাবিক সরল ভাবে ঘটে গেল যে মনেই হল না, কোথাও কোনো বিপদ ছিল। নীরজার জন্মের পর তার বাবা এক সরকারী খেতাব পান, যে নদী বারবার পুল ভেঙে রেল কোম্পানীকে বিব্রত করছিল সেই নদীকে নীরজার বাবা পরাজিত করলেন। চাকরিতে মস্ত উন্নতি ঘটল। সংসারে নীরজার জন্মের পর আরও অনেক সৌভাগ্যের ঘটনা ঘটেছে: নীরজার মা পিতৃসম্পত্তি পান প্রায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকার, নীরজার বড় ভাই সর্পদংশনের পরও নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে যায়, ছোট পিসির বিয়ে হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে, তার

পায়ের খুঁতে পাত্র গ্রাহ্য করল না। এই রকম কত ঘটনা ঘটেছে পরিবারে।

সুলক্ষণা মেয়েকে অতি যত্নে এবং অতি প্রশ্রয়ে রক্ষা করে করে প্রথমে নীরজার বাবা মারা গেলেন, তারপর নীরজার মা। আমার সঙ্গে নীরজার যখন প্রথম পরিচয় ঘটেছিল তখন নীরজার মা বেঁচে ছিলেন। তাঁর রূপ ছিল স্নিগ্ধ, মুখের আদলটি ছিল কুমারটুলির প্রতিমার মতন। নীরজাকে অকাতর স্নেহ ও প্রশ্রয় দেবার পরও তাঁর কোনো কোনো ব্যাপারে উদ্বেগ ছিল। মনে হত, তাঁর সুলক্ষণা মেয়েকে কেউ অধিকার করে নেয় এই ভয়ে তিনি সতর্ক রয়েছেন। বড় ছেলে বিদেশবাসী, বিয়ে করেছে বিদেশিনীকে। নীরজার মার একটি বড় রকমের দুঃখ ও মনোক্ষোভ এ-ব্যাপারে থেকে গিয়েছিল। তিনি বংশের মর্যাদা ও গৌরব রক্ষা করার জন্যে মেয়েকে তাঁর মনোমত পাত্রে সমর্পণ করার কথা ভাবতেন।

নীরজার মা একবার বেশী রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগটা জটিল পথ নেয়। তাঁর ধারণা হয়, জীবনের বেলা তাঁর ফুরিয়ে এসেছে। নীরজার জন্যে তিনি তখনও যোগ্য পাত্র নির্বাচন করে উঠতে পারেননি। সময় নেই দেখে, এবং ভরসা পাচ্ছিলেন না বলেই শেষ পর্যন্ত তিনি নীরজাকে আমার স্ত্রী হতে দিতে সম্মত হলেন।

সুলক্ষণা নীরজাকে আমি লাভ করার পর অনেকেই মনে করেছিল, পিতৃপরিবারের পারিবারিক সৌভাগ্য এবার নীরজা স্বামীর পরিবারে স্থানান্তর করবে। কেউ কেউ বলত, এই বিবাহই তার সূচনা।

প্রসন্ন এবং সপ্রেম চিত্তে আমি নীরজাকে গ্রহণ করেছিলাম। আমি আশাতীত সৌভাগ্য অর্জন করব, সমৃদ্ধ ও যশস্বী পুরুষ হয়ে উঠব এমন বাসনা সজ্ঞানে কোনোদিন করি নি। আমি কখনও নীরজাকে বলি নি, তোমার ভাগ্যে আমার জয় হোক।

নীরজার কাছে আমি পরিপূর্ণ প্রেম চেয়েছিলাম। কৈশোরকাল থেকেই আমার মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে, জীবনে প্রেমই একমাত্র কাম্য বস্তু। আমায় আমার সোনামাসি একটা গল্প বলেছিল। গল্পটা আমার চেতনার কোথাও মধুর চাকের মতন বাসা বেঁধেছিল। যৌবনের স্ফুটিত দিনগুলিতে পৌঁছে আমি অনুভব করতে পারতাম মউয়ের চাকটি পূর্ণ হয়ে রয়েছে।

সোনামাসির কাছে আমি যে গল্পটি শুনেছিলাম, তার চেহারা প্রাচীন উপকথার মতন। সাবিত্রীর উপাখ্যানটি মনে পড়ে যেত। কিন্তু আমার বরাবরই মনে হয়েছে, সৌমতীর কাহিনীর গভীরতা আরও বেশী। সৌমতী একটি আশ্চর্য অভিসার করেছিল, মৃত্যু এবং প্রেমের কোনটি শ্রেষ্ঠ সৌমতী তার অন্বেষণ করেছিল শেষাবধি। মৃত্যুর রথকে সে অনুসরণ করে করে জীবজগতের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত এসেছিল। এসে যমরাজকে বলেছিলঃ যম, আমি তোমায় অনুরোধ করছি আমার প্রেমাস্পদ যুবতীটিকে তুমি তোমার রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে যাও।

সোনামাসি বলেছিলঃ সে বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা। যম বলে, মৃত্যু যাকে নেয় তাকে ফেরৎ দেয় না; তার শক্তির কাছে মানুষের করার কিছু নেই। সৌমতী বলে, প্রেম মৃত্যুকে জয় করে।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করার জন্য এল একটা তুলাদণ্ড। একদিকে থাকবে মৃত্যু অন্যদিকে প্রেম। যেদিকের দণ্ড মাটিতে নেমে যাবে কথামত সে জিতবে।

—বুঝলি, হিরণ—সোনামাসি বলেছিল, যমরাজের দিকে প্রথমে থাকল সেই মেয়েটির মৃতদেহ; সৌমতী অন্যদিকে রাখল তার মন। যমরাজ দেখলেন সৌমতীর পাল্লা অনেক ভারী; তিনি আরও কটা মৃতদেহ রাখলেন। তবু তাঁর পাল্লা ভারী হল না। একে একে যমরাজ শত শত মৃতদেহ, মৃত পশুপাখি, মৃত গাছপালা, পৃথিবীর যা কিছু প্রাণহীন—গলিত, যা কিছু মৃত্যুতে পরিণত হয়েছে—সবই তিনি তাঁর দিকের দণ্ডে রাখলেন। সৌমতী ধ্যানে তার মন অন্য দণ্ডে রেখে বসেছিল; শেষে সে আকাশ জল বায়ু ও স্বয়ং ঈশ্বরকে তার সহায় হতে বলল। বললঃ আপনারাও প্রেম; মৃত্যুকে আপনারা হীন প্রতিপন্ন করুন।

যমরাজ হেরে গিয়েছিলেন। যদি নাও হারতেন, সোনামাসির গল্প থেকে আমি আমার প্রাপ্যটুকু লাভ করতাম। জগতে প্রেমহীনতা একভাগ স্থলের ন্যায়, তার অধিকার অধিক হলে এই জীবনপ্রবাহ এতদূরে বয়ে আসত না। আমি সোনামাসির গল্পকে হীরক কাটার মতন যথাযথ ভাবে কেটে, আমার প্রয়োজনের মতন ও রুচি অনুযায়ী ছোট করে নিয়ে একটি বহুমূল্যবান মাণিক্য করে নিয়েছিলাম। আঙটির মতন আমার মনের ধারণায় এই হীরকটি থেকে গিয়েছিল।

আমি সৌমতী নই, পৌরাণিক উপকথার নায়ক সদৃশ চরিত্র আমার নয়, তবু আমি একনিষ্ঠ পবিত্র প্রেমিক হতে চেয়েছিলাম। যৌবন যাতনায় কাতর বন্ধুরা আমায় বলত, উপভোগ্য কয়েকটি নারীর সংস্পর্শে এলে আমার ধারণা পার্থিব হবে।

নীরজাকে আমি ভালবেসেছিলাম। যে-প্রেমের আস্বাদ আমি কামনা করতাম, যার জন্যে আমি ব্যাকুল ছিলাম—নীরজাকে দেখার পর সেই প্রেম আমি অনুভব করলাম। তারপর অপেক্ষা করলাম—অপেক্ষা করলাম নীরজার মার সম্মতির জন্যে। হয়ত আমি নীরজাকে না পেতে পারতাম। কিন্তু ঘটনা আমায় নীরজাকে পাইয়ে দিয়েছিল।

আমাদের বিবাহের পর সামান্য কিছুদিন নীরজার মা বেঁচে ছিলেন। তাঁর মৃত্যু ঘটলে ওই সংসারে আমি এবং নীরজা দুজন মাত্র মানুষ থাকলাম। নীরজাদের বাড়িতেই উঠে গেলাম আমরা। মস্ত বাড়ি, পুরোনো কয়েকজন দাসদাসী ছেড়ে নীরজা আমার চ্যাটার্জি লেনের ছোট বাড়িতে থাকতে রাজী হল না।

আমি ছিলাম সরকারী চাকুরে। মাসের মধ্যে অর্ধেক দিন বাড়ি, অর্ধেক দিন বাইরে। ঘুরে বেড়াতে হত নিত্য। ভাল লাগত না। নীরজাকে বিয়ে করার পর আমি একবার প্রায় স্থির করে ফেলেছিলাম চাকরিটা ছেড়ে দেব। আমার বড় কষ্ট হত নীরজাকে রেখে যেতে।

শেষ পর্যন্ত চাকরিটা ছাড়িনি। মনে হয়েছিল, ওটা উচিত হবে না। নীরজা বলত, আমার হাতে শীঘ্র একটা সোনার ফল এসে পড়বে।

বিবাহিত জীবনের দুটি বছর কেটে যাবার পর আমি বুঝতে পারলাম, নীরজার মা আমায় তাঁদের পরিবারের সৌভাগ্য অথবা সুলক্ষণযুক্ত মূর্তিটি দান করে যান নি। বরং একদিন আমার মনে হল, আমার প্রেম-প্রজ্জ্বলিত দেহমনে তিনি যেন কৃপাপরবশ হয়ে এক পাত্র জল ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, এবং আমার সর্বত্র একটি ভয়ংকর ফোসকা পড়ে গেছে।

সাধারণ একটা বিষয়, যা আমি উপেক্ষা করে ছিলাম, আমার চোখে পড়ল। নীরজা আমার মতন জীবনের কোনো একটি বিষয়ে স্থির ধারণা নিয়ে বসে নেই। সে অত্যন্ত নির্বিকারচিত্তে তার প্রাপ্ত ঐশ্বর্য ব্যয় করে চলেছে, এবং ভাবছে তার সৌভাগ্য ও সুলক্ষণের জন্যে কখনও তার স্থলে দুঃখ আসবে না।

প্রশ্রয় মানুষকে জেদী এবং বিবেচনাহীন করে, প্রশ্রয় চরিত্রকে তরল ও আত্মম্ভরি করে তোলে। নীরজা যে জেদী, বিবেচনাহীন, তরল প্রকৃতির, এবং অহমিকাপূর্ণ নারী এ-কথা আমার ভাবা উচিত ছিল আগে। আমি ভাবিনি কখনও। মনে হয় নি, নীরজা আমার মতন সৌমতী উপাখ্যানের মুগ্ধ শ্রোতা নাও হতে পারে।

ক্লেশ এবং মৃত্যুর অনুগমন সাধারণ মানুষের স্বভাব নয়। আমি নীরজার যৌবনের দিকে তাকিয়ে দেখতে শিখছিলাম, জৈবপ্রকৃতি তাকে সুখ এবং আনন্দের দিকে কী অক্লেশে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে হত, ওর চরিত্র আমার বিপরীত। আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্ত থেকে কাজ সেরে নীরজার কাছে ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রতিক্ষণ তার সান্নিধ্যের জন্যে কাতর হতাম, আর নীরজা আমি বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে তার চারপাশে আনন্দের অট্টরোল তুলত। ওর বহু বন্ধু ছিল, দূর সম্পর্কের

নানা ধরনের আত্মীয় ছিল, বিলাস ছিল, ব্যসন ছিল।

একদিন নীরজার সঙ্গে আমার কয়েকটি কথা হয়েছিল যা আমার আজও মনে আছে।

"তুমি বাড়িতে এলেই দেখেছি সব কেমন হয়ে যায়!" নীরজা আমাকে বলেছিল স্পষ্ট করেই।

"কেন?" আমি ওকে লক্ষ করে বলেছিলাম।

"কেন কি, তুমিই বুঝে নাও!"

"আমি বুঝতে পারছি কই!"

"চেষ্টা কর।" নীরজা বলল; বলে আমার সামনে থেকে উঠে গিয়ে কাকে যেন ফোন করল। ফোন সারা হলে ফিরে এসে বলল, "তুমি কোনোদিন খুশী হতে শিখবে না। তোমার মন বুড়ো হয়ে গেছে।"

আমি ভেবেছিলাম নীরজাকে প্রশ্ন করব, খুশী হবার শিক্ষা তাকে কে দিয়েছে, কে তাকে বলেছে তাদের মন শিশুর তুল্য। এ-সব প্রশ্নের কোনো জবাব আমি পাব না জেনে নীরজাকে বলেছিলাম, "তুমি খুশী হও, আমি খুশী হওয়া দেখি।"

নীরজা হয়ত আমায় তার খুশী হওয়া আচরেই দেখাতে পারত, কিন্তু তার অদৃষ্ট বাদ সাধল। তার দাদা বিদেশে দেনার দায়ে দেউলিয়া হয়ে যাবার যোগাড় হয়ে জরুরী চিঠি পাঠালেন, বাড়ি বেচে তাঁকে টাকা পাঠিয়ে দিতে। বাড়ির ওপর নীরজার কোনো সত্ব ছিল না, সে মাত্র বসবাসের অধিকারী ছিল।

বাড়ি বেচা হল। বাড়ি বেচা শেষ হতে না হতেই নীরজা তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত বন্ধু মণিমোহনের জাহাজী ব্যবসায় ধার দেওয়া অর্থ জলে পড়ে যেতে দেখল। মণিমোহন নীরজার দূর সম্পর্কে আত্মীয় ছিল।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, নীরজার সৌভাগ্য এতদিনে অস্তমিত হয়েছে। তাকে বলেছিলাম, "তুমি এদের কাছ থেকে সরে এস। বয়স হয়ে আসছে, এবার নিজের ভালমন্দ বুঝতে শেখ।"

নীরজা আমার কথা গা করে শোনে নি। বরং যে-মুহূর্তে সে অনুভব করল, তার সৌভাগ্য তাকে ফেলে চলে যাচ্ছে সে-মুহূর্তে সে আরও জেদী আরও অবিবেচক হয়ে উঠল। মার কাছ থেকে পাওয়া অর্থ এবং অলঙ্কার যথেষ্ট নষ্ট করেছিল নীরজা, তবু কিছু ছিল। নিজের কাছে নিজে হারবে না, যেন এই প্রতিজ্ঞাবশত সে এক অদ্ভুত কাজ করল। উঠতি এক শৌখিনী পাড়ায় বাড়ি করার জেদে সে শেষ কপর্দক পর্যন্ত তুলে দিল পরমেশের হাতে।

সংসারে কিছু অগোচর কাহিনী থেকে যায়। আমি জানতাম না, নীরজার সঙ্গে পরমেশের এই রকম একটি কাহিনী ছিল। পরমেশ মস্ত ব্যবসাদার লোক। জমি কেনা বাড়ি তৈরী করা তার পেশা। নীরজা যা চেয়েছিল, পরমেশ তার অর্ধেকটা দিয়েছিল ব্যবসাদারের মতন, বাকিটা দিতে সম্মত হয়েছিল আনন্দ লেনদেনের ভিত্তিতে। আর তখনই আমি জানতে পেরেছিলাম, নীরজা মনোহর উজ্জ্বল একটি স্থাবর গৃহের জন্যে সব কিছু অকাতরে দিতে পারে।

একদিন অত্যন্ত বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে আমি বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম, নীরজা তার জামা কাপড় গুছোচ্ছে। সাধারণত এমন করে বাক্স গুছোনোর কথা নয় তার। বললাম, "কি ব্যাপার? সুটকেশ বাক্স নিয়ে বসে পড়েছ যে?"

নীরজা কিছু সময় কথার জবাব দিল না। পরে বলল, "আমি আজ পুরী যাচ্ছি!"

"পুরী! হঠাৎ!"

"কেন, যেতে নেই?"

"না!"

"না কেন?"

"আমি বাড়ি নেই। এক হপ্তা সাত জায়গার জল খেয়ে বাড়ি ফিরলাম, আর তুমি ঘর ছেড়ে বাইরে চললে!"

"আমার যাওয়া ঠিক।"

"আমি না এলেও তুমি চলে যেতে?"

"যেতাম।"

সেই মুহূর্তে আমি অনুভব করেছিলাম, নীরজার উদ্ধত কুৎসিত আচরণের জন্যে তাকে আমি কিছু শিক্ষা দি। ওর স্পর্ধা এবং অবজ্ঞা আমায় কাণ্ডজ্ঞানহীন করে তুলেছিল। কাছে গিয়ে বাক্সর ডালা ফেলে দিয়ে বললাম, "না, তুমি যাবে না!"

আমি ভুল করেছিলাম। নীরজার স্পর্ধা এতদিনে স্বেচ্ছাচারিতা এবং অহমিকায় রূপান্তরিত হয়েছে এ-কথা আমার বোঝা উচিত ছিল। আবাল্য থেকে যে-মেয়ে শুধু প্রশ্রয় পেয়েছে, যাকে সংসারে লক্ষ্মীর বিগ্রহের মতন অর্চনা করা হয়েছে সে স্বভাবতই আমার মতন মানুষের আপত্তি অথবা বাধা গ্রাহ্য করবে না।

নীরজা আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে শেষে উঠে দাঁড়াল। তার মুখ অপমানে লাল হয়ে গিয়েছিল, শক্ত কঠিন হয়েছিল। ঘর ছেড়ে চলে যেতে যেতে বলল, "অশান্তি করে তুমি আমার যাওয়া আটকাতে পারবে না।"

আমি সত্যিই সে সময় কিছু অশান্তি করেছিলাম। নীরজা পুরী চলে যাবার পর আমিও তাকে অনুসরণ করেছিলাম। পুরীতে নীরজার সঙ্গে পরমেশ গিয়েছিল। আমার ধারণা হল, ভ্রমণ বোধ হয় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

... আর মাত্র মাস দুই নীরজার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সুলক্ষণা নীরজা আমার জীবনের সর্বত্র দুর্লক্ষণ ও দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে।

আমার শরীর ভেঙে গিয়েছিল, চাকরিতে সুনাম নষ্ট হয়ে দুর্নাম রটছিল, শেষে অসুখে পড়লাম।
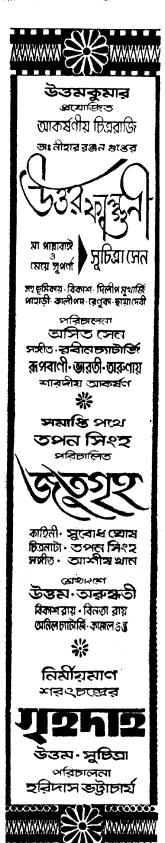
আমার অসুখের সময় নীরজা তার নতুন বাড়ি নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল। বাড়িটা শেষ হয়ে এসেছিল, এবং রঙের কাজ হচ্ছিল, ইলেকট্রিকের তার টানা হচ্ছিল। একদিন অনেকটা রাত করে বাড়ি ফিরে এসে নীরজা বলল, পরমেশের স্ত্রী মারা গেছে। আত্মহত্যা করেছে আফিং খেয়ে।

আমার গায়ে জ্বর ছিল, মাথায় যন্ত্রণা ছিল। চোখ তুলে নীরজাকে দেখতে গিয়ে কেন যেন তার আঁচিলটি লক্ষ না করে পারলাম না। আমার মনে হল, অত্যন্ত বিষাক্ত কোনো ক্ষতের মতন ওই আঁচিলটি নীরজার জীবনকে আশ্রয় করে আছে।

"জগতে অনেক বোকা আছে—" নীরজা বলল, "পরমেশের বউ আফিং খেয়ে মরে কোন উপকারটা করল বুঝি না!"

"তোমার। তোমার অনেক উপকার করে গেল—" আমি বললাম।

নীরজা আমার চোখে চোখ রেখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক। তারপর বলল, "আমার উপকার আরও তো অনেকেই করতে পারে।"

কথাটা শোনার পর আমি যেন জ্বরের ঘোরে হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে ঘরের বাতি নিবে যেতে দেখলাম। নীরজা নিশ্চয় চলে গিয়েছিল।

তারপর আমি নীরজার কাছ থেকে চলে এসেছিলাম।

নিজেকে সামলে নিতে আমার কিছু সময় লেগেছিল। মন কিছুটা সংযত ও সহনশীল হয়ে উঠলে আমি ভাববার চেষ্টা করেছি, নীরজার সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনের পাঁচটি বছর এমন অশান্তির হল কেন? আমি সর্বান্তঃকরণে নীরজাকে ভালবাসতাম, নীরজা ভিন্ন কোনো চিন্তা আমার ছিল না।

ভেবে ভেবে আমি স্থির করেছিলাম, নীরজাকে যথার্থ দৃষ্টিতে আমি দেখতে পারি নি। তার চরিত্রে যতগুলি অশুভ উপকরণ ছিল আমি সেগুলি লক্ষ করে দেখলে বুঝতে পারতাম, নীরজাদের পরিবারে যে মূর্তিটি জীবিত ছিল—সেই মূর্তিটির যখন ক্ষয় ধরেছে তখন আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। বস্তুত নীরজার বাবা এবং মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনে নীরজার চরিত্রে অনেকগুলি বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিলেন, নীরজা যখন আমার স্ত্রী হল তখন তার সমস্ত চেতনায় সেই বিষ সংক্রামিত হয়েছে। বস্তুত আমি যে-নীরজাকে লাভ করেছিলাম সেই নীরজা মৃতোপম ছিল, সংসারের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলি তাকে আক্রমণ করে নিজ অধিকারে টেনে নিচ্ছিল।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সোনামাসির গল্প আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নি। আমার প্রেম আমায় অপদার্থ প্রতিপন্ন করেছে। আমি অধিক পথ হাঁটতে পারি নি, ক্লেশ সহ্য করতে পারি নি, জীবনের একটি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হবার যোগ্যতা ও সাহস অর্জন করি নি।

মানুষ জানে না, সে কেন অপেক্ষা করে। আমি বস্তুত তারপর থেকে অপেক্ষা করেছি। এবং আজ প্রায় পনেরো বছর অপেক্ষার পর নীরজাকে দেখতে পেলাম অপ্রত্যাশিত ভাবে। দেখে মনে হল, নীরজা কি আজও আনন্দ-ভবনের অতিথি!

বাড়ির সামনেই দেখা হয়ে গেল একদিন। সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল, ঠাণ্ডা পড়ছিল। নীরজা আমায় চিনতে পারল। বললাম, এসো বাড়ির ভেতরে যাই।

আমার বসার ঘরটি খুব ছোট, আসবাব-পত্র অতি অল্প। বালক ভৃত্যটি লণ্ঠন জ্বালিয়ে এনে রেখে গেল ঘরে। সাধারণ সরু মতন একটি তক্তপোশে সতরঞ্চি পাতা, কাঠের চেয়ার একটি, বেতের মোড়া এক পাশে; ছোট একটি টেবিল জানলার দিকে মুখ করে রাখা।

নীরজা তক্তপোশের ওপরেই বসল। লণ্ঠনের আলোয় যথাসাধ্য নজর করে ওর মুখটি দেখলাম। নীরজার মুখের আদল অনেকটা যেন বদলে গেছে, গালের পাশ-গুলো ফুলে গেছে, ফ্যাকাশে হয়েছে; অনেকদিন রক্তশূন্য ব্যাধিতে ভুগলে বুঝি এই রকম সাদাটে চেহারা হয় গায়ের চামড়ার। খুব প্রাণহীন দেখাচ্ছিল। চোখ দুটি নিরুজ্জ্বল, অবসাদগ্রস্থ। কালো একটি রেখা পড়েছে চোখের ওপর পাতায়। ওকে অত্যন্ত নিরানন্দ ও শূন্য দেখাচ্ছিল। সেই আঁচিলটি ওর মুখের যথাস্থানেই রয়েছে, আরও কালো হয়ে গেছে।

কয়েকটি ছোটখাটো কথার পর বললাম, "কুঞ্জবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছ?"

"ওঁর স্ত্রী পাঠিয়েছেন।" নীরজা বলল, "কুঞ্জবাবুর বড়মেয়ে শরীর সারাতে এসেছে, আমি তার দাসী।"

"দাসী?"

"ওই একই হল। দেখাশোনা করার দাসী!" নীরজা তার গলার কাছে গায়ের পুরোনো শালটা তুলে নিল। তার হাতের পাশে ছোট একটি কাপড়ের ব্যাগ; তার মধ্যে টুকটাক কিছু বাজারপত্র দেখা যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম কুঞ্জবাবুর মেয়ের ফর্দ বাজার করে ফিরছিল নীরজা। আমি কুঞ্জবাবুর বড় মেয়েকে আগে কয়েকবার দেখেছি, বিবাহিতা এবং অসুস্থা মেয়ে; বেচারী প্রায়ই এখানে হাওয়া বদলাতে আসে।

সামান্য সময় নীরব থাকলাম। নীরজার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস জানার ইচ্ছা আমার হচ্ছিল না। অনুভব করতে পারছিলাম, সৌভাগ্য তাকে যা যা দিয়েছিল দুর্ভাগ্য তার সব কিছুই একে একে ফিরিয়ে নিয়েছে। নীরজার সেই শখের বাড়ি, সেই পরমেশ, সেই সুখান্বেষণ, জেদ, অহমিকা, দম্ভ, স্বেচ্ছাচারিতা সমস্তই চলে গেছে।

এক সময় মৃদু গলায় বললাম, "তোমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হল।"

"হ্যাঁ, অনেক দিন।" নীরজা টেনে টেনে বলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে। চুপ করে থাকল মুহূর্ত কয়। তারপর বলল, "তুমি এখানে কত দিন আছ?"

"তা অনেক দিন। বছর সাত আট হয়ে গেছে।"

"একলাই থাক?"

"একটা চাকর আছে।"

"কি কর আজকাল?"

"এখানে একটা স্কুল আছে হিন্দুস্থানী-দের, সেখানে পড়াই।"

"ও। মাস্টারী।"

লণ্ঠনের আলোতে কয়েকবার চোখের পাতা রগড়ে নীরজা বলল, "আমার চোখের পাতায় পোকা ধরেছে আজকাল; সন্ধ্যের আলোয় আরও জ্বালা বাড়ে। এবার উঠব। মেয়েটা অপেক্ষা করে আছে।"

নীরজাকে বসতে বলে রাত বাড়ালাম না। ও উঠে দাঁড়াল; আমিও উঠলাম।

বাইরে শীত পড়েছে। কুয়াশা জমেছে ধোঁয়ার পুঞ্জের মতন। আকাশের তলায় কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার কয়েকটি নক্ষত্র সমেত স্থির হয়ে আছে।

আমরা নীরবে বাড়ির বাইরে এলাম। ফটক খুলে নীরজাকে পথ দিতে নীরজা হঠাৎ বলল, "এ বাড়িটা তোমার?"

ছোট্ট করে হ্যাঁ বললাম।

নীরজা দাঁড়িয়ে থেকে কি ভাবল যেন। বলল, "এখানে সব বাড়িতে নাম আছে; তোমার বাড়ির নাম কি?"

আমার বাড়ির কোনো নাম ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হত, একটা নাম দেওয়া থাক; মনোমত নাম পেতাম না। নীরজার কথায় কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না।

পথে পা বাড়িয়ে গায়ের চাদরটা আরও গুছিয়ে নিল নীরজা। বাতাসে শীত এসেছে, রাস্তা নির্জন, অন্ধকারে একটা চতুষ্পদ জীব চলে যাচ্ছিল। নীরজা ভেবে-ছিল আমি ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে আছি, মুখ ফিরিয়ে দেখল কিছু বলবে বলে। আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিলাম। আমায় পাশা-পাশি হাঁটতে দেখে নীরজা কেমন বিষণ্ণ উদাস গলা করে শুধলো, "তুমি কি কোনো-দিন ভেবেছিলে আমার সঙ্গে দেখা হবে?"

"না, ভাবি নি। তবে কখনও কখনও মনে হত যদি দেখা হয়—দেখব।"

"দেখবে? কি দেখবে—?"

দু' পা হেঁটে নীরজা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমায় ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। আমি কোনো জবাব দিচ্ছিলাম না।

সামান্য অপেক্ষা করে পা বাড়াল নীরজা। "আমায় এ অবস্থায় দেখে তোমার কি লাভ হল, হয়ত কষ্টই পেলে।"

নীরজার কথার কোনো উত্তর আমি দিই নি। তাকে দেখে আমার কষ্ট পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি কষ্ট পাই নি।

আনন্দভবনের কাছাকাছি এসে নীরজা বলল, "এবার তুমি ফিরে যাও, আমি এসে গিয়েছি।"

নীরজার সেই স্বর হঠাৎ আমায় সোনা-মাসির গল্প মনে পড়িয়ে দিল। মনে হল, নীরজা যমরাজের মতনই জীবজগতের শেষ প্রান্তে এসে আমাকে ফিরে যেতে বলছে।

নীরজা বোধ হয় বুঝতে পারল না, ফিরে যাওয়ার আগে আমি এখনও অনেকটা পথ হাঁটব, ক্লান্ত হব, ক্লেশ পাব, এবং মৃত নীরজাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করব শেষ পর্যন্ত।

বছরের সেরা উপহার
সারাজীবন কাজে লাগবে

হেমন্তের পূর্বাভাস ঃ বীরভূম — বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় — অশোক মিত্রের সৌজন্যে

জিয়া ভরলি

সুবোধ ঘোষ

আকাশ খুব পরিষ্কার। ভোরের দিকে অবশ্য সামান্য একটু কুয়াশার ঘোর ছিল। কিন্তু সকালবেলার রোদের সাড়া ঝলমল করে জেগে উঠতেই সে-কুয়াশা শুকিয়ে গিয়েছে। আকাশ পাড়ি দেবার জন্যে এক'শো এগার নম্বর ফ্লাইটের ডাকোটা ঠিক সময়েই গুমরে উঠেছে।

কলকাতা থেকে গৌহাটি, তারপর গৌহাটি থেকে তেজপুর; এই ডাকোটার একদফা আকাশযাত্রা তেজপুরে গিয়েই শেষ হবে। সব যাত্রীর মত শুক্তি বসুও তেজপুরে নেমে যাবে।

প্লেনে ওঠবার সিঁড়িটার কাছে পৌঁছেই একবার থমকে দাঁড়ায় শুক্তি; মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়ে, হ্যাঁ, ওরা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু ছোট্ট সুকুর ছোট্ট হাতটা ছটফট করে রুমাল দোলাচ্ছে। আর মনে হলো, বড় পিসি যেন তাঁর চশমাটাকে শাড়ির আঁচলে তাড়াতাড়ি করে একবার মুছে নিয়েই আবার চোখে পরলেন।

বোধহয় বেশ আনমনা হয়ে গিয়েছিল বলেই বুঝতে পারেনি শুক্তি, প্লেনটা কখন আকাশে উঠে পড়েছে। পাল্টে গিয়েছে ডাকোটার গুঞ্জনের সুর। নীচের এয়ারপোর্টের কিছুই আর দেখতে পাওয়া গেল না। শুধু দেখতে পাওয়া গেল, ধানক্ষেতের উপর দিয়ে টানা টেলিগ্রাফের তারের উপর সাদা বকের সারি চুপ করে বসে আছে।

প্লেন ছাড়বার আধঘণ্টা আগে দমদম এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে বড় পিসিমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই দেখতে পেয়েছিল শুক্তি, পিসিমা যেন শুক্তির কোন কথা শুনতে পাচ্ছেন না। আনমনার মত উসখুস করছেন, আর, আকাশের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করছেন।

হেসে ফেলেছিল শুক্তি—ওরকম করে কী দেখছো, বড় পিসি?

বড় পিসি চমকে ওঠেন—কি বললে?

শুক্তি আবার হাসে।—একটুও ভেব না। ভাবনা করবার কিছু নেই। ওটা আমার চেনা আকাশ।

কথাটা একটুও বাড়িয়ে বলেনি শুক্তি। ঠিকই, চেনা আকাশ। বছরে অন্তত পাঁচবার যে-মেয়েকে বিমানযাত্রিনী হয়ে কলকাতা থেকে তেজপুরে যাওয়া আসা করতে হয়, তার কাছে ওই আকাশের সব কিছুই চেনা। মেঘের চেহারা দেখেই বলে দিতে পারবে শুক্তি, ওটা গারো পাহাড়ের মেঘ। কুয়াশা দেখেই বুঝে নিতে পারে শুক্তি, প্লেন এইবার ব্রহ্মপুত্র পার হবে। জানে শুক্তি, ঠিক কখন প্লেনের জানালার কাচের কাছে চোখ দুটো এগিয়ে নিলেই দেখতে পাওয়া যাবে, ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘের ঘূর্ণি উড়ছে আকাশে। সীটবেল্ট কোমরে জড়াবার জন্যে রঙীন নির্দেশের লেখা এখনি দপ করে জ্বলে উঠবে। ঝড়ো হাওয়ার দাপট এড়াবার জন্যে ছটফট করে গা-ঝাড়া দিয়ে উপরে উঠবে প্লেন। তারপর; নীচের ওটা কি তিস্তার বেনো জলের স্রোত? তবে তো আর দেরি নেই; শেষ এয়ার-পকেট পার হতে অন্তত পাঁচ মিনিট সময় লাগবে। এলোপাথাড়ি ঝাম্প করবে প্লেন।

ঠিকই, যেন চেনা আকাশ দেখতে পেয়ে ভয়কাতুরে পাখির ডানা হঠাৎ খুশির সাহসে ছটফটিয়ে উঠেছে। সঙ্গে কাউকে যেতে হয় না; একাই এভাবে একহাতে শুধু ছোট্ট একটা ব্যাগ, আর, অন্য হাতে এয়ার-প্যাসেঞ্জের টিকেট বইটাকে দোলাতে দোলাতে চলে যায় শুক্তি। কলকাতা থেকে তেজপুর; তেজপুর থেকে কলকাতা, একাই যায় আর ফিরে আসে। বড় পিসি তাই একটু আশ্চর্য না হয়ে পারবেন কেন, এই মেয়েই যে কলকাতায় থাকতে ঘরের বাইরে একা বের হতে চায় না। কোনদিন একা বের হবার দরকার হলেই শুক্তির অমন কালো চোখ দুটোও যেন আতঙ্কে ফেকাশে হয়ে যায়।

আজ এখন মনে পড়তেই শুক্তির সাহসখুশি প্রাণটা বেশ লজ্জা পায়। ছি, মিছিমিছি অবুঝ হয়ে বড় পিসিকে কত না বিরক্ত করা হয়েছে। বড় পিসির গাড়ির ড্রাইভার কেষ্টবাবু সাত-দিনের ছুটি নিয়েছিলেন। সেই সাতদিন কলেজ কামাই করে ঘরেই রইল শুক্তি। বড় পিসি কত করে বোঝালেন, ট্রামে-বাসে একা যেতে ভয় কিসের? কত মেয়েই তো একা-একা ট্রামে-বাসে যাওয়া-আসা করে কলেজ করছে। না, শুক্তির আপত্তি টলাতে পারেননি বড় পিসি। অথচ, ওইটুকু মেয়ে, ওই কৃষ্ণাটা সেদিন যেন আরও খুশি হয়ে একাই বের হয়ে গেল; ট্রামে চড়ে স্কুলে গেল আর ফিরে এল।

এক-আধ বছর নয়; এই চার বছর ধরে চেনা আকাশের পথে যাওয়া-আসা করতে গিয়ে, আর বারবার দেখে দেখে শুক্তির চোখে অনেক মুখও চেনামুখ হয়ে গিয়েছে। শুক্তি তাদের চেনে, তারাও শুক্তিকে চেনে। এই ডাকোটারই পাইলট, যিনি আজ শুক্তিকে দেখতে পেয়েই মৃদুহাসির সঙ্গে অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথাটা একটু হেলিয়ে দিলেন, তাঁকে চিনতে একটুও দেরি হয়না শুক্তির। গত বছর গরমের ছুটির শেষে তেজপুর থেকে কলকাতায় ফেরবার ডাকোটাতে ইনিই ছিলেন পাইলট। শুক্তির হাতব্যাগটা হঠাৎ খুলে গিয়ে একগাদা ফটো প্লেনের মেজের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিন এই পাইলট ভদ্রলোক সেইসব ফটো কুড়িয়ে তুলে দিয়েছিলেন।

ওই তো, আরও একটি চেনামুখ। ওই এয়ার-হোসটেস মেয়েটির নাম শান্তি কাপুর। প্রায় এক বছর আগে একবার দেখা হয়েছিল। শুক্তির হাতের কাছে গরম কফির পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে প্রায় দশ মিনিট ধরে গল্প করেছিল শান্তি কাপুর। খুব মাথা ধরেছিল শুক্তির, এই শান্তিই সেদিন ব্যস্ত হয়ে মাথাধরা ওষুধের একটা মিষ্টি ট্যাবলেট নিয়ে এসে শুক্তির কফির পেয়ালাতে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু বড় পিসি আর ওরা, সবাই কি এখনও এই উড়ন্ত ডাকোটার দিকে তাকিয়ে রানওয়ের শিকল-বেড়াটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে? সুকু কি এখনও রুমাল দোলাচ্ছে? বেণী কামড়াচ্ছে কৃষ্ণাটা? কি আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে কতবার ধমক দিয়ে শুধরিয়ে দেওয়া হলো, এটা একটা ভয়ানক বিচ্ছিরি অভ্যেস। তবু, যখন তখন আনমনা হয়ে যায় কৃষ্ণা, আর, বেণীটাকে মুখের কাছে টেনে নিয়ে কামড়ায়।

বুঝতে পারে শুক্তি, মনটা কেন হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। কী দরকার ছিল কৃষ্ণাকে এত ধমক-ধামক দেবার? একটু আদর করে, গলা জড়িয়ে ধরে আর গাল দুটো টিপে দিয়ে, একটু মিষ্টি করে বলে দিলেই তো হতো, বেণী কামড়াতে নেই কৃষ্ণা, ওতে অসুখ হতে পারে।

শুক্তিরই বড় পিসির মেয়ে কৃষ্ণা। ঠিক শুক্তিদির মত শক্ত করে বাঁধা একটা বেণী না দোলালে ওর শখের ইচ্ছেটা সুখী হতে পারে না। তের বছর বয়স; কিন্তু এখনও তিন বছর বয়সের বাচ্চার মত ফোলা-ফোলা গাল। না, শুক্তির হাত নিসপিস করলেও কৃষ্ণাকে গাল টিপে আদর করবার এখন আর কোন উপায় নেই। হাতব্যাগের ভিতর থেকে একটা ফটো বের করে দেখতে থাকে শুক্তি। একটা গ্রুপ ফটো। শুক্তির দশ বছর বয়সের পিসতুতো ভাই ওই ছোট্ট সুকুর জন্মদিনে এই তিন মাস আগে এই ফটো তোলা হয়েছিল।

পিসেমশাই আর বড় পিসি পাশাপাশি দুটো চেয়ারে বসে আছেন। তাঁদের সামনে বসে আছে কৃষ্ণা আর সুকু। সুকুর হাতে জন্মদিনের উপহার সেই চকোলেটের তাজমহল। তাজমহলটাকে দুহাতে ধরে কোলের উপর বসিয়ে, কেমন সুন্দর শান্তটি হয়ে আর চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সুকু। আর, কি আশ্চর্য, কৃষ্ণাটা বেণী কামড়াচ্ছে।

ঝিকঝিক করে হাসতে থাকে শুক্তির চোখ দুটো। শুক্তির
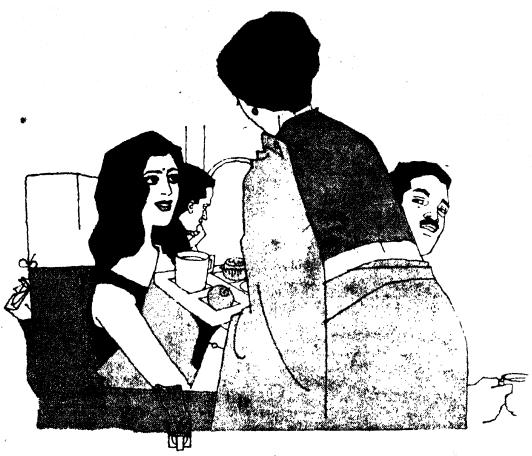
শান্তি বলে, চিনতে পারছেন?

কলকাতার জীবনে ওই সুকু আর কৃষ্ণাই যে শুক্তির দুটি ভাই আর বোন। জানে না শুক্তি, বুঝতেও পারে না, আপন ভাই-বোন থাকলে ওরা সুকু আর কৃষ্ণার মত না হয়ে অন্য রকমের কিছু হতো কিনা।

আর বড়দা? বড় পিসির বড় ছেলে দিবাকরই তো শুক্তির বড়দা। আজ প্রায় দেড় বছর হলো সাত দিনের জন্যেও ছুটি নিতে পারেন নি। তাই দিল্লী ছেড়ে কলকাতায় আসতে পারেন নি। করুণা বউদিও দেড় বছর হলো দিল্লীর বন্দিনী হয়ে পড়ে আছেন।

ভুলতে পারেনি শুক্তি, আজ এখন বরং আরও বেশি করে মনে পড়ছে, দিল্লি রওনা হবার আগের দিন শেক্সপীয়রের কমেডির ভল্যুমটা হাতে তুলে নিয়ে আর চোখ পাকিয়ে শুক্তিকে শাসিয়ে-ছিলেন বড়দা—ফাইনালের ফল যদি ভাল না হয়, তবে জেনো, এই বই দিয়ে পিটিয়ে তোমার ওই তিলফুল নাসিকা আমি থেঁতো করে দেব।

ফাইনাল তো এগিয়ে আসছে। কিন্তু বড়দা বোধ হয় এখনও জানেন না যে, একবার ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরী হয়েছে শুক্তি। বড় পিসিও বলেছেন, থাক এবার, এখনও কাল-কুলাসের একটা লিমিট বুঝতেই হিমসিম খায় যে-মেয়ে, সে-মেয়ের পক্ষে টেস্ট পার হওয়াই অসম্ভব। ফাইনাল তো স্বপ্ন।

ভাবতে ভয় ভয় করে। বড় পিসি কি পরশু দিনের সেই চিঠিতে বড়দাকে সত্যিই ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছেন?

করুণা বউদির চিঠিটা কিন্তু একটা অদ্ভুত সান্ত্বনা। মাসখানেক আগে ইন্দ্রপ্রস্থে বেড়াতে গিয়ে পা মচকে গিয়েছিল করুণা বউদির। পা-মচকানির ব্যথা এখন সেরে গিয়েছে। শুক্তির জন্যে খুব সুন্দর দেখতে একটা রেশমী ওড়না কিনেছেন করুণা বউদি, কুমায়ুনী গাঁয়ের মেয়েরা বিয়ের দিনে যে-ওড়না গায়ে জড়ায়। সব কথার শেষে লিখেছেন—পরীক্ষার জন্যে ভাবনা করে মুখ শুকনো করার কোন দরকার নেই। কোন ভয় নেই শুক্তি, একটুও ভেব না। তোমার ফাইনালের সময় আমি তোমার কাছেই থাকবো।

কিন্তু এ কেমন সান্ত্বনা? ভুল ধারণা করে একটা ভুল নির্ভয়ের বাণী শুনিয়েছেন করুণা বউদি। বউদি জানেন না যে ফাইনাল না দেবার জন্যেই তৈরী হয়ে শুক্তি আজকাল বেশ ভাবনা-হীন মনের খুশিতে দুবেলা এসরাজ হাতে তুলে নিয়ে কৃষ্ণাকে জোর করে গান শেখায়—সেও গান তো হলো গাওয়া...।

দেখতে পায়নি শুক্তি, শান্তি কাপুর কখন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। শান্তি বলে—চিনতে পারছেন?

শুক্তি—নিশ্চয়।

শান্তি—হাসছিলেন কেন?

চমকে ওঠে শুক্তি—আঁা? হাসছিলাম? হবে।

শান্তি কাপুর এইবার মুখ টিপে হাসে।—বোধ হয় কোন খুব-ভাল-কথা ভাবছিলেন।

শুক্তি—হ্যাঁ, আমার বোন কৃষ্ণার কথা ভাবছিলাম। আবার যেদিন কলকাতায় ফিরবো, সেদিনই কৃষ্ণাকে একটা গল্প বলে আশ্চর্য করে দেব।

শান্তি কাপুর—কিসের গল্প?

শুক্তি হাসে—গল্পটা এই যে, হঠাৎ মনে হলো, আপনার এই

ডাকোটার গম্ভীর শব্দটা যেন চুরি করে একটা গান গাইছে।

দুই চোখ বড় করে শক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শান্তি কাপুর। কোন কথা বলে না।

শক্তি বলে—আপনারও নিশ্চয় অনেকবার এরকম মনে হয়েছে। কোন গানের লাইন মনে পড়ে গেলেই মনে হবে যে, বাইরের শব্দগুলি যেন...। তাই নয়? কি বলেন আপনি?

শান্তি কাপুর আবার মুখ টিপে হাসে।—বুঝলাম, গান গাইছে আপনার হৃদয়টি। ইওর হার্ট ইজ সিংগিং।

ব্যস্তভাবে চলে যায় শান্তি কাপুর। কিন্তু শক্তির মুখের উপর কেউ যেন একটা লাজুক কুহকের আবীর ছিটিয়ে দিয়েছে। সারা মুখ লালচে হয়ে গিয়েছে। মাথাটাও একটু হেঁট হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। মুখ তুলে আর তাকিয়ে দেখতে সাহস হয় না, শান্তি কাপুর এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে আর কি করছে।

কৃষ্ণাটার মনে বুদ্ধি-সুদ্ধি নামে কোন পদার্থ নেই। তা না হলে সেদিন অনায়াসে আস্তে একটা কথা বলে, অন্তত ইশারায় জানিয়ে দিতে পারতো কৃষ্ণা, শক্তিদি সাবধান, শ্যামলদা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার গান শুনছেন আর হাসছেন।

শক্তি দেখতে পায়নি, কিন্তু কৃষ্ণা তো দেখতে পেয়েছিল। কৃষ্ণা যে সোজা দরজার দিকে মুখ করে ঘরের ভিতরে চেয়ারটার উপরে বসেছিল। শক্তি বসেছিল ঘরের কোণের ছোট কোচের উপরে, মখমলে মোড়া একটা পালকের বালিশকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে গান গাইছিল। ওই গান, কত গান তো হলো গাওয়া... ...। শক্তি কেমন করে দেখবে যে, দরজার কাছে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না আছে?

ঘরের ভিতরে ঢুকলো শ্যামল। শক্তির দিকে একবার তাকালো। শক্তির বুকের ভিতর থেকে যেন এক ঝলক লাজুক রক্তের ভয় উথলে উঠে সারা মুখে রঙীন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। পালকের বালিশটাকে তুলে নিয়ে মুখ ঢাকা দেয় শক্তি।

কৃষ্ণার হাতে মস্ত বড় একটা মাটির কমলালেবু তুলে দিয়েই চলে গেল শ্যামল—এর চেয়ে ভাল কমলালেবু বাজারে পাওয়া যায় না, কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—লিচু?

শ্যামল বারান্দায় দাঁড়িয়ে জবাব দেয়—এটা লিচুর সীজন নয়।

কৃষ্ণা—বাঃ, মাটির লিচুর আবার সীজন কি? চালাকি পেয়েছেন?

—তবে দেখবো চেষ্টা করে, পাই কিনা।...কাকিমা কোথায়? বলতে বলতে চলে গেল শ্যামল, বোধহয় দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে, কিংবা নীচের তলারই ওই ঘরটার দিকে, যেখানে সুকুর মাস্টার গণেশবাবু এখন চুপ করে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।

মনে পড়বে না কেন? খুব মনে পড়ছে, শ্যামলবাবুও আজ এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। শক্তি যখন বড় পিসিকে প্রণাম করে বিদায় নিল, তখন সুকুর পিছনে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামলবাবু। বেশ বিপদে ফেলেছিলেন বড় পিসি। একবার নয়, বার বার তিনবার শক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে একটি কথা বললেন, শ্যামলকে দু-একটা কথা বলে যাও, শক্তি।

পিসিমাকে একবার স্পষ্ট করে বলে দিতে ইচ্ছে করেছিল, আমাকে দিয়ে বলাবার চেষ্টা কেন? তোমাদের যা ইচ্ছে হয়, যা ভাল মনে কর, তাই করে ফেললেই তো হয়। তোমাদের এই অদ্ভুত সন্দেহ কেন যে, আমি একটা বেহায়া বিদ্রোহিনীর মত তোমাদের ইচ্ছের কথায় একেবারে 'না' করে বসবো।

তবে হ্যাঁ, যা আমি পারি না, তা আমি পারি না। শ্যামলবাবুকে কিছু বলতে-টলতে পারবো না। তোমাদেরও জেদ আর মরজির রকম বুঝতে পারি না। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, শ্যামলবাবুর কাছে আমাকে দিয়ে কথা না বলিয়ে নিলে তোমরা যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছো না। কিন্তু করুণা বউদিকে আমি তো কবেই বলে দিয়েছি, শ্যামলবাবুর মত চমৎকার মানুষ হয় না। আর কত বলবো? কি-ই বা বলবার আছে?

না, আজ আর মুখ লুকোতে চেষ্টা করেনি, ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করেও ওঠেনি, শ্যামলের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা কথা বলে দিতে পেরেছে শক্তি—আসি তবে!

বড় পিসি নিশ্চয় খুব আশ্চর্য হয়েছেন। বোধহয় ভাবছেন, যে-মেয়ে আজ এত সহজে একেবারে শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পেরেছে; সে-মেয়ে এতদিন মুখ বন্ধ করে ছিল কেমন করে?

হাতঘড়ির দিকে তাকায় শক্তি। হ্যাঁ, এতক্ষণে সবাই চলে গিয়েছে। বড় পিসির গাড়ি এতক্ষণে বোধহয় আলিপুরের ব্রিজ পার হলো। ওদিকে বড় পিসেমশাই এতক্ষণে নিশ্চয় তাঁর চেম্বারে যাবার জন্যে ছটফট করে গাড়ির খোঁজ করছেন। আজ শক্তিকে বিদায় দিতে বড় পিসেমশাইও এয়ারপোর্ট পর্যন্ত নিশ্চয় আসতেন। কিন্তু আসতে পারলেন না। শুধু বাড়ির গেট পর্যন্ত এগিয়ে এসে শক্তির পিঠে হাত বুলিয়ে আক্ষেপ করেছেন, যেতে পারলাম না শক্তি। সকাল থেকে টেলিফোনে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছেন মক্কেল, আজ আপীলের শুনানি। আমি আজ খুবই ব্যস্ত। লক্ষ্মী মেয়ে, তেজপুরে পৌঁছেই তার করে একটি খবর দিও।

শ্যামলবাবুও চলে গিয়েছেন। কে জানে কতক্ষণ ওখানে ওভাবে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। কে জানে কি মনে করে চলে গেলেন!

একটা হাত তুলে চোখ বন্ধ করে, বাঁ চোখের ভুরুর উপর শক্ত করে একটা আঙুল চেপে রাখলেও মনের ভিতরে এ ছাই চিন্তেগুলি একটুও চাপা থাকতে চায় না। ভাবতে কষ্ট হয় বইকি। শ্যামলবাবু হয়তো আজ সন্ধ্যে হলেই ভুল করে, সেই ভবানীপুর থেকে আলিপুরে বড়পিসির বাড়িতে হঠাৎ একবার এসে পড়বেন। শক্তির এসরাজটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকবেন। তারপর হঠাৎ উঠে পড়বেন আর চলে যাবেন—না, আজ আমি আর চা খাব না, কাকিমা। চলি কৃষ্ণা, যাচ্ছি রে সুকু।

আবার চমকে উঠতে হলো। চোখ মেলে তাকায় শক্তি। শান্তি কাপুর বলছে—মাথা ধরেছে বোধহয়।

শক্তি হাসে—না।

[দুই]

কৃষ্ণার চেয়ে বয়সে দু বছরের বড়, তার মানে, বাইশ বছর বয়স হয়েছে এই মেয়ের, যার নাম শক্তি। এখনও ভাবছে, এবার ফাইনাল না দিয়ে একটা বছর পিছিয়ে থাকলে কেমন হয়? কে জানে কবে বি-এ এম-এ পাশ করবে এই মেয়ে। কোনদিন পাশ করতে পারবে কিনাও সন্দেহ। তার উপর যদি ফাইনালের ভয়ে এভাবে এক-একটা বছর নষ্ট করতে থাকে, তবে তো...।

জয়ন্ত সরকার বলেন—তুমিও ভুল করেছো। তোমার পরামর্শেই মেয়েটা অঙ্ক নিতে বাধ্য হলো। তুমি নিজে অনেকের গ্রাজুয়েট বলে মনে করেছো, সবাই...।

সুমিত্রা বলেন—স্বীকার করি, ভুল হয়েছে। কিন্তু তুমিও ভুল পরামর্শ দিয়েছিলে। হিস্ট্রি নিলে শক্তির একটুও সুবিধে হতো না। তোমার মত শক্তিরও কিছু মনে থাকে না।

সত্যি কথা, শক্তির বড় পিসেমশাই জয়ন্ত সরকার আর বড় পিসি সুমিত্রা, দুজনেই শক্তির জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে যতটা চিন্তা করেন, তাঁদের নিজের মেয়ে কৃষ্ণার জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সিকিভাগ চিন্তাও করেন না। শক্তির বাবা গগন বসু যেন প্রতিজ্ঞা করে মেয়েটার জীবনটাকে নিয়তির ইচ্ছার কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়েছেন। লেখাপড়া শিখতে ইচ্ছে হলে শিখবে, ইচ্ছে না হলে শিখবে না। যদি বিয়ে করতে চায় তো বিয়ে করবে, না চায় তো চিরকুমারী হয়ে থাকবে। বাস্, গগন বসু এর বেশি আর কিছু বলতে ভাবতে, কিংবা কোন চেষ্টা করতে পারবেন না।

শুক্তির বাবা, কদমবাড়ি চা-বাগানের বড় মালিক গগন বসুর এই একরোখা ঔদাসীন্য কি মেয়ের প্রতি বাপের বিরূপ মনের একটা কঠিন ভর্ৎসনা? মোটেই নয়। জানেন সুমিত্রা, তাঁর দাদা ওই গগন বসু আজকাল দিনরাত শুধু শুক্তির কথাই ভাবেন। শুক্তির মা কিরণলেখাও মাঝে মাঝে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে কদমবাড়ি থেকে চিঠি লেখেন, কবে আসবে শুক্তি? কলেজের ছুটি শুরু হবে কবে? এদিকে মানুষটা যে-সব কাণ্ড শুরু করেছে, সে-সব আর লিখে কুলোতে পারবো না। বিছানার কাছে একটা ছোট টেবিলে শুক্তির একটা ফটো দাঁড় করিয়ে রেখেছে; ঘুম ভেঙ্গে তাকালেই মেয়ের মুখটি যাতে চোখে পড়ে।

গগনদা'র দুই মেয়ে, অঞ্জনা ও অর্চনার বিয়ে কবেই হয়ে গিয়েছে। ছেলে নেই গগনদার। তাই এই তৃতীয়া কন্যাটি, বাইশ বছর বয়সের এই শুক্তিকে যেন কোলের মেয়েটি বলে মনে করেন গগনদা। তা করুন না কেন, কেউ আপত্তি করছে না। কিন্তু বুঝতে পারেন না সুমিত্রা, শুক্তির বিয়ের কথা তুলে কোন মতামত জানতে চাইলেই গগনদার জবাবের চিঠিটা কেন অদ্ভুত এক আতঙ্কের ভাষায় মুখরিত হয়ে ছুটে আসে; না ওসবের মধ্যে আমি আর নেই।

মাঝে মাঝে গগনদার এমন চিঠিও আসে, যার মধ্যে কি-যেন বুঝিয়ে বলবার একটা করুণ চেষ্টার আর্তস্বর শোনা যায়। চিঠিটাকে বারবার দু-তিনবার পড়ে বুঝতে চেষ্টা করেন সুমিত্রা, কী বোঝাতে চাইছেন গগনদা। 'তোমরা যারা শুক্তির জীবনের ভাল চাও, তারা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। আমি কোন দায়িত্ব নিতে পারবো না। কিন্তু শুক্তি কি নিজেই কিছু বলেছে? বলে থাকলে ভালই।' গগনদার চিঠির এমন জিজ্ঞাসার সামনে বসে ভাবতে গেলে দায়িত্ব নেবার আনন্দটাও একটু করুণ হয়ে যায় বইকি। তাই ভাল, শুক্তি নিজেই বলুক।

কিন্তু কী অদ্ভুত ভীরু স্বভাবের মেয়ে এই শুক্তি। শ্যামলের সঙ্গে আজও ভদ্রভাবে একটু মেলামেশা করতে পারলো না। ইচ্ছের কথাটা মুখ খুলে বলতেও পারছে না। অথচ, নিজের কানে শুনেছেন সুমিত্রা, কলেজ থেকে ফিরে এসেই কৃষ্ণাকে চুপি-চুপি জিজ্ঞেসা করেছে শুক্তি; শ্যামলবাবু এসেছিলেন নাকি, কৃষ্ণা?

সুমিত্রার বড় জা সুধাদির বড় ছেলে এই শ্যামল। শুধু কি দেখতে সুন্দর? গুণে জ্ঞানে ও রোজগারেও কিছু কম সুন্দর নয় শ্যামল। তিন বছর হলো ভিয়েনা থেকে ফিরেছে, সার্জারীতে শ্যামল সরকারের হাতযশ এখন কলকাতার হাসপাতাল ও ডাক্তার মহলের বৈঠকে নিত্যদিনের গল্প হয়ে উঠেছে। এই তো, গত মাসেই রাজস্থানের এক কুমারসাহেব এসে শ্যামলের নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছিলেন। পেটের একটা ভয়ানক ম্যালিগন্যান্ট টিউমার অপারেশন করিয়ে, আর এক হাজার এক টাকা দক্ষিণা দিয়ে, বেশ খুশি হয়েই রাজস্থানে ফিরে গিয়েছেন সুস্থ কুমারসাহেব।

শ্যামল সরকারের ভবানীপুর বাড়িতে একদিন সন্ধ্যা হতেই বেশ সুন্দর একটি উৎসবের আনন্দ জেগে উঠেছিল। শ্যামলের জন্মদিনে চেনা-শোনা বন্ধু ও স্বজনের হাসিখুশি মেলামেশা আর খাওয়া-দাওয়ার উৎসব। বড় জা সুধাদি চিঠি দিয়ে সুমিত্রাকে জানিয়েছিলেন, তোমরা সবাই আসবে।

সবাই গিয়েছিল। অ্যাডভোকেট জয়ন্ত সরকারের মনটা সেদিন জজের একটা রূঢ় কথার আঘাতে খুবই বিষণ্ণ ছিল। তবু, তিনিও শ্যামলের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। যায়নি শুধু শুক্তি। করুণা বউদি শুক্তিকে কত সাধাসাধি করে কত কি বোঝালেন। কিন্তু শুক্তি যেতে রাজি হয়নি।

অথচ, কি আশ্চর্য, কৃষ্ণাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে, কৃষ্ণার হাতে ফুলের একটা তোড়া ধরিয়ে দিয়েছিল শুক্তি।—শ্যামলবাবুকে দেবে, ভুলে যেও না কিন্তু।

না, এরপর আর শুক্তির ঘরকুনো স্বভাবটার উপরে রাগ করতে পারেননি বড় পিসি সুমিত্রা। করুণা বউদি তো খুশি হয়ে হেসেই ফেলেছিলেন।

একদিন চন্দননগর থেকে বাড়ি ফিরে আরও একটু আশ্চর্য হয়ে আরও একটু বেশি খুশি হয়েছিলেন সুমিত্রা। বাড়িতে আর কেউ ছিল না, শুধু ছিল শুক্তি। ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন সুমিত্রা, একটা বই হাতে নিয়ে মিররের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শুক্তি।

সুমিত্রা বলেন—এ কি? সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও সেই দুপুরবেলার শাড়িটা পরে রয়েছে?

শুক্তি বলে—শ্যামলবাবু এসেছিলেন।

চমকে ওঠেন সুমিত্রা—তাই নাকি। তারপর?

শুক্তি বলে—বেশিক্ষণ ছিলেন না।

সুমিত্রা—তা তো বুঝলাম, কিন্তু...।

শুক্তি—হ্যাঁ, চা খেয়েছেন শ্যামলবাবু।

সুমিত্রা—কে চা করলে? তুমি?

শুক্তি—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—কি বললে শ্যামল?

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিররের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি। দেখতে পেয়েছিলেন সুমিত্রা, মেয়েটার মুখটা সত্যিই যেন একটা লজ্জার রক্তগোলাপ। চোখের তারা দুটো সন্ধ্যাতারার ভীরু হাসির মত কাঁপছে। না, আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করে মেয়েটার এই মূক লাজুক প্রাণটাকে ত্যক্ত করার কোন মানে হয় না। তা ছাড়া, ভাবতে গিয়ে নিজেই একটু লজ্জিত হয়ে পড়েন সুমিত্রা। সত্যিই তো, শ্যামল যে-কথা শুক্তিকে বলেছে, সে-কথা শুক্তির বড় পিসির না শুনলেও চলবে। শুক্তি বলবেই বা কেন?

কিন্তু একটু পরেই, বাগানের কদম গাছের মাথায় সন্ধ্যার অন্ধকার যখন বেশ কালো হয়ে উঠেছে, ঠিক তখন কৃষ্ণার মুখ থেকে একটা উদ্বেগের প্রশ্ন শুনতে পান সুমিত্রা।—শুক্তিদির বোধহয় জ্বর হয়েছে, মা।

—কে বললে?

—শুক্তিদি চুপ করে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে আছে।

ছুটে এলেন সুমিত্রা।—কি হলো শুক্তি, লক্ষ্মী মা? মাথা ধরেছে বোধ হয়?

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি—কিচ্ছু হয়নি। মিছিমিছি মাথা ধরবে কেন, ছি!

সুমিত্রা—তবে ওঠো। হাত মুখ ধুয়ে সাজ বদলে নাও। সেই কাশ্মীরী মসলিনের শাড়িটা পর, করুণার মা যেটা তোমাকে উপহার দিয়েছেন। শাড়িটা সত্যিই খুব সুন্দর, কি বলিস কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা চেঁচিয়ে ওঠে—সত্যি, চমৎকার। হংসমিথুন আঁকা, ঝলমল ছলছল...।

কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে ধমক দেন সুমিত্রা।—এতক্ষণে কথা ফুটেছে বোকাটার মুখে: কেন, একবার তো শুক্তিদির হাত ধরে বলতে পারতিস, ওঠো শুক্তিদি, গান গাইবে চল।

কৃষ্ণার স্কুলের পাঠ্য একটা বইয়ে একটা গল্প আছে। কৃষ্ণার ধারণা, ওটাই সব চেয়ে মজার গল্প। একদা এক কাঠুরিয়া কুঠার হাতে লইয়া পলাশবনে প্রবেশ করিয়াছিল।......।

কিন্তু কাঠ কাটতে পারেনি কাঠুরিয়া। কোন পলাশের গায়ে কুঠারের কোপ বসাতে পারেনি। ফাল্গুন মাসের টাটকা ফোটা পলাশফুলের রঙের শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই কাঠুরিয়ার চোখ। কাঠুরিয়ার মন বলিল, আহা, এমন শোভা ধরিতে পারে যে তরুর ফুল, তাহার গায়ে কুঠার হানিতে নাই।

শ্যামল ছেলেটি যেন পলাশবনের কাঠুরিয়ার চেয়েও নরম মনের মানুষ। বড় পিসি একদিন জানতে পেরেছিলেন, আর করুণা বউদি নিজের চোখেই দেখতে পেয়েছিলেন, শ্যামলের একটা মায়াময় অনুরোধের কথা শুনেই কী অদ্ভুত একটা রূঢ় অভদ্রতার

কাণ্ড করে ফেলেছিল শুক্তি।

—চল না, আমাদের ওখানে একবার ঘুরে আসবে। আমার সঙ্গেই চল। এই তো সামান্য একটা কথা। বারান্দার টবের গোলাপটার কাছে, যেখানে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে লেস বুনছিল শুক্তি, সেখানেই এগিয়ে যেয়ে শুক্তিকে শুধু এই কয়েকটি কথা বলেছিল শ্যামল।

বারান্দার একটা চেয়ারের উপর হাতের লেস আর কাঁটা তখনি ঝুপ করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরে গেল শুক্তি। সোজা সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে একটা ঘরের ভিতরে ঢুকে আর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বসে রইল।

কিন্তু শ্যামলের চোখ দেখেই বোঝা যায়, একটুও রাগ করেনি শ্যামল। দুঃখিত ব্যথিত বিষণ্ণ, কিছুই হয়নি শ্যামল। শ্যামলের চোখে মুখে কোন রূঢ় বিস্ময়ের ছায়াও দেখতে পাওয়া যায়নি। শুক্তির নামে ঠাট্টা করেও সামান্য একটু শক্ত ভাষার কথা বলতে পারেনি শ্যামল। বরং শ্যামলের মুখের শান্ত হাসিটা যেন স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিল, শুক্তির এই অদ্ভুত অভদ্র লজ্জার কাণ্ডটাই একটা মায়ার শোভা হয়ে শ্যামলকে আশ্চর্য করে দিয়েছে।

করুণা বউদিকে দেখতে পেয়েই বলে ফেলেছিল শ্যামল—শুক্তি আমাকে ভুল বুঝলো না তো, বউদি?

শ্যামল চলে যাবার পর, করুণা বউদিও সোজা দোতলার ঘরে গিয়ে শুক্তির দিকে বেশ রুক্ষ দুটো চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন। —একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, শুক্তি।

শুক্তি—কি হলো?

—শ্যামলের কথার একটা জবাবও না দিয়ে আর ওরকম করে ছুটে পালিয়ে এলে কেন?

শুক্তি—কেন? তাতে কি কোন দোষ হয়েছে?

—হয়েছে। শ্যামল তোমাকে কি মনে করেছে, সেটা ধারণা করতে পার?

—পারি। শ্যামলবাবু কিছুই মনে করেননি। তেমনই পারে শুক্তি। করুণা বউদি হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেন—এর মানে কি?

শুক্তি—তুমিই বুঝতে ভুল করেছ।

শুক্তির মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন করুণা বউদি। তারপর মনে মনে [illegible] একটু ভুলই হয়েছে বোধ হয়।

এটা তো দেড় বছর আগের ঘটনা। করুণা বউদির আর দেখবার সুযোগ হয়নি, কিন্তু সুমিতা নিজের চোখে দেখেছেন আর নিজের কানে শুনেছেন। মুকুর পড়ার ঘরের ভিতরে বসে কৃষ্ণাকে বার বার শ্যামলের কথা জিজ্ঞাসা করেছে শুক্তি। শ্যামলবাবু কি কখনও তোমার কাছে আমার নামে কোন কথা বলেছেন?

কৃষ্ণা—হ্যাঁ, কতবার বলেছেন।

—কি বলেছেন?

—তোমাদের শুক্তিদি আমাকে কেন এত ভয় করে বুঝি না।

—তুমি কি বললে?

—বললাম, শুক্তিদি ভয়ানক ভীতু।

—একথা কেন বলতে গেলে?

—তবে কি বলবো?

—বলতে পারলে না কেন, যে যাকে ভয় করে সে কি তাকে নিজের হাতে চা তৈরী করে খাওয়াতে পারে?

—তুমি আবার কবে শ্যামলদাকে চা খাওয়ালে?

—খাইয়েছি, তুমি জান না।

—যা জানি না, তা বলবো কি করে?

—তর্ক করো না। যা বলছি, মন দিয়ে শোন।

—বল।

—শ্যামলবাবু যদি আবার কোনদিন আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে বলে দিও, শুক্তিদি আপনার ওপর কোনদিনও একটুও রাগ করে নি।

শুক্তির কথাগুলিকে বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পেয়েছিলেন বলেই সেই ঘরের দরজার একপাশে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সুমিত্রা। ঘরের ভিতরে আর ঢোকেননি। কৃষ্ণার টনসিলের পেণ্টমাখা তুলিটা হাতে ধরে নিয়ে নেপথ্যের এক অবাক্ কৌতূহলের ছবিটির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেও সুমিত্রার মুখের হাসিটা আর চুপ করে থাকতে পারছিল না। তাই সরে গেলেন সুমিত্রা, আর বারান্দা পার হয়ে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে বলেই ফেললেন—কৃষ্ণাকে দিয়ে বলানো কেন, নিজের মুখে বলে দিলেই তো পার।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসেন রাঁধুনী ঠাকরুণ নিশির মা।—কি মা? কি বলতে হবে, বলুন।

সুমিত্রা হাসতে থাকেন।—আপনাকে কিছু বলছি না, বলছি শুক্তিকে। মন যা চাইছে, তা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারবে না মেয়েটা।

নিশির মা মাথা নাড়েন।—হ্যাঁ মা, একেই বলে শান্তভীরু মেয়ে। ওটা বয়সের রীতি মা; কী আর করবেন, বলুন?

সেদিন বারবার অনেকবার ভেবেছিলেন সুমিত্রা। ঠিকই, শুক্তির প্রাণটা যেন নিজেকেই ভয় করে করে চলছে। শ্যামলের কাছে দুটো-একটা কথা বলতে হলে ভুল করে আর লজ্জার মাথা খেয়ে মস্ত একটা ভালবাসার কথা বলে ফেলতে হবে, যেন এইরকম একটা মিথ্যে ভয়ের ছায়া মেয়েটার মন জুড়ে ছমছম করছে। কিন্তু বয়সের রীতি বললে চলবে কেন? সুকুর মাস্টার ওই যে গণেশবাবুর মেয়ে স্নিগ্ধা, তার বয়সও তো কুড়ি-একুশের কম নয়। সে-মেয়ে কত স্পষ্ট করে গণেশবাবুকে বলে দিতে পেরেছে; টেলিফোনের শশাঙ্ককে আমি কথা দিয়ে দিয়েছি; বাবা। তুমি আপত্তি করতে পারবে না।

গণেশবাবু নিজেই সুমিত্রার কাছে মেয়ের ইচ্ছার এই কীর্তির কথা বলেছেন। বলতে গিয়ে গণেশবাবুর গলার স্বরও মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর ও বেশ তিক্ত হয়ে কেঁপে উঠেছে। কিন্তু আপত্তি করেননি গণেশবাবু। গত বৈশাখেই শশাঙ্কের সঙ্গে স্নিগ্ধার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

জয়ন্তবাবু কিন্তু সুমিত্রার ধারণাটাকে বাজে চিন্তার এরিথ-মেটিক বলে ঠাট্টা করেন।—না, না, শান্তভীরু-টীরু নয়, নিতান্ত বাজে কথা। ওটা একটা লজ্জার বাধা। তুমি আর করুণা গল্প করে চারদিকে রটিয়ে দিয়েছ যে, শ্যামলের সঙ্গে শুক্তির বিয়ে হলে ভাল হয়। কাজেই, শ্যামলের কাছে ঘেঁষতে চায় না শুক্তি। ঠিকই তো, যা অবধারিত, তার জন্যে ছটফট করে লাভ কি?

সুমিত্রা—বুঝলাম না।

জয়ন্তবাবু—ভালবাসাবাসি তো হবেই একদিন। বিয়ে হলেই ওসব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। কাজেই, ড্রামার মত স্টেজিং-এর আগে ভালবাসার রিহার্সাল, ওটা কোন কাজের কথা নয়।

দিবাকর একবার বলেছিল—না না, ভয়-টয় নয়। শুক্তি বোধ হয় একটু দেরি করতে চায়। অন্তত বি-এ'টা পাস না করে বিয়ে করতে চাইবে না শুক্তি। শুক্তির লজ্জাটা হলো মুখ্খু হয়ে থাকবার লজ্জা। তোমরাই বল, শ্যামলের মত ছেলেকে কোন্ সাহসে এখনই বিয়ে করতে রাজি হবে শুক্তির মত মেয়ে, যে-মেয়ে জীবনে অঙ্কেতে একত্রিশের বেশি নম্বর পেল না?

করুণা বলেছিল—আমার মনে হয়, শুক্তির মনটা ওর বাবার ওপরেই রাগ করে......না, ঠিক রাগ নয়, একটা অভিমান করে রয়েছে বলেই আজও মুখ খুলে কিছু বলতে পারছে না।

চমকে উঠেছিলেন সুমিত্রা—কেন? কেন? শুক্তির কবে এমন মাথাখারাপ হলো যে, গগনদার মত মানুষের ওপর.....

করুণা—আপনার কাছে শুক্তির বাবার যে চিঠিটা পরশুদিন এসেছে, সে চিঠি পড়েছে শুক্তি।

ঠিকই দেখতে পেয়েছিলেন করুণা বউদি, গগনবাবুর চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়ছে শুক্তি। পড়ছে আর হাসছে। চিকচিক করে হাসছে চোখ দুটোও। আর মুখের হাসিটা যেন ছোট্ট একটা ব্যথার টোকা খেয়ে কাঁপছে। ঠোঁট দুটোও ফুলে উঠেছে বলে মনে হয়।

—আমার ইচ্ছার কথা আর জিজ্ঞাসা করো না, সুমি। আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলবো না। যা বলবার হয় মেয়েই বলবে। গগন-বাবুর লেখা চিঠির মধ্যে এই তো মাত্র তিন লাইনের কয়েকটি কথা। এর জন্যে তাঁর মেয়ের মনটার ব্যথিত ও অভিমানিত হবার কোন কারণ আছে কি?

সন্দেহ হয় সুমিত্রার, আছে বোধহয়। তা না হলে শুক্তি কেন আজও ওর ইচ্ছেটাকে এমন করে বোবা করে দিয়ে মনের ভিতরে লুকিয়ে রাখবে? কিন্তু এরকম একটা অভিমানের সমস্যা থাকলে মেয়ের বিয়ে হবে কেমন করে? বাপ কিছু বলবেন না, মেয়েও কিছু বলবেন না, বাঃ

আজ এখন, এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এসেই বাড়িতে ঢুকে সবার আগে যে-ঘরের ভিতরে গিয়ে আর চুপ করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সুমিত্রা, সেটা শুক্তির শোবার ঘর। বিছানার উপর শুক্তির একটা ছাড়া-শাড়ি, কল্কাপাড় একটা টাঙ্গাইল, এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। আয়নার টেবিলের পাউডারের ডিবেটাও খোলা। মেয়েটা যেন পাশের ঘরেই আছে, এখুনি এসে সব গুছিয়ে ফেলবে। মেয়েটার অভ্যাসটা তো একটুও এলোমেলো নয়। যেমন নিজেকে, তেমনই ওর এই ঘরের চেহারাকেও বেশ পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসে শুক্তি।

শুক্তি নেই; বাড়িটাকে আজ বেশ খালি খালি মনে হয়। সুমিত্রার মনটা তবু আজ কেন-যেন খুশি হয়ে রয়েছে। শুক্তির ভুলো মনের এই কাণ্ডটাকে দেখতে ভাল লাগছে। হোক না বড়-পিসির বাড়ি, শুক্তি যেন এখানেই ওর মনটাকে রেখে দিয়ে দু'দিনের জন্য বাইরে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে। একটুও মিথ্যে তো নয়; বছরের যে-কটা মাস এখানে থাকে, তার মধ্যে কোন একটি দিনেও তেজপুরে কিংবা চা-বাগানে যাবার জন্যে মেয়েটার মনে কোন ইচ্ছার তাড়না ছটফটিয়ে ওঠে কিনা সন্দেহ। অন্তত ওর কথার মধ্যে এরকম কোন তাড়নার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

খুব ভাল হতো, শুক্তি যদি গত মাসের তোলা ওর ফটোটাকে এই টেবিলের উপরে নিজেই রেখে দিয়ে চলে যেত। তা হলে আর বুঝতে কিছু বাকি থাকতো না, কার চোখের খুশির জন্য ফটোটাকে রেখে গিয়েছে শুক্তি।

যাই হোক, আজ যেটুকু বুঝতে পেরেছেন সুমিত্রা, তাতেই তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এতদিন ধরে এবাড়ির মনে কতই না মিথ্যে উদ্বেগের জল্পনা কল্পনা আর গবেষণা চলছিল। সব ভুল। আজ যদি দেখতে পেত করুণা, প্লেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে বিদায় নেবার সময় শ্যামলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শুক্তির মুখটা কী সুন্দর হয়ে ঝলমল করে উঠেছিল, তবে করুণাও আজ চেঁচিয়ে হেসে উঠতো। না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই।

—আসি তবে। এই সামান্য ছোট্ট একটা কথা বলতে গিয়েই শুক্তির প্রাণটা যেন এক বুক লজ্জার জলে ডুবে গিয়ে রাঙা হয়ে গেল। তবু তো বলতে পেরেছে। ভয় ভেঙেছে। শ্যামলের সঙ্গে এই প্রথম কথা বললো মেয়েটা। দু' মাস পরে, না হয় আর এক-বছর পরে মেয়েটা ওর ভয়-ভাঙ্গা প্রাণের সাহসে শ্যামলেরই কাছে সে-কথাটা বলে দিতে পারবে, যে-কথা ওর মুখে আজ সব

চেয়ে ভাল শোনায়, সবচেয়ে ভাল মানায়। তখন আর গগনদাকে চিঠি লিখে নিশ্চিন্ত করতে কোন অসুবিধে থাকবে না, তুমি শুনে সুখী হবে, দাদা; শুক্তি নিজেই বলেছে।

বারান্দার মেজের উপর গড়িয়ে বসে আর প্লাস্টিকের একটা এরোপ্লেন নিয়ে ওটা আবার কী খেলা খেলছে সুকু?

নীল খড়ি ঘষে মেজের উপর একটা আকাশ এ'কেছে সুকু। তার উপর সাদা খড়ির দাগ টেনে দিয়ে একটা লাইনও এ'কেছে। লাইনের আরম্ভে মাঝখানে ও শেষে পর পর তিনটে লাল খড়ির গোলদাগ, দমদম—গৌহাটি—তেজপুর।

সুকু জিজ্ঞেস করে।—শুক্তিদি এখন কত দূরে, মা? প্লেন কি গৌহাটি পার হয়েছে?

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই হাসতে থাকেন সুমিত্রা।—হ্যাঁ।

প্লাস্টিকের খেলনা এরোপ্লেনটাকে এক ঠেলায় গৌহাটি পার করে দেয় সুকু।

[তিন]

তেজপুরের মণিমাসি বললেন—আমি যে তোর বড় পিসির চিঠির একটি কথারও মানে বুঝতে পারি না।

শুক্তি—কেন?

মণিমাসি—তুই নাকি ঘর ছেড়ে বের হতেই চাস না? একা কলেজে যাবার দরকার হলে ভয়ে আধমরা হয়ে যাস? কথা-টথা বলতেও নাকি তোর ভয়ানক আনিচ্ছে? বিশেষ করে বাইরের কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে তোর যেন মাথায় বাড়ি পড়ে, শুধু বোবার মত, অ্যাঁ? তোর বড় পিসি মিথ্যে তোর নামে এত নিন্দে করেন কেন?

শুক্তি হেসে ফেলে—নিন্দে কেন হবে? খুব সত্যি কথা।

সত্যি কথা? বিশ্বাস করলে যে একটা অদ্ভুত অসম্ভব বিস্ময়কে বিশ্বাস করতে হয়। কিরণদির মেয়ে এই শুক্তি আজ সকাল সাড়ে দশটার পাঁচ মিনিট আগে তেজপুরে পৌঁছেছে। ঘরে ঢুকেই মণিমাসির গা ঘেঁষে মাত্র একটি মিনিট শান্ত হয়ে বসেছে। তারপরেই ছটফট করে উঠে গিয়েছে। পনর মিনিটের মধ্যে স্নান করে আর তড়বড় করে শুধু ভাত ডাল আর আধখানা ভাজা দিয়ে আধপেটা একটা খাওয়া সেরে নিয়েই বাইরে বের হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।—রাজবাহাদুরকে একবার বলে দাও মণিমাসি, গাড়িটাকে যেন এখনি গ্যারেজে না নিয়ে যায়।

মণিমাসি—কোথায় যাবি?

শুক্তি—যাই একবার মালতীর সঙ্গে দেখা করে আসি। তারপর...একবার শীতলকাকার বাড়ি তো যেতেই হবে। হ্যাঁ, তারপর হয়তো অঞ্জলিদির বাড়িতেও একবার যেতে হতে পারে।

রাজবাহাদুরকে ডাক দিয়ে কিছু বলবার দরকার হয় না মণিমাসির। ফটকের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে আর গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই বের হয়ে যায় শুক্তি। যেতে যেতে বলতে থাকে।—মালতীর সঙ্গে দেখা করেই ফিরে আসবো। তারপর যদি ইচ্ছে হয়... হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কলকাতার বড় পিসিকে একটা তার করে দিতে হবে যে, আমি তেজপুরে পৌঁছে গেছি।

মণিমাসি হাসতে থাকেন—সব হবে, সব হবে। কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

মণিমাসি বেশ একটু মোটাসোটা ভারী চেহারার মানুষ। নড়াচড়া করতে ভালবাসেন না, পারেনও না। তাই বলে শুক্তির এই ছুটোছুটির অভ্যাসটাকে যে একটুও অপছন্দ করেন, তা নয়। বরং একটু ভালই বাসেন। টেবিলের কাছে এগিয়ে যেয়ে আর কলম হাতে তুলে নিয়ে শুক্তির বড় পিসির কাছে তখুনি একটা চিঠি লিখতে শুরু করে দেন।—শুক্তি এখন আমার এখানে আছে। ভালই আছে। কিন্তু একটা কথা ভেবে একটু আশ্চর্য হচ্ছি, সুমিত্রা; তোমাদের ওখানে কেন এত ভীতু হয়ে আর ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকে শুক্তি। আমার এখানে তো বেশ মনের আনন্দ থাকে; ঘরের বাইরে বেড়িয়ে আসতে ভালবাসে। আর......।

না, শুক্তির নামে এখনই আরও কিছু লিখে ফেলা কি উচিত হবে? লেখা বন্ধ করে আর কলমটাকে টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে কি-যেন ভাবতে থাকেন মণিমাসি।

বেশ তো, মালতীদের বাড়ি না-হয় একবার ঘুরেই এল। মালতীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে শুক্তির এই তর-সয়-না ব্যস্ততার তবু একটা মানে হয়। কিন্তু অঞ্জলিদের বাড়িতে কেন?

শুক্তির বাবা গগন বসু ছাত্রজীবনের বন্ধু পরমেশ হাজারিকার মেয়ে মালতীও একদিন শুক্তির ছাত্রী-জীবনের বান্ধবী ছিল। সে আজ দশ বছরেরও আগের কথা, শিলংয়ের এক কনভেন্ট স্কুলের হোস্টেলের একটি ঘরে বসে একদিন দুই মেয়েই কান্নাকাটি করে প্রায় একরকমের ভাষায় চিঠি লিখে বাড়ির মানুষকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।—শিগগির নিয়ে যাও, এখানে থাকলে মরে যাব।

আজও জিজ্ঞাসা করলে ওদের দুজনের একজনও বলতে পারে না, মালতী কিংবা শুক্তি, মরে যাবার মত দশা কেন হয়েছিল? আজ বরং ওরা বেশ হাসাহাসি করে গল্প করতে পারে, হোস্টেলের ঘরের জানালার কাছে গোলাপ গাছের গায়ে সব সময় একটা টিকটিকি বসে থাকতো, তাই বোধহয়...।

মালতীর বাবা পরমেশ হাজারিকা আজ আর বেঁচে নেই। মুনসেফ হয়ে কাজের জীবন শুরু করেছিলেন; সাবজজ হয়ে অবসর নিয়েছিলেন। তেজপুরের কোলি-বাড়ি পাড়াতে শান্ত নিরালায়, একসারি কাঁচ নারকেলের আড়ালে একটি বাসাধাঁচের পাকা-বাড়ি ছাড়া এমন কিছুই তিনি রেখে যেতে পারেননি, যাকে বিষয়-সম্পদ বলে মনে করা যেতে পারে। পারবেনই বা কেমন করে? সৌখীন মেজাজের মানুষ; প্রতি বছর দু-তিন হাজার টাকা খরচ করে গাঁয়ের বাড়িতে বিহু পরবের আনন্দ মাতিয়ে তুলে খুশি হতেন। তার উপর ছিল, থিয়েটারের শখ। যখন যেখানে থাকতেন, তখন সেখানে একটা নাট্যসমিতি গড়ে তুলতেন। স্টেজ তৈরীর খরচ থেকে শুরু করে অভিনেতাদের চা-বিস্কুটের খরচ পর্যন্ত, টাকা খরচের সব দায় নিজেই নিয়েছেন!

মৃত্যুর এক বছর আগে আরও একটা কাণ্ড করেছিলেন পরমেশবাবু। বড় ছেলে শিশির তখন কলেজের ছাত্র, তবু শিশিরের বিয়ে দিলেন। তার মানে প্রমীলাকে পুত্র-বধূ করে ঘরে নিয়ে এলেন। প্রমীলা হলো নওগাঁ আদালতের সেই টাইপিস্ট কেরাণী মহেন্দ্র ফুকনের মেয়ে, যিনি হঠাৎ একদিন আদালতের অফিসঘরেই মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন, আর মরেও গেলেন। পরমেশবাবুর আত্মীয় আর কুটুম্বদের অনেকেই অখুশি হয়েছিলেন, এত গরীবের ঘরের মেয়েকে ঘরে আনা কেন? এটাও কি পরমেশবাবুর একটা শখের খেয়াল? হতে পারে। কিংবা, হয়তো একটা মমতার খেয়াল!

মারা যাবার একমাস আগে, বড়পেটা থেকে তেজপুরে ফিরে আসবার সময় হাতীর দাঁতের দুটি চিরুনি কিনে নিয়ে এসেছিলেন পরমেশবাবু; একটি মালতীর জন্য, আর একটি শুক্তির জন্য।

সেই পরমেশবাবুর মেয়ে মালতী এখন বাড়িতেই পড়ে। মাইনে দিয়ে কলেজে পড়তে অসুবিধা আছে। প্রাইভেট বি-এ দিতে পারবে বলে আশা করছে। আর, মালতীর দাদা শিশির, যে-ছেলেকে তিন বছর আগে দেখা গিয়েছিল, টেনিস ব্যাট হাতে নিয়ে আর স্কুটারে চড়ে ছুটেছে; সে-ছেলে আজ একটি প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টার। পরমেশবাবুর হঠাৎ-মৃত্যুর খবর পেয়ে শিলং থেকেই সেই যে চলে এল শিশির, আর তার ফিরে যাওয়া হলো না। বি-এ পরীক্ষাও দেওয়া হলো না। অথচ, শিলং কলেজের প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, বোটানিতে ফার্স্ট ক্লাস পাবেই শিশির হাজারিকা।

অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর আবার চিঠি লিখতে শুরু করেন মণিমাসি।—আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। সুকু আর কৃষ্ণাকে আমার আদর জানাবে। করুণার কি এখনও কোন নতুন খবর নেই? হ্যাঁ, সাহস করে কলকাতার মানুষকে আবার অনুরোধ করছি; একবার তেজপুরে বেড়িয়ে যাও। শীতের সময় এস।

ফিরে এসেছে গাড়িটা। শুক্তিও এসেছে।

কিন্তু ঘরে ঢুকে মণিমাসির গা ঘেঁষে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।—তবে যাই মণিমাসি, ঘুরেই আসি।

—কোথায়?

—শীতলকাকার বাড়ি।

—যাও, তাড়াতাড়ি ফিরে এস।

—কিন্তু...।

—কি?

—মালতীকে দেখে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। চাকরি করতে চায় মালতী, তা না হলে আর চলে না। বাড়িতে এতগুলি মানুষ; মা আছে, দুটো ছোট ভাই আছে। প্রমীলাও আছে। কি করে চলে? মালতীর দাদা শিশিরবাবুর ওই তো মাইনে, মাত্র একাশি টাকা। আর, প্রাইভেট টিউশন করে আরও পঞ্চাশ টাকা। দেখলাম, জ্বর হয়েছে তবু একগাদা কাপড় নিয়ে কাচতে বসেছে প্রমীলা। শিশিরবাবুও খুব গম্ভীর, মাথায় হাত দিয়ে ঘরের ভিতরে চুপ করে বসে আছেন, কি-যেন ভাবছেন।

—কার কথা বলছিস, শুক্তি? কোলিবাড়ির শিশির হাজারিকার কথা? বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে বের হয়ে আসেন মহিমবাবু।

শুক্তি বলে—হ্যাঁ, মেসোমশাই।

মহিমবাবু বলেন—হ্যাঁ, মাথায় হাত দিয়ে একটু ভাবতেই হবে। বাপের মাথায় একটা ভুল করে বসলে ভাবতেই হয়।

মণিমাসি।—ছেলেটা কষ্টে পড়েছে, অভাবে আছে। তাই দুশ্চিন্তা করতে হচ্ছে। ভুল আবার কোথায় হলো?

মহিমবাবু হাসেন।—না, তোমরা জান না, তাই বুঝতে পারছো না। আমি বুঝেছি। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে ভালুকপং বেড়াতে যাবে, জঙ্গলের একটা ঝর্ণার কাছে বসে আর পিকনিক করে ফিরে আসবে; সেই জন্যে নেফা অফিসে গিয়ে ইনার লাইন পার হবার পারমিট চেয়েছিল শিশির।

শুক্তি—সেটা আবার কি?

মহিমবাবু—নেফাতে ঢুকতে হলে সরকারের অনুমতি চাই।

শুক্তি—পাসপোর্ট?

মহিমবাবু—না না, পাসপোর্ট নয়, পারমিট।

মহিমবাবু—যাই হোক, অফিসার ভদ্রলোক বললেন, হবে না। শিশিরেরও জেদ; কেন পারমিট দেওয়া হবে না? এইরকম কেন কেন করে তর্কাতর্কি হতে হতে শেষে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম।

শিশির বলে—নেফা কি আপনার জমিদারী?

অফিসার বলেন—হ্যাঁ, যতদিন আমি সার্ভিসে আছি, ততদিন আমারই জমিদারী।

শিশির—বাজে কথা বলবার এত সাহস পেলেন কোথায়?

অফিসার—আমার এখানে গোলমাল করবার এত সাহস পেলেন কোথায়? এম-পি কুটুম আছে বোধহয়?

শিশির—না, নেই। আপনার বোধহয় মিনিস্টার কুটুম আছে।

অফিসার—চুপ, আর একটি কথাও বলবেন না, চলে যান। নইলে......।

—পুলিশ ডাকবেন?

—ডাকতে বাধ্য হব।

—ডাকুন তাহলে?

মহিমবাবু এইবার জানালার দিকে তাকিয়ে, বোধহয় দূরের নেফা-পাহাড়ের মাথার সাদা মেঘটার দিকে তাকিয়ে কথা বলেন।—আমি তখন সেখানে ছিলাম। আমিই দুজনের মাঝখানে পড়ে আর বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঝগড়াটা থামিয়ে দিয়েছি।

শুক্তি বলে—অফিসার ভদ্রলোকই বা কেমনতর মানুষ? পারমিট দিলেন না কেন?

মহিমবাবু — বোধহয়...বোধহয়...বোধহয় সরকারের নিয়ম।

হেসে ফেলে শুক্তি।—সরকারই বা কেমনতর?

শুক্তিকে নিয়ে গাড়িটা ফটক পার হয়ে চলে যাবার পরেও জানালাটার কাছে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু; মহিম দস্তিদার, পনর বছর আগে যিনি দিনাজপুরের স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এই ছিপছিপে সুগৌর বুড়ো মানুষটির কপালে কোন রেখা ফুটে ওঠে না। চোখ-মুখ সব সময়েই হাসছে; চমৎকার একটি আশাসুখী চেহারা। জীবনে যা আশা করেছিলেন, তার সবই পেয়ে গিয়েছেন। আরও যা আশা করেন, তাও পেয়ে যাবেন। তিন ছেলে আছে; তিন ছেলেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। রমেন, রথীন, রজত, তিনজনেই দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করে। কেউই কনিষ্ঠ কেরানী নয়; তিনজনেই জ্যেষ্ঠ অফিসার।

রবার বাগানের এক প্রান্তের এই বাড়ি, যে বাড়িকে 'ভারতী' নাম দিয়ে খুশি হয়েছেন মহিম দস্তিদার; সে বাড়ি তৈরীর সব টাকা দিয়েছে রমেন। গাড়িটা কিনে দিয়েছে রথীন। আর, সেগুন কাঠের সুন্দর আসবাব দিয়ে বাড়িটাকে ভরে দিয়েছে যে, সে হলো রজত। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে, ভারতীর চওড়া বারান্দার উপরে যখন পায়চারী করেন মহিমবাবু, তখন অনেক স্বদেশী গান তাঁর মনেরই ভিতরে গুনগুন করে বাজে। এক-একদিন পাশের বাড়ির লাহিড়ীবাবুর ছেলে, দশ বছর বয়সের হীরক যখন চেঁচিয়ে গান গেয়ে ওঠে, ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে, তখন মহিমবাবুও চেঁচিয়ে ডাক দিয়ে বলেন—আরও জোরে গাও, হীরক।

মহিমবাবুর মনে বোধহয় এই সেদিনের একটা ঘটনার কথা, সেই সঙ্গে অনেকদিন আগের একটা ঘটনার কথাও মনে পড়ে গিয়েছে; তাই জানালা দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে ওরকম করে তাকিয়েছেন। এই তো সেদিন, মাস তিন আগে, বিদেশী এক বোটানিস্ট সাহেব এসে সার্কিট হাউসে উঠলেন। নেফার উদ্ভিদের খবর যোগাড় করতে চান এই বোটানিস্ট সাহেব। বলেছেন, জঙ্গলে ভরা ওই নেফাকে তিনি দ্বিতীয় এক ইডেন বলে মনে করেন।

দিল্লী আর শিলং থেকে সরকারী মহলের কত মানী মহোচ্চ ও পদস্থের কত শুভেচ্ছার চিঠি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এই বোটানিস্ট সাহেব, ডক্টর সি টি এলগিন। চারজন ভি আই পি, যাঁরা সে-সময়ে সার্কিট হাউসে ছিলেন, তাঁরাও বোটানিস্ট সাহেবকে চা-খাওয়াবার জন্য যখন-তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নেফা অফিসের জীপও যখন-তখন ছুটে এসে বোটানিস্ট সাহেবের দরকারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। সাহেবের জন্য হেলিকপ্টর যোগাড়ের চেষ্টা করছেন নেফা-অফিসেরই সেই অফিসার মিস্টার মনোহর লাল, শিশির যাকে মিছিমিছি অত্যন্ত বিরক্ত করেছিল। এলগিন বিনীতভাবে হেসেছেন, না, আমি গাছের ছায়ায় হাঁটতে ভালবাসি, হেলিকপ্টরের দরকার নেই।

ইনার লাইনের পারমিট পেতে বোধহয় এক ঘণ্টাও দেরি হয়নি; স্বাগত অতিথির মত খুশির হাসি হেসে, সরকারী জীপের আরোহী হয়ে, আর সরকারী প্রথার গুরুজন হয়ে নেফা চলে গেলেন বোটানিস্ট এলগিন। তেজপুর থেকে রুটীহিল; রুটীহিল থেকে চাকু; তারপর কে জানে কোন্ দিকে। এর চেয়ে বেশি কোন খবর আর পাননি মহিমবাবু। সেদিন বোটানিস্ট এলগিনকে বিদায় দেবার সময় সার্কিট হাউসের বারান্দায় দশজন ভি আই পি আর অফিসারের ভিড়ের এক পাশে মহিমবাবুও দাঁড়িয়ে ছিলেন।

আর, অনেকদিন আগের ঘটনাটা এই যে, পরমেশবাবু মারা যাবার ঠিক ছমাস পর, একদিন শিশিরকে দেখতে পেয়ে উপদেশ দিয়েছিলেন মহিমবাবু, মন খারাপ করো না শিশির। ভাল করে পড়াশোনা কর। তুমিই একদিন বিদ্বান বোটানিস্ট হয়ে, আমাদের এই নেফারই জঙ্গল থেকে এমন অর্কিড খুঁজে আনতে পারবে, ইওরোপের বাজারে যার দাম হবে দু'তিন হাজার পাউন্ড।

মহিমবাবু কি মিথ্যে একটা গল্প বলে ছেলেমানুষের মন ভোলাতে চেয়েছিলেন? না না; মহিমবাবু যা আশা করেছিলেন, তাই বলেছিলেন। গণ্ডগোল তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাটি পছন্দ করেন না মহিমবাবু। তিনি চান, ভাগ্য যা দিয়েছে তাই নিয়ে শান্ত হয়ে থাক আর আশা কর। আশা হারাতে নেই। ভেবে একটু দুঃখ বোধও করেন মহিমবাবু; মানুষের মন এত সহজে ধৈর্য হারায় কেন? একটু সহ্য করতে অসুবিধে কোথায়?

—শুক্তি কোথায় গেল? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে মহিমবাবুর চোখমুখে হাসতে থাকে।

মণিমাসি বলেন—নতুন পাড়ার শীতলের বাড়িতে।

[চার]

জানেন মণিমাসি, শীতলের বাড়িতে একবার না যেয়ে পারবে না শুক্তি। গিয়েছে, ভালই করেছে। শীতলের বউ মীরা শুক্তিকে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাবে। সব কাজ ফেলে রেখে শুক্তির শক্ত বেণীটাকে খুলে দিয়ে খোঁপা বেঁধে দিতে চেষ্টা করবে। মীরার ওই এক অভ্যাস; শুক্তির মাথাটার দিকে চোখ পড়লেই মীরার হাত যেন নিসপিস করে।

শুক্তিরই বাবা গগন বসুর, কে জানে কেমন দূর সম্পর্কের এক কুটুমের ছেলে নতুন-পাড়ার শীতল বিশ্বাস, তেজপুরে বাজারে যাঁর সামান্য ধরনের একটা বস্ত্রালয় আছে। মহাজনের দেনা ঠিক সময়ে শোধ করতে না পেরে মাঝে-মাঝে মহিমবাবুর কাছে টাকা ধার চাইতে আসেন শীতল।

শীতল বিশ্বাসের ভাই রতন, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন; বছরে দু-একবার কাজের ছুটি নিয়ে তেজপুরে আসে, নতুন পাড়ার বাড়িতে একটা দিন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে পার করে দেয়। কিন্তু পরের দিনই ছটফট করতে থাকে, ঘুমটুম হয় না। তার পরের দিন নেফা চলে যায় রতন। শীতল আর মীরার আপত্তির কোন কথা গ্রাহ্য করে না। মীরাও রাগ করে তার এই বিচিত্র স্বভাবের দেবরটিকে কথা শোনাতে ছাড়ে না—পাঁচ বছর নেফাতে চাকরি করে তুমিও আস্ত একটি দফলা হয়ে গিয়েছ।

রতন কিন্তু রাগ করে না। হেসে হেসে দফলা ভাষাতে জবাব দিয়ে মীরার রাগটাকে ঠাট্টা করে। সে-ভাষার একটা কথাও বুঝতে না পেরে মীরা আরও রেগে যায়।

এবার কিন্তু, রতন বেশ জব্দ হয়েছে। প্রায় এক মাস হতে চললো, তেজপুরে এসেছে রতন। কিন্তু যাই-যাই করেও যেতে পারছে না।

সেটা একটা কাণ্ডই বটে; রতনের কাণ্ড! সেদিন নেফা থেকে এসে, আর, নতুনপাড়ার বাড়িতে ঢুকেই মেজের মাদুরের উপরে ঘুমিয়ে পড়বার আনন্দটাকে ভুলে গেল। তখুনি বের হয়ে গেল, আর দুঘণ্টা পরে ফিরে এসে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—দেখ বউদি, নেফা থেকে কী বস্তু নিয়ে এসেছি।

নেফার বস্তু? সে কী? রাক্ষসে সোনপা-মুখোশ? বুনো শুয়োর? ভুজ্জ কাঠের ডিঙে? ইয়াক দুধের মাখন? চকচকে একটা দফলা দা? কিছুই ধারণা করতে না পেরে আর, বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে ঘরের বাইরে এসেই চমকে উঠেছিল মীরা। রতনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা দফলা মেয়ে হাসছে।

তেজপুর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ওই দফলা মেয়ে, যার নাম রেনকি। মাস-খানেক আগে নেফা মেডিক্যালের চিঠি নিয়ে আর রেনকিকে নিয়ে পিয়ন রতনই তেজপুরে এসেছিল। হাসপাতালে রেনকিকে ভর্তি করে দিয়েই ফিরে গিয়েছিল রতন; ওর চাকরির সেই জায়গাটিতে, খানোয়া বেস থেকে একদিনের হাঁটাপথ সেই এরিয়াতে, যার নাম বিলং।

শীতলবাবুর বাড়িতে গিয়ে মণিমাসিও একদিন দফলা-মেয়ে রেনকিকে দেখে এসেছিলেন। বয়স কত হবে মেয়েটার? উনিশ কুড়ি কিংবা একুশ? ফুলো ফুলো দুটো ভুরুর ছায়ার নীচে দুটো ছোট্ট মিটমিটে খুশি চোখের তারা চিকচিক করে হাসছে। মেয়েটার দুই গালে কেউ আলতো বুলিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু ওটা ওর রক্তেরই রঙের আভা। আর কী-কাণ্ড? বলতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল মীরা।—রেনকিকে একদিন শাড়ি-ব্লাউজ পরিয়ে সিনেমার ছবি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, মণিদি। আমার তো হাতঘড়ি নেই, তাই ভদ্রলোকের হাতঘড়িটাকেই রেনকির হাতে পরাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রেনকির কব্জিতে পুরুষ ঘড়ির ব্যাণ্ডও টাইট হয়ে ছিঁড়ে গেল। শেষে সিল্কের ফিতে দিয়ে...।

হাসি থামিয়ে নিয়ে মীরা আবার বলে —অমন কব্জি হবে না কেন? মেয়েটা নিজের হাতে ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙে আর কাঠ কাটে।

এবার কিন্তু একমাসের ছুটি নিয়েছে রতন। আর নেফা মেডিক্যালও অনুমতি দিয়েছে, হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর ট্রাইবালের মেয়ে রেনকিকে কোন ইণ্ডিয়ান পরিবারের বাড়িতে কয়েকটা দিনের জন্য থাকতে দিতে পারা যায়; যদি অবশ্য সে-বাড়িতে কোন রেসপন্সিবল্ বয়স্কা মহিলা থাকেন।

গাঁওবুড়োর মেয়ে রেনকি। খুঁড়িয়ে হাঁটতো রেনকি। হাঁটুর কাছে একটা মাংস-পেশী কুঁচকে গিয়ে শক্ত ঢেলার মত হয়ে গিয়েছিল। হাঁটতে গেলেই ব্যথা পেয়ে কটকট করতো হাঁটুটা। সোজা টান হয়ে দাঁড়াতে পারতো না। অপারেশনের পর সেই হাঁটু ভাল হয়ে গিয়েছে। এখন দৌড়তেও পারে। তাই রেনকিকে নিয়ে যেতে চায় রতন। কিন্তু রেনকি বলে—আরও কিছুদিন থাকি।

রতন বোধহয় এখনও চলে যেতে পারেনি। না গিয়ে থাকলে ভালই হবে। শুক্তি তাহলে মেয়েটাকে দেখতে পাবে। খুব খুশি হবে, খুব আশ্চর্য হবে শুক্তি। ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলেন মণিমাসি। দফলা-মেয়েটাকে নিয়ে মীরা কত কাণ্ডই না করেছে। যখন-তখন মেয়েটাকে খেলার পুতুলের মত সাজিয়েছে। দুবেলা দুরকম করে খোঁপা বেঁধে দিয়েছে। একদিন মেয়েটাকে দিয়ে লুচি ভাজিয়েছিল মীরা। কালোর মা'র কাছে সে-গল্প বলতে গিয়ে হেসে-হেসে লুটোপুটি করেছে মীরা, যার বয়স এখন প্রায় চল্লিশের কাছে এসে ঠেকেছে। তাহলে শুক্তির মত মেয়ে এখন রেনকিকে নিয়ে কী যে কাণ্ড করবে, ভগবান জানেন। শুক্তি এতক্ষণে বোধহয় দফলা-মেয়েটাকে গান শেখাতেই শুরু করে দিয়েছে, কত গান তো হলো গাওয়া......।

নিজেরই কল্পনার মধ্যে মন ডুবিয়ে দিয়ে হাসতে থাকেন মণিমাসি। তারপর আরও দুটো চিঠি লেখা সেরে ফেলেন। তারপর হঠাৎ শুক্তির গলার স্বর শুনেই চমকে ওঠেন।

—একটু অপেক্ষা কর রাজবাহাদুর; আমি এখনই আবার বের হব।

শুক্তি বলে—কী চমৎকার মেয়ে রেনকি। আমি ওর গলায় পাউডার মাখিয়ে দিয়েছি, ওর শাড়িতে সেন্ট ছড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু...।

মণিমাসি—কি?

শুক্তি—আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলেছে রেনকি।

—কেন?

—এখনই চলে যেতে হবে বলে।

—চলে যাচ্ছে নাকি?

—হ্যাঁ। কি আর করবে বল? রতনকাকা বলেছেন, আর একটি দিনও দেরি করতে পারবেন না। দেরি করলে রতনকাকার চাকরি চলে যাবে।

আনমনার মত একটু চুপ করে থেকেই শুক্তি আবার কথা বলে।—উঃ, কী ভয়ানক রেগে গেল রেনকি। রতনকাকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইল; তার পরেই ঘরের ভিতরে ছুটে গেল। গায়ের শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ, সব সাজ খিমচে টেনে সরিয়ে দিয়ে, ওর নিজের সাজ পরে বের হয়ে এল। কী খসখসে ধোকড় কাপড়ের একটা লম্বা কোর্তা পরে, ঝুঁটি করে চুল বেঁধে, শক্ত করে কোমরে চাদর জড়িয়ে, আর, রতন কাকার কাছে এগিয়ে যেয়েই ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো রেনকি।—চল।

মণিমাসি কোন কথা বলেন না। মণি-মাসিও যেন আনমনা হয়ে গিয়েছেন। শুক্তি নিজেই বিড়বিড় করে—ওরা রওনা হবার আগেই আমি পালিয়ে এসেছি। আমার খুব ভয় করছিল মণিমাসি।

মণিমাসি হাঁপ ছাড়েন।—তুই কি এখনই আবার বের হবি?

শুক্তি—ও...হ্যাঁ...একবার অঞ্জলিদির সঙ্গে দেখা করে আসি।

মণিমাসি—যাও, কিন্তু বেশি দেরি না করে চলে এস।

শুক্তি—না, দেরি করবো না। কিন্তু রতনকাকার মুখের দিকে অমন কটমট করে তাকালো কেন রেনকি? রতনকাকা কী দোষ করলেন?

মণিমাসির চোখ চমকে ওঠে—মীরা তোকে কিছু বলেনি? বলেছে বুঝি?

—না, কই, মীরা কাকিমা তো আমাকে কিছু বলেন নি।

মণিমাসি আবার হাঁপ ছাড়েন—না, রতনের দোষ কেন হবে? ওটা হলো সরকারী নিয়ম. ট্রাইবালের মেয়েকে ট্রাইবালের ঘরেই থাকতে হবে।

—কী বিদ্‌ঘুটে নিয়ম? হাসতে গিয়ে শুক্তির ঠোঁট দুটো কুঁচকে যায়।

চলে গেল শুক্তি।

মণিমাসির মনের এতক্ষণের ছায়া-ছায়া কিন্তুটা এইবার সুস্পষ্ট একটা প্রশ্নের কায়া হয়ে ফুটে ওঠে। এত ব্যস্ত হয়ে অঞ্জলির বাড়িতে কেন বেড়াতে গেল শুক্তি? মালতী ওর অনেকদিনের চেনা-জানা বান্ধবী; শীতলবাবুর বাড়ি ওর কুটুম্বকাকার বাড়ি। কিন্তু অঞ্জলি তো এমন কেউ নয় যে, নেমন্তন্ন করে না ডাকলেও তার বাড়িতে ছুটে যেতে হবে। অঞ্জলি যে শুক্তির ডবল বয়সের এক মহিলা। অঞ্জলি যে বিধবা মানুষ।

সোম সাহেবের মেয়ে অঞ্জলি আর ছেলে অনিমেষ, দুজনেই আজ মণিমাসির কাছে একেবারে অজানা জগতের মানুষ-জন নয়। সোম সাহেব ছিলেন রয়াল নেভির একজন অফিসার। মহিমবাবু বলেছেন, তাই জানতে পেরেছেন মণিমাসি, সে-সময়ে সোমসাহেব ছাড়া মাত্র আর তিনজন ইণ্ডিয়ান ভাগ্যবান রয়াল নেভির অফিসার হতে পেরেছিল। জার্মান সাবমেরিনের টর্পেডোতে ঘায়েল হয়ে ব্রিটিশের যে যুদ্ধ-জাহাজটা জিব্রল্টার থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সমুদ্রজলে ডুবে গিয়েছিল, সে যুদ্ধ-জাহাজেই ছিলেন সোম-সাহেব। মারা গেলেন সোমসাহেব।

সোম লজ; গণেশঘাটের কাছাকাছি যে লালরঙা বাংলোর বারান্দায় বসে ব্রহ্মপুত্রের আষাঢ়ে ঢলের শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়, সে-বাড়ি প্রায় পনর বছর ধরে খালি পড়েই ছিল। এক মালী ছাড়া আর কেউ সে-বাড়িতে ছিল না। অঞ্জলি, অঞ্জলির মা, অঞ্জলির ভাই অনিমেষ, সবাই পাটনাতে সোমসাহেবের দাদার বাড়িতে, ব্যারিস্টার পি কে সোমের বাড়িতে থাকতো। রেলওয়ের ইঞ্জিনীয়ার হয়ে যেদিন শিলিগুড়িতে চলে এল অনিমেষ, তার দশদিন পরে অঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জলির মা পাটনা থেকে এসে একসন্ধ্যায় সোম লজে ঢুকলেন, ধূপচন্দন পোড়ালেন, আলো জ্বালালেন।

এমন কিছু পুরনো দিনের ঘটনা নয় যে এরই মধ্যে ভুলে যাবেন মণিমাসি। মাত্র দেড় বছর আগের একটা সকালবেলার ঘটনা। সেদিন শুক্তির সঙ্গে নতুনপাড়ার মীরার বাড়িতে মণি-মাসিও গিয়েছিলেন। শুক্তির নয়, মণি-মাসিরই ইচ্ছে হয়েছিল, গাড়িটা একটু এদিকে-ওদিকে ঘুরে, পদ্মপুকুরের সড়ক ধরে একটু বেড়িয়ে চলে যাক। কিন্তু পদ্মপুকুরের কাছাকাছি এসেই গাড়িটার ইঞ্জিনের শব্দ হঠাৎ থেমে গেল। বেচারা রাজবাহাদুর আধঘণ্টা ধরে ইঞ্জিনের যত কলকব্জা টানাটানি আর ঠোকাঠুকি করে শুধু ঘেমে উঠলো আর হয়রান হলো; কিছুই করতে পারলো না। স্টার্ট নিতেই চায় না গাড়িটা।

এক মহিলা, তাঁর সঙ্গে অল্প বয়সের এক ভদ্রলোক, যাঁরা দুজন চমৎকার দুটি হাসি-মুখ নিয়ে গল্প করতে করতে আর আস্তে আস্তে হেঁটে এদিকে আসছিলেন, তাঁরা এবার গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। শুক্তির কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে মণিমাসি বলেন—নিশ্চয়, দিদি আর ভাই। দেখছিস না, একেবারে একধাঁচের মুখ?

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সেই অল্পবয়সের ভদ্রলোক, রাজবাহাদুরকে কি-যেন জিজ্ঞাসা করলেন। গাড়ির ইঞ্জিনের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে কি যেন দেখলেন। নিজেই হাত চালিয়ে একটা প্লাগকে শক্ত করে কষে বসিয়ে দিলেন। তারপর নিজের হাতেই স্টার্টিং হাণ্ডেলটাকে শক্ত করে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিলেন। গরগর করে গর্জে উঠলো গাড়ির স্তব্ধ ইঞ্জিন।

মণিমাসির দিকে তাকিয়ে আর কালিমাখা হাত তুলে একটা নমস্কার জানিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। সেই মহিলা, যিনি এতক্ষণ সড়কের একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে-ছিলেন, তিনিও চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। কিন্তু মণিমাসি বাধা দিলেন—কে আপনারা? যেচে উপকার করলেন, অথচ একটুও পরিচয় না দিয়ে চলে যাচ্ছেন?

—আমরা গণেশ ঘাটের সোম লজে থাকি।

মণিমাসি চমকে ওঠেন—আপনারা কি সোমসাহেবের ছেলে আর মেয়ে?

—হ্যাঁ, উনি আমার দিদি।

মণিমাসি তা তো দেখেই বুঝেছি। কিন্তু এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

—আজ্ঞে?

গাড়ির ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে সেই মহিলার দিকে তাকিয়ে মণিমাসি বলেন—আমি সোমসাহেবের মেয়েকেও বলছি, এভাবে চলে গেলে তো চলবে না।

এগিয়ে এসে মণিমাসিকে নমস্কার করে হাসতে থাকেন সোমসাহেবের মেয়ে—বলুন, কি করলে চলবে?

মণিমাসি—হয়, আমার সঙ্গে এখনই এই গাড়িতে তোমরা দুজনে আমার বাড়ি যাবে আর চা খাবে। নয়, তোমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে চা খাওয়াবে।

সোমসাহেবের ছেলে আর মেয়ে, দুজনেরই মুখের হাসি এইবার খুশি ফোয়ারার মত উথলে ওঠে।—চলুন, আমাদের বাড়ি চলুন।

অগত্যা, কিছুটা নিজেরই কথার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে জব্দ হয়ে, কিছুটা সোম-সাহেবের ছেলে আর মেয়ের দুটি চমৎকার হাসিমুখ অনুরোধের মায়ায় পড়ে সোম লজে না যেয়ে পারেননি মণিমাসি।

হঠাৎ-ঘটনার মত সোম লজের মা দিদি আর ভাই-এর পরিচয় পাওয়ার সেই প্রথম দিনেই দেখতে পেয়েছিলেন মণিমাসি, সোম-সাহেবের মেয়ে অঞ্জলির মুখের দিকে তাকিয়ে শুক্তি যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। অঞ্জলি যেন একটা ভিন-জগতের বিস্ময়।

কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, একুশ বছর বয়সে বিধবা হয়েছে, আজ চল্লিশ বছর বয়সের কাছে এসে পৌঁছেছে অঞ্জলি। তবু, অঞ্জলির মুখের হাসি দেখলে মনে হবে, যেন ভোরের শিউলি হাসছে। সাদা সিল্কের শাড়ি; সাদা গরদের ব্লাউজ, সাদা ভেলভেটের চটি, হাতঘড়ির ব্যাণ্ডও সাদা। আর মুখের রঙ যেন দুধে ঘষা লালচন্দনের রঙ। অঞ্জলির ঘরের টেবিলে বই-এর পাহাড়; পরলোকের যত কাহিনীর বই।

মণিমাসি একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও শুনতে পেয়েছিলেন, অঞ্জলি বলছে—আমার মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকতে নেই, শুক্তি। বেশি কাছে আসতেও নেই। আমি হলাম সেই ওই ওদের মত, যাদের শরীর হয় কিন্তু ছায়া হয় না।

বোকার মত তাকিয়ে বিড়বিড় করে শুক্তি—তা কি কখনও হয়? হতে পারে না, অসম্ভব।

অঞ্জলি হাসে।—হতে পারে। হয়ে থাকে। ওরা শুধু চোখের একটি দৃষ্টি দিয়ে পুকুরের জল শুষে নিতে পারে। ফুল-গাছের দিকে তাকালে সেই মুহূর্তে গাছ শুকিয়ে যায়, টুপটুপ করে সব ফুল ঝরে পড়ে যায়।

হেসে ফেলে শুক্তি—বুঝলাম, আপনি আমাকে কুঞ্জার মত একটা বোকা খুকী মনে করেছেন, আর তামাসা করে ভয় দেখাচ্ছেন। আমি কিন্তু ভীতু মেয়ে নই, অঞ্জলিদি।

কিন্তু মণিমাসিকে বাড়ি ফেরার তাড়া দেবার জন্য পাশের ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, অঞ্জলিদির মা কথা বলছেন—আমার ওই একুশ বছর বয়সের বিধবা মেয়েকে ডাইনি বলে গালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলেন মেয়ের শাশুড়ি, শিক্ষিতা এম-এ পাস করা শাশুড়ি। একেবারে শূন্য হয়ে, এক-কাপড়ে আমার কাছেই ফিরে এল মেয়ে। মেয়েটা ওর স্বামীর একটা ফটোও সঙ্গে আনতে পারেনি, মেয়ের হাত থেকে ফটোটাকে কেড়ে নিয়ে-ছিলেন ওর শাশুড়ি।

কিন্তু শুক্তির ওই মুগ্ধ চোখের করুণ আবেদন ব্যর্থ হয়নি। শুক্তির ভয়ানক অনুরোধের জেদ রক্ষা করতে গিয়ে অঞ্জলি

অনেকবার এই বাড়িতে, রবার বাগানের এই ভারতীতে এসেছে, বসেছে, হেসেছে। কিন্তু শান্তির সঙ্গে দু-চারটে কথা বলাবলি করে, আর পাঁচ মিনিটও পার না হতেই চলে গিয়েছে।

অঞ্জলির সঙ্গে অঞ্জলির ভাই অনিমেষও এবাড়িতে এসেছে। ঘরের ভিতরে বসে শান্তির সঙ্গে কথা বলতে অঞ্জলির যে-টুকু সময় লাগতো, সেটুকু সময় বাইরের বারান্দার এদিকে-ওদিকে আস্তে আস্তে হাঁটাহাঁটি করেই পার করে দিত অনিমেষ। বার বার বলে অঞ্জলিকে ধরে রাখতে না পেরে শান্তি এক-একদিন অনিমেষের দিকে তাকিয়ে, আর বেশ একটু ক্ষুব্ধ স্বরেই বলে ফেলতো—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চললেন, এটা কিন্তু একটুও ভাল দেখাচ্ছে না।

অনিমেষ হাসে—আমার তো ইচ্ছা, আরও কিছুক্ষণ থাকি। কিন্তু......।

হেসে হেসে এত মনখোলা ভাষায় একটা কথা বলে দিয়েও অনিমেষ যেন আরও একটা কথাকে মনচাপা দিয়ে রেখে দিল।

একদিন মণিমাসি আর অঞ্জলির সামনেই অনিমেষ ছেলেটা কত সহজে ওর মনচাপা কথাটাকে স্পষ্ট করে বলে দিয়ে হেসে উঠলো—আমি একা এলে নিশ্চয় আরও কিছুক্ষণ থাকতাম।

অঞ্জলিও হাসে।—তা...এলেই পারেন, কে বারণ করছে?

সেবার শান্তির কলকাতা চলে যাবার আগে হঠাৎ একদিন একাই এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসির সঙ্গে শুধু একটি কথা—কেমন আছেন? শান্তির সঙ্গেও শুধু একটি কথা—কলেজ খুলছে কবে? এ ছাড়া আর কোন কথা বলেনি অনিমেষ। শুধু শান্তির মেসো মহিমবাবুর সঙ্গে বাইরের ঘরে বসে প্রায় আধঘণ্টা ধরে অনেক কথা আলাপ করে চলে গেল অনিমেষ।

কিন্তু কলকাতা রওনা হবার আগের দিনে শান্তি কি ওর বিস্ময়ের সেই অঞ্জলিদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে যায়নি? গিয়েছিল। সেখানে অঞ্জলি ছাড়া কি আর কারও সঙ্গে কথা বলেনি শান্তি? বলেছিল। সোম লজের বারান্দাতে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সে-সন্ধ্যায় শুধু কি ব্রহ্মপুত্রের জলের শব্দ শুনে চলে এসেছিল শান্তি? আর কারও কথা শোনেনি? শুনেছিল।

মণিমাসিই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ফিরতে এত দেরি কেন হলো রে, শান্তি?

শান্তি—অনিমেষবাবুর জন্যে।

মণিমাসি—কেন? তার মানে?

শান্তি হাসে—অনিমেষবাবুর গল্প বলা আর ফুরোতে চায় না।

—কিসের গল্প।

—যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প।

—পরলোকের গল্প?

—না না। ওসব কিছু নয়। ইহলোকেরই গল্প।

—তার মানে?

—এই তেজপুরের যত পাহাড় বন নদী আর মন্দিরের গল্প। এটাই নাকি শোণিতপুর, বাণরাজার রাজধানী।

—অনিমেষ তো ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। ওর মনে আবার এসব গল্পের মায়া কেন?

—আমিও অনিমেষবাবুকে এই কথা শুনিয়ে দিয়েছি।

—কি শুনিয়েছিস?

—বলেছি, আপনি ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে, একজন বেদব্যাস হলেই পারতেন।

সেবার, সেদিনের শান্তির মুখের কথা শুনে মণিমাসি হেসেছিলেন। কিন্তু তারপর আর ঠিক ওভাবে হাসতে পারেননি, বরং একটু গম্ভীর হয়ে ভেবেছিলেন।

কলেজের ছুটির পর আবার কলকাতা থেকে যেদিন তেজপুরে ফিরে এল শান্তি, সেদিনই সন্ধ্যাবেলা অনিমেষকে এবাড়ির বারান্দার একটা চেয়ারে বসে থাকতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলেন মণিমাসি। শান্তি

বাড়িতে নেই; তবু শক্তির অপেক্ষায় বসে আছে অনিমেষ।

অনিমেষের হাসিমুখের একটা খুশিভরা কথা শুনে আরও একটু চিন্তিত হন মণিমাসি। অনিমেষ বলে—আমিও আজ শিলিগুড়ি থেকে ফিরেছি।

মণিমাসি—খুব ভাল; তোমাকে দেখে খুব সুখী হলাম। চা খাবে নিশ্চয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—শক্তি কোথায় যেন গিয়েছে, বোধহয় কোলিবাড়িতে ওর বান্ধবীর সঙ্গে একবার দেখা......।

—হ্যাঁ, আপনাদের বেয়ারা বলেছে, দিদি এখন বাড়িতে নেই।

শক্তির বাড়ি ফিরতে আর কত দেরি হবে, কে জানে? চা খাওয়া হয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ বসে রইল অনিমেষ। তারপর চলে গেল।

দেখতে ভুল হয়নি মণিমাসির, অনিমেষ এসেছিল শুনেই কেমন-যেন আনমনার মত চোখ করে দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল শক্তি। রাত আটটার শব্দ বাজিয়ে দিয়ে ঘড়ির বড় কাঁটা নামতে শুরু করেছে—টিক্ টিক্! টিক্ টিক্! মেয়েটাও যেন ওর বুকের ভিতরের একটা শব্দকে শুনছে আর গুনছে।

শক্তিকে নিয়ে যাবার জন্য চা-বাগানের গাড়ি এল যেদিন, সেদিনও আবার এসেছিল অনিমেষ। মণিমাসি শুনতে পেয়েছিলেন, বাইরের ঘরে অনিমেষের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে শক্তি—আমি সেদিন বাড়িতে ছিলাম না বলে আপনি কিছু মনে করেননি তো?

—না না, মনে করবার কি আছে? আমি তো জানতামই যে, আপনি বাড়িতে নেই; তবু ইচ্ছে করে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। তা ছাড়া, তখন টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছিল।

—তাই বলুন। বলতে গিয়ে শক্তির গলার স্বরটা যেন একটা হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

না, সেদিন আর নেই, যেদিন মণিমাসির ধারণা হয়েছিল যে, শক্তি শুধু ওর বিস্ময়ের এক অঞ্জলিদিকে দেখবার জন্য গণেশ ঘাটের সোম লজে যায়। শক্তির কলকাতার কলেজের যখন ছুটি শুরু হয়, ঠিক তখনই শিলিগুড়ি থেকে রেলের ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষও ছুটি নিয়ে তেজপুরে চলে আসে, এটাও কি দুটো ছাড়া-ছাড়া হঠাৎ-ঘটনার মিল? নয় বোধহয়। মণিমাসি অনেকবার ভেবেছেন, এখনই চিঠি দিয়ে কিরণদিকে স্পষ্ট করে কিছু বলা উচিত হবে কিনা?

[পাঁচ]

—কানুছা! ডাক দিলেন সোম লজের অঞ্জলি।

সোম লজের বাচ্চা নেপালী চাকর; কথাটা না শুনে শুধু ডাক শুনেই কাজ করতে ছুটে যাওয়া ওর অভ্যাস। ছুটতে গিয়ে বার বার হোঁচট খাওয়া, আর মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়াও ওর অভ্যাস। দিগ্বিদিক বুঝবার কোন ধার ধারে না কানুছা।

এ-হেন এক কানুছা ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢোকে, আর জলভরা একটা কাঁচের গেলাসকে টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে অঞ্জলির ঘড়িটারই উপর ধুপ করে বসিয়ে দেয়।

গেলাসটা ঝনঝন করে দশ টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। গুঁড়ো হয়ে গেল অঞ্জলির ঘড়ির কাঁচ।

চমকে ওঠে শক্তি—এ কি!

কিন্তু অঞ্জলি হাসেন—আমি জল চাইনি, কানুছা। চাইছিলাম...থাক্, তুমি যাও।

শক্তি আশ্চর্য হয়; এমন একটা কাণ্ড দেখেও অঞ্জলিদি একটুও রাগ করতে পারলেন না। অঞ্জলিদির প্রাণটা কি রাগ করতেই ভুলে গিয়েছে?—সত্যি অঞ্জলিদি, আপনি কারও ওপর একটুও রাগ করতে পারেন না কেন, বলুন তো?

অঞ্জলি—পারি; শুধু একজনের ওপর। সে ছাড়া আর কারও ওপর আমার রাগ নেই।

শক্তি—জিজ্ঞেস করলে বলবেন কি, কে সে?

অঞ্জলি—সে হলো সে, যার সঙ্গে উনিশ বছর আগে শেষ দেখা হয়েছিল।

শুনে খুশী হয় না শক্তি। এটা আবার কী এমন নতুন কথা বলছেন অঞ্জলিদি। অঞ্জলিদির মা'র মুখ থেকে মণিমাসি তো কবেই শুনেছেন, উনিশ বছর বয়সে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন অঞ্জলিদি, তার এক বছর পরেই সায়েন্সের এক ডক্টরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। খুব ভালমানুষ ছিলেন সেই ডক্টর বিনয় সেন। অঞ্জলিদিকে ফরগেট-মি-নট বলে ডাকতেন।

অঞ্জলি বলেন—অনু আমার চেয়ে বারো বছরের ছোট। সেদিন আমার সেই ছোট্ট ভাই অনুও আমাকে কাঁদতে দেখে কেঁদে ফেলেছিল—আমার যে বিনয়দার ওপর ভয়ানক রাগ হচ্ছে, দিদি।

শক্তির মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। শুনতে ভাল লাগে না এসব কথা। কিন্তু অঞ্জলিদির মুখের হাসিটা যেন ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপছে। বুঝতেও পারা যায় না, কোন্ দিকে তাকিয়ে কী দেখছেন।

আবার, কথাও বলছেন অঞ্জলিদি।—দেখা তো হবেই একদিন। তখন জিজ্ঞাসা করবো, ফরগেট-মি-নট মানে কি ডাইনি?

একটা শনশনে হাওয়া জানালার পর্দা ফাঁপিয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকছে। অঞ্জলিদির সাবানঘষা মাথার চুল এলোমেলো হয়ে ফুরফুর করে উড়ছে।

অঞ্জলিদি! ডাকতে গিয়ে শক্তির গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

অঞ্জলি হাসেন—হ্যাঁ শক্তি; আমার গল্প শুনতে নেই। বরং...।

বরং, অন্যের গল্প শুনে বাড়ি চলে যাও, এই তো বলতে চাইছেন অঞ্জলিদি। কিন্তু অনিমেষবাবুর গল্পের কাছেও যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যায় না। বেশ ভয় ভয় করে। তা ছাড়া, নতুন করে আর কি-ই বা বলবেন অনিমেষবাবু? সেই তো যত সব... এই তেজপুরের গল্প।

তেজপুরই বা কেমনতর একটা জায়গা? বাণ রাজার মেয়ে ঊষা এখানে স্নান করতেন, ওখানে ফুল তুলতেন, সেখানে বসে থাকতেন। আর, অনিরুদ্ধ এসে ঊষার জন্যে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, ওখানে ছুটে যেতেন, সেখানে বসে ছটফট করতেন। না, ওসব গল্পের ঘাট পাহাড় আর কুঞ্জবন, পাথরের মূর্তি আর ভাঙা মন্দির দেখবার জন্যে শক্তির প্রাণে কোন সাধ নেই।

না, অবজারভেটরি হিলের মাথায় দাঁড়িয়ে নেফা-পাহাড়ের উত্তরে স্নো-লাইনের ফিকে ছবি দেখতেও ইচ্ছে করে না। ব্রহ্মপুত্রের চরের শরবন আর ধানক্ষেতের উপর বিকেলের রোদের খেলা দেখবারও ইচ্ছে নেই। অনিমেষবাবু নিজে একাই গিয়ে ওসব মায়াময় শোভা দু-চোখ ভরে দেখে আসুন না কেন?

সোম লজের বারান্দাটা সিঁড়ির রেলিং ডিজাইনের গ্রিল দিয়ে ঘেরা; তার উপর চকচকে সোনা-রঙের পেন্টের প্রলেপ। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, যেন একটা সোনার খাঁচা হাসছে। অঞ্জলিদির ঘর থেকে বের হলেই ওই বারান্দা চোখে পড়ে; একটু চমকে উঠতে হয়; একটু থমকে দাঁড়াতেও হয়। কতবার মনে হয়েছে, দম বন্ধ করে, আর, একটা দৌড় দিয়ে বারান্দাটা পার হয়ে গেলেই তো ভাল। কোথাও না থেমে, একেবারে সোজা হেঁটে গিয়ে আর গাড়ির ভিতরে ঢুকে বলে ফেললেই তো হয়—চল রাজবাহাদুর। শিগগির চল।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত বিপদ! ইচ্ছে করলেও ওভাবে চলে যাওয়া যায় না। বারান্দার একটা চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে আর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। যেন শক্তির পায়ের শব্দ শোনবার জন্য একটা অপেক্ষার ধ্যান দাঁড়িয়ে আছে। কোনদিনও কি একটুও ভুল হলো অনিমেষবাবুর? না কোনদিনও না। বৃষ্টির ঝাপটায় বারান্দা ভিজে গেলেও যেমন, আর ফুটফুটে চাঁদের আলো বারান্দায় গড়িয়ে পড়লেও তেমন, ভদ্রলোক ঠিক ওখানে চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকবেন।

এরকম করে যদি জাগা চোখে স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন অনিমেষবাবু, তবে দেখুন না কেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য শক্তিকে আটক করে থামিয়ে রাখার কি দরকার?

কে জানে, আজ আবার কিসের গল্প বলবার জন্য তৈরী হয়েছেন অনিমেষবাবু!

না, আজ আর সময় নেই। গল্প শোনা সম্ভব হবে না। দু মিনিটের জন্য হলেও না। না, আর কিছু শোনবার দরকার নেই।

এগিয়ে যায় শুক্তি, বারান্দায় উঠেও থামে না। হেঁটে যেতে যেতে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে শুধু ছোট্ট একটি কথা বলে নেয়—চলি আজ।

অনিমেষ—যাচ্ছেন? আচ্ছা আসুন।

থমকে দাঁড়ায় শুক্তি। হেসে হেসে কথা বলেছে অনিমেষ, কিন্তু গলার স্বর যেন একটা করুণ আপত্তির মৃদু গুঞ্জন। কত শান্ত আর সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুক্তিরই দিকে তাকিয়ে আছে অনিমেষ।

অনিমেষের দিকে না তাকিয়ে, শুধু দূরের সড়কের একটা গাড়ির হেড লাইটের ছুটন্ত আলোর ছটার দিকে তাকিয়ে কথা বলে শুক্তি।—মনে হচ্ছে, আপনি যেন কেমন একটু রাগ করে কথাটা বললেন।

অনিমেষ—হ্যাঁ।

শুক্তির চোখের পাতা শিউরে ওঠে। বুকের ভিতরে শব্দ হয়। রুমাল তুলে কপালের ঘাম মুছতে গিয়ে হাতটাও কাঁপে।

ভয় করছে? হ্যাঁ, অনেক বছর আগে ঠিক এই রকম একটা ভয় পেয়ে মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল শুক্তির। শিলংয়ের সেই ঝর্নার শব্দের প্রতিধ্বনিটা পাইনবনের বাতাসে একবার করুণ হয়ে মিলিয়ে আর ফুরিয়ে যায়; আবার হঠাৎ গুমরে ওঠে। শুনতে ভয় করে বইকি।

কথা বলে না শুক্তি। কিন্তু অনিমেষ বলে—আপনি আমার একটাও অনুরোধের কথা শুনলেন না।

শুক্তি হাসতে চেষ্টা করে।—তাতে কি হয়েছে?

অনিমেষ—কিছু হয়েছে বইকি।

শুক্তি—কী যে বলেন! ভৈরবী পাহাড়ের গুলঞ্চ পিয়াল আর নাগকেশরের ছায়াতে বসে পাখির ডাক না শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?

উত্তর দেয় না অনিমেষ। কিন্তু অনিমেষের চোখ দুটো তেমনই খুশি হয়ে শুক্তির মুখের দিকে অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

হেসে ফেলে শুক্তি—এই তো, এখানে আপনার কাছেই দাঁড়িয়ে গল্প করছি। বাইরে গিয়ে গল্প না করলেও চলে।

অনিমেষ—বাগানে যাচ্ছেন কবে? দিন ঠিক করেছেন?

শুক্তি—না। আচ্ছা, চলি এবার।

এইবার সত্যিই প্রায় একটা দৌড় দিয়ে ছুটে চলে যায় শুক্তি। রাজবাহাদুরও গাড়ি স্টার্ট করতে দেরি করে না। স্টেশন ক্লাবের পাশের সড়কের অন্ধকারের কাছে গাড়িটা পৌঁছে যেতেই হাঁপ ছাড়ে শুক্তি।

অদ্ভুত মানুষ এই অনিমেষবাবু। কি একটা রূপকথার জগৎ? মানে কিংবা মুখের ভাষাতে কোন লজ্জা না রেখে ভদ্রলোক একদিন কত স্পষ্ট করে সত্যি বলেই দিলেন, হ্যাঁ তাই। একবার জিজ্ঞেস করলে হতো, শুক্তি বসু যদি তেজপুরের আর না আসে, তবুও কি আপনি এই তেজপুরকে একটা রূপকথার জগৎ বলে মনে করতে পারবেন?

একটুও ভাবলেন না, একটু বুঝেও দেখলেন না অনিমেষবাবু; আবার একদিন কত স্পষ্ট করে একটা ভয়ানক কথা বলেই ফেললেন—আপনি তো এখনও কিছু বলছেন না।

সেদিন চুপ না করে থেকে বলে দিলেই হতো—বিশ্বাস করুন, এখানে এই বারান্দার আলোর কাছে দাঁড়িয়ে আপনার গল্প শুনতে ইচ্ছে করে, ভালও লাগে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারবো না, বলতে পারি না। আপনি জিজ্ঞেসও করবেন না।

—নামুন দিদি, বাড়ি তো পৌঁছে গিয়েছি। রাজবাহাদুর ডাক দিল বলেই চমকে ওঠে শুক্তি, চোখ মেলে তাকায়। গাড়ি থেকে নেমে যায়।

মণিমাসি বলেন—বাড়ি ফিরতে এত দেরি করলি কেন?

শক্তি—বাগানের গাড়ি কবে আসবে আমাকে নিতে?

মণিমাসি—আসছে সোমবারে আসবে?

শক্তি—তার মানে আরও সাতদিন পরে।

—হ্যাঁ।

—না মণিমাসি। তোমার গাড়িতেই আমাকে বাগানে পাঠিয়ে দাও।

—দেব।

—কালই সকালে।

—না, কখখনো না। আমাকে রাগাবি না! সাবধান।

—রাগ না মণিমাসি, আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে কালই সকালে যেতে হবে।

—কেন?

—দরকার আছে, তুমি বিশ্বাস কর।

—বেশ।

—একটা কথা। সোম লজের কেউ যদি আসেন, অঞ্জলিদি কিংবা অনিমেষবাবু, তবে বলে দিও, আমাকে হঠাৎ দরকারে চলে যেতে হলো, যেন কিছু না মনে করেন।

—তাই বলবো। কথাটা বলেই গম্ভীর হয়ে যান মণিমাসি।

ভাবতে ভাল লাগে না মণিমাসির, বোধ হয় একটা সন্দেহও করছেন যে, শুক্তি যেন নিজেরই ইচ্ছেটার হাত থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে যেতে চাইছে। কিন্তু কি দরকার? অনিমেষ তো খুবই ভাল ছেলে।

দুঃখ করে একটা কথা বলেছিলেন কিরণদি, মেয়েটা যেন পাখির স্বভাব পাওয়ার অভ্যাস। আজ কলকাতা, কাল তেজপুরে, পরশু চা-বাগান; এই করে করেই বোধ হয় মেয়েটা এরকমের একটা উড়ো-উড়ো ছটফটানির মন পেয়েছে। কিন্তু মানুষের জীবনে তো পাখির স্বভাব খাটে না।

চেয়ারটার উপর একটা ক্লান্ত-শ্রান্ত চেহারা নিয়ে চুপ করে বসে আছে শুক্তি। চোখ দেখে মনে হয়, দেয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দের টোকাগুলিকে মনে মনে গুনছে।

না না, শিকলি-কাটা মন নয়। যা কল্পনা করছেন মণিমাসি, তাই বোধ হয় ভাবছে শুক্তি। একটু স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে আরও নিশ্চিন্ত হতেন মণিমাসি। তাই জিজ্ঞেস করেন—কিন্তু তুই কি ওদের কারও ওপরে রাগ করে......।

হেসে ফেলে শুক্তি।—কী যে আবোল-তাবোল সন্দেহ করছো মণিমাসি! কোন মানুষে কখনও অঞ্জলিদির মত মানুষের ওপর রাগ করতে পারে না।

মণিমাসি—আমি বলছি, হয়তো অনিমেষের ওপর রাগ করে......।

হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শুক্তি—অনিমেষবাবুর মত মানুষের ওপর আমি রাগ করবো? কখখনো না।

মণিমাসি ব্যস্ত হয়ে হাঁক-ডাক করেন—ও কালোর মা, শুক্তিকে খেতে দিতে আর দেরি করো না।

[ছয়]

নেফার পাহাড়ের ওই মেঘ যেন ঘন-ঘোর এক খেয়ালের প্রহেলিকা। মতিগতির কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। গালে গিয়ে ক্ষয় হতে হতে উপরে উঠতে থাকে; আবার কখনও বা নীচে নেমে যায়। হঠাৎ আবার বিনা ঝড়েই পাহাড়ের গা থেকে যেন আলগা হয়ে খসে পড়ে আর এদিকের আকাশে ভেসে আসে। সমতলের ধানক্ষেতের বুকের উপর কালোছায়া ছড়িয়ে দিয়ে চলে যাবার সময় কদমবাড়ি চা-বাগানের উপর এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয়। গগন বসু আজ এই কদমবাড়ি চা-বাগানের বারো আনা মালিক।

বয়সটা সত্তর না হোক, পঁয়ষট্টি বছরের কম হবে না। কিন্তু গায়ে চকোলেট রঙের সিল্কের গেঞ্জি, পরনে সাদা জিনের হ্রস্ব হাফ-প্যাণ্ট, পায়ে ছোট মোজা; এক হাতে ফেল্টের হ্যাট, আর-এক হাতে তামাকের পাইপ; গগন বসুকে তাই চিনে নিতে কারও অসুবিধে নেই যে; উনি একজন প্ল্যাণ্টার সাহেব।

গগন বসুর স্ত্রী, প্রায় ষাট বছর বয়সের কিরণলেখাকে দেখলে মনে হতে পারে, উনি একজন শাড়িপরা মেমসাহেব; এমনই ধবধবে ফরসা ও'র গায়ের রঙ। আজকাল

কত শান্ত আর সুস্থির হয়ে শুক্তিরই দিকে তাকিয়ে আছে অনিমেষ

মাসের মধ্যে অন্তত একবার, তেজপুরের সড়ক ধরে ছুটে চলে যাচ্ছে ঝকঝকে চেহারার একটি মোটরগাড়ি; গাড়িতে প্ল্যান্টার সাহেব গগন বসুর গা-ঘেঁষে বসে একটা চণ্ড বলিষ্ঠ চেহারার বুলডগ মুখ বাড়িয়ে রয়েছে, আর পথের যত মানুষের ভিড়কে ধমক দিয়ে দিয়ে দুরন্ত এক রাগের ডাক ডেকে চলে যাচ্ছে। গগন বসুর স্ত্রীও সেই গাড়িতে বসে আছেন; নতুন প্যাকেট ছিঁড়ে বিস্কুট বের করে বুলডগের মুখের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন।

পঁচিশ বছর আগে, মধ্যপ্রদেশের এক দেশী রাজার ট্রেজারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে গগন বসু যেদিন এখানে এসে কদমবাড়ি চা-বাগানের এই সুন্দর সাহেবকুঠির লনের উপর একটি চেয়ার পেতে আর শক্ত হয়ে বসেছিলেন, সেদিন তিনি ছিলেন এই চা-বাগানের চার-আনা মালিক। ওই চার-আনা স্বত্ব গগন বসুর বাবা কান্তি বসুর উইলের দান। একমাত্র ছেলেকে তিনি এর চেয়ে বেশি কিছু দিয়ে যেতে পারেননি। শেষ বয়সে কান্তি বসু আর এদেশে ছিলেন না। তিনি লণ্ডনেই ছিলেন, আর, ত্রিশ বছর আগে সেখানেই মারা গিয়েছেন। গগন বসুর বিদেশিনী সৎ-মা রেবেকা বসুও আজ প্রায় বিশ বছর হলো লণ্ডনে মারা গিয়েছেন।

সেই কঠিন মামলাতে শেষ পর্যন্ত গগন বসু জয়ী হয়েছিলেন। রেবেকা বসুর ছয় আনা স্বত্ব গগন বসুরই স্বত্ব হয়ে গেল। রেবেকা বসুর দুই ভাইপো, দুই পিটার্স ভ্রাতা, আর্নল্ড আর আর্থারের দাবি সে মামলায় মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল। দুই-আনা স্বত্বের মরিসও দশ বছর আগে হঠাৎ একদিন লণ্ডন থেকে এসে, আর, গগন বসুর কাছে স্বত্ব বিক্রী করে দিয়ে চলে গেলেন।

বার-আনা মালিক গগন বসু আজও এখনও পুরনো অভ্যাসের নিয়মে কদমবাড়ি চা-বাগানের তার-কাঁটার বেড়ার ওদিকে, উঁচু টিলার উপর এই সাহেবকুঠির বারান্দায় বসে লাভের হিসাবের খাতা পরীক্ষা করেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, ম্যানেজার, ডাক্তার, এমন কি বাগানবাবুও গগন বসুর চোখের সামনের চেয়ারগুলিতে বসে থাকেন।

আজকের এই গগন বসু নিশ্চয় দশ বছর আগের সেই গগন বসু নন। তা না হলে কি, বাগানবাবু কোন্ ছার, ম্যানেজারও কি গগন বসুর চোখের সামনে চেয়ারের উপর বসতে পারতেন, বসবার সাহস পেতেন?

যে গগন বসু একদিন তেজপুরে বাজারে গিয়ে অনেক খোঁজ করেও তাঁর কুকুরের

জামার জন্য পছন্দসই ফ্লানেল না পেয়ে দোকানের লোকগুলিকে কুকুরের চেয়েও অধম জীব বলে মনে করেছিলেন, আজকের এই গগন বসু ঠিক সেই গগন বসু নন।

যে গগন বসু একদিন চা-বাগানের মেশিন ঘরের সামনে মজুর আর কামিনদের একটা হল্লার শব্দ শুনে গুলীভরা বন্দুক হাতে তুলেছিলেন, সেই ভয়ানক কড়া মেজাজের গগন বসু আজ বেশ শান্ত হয়ে বসে শুনতে পারেন, শুনেও বেশ শান্ত হয়ে থাকতে পারেন, অফিসঘরের দরজা আটক করে আর হল্লা করে কেরানীবাবুকে শাসাচ্ছে আর ভয় দেখাচ্ছে মদে মাতাল একদল মজুর।

এই যে, দুলাল দত্ত নামে একজন মানুষ, গগন বসুরই এক কুটুম্বজন, যাঁর বয়স তাঁর চেয়ে চার বছরের ছোট, আজ এখন চেঁচিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে গদি-আঁটা চেয়ারের উপর পা তুলে দিয়ে বসলেন, তাঁর সঙ্গে দশ বছর আগে কি কখনও হেসে হেসে কথা বলেছেন গগন বসু? কখনও না। দুলাল দত্তকে চোখে পড়তেই কিরণলেখাকে ডাক দিয়ে, আর দুই চোখে দুটি কঠিন অপ্রসন্নতার ভ্রূকুটি নিয়ে আদেশ করতেন গগন বসু—তোমার ওই বিচিত্র মেজদাটিকে ওদিকেই থাকতে বল; আমার কাছে যেন না আসে।

আজ আর সেদিনের মত পাইপ দাঁতে চেপে, একটা শক্ত তৃপ্ত আর উদাত্ত আত্মশ্লাঘা হয়ে কিরণলেখার কাছে সে-কথা বলেন না, বলতে পারেনও না গগন বসু, যে-কথা আট বছর আগেও একবার বলেছিলেন।—এই দুলাল দত্ত লোকটার জীবনের সবই যেমন একটা ষোল-আনা ব্যর্থতা, আমার জীবনের সবই তেমনই, অন্তত বারো-আনা তো সফলতা। বাগানের আর চার-আনা স্বত্ব ছেড়ে দিতে জনসনকে রাজি করাতে বড় জোর আর-একটা বছর লাগবে।

আজ বরং দুলাল দত্তের মুখের ওই হো-হো হাসির সামনে গগন বসুর মুখের হাসিটা বেশ একটু করুণ হয়ে চুপসে যায়। কারণ, জানা আছে গগন বসুর, সব কথার আগে যে কথাটা চেঁচিয়ে বলবেন এই লোকটি; বয়সে কিরণলেখার চেয়ে মাত্র সাড়ে সাত মাস বড়, কিরণলেখারই জেঠতুতো দাদা, মেজদা, এই দুলাল দত্ত।—অঞ্জনার খবর কি? অর্চনা কেমন আছে?

অঞ্জনা আর অর্চনা, গগন বসুর বড়মেয়ে আর মেজ মেয়ে, দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। দশ-বছর আগে অঞ্জনার, আট বছর আগে অর্চনার। অঞ্জনা আর অর্চনা, দুই মেয়ের একজনও আর বোধহয় এই কদম-বাড়িতে বাপ-মায়ের কাছে মুখ দেখাতে আসবে না; সাংঘাতিক অভিমানে আহত দুটি মুখ। ছয় বছর আগে দুই মেয়ের হাতের লেখা সেই চিঠি দুটো শেষ চিঠি হয়ে গগনবাবুর টেবিলের দেরাজের ভিতরে পড়ে আছে। কিন্তু দেরাজটা কাঠের তৈরী না হয়ে পাঁজরের তৈরী হলে এতদিনে বোধহয় গুঁড়ো হয়ে যেত। অঞ্জনার চিঠি আর অর্চনার চিঠি, দুই চিঠিরই ভাষা প্রায় একরকমের।—ভালই তো আছি। ভালই থাকবো। বলতে পারি না, কদমবাড়ি কবে যাব।

ঘর-বর সবই নিজে পছন্দ করেছিলেন গগন বসু। নিজেই খোঁজ নিয়ে সব জেনে নিয়েছিলেন। নিজেই গিয়ে সবই চোখে দেখেছিলেন। যেমন দিল্লীর সুকমল, তেমনই নাগপুরের প্রভাত; দুই ছেলেরই রূপে-গুণের মধ্যে তিনি তাঁরই আশার দুটি আইডিয়াল ছেলের জীবনের পরিচয় পেয়েছিলেন। যথেষ্ট সম্পত্তি আছে, ভাল সার্ভিসে আছে, বিদ্যা আছে; আর কি চাই? কালচার ভাল, স্টেটাস ভাল, প্রেস্টিজ ভাল; এমন দুই ফ্যামিলির দুই ছেলে। খুশি হয়ে দুই মেয়ের বিয়ে দিলেন গগনবাবু। দিল্লীর ডাক্তার সুকমলের সঙ্গে অঞ্জনার; নাগপুরের মিল ম্যানেজার প্রভাতের সঙ্গে অর্চনার।

কিন্তু অঞ্জনা এখন মীরাটের এক মেয়ে-স্কুলের টিচার, পঁচাশি টাকা মাইনে পায়। মেয়ে-স্কুলের হোস্টেলেই থাকে অঞ্জনা। আর, অঞ্জনার স্বামী সুকমল থাকে দিল্লীতেই; একটি ফিরিঙ্গি নার্স মেয়ে এখন তার ঘরোয়া জীবনের বে-আইনী সঙ্গিনী।

অর্চনা তার স্বামীর ঘরেই আছে; মাতাল মিল-ম্যানেজার প্রভাতের হাতের চাবুকের একটা মারের দাগ কপালে নিয়ে অর্চনা বেঁচেই আছে। ম্যানেজার ব্যানার্জীকে নাগপুরে একবার পাঠিয়েছিলেন গগন বসু। দেখে এসেছেন ব্যানার্জী, ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারের উপর চুপ করে বসে একটা ছেঁড়া তোয়ালে সেলাই করছে অর্চনা। চোখের কোণে কালি, ঘুম হয় না মেয়েটার। হাত দুটো শুকনো রোগা কাঠ-কাঠ রগ দেখা যায়। অর্চনা হেসেছে—বাবাকে বলবেন, ভালই আছি।

একদিন মাঝরাতে হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, আর মাথাটাকে দুহাত দিয়ে যেন শক্ত করে খিমচে ধরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু—আমি কি তাহলে একটা অপয়া, একটা জঘন্য আহাম্মক? দুলাল দত্তের চেয়ে দশগুণ আনফরচুনেট জীব? শুনছো কিরণ, কি বলছি আমি?

কিরণলেখা শুধু কেঁদেছিলেন; কোন জবাব দিতে পারেন নি।

চোখ-মুখ আর মাথা ধুয়ে, আর এক গেলাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে নিয়ে, খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস ছেড়েছিলেন গগন বসু; যেন নিদারুণ এক ক্লান্ত মানুষের নিঃশ্বাস।—শুক্তির বিয়ের জন্য আমাকে কিন্তু চেষ্টা করতে বলবে না কিরণ, কখনও না, সাবধান। আমি পারবো না। আমি মানুষ চিনতে জানি না।

—কবে এলেন? কখন্ এলেন দুলাল মামা? হেসে চেঁচিয়ে আর লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে আসে শুক্তি। ধড়াস্ করে একটা চেয়ারকে কাছে টেনে নিয়ে বসে পড়ে। তখুনি আবার চেঁচিয়ে ডাকতে থাকে—আমার চা এখানে পাঠিয়ে দাও, মা। আমি এখন দুলাল মামার গল্প শুনবো।

গগনবাবুও হাসেন—বলুন স্যার মেজদা; এবার আপনার রাজ্যি থেকে কী রত্ন নিয়ে এলেন।

দুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে হাসতে থাকেন।—এনেছি একটা ধনেশ।

—কই কই? চেঁচিয়ে ওঠে শুক্তি।

কিরণলেখা আসেন। চায়ের কাপ শুক্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েই বলেন—লাফাসনি শুক্তি। একটু শান্ত হয়ে বস। গল্প শোন।

আজই এসেছেন দুলাল মামা; কালই চলে যাবেন। এইরকমই তাঁর আসা-যাওয়ার রীতি। যখনই আসেন, তখনই তাঁর জীবন ও জীবিকার জংলী রঙ্গভূমি ওই নেফা রাজ্যেরই একটা-না-একটা প্রাণের নমুনা সঙ্গে নিয়ে আসেন। আজ নিয়ে এসেছেন, একটা ধনেশ পাখি। এর আগে একবার এনেছিলেন, একটা সাদা ময়ূরের বাচ্চা। একবার একটা রঙীন বনবিড়াল। আরও কত কি এনেছেন, তার হিসাব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন।

কিন্তু এবাড়ির সকলেরই জানা আছে, কাল যখন আবার তাঁর নিজের রাজ্যে রওনা হবেন দুলাল দত্ত, তখন ধনেশ পাখিটাকে সঙ্গে নিয়েই চলে যাবেন। সাদা ময়ূরের বাচ্চা, রঙীন বনবিড়াল, আর পোকা-মাকড় যা-কিছুই সঙ্গে এনেছিলেন, সবই আবার সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছেন। কিছুই রেখে যাননি। কিরণলেখা জানেন, তাঁর এই মেজদার মাথায় একটু ছিট আছে।

বিয়ে করেননি দুলাল দত্ত। তিনি একা মানুষ। সেই কবে, ত্রিশ বছর আগে, দুলাল দত্তের বয়স যখন ত্রিশ বছরের বেশি নয়, তখন দেশের বাড়ি বেচে দিয়ে আর আশি হাজার টাকা নিয়ে কাঠের কারবার শুরু করেছিলেন। নেফার জঙ্গলের লীজ নিয়ে বছরের পর বছর কত ছুটোছুটি আর হাঁটাহাঁটি করলেন। কত বার দেঁতো শুয়োরের চোখের সামনে পড়লেন, রাগী হাতীর ডাক শুনলেন, ভালুকের পাশ কাটিয়ে দৌড় দিলেন। তবু কোন বিপদ হয়নি। কিন্তু তাঁর কারবার যেন মরীচিকার ছলনা হয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল, শুধু রেখে গেল তাঁকে, ওই নেফারই জংলী মায়ার মধ্যে, সে মায়ার বন্ধন আজও তিনি ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। তিনি আজ

চারদুয়ারের কাঠের গোলাদার আগরওয়ালার জঙ্গল সরকার। তার মানে আগরওয়ালার লীজের জঙ্গলের যে কুপে যখন গাছ-কাটার কাজ হয়, তখন তিনি সেখানে যান; আর, কাটা গাছের ধড়গুলিকে গুনে নিয়ে চারদুয়ারের গোলাতে একটা হিসেব পাঠিয়ে দেন। সেই সঙ্গে তাঁর নিজের পাওনার হিসেব, গাছ প্রতি দু' আনা।

তাঁর পাওনার টাকা নেবার জন্যে বছরে দু'তিনবার চারদুয়ারে আসেন দুলাল দত্ত, তাই কদমবাড়ি চা বাগানে তাঁর খুড়তুতো বোন কিরণের বাড়িতে এসে, বোধহয় শুধু গল্প বলবার জন্যেই দুটো-একটা দিন থাকেন।

আরও একটা ছিট আছে দুলাল দত্তের মাথায়, কিংবা প্রাণে। ফিরে যাবার সময় একটা ঝুলি ভর্তি করে হরেক রকমের কেষ্টবিষ্টুর আর শিবের ছবি তেজপুরে বাজার থেকে কিনে নিয়ে যান। টাকায় কুলোলে রবিবর্মার গঙ্গাবতরণ, হরধনুর্ভঙ্গ আর সীতার পাতাল প্রবেশও কিনে নিয়ে যান। কিরণলেখা জানেন, এসব ছবির বেশির ভাগই নেফার জঙ্গলের গাঁয়ের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দেন মেজদা।

ছবিগুলিকে যত্ন করে বাঁধা-ছাদা করবার সময় কিরণলেখাকে হঠাৎ দেখতে পেয়েই হেসে ফেলেন দুলাল দত্ত।—তোমার তো নিশ্চয় মনে আছে কিরণ, আমাদের জনাই-এর বাড়ির বাইরের ঘরে এরকমের আরও কত ছবি ছিল।

কারবারের জগতে যাঁরা হাঁটাহাঁটি করেন, বিশেষ করে যাঁরা টিম্বার স্লিপার আর তক্তা ঘাঁটাঘাঁটি করেন, তাঁরা জানেন, সেই আশি হাজার টাকার দুলাল দত্ত আজকাল আশি টাকার মুখ একসঙ্গে দেখতে পান কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেজন্য দুলাল দত্তকে কখনও উদ্বিগ্ন হতে, একটু গম্ভীর হতে, কিংবা নেফার পাহাড়ের মেঘের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেও দেখা যায় না।

শুক্তির সঙ্গে চেঁচিয়ে গল্প করতে গিয়ে দুলাল মামা যে-সব কথা বলেন, তার সরল অর্থ এই যে, ভূলোকে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে তবে ওই ওখানে, যেখানে তিনি থাকেন, আকাদের একটা গাঁয়ের কাছে আর জঙ্গলের পাশে তাঁর মাচা ঘরটি যেখানে দাঁড়িয়ে আছে।—ওখানে থাকলে মেঘদূত তোর আর পড়বার দরকার হবে না শুক্তি, নিজেই একটা মেঘদূত লিখতে পারবি। একেবারে কবিনী কালিদাসী হয়ে যাবি।

কিরণলেখার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে দুটি চুমুক দিয়ে দুলাল মামার গলার স্বরের উল্লাস আরও প্রবল হয়ে ওঠে।—তুমি বিশ্বাস কর কিরণ, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। জায়গাটা একে-বারে কণ্বমুনির তপোবনের মত। শুক্তিকে ওখানে ঠিক একটা শকুন্তলা বলে মনে হবে।

শুক্তি—কিন্তু গাছের বাকল টাকল পরে ঘুরে বেড়াতে পারবো না।

—বাজে কথা বলিস না। ওসব কিছুই পরতে হবে না। আকা মেয়েগুলোও বাকল-টাকল পরে না। কিন্তু...।

শুক্তি—কিন্তু কি?

—একটা আকা মেয়ে যখন বনসুমের ঘন ছায়ার মধ্যে বসে, আর একটা কাঠবিড়ালীকে কোলে নিয়ে আদর করে, তখন সত্যিই মনে হয়, যেন একটা শকুন্তলা মৃগশিশুকে কোলে নিয়ে বসে আছে।

শুক্তি—আমার কিন্তু মৃগশিশু চাই; কাঠবিড়ালীকে আদর করতে পারবো না।

—মৃগশিশু কেন? কপালে থাকলে হস্তীশিশু পেয়ে যাবি।

শুক্তি শিউরে ওঠে—ওরে বাবা!

—ওরে বাবা করবার কিছু নেই। হাতির বাচ্চা দেখলেই গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করবার জন্যে হাত সুড়সুড় করবে।

শুক্তি—আপনি নিজে কি কোনদিন...।

—মা। দূর থেকে দেখেছি, একটা হাতির বাচ্চা ওর ছোট্ট শুঁড় দিয়ে একটা গাছের ডাল জড়িয়ে ধরে দুলছে। আবার, কচি বাঁশের কচি পাতা; তার মানে নবীন বেণু কিসলয় ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

একটু চুপ করে থেকেই চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।—আরও কত কি দেখেছি, বললে বিশ্বাস করবি না।

শুক্তি—আগে বলুন। শোনবার পর বুঝবো, বিশ্বাস করা যায় কিনা।

—সত্যি, কালিদাস যেমনটি লিখেছেন, ঠিক তেমনটি কাণ্ড করে প্রেম করেন জঙ্গলের হাতী আর হাতিনী। উনি শুঁড়ে করে একটা ফুলেল লতা নিয়ে ওঁর গলার উপর ফেলে দিচ্ছেন। তিনি আবার একগাদা শুকনো ধুলো শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাঁর গলায় মাখিয়ে দিচ্ছেন। নাই বা হলো পদ্মরেণু, ধুলোর পাউডারই বা কম কিসে? তারপর, শুঁড়ে শুঁড়ে জড়াজড়ি করে দুজনের সে কী পীরিতের খেলা।

গগন বসু অপ্রস্তুতের মত এদিক ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই সরে যান। কিরণ-

লেখা তাঁর মুখের হাসিটাকে আঁচল দিয়ে চেপে ধরেন।—থামুন মেজদা।
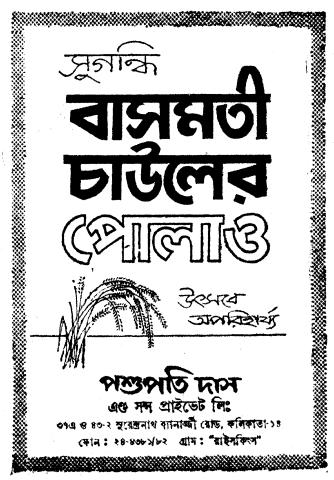
দুলাল দত্ত—কেন? কি হলো?

কিরণলেখা—আপনার মুখ খুললে ভয় করে।

দুলাল মামা—আশ্চর্য, সত্যি কথাকে তোমরা এত ভয় কর কেন?

শুক্তি চেঁচিয়ে ওঠে।—আমার ভয় করে না, দুলাল মামা। আপনি বলুন।

কিরণলেখা—চুপ কর শুক্তি।

কদমবাড়িতে এসে যখনই শুক্তিকে দেখতে পেয়েছেন দুলাল মামা, তখনই চেঁচিয়ে উঠেছেন—চল শুক্তি, আমার ওখানে গিয়ে অন্তত পাঁচটে দিন কাটিয়ে আয়। আজও তেমনই উৎফুল্লভাবে সাদা মাথাটাকে হেলিয়ে দুলিয়ে আর চেঁচিয়ে হেসে কথা বলেন দুলাল মামা।—চল একবার; তাহলেই বুঝবি, আমি সত্যি কথা বলছি কিনা।

শুক্তি হাসে—সব মিথ্যে কথা।

—কেন? কেন? আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন দুলাল মামা।

শুক্তি—তিন বছর ধরে এই একই কথা বলছেন, কিন্তু নিয়ে তো গেলেন না।

দুলাল মামা একবার তাঁর সাদা গোঁপে হাত বুলিয়ে আর বেশ শান্ত-নরম স্বরে কথা বলেন—টাট্টু চড়তে পারবি তো? রুপা থেকে দুদিনের ফুটমার্চ, চড়াই-উতরাই রাস্তা। তারপর আমার আশ্রম। ভেবে দেখ, যদি সাহস থাকে তো বল, কবে যাবি?

শুক্তি—আজই চলুন।

দুলাল মামা—আমার ওখানে কিন্তু রোজ চা পাবি না।

শুক্তি—মাঝে মাঝে পাবো তো? তাহলেই হবে।

দুলাল মামা—কিন্তু বিনা চিনির চা।

শুক্তি—বেশ তো। কোন অসুবিধে নেই।

—খাওয়ার মধ্যে শুধু ভাত আর কচুর ঝোল। নয়তো মকাইয়ের ছাতু।

—খুব ভাল।

—খুব ঠান্ডা আছে কিন্তু।

—ঠান্ডা আমি খুব পছন্দ করি।

—কিন্তু জংলী হাতির ডাকও কি পছন্দ করিস?

—শুনতে পেলে নিশ্চয় পছন্দ করবো।

—বেশ, তাহলে কথা রইল, আসছে বছর পুজোর ছুটিতে...।

হেসে ফেলে শুক্তি। হেসে ফেলেন কিরণলেখা।

দুলাল দত্ত।—তোমাদের এই জায়গাটি অবিশ্যি খুব খারাপ নয়, কিরণ। কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব সুবিধার নয়। ক্ষিদে হয় না, ঘুমও হয় না। নইলে দু-চারটে দিন থাকতাম।

দেখুন না কেন।

দুলাল দত্ত।—অসম্ভব!......এই এই এই শুক্তি, লক্ষ্মী সোনা......।

শুক্তিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যেতে দেখে আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে উঠলেন দুলাল মামা। শুক্তি থমকে দাঁড়ায়—কি হলো?

দুলাল মামা—আমার পাখিটাকে বিস্কুট-টিস্কুট খাওয়াসনি মা। এই নে, নিয়ে যা, আমার কাছে পাকা জংলী ডুমুর আছে।

ঝোলা থেকে পাকা জংলী ডুমুর বের করে শুক্তির হাতে তুলে দেন দুলাল মামা। শুক্তিও চলে যায়।

[সাত]

পর পর তিনটে দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি ঝরেছে। আজ বৃষ্টি নেই; কিন্তু এমন একটা আশ্বিনে দিন ঠিক একটা আষাঢ়ে দিনের মত সেঁতসেতে হয়ে রয়েছে।

সবুজ ধানক্ষেতের বুকের উপর দিয়ে যেন একটা পঙ্কিলতার দাগ গড়িয়ে চলে গিয়েছে, ওটা কি একটা সড়ক? থইথই করছে কাদা। এখানে-ওখানে এক-দেড় হাত গভীর এক-একটি গর্ত; যার মধ্যে থিতিয়ে আছে জল। মাঝে মাঝে একটু শুকনো আর শক্ত মাটির পিঠও দেখতে পাওয়া যায়, যার কাছে জংলী আনারসের ঝোপ ঘন হয়ে ছড়িয়ে আছে। বকের ভয়ে ধানক্ষেতের জলের চ্যাং ছটফটিয়ে লাফ দিয়ে সড়কের গর্তের জলের ভিতর লুকিয়ে পড়তে চায়।

সাইন পোস্টে লেখা আছে—কদমবাড়ি রোড। তাই বিশ্বাস করতে হয়, ওটা একটা সড়কই বটে। মাঝে মাঝে সুরকির লালচে কাদা আর ইঁটের খোয়াও ছড়িয়ে পড়ে আছে, এই কদমবাড়ি রোড অনেক দূরে গিয়ে নর্থ ট্রাঙ্ক রোডের সঙ্গে মিশেছে।

খুব ভাল করেছে শুক্তি; তেজপুরে একটা দিনও আর দেরি না করে, বেশ খট-খটে একটা শুকনো দিনেই কদমবাড়ি চলে এসেছে। আর একটি দিন দেরি করলে, শুক্তির মণিমাসির ওই ছ' সিলিন্ডার গাড়িকে আর কদমবাড়ি পৌঁছতে হতো না। গাড়ি তাহলে মাঝপথে সড়কের কাদার মধ্যে আটক হয়ে পড়ে থাকতো, একটা গণ্ডার বাচ্চা যেমন একদিন...।

গত বছরের আশ্বিন মাসের একটি ভোরবেলায়, যখন সারারাতের বৃষ্টির ঝরানি মাত্র এক ঘণ্টা হলো থেমেছে, তখন কদমবাড়ি চা-বাগানের একদল মজুর লাঠিসোটা নিয়ে আর হই-হই করে ওই সড়কের দিকে ছুটে গিয়েছিল। আর, কাদামাখা একটা গণ্ডারের বাচ্চাকে ধরে নিয়ে এসেছিল; সড়কের কাদায় আটক হয়ে আর অচল হয়ে পড়েছিল গণ্ডারের বাচ্চাটা।

শুকনোর সময়েই সড়কটার যা অবস্থা, তা তো জানাই আছে। তার উপর পর-পর তিনদিনের বৃষ্টি, সড়কটা বোধ হয় পচেই গিয়েছে।

জানালার দিকে চোখ পড়তেই দেখতে পান গগন বসু, ওই সড়ক ধরে পর-পর দশটা মিলিটারী ট্রাক চলে যাচ্ছে। তাঁবুর বোঝা আর বোধহয় আটা-ময়দার বস্তায় ভরাট হয়ে একটা কনভয় চলেছে। হোঁচট খেয়ে, হুমড়ি দিয়ে, কাত হয়ে, কখনও বা হেলে-দুলে, কখনও বা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক-একটা ট্রাকের চাকা কাদাজলের ছলক তুলে চলে যাচ্ছে। মনে হয়, ভালুকপং যাবার রাস্তা ধরতে চায় মিলিটারীর সম্ভারের এই কনভয়। কিংবা ওদিকে, আরও কাছে, নদী জিয়া-ভরলির এপাশে শালজঙ্গলের কিনারায়, যেখানে মিলিটারীর একটা নতুন ছাউনি হয়েছে, সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করছে কনভয়।

কথাটা মেয়ের মুখ থেকেই শুনতে পেয়েছেন গগন বসু। শুক্তি বলেছে, নদী জিয়াভরলির এপাশে আর ওদিকে আরও এক মাইল দূরে মাটি খুঁড়ে অনেক বাংকার তৈরী করা হয়েছে। —ওই যে, পরশু রাত্রি-বেলা গুম্ গুম্ শব্দ শুনে তোমার ঘুম ভেঙে গেল বাবা, ওটা বাজ পড়ার শব্দ নয়। লাইট মেশিনগান প্র্যাকটিস করছে ডোগরা রেজিমেন্টের কয়েকটা গানার কোম্পানী।

কে জানে কোথা থেকে এসব খবর শুনতে পেয়েছে শুক্তি। খুব সম্ভব ম্যানেজার ব্যানার্জীর কাছ থেকে শুনেছে। এই তো মাত্র সাতদিন হলো কলকাতা থেকে কদমবাড়িতে এসেছে। এই সাতদিনের মধ্যে যে তিনটে দিন বেশ শুকনো ছিল, সারা বাগান জুড়ে সকাল-বিকেল রোদ ঝলমল করেছিল, সে তিনটে দিন রোজই সকালবেলা বাংলোর সামনের লনের উপর দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে হাঁকাহাঁকি করেছে শুক্তি—মহারাজা! মহারাজা!

ছুটে এসেছে মহারাজা; গগন বসুর আদরের বুলডগ। মহারাজার সঙ্গে ছুটোছুটি করে লনের নরম ঘাস তছনছ করেছে শুক্তি।

বিকেল হয়েছে যখন, তখন দেখা গিয়েছে, চা-বাগানের একটা শিরীষের ছায়াতে বেতের মোড়ার উপর বসে বই পড়ছে শুক্তি। কিন্তু সত্যিই পড়ছে কি? কিরণলেখা বলেন, বই পড়ে না ছাই পড়ে। হাতে ধরা বইটা একটা ছুতো; চোখ বন্ধ করে শুধু চুপ করে বসে থাকে শুক্তি। হঠাৎ চমকে ওঠে আর চোখ মেলে তাকায়, যেন একটা তন্দ্রার আবেশ হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে। মাটির ঢেলা ছুঁড়ে শিরীষ গাছের গায়ে-চড়া একটা কাকলাসের গায়ের উপর ছুঁড়তে থাকে। ঝুপ ক'রে পড়ে যায় আতঙ্কিত কাকলাস।

মহারাজার সঙ্গে ছুটোছুটি করে লনের নরম ঘাস তছনছ করছে শক্তি

কনভয়টাকে আর দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যায়, চা-বাগানের ময়লা চেহারার জীপ নয়, সাহেবকুঠিরই জীপ, নীলরঙা হুডের জীপ গাড়িটা ওই ভয়ানক সড়কের দিকে উল্লাসের হরিণের মত ছুটে চলেছে।

চমকে ওঠেন গগন বসু। কি আশ্চর্য, ড্রাইভার কৈলাস তো নেই; তবে কে এখন ওভাবে জীপটাকে ওই সড়কের দিকে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে? গগন বসু একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ডাকতে থাকেন।—কিরণ, কিরণ, শুনছো?

কিরণলেখা আসেন।—বল।

—শক্তি কোথায়?

—এই তো, এতক্ষণ এখানেই.. তাই তো... কোথায় গেল মেয়েটা? শক্তি! শক্তি!

বার বার ডাক দিয়েও শক্তির কোন সাড়া শুনতে পান না কিরণলেখা। গগন বসু বলেন—ওই দেখ।

দেখতে পেলেন কিরণলেখা। আর সন্দেহ করবার কিছু নেই। শক্তিই জীপ নিয়ে বের হয়েছে।

এখনই দৌড়ে গিয়ে শক্তিকে থামতে বলা কি কারও পক্ষে সম্ভব? সম্ভব নয়। আর বোধহয় তিন মিনিটও সময় লাগবে না, জীপ গাড়িটা ওই সড়কের কাদাজলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে; তারপর চাকা স্লিপ করবে। হয়তো একটা গর্ত পার হতে গিয়ে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েই যাবে।

বারো বছর আগে, ওই মেয়ে যখন দশ বছর বয়সের একটা খুকু, তখনই একবার চুপি-চুপি চা-বাগানের কলঘরে ঢুকে একটা হাতল টেনে দিয়ে ভয়াবহ একটা কাণ্ড বাধিয়ে ছিল। কলঘরে আগুন ধরে গিয়েছিল, মেশিনের বেল্ট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই মেয়ে আজ এত বড় হয়েও যেন ভুলে গিয়েছে যে, ওর বয়স বেড়েছে; কাউকে না জানিয়ে চুপি-চুপি গ্যারেজ থেকে জীপ বের করে নিয়ে দূরের সড়কের দিকে ছুটে চলেছে। নিজে না বুঝলে কে ওকে বুঝিয়ে দিতে পারবে যে, এরকমের দুরন্তপনা ওকে এখন আর একটুও মানায় না? পঁয়ষট্টি বছর বয়সের বাপ, আর ষাট বছর বয়সের মা; দুটো মায়াদুর্বল শাসনের মন এখন একটু রাগ করেই কামনা করে, জীপটা যেন এখনই অচল হয়ে যায়।

সত্যিই অচল হয়ে গেল নাকি জীপটা? জীপটা যে সত্যিই থমকে দাঁড়িয়েছে। কিরণলেখা বিড়বিড় করেন,—ভাল চাস তো ফিরে চলে আয়, আর এগতে চেষ্টা করিসনি!

গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে ওঠে।—কে যেন হাত তুলে জীপটাকে থামিয়েছে।

—কে? কে? প্রশ্ন করতে গিয়ে কিরণ

লেখার গলার স্বরেও যেন একটা ভয় ছলছল করে।

গগন বসু—চিনতে পারছি না। যেই হোক্, লোকটা যেন ভদ্রলোকের মত দেখতে সেই রেপটাইলটা না হয়। যদি হয়, তবে আজ আমি আর রাইফেলে গুলী ভরতে একটুও...।

ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে থাকেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন—সুজিত বোধহয়।

সেই মুহূর্তে শান্ত হয়ে যায় গগন বসুর উত্তেজিত মূর্তিটা।

সত্যিই যদি ওই লোকটা সুজিত হয়ে থাকে, তবে আর এত ক্ষুব্ধ হবার কারণ থাকে না; বরং ব্যাপারটাকে একটা দৈব বিস্ময় বলে মেনে নিতে হয়। একবার দুবার নয়, কত কতবার, ওই সুজিত ছেলেটা শুক্তির অবুঝ দুরন্তপনাকে ভয়ানক ভুল থেকে বাঁচিয়েছে।

একবার সাহেবকুঠির মেহেদি বেড়ার ওদিকে কামিনদের ঝুমুরনাচের হুল্লোড় দেখবার জন্যে পিলখানার পিছনে একটা পুরনো উইঢিবির উপরে উঠেছিল শুক্তি। সে উইঢিবির ভিতরে গোখরো সাপের বাসা। সেদিন সুজিত হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এসে বলেছিল, শিগ্‌গির নেমে আসুন। একবার খুব ব্যস্ত হয়ে আর বিস্কুট হাতে নিয়ে একটা অচেনা কুকুরের কাছে এগিয়ে চলেছিল শুক্তি। হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিয়ে সুজিতই বলেছিল, কাছে যাবেন না, ওটা ক্ষেপা কুকুর।

আরও একটা ভুল, যেটা শুধু একা শুক্তির ভুল নয়; সাহেবকুঠির বাপ মা ও মেয়ে, তিনজনেরই ভুল; সে ভুলের ফলে কী ভয়ানক কুৎসিত হয়ে দেখা দিয়েছিল একটা বিপদ! সেদিনও সুজিত হঠাৎ ছুটে এসেছিল।

সুজিত ছেলেটা ভাল; কারও বিপদ হবার মত চরিত্র সে নয়। তাছাড়া, সে-রকম কিছু নয় যে, ওকে দেখে কদমবাড়ির সাহেবকুঠির কারও চোখ আশ্চর্য হতে পারে।

দু'বছর আগে, পুজোর ছুটিতে, ঠিক এরকমই একটা শুকনো আশ্বিনের দিনে, কলকাতা থেকে কদমবাড়ির বাগানে এসে যেদিন পৌঁছলো শুক্তি, ঠিক সেই দিনই গগনবাবুর রাইফেলটাকে আলমারির ভিতর থেকে বের করে নিয়ে নারকেল গাছের দিকে তাক করেছিল। কাঁচ ডাবের ছড়া ঝুলছে গাছের মাথার কাছে। গুলী করে ছড়ার বোঁটা ঘায়েল করে ডাব নামাতে চায় শুক্তি।

কে জানে কোথায় দাঁড়িয়ে শুক্তির এই দুরন্ত খেয়ালের কাণ্ডটাকে দেখতে পেয়েছিল সুজিত! তাই দৌড়ে গিয়ে আর হাত ধরেছিল। —গুলী চালাবেন না, গাছের উপরে লোক বসে আছে।

চমকে ওঠে শুক্তি, রাইফেল-ধরা হাতটা শিউরেও ওঠে। সেদিন শুক্তির স্তব্ধ চোখের ভীরু-ভীরু বিস্ময় চিকচিক করে দেখতেও পেয়েছিল, ঠিকই, গাছের মাথায় জড়সড় হয়ে ছোট্ট একটা মানুষের চেহারা বসে আছে।

সুজিত ডাক দেয়—নেমে আয় রাজু। ভয় নেই, কেউ তোকে বকবে না।

চা-বাগানের মজুরদের মেট বুধন সরদারের ছেলেটা কাঁদ-কাঁদ হয়ে নারকেলের মাথা থেকে নীচে নেমে এল।

শুক্তিকে খুব বকেছিলেন কিরণলেখা—কী অবুঝ আক্কেলহারা মেয়ে! ভুল করে যে একটা নরহত্যার কাণ্ড করতে চলেছিলি। ছি ছি! দেশ-গাঁয়ে এমন মেয়েকেই তো গেছো মেয়ে বলে।

সেই পুজোর ছুটি শেষ হবার ঠিক দশদিন আগে এই শুক্তি, যাকে একটা নিদারুণ গেছো মেয়ে বলে নিন্দে করেছিলেন কিরণলেখা, সেই মেয়ে এই বারান্দারই উপরে একটা চেয়ারে বসে, আর, একটা পায়ের পাতা দু'হাতে চেপে ধরে, সেই সঙ্গে কেঁদে ককিয়ে ফুঁপিয়ে একটা দুঃসহ করুণ আতঙ্কের কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিল। শুক্তির ডান পায়ের গোড়ালির কাছে ছোট্ট একটা লালচে স্ফীতি দপদপ টনটন করছে। কুমুদ ডাক্তার এসে বললেন—এটা একটা ফোঁড়া, মুখ নেই। শুধু একটু ওপেন করে দিতে হবে।

কার সাধ্যি শুক্তির এই সামান্য ফোঁড়াকে ওপেন করে! ছুরি হাতে নিয়ে মনে মনে হরিনাম জপে নিয়ে যতবার তৈরী হন কুমুদ ডাক্তার, শুক্তিও ততবার আর্ত-স্বরের চিৎকার ছেড়ে পা সরিয়ে নেয়। —চলে যান ডাক্তারবাবু, প্লীজ, এরকম বুচারি করবেন না! ছিঃ, কিরকমের মানুষ আপনি। শিগগির চলে যান।

গগন বসু আর কিরণলেখা মেয়েকে কত মিষ্টি কথায় কতই না বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুই বুঝলো না শুক্তি। হার মেনে, অসহায়ের মত ঘরের বাইরে দরজার কাছে দুজনে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

বোধ হয় কুমুদ ডাক্তারও হার মেনে চলে যেতেন, কিন্তু যেতে পারলেন না। কারণ হঠাৎ ঘরের ভিতরে ঢুকলো সুজিত। শুক্তিরই মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলে সুজিত—একটু শান্ত হয়ে বসুন।

শুক্তি—বাজে কথা বলবেন না।

সুজিতও আর কোন কথাই বলেনি। শুধু দু'হাত দিয়ে শুক্তির ডান পা'টাকে শক্ত করে চেপে ধরেছিল।

শুক্তির চিৎকার শুনে চমকে উঠে আবার ঘরের ভিতরে তাকিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন গগন বসু আর কিরণলেখা, শুক্তি রাগ করে আর চিৎকার করে সুজিতের কামিজের কলারটাকে খিমচে ধরে একটা টান দিয়ে ফরফর করে ছিঁড়ে দিল। কিন্তু সুজিত অবিচল। কোলের উপর একটা তোয়ালে পেতে নিয়ে তার উপর শুক্তির পা'টাকে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরেছে সুজিত। কুমুদ ডাক্তার আধ মিনিটের মধ্যেই ফোঁড়া কেটে নিয়ে, দু'মিনিটের মধ্যেই ওয়াশ ও ড্রেস করে দিলেন। দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে শুক্তি শুধু কাঁপছে আর ফোঁপাচ্ছে। শুক্তির ব্যাণ্ডেজ করা পা'টাকে কোলের উপর থেকে আস্তে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল সুজিত।

আজ এখন সাহেবকুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা, জীপের ভিতর থেকে ঝুপ করে রাস্তার উপরে নেমেই নাচুনে পাখির মত লাফালাফি করে গাড়ির চারদিকে ঘুরছে শুক্তি। বেণীটাও এই লাফালাফির ঠেলায় কাঁধের উপর দিয়ে সামনের দিকে গড়িয়ে পড়ে ঝুলছে আর দুলছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জীপের একটা চাকার দিকে তাকিয়ে রইল শুক্তি। আর, সেই লোকটাও এগিয়ে এসে, শুক্তির পাশেই দাঁড়িয়ে জীপের চাকাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

[আট]

রোগীর বুকে স্টেথিস্কোপ ছোঁয়াবার আগে পাঁচবার; আর রোগীর হাতে ওষুধ তুলে দেবার আগে মনে মনে দশবার হরিনাম জপে নেন চা-বাগানের ডাক্তার, যাঁর নাম কুমুদ রায়।

অনেকদিন আগে গগন বসু একবার হেসে-হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন—ফোঁড়া কাটবার ছুরি হাতে নেবার আগে কতবার হরিনাম জপতে হয়, কুমুদবাবু?

কুমুদবাবুও হেসে জবাব দিয়েছিলেন।—বিশবার।

—তাই বলুন। আমার ধারণা হয়েছিল, একশো একবার।

এই ডাক্তার, এই কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিত। কাকা আশা করেছিলেন, তাঁর ভাইপো একদিন লেখাপড়া শিখে অন্তত ডাক্তারীটা পাশ করবে।

কিন্তু কাকার আশা সফল হয়নি, হবেও না কোনদিন। ডাক্তারী পড়া দূরে থাকুক, স্কুলের পড়ার শেষ ক্লাসটাও পার হতে পারেনি সুজিত।

বেশ বুড়ো হয়েছেন কুমুদবাবু, তবু চা-বাগানের লোকেরা তাঁকে বলে, নতুন ডাক্তার। কারণ, মাত্র এই দু'বছর হলো তিনি এই চা-বাগানের ডাক্তার হয়েছেন। আগে ছিলেন ডুয়ার্সের এক চা-বাগানে; পুরো একটি বছর নিজেই পক্ষাঘাতের মত একটা রোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়েছিলেন বলে তাঁর চাকরি

গিয়েছে; সেখানে এক ছোকরা বড় ডাক্তার এসেছেন।

ম্যানেজার ব্যানার্জী বলেছিলেন—সাহেব নিজে বুড়ো হয়েছেন বলেই বোধহয় বুড়ো জীবনের কষ্ট বুঝতে শিখেছেন। তা না হলে কুমুদবাবুর মত একটা অপদার্থ বুড়ো ডাক্তারকে চাকরি দেবেন কেন? শুধু কি তাই? কুমুদ ডাক্তারের অপদার্থ ভাইপো সুজিতকেও চাকরি দিতে রাজি আছেন সাহেব। সুজিতের একটা গতি করে দেবার জন্যে সাহেবের কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছেন কুমুদ ডাক্তার। সাহেব বলেছেন—বেশ তো, গোহাটিতে গিয়ে অন্তত কম্পাউন্ডারীটা শিখে আর পাস করে; আর একটা সার্টিফিকেট নিয়ে চলে আসুক সুজিত। কম্পাউন্ডার মথুরাপ্রসাদ যেদিন কাজ ছেড়ে দিয়ে কাশীবাস করতে চলে যাবে, সেদিনই সুজিতকে কাজে নিয়ে নিতে অসুবিধে হবে না।

কম্পাউন্ডার মথুরানাথ কাজ ছেড়ে দিয়ে কবেই চলে গিয়েছে। নতুন কম্পাউন্ডার নন্দলালও কবেই এসে কাজ ধরে ফেলেছে। আর সুজিত আজও সেই সুজিত। কাজ নেই, কাজের চেষ্টা নেই; সেজন্যে কোন লজ্জা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ নেই। ডাক্তার কুমুদনাথ রায়ের ভাইপো সুজিতনাথ রায় যেন এই কদমবাড়ি চা-বাগানের আলো-ছায়ার মধ্যে এক পরম শান্তির যোগী হয়ে জীবনের দিনগুলিকে ক্ষয় করে দিচ্ছে।

সুজিতের বাবা আর মা, দুজনেরই কেউই আজ নেই। পাবলিক ওয়ার্কসের সাব-ওভারশিয়ার মণিভূষণ রায় ডিনামাইট দিয়ে নেফার পাহাড়ের পাথর ফাটাতে গিয়ে যেদিন জখম হলেন আর তেজপুরে হাসপাতালে এসেই মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতনাথের বয়স ছিল চার বছর। আর, সেই মণিভূষণ রায়ের বিধবা স্ত্রী তরুলতা যেদিন তেজপুরে হাসপাতালেরই রোগীর বিছানায় একমাস পড়ে থাকবার পর মারা গেলেন, সেদিন তাঁর ছেলে সুজিতের বয়স ছিল সাত বছর।

কাজেই কাকা আর কাকিমার কাছে থেকে আর খেয়ে-পরে আজ পঁচিশ বছর বয়সের জোয়ান হয়ে উঠেছে যে ছেলে, সে আজ কাকা আর কাকিমারই মন-প্রাণের ছেলে। কুমুদ ডাক্তারের বাড়িতে আর কোন ছেলে বা মেয়ে নেই। তিনি নিঃসন্তান।

কাকার আক্ষেপ, সুজিত মানুষ হলো না। কিন্তু কাকিমা মানুষটার মনে কোন আক্ষেপ নেই। সুজিত যে চাকরি-বাকরি করতে চায় না, চেষ্টাও করে না, সেজন্যে কাকিমা প্রিয়বালার মনে কোন অভিযোগ নেই। পঁচিশ বছর বয়সের ভাসুরপো যেন এখনও চার বছর বয়সের একটা শিশু। যেন হারাই হারাই সদা ভয় হয়, সারাক্ষণ ভুকুপুকু করছে প্রিয়বালার মনটা। কোথায় গেল ছেলেটা? রান্নার কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই বার-বার উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটে আসেন, আর এদিকে-ওদিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকেন, কি করছে সুজিত? বাইরে অনেক দূরে কোথাও চলে গেল নাকি ছেলেটা?

এমনিতে কথা বলে কম, কিন্তু কী বিচ্ছিরি একটা কথা একদিন বলে ফেলেছিল ছেলেটা। —সে জায়গাটাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে কাকিমা।

কাকিমা—কোন্ জায়গাটা।

সুজিত—নেফা পাহাড়ের একটা জায়গা; কাকা বলেছেন, জায়গাটার নাম খেলং। ওখানে নাকি এখনও সড়কের ধারে সেই পাথরটা আছে; যেটা ফাটাতে গিয়ে বাবা মরে গেলেন।

চেঁচিয়ে ওঠেন কাকিমা—চুপ, চুপ, কখখনো এরকম অলক্ষুণে ইচ্ছের কথা বলবি না।

কিছুই না, কুঞ্জলতার গাছটা একদিন একটু হেলে পড়েছিল। তাই একটা বাঁশ বেঁধে দিয়ে লতার হেলান ঠিক করে দিচ্ছিল সুজিত। কিন্তু এতেই কাকিমার মনের অস্বস্তি ছটফট করে উঠেছে। চেঁচিয়ে ডাক দেন প্রিয়বালা—ও সুজিত, ওখানে ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঘরে আয়। ওখানে বিচ্ছিরি পোকামাকড় আছে। শিগগির চলে আয়।

এমনও ব্যাপার হয়েছে, দুপুরের ভাত-খাওয়া সেরে নিয়ে সুজিত যখন বিছানার উপর গা গড়িয়েছে, ঠিক তখন পেতলের রেকাবীতে চারটে বড় বড় নারকেল-নাড়ু নিয়ে এসে সুজিতের প্রায় মুখের কাছেই তুলে ধরেন প্রিয়বালা।

—এ কি! এখুনি তো ভাত খেলাম। আপত্তি করে সুজিত।

—তাতে কী হয়েছে। অনায়াসে এমন অদ্ভুত কথাটাও বলে ফেলেন প্রিয়বালা।

—এখন রেখে দাও, বিকেলে খাব।

—এখন অন্তত একটা খা।

ঠিক এই রকম এক-একটি ঘটনার সঙ্গে বেশ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কাকিমা প্রিয়বালা আরও একটা কথা; চেঁচিয়ে নয়, বেশ একটু চাপা-স্বরে বলেই ফেলেন—চাকরি-বাকরির কোন দরকার নেই। তোর কাকার কোন কথায় একটুও কান দিবি না।

কাকিমার ভীরু প্রাণেরই একটা কঠিন বিশ্বাস বোধহয় এই সার-সত্য বুঝে

ফোঁড়া কাটবার ছুরি হাতে নেবার আগে ক'বার হরিনাম জপতে হয় কুমুদবাবু?

ফেলেছে যে, এই পৃথিবীকে বিশ্বাস নেই। তার এই ঘরের বাইরে কোথাও দয়া মায়া মমতা বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। নিষ্ঠুর নিয়তির ডিনামাইট কখন যে কার প্রাণের উপর ফেটে পড়বে, কোন ঠিক নেই। আজও ভুলতে পারেননি প্রিয়বালা, তরুদি যে ঠিক সেদিনই বড়দাকে বলেছিলেন, আজ আর বাইরে বের হয়ো না। কিন্তু বড়দা তো তরুদির কথা একটু গ্রাহ্যও করলেন না, কাজে বের হয়ে গেলেন। হায় রে কাজ?

চা-বাগানের সকলেই জেনে ফেলেছে, কুমুদ ডাক্তারের এই শক্ত-সমর্থ জোয়ান ভাইপো সুজিত একটি অদ্ভুত ঘরকুনো স্বভাবের ছেলে। ঘরের বাইরে বের হবার জন্য ছেলেটার প্রাণে কোন চাড় নেই, তাগিদ নেই। তেজপুরে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে, বাগানের বুধন সরদারও একদিন তেজপুরে গিয়ে সার্কাস দেখে এসেছে। কিন্তু সুজিত যায়নি। কম্পাউন্ডার নন্দলালও সুজিতকে কতবার সাধাসাধি করেছে, সার্কাস দেখতে তেজপুরে যাবার সঙ্গী করতে চেয়েছে। কিন্তু যেতে রাজি হয়নি সুজিত।

কিন্তু কুমুদ ডাক্তার জানেন, আগে তো সুজিতের এরকম আর এতটা ঘরকুনো স্বভাব ছিল না। সকালবেলা ঘুড়ি ওড়াতে বের হয়ে বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে আসতো। একবার না বলে কয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে জলপাইগুড়ি চলে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল তিন দিন পরে, কেঁদে-কেটে প্রিয়বালার যখন আধ-পাগল অবস্থা। এসব না হয় অল্প-বয়সের ঘর-পালানো ছেলে-মানুষীপনার কাণ্ড। কিন্তু বড় হয়েও, এই তিন বছর আগেও, ডুয়ার্সের বাগানে থাকতে মাছ ধরবার জন্যে কোথায় না চলে যেত সুজিত। মহাশোল ধরবার জন্যে তোর্সার জলে ডিঙ্গি ভাসিয়ে আর জাল ছুড়ে ছুড়ে সারা দিনটা পার করে দিয়েছে। গো-বাঘা মারবার জন্যে সাঁওতাল সরদারের তীর-ধনুক নিয়ে তিন ক্রোশ দূরে গদাই ফকীরের জঙ্গলে ঢুকেছে। শুধু এই কদমবাড়িতে আসবার পরেই দেখা গেল যে, সুজিত যেন ওর প্রাণটাকে একেবারে অলস করে দিয়েছে। এই চা-বাগানের বাইরে গিয়ে কিছু দেখতে শুনতে ও খুঁজতে ওর আর ইচ্ছেই করে না। এই চা-বাগানের বাইরে যেন পৃথিবীটাই আর নেই।

সেদিন একটু লজ্জিত না হয়ে পারেননি কুমুদ ডাক্তার, সাহেবের মেয়ে শুক্তি প্রথম যেদিন এসে সুজিতকে বেশ মিষ্টি স্বরে একটা শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল—কী আশ্চর্য, মানুষও এত কুঁড়ে হয়! বুঝতে পারি না, আপনি কাজ করেন না কেন?

কুঞ্জলতার গাছটার কাছে সুজিত; আর সাহেবকুঠির মেয়ে শুক্তি বুলডগ মহারাজার একটা কান শক্ত করে ধরে নিয়ে সুজিতের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

উত্তর দেয়নি সুজিত। হেসে ফেলেছিল শুক্তি।—গায়ে তো সিংহের জোর, তবে কাজ করতে সাহস নেই কেন?

সুজিত—কি বললেন?

শুক্তি—উঃ, কী সাংঘাতিক জোর দিয়ে আমার পা'টাকে চেপে ধরেছিলেন। আর একটু হলে...।

সুজিত হাসে—কি করবো বলুন, আপনি যে কারও কথা শুনছিলেন না, কাউকে বিশ্বাসও করছিলেন না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি তখন হুট্ করে কোত্থেকে ছুটে এলেন? ছিলেন কোথায় আপনি?

সুজিত—আমার মনে হয়েছিল, ফোড়া-কাটার ভয়ে আপনি একটা গণ্ডগোল বাধাবেন। তাই আমি সাহেবকুঠির ফটকের কাছেই ছিলাম।

শুক্তি—বাঃ, বেশ লোক আপনি!

চলে গেল শুক্তি।

সেদিন চলে গেলেও আরও অনেকবার এসেছে শুক্তি। বুলডগ মহারাজাকে সঙ্গে নিয়ে সারা বাগান টই-টই করে ঘুরে বেড়াবার অভ্যাসের সঙ্গে যেন আরও একটা অভ্যাস তৈরী করে নিয়েছে। কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির গেটের কুঞ্জলতার কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়াবে। হয় সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালার সঙ্গে, নয় সুজিতের সঙ্গে দুটো-একটা কথা বলে চলে যাবে।

প্রিয়বালাকে দেখতে পেলে শুক্তি ওই সেই একই কথা বলে—আপনাদের সুজিত যতই অকেজো মানুষ হোন না কেন, আমার কিন্তু কয়েকটা উপকার করেছেন।

আর, সুজিতকে দেখতে পেলেও ওই সেই একই কথা বলে শুক্তি—আমি যদি বাবাকে বলি, তবে আপনার এখুনি একটা কাজ হয়ে যাবে।

উত্তর দেয় না সুজিত।

শুক্তি—আপনি জানেন না, আমি কিন্তু বাবাকে বলেছি। বাবা আপনাকে কাজ দিতে রাজি হয়েছেন। কাজটা হলো, বাগানবাবুর কাজ; এমন কিছু খাটুনির কাজ নয়। একটা টুল নিয়ে ছায়াশিরীষের কাছে বসে থাকবেন। বসে বসে শুধু দেখবেন, কামিনগুলো ঠিকমত পাতি ভাঙছে কিনা, কলম চায়ের গোড়ায় ঠিকমত জল পড়ছে কিনা; আর দেখবেন, চৌপলের চারার পাতা মশাতে চুষে শুকিয়ে দিচ্ছে কিনা; দরকার হলে ঝারি করে একটু গন্ধকজল ছিটিয়ে দেবেন, বাস্, এই তো কাজ।

ঘরের ভিতর থেকে প্রিয়বালা বের হয়ে [illegible]

বললেন—আমি তো মনে করি; এটা ভাল কাজ। দূরদেশে যেতে হবে না, বাড়িতে থেকে বাড়ির ভাত খেতে পাবে, অথচ চাকরি করাও হবে।

শুক্তি—এই তো, আপনার কাকিমাও বলছেন। কিন্তু আপনি চুপ করে আছেন কেন?

সুজিত—একটু ভেবে দেখছি।

—ভেবে দেখুন তবে। বলতে বলতে চলে যায় শুক্তি। কিন্তু তখুনি আবার থমকে দাঁড়ায়—আমি কিন্তু কলকাতায় চলে যাচ্ছি। বার বার তাগিদ দিয়ে মনে করিয়ে দিতে আর আসবো না।

সুজিত—না না, আপনি আর আসবেন কেন? আমার খুব মনে থাকবে। তবে ...।

শুক্তি—কি তবে?

সুজিত—তবে এখানে কোন কাজ না নিয়ে বরং বাইরে কোথাও গিয়ে একটা কাজের চেষ্টা করা ভাল।

শুক্তি—খুব ভাল। তাই করুন। আপনার কাকার তো এই অবস্থা, একশো পঁচিশ টাকা মাইনে পান। তার ওপর আবার বুড়ো হয়েছেন। আপনার একটু ভেবে দেখা উচিত, সুজিতবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ, আচ্ছা...কিন্তু...।

শুক্তি—কি? বলুন।

সুজিত—মজুমদার কি আজও একবার আসবেন?

শুক্তি—এরকম করে বলবেন না। হয় বলুন, মিস্টার মজুমদার। নয় বলুন, সুশান্তবাবু।

সুজিত—হ্যাঁ, সুশান্ত বাবুর কথাই বলছি।

শুক্তি—হ্যাঁ, আসবেন। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?

সুজিত—না, এমনই; এর আগে তাঁকে আরও দেখেছি কিনা, তাই মনে হলো...।

শুক্তি—উনি তো মস্ত বড় কণ্ট্রাক্টর।

সুজিত—হ্যাঁ, ডুয়ার্সে থাকতে দেখেছি রেলওয়ের অনেক স্টোরে উনিই সাপ্লাই করতেন।

শুক্তি—আপনার কথা বলবো সুশান্ত বাবুকে? তাঁর কাছে নিশ্চয় অনেক চাকরি আছে। ইচ্ছে করলে আপনাকে তাঁর কোন একটা অফিসে অন্তত ফাইলবাবুর কাজ দিতে পারবেন।

সুজিত—না, বলবেন না।

শুক্তি হাসে—অদ্ভুত মানুষ আপনি।

শুক্তির হাতে একটা ট্রানজিস্টর রেডিও ঝুলছে। গান গাইছে রেডিও। শুক্তির রঙীন শাড়ির আঁচলটা যেমন, শুক্তির মুখের হাসিটাও তেমনই ফুরফুর করে উড়ছে।

সুজিত বলে—আপনি কি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন?

শুক্তি হাসে—একথা কেন আপনার মনে [illegible]

পরেছি? না, ফিকে নীল শাড়ি ছাড়া আমি বেড়াতে বের হই না।

সুজিত হাসতে চেষ্টা করে—আমি কি করে বুঝবো, বলুন?

শক্তি—ঠিক কথা, আমাকে ক'দিনই বা চোখে দেখেছেন যে, বুঝতে পারবেন? এই তো...বোধহয় মাত্র এক বছর হলো আপনারা কদমবাড়িতে এসেছেন, তাই না?

সুজিত—হ্যাঁ।

শক্তি—সুশান্ত বাবুও বোধ হয় আপনাদের আসবার মাস দু'তিন পরে, ও হ্যাঁ, সেই যে আপনি ছুটে গিয়ে আমার হাতের বন্দুকটা চেপে ধরলেন, ঠিক সেদিনই সুশান্তবাবু এসেছিলেন।

সুজিত—হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

শক্তি চলে যেতেই কাকিমা প্রিয়বালা দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে বারান্দার উপরে দাঁড়ান; তারপর সুজিতের কাছে এগিয়ে চোখ-মুখ করুণ করে নিয়ে আর গলা-কাঁপা স্বরে কথা বলেন—সবই তো শুনেলাম, সাহেবের মেয়ে যা বলে গেল। কিন্তু তুই কি সত্যিই চাকরির চেষ্টায় বাইরে যাবি?

সুজিত বলে—না।

কোথাও যায়নি সুজিত। শক্তি কলকাতা চলে যাবার পর সারা দিন-রাতের মধ্যে ঘরের বাইরে একবারও বের হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন প্রিয়বালা। দেখে খুবই কষ্ট বোধ করেছেন কুমুদ ডাক্তার। এ কী ভয়ানক আলস্য দিয়ে জীবনটাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে সুজিত! ঘুমের মানুষও নিশির ডাক শুনে চমকে ওঠে আর বাইরে বের হয়ে যায়। কিন্তু সুজিতের ঘুম যেন ভয়ানক একটা রুপোর কাঠি ছোঁয়ানো ঘুম, ভাঙতেই চায় না।

ম্যানেজার ব্যানার্জীও কুমুদ ডাক্তারকে কথা শোনাতে ছাড়েন না।—কানে জল ঢেলে দিলেই ঘুম ভেঙে যাবে। আপনারা শুধু মায়া নিয়েই তুকুপুকু করবেন, কিছু বলবেন না; তবে ও-ছেলের শিক্ষা হবে কেমন করে?

তিন মাস পরে কলকাতা থেকে ফিরে এসে গগন বসুর মেয়ে শক্তিও কুমুদ ডাক্তারের বাড়ির কুঞ্জলতার কাছে সুজিতকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।—এ কী, আপনি এখনও আছেন? কোথাও যাননি তবে?

সুজিত—না।

দুই চোখের দুটি শক্ত ভ্রূকুটির সঙ্গে শক্তির চোখের তারা দুটোও যেন বেশ শক্ত হয়ে যায়।—আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত।

আর একটিও কথা বলে না শক্তি। শুধু বুলডগ মহারাজার মাথায় আস্তে একটা টোকা দিয়ে বলে—চল।

জানালার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখতে পেয়ে খুশি হন প্রিয়বালা, সাহেবের দুর্দান্ত মেয়ে সকালবেলার শান্ত বাতাসে যেন একটা ঝড় তুলে দিয়ে আর আঁচল উড়িয়ে চলে যাচ্ছে। ভালই হয়েছে। রাগ করেছে করুক, কিন্তু গরীবের বাড়িতে এসে যেন ধমক-ধামক আর না করে।

শীতের দুপুর যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, তখন সাহেবকুঠির ভিতরের দিকে বাগান-মুখী নিরালা বারান্দার চেয়ারে চুপ করে বসে শক্তিও ভাবে, ঠিকই, ওরকমের মানুষের কাছে এতবার যাওয়াই ভুল হয়েছে, এত কথা বলাও ভুল হয়েছে। ভাল কথার সম্মান দিতে জানে না, ওরা হলো সেই রকমের মানুষ।

কী অদ্ভুত স্তব্ধতা। কোথাও একটা শব্দ নেই। মহারাজাও ডাকে না। বাবা ঘুমিয়ে আছেন তাঁর অফিসঘরের আরাম-চেয়ারে। মা ঘুমিয়ে আছেন শক্তির ঘরে, শক্তিরই বিছানায়। কিন্তু বাগানের কলঘরের বয়লারও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? পাতি ভাঙ্গবার কামিনগুলোও কি গান গাইতে ভুলে গেল?

পায়ের শব্দ শুনেই চমকে ওঠে শক্তি। কি আশ্চর্য, কুঠির এদিকের এই বারান্দায় কেমন করে এত শব্দহীন হয়ে চলে এলেন সুশান্ত বাবু? কেমন করেই বা বুঝলেন যে, শক্তি এখন এদিকের এই নিরালা বারান্দার এক কোণে চুপ করে বসে আছে? তবে কি লনের কিনারা ধরে নরম ঘাস মাড়িয়ে আর খুব আস্তে আস্তে হেঁটে এসেছেন?

সুশান্ত মজুমদারের কাঁধের সঙ্গে একটা ক্যামেরা ঝুলছে। সুশান্ত মজুমদারের হাতের পাইপের মুখ থেকে যেন সিরসির করে সরু ধোঁয়ার সাপ বের হয়ে কাঁপছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই সুশান্ত মজুমদার তো কতবার এবাড়িতে এসেছেন। কিন্তু কোনদিন সুশান্তবাবুকে দেখতে এত অদ্ভুত লাগেনি শক্তির। সুশান্তবাবুর চোখ দুটোকেও কোনদিন এত লাল হয়ে হাসতে দেখেনি শক্তি।

—আমি এখন একজন গরীব কণ্ট্রাক্টর, কাকাবাবু। এই কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, যেদিন হঠাৎ কদমবাড়িতে এসে গগন বসুর কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। দেখেই চিনতে পেরেছিলেন গগন বসু।—চিনেছি, তুমি সুশান্ত।

হ্যাঁ, সেই সুশান্ত; গগন বসুর দার্জিলিংয়ের বন্ধু হেমেনের ছেলে সুশান্ত। দার্জিলিংয়ে হেমেনের তিনটে গার্ডেন আছে, সে গার্ডেনের হৈমন্তী অরেঞ্জ পিকোর কথা না হয় ছেড়ে দেওয়াই গেল, ব্রোকেন পিকো শুশংও প্রায় সোনার দরে বিকিয়ে যায়। কলকাতার ব্রোকারদের সঙ্গে ঝগড়া করে হেমেন একবার বলেছিল, আমি আর আমার চা অকশনে দেব না; বাগান থেকে সোজা লণ্ডনে চালান করে দেব।

সুশান্ত বলে—আমি এখন তেজা সিং-এর পার্টনার। রেলওয়ে সাপ্লাই বলুন, মিলিটারি সাপ্লাই বলুন, এমন কি হর্তা-কর্তাদের মেয়ের বিয়ের সামিয়ানা সাপ্লাই পর্যন্ত, অনেক কিছু ঝঞ্ঝাট আপনাদের এই সুশান্তকে সহ্য করতে হয়।

গগন বসু হাসেন—ভালই তো। যথেষ্ট উন্নতি করেছো।

সুশান্ত—বছরে তেত্রিশ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিই; আর কত দেব কাকাবাবু? বলুন?

গগন বসু—তুমি এখন কোথায় থাক?

সুশান্ত—সর্বঘটে থাকি, কাকাবাবু। পার্লামেন্ট হাউসের গ্যালারিতে আমাকে দেখতে পাবেন। মিনিস্টারের বাড়িতেও দেখতে পাবেন। আর, খোঁজ নেন তো দেখতে পাবেন, আমি একজন সামান্য রোড ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে গাছতলায় বসে আছি। আপনি কি স্বীকার করবেন না, কাকাবাবু, এটা যে...।

গগন বসু—কি বলছো?

সুশান্ত—এটা যে টাকার যুগ?

গগন বসু বোধ হয় প্রশ্নটাকে এড়াবার জন্যেই হাসতে থাকেন।—হতে পারে। দেখছি, তুমি বেশ অকপট মনে কথা বলতে পার, সুশান্ত।

সুশান্ত—হ্যাঁ কাকাবাবু; আমার আর কিছু না থাকুক, আপনাদের আশীর্বাদে অন্তত ওই অ্যাসেটটুকু আছে, অকপটতা।

সেদিন শক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার।—আমি ভাবতে পারিনি যে, আপনি এখানেই থাকেন। আপনাকে দেখে খুব খুশি হলাম। মাঝে মাঝে আসবো, কিন্তু বিরক্ত হতে পারবেন না।

মাঝে মাঝে, আর বার বার অনেকবার এবাড়িতে এসেছেন এই সুশান্ত মজুমদার। যখনই এসেছেন, তখনই শক্তির জন্য ঝুড়ি ভর্তি করে অজস্র ফুল এনেছেন।

—এই সবই তেজা সিং-এর মিসামারি বাগানের ফুল। ফুল ফলাবার মত সময় আমার নেই মিস শক্তি বসু। শিলং থেকে ফ্লাই করে তেজপুরে আসি, স্টেশন ক্লাবে থাকি, তারপর তেজা সিং-এর গাড়িটি নিয়ে এখানে ছুটে আসি। কেন আসি বুঝি না।

শক্তিকে একদিন একথাও বলে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন সুশান্ত মজুমদার। তারপর আরও কত কথা বললেন, সব কথাই চুপ করে শুনেছে শক্তি, আর হাসতে চেষ্টাও করেছে।

গগন বসু বলেন, সুশান্ত কিন্তু বেশ অকপট মনের মানুষ। কিরণলেখা বলেন, হ্যাঁ। শক্তি বলে, তাই তো মনে হয়।

কিরণ লেখা একদিন শক্তিকে একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞেসা করেছিলেন, সেই সঙ্গে তাঁর গলার স্বরও বেশ নিবিড় হয়ে গিয়েছিল।—সুশান্ত তো তোরই সঙ্গে বেশি কথা বলে; কি মনে হয় তোর? বেশ ভাল ছেলে?

শক্তি—তাই তো মনে হয়।

শক্তিকে একদিন বলেছিলেন সুশান্ত মজুমদার, আমি আপনাকে দেখবার জন্যেই আসি। ওকথা না বললেই ভাল করতেন: কিন্তু শুধু ওই একটি কথার জন্যে মানুষকে অভদ্র বলে মনে করাও উচিত নয়। বলেছেন, আরও কত কথা বলেছেন, তার মধ্যে কোন অভদ্রতা ছিল না, যদিও শুনে খুব খুশি হয়নি শক্তি। বলেছেন, ইচ্ছে করে যে রোজই এখানে এসে আপনার সঙ্গে একটু টেনিস খেলে চলে যাই।

কিন্তু, সেদিন সত্যিই একটু বেশি কথা বলে ফেলেছিলেন।—চলুন মিস শক্তি বসু; একটু প্লেজার অভিযান ক'রে ফিরে আসি। মিসামারির কাছে গাভরু নদীর জলে রবার বোট ভাসিয়ে দু'জনে একটু ভেসে আসি। দেখবেন, কত অফিসারের স্ত্রী আর বান্ধবী সেখানে রবার বোটে ভাসছে, কোরাস গান গাইছে আর ফ্লাস্ক থেকে পানীয় বের করে মনের আনন্দে মুখে ঢালছে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

চমকে উঠেছিল শক্তি। বেশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। আর বেশ শান্ত ভাষাতেই জবাব দিয়েছিল।—ওসব কথা আমাকে বলবেন না। বলে লাভ নেই।

সুশান্তর চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের একটা করুণতা নিয়ে কাঁপতে থাকে।—তবে কি আমাকে এখানে আসতেই মানা করে দিচ্ছেন?

শক্তি—না না; মানা করবো কেন? আসবেন বই কি।

সেই সুশান্ত মজুমদার আবার এসেছে। শক্তির মুখের দিকে অপলক দুটো চোখ নিয়ে তাকিয়ে খুব মৃদুস্বরে কথা বলে সুশান্ত।—বরং আরও একটু দূরে গিয়ে ধানসিরি নদীর জলে একটু আনন্দ করে আসা ভাল। কি বলেন? আপনার সুইমিং কস্ট্যুম আমিই যোগাড় করে দেব।

চমকে ওঠে শক্তি।—কি বললেন?

হঠাৎ শক্তির কাছে এগিয়ে যেয়ে আর চাপা-স্বরে একটা অনুরোধের কথা বলেন সুশান্ত মজুমদার।

শক্তি বসুর দুই চোখের তারা দুটো স্তব্ধ হয়ে যায়। গায়ের শাড়িটাকে দুই হাতে শক্ত করে খিমচে আর চেপে ধরে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে শক্তি। একটা কালো কঠিন আতঙ্কের বোবা পাথর যেন শক্তির মুখের উপর চেপে রয়েছে; কথা বলতে পারে না শক্তি।

কিন্তু কে একজন হঠাৎ এসে সেই নিরালা বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েছে।

—সুজিতবাবু। ডাক দিয়েই বারান্দা থেকে ছুটে এসে সুজিতের একটা হাত শক্ত করে ধরে কাঁপতে থাকে শক্তি।

সুজিত বলে—না, কিছু হয়নি। কোন ভয় নেই।

হাঁপাতে থাকে শক্তি—আমি পড়ে যাব, আমাকে শক্ত করে ধরুন।

দু'হাতে শক্তির দুই হাত শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেসা করে সুজিত—এইবার বলুন, কি হয়েছে?

শক্তি কেঁদে ফেলে—ফটো তুলতে চায়; ভয়ংকর ফটো।

সুজিতের চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠে শুধু দেখতে পায়, কেউ নেই বারান্দায়। বোধ হয় ওদিকের রেলিং টপ্‌কে চলে গিয়েছেন সুশান্ত মজুমদার। হ্যাঁ, চলেই গেলেন। শুনতেও পাওয়া গেল, গাড়ির শব্দটা সাহেবকুঠির ফটক থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে শক্তির মুখটা হাসতে গিয়ে অদ্ভুত হয়ে যায়।—কি আশ্চর্য, আবার আপনি!

সুজিতও হাসে।—হ্যাঁ; কিন্তু এইবার আমি যেতে পারবো। আর আমার এখানে থাকবার দরকার নেই।

শক্তি—এতদিন এখানে কী দরকারে ছিলেন?

সুজিত—এই তো এই জন্যে, এখনই যা হয়ে গেল। আমি জানতাম আপনি এরকম একটা বিপদে পড়বেন।

সুজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে শক্তির চোখের তারা ঝিকমিক করে—কি আশ্চর্য!

সুজিত হাসে—এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

শক্তি—কি বললেন?

সুজিত—আপনি যা বলেছিলেন, কাজের চেষ্টায় বাইরে বের হতে হবে।

—কোথায় যাবেন?

—দেখি কোথায় যাই। এখনও কিছু ঠিক করিনি।

বাগানের ঝাউয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি-যেন ভেবে নেয় শক্তি। তার পরেই বলে।—আমি কিন্তু আপনাকে একটা ঠিকানা দিতে পারি, চিঠিও দিতে পারি, যেখানে গেলে আপনার কাজ হবে।

সুজিতও চুপ ক'রে শক্তির মুখের দিক কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি-যেন ভেবে নেয়। তারপরেই বলে—দিন তবে।

—একটু দাঁড়ান। চিঠিটা লিখে আনছি।

সাহেবকুঠির বাইরের বারান্দার সিঁড়ির কাছে গিয়ে চুপ করে, একটা নিরেট পাথরের মত শান্ত ও সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুজিত। ঘরের ভিতরে টেবিলের কাছে বসে চিঠি লেখে শক্তি—মেজর পি বোস, আসাম রাইফেল্‌স্, লোখ্‌রা। আমাদের বাগানের ডাক্তারবাবুর ভাইপো সুজিত রায়কে যদি একটি চাকরি করে দিতে পারেন কাকা, তবে খুশি হব। এবার ছুটির সময় নিশ্চয় আপনার ওখানে যাব। ইতি, শক্তি।

(নয়)

জীপের চাকার টায়ার চুপসে গিয়েছে, হাওয়া নেই। ভিতরের টিউব বোধহয় ফেটেই গিয়েছে। সুজিত বলে—তা ছাড়া, চাকার রীমও ফেটে গিয়েছে দেখছি।

শান্তি বলে—ছেড়ে দিন। চলুন ফিরে যাই। জীপ পড়ে থাকুক এখানে, উপেন মিস্তিরি এসে নিয়ে যাবে।

সুজিত—চলুন। কিন্তু আপনি যাচ্ছিলেন কোথায়?

শান্তি হাসে—বলবো না।

সুজিত—ওই সড়কে উঠলে কিন্তু আপনার বিপদ হতো। গর্তে পড়ে বোধ হয় উল্টেই যেত জীপটা।

শান্তির হাসির দোলা লেগে মাথার বেণীটাও দুলে ওঠে।—কেন বিপদ হবে? বিপদ থেকে বাঁচাতে আপনিই তো আছেন।

সুজিত হাসে—সে কথা বললে কি চলে? আজ তো আর-একটু হলে...যদি চাকার হাওয়া ফুরিয়ে গিয়ে আর রীম ফেটে গিয়ে গাড়িটা হঠাৎ অচল হয়ে না যেত...।

শান্তি—ভুল বলছেন। টিউব বার্স্ট করবার আগেই জীপকে থামিয়ে দেবার জন্যে আপনি হাত তুলেছিলেন।

সুজিত—তা হবে।

শান্তি—এ তো বড় মজার নিয়ম হয়ে উঠলো দেখছি।

সুজিত—কি বললেন?

শান্তি—আমার একটা বিপদ হতে চললেই আপনি কোত্থেকে এসে হাজির হবেন।

সুজিত—না না; আজ কিন্তু আমি সত্যিই জানতাম না যে আপনি জীপ নিয়ে বের হয়ে এই সাংঘাতিক সড়কের দিকে যাচ্ছেন।

শান্তি—আমি কিন্তু জানতাম যে, আপনি এখন ওদিক থেকে আসছেন।

সুজিত—আপনি ঠাট্টা করছেন।

শান্তি—ঠাট্টা করবো কেন? কুঠির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর চোখে বাইনকুলার লাগিয়ে কি দেখা যায় না যে, আপনি এই সড়কের কিনারা ধরে আস্তে-আস্তে হেঁটে এদিকে আসছেন?

সুজিত হাসতে থাকে—তাই বলুন।

শান্তি—কিন্তু আপনি কোত্থেকে আসছেন?

সুজিত—কেন? লোখরা থেকে আসছি।

—সত্যি কথা বলছেন তো? এতদিন লোখরাতে ছিলেন? সত্যিই কাজ করছেন সেখানে? সাহেবকুঠির খুশি মেয়ে শান্তির মুখের ভাষা, গলার স্বর আর চোখের বিস্ময়, সবই যেন এক সঙ্গে উথলে উঠেছে।

সুজিত—আমার কাকা কি আপনাকে কিছু বলেননি? কাকিমার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়নি?

শান্তি—না; কেউ আমাকে কিছু বলেননি। কারও সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি।

সুজিত—এই এক বছরের মধ্যেও কি আপনি কারও কাছ থেকে শুনতে পাননি যে...।

শান্তি—না, কিছুই শুনিনি। যদিও এক বছরের মধ্যে তিনবার কদমবাড়িতে এসেছি আর কলকাতা চলে গিয়েছি। আমি শুধু জানতাম যে, আপনি এখানে নেই। কিন্তু...।

হঠাৎ চুপ করে আর মুখ টিপে হাসতে থাকে শান্তি—কিন্তু বলুন তো, কেমন করে জানতে পেলাম যে, আপনি কদমবাড়িতে নেই?

সুজিত—বোধহয় মেজর সাহেব আপনাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, আমি লোখরাতে চাকরি করছি।

শান্তি—না। একদিন বাগানের নালার জলের হাঁস ধরতে গিয়ে পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। জলে ডুবে যেতেই চলেছিলাম, কিন্তু আপনি তবু এলেন না। তখনই বুঝলাম, আপনি এখানে নেই।

জীপের সুইচের চাবিটাকে দুই হাতে লোফালুফি করে হাসতে থাকে শান্তি।

সুজিত কিন্তু হাসে না; চোখ দুটোও অদ্ভুত হয়ে কেঁপে ওঠে।—তারপর কি হলো?

শান্তি—নালার ধারের ঘাসের ঝুঁটি দু' হাতে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে সামলে গেলাম আর উঠে এলাম।

সুজিত—আপনি সাঁতার জানেন?

শান্তি—না।

সুজিত—তা হলে বুঝে দেখুন, আপনি খুব ভুল করেছেন। জলের হাঁস ধরতে যাওয়া আপনার একটুও উচিত হয়নি।

শান্তি—আঃ, ওসব কথা এখন রাখুন। আগে বলুন, কি কাজ করছেন?

সুজিতের গায়ে খাকি জিনের শার্ট, খাকি ফুল প্যান্ট। চকচক করছে খাকি নেয়ারের বেল্টের পেতলের বাকলস। পায়ে কাদা-মাখা গামবুট। সুজিতের এই নতুন মূর্তিটাও হাসছে। সুজিত বলে—আমি আসাম রাইফেলের হাবিলদার। আপনার কাকা মেজর সাহেব আমাকে খুব পছন্দ করে এই চাকরি করে দিয়েছেন।

শান্তির খুশির মনটা যেন চিৎকার করে ওঠে।—কি আশ্চর্য! আপনি সোলজার! চমৎকার! আপনি একটা কাণ্ডই করেছেন সুজিতবাবু! খুব ভাল হলো। আমি তো ভাবতেই পারিনি যে...কাজ পেয়ে সত্যিই খুশি হয়েছেন তো?

সুজিত—নিশ্চয়।

শান্তি—তবে চলুন।

সুজিত—কোথায়?

শান্তি—বাবার কাছে আপনাকে নিয়ে গিয়ে একবার দেখাই।

সুজিত—আপনি যখন বলছেন তখন সাহেবের কাছে নিশ্চয় একবার গিয়ে দেখা করে আসবো। কিন্তু এখন এই কাদামাখা গামবুট পায়ে...।

শান্তি—ঠিক আছে। ওতে কিছু আসে যায় না। চলুন।

সুজিতের সঙ্গে গল্প করে করে, কাঁকরের ছোট রাস্তা ধরে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে শান্তি। শান্তির হাঁটবার ভঙ্গীটাও অদ্ভুত হয়ে গিয়েছে, যেন একটা উতলা খুশির হিল্লোল। শান্তি যেন কদম-বাড়ির সাহেবকুঠিকে একটা জয়ের ট্রফি দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

দেখে খুশি হলেন গগন বসু।—ভালই করেছো সুজিত, মন দিয়ে কাজে লেগে থাক। তাহলে আরও ভাল হবে।

শান্তি—সুজিতবাবুকে এই কাজটা কিন্তু আমিই পাইয়ে দিয়েছি, বাবা।

গগন বসু—তুমি?

কিরণলেখা—তুই পাইয়ে দিয়েছিস, মানে?

সুজিত—মেজর সাহেবকে উনিই একটা চিঠি দিয়েছিলেন।

হেসে ফেলেন গগন বসু। সুজিতের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।—কেমন আছে প্রণব?

সুজিত—আজ্ঞে?

গগন বসু—তোমাদের মেজর সাহেব, মেজর পি বোস কেমন আছে?

সুজিত—ভাল। আপনাদের সবাইকে একবার যেতে বলেছেন।

গগন বসু—আর আমার যাওয়া! ওটা আর সম্ভব নয়। হ্যাঁ, এরা যদি যেতে চায় তো যাবে।

কিরণলেখা—আমার তো যেতে ইচ্ছে করে ঠিকই, কিন্তু...।

শান্তি—আমি কিন্তু যাবই। কাকার বাড়ির কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা নিশ্চয় এখনও আছে।

কিরণলেখা—হ্যাঁ যেও, আর আবার একটা অ্যাক্সিডেণ্ট করো।

শান্তি—করলেও ভয় নেই। এখন সুজিতবাবু ওখানে আছেন। বিপদ থেকে বাঁচাতে ছুটে আসবেন।

হেসে ফেলে সুজিত। হাত তুলে গগন বসু আর কিরণলেখাকে নমস্কার জানায়।—আসি।

চলে যায় সুজিত। আকাশের দিকে তাকিয়ে শান্তি বলে—এরকম কড়া রোদ্দুর আরও দুটো দিন থাকুক, সড়কটাও শুকিয়ে যাক, এদিকে ড্রাইভার কৈলাসও এসে পড়ুক, ব্যস, তারপর আর কোন কথা নয়, আমি কিন্তু লোখরার কাকার বাড়িতে, অন্তত দুটো দিনের জন্য বেড়িয়ে আসবো।

কিরণলেখা—সাতদিনের মধ্যে একটি দিনও তোকে বই ছুঁতে দেখলুম না। এর মানে কি? অথচ সুমিত্রার সব চিঠিতে ওই একই কথা পড়তে হয়; শান্তি সব সময়েই পড়ায় ব্যস্ত। এত ব্যস্ত যে,

সময় মত স্নান করতে, খেতে আর ঘুমোতে ভুলে যায়। মেয়েকে নাকি সবই মনে করিয়ে দিতে হয়।

শুক্তি—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেন না।

কিরণলেখা—বড় পিসি মিথ্যে কথা লেখেনি। কিন্তু তুমি এখানে এসে বড় পিসির কথাটাকে মিথ্যে করে দিচ্ছ কেন?

শুক্তি—মনে হচ্ছে তুমি রাগ করে কথা বলছো।

কিরণলেখা—পড়ার কথা বললেই যদি রাগের কথা হয়, তবে তাই।

গগন বসু—যাকগে, পড়তে ভাল লাগলে পড়বে, না লাগলে পড়বে না। ও নিয়ে এত মাথা ঘামাবার আর ব্যস্ত হবার কি আছে?

শুক্তি—আমি লোখরা থেকে একবার ঘুরে আসি, মা; তারপর দেখবে, দিনরাত পড়ি কিনা।

কিরণলেখা—সেটা আর হবে না; হতে বলছিও না। তবে একটু শান্ত হয়ে বাড়িতেই থেকো, যখন তখন টই-টই করে ঘুরে বেড়িও না।

চলে যায় শুক্তি; ঘরের ভিতরে গিয়ে কিছুক্ষণ বেশ শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; তারপর টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বিছানার উপর গড়িয়ে পড়ে।

বই পড়তে চেষ্টা করলেই চোখের পাতা জড়িয়ে আসে আর ঘুম পেয়ে যায়। আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলেই চোখ দুটো যেন ধড়ফড় করে জেগে ওঠে আর ভুরু টান করে বই পড়তে থাকে; শুক্তির অবস্থা দেখে হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—বেশ তো, আগে লোখরা থেকে একবার ঘুরে আয়, তারপর পড়া শুরু করিস।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মেঘ নেই। সারা দিনের রোদ খেয়ে শুকিয়ে গেল বাগানের পুরনো পিলখানার সামনের কাদাটে মাঠটা। সেই শুকনো মাঠের উপর কাকের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর ঠোঁট দিয়ে ঠুকে ঠুকে কাঁকড়া মারছে। তেড়ে যাচ্ছে বুলডগ মহারাজা।

আজই তো ড্রাইভার কৈলাসের ফিরে আসবার কথা। বিকেল ফুরলো, সন্ধ্যা হলো, নারকেলের পাতার ঝালরে টাটকা চাঁদের আলোর ঝিলিমিলিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু কৈলাস এল না। মঙ্গলদই থেকে কদমবাড়ি আসতে কী এমন সময় লাগে যে, সকালে বের হলে সন্ধ্যার মধ্যেও পেঁছিতে পারা যায় না?

কৈলাস আসেনি; কিন্তু কেউ একজন এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কে? কে এই সময় বাইরের বারান্দায় গগন বসুর সঙ্গে কথা বলতে পারে? কিরণলেখা তো এখন শুক্তির এই ঘরেরই একটা আলমারির জিনিস সাজাতে গিয়ে পুরনো কালের ছোট্ট একটা ফ্রক হাতে তুলে নিয়েছেন আর হাসছেন; সেই দুরন্ত ছোট শুক্তির ফ্রক, এখনও কলঘরের কালির ছোপ লেগে আছে ফ্রকের গায়ে।

হঠাৎ বই বন্ধ করে আর কান পেতে শুনতে থাকে শুক্তি। হ্যাঁ, বাবার সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। বেশ অদ্ভুত রকমের কথা।—আপনি তো জানেন স্যার, গল্পে আছে যে, সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিল আর হাজার বছরের ঘুম ভেঙে গেল। আমাদের সুজিতকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। সেই আলসেমির ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেছে। খুব খুশি হয়ে কাজ করছে।

গগন বসু—সুজিতকে দেখে আমারও তাই মনে হলো।

কুমুদ ডাক্তার—আমি কিন্তু আগে জানতাম না, স্যার, আজ জানতে পেলাম, আপনার মেয়ে শুক্তিই চিঠি লিখে সুজিতকে এই কাজটা পাইয়ে দিয়েছে।

গগন বসু হাসেন।—হ্যাঁ, আমিও আজ জানতে পেলাম। দেখছি; শুক্তিও তাহলে দেশের বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করতে শিখেছে, যদিও...।

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে?

গগন বসু—যদিও এটুকু চিনতে করতে শেখেনি যে, নালার জলের হাঁস ধরতে গেলে পা পিছলে যেতে পারে।

কুমুদ ডাক্তার—তা স্যার,...ছেলে মানুষের মন স্যার...ওরকম একটু...আচ্ছা আসি স্যার।

হেসে ফেলে শুক্তি। হাতের বইটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখে দিয়ে আর ছুটে গিয়ে এক হাতে গগন বসুর গলা জড়িয়ে ধরে, আর-এক হাতে গগন বসুর মুখটাকেও চেপে ধরে।—তুমি আমাকে এত ঠাট্টা করবে না, বাবা।

কদমবাড়ি চা-বাগানের সাহেবের সোনার ফ্রেমের চশমাটা চোখ থেকে ফসকে পড়ে যায়; হাতের পাইপটাও আর-একটু হলে পড়ে যেত। গগন বসুর চেহারাটা যেন গলে যেতে চাইছে; গলার স্বরও যেন এক বিগলিত তৃপ্তির কলরোল—কোথায় থাকিস তুই, শক্তি? দেখছিস, আমি এখানে একা-একা বসে আছি, তবু তুই ওদিকে পড়া নিয়ে পড়ে আছিস? কাছে এসে একটু বসবি তো।

শুক্তি—নিশ্চয়। লোখরা থেকে ফিরে আসি, তারপর রোজ তোমার কাছে এসে বসবো।

শুক্তির লোখরা যাবার স্বপ্নটাকে আর দুটো দিনও অপেক্ষা করে থাকতে হয় না। সড়ক শুকিয়ে গেল কৈলাসও এসে গেল। বিকেল হতেই সাহেবকুঠির টুরার গ্যারেজ থেকে বের হয়ে গেটের সামনে শুধু এক মিনিটের মত দাঁড়ালো আর শুক্তিকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

কদমবাড়ি থেকে লোখরা পেঁছিতে কতক্ষণ লাগে? দেড় ঘণ্টার বেশি নয়। কিন্তু এই শুকনো সড়কেরই রাক্ষুসে গর্ত-গুলি টুরারের স্পীড মিথ্যে করে দিয়ে লোখরা পেঁছিতে কত দেরি করিয়ে দেবে কে জানে?

কৈলাস বলে—এই সড়কের মেরামতের জন্যে এ বছরে কণ্ট্রাক্টর কত টাকা নিয়েছে, সে খবর তো আপনি জানেন না দিদি।

শুক্তি—কত টাকা?

কৈলাস—একান্ন হাজার টাকা।

শুক্তি—কিন্তু কই, মেরামত করা তো হয়নি।

কৈলাস—মেরামত করবার দরকার কি? বিল তো মজেসে বন্ যাতা হ্যায়; আওর মজেসে পাসভি হো যাতা হ্যায়।

শুক্তি—কে কণ্ট্রাক্টর?

কৈলাস—মিসামারিকা তেজা সিং আওর মজুমদার।

শুক্তি—তোমার স্ত্রীর অসুখ এখন কেমন? সেরেছে?

কৈলাস—একটু সেরেছে। হাঁ, আপনি তো বলবেন...।

শুক্তি—আমি কিছু বলছি না, তুমি চুপ কর।

কৈলাস—রাগ করবেন না দিদি। আপনি বলবেন, এটা নেহরু-রাজ। হুম্ বোলেঙ্গে, হায় ভগবান রাজ! চোরের জোর, চোরের খাতির, চোরের ইজ্জৎ! চোরলোগ ওই নেফার পাহাড়কেও গিলে খেয়ে ফেলবে। একদিন বলবেন, ঠিকই বলেছিল মুরুখ কৈলাস।

শুক্তি—আমি বলছি, তুমি চুপ কর।

কৈলাস—চুপ তো করতেই হবে, দিদি। আমার মত গরীবেরও দশটা টাকা খেয়ে নিয়ে তবে আমার লাইসেন্স রিনিউ করেছে পুলিস। তাই বাড়ির রোগী মানুষটার জন্যে আমি এক টাকারও ওষুধ কিনে দিয়ে আসতে পারিনি। কাকেই বা বলবো একথা?

শুক্তি—আচ্ছা আমি তোমাকে পাঁচ টাকা দেব। তুমি চুপ কর।

কৈলাস—আপনি আমাকে না হয় দিলেন। ভগবান আপকো ভালা করে! কিন্তু আরও যে কত কৈলাস আছে দিদি; তাদের কে দেবে?

শুক্তি—জানি না। কিন্তু তুমি তোমার মহাভারত থামাবে কিনা?

কৈলাস—হ্যাঁ, থেমেছি, থেমেই তো আছি।

শুক্তি—কি বললে?

কৈলাস হাসে—এই তো মেজর সাহেবকা কোঠি।

চমকে ওঠে শুক্তি। হেসেও ফেলে। লোখরার কাকার বাড়ির গেটের সামনে থেমে আছে গাড়িটা। বাড়ির বারান্দায় আলো জ্বলছে; তাই দেখতে অসুবিধে নেই, দাঁড়িয়ে আছেন আর হাসছেন বাণী কাকিমা।

গাড়ি থেকে নামে শান্তি।—কৈলাস, তুমি একটু জিরিয়ে নিয়ে আর চা খেয়ে, তারপর যেও।

কৈলাস—কবে আবার আসতে হবে?

শান্তি—আমি খবর দেব।

[দশ]

বাণী কাকিমা বললেন—আগেই বলে রাখছি, শান্তি, যাব-যাব করতে পারবে না। এসেছো যখন, তখন অন্তত দশটা দিন থাক।

শান্তি—আমার তো দশটা বছর থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু......ও কি! ও কি! কে ওটা?

ঘরের ভিতরে চোখ পড়েছে শান্তির; আর, যেন সাংঘাতিক একটা লোভের বস্তু দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে।

—ইস্! এতদিন ধরে কত ছাই আজে-বাজে কথা মনে পড়েছে, অথচ এটার কথা মনে পড়েনি। বলতে বলতে ঘরের ভিতরে ছুটে গিয়ে বিছানা থেকে একটা বাচ্চাকে বুকের উপর তুলে নিয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে। এটা হলো বাণী কাকিমার সেই বাচ্চাটা, এক বছর আগে যেটা বিছানায় শুয়ে শুধু হাত-পা ছুঁড়তো, হামা দিতেও পারতো না। আজ এখন সেটা বিছানার উপর বসে, আর, একটা হাত তুলে শান্তিকে যেন ছোট্ট একটা ঘুসি দেখিয়ে হাসছিল।

বাণী কাকিমা হাসেন।—এটার একটা আশ্চর্য অভ্যেস হয়েছে; ঘরের লোকের কোলে উঠতে কোন চাড় নেই। কিন্তু বাইরের লোক দেখতে পেলেই কোলে ওঠবার জন্য উসখুস করবে, হাত ছাড়বে।

শান্তি—এটা কিরকমের কথা হলো কাকিমা? আমি কি বাইরের লোক?

বাণী কাকিমা—আঃ, আগে শুনে নাও কথাটা। ওই যে, যে লোকটিকে তুমি চাকরির জন্য চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছিলে, কি-যেন নাম, সুজিত? হ্যাঁ, সে লোকটিকেও কী অদ্ভুত চিনে রেখেছে এইটুকু বাচ্চা! ওকে দেখলেই হাত ছুঁড়বে, কোলে ওঠবার জন্যে ছটফট করবে।

শান্তি—সুজিত কি করে? কোলে নেয় না?

বাণী কাকিমা—নেয় বইকি। মাঝে মাঝে কাজের অর্ডার নেবার জন্যে তোমার কাকার কাছে সুজিত যখন আসে, তখন সেই তাড়া-তাড়ির মধ্যেও দুষ্টুটাকে কোলে নিয়ে পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-সেদিক বেড়িয়ে আসে।

শান্তি—দুষ্টুর নামটা কি?

বাণী কাকিমা—নাম তো এখনও কিছু হলো না। তোমার কাকা ডাকেন, হনুমান।

শান্তি—ধেৎ! এটার নাম তুলতুল! সত্যি এটা কী নরম তুলতুলে হয়েছে, কাকিমা!

গগন বসুর খুড়তুতো ভাই প্রণব বসু, মেজর বোস; শক্ত করে পাকানো বড়-বড় এক

কোথায় থাকিস তুই শান্তি? দেখছিস আমি এখানে একা একা...
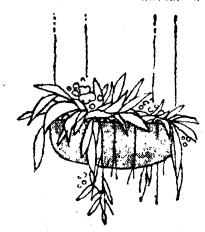
জোড়া গোঁপ যাঁর লম্বা-চওড়া শরীরটার সঙ্গে চমৎকার মানায়, তিনি একবছর আগে এই ঘরের ভিতরে শক্তির দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে বাণীকে দেখিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন—এই মহিলা কেন যে আমাকে বিয়ে করলেন, বুঝি না। তুই কিছু বুঝিস নাকি শক্তি?

শক্তি—হ্যাঁ, খুব বুঝি।

প্রণব বসু—কি?

শক্তি—আপনি এই মহিলাকে বিয়ে করলেন বলে?

প্রণব বসু—তুই কি লজিক নিয়েছিস?

শক্তি—না, ম্যাথমেটিকস্।

প্রণব বসু—যাই হোক, হনুমানের মা একবার বলুক আমি ওর কোন্ স্বপ্নটা ব্যর্থ করে দিলাম। সব সময় কিসের এত অভিযোগ?

বাণী—পুরো তিনটি বছর হলো শান্তি-পুর যাইনি, শক্তি। তুমিই বল, মানুষ এই অবস্থা সহ্য করতে পারে?

প্রণব বসু—আমি কোনদিনও আপত্তি করিনি। আমি তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছি, যত দিন খুশি বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পার। কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলবো, না। যেতে দিতে আমার ইচ্ছে করে না।

বাণী—কেন করে না?

প্রণব বসু—আমি একটি খাঁটি স্ত্রৈণ স্বামী, তাই করে না। বাস্, এর ওপর আর কথা কিসের?

কিন্তু প্রণব বসুর মুখের অদ্ভুত গম্ভীরতা তখুনি চেঁচিয়ে হেসে ফেলে—যাবে যাবে, আমি কথা দিচ্ছি। ডিসেম্বরের আগেই তোমাকে শান্তিপুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেব।

সেদিনের সে-ঘটনার হাসির শব্দটাকে এখন হঠাৎ যেন মনের ভিতরে শুনতে পেয়েছে শক্তি। তাই জিজ্ঞাসা করে— প্রণব কাকা কোথায়? কোন সাড়া পাচ্ছি না কেন?

বারান্দা থেকে একজোড়া শক্ত জুতোর খট্‌মট্ শব্দ বাজতে বাজতে ঘরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। ঘরে ঢুকেই মাথার টুপিটাকে তুলে নিয়ে আর তুলতুলের মাথায় পরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন প্রণব বসু—শক্তি, তুই তাহলে সত্যিই এসেছিস? তাহলে এইবার একবার জিজ্ঞেস কর তো বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাটিকে, গত ডিসেম্বরে তাঁর শান্তিপুর যাওয়া কেন হলো না?

বাণী ডাকেন—শক্তি, তুমি ওর আজে-বাজে কথায় কান না দিয়ে এখন বরং......।

প্রণব বসু—আমি সব ব্যবস্থা করেছিলাম, শক্তি; কিন্তু এই মহিলাই রাগ করে বললেন, আমাকে শান্তিপুরে পাঠাবার জন্যে তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? এখন তুই বল্......।

বাণী—তুমি এস শক্তি। ওঘরে চল। দুজনে মিলে চা তৈরী করি আর গল্প করি।

শক্তি—চলুন।

প্রণব বসু—আমারও একটা কথা আছে, শুনে যা। এসেছিস যখন, তখন একদিন এগ্‌জিবিশন দেখে, আর একদিন মাছ ধরা দেখে তারপর কদমবাড়িতে যাবি।

শক্তি—কৃষ্ণচূড়ার দোলনাটা কি নেই?

চেঁচিয়ে ওঠেন প্রণব বসু—আছে বইকি। আয় আমার সঙ্গে, দেখবি আয়।

তখুনি টেবিলের উপর থেকে একটা টর্চ তুলে নিয়ে আর জানালার কাছে এগিয়ে যেয়ে বাইরের অন্ধকারের উপর আলো ফেলেন প্রণব বসু—ওই দেখ আছে কিনা? ঠিক কিনা?

দেখে খুশি হয়ে হাসতে থাকে শক্তি। হ্যাঁ ঠিক আছে। সেই কৃষ্ণচূড়া আর সেই দোলনা।

হলোই বা ছেচল্লিশ বছর বয়স, প্রণব কাকাও আজও ঠিক সেই প্রণব কাকা; এক বছরে একটুও বদলাননি। এই প্রণব কাকাকে তাই বেশ ভাল লাগে। এই লোখুরাকেও তাই ভাল লাগে। বাণী কাকিমা অবিশ্যি খুবই শান্ত মানুষ; রাগ করলেও জোরে কথা বলতে পারেন না। প্রণব কাকার হৈ-চৈ স্বভাবের শখগুলিকে একটুও পছন্দ করেন না।

বছর দুই আগে, সেবারের পুজোর ছুটিতে যখন লোখুরা এসেছিল শক্তি, তখন এই ঘরে বসেই কথায় কথায় শক্তির কাছে অদ্ভুত একটা অভিযোগও করে ফেলে-ছিলেন বাণী কাকিমা। —বয়সের হুঁস নেই তোমার কাকার। বড় বেশি ছেলেমানুষী বাতিক। দোলনাতে বসে গল্পের বই পড়ে।

শক্তি হেসে ফেলেছিল—তাতে তোমার এত আপত্তি কেন?

বাণী—আপত্তি করবো না কেন? এতদিন কিছু ছিল না, ছিল না; সে একরকম ভালই ছিলাম। এবার আমাকে কী লজ্জায় ফেলেছে, বল দেখি?

শক্তি আশ্চর্য হয়েছিল—তোমার লজ্জা কিসের? তুমি তো আর দোলনাতে দুলছো না।

বাণীও সেদিন একটু আশ্চর্য হয়ে আর চোখ বড় করে শক্তির মুখের দিকে কিছু-ক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন। তারপরেই হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হয়ে আর হতাশ-উদাস স্বরে একটা আক্ষেপের কথা বলেছিলেন—আমারও মাথা খারাপ হয়েছে। কার কাছে কি কথা বলছি।

শক্তি—কি হলো?

বাণী—তুমি ঠিক বলেছ। আমার আবার কিসের লজ্জা? যাই হোক, তুমি কিন্তু এখনও সেই দোলনা-দোলা মেয়েটি, একটুও বড় হওনি।

আজ আবার কাকিমা সেই পুরনো কথারই মত একটা কথা বলে হেসে উঠলেন—এবার আমি আশা করেছিলাম, তুমি একটু বদলেছো। কিন্তু যা দেখছি, তাতে তো মনে হচ্ছে, এই একবছরেও একটুও বড় হওনি।

শক্তি—না, বড় হইনি। কিন্তু ওরকম হেঁয়ালি করে কথা বললে আমি এখনই এই চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে দোলনাতে বসবো আর দুলবো।

বাণী—না শক্তি, লক্ষ্মী, তুমি এখন ওসব আরম্ভ করলে ভদ্রলোকও এখনি বিউগল বাজাতে শুরু করবে।

শক্তি—কিন্তু কি বলছিলে, বল।

বাণী—বলবার মত এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। কিরণদিকে একটা চিঠি দিয়েছি। জানতে চেয়েছি, এখন তোমার বয়স ঠিক কত?

শক্তি—বাইশ বছর হয়ে গিয়েছে।

বাণী—হ্যাঁ হ্যাঁ, কিরণদিও তাই লিখেছেন। আমিও শান্তিপুরের চিঠির জবাবে সে-কথা জানিয়ে দিয়েছি।

কথা বলে না শক্তি। শুধু কোলের তুলতুলের দু'হাতের থাবাথাবির নরম উৎ-পাতের কাছে একটা হাত অলসভাবে এলিয়ে রেখে দিয়ে জ্বলন্ত স্টোভটার দিকে আনমনার মত তাকিয়ে থাকে। বাণী কাকিমা মুখ টিপে হাসেন।—দেখছি, সত্যিই বড় হয়েছো। ভাবতে শিখেছো তাহলে? আমি মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম।

শক্তি—আমিও তো দেখছি, তুমি এই একবছরে কত বুড়ি হয়ে উঠেছো।

বাইরের ঘরে প্রণব কাকার নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শক্তি বলে—এ কি? কাকা এখনি ঘুমিয়ে পড়লেন?

বাণী—চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছেন। চায়ের গন্ধ নাকে গেলে জেগে উঠবেন।

শক্তি—কিন্তু আগে তো কাকার এরকম অভ্যেস দেখিনি।

বাণী—সাধে কি অভ্যেস হয়েছে? শেষ রাতে উঠে বেরিয়ে যেতে হয়, ফিরে আসতে এক একদিন বিকেল হয়ে যায়। খুব খাটুনি পড়েছে। নতুন প্লেটুনগুলোর মর্টার ট্রেনিং শুরু হয়েছে।

শক্তি—অনেক দূরে যেতে হয় বোধহয়?

বাণী—হয় বইকি। জীপ নিয়ে ছুটছেন, কখনও এ-জঙ্গলে কখনো সে-জঙ্গলে। আর, নদীর কাছে কোন এক্সারসাইজ থাকলে তো কথাই নেই; ফিরতে রাত হয়ে যায়।

ঘুমন্ত প্রণব কাকা বোধহয় চায়ের গন্ধ পেয়েছেন। তাই তাঁর ডাক শোনা যায়।—চা কি হলো?

শক্তি হেসে ফেলে। কিন্তু বাণী কাকিমা হাসেন না। বরং বেশ একটু অপ্রসন্ন স্বরে কথা বলেন। —তুমি মনে করছো, শুধু

কাজের জন্যেই বাড়ি ফিরতে রাত হয়? না। কাজ শেষ হবার পর মাছ ধরবার জন্যে নদীর জলে ছিপ ফেলে বসে থাকবে। একবার ভেবেও দেখবে না যে, এদিকে একটা মানুষ একা পড়ে আছে।

চায়ের পেয়ালা হাতে তুলে নিয়ে বাইরের ঘরে চলে গেলেন বাণী কাকিমা।

লোখ্‌রার এই রাতটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে। জানালার দিকে তাকাতেই চোখে পড়েছে শক্তির, এইটুকু এককুচি চাঁদের আলোতেই আকাশের কালোমেঘ যেন সাদা ধবধবে গুঁড়োর মত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কৃষ্ণচূড়ার মাথা দুলিয়ে দিয়ে হুহু করে ছুটেছে লোখ্‌রার ময়দানের হাওয়া। কোলের তুলতুল ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই রাত যখন শেষ হয়ে আসে, তখন প্রণব কাকার বুটের খটখাট শব্দ, কিংবা বাণী কাকিমার চা-তৈরীর ঠুং-ঠাং শব্দ শক্তির ঘুম ভেঙে দিতে পারে না; এমনই নিবিড় ঘুম। কিন্তু ভোরের দিকের আরও নিবিড় ঘুম হঠাৎ একটা বিউগলের শব্দে ভেঙে যায়।

ধড়ফড় করে বিছানা থেকে নেমে একেবারে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায় শক্তি।

বাণী কাকিমা বলেন—এ কি? তুমি ওরকম করে হঠাৎ জেগে উঠলে কেন?

শক্তি—এ কী রকমের বিউগলের শব্দ?

বাণী কাকিমা হাসেন—কী রকমের আবার? রোজই তো এইরকম বিউগলের শব্দ করে আর মার্চ করে ওরা চলে যায়।

বাণী কাকিমা ঠিক কথাই বলেছেন। শুনতে পায় শক্তি, ভোরের বাতাসকে তালে তালে শিউরে দিয়ে বুটের শব্দের কাতার চলে যাচ্ছে। পাশের বাংলোর ক্যাপ্টেন থাপার চাকর কয়লাচাপানো উনানটাকে আগুনে ধরিয়ে রাস্তার উপর রেখে দিয়েছে। ধোঁয়া ছড়াচ্ছে উনানটা। তাই দেখতে পাওয়া গেল না, কারা মার্চ করে চলে গেল।

ভোরের বিউগল রোজই বাজে। মেজর বোসের বাড়ির ফটকের ঠিক সামনে এসেই বেজে ওঠে। একদিন বলেই ফেলে শক্তি। —আমার কি-রকম মনে হয় জান, কাকিমা? বিউগলের শব্দটা যেন ইচ্ছে করে আমাদের বাংলোর ঠিক গেটের কাছে এসে বেজে ওঠে।

বাণী কাকিমা বলেন—হতে পারে। ওরা হয়তো মনে করে, বিউগলের শব্দ শুনে খুশি হবেন মেজর সাহেব।

না, কেষ্টচূড়ার দোলনাতে চড়ে বাণী কাকিমাকে আতঙ্কিত করতে চেষ্টা করেনি শক্তি, যদিও পাঁচটা দিন এই লোখরাতেই কেটে গেল। বিকেল হয়েছে যখন, তখন এক হাতে তুলতুলকে দোলনাতে বসিয়ে আর ধরে রেখে, আর-এক হাতে আস্তে আস্তে দুলিয়েছে।

সন্ধ্যে হয়। চায়ের টেবিলে বসে বাণী কাকিমার সঙ্গে কথা বলে শক্তি। —এবার আমাকে কদমবাড়ি ফিরে যেতে হয় কাকিমা, আর দেরি করা চলে না। বাগানে একটা খবর পাঠাবার......।

শক্তির কথাটা না ফুরোতেই পাশের ঘর থেকে প্রণব কাকা বলে ওঠেন। —হ্যাঁ, শক্তি, বি রেডি। এখনই বের হতে হবে।

বাণী কাকিমা আশ্চর্য হয়ে বলেন—কী বলছেন ভদ্রলোক?

প্রণবকাকা—বলছি, শক্তিকে এখন এগজিবিশন দেখাতে নিয়ে যাব।

বেশ সুন্দর আর বেশ অদ্ভুত এগজিবিশন। মস্ত বড় সামিয়ানার নীচে ময়দানের একপাশের একটা জায়গার উপর নানারকমের তৈরী-করা বিচিত্রতা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। নদীর উপর পনটুন ব্রিজ, পুরো প্যাক কাঁধে নিয়ে নদী পার হচ্ছে সৈনিক। দুশমনের মেসিনগানের দিকে তাক করে গ্রেনেড ছুঁড়ছে একলা একজন ভয়ানক শক্ত চেহারার জমাদার। রিমাউন্টের টাট্টু ঘোড়ার তিনটে সত্যিকারের নতুন বাচ্চা শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে দানা খাচ্ছে। স্তূপ করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ক্যাপ্টেন থাপার বাগানের টমেটো, যার সাইজ ক্রিকেট বলের চেয়েও বড়। আর ওদিকের ওগুলো বোধহয় নেফার পাহাড়।

মস্ত বড় একটা ত্রিপলকে ঢেউ খেলিয়ে দিয়ে নেফার পাহাড় তৈরী করা হয়েছে। কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে পাহাড়ের পাথরে গা, আর সবুজ রঙ দিয়ে জঙ্গল আঁকা হয়েছে। ঝর্ণা আর নদীগুলো সাদা। সড়কটা মেটে রঙের। আর, পেঁজা তুলোর মোটা একটা লাইন আঠা দিয়ে সেঁটে বরফ-ঢাকা সীমান্তের চেহারাও আঁকা হয়েছে। নীল আলোর খুব ছোট এক-একটা বাল্‌ব জ্বলছে সেই তুলোর বরফ-লাইনের এখানে আর ওখানে—তোয়াং, চোলা, বুমলা, থাগলা।

সত্যিই যে সুজিতবাবু দাঁড়িয়ে আছে এখানে। হেসে ওঠে শক্তি—আপনি এখানে কি করছেন?

সুজিত বলে—এটা আমিই তৈরী করেছি।

শক্তি—আপনি?

সুজিত—হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন থাপা বলেছেন, আমার এই নেফার পাহাড়ই ফার্স্ট প্রাইজ পাবে।

শক্তি—বেশ, খুব সুখবর শোনালেন। সত্যিই দেখতে খুব চমৎকার হয়েছে এই নেফা-পাহাড়।

লম্বা একটা স্টিক হাতে তুলে নিয়ে, আর স্টিকের ডগাটাকে বুমলার বরফের গায়ে ছুঁইয়ে দিয়ে সুজিত হাসতে থাকে। —আরও একটা সুখবর পেয়েছি। এই বুমলাতে আমাদের প্লেটুনের পোস্টিং হবে।

—তাই নাকি। খুব ভাল হলো। সত্যিই খুব ভাল খবর। শক্তির দুই চোখের তারার উপর নীল বাল্‌বের বুমলার আলোটাও যেন নীলাভ বিস্ময়ের আলো হয়ে হাসতে থাকে।

এতক্ষণ ওদিকে ব্যান্ড-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন থাপার সঙ্গে গল্প করছিলেন প্রণব কাকা। এইবার হাত তুলে ইসারায় শক্তিকে ডাক দিলেন। চলে গেল শক্তি।

আজই ছিল এগজিবিশনের শেষ দিন। কাজেই আর একটি দিন পরে ময়দানের সামিয়ানাও অদৃশ্য হয়ে গেল। শক্তি বলে—আর দেরি করবো না কাকা। এবার কদমবাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিন; কৈলাস গাড়ি নিয়ে এসে আমাকে নিয়ে যাক।

প্রণব কাকা। —আজ নয়, কাল খবর পাঠাবো। আজ তুই বরং এখুনি তৈরী হয়ে নে। কুইক!

শক্তি—কেন?

প্রণব কাকা—মাছ ধরবি চল।

বাণী কাকিমা ভ্রূকুটি করেন। —এ কি কথা।

প্রণবকাকা—তার মানে আমি মাছ ধরবো, শক্তি শুধু বসে বসে দেখবে।

বাণীকাকিমা—তাতে শক্তির লাভ কি?

প্রণব কাকা—শক্তির লাভ, বসে বসে নদীর বিউটি দেখবে। নদী জিয়াভরলি, একেবারে জীবন্ত ভরলি।

শক্তির আপত্তি নেই। তাই বাণীও আর আপত্তি করেন না। বরং রান্নাঘরে ঢুকে এক ঘণ্টার মধ্যে একগাদা লুচি ভেজে আর হালুয়া তৈরী করে হাঁপিয়ে উঠলেন। এক হাতে খাবারের বাস্কেট তুলে নিয়ে, আর-এক হাতে শক্তির একটা হাত ধরে প্রণব কাকাও জীপে উঠলেন।

গরগর করে শব্দ করছে জীপের ইঞ্জিন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আর জীপের দিকে তাকিয়ে বাণী বলেন—আস্তে চালিও।

মেজর পি বোস সেই মুহূর্তে তাঁর বাঁ পায়ের বুটের গোড়ালির সব জোর দিয়ে অ্যাক্সিলেটার চেপে দিলেন। চিতে বাঘের মত তিনটে লাফ দিয়েই মত্ত হয়ে ছুটে চললো জীপ।

—অনেকটা রাস্তা। তাড়াতাড়ি না গেলে তাড়াতাড়ি ফিরবো কি করে? তোর কাকিমার কমনসেন্স একটু কম, যদিও মানুষটা ভাল। মেজর বোসের গলার স্বরও যেন একটা ছুটন্ত আনন্দে গরগর করে হাসতে থাকে।

—ওই যে ছেলেটা, তোর চিঠি নিয়ে চাকরির জন্যে আমার কাছে এসেছিল......।

শক্তি—সুজিত।

মেজর বোস—হ্যাঁ, সুজিত ছেলেটা আমার চেয়েও বড় ট্যালেণ্ট।

শক্তি—কি বললেন?

মেজর বোস—মাছ ধরতে সাংঘাতিক

ওস্তাদ। সেদিন আমাকে কেমন সরল করে বুঝিয়ে দিল, টোপের বদলে আরও দু'হাত বাড়িয়ে দিন; তা না হলে এরকম স্রোতের জলে বড় মাছ পাবেন না। সত্যি, টোপের বদলে বাড়িয়ে দিয়ে ছিপ ফেলাতেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইয়া বড় একটা সাতসেরী চিতল গেঁথে ফেললাম। তাই আমি......।

লোখরা ময়দানের সীমানা পার হয়ে জীপ এখন একটা আমবাগানের ছায়াঘেঁষা কাঁকরে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। আম-বাগানের ভিতরে অনেক তাঁবু।

মেজর বোস হঠাৎ ব্রেক দাবিয়ে জীপ থামালেন। —তাই আমি যখনই মাছ ধরতে যাই, তখন হাবিলদার সুজিতকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আগেই ওকে একটা খবর দিয়ে রাখি। থাপাকে বলে ওর একবেলার ছুটি করিয়েও নিই।......ওই যে এসে পড়েছে।

আমবাগানের তাঁবুর ভিড়ের ভিতর থেকে বের হয়ে, একটা ছিপ আর একটা থলি হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে সুজিত।

ছিপ-ধরা হাতটা জীপের বাইরে রেখে পিছনের সীটের উপর উঠে বসে সুজিত। সামনের সীট থেকে শুক্তি মুখ ফিরিয়ে তাকায় আর হেসে ফেলে—আপনি মাছ ধরতে ওস্তাদ?

সুজিত হাসে—সাহেব তাই বলেন।

মেজর বোস—পটাশিলাতেই যাওয়া যাক্, কি বল সুজিত?

সুজিত—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।

কলকল করে জিয়াভরলির জলের স্রোত যেন পটাশিলার যত শিলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার এক বিপুল উল্লাসের কল্লোল তুলে ছুটে চলেছে। ভেসে চলেছে রঙীন হাঁসের সারি। কিনারা থেকে লতার ঝোপ ঝুঁকে ঝুঁকে জিয়াভরলির জলের দুরন্ত ফুর্তির বুকটাকে দেখছে। জলের ভিতর থেকে ছোট ছোট উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক হঠাৎ ছট-ফটিয়ে লাফিয়ে উঠেই আবার ডুবে যায়। রোদ লেগে হীরার কুচির মত ঝিকমিকিয়ে জ্বলে ওঠে উড়ুক্কু ছোট-মাছের গা।

সুজিত যেখানে বসতে বলেছে, ঠিক সেখানেই বসেছেন মেজর বোস। শক্ত করে ছিপ ধরে আর ফাত্নার দোলার দিকে তাকিয়ে ধ্যানীর মত বসে থাকেন। চার ঘণ্টার মধ্যে তিনটে ফলুই তুললেন, সাইজ আর ওজন মন্দ নয়।

শুক্তি যখন খাবারের বাস্কেট খোলে, তখন তিনটে খাবারের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বেশ একটু কুণ্ঠিতভাবে হাসতে থাকেন মেজর বোস। —তোর কাকিমার বেশ কমনসেন্স আছে, তাই না, শুক্তি? তিনটে প্যাকেট করে দিয়েছে, তোর আর খাবার নাড়া-চাড়া করবার কোন ঝঞ্ঝাট ভুগতে হলো না। ওসব অভ্যেসও তোর বোধহয় নেই।

শুক্তি হাসে—তাহলে বাড়ি গিয়ে বাণী কাকিমাকে একটা ধন্যবাদ জানাবেন।

এতক্ষণে প্রণব কাকার পাশে বসে আর জলের শব্দ শুনে শুনে শুক্তির চোখের পাতা তিনবার জড়িয়ে গিয়েছে; ঘুমের আবেশ সামলাতে গিয়ে কয়েকবার হেলেপড়া মাথাটাকেও সামলাতে হয়েছে। প্রণব কাকা অবশ্য একবার বলেছেন, ঘুমোতে হলে যা, জীপের সীটে বসে ঘুমোগে। কিন্তু কাকার কথার তো কোন মানে হয় না; জীপের কাছে একটা গাছের ছায়াতে যে চুপ করে বসে আছে সুজিত।

খাবারের একটা প্যাকেট হাতে তুলে সেই গাছের ছায়ার দিকে তাকায় শুক্তি। সুজিতও এসে খাবারের প্যাকেট হাতে তুলে নিয়ে চলে যায়।

শুক্তি বলে—আর কত দেরি করবেন, কাকা?

প্রণব কাকা বলেন—মনে হচ্ছে, চুপ করে বসে থাকতে তোর আর ভাল লাগছে না, তাই না?

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ।

প্রণব কাকা—তবে কি করবি?

শুক্তি—আমি বরং......

প্রণব কাকা—বেশ তো, একটু ঘুরে ফিরে দেখ।

ঘুরে ফিরে আর কি দেখবারই বা আছে? দেখতে পায় শুক্তি একটু দূরে, সেগুনের ছায়ার কাছে সাদাটে চেহারার একটা পাথর স্রোতের জল ছুঁয়ে যেন একটা আরামের বেদির মত পড়ে আছে।

এগিয়ে যেয়ে, সাদাটে পাথরের উপর বসে, আর উঁকি ঝুঁকি দিয়ে নীচের স্রোতের জলের ঘূর্ণিটাকে দেখতে থাকে শুক্তি।

—জলে পা ডোবাবেন না কিন্তু। ডাক দেয় সুজিত। শুনতেও পায় শুক্তি।

মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায় শুক্তি, একটু দূরে, আর-একটা সেগুনের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে এদিকের এই সাদাটে পাথরের দিকে তাকিয়ে আছে আর হাসছে সুজিত।

শুক্তি বলে—ওখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছেন? এখানে এসে দেখুন।

এগিয়ে আসে সুজিত। সাদাটে পাথরটার উপরে উঠেই ব্যস্তভাবে বলে—আঃ, এখানে ঘূর্ণিটাকে এত দেখছেন কেন? হঠাৎ মাথা ঘুরে যেতে পারে; বরং ওখানে তাকিয়ে দেখুন।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, স্রোতের এই ঘূর্ণিটার দিকে আর না তাকিয়ে, মাঝনদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকে শুক্তি।

ওখানে মাঝনদীর রোদমাখানো জল, যেন গলা সোনার ঢল। এখানে ছায়া। সেগুনের পাতার আড়ালে বসে কতরকমের সুরে শিস দিচ্ছে পাখি। জলের গুঁড়ো ছিটকে এসে চোখে-মুখে লাগছে। জলের শব্দটাও অদ্ভুত; পাথরের কাছে এসে ছলছল করে, ছায়ার কাছে গিয়ে কলকল করে।

যেন হঠাৎ-বিহ্বল একটা খুশির গুঞ্জন। আপনমনের একলা ভাষার মত গুনগুন করে কথা বলে শুক্তি।—সত্যি চমৎকার! জিয়া-ভরলি সত্যি জিয়া ভরলি। প্রাণ ভরে গেল।

[এগার]

এ তো বড় অদ্ভুত অস্বস্তি। এই চেনা আকাশের আসা-যাওয়ার পথে কোনদিনও এরকমের অস্বস্তি বোধ করেনি শুক্তি। অস্বস্তিটা যেন একটা করুণ কৌতুক।

এ অস্বস্তিকে ভয় করবার কিছু নেই, লজ্জা করবারও কোন মানে হয় না। কিন্তু, কি আশ্চর্য, শুক্তি হেসে ফেললেও অস্বস্তিটা যেন লজ্জিত হয় না, সরেও যায় না; বরং বেশ করুণ-শান্ত একটা মুখ নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, আকাশের পশ্চিমের একটা মেঘের দিকে চোখ তুলে তাকায়; তারপর সিগারেট ধরিয়ে কোন্ দিকে যেন চলে যায়।

গৌহাটি থেকে যাত্রীতে ভর্তি হয়ে আর অনেক মেঘ পার হয়ে প্লেন এখন কলকাতার কাছাকাছি আকাশে এসে পড়েছে। বোধহয় আর দশ মিনিটের মধ্যেই দমদম পৌঁছে যাবে এই প্লেন, এই ডাকোটা, যার পাইলট হলেন সেই চেনা-মুখ ভদ্রলোক।

কদমবাড়ি থেকে রওনা হবার দিন সত্যিই মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর একবার তেজপুরের একটা দিন; তারপর আর নয়। তারপর আর যা-কিছু দেখতে হলো আর শুনতে হলো, তার সবই তো মন হাসিয়ে দেবার মত এক-একটা বিস্ময়ের আচমকা আলোর ঝিলিক। শুধু এই অস্বস্তিটা, যেটা গৌহাটি থেকে প্লেন ছাড়তেই শুক্তির মনের শান্তির একটা নতুন উৎপাত হয়ে উঠেছে, সেটা শুক্তিকে হাসিয়ে দিয়েও হঠাৎ এক-একবার একটু গম্ভীর করে দেয়।

কথা ছিল ড্রাইভার কৈলাস গাড়ি নিয়ে শুক্তিকে কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু কৈলাস নয়; শেষ পর্যন্ত উপেন মিস্ত্রির এসে সাহেবকুঠির টুরারের স্টিয়ারিং-এ বসলো আর শুক্তিকে তেজপুরে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

মঙ্গলদই থেকে চিঠি পেয়েছে কৈলাস, কৈলাসের স্ত্রী মারা গিয়েছে। কিন্তু কাঁদেনি কৈলাস, শুধু গ্যারেজের একটা পুরনো গাড়ির সীটের ছেঁড়া গদির উপর অনেকক্ষণ ধরে স্তব্ধ মড়ার শরীরের মত লুটিয়ে পড়ে ছিল। তারপরেই উঠে এল কৈলাস; সাহেবকুঠির সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আর গগন বসুর মুখের দিকে একবারও না

তাকিয়ে, ফরফর করে ওর লাইসেন্সটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিল।—মাপ করবেন হুজুর, আমি আর চাকরি করবো না।

শান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করে কৈলাস, কিন্তু হাসতে পারে না। তবু বেশ শান্তস্বরে বলে—আপনার কাছ থেকে পাঁচ টাকা বকসিস নেবার আর দরকার হলো না, দিদি।

শান্তি—তুমি এখন কোথায় যাবে? কি করবে?

এইবার হেসে ফেলে কৈলাস—দেখি, কোথায় যাই। দেখি কি করতে পারি। ভিখারী যোগী কিংবা পরমহংস, কিছু একটা হতে হবে তো!

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল কৈলাস। তারপর কৈলাসের চোখ দুটো যেন শক্ত হয়ে ইস্পাতের গুলির মত চিকচিক করে উঠলো।—শুনেছি সেই পুলিশ মহারাজ মঙ্গলদই থেকে বদলি হয়ে তেজপুরে এসেছেন। তরক্কি হয়েছে তাঁর, আওরভি উঁচা তক্ত পর বসেছেন। আচ্ছা চলি; নমস্তে হুজুর, নমস্তে দিদি।

বাবাকে একবার বলে দেখলে হতো, কৈলাসকে অন্তত দু'মাসের মাইনের মত টাকা বকসিস করে দাও। যাক্‌গে, না বলে ভালই হয়েছে। সে বকসিস নিতে কৈলাস রাজি হতো কিনা সন্দেহ। কৈলাসের তো মাথার ঠিক নেই।

না, ইনি চেনামুখ নন, এই এয়ার হোসটেস। ইনি বোধহয় সাউথ ইণ্ডিয়ার মেয়ে। শান্তি কাপুর থাকলে আজও নিশ্চয় সেবারের মত নিজেই কাছে এসে আর গল্প করে চলে যেত। কিন্তু কে জানে, আবার হঠাৎ কি-কথা বলে ফেলতো আর মুখ টিপে হাসতো। শান্তির চোখের কোণে সব-সময় যেন ভয়ানক একটা দুষ্টুর হাসি চিকমিক করে।

মালতীর চোখে কিন্তু আগের মত সেই দুষ্টু খুশির হাসি আর চিকচিক করে না। হাসে বটে মালতী, কিন্তু বড় বেশি শান্ত হাসি। জিজ্ঞাসা করেছিল শান্তি, হাতির দাঁতের সেই চিরুনিটা আছে তো মালতী?

মালতী—আছে।

শান্তি—মাঝে মাঝে মাথায় দাও তো?

মালতী—এই তো মাথাতেই রয়েছে। বলতে বলতে কেঁদে ফেলে, আবার হেসেও ফেলে মালতী।

মালতীর দাদা শিশিরবাবু একটা নতুন চাকরি নেবার খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাননি। মালতী বলে—সরকারী এগ্রিকাল-চারের চাকরি। একটা পরীক্ষাও হয়েছিল, ইণ্টারভিউও হয়েছিল। সব চেয়ে বেশি নম্বরও পেল দাদা। জানই তো, দাদা খুব ভাল বোটানি জানে।

শান্তি—জানি।

মালতী—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না।

শান্তি—কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেল কে?

মালতী—পেয়েছে সুধীর শর্মা নামে কে একজন, কোন্ এক মিনিস্টারের সেক্রেটারীর ভাগ্নে। ইণ্টারমিডিয়েটও পাস করেনি। আজ আবার......।

শান্তি—আজ আবার কি হলো?

মালতী—বোধহয় রেলওয়ে কিংবা এল আই সির চাকরি, দরখাস্ত করবার ফরম আনতে সরকারী অফিসে গিয়েছিল দাদা, কিন্তু ভাগ্যে আর ফরম পাওয়া হলো না।

শান্তি—কেন?

হেসে ফেলে মালতী—কেরানীবাবু বললেন, ফরম পেতে হলে অন্তত আমার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করুন।

শান্তি—তার মানে?

মালতী—তার মানে অন্তত পাঁচটা টাকা দিন, পান খাওয়ার জন্যে।

শান্তিও হেসে ফেলে—কী রকম লোক রে বাবা!

মালতী—তারপর যা হবার তাই হয়েছে। দাদার যা স্বভাব, কেরানীবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলেও কোন ফল হলো না। তিনি বললেন,

বাড়ি যান মশাই, মাথা গরম করবেন না।

শুক্তি—শিশিরবাবু এখন বাড়িতে নেই বোধহয়।

মালতী—না; বউদিকে নিয়ে ডাক্তার মুখার্জীর কাছে গিয়েছে।

শুক্তি—কি হয়েছে প্রমীলার?

মালতী—হার্টের কষ্ট।

শুক্তি—সেরে যাবে নিশ্চয়।...আচ্ছা চলি... না, আজ আর চা খেতে ইচ্ছে করছে না, মালতী।

মালতীদের বাড়ির বাইরে এসে একবার, আর রবার বাগানের বাড়িতে ফিরে এসেই একবার, খুব জোরে হাঁপ ছেড়েছিল শুক্তি।

সব শুনেও মেসোমশাই মহিমবাবু কিন্তু অদ্ভুত কথা বললেন আর হাসলেন—হ্যাঁ, এসব একটু দুঃখের কথা বটে; কিন্তু ঝগড়াঝাটি আর তর্কাতর্কিও কাজের কথা নয়। একটু সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া, ভাগ্য নামে একটা ব্যাপার আছে; সেটাও তো অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীর চওড়া বারান্দার মোজেয়িকের উপর আস্তে-আস্তে হাঁটছেন আর কথা বলছেন মহিম দস্তিদার। মাঝে মাঝে আলোর কাছে এসে থামছেন আর মুগার চাদরটাকে ভাল করে গায়ে জড়াচ্ছেন। দেখতে অদ্ভুত লাগে, মেসোমশাই মানুষটা নিজে এত আলোকিত বলেই বোধহয় বাইরের কোন অন্ধকার তাঁর চোখে পড়ে না। ভাল কথাই তো বললেন মেসোমশাই, কিন্তু কেমন-যেন হেঁয়ালির মত কথা। ঠিক বুঝতে পারা যায় না।

শুধু কি একা মহিম দস্তিদার? এই ভারতীর বাইরের ঘরে মহিমবাবুর যে-সব বন্ধু আসেন আর গল্প করে চলে যান, যেমন শৈলেশ্বর সইকিয়া আর মহাদেব চৌধুরী, তাঁরাও সবাই ঠিক ওই রকম হেঁয়ালির মত কথা বলেন, আর দুঃখিতভাবে হাসেন। শৈলেশ্বর সইকিয়ার অনেক বাড়ি আছে এই তেজপুরে; তাছাড়া গৌহাটিতে আর শিলং-এ। ইনকম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী তিন ছেলেকে বিলেতে পাঠিয়ে লেখা-পড়া শেখাচ্ছেন; দুই জামাইকে দুটি বাড়ি উপহার দিয়েছেন। তাছাড়া যখন-তখন, প্রায় প্রতি মাসে সোনা কেনাও তাঁর একটা অভ্যাস।

কিন্তু মণিমাসি হঠাৎ খুশি হয়ে যে-কথা বলে উঠলেন, তাঁর মধ্যে কোন হেঁয়ালির ছিটে-ফোঁটাও ছিল না। ভাবতে পারেনি শুক্তি, মণিমাসির মত মানুষ, যিনি সোম লজ থেকে শুক্তির ফিরতে একটু দেরি হলে দশবার দশরকমের কথা জিজ্ঞেসা করেন, তিনি নিজেই এরকম একটা কথা বলে ফেলবেন।

সেই সোম লজ। ভিতরের ঘরে অঞ্জলির সঙ্গে গল্প করছেন মণিমাসি। আর, সোনালী রঙের গ্রীল দিয়ে ঘেরা বারান্দার ঠিক সেখানে সেই চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে অনিমেষ।

ব্রহ্মপুত্রের জলের কোন ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায় না। কিন্তু শুক্তির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অনিমেষের গলার স্বরে যেন ঢেউ জেগেছে। যদিও গল্পের কথাগুলি নতুনরকমের কোন কথা নয়। তেজপুরে এয়ারপোর্ট থেকে সামান্য একটু দূরে একটা বিল আছে; নাম শোলমারা বিল।

—নাম শুনে ঘাবড়ে যাবেন না। লোকে বলে, আকাশে যদি পূর্ণিমা চাঁদ থাকে, আর বিলের জলে তখন যদি একটা সাদা হাঁস উড়ে এসে নামে, তবে তখুনি দেখা যাবে যে, বিলের জলের উপর নীলপদ্ম ফুটে রয়েছে। কাল তো পূর্ণিমা, চলুন না, একবার দেখেই আসি, সত্যি নীলপদ্ম ফোটে কিনা।

অনিমেষের এই উতলা অনুরোধের একটা জবাব দিতে হবে। কিন্তু কী জবাব দিতে পারে শুক্তি? নীরব শুক্তির নিশ্বাসের বাতাসের সঙ্গে যেন হাঁসফাঁস করছে শুক্তির প্রাণের সব সাহস।

কিন্তু কি আশ্চর্য, মণিমাসি নিজেই হঠাৎ ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে কত সহজে বলেই দিলেন—বেশ তো, যাও না দুজনে, একবার জায়গাটা বেড়িয়ে দেখে এস।

অনিমেষ হাসে—উনি যদি আপত্তি না করেন তবেই তো যাওয়া সম্ভব।

মণিমাসি—না না, আপত্তি করবার কি আছে? আপত্তি করবে কেন শুক্তি?

শুক্তিও এইবার হাসতে চেষ্টা করে।—আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু...।

মণিমাসি—কিসের কিন্তু?

শুক্তি—কলকাতা থেকে ফিরে আসি, তারপর না হয় যে-কোন দিন...।

মণিমাসি—বেশ তো; তাই না হয় হবে, আপত্তি না থাকলেই হলো।

সেদিনের পর আর যে-দুটো দিন তেজপুরে থাকতে হয়েছিল, তার মধ্যে আর-একবারও সোম লজে যাওয়া হয়নি শুক্তির, যদিও অনেকবার মনে পড়েছে, সন্ধ্যাবেলার সোম লজের বারান্দায় একটা চেয়ারের কাঁধে হাত রেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন অনিমেষবাবু। আপত্তি নেই, শুধু এই একটা কথার মধ্যে কে-জানে-কিসের সান্ত্বনা পেয়ে গেলেন অনিমেষবাবু, যে জন্যে শুক্তির মুখের দিকে ওরকম অদ্ভুত শান্ত একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইলেন।

নতুন পাড়ার মীরাকাকিমাও যে অদ্ভুত একটা গল্প বলে হাসিয়ে দিলেন। কল্পনা করতে পারেনি শুক্তি, মীরাকাকিমার কাছে গেলে হঠাৎ এরকম একটা গল্প শুনতে হবে। গল্প বটে, কিন্তু সেটা মীরাকাকিমারই একটা চিন্তার কীর্তি।

শীতল বিশ্বাস গরীব মানুষ, মীরাও গরীবের ঘরের মেয়ে। কিন্তু মীরার মামার বাড়ি খুবই বড় ধরনের বড়লোকের বাড়ি। সে-কথা তো জানাই ছিল শুক্তির; মণিমাসিও শুক্তির কাছে শীতলের বউ মীরার মামার অগাধ সম্পত্তির কাহিনী অনেকবার বলেছেন। আমেরিকা থেকে জাহাজ ভর্তি হয়ে মীরার মামার আমদানির মেশিন আসে। কারবারের হেড অফিস বোম্বাই, সে-অফিস দেখাশোনা করে মীরার মামার বড়ছেলে রাজীব। মীরার মামা-মামী থাকেন নাসিকে, গোদাবরীর কাছে শখের দুর্গের মত মস্ত বড় এক বাড়ি। সে-বাড়ির বাগানের ভিতরে টেনিস খেলবার তিনটে কোর্ট আছে।

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত এই রাজীবের গল্প বলে বলে শুক্তির মনের যত সন্দেহ বিস্ময় আর কৌতুকের প্রাণ ক্লান্ত করে দিলেন মীরা। রাজীব সত্যিই রাজীব, দেখতে খুব ভাল। স্বভাবে বা কথায় এক ফোঁটাও অহংকার নেই। রাজীব একদিন ওর অফিসের কেরানী সদাশিব নাইডুর বুড়ি মাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল।

হেসে ফেলে শুক্তি—আমাকে হঠাৎ এরকম একটা ট্রেজার আইল্যান্ডের গল্প শুনিয়ে তোমার লাভ কি মীরাকাকিমা?

মীরা—আমার লাভ এই যে তোমার লাভ হতে পারে।

শুক্তি—বাস্, আর নয়, এইবার এখানে তোমার গল্প থামিয়ে অন্য কথা বল।

মীরা—আমি কিন্তু নাসিকে মামীর কাছে চিঠি লিখে দিয়েছি।

শুক্তি—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

মীরা—রাগ করলে নাকি?

শুক্তি হেসে ফেলে—এত মজার একটা গল্প শুনে কি কেউ রাগ করে?

মীরা—যাক, তা হলেই হলো।

হঠাৎ শুক্তির চোখ দুটো একটু চমকে ওঠে, আর বড়-বড় হয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকায়।—দেয়ালের গায়ে ওটা কী বস্তু ঝুলিয়ে রেখেছো মীরাকাকিমা?

একটা সামান্য বস্তু। ছোট-ছোট রঙীন পাথর-নুড়ির একটা মালা। ছোট মেয়ের খেলবার জিনিস নয়, মীরার মত বয়সের বাঙালী নারীর গলায় পরবার জিনিসও নয়।

মুখে হাত রেখে হাসি চাপতে চেষ্টা করেন মীরা।—বলতে পারি, কিন্তু বলা উচিত নয় বোধহয়; মণিদি বলে রেখেছেন, শুক্তির কাছে কখনও এ-গল্প বলবে না।

শুক্তি—তাহলে বলো না।

মীরা—তাহলে বলেই ফেলি। ওটা হলো দফলা-মেয়ে সেই রেনাকির রাগের মালা।

শুক্তি—তার মানে?

মীরা—তার মানে অনুরাগের মালা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, রেনাকি একদিন এই মালাটাকে ওর ঝোলার ভেতর থেকে বের করে রতন ঠাকুরপোর হাতের কাছে......।

শুক্তি—থাক্, এবার তুমি চুপ কর।

কিন্তু মীরা কি চুপ করে থাকবার মত মানুষ? তাড়াতাড়ি করে একটা রেকাবী ভর্তি করে একগাদা জিলিপী নিয়ে এসে

শান্তির হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন—খাও আর শোন। এমন কিছু বাজে কথা নয় যে শুনতে তোমার খারাপ লাগবে।

রেনকি সেদিন রাগ করে চলে যাবার পরেই দেখতে পেয়েছিলেন মীরা, ঘরের কোণে একটা বাক্সের পিছনে ওই মালাটা পড়ে আছে। রেনকি নয়; রতনই মালাটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিল। মীরার কাছে একদিন একেবারে স্পষ্ট করে বলে ফেলেছিল রেনকি, আমি তোমাদের রতনের কাছে বউ হয়ে থাকবো।

মীরা—কিন্তু রতন কি বলে?

রেনকি—রতন বলে, তা হয় না।

মীরা—তবে কি করে হবে?

রেনকি—তবে আমার মুখে রঙ দিয়েছিল কেন রতন?

মীরা—দিয়েছিল নাকি?

রেনকি—নিশ্চয়, রতনকে জিজ্ঞেসা করে দেখ।

মীরা—তোমার মুখে কেন রঙ দিল রতন?

রেনকি—আমি বলেছিলাম।

মীরা—কেন বলেছিলে?

রেনকি—রতন বলেছিল, যাকে ভাল লাগে তার মুখে রঙ মাখিয়ে দিয়ে পরব করে ওর দেশের লোক।

মীরা—কিন্তু তোমাদের বিয়ে কি করে হবে রেনকি? সরকারী মানা আছে যে?

আর কোন কথা বলেনি রেনকি। শুধু ঘরের আয়নাটার দিকে চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মীরা—সত্যি শান্তি, রেনকি যেন আয়নাতে ওর ওই খোঁপা বাঁধা, জরি-হাতা ব্লাউজ গায়ে, আর রঙীন তাঁতের শাড়িপরা চেহারাটারই ওপর রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখতে আমারও বেশ একটু কষ্ট হয়েছিল শান্তি।

শান্তি—রতন কাকা নেফা থেকে আর এখানে আসেননি?

মীরা—না।

শান্তি—আসবেন নিশ্চয়। ছুটি পেলেই আসবেন।

মীরা—তাই যেন হয়।

বেচারা দফলা-মেয়ে, বোকা রেনকি! বেচারা রতনকাকা, নেফা মেডিক্যালের পিয়ন। কিন্তু সরকারী আইনের নিষেধটাকে বেচারা বলতে একটুও ইচ্ছে করে না। মীরা কাকিমার কাছ থেকে এ গল্পটা না শুনলেই ভাল ছিল। হাতে ধরা গল্পের বইটার পাতার উপর শান্তির চোখ পড়ে থাকলেও হঠাৎ এক-একবার চোখের সামনে যেন রেনকির পাথুরে মালাটা দুলে ওঠে। তাই বইটাকে এখন বন্ধ করে রেখে দিতে ইচ্ছে করে।

গৌহাটি এয়ারপোর্টের মাথার উপর এসে আর কাত হয়ে প্লেন নামতে শুরু করেছে। খোলা বইটা বন্ধ করে হাতব্যাগের ভিতরে ভরে দেয় শান্তি।

তারপর আর নেফার দফলা-মেয়ে রেনকির কথা নয়, কদমবাড়ির গগন বসুর মেয়ে শান্তি বসুরই একটা অদ্ভুত হঠাৎ-বিস্ময়ের অস্বস্তিকে এতক্ষণ ধরে হাসিমুখে সহ্য করতে চেষ্টা করেছে শান্তি। মনে হয়, এই প্লেন থেকে নেমে না যাওয়া পর্যন্ত এই অস্বস্তি দূর হবে না। দমদম পৌঁছতে কি দশ মিনিটের আরও বেশি সময় লাগবে?

গৌহাটিতে নেমে বিরামের পঁচিশ মিনিট সময় অনায়াসে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের কোচের উপর বসে আর গল্পের বই পড়ে কাটিয়ে দিতে পারা যাবে, এই তো আশা করেছিল শান্তি। কিন্তু সে-আশা যেন একটা আচমকা আঘাতে গল্পের সামনে পড়ে মিথ্যে হয়ে গেল।

পাইলট ভদ্রলোক হঠাৎ কোথা থেকে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন।—আমি আপনাকে চিনি। কিন্তু আপনি আমাকে চেনেন না; পরিচয় দিলেও চিনতে পারবেন বলে মনে হয় না।

চমকে ওঠে শান্তি—আমি তো সত্যিই আপনাকে চিনি না। শুধু আগে দু'একবার দেখেছি। কিন্তু আপনি আমাকে চিনবেন কেমন করে?

—এখানে অনেকেই তো আপনাকে চেনে। জিজ্ঞেসা করলে ক্যান্টিনের ম্যানেজারও বলে দিতে পারবেন যে, আপনি প্ল্যান্টার বোস সাহেবের মেয়ে। কাজেই আপনার পরিচয় জেনে নিতে আমার বেশি খোঁজ করতে হয়নি।

শান্তি—প্লেন ছাড়তে আর কত দেরি?

—দেরি আছে। অন্তত আরও দশ মিনিট না পার হলে প্লেন ছাড়বে না। আপনার বাণীকাকিমা কিন্তু আমাকে চেনেন। আমাদের বাড়ি শান্তিপুরে। আমার নাম পরিতোষ মৌলিক।

শান্তি—আমি শান্তিপুরে কখনো দেখিনি।

পরিতোষ—দেখলে আপনার খুব খারাপ লাগবে না মনে হয়। আপনার বাণী কাকিমার বাবা হলেন আমাদেরই পাশের বাড়ির প্রতাপবাবু; আত্মীয় না হয়েও তিনি আমাদের প্রায় আপন-জন। ছেলেবেলায় প্রতাপকাকাকে খুব ভয় করতাম; উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে দেখে নিয়ে যখন বুঝতাম যে প্রতাপকাকা বাড়ি নেই, তখন ডাণ্ডা-গুলি হাতে নিয়ে খেলতে বের হতাম।

শুধু হাতঘড়ির উপর দু'চোখের দৃষ্টিটাকে বসিয়ে রেখে, আর নিজেকে একেবারে নীরব করে নিয়ে বসে থাকে শান্তি।

পরিতোষ—আপনি বোধহয় একটু আশ্চর্য হয়েছেন, আর বেশ বিরক্ত বোধ করছেন। কিন্তু......তবু......সব বুঝেও সাহস করে আপনাকে আর-একটু আশ্চর্য করে দিতে চাইছি।

শান্তি—কি বললেন?

পকেট থেকে একটা ফটো বের করে পরিতোষ—এটা নিশ্চয় আপনার ফটো?

চমকে ওঠে শুক্তি—এ কি!

পরিতোষ হাসে—চুরি করিনি।

শুক্তি—একথা কেন বলছেন? আমি কি তাই মনে করেছি?

পরিতোষ—তবে কি মনে করলেন?

শুক্তি—ভাবছি, আপনার কাছে আমার ফটো কেমন করে এল?

পরিতোষ—মনে নেই কি আপনার? অনেকদিন আগে একবার আপনার ব্যাগ থেকে......।

শুক্তি—হ্যাঁ, কয়েকটা ফটো পড়ে গিয়েছিল আর আপনি কুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পরিতোষ—তবু বলছি, সন্দেহ করবেন না। তখুনি চুরি করে আপনার এই ফটোটাকে লুকিয়ে রাখিনি। আপনি প্লেন থেকে নেমে যাবার অনেক পরে, হঠাৎ আমার চোখে পড়েছিল, এই ফটোটা সীটের নীচে পড়ে আছে। হ্যাঁ, বলতে পারেন, আপনার ঠিকানায় ফটোটা ফেরত পাঠিয়ে না দেওয়া অন্যায় হয়েছে।

কোন কথা না বলে আবার চোখ নামিয়ে হাতঘড়ির দিকে তাকায় শুক্তি। পরিতোষ বলে—এই নিন আপনার সেই ফটো; আর, কিছু মনে করবেন না যেন।

ফটোটাকে শুক্তির হাতব্যাগের উপর রেখে দিয়েই সরে যায় পরিতোষ। এইবার বক্ষ-ভাবে নিজেরই হাত-ঘড়ির দিকে তাকায়। তারপর এগিয়ে যেয়ে লাউঞ্জের বাইরের বারান্দায় লতানে গোলাপের কাছে দাঁড়িয়ে আকাশের একটা মেঘের দিকে তাকায়। তার-পর সিগারেট ধরায়।

বুঝতে পারে না শুক্তি, ফটোটাকে হাত-ব্যাগের ভিতরে ভরতে গিয়ে হাতটা কেঁপে উঠলো কেন? পরিতোষবাবুকে কি একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল? কিংবা, বলে দেওয়াই উচিত ছিল, ও ফটো আর ফেরত দেবারই বা কি দরকার? দেড় বছর ধরে যে ফটো একজন অচেনা মানুষের কাছে ছিল, সে ফটো শুক্তি বসুর নিজের ফটো হলেও হাত দিয়ে স্পর্শ করতে যে সত্যিই বেশ অস্বস্তি বোধ করতে হয়।

ভদ্রলোককে কিন্তু মুখর স্বভাবের মানুষ বলে মনে হলো না। তবে চক্ষুলজ্জা নিশ্চয় একটু কম। অজানা অচেনা মেয়ের ফটো দেড় বছর ধরে নিজের কাছে পুষে রেখেছেন, এই কথাটাকেই তো খুব ভদ্রভাবে বলে চলে গেলেন। কিছু মনে করবেন না, একথা বলবারও কোন মানে হয় না।

বাম্প্ করেনি প্লেন, কিন্তু শুক্তি বসুর এই অস্বস্তির মন যেন হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে ওঠে। বুকের ভিতরে একটা ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস ভয়ানক একটা সন্দেহ হয়ে দুলতে থাকে। কোথা থেকে বাণী কাকিমার শান্তিপুরে লেখা চিঠিটার মানে কি এই পাইলট ভদ্রলোক, এই পরিতোষ মৌলিক?

আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করে না, ভালও লাগে না। এই অস্বস্তি এখানেই মরে যাক। চেনা আকাশের পথে এ কী বিশ্রী দুর্ঘটনার মত একটা অচেনা মেঘের উপদ্রব!

যাক্, এইবার নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। নামতে শুরু করেছে প্লেন।

প্লেন থেকে নেমে দমদমের মাটিতে পা দিয়েই একেবারে স্বচ্ছ হয়ে হেসে ওঠে শুক্তির এতক্ষণের অস্বস্তির মন। এই তো, দাঁড়িয়ে আছে ওরা; ড্রাইভার কেষ্টবাবু, কৃষ্ণা আর সুকু।

[বার]

কলকাতা থেকে যাবার সময় যে-মেয়ের ব্যস্ততাকে পালিয়ে যাবার ছটফটানির মত মনে হয়, সে-মেয়ে বোধহয় কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যেও ছটফট করে উঠেছিল। তা না হলে ঘরে ঢুকে এরই মধ্যে শেলফের সব বই পরিপাটি করে সাজিয়ে ফেলবে কেন শুক্তি? কত ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে শুক্তি। আলনার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে।

ঘরে ঢুকেই বড় পিসি সুমিত্রা যেন একটু হাসি চাপতে চেষ্টা করে কথা বলেন—কি দেখছো তুমি?

আলনাতে একটা কমলা পাড়ের টাঙাইল।

প্লেন ছাড়তে আর বড় দেরী

শাড়িটারই দিকে তাকিয়ে থেকে শুক্তি বলে—শাড়িটাকে এরকম এলোমেলো করে ভাঁজ করলে কে?

সুমিত্রা হাসেন—কৃষ্ণা।

শুক্তি—কৃষ্ণা কেন?

ঘরে ঢোকে কৃষ্ণা।—শাড়িটাকে কোথায় রেখে গিয়েছিলে, মনে পড়ে?

হেসে ফেলে শুক্তি—মনে পড়েছে। তাড়া-তাড়িতে ভুল করে বিছানার উপর ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম।

কৃষ্ণা—সেই জন্যে আমি......।

সুমিত্রা হাসেন—সেই জন্যে কৃষ্ণা রাগ করে শাড়িটাকে আলনাতে তুলে রেখেছে, পাট করতে দেয়নি।

শুক্তি—কেন?

কৃষ্ণা—প্রমাণ করে দিলাম কিনা, তুমি সব ভুলে যাও।

কৃষ্ণার গাল টিপে ধরে শুক্তি।—কী ভুলে যাই?

কৃষ্ণা—তুমি কলকাতার বাইরে গেলে একটা চিঠি দিতেও ভুলে যাও কেন, শুক্তিদি?

শুক্তি—চিঠি দিতে ভুলে যাই ঠিকই, কিন্তু তোমাকে তো ভুলে যাই না।

কৃষ্ণা—শ্যামলদাও বলছিলেন, তোমার শুক্তিদি কি কলকাতাকে ভুলেই গেল? কলেজের পূজোর ছুটি তো তিনদিন হলো শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু আসে না কেন?

সুমিত্রা তবু দাঁড়িয়ে আছেন। সরে

যাবেন বলেও মনে হয় না। কৃষ্ণাকে এখন কি-কথা বলে ওর মুখ বন্ধ করা যায়, তাও ভেবে পায় না শক্তি।

কৃষ্ণার একটা অভিমানের মুখরতা বটে; কিন্তু শক্তির চোখ-মুখের অবস্থা দেখলে মনে হয়, যেন একটা কঠোর জিজ্ঞাসার ডাক শুনতে পেয়েছে শক্তি।

কৃষ্ণা বলে—আমি সত্যি খুব রাগ করেছি, শক্তিদি।

হাসতে চেষ্টা করে শক্তি—রাগ করো না কৃষ্ণা। দিদির ওপর কখ্খনো রাগ করতে নেই।

কৃষ্ণা—আমাদের ভুলে যাও কেন?

শক্তি—ভুলিনি কৃষ্ণা; আমি কাউকেও ভুলিনি।

সুমিত্রা হাসেন—চুপ কর কৃষ্ণা, শক্তিকে আর বেশি বিরক্ত করিস না।

চলে গেলেন সুমিত্রা।

বাড়ি থেকে কলেজ, আর কলেজ থেকে বাড়ি; এই চেনা পথের জীবনে নতুন করে দেখে আশ্চর্য হবার মত কোন ঘটনা নেই, কোন দৃশ্যও নেই। হাজরার মোড়ে সেই খোঁড়া ভিখারীটা এখনও হরেকৃষ্ণ বলে চেঁচিয়ে ওঠে আর হাত পেতে ভিক্ষে চায়। আর চেতলার পুল পার হবার সময় দেখা যায়, সেই ভাঙ্গা নৌকাটা নালার কাদার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

শক্তির সুন্দর মুখটা কি আরও সুন্দর হয়ে গিয়েছে? তা না হলে শক্তির বড় পিসি কেন বারবার শক্তির মুখের দিকে ওরকম করে তাকিয়ে থাকেন? যখন তখন শক্তির কাছে এসে দাঁড়াবেন, শক্তির পিঠে হাত বোলাবেন। সুমিত্রার এ এক নতুন অভ্যাস হয়ে উঠেছে। দিন দিন আদের বাড়িয়েই চলেছেন সুমিত্রা। শক্তি তাই না হেসে আর না বলে থাকতে পারে না—তুমি এসব কী আরম্ভ করলে বড়পিসি? দেখতে পেলে কৃষ্ণা যে হিংসেতে ছটফট করবে।

সুমিত্রাও হাসেন—ছাই করবে কৃষ্ণা। ও মেয়েকে আমি চিনে নিয়েছি। আমাকে ওর একটু কাছ ঘেঁষে বসতেও দেয় না। ঠেলে সরিয়ে দেয়। ওর নাকি ভয়ানক গরম লাগে।

শক্তি—আজ বুঝছে না, কিন্তু পরে একদিন বুঝবে, কী ভুল করছে বোকাটা।

আজকাল শক্তির মুখের এক-একটা কথা শুনে সুমিত্রার মায়াকাতর মন যে কত গভীর তৃপ্তিতে ভরে যায়; সেটা তিনি বুঝতে পারেন বটে; কিন্তু চোখে তো দেখতে পান না যে, তাঁর মুখের হাসিটাও কত নিবিড় হয়ে থমথম করে। সে-ছবি দেখতে পায় শক্তি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না, বড়-পিসির মন এত বেশি খুশি কেন?

শ্যামল আসে মাঝে মাঝে, যদিও শ্যামলের কাজে ব্যস্ততার অন্ত নেই। পশারের নাম-ডাক যেমন বেড়ে চলেছে, পেশার হাঁকডাকও তেমনি বাড়ছে। তবু তো, এই অফুরান দায়িত্বের ছুটোছুটির মধ্যেও একটু সময় করে নিয়ে এক-একবার, মাসে অন্তত দুটো-তিনটে দিন আলিপুরের এই বাড়ির চা খেয়ে যেতে ভুলে যায় না শ্যামল।

শ্যামলকে দেখে শক্তিও আর সারামুখের চেহারা লালচে করে, চোখ নামিয়ে আর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে না। —বসুন আপনি, কৃষ্ণাকে ডেকে দিচ্ছি। বেশ তো স্পষ্ট করে ভদ্রতার ভাষণ শুনিয়ে দিয়ে চলে যেতে পারে শক্তি; কথা বলতে গিয়ে আর ঢোঁক গিলে ভীরু নিঃশ্বাসের বাতাস গিলতে হয় না। সবই দেখতে পান সুমিত্রা।

কত সহজে সেদিন ভবানীপুরে যেতে রাজি হয়ে গেল শক্তি, যেদিন সুমিত্রা বললেন—সুধাদি আমাদের সবাইকে ডেকেছেন, তুমিও যাবে নাকি শক্তি?

কেন কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে এই আহ্বান এসেছে, তার কিছুই জানে না শক্তি। সুমিত্রা অবশ্য বলতেই যাচ্ছিলেন যে, সুধাদি কীর্তনগান শুনতে খুব ভালবাসেন, তাই ব্যবস্থা করেছেন, সুধাদির চেনা এক সুগায়িকা মহিলা আজ তাঁর ভবানীপুরের বাড়িতে কীর্তন গাইবেন।

কিন্তু শক্তির যাবার ইচ্ছাটা যেন তৈরী হয়েই ছিল। কিছুই জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইল না শক্তি, কেন আর কিসের জন্য ভবানীপুরের বাড়ি থেকে আজ হঠাৎ একটা আমন্ত্রণ উপস্থিত হলো। সুমিত্রা শুধু একটু প্রশ্ন করে কথাটাকে বলেছেন, আর, শক্তিও সেই মুহূর্তে রাজি হয়ে জবাব দিয়ে দিলে যাব।

ভবানীপুরের বাড়ির বড়ঘরে সেই সন্ধ্যা-বেলার অনেক মানুষের আসরটিকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে দিয়ে সুগায়িকা মহিলা যখন চলে গেলেন, তখন ঘরভরা এলোমেলো কলরবের মধ্যেই শুনতে পেলেন আর দেখতে পেলেন সুমিত্রা, সকলের কাছে শ্যামলের চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে, কত খুশি হয়ে আর হেসে-হেসে কথা বলছে শক্তি।

শ্যামল হাসছে আর বলছে—আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না।

শক্তি—বিশ্বাস করুন, আমি আপত্তি করিনি।

শ্যামল—আপত্তি না কর; কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় তো আসনি। কাকিমা বলেছেন, তাই এসেছো।

শক্তি—এর মানে কি অনিচ্ছার আসা?

শ্যামল—হ্যাঁ।

শক্তি—তাহলে আমি আর কি করতে পারি?

শ্যামল—একদিন কি নিজেই ইচ্ছে করে আসতে পার না?

শক্তি—কি জবাব দেব, বুঝতে পারছি না।

শ্যামল—আসতে ইচ্ছে করে?

শক্তি—হ্যাঁ।

রাত ফুরোতে দেরি আছে মনে করে মানুষের চোখ আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে যদি দেখতে পায় যে, লাল সূর্য হাসছে, তবে সে মানুষের চোখের বিস্ময়ও আচমকা রঙীন হয়ে যায়। সুমিত্রার চোখের ও মনের অবস্থাও প্রায় তাই। মনে করে-ছিলেন, নিজের মুখে শ্যামলের কাছে যা বলবার তা বলতে বেশ দেরি করে ফেলবে শক্তি, বড় বেশি লাজুক ভীরু আর মন-চাপা স্বভাবের এই মেয়ে। কিন্তু কই, দেরি তো করলো না শক্তি। মিথ্যে লজ্জা করলো না, ভয়ও পেল না, বেশ মন খুলেই ইচ্ছের কথাটা বলে দিল।

লিলুয়াতে করুণার কাছে চিঠি লিখলেন সুমিত্রা। সাতদিনের মধ্যেই করুণার জবাবের চিঠি পৌঁছে গেল—আপনি এর চেয়ে আর বেশি কিছু জানতে চাইছেনই বা কেন? এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কি-ই বা বলতে পারে শক্তি? আপনি এখন নিঃসংশয়ে কদম-বাড়িতে চিঠি দিতে পারেন যে, শক্তি নিজেই বলেছে।

জয়ন্ত সরকার সব কথা শুনে খুশি হলেও শেষে আক্ষেপ করেন—আমার কিন্তু একটা দুঃখ রয়ে গেল।

সুমিত্রা—কিসের দুঃখ?

জয়ন্ত সরকার—মেয়েটাকে বছরের পর বছর ধরে আমরা কাছে রাখলাম, এইবার বিয়েও দেব, সবই ভাল। কিন্তু মেয়েটার লেখা-পড়া আর এগুলো না।

চুপ করে কি যেন ভাবতে থাকেন সুমিত্রা। তাঁরও মনে বোধহয় ছোট্ট একটা ব্যথার কাঁটা বিঁধছে।

জয়ন্ত সরকার মৃদুভাবে হাসেন। —আমি তো যখন-তখন তেজপুরের চিঠি পাব বলে ভয় পাচ্ছি। শক্তির মাসি নিশ্চয় বলবেন, আর বললেও অন্যায় বলা হবে না যে, শক্তিকে আমরা ভাল করে লেখা-পড়া না শিখিয়ে, শুধু তাড়াহুড়ো একটা বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। কাজেই ....।

সুমিত্রা—আমি বলি, শক্তি এই বছরেই ফাইনালটা দিয়ে দিক, তারপর কিরণ বউদিকে চিঠি দেব।

জয়ন্ত সরকার—আমিও সেই কথা তোমাকে বলতে চাইছি। বরং, এখন তোমার চেষ্টা করা উচিত, মেয়েটা যাতে ভাল করে পড়াশোনা করে, আর ভাল করে পাসও করতে পারে।

সুমিত্রা—ঠিক; তাহলে সব দিক দিয়ে সুখের বিষয় হবে। কারও অভিযোগ করে কিছু বলবার থাকবে না।

কদমবাড়িতে চিঠি লিখতে দেরি করলেন

মা সুমিত্রা। —আপনাদের একটু সহ্য করতে হবে, বউদি। ফাইনাল না দেওয়া পর্যন্ত শুক্তিকে আর কদমবাড়ি যেতে দিতে চাই না। গগনদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন, পরীক্ষার পর শুক্তিকে আর একটি দিনও এখানে দেরি না করিয়ে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। নবেম্বর তো শেষ হতেই চললো, আর মাত্র পাঁচ মাস পরেই শুক্তি আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে। মাঝে বড়-দিনের ছুটিতে আর নাই বা গেল।

কদমবাড়ি থেকে কিরণবালাও জবাব দিতে দেরি করেন না—শুনে খুশি হয়েছেন তোমার দাদা। কাজের কাজ তোমরাই করছো, মেয়েটাকে মানুষ করছো। আমরা তো শুধু মায়া করি। মন দিয়ে পড়াশোনা করুক শুক্তি, পরীক্ষা দিক, তারপর যেন আসে।

সুমিত্রা সরকারের আশার মন এইবার যেন কঠিন এক প্রতিজ্ঞার মন হয়ে কঠিন একটা চেষ্টার দা[illegible] নেবার জন্যে তৈরী হয়। শুক্তিকে ফাইনালে ভাল করে পাস করাতেই হবে। সকালে একঘণ্টা আর রাত্রিতে দু' ঘণ্টা, সুমিত্রা নিজেই শুক্তিকে পড়াতে শুরু করেন। অংক নিয়ে শুক্তিকে খাটাতে গিয়ে নিজেও খাটেন। শুক্তিকে ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে, তাই সুমিত্রাকেও এক-একদিন মাঝরাত পর্যন্ত জেগে জেগে অনেকবছর আগের চেনা ক্যালকুলাসের আর স্ট্যাটিক্সের মত জটিল থিওরী আর ফরমুলাকে আবার নতুন করে চিনে নিতে ও বুঝে নিতে হয়। কাজটা যেন সুমিত্রার একটা কল্পনার ক্লান্তিহীন আনন্দের ব্রত।

মাঝে যদি এক-আধদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে সুমিত্রাকে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকতে হয়, তবু তাঁর এই প্রতিজ্ঞার কাজটিকে থামিয়ে রাখতে তিনি পারেন না। —এস, বই খাতা নিয়ে আমার কাছে এসে বসো। শুক্তিকে সেদিনও কাছে ডাকবেন আর পড়াবেন।

শুক্তি আপত্তি করে—আজ আর তুমি নাই বা পড়ালে, বড় পিসি। ডাক্তার যে তোমাকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বলেছেন।

সুমিত্রা—শুয়েই তো আছি। একটু কথা বললে কিংবা তোমার পড়া শুনলে আমার জ্বর বেড়ে যাবে না। তুমি পড়।

শুক্তি মাঝে মাঝে হেসেও ফেলে। —তুমি শুধু আমাকেই দেখছো, কিন্তু ওদিকের কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?

ঠিকই, ওদিকের কিছু সুমিত্রার যেন চোখেই পড়ে না। ওপরে মাস্টার গণেশবাবুর ধমক আর ভ্রূকুটিকে নির্বিকার মনে অগ্রাহ্য করে রুক্মা যে গণেশবাবুর চোখের সামনেই বসে ঘষা ঝিনুকের টুকরো গেঁথে গেঁথে মালা তৈরী করে চলেছে।

দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাচ্ছে এক-একটা মাস। কোন সন্দেহ নেই, ভাল করে পাস করবার জন্যে শুক্তিও ওর মন-প্রাণের সব চেষ্টা ঢেলে দিয়েছে। কল্পনা করতেও মনটা হেসে ওঠে, একদিন শুনতে পেয়ে চমকে উঠবেন দিবুদা, অংকে কত ভাল নম্বর পেয়ে ফাইনাল পরীক্ষা পাস করে গেল শুক্তি। সেদিন দিবুদাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবে শুক্তি, এবার বল, কার নাক থেঁতো করবে তুমি?

শুধু রবিবারের দিন, শুক্তির কলেজে যাবার ব্যাপার যেদিন থাকে না, সেদিন সকালবেলায় শুক্তির ঘরে পড়ার টেবিলের কাছে বসে অনেকক্ষণ ধরে খবরের কাগজটাকে ভাল করে পড়ে নিয়ে অন্যরকমের দু-একটা কথা বলেন সুমিত্রা। শুক্তির এই পড়া-শোনার পৃথিবীর বাইরে কোন অচেনা পৃথিবীর কথার প্রতিধ্বনির মত দু-একটা

কথা। আবার বন্যা!...বিজয়লক্ষ্মী বোধহয় শেষ পর্যন্ত কোন স্টেটের গভর্নর হবেন, চুপ করে বসে থাকবেন না।......চীনাদের মতলব ভাল নয়, নেফাতে উপদ্রব করবে বলে মনে হয়।

হ্যাঁ নেফা, এখন শক্তির মনের কাছে অনেক দূরের সে-নেফা যেন আবছায়াময় এক প্রহেলিকার দেশ। ক্ষীণ স্মৃতির একটা ছবি। সেখানে বাচ্চা হাতির খেলা দেখছেন দুলালে মামা। বনের গাছের ছায়ায় শকুন্তলার মত বসে আছে আকা মেয়ে। ক্ষেতের মাটির ঢেলা ভাঙে দফলা-মেয়ে রেনাক।

শক্তির পরীক্ষা শুরু হলো যেদিন, সেদিন সুমিত্রাকে আর না বলে থাকতে পারলেন না জয়ন্ত সরকার—তুমি এত নার্ভাস হয়ে গেলে কেন?

সারাটা রাত ঘুমোতে না পেরে জেগে জেগে উসখুস করেছেন সুমিত্রা। সকাল হতেই আবার চিন্তা শুরু করেছেন, আজ এখন কী খাবে শক্তি? চা না খেয়ে এক কাপ কোকো খেলে কি ভাল হবে?

জয়ন্ত সরকার হাসেন—চা ভাল, কোকোও ভাল। মোট কথা, পাস করবে শক্তি, তুমি মিথ্যে চিন্তা করবে না।

পরীক্ষার হলঘরে শক্তি ঢুকে পড়লেও দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন সুমিত্রা। বাড়ি ফিরে গিয়েও দেড় ঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরে আসেন। সন্দেহ আছে সুমিত্রার, তিনি নিজে গিয়ে কাছে না দাঁড়িয়ে থাকলে, শক্তি ওই খাবারের ভিতরের একটা সন্দেশও মুখে দেবে না; ড্রাইভার কেষ্ট জোরগলায় যতই বলুক না কেন, মা অনেক করে বলে দিয়েছেন, খাবার যেন ফেলা না যায়।

শক্তির পরীক্ষার শেষ দিনটি শেষ হলো যেদিন, সেদিন সন্ধ্যাবেলা কোর্ট থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন জয়ন্ত সরকার, সুমিত্রা তখনও বিছানার উপর শুয়ে পড়ে আছেন আর হাসছেন। জয়ন্ত সরকার হাসেন। —কী ব্যাপার? বড় সাধ হয়েছে, তাই বুঝি খুব নিশ্চিন্ত।

উঠে বসেন সুমিত্রা। কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলার স্বরেই নিশ্চিন্ত মনের আনন্দটা ধরা পড়ে যায়। —সত্যি তাই। আমার এখন আর ভাবনা করবার কিছু নেই।

এখন শুধু সামান্য দুটি কাজ বাকি; ইচ্ছে করলে সে-দুটি কাজ কাল-পরশু যে-কোন দিনেই সেরে ফেলতে পারেন সুমিত্রা। শক্তিকে তেজপুরের প্লেনে তুলে দেওয়া, আর কদমবাড়িতে কিরণ বউদির কাছে সব-কথা জানিয়ে চিঠিটা লিখে ফেলা।

জয়ন্ত সরকার বলেন—আর দেরি করো না; শক্তিকে দু'চার দিনের মধ্যেই তেজপুরে রওনা করিয়ে দাও। ওর বাবার মনের অবস্থাটা তো কল্পনা করতে পার।

ঠিক পরের দিন, বৈশাখী সন্ধ্যায় আলিপুরের বাড়ির বাগানে একটা ঝড়ের বাতাস যখন হুটোপাটি করতে শুরু করেছে, তখন কোর্ট থেকে ফিরে আর ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন জয়ন্ত সরকার, বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে আছেন সুমিত্রা, আর চোখ দুটোও জলে ভরে রয়েছে।

সুমিত্রার একটা হাত তখনও একটা চিঠিকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। জয়ন্ত সরকারের সন্দেহ করতে দেরি হয় না, ওই চিঠিটাই একটা নিদারুণ আঘাত, যে-জন্য সুমিত্রার মুখটাও আহত মানুষের মুখের মত করুণ হয়ে গিয়েছে।

চিঠিটাকে পড়লেন জয়ন্ত সরকার। কদম-বাড়ি থেকে শক্তির মা'র লেখা একটা চিঠি। তারপর আর বুঝতে কিছু অসুবিধে থাকে না; হ্যাঁ, সুমিত্রার নিশ্চিন্ত মনের স্বপ্নটাই চুরমার হয়ে সুমিত্রাকে কাঁদিয়েছে।

তেজপুর থেকে মণিমালার একটা চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা। তাই কদমবাড়িতে সুমিত্রাকে জানিয়েছেন; ছেলেটি সবদিকেই ভাল, শক্তির সঙ্গে চেনা শোনা আর মেলা-মেশাও হয়েছে। মণিমালা লিখেছে শক্তির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিঠিতে আরও কথা জানাতে পারবে।

পরের দিন যে চিঠিটা এল, সেটা তেজপুর থেকে লেখা শক্তির মণিমাসির চিঠি। —আপনারা শুনে সুখী হবেন যে...ইত্যাদি।

তেজপুরের চা-বাগানের ছেলে অনিমেষের [illegible] অনেক প্রশংসা করে আরও এমন কয়েকটি কথা লিখেছেন তেজপুরের মণি-মাসী [illegible] একেবারে সন্দেহ-[illegible] একটা [illegible] বিশ্বাসের [illegible] কথা। এই চিঠির ভাষাও [illegible] ছড়িয়ে দিয়েছে। কোথায় যেন বিলের জলে নীলপদ্ম ফোটে, শক্তি আর অনিমেষ নৌকোয় [illegible] সেখানে [illegible]।

কাজেই, ওদের দুজনের মধ্যে যখন কোন অনিচ্ছা নেই, তখন আমি তো মনে করি যে, এ বিয়ে হলে ভালই হবে।

ভাল হলেই ভাল। সুমিত্রার চোখ দুটো শুকনো হয়ে খটখট করে। মন শক্ত করবার চেষ্টা করেন সুমিত্রা, যেন তাঁর কণ্ঠের কোন আক্ষেপ শব্দ করে বেজে উঠতে না পারে; যেন শক্তি শুনতে না পায়।

এঘরে বসেই শোনা যায়, বারান্দার ফুলের টবের কাছে দাঁড়িয়ে কমলার সঙ্গে গল্প করছে আর হাসছে শক্তি। হাসুক। শক্তিকে যেন এভাবে আরও দুটো দিন হাসিয়ে রেখে ভালয়-ভালয় তেজপুরের প্লেনে তুলে দিয়ে আসতে পারেন, এ ছাড়া এখন সুমিত্রার আর কিছু চিন্তা করবার বা আশা করবার নেই।

তবে তাঁর মনের ভিতরে একটা করুণ বিস্ময়ের প্রশ্ন যেন কথা বলতে চায়, ওখানে দাঁড়িয়ে হেসে-হেসে কথা বলছে যে শক্তি, সে কি সেই শক্তি, যাকে এতদিন তিনি শক্তি বলে চিনতেন? সে-মেয়ে এখানে শ্যামলের কাছে ফুলের তোড়া পাঠিয়েছে, সে-মেয়ে ওখানে অনিমেষের সঙ্গে নীল-পদ্মের গল্প করেছে।

তবে কি শক্তিকে ঘেন্না করতে চাইছে শক্তির বড়পিসির মন? ছি ছি, অসম্ভব। শক্তিকে ঘেন্না করতে হলে যে সুমিত্রার বুকের ভিতরের সব মায়ার নিঃশ্বাস নিজের লজ্জার জ্বালায় পুড়ে মরে যাবে।

উচিত অনুচিত বিচার করে আর লাভ কি? না হয় ভুল করেই একটা ফুল বাড়িয়েছে শক্তি; কিন্তু সেজন্যে কি শক্তির হাতটাকে ঘেন্না করে ঠেলে সরিয়ে দিতে হবে? শত হলেও ওটা যে শক্তিরই হাত।

ভুল বলেই বা মনে করতে হবে কেন? হয়তো এটাই আসল সত্য, এটা কেমন কিছু নয়। না, সুমিত্রার আর কিছু বলা সাজে না। শক্তির ভালবাসার ভাষা নিজেই নিজেকে চিনে নিক।

কিন্তু শক্তি কি সত্য [illegible] এই কাহিনী [illegible] [illegible] [illegible] কিছু বুঝতে পারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তুমিই [illegible]?

সুমিত্রা হাসেন। —একথা তোমার মনে হলো কেন?

শক্তি—আমার গান শুনতে [illegible] তুমি আমার ঘরে ঢুকলে না, [illegible] ওদিকে কোথায় যেন চলে গেলে?

সুমিত্রা বলেন—[illegible] তোমার পিসেমশাইয়ের ঘরে গিয়ে বসেছিলাম।

শক্তি—উঃ, কী মস্ত কাজ করলে!

চোখ বোজেন সুমিত্রা। মুখের হাসিটাও কেঁপে ওঠে। তখুনি সরে যান সুমিত্রা, তাড়াতাড়ি হেঁটে একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে বামুন ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেন—নির্মলার মা, শুনেছেন? পায়েসে বেশি মিষ্টি দেবেন না কিন্তু; বেশি মিষ্টি হলে শক্তি সে-পায়েস মুখেই তুলবে না।

প্লেনের টিকেট কিনে নিয়ে এসেছেন ড্রাইভার কেষ্টবাবু। আজকের রাতটার শুধু ফুরিয়ে যাওয়া বাকি, কাল সকালেই রওনা হয়ে যাবে শক্তি।

ঘরের আলোর কাছে বসে ডাক দিলেন সুমিত্রা—শক্তি, শোন।

—কী বড় পিসি? ডাক শুনেই ছুটে আসে শক্তি।

সুমিত্রার চোখ-মুখ হাসছে। কী অদ্ভুত শান্ত অথচ জ্বলজ্বলে হাসি। —তেজপুরের সোম লজের অনিমেষকে তুমি চেন নিশ্চয় ?

চমকে ওঠে শক্তি—হ্যাঁ।

সুমিত্রা—তোমার মণিমাসি লিখেছেন, অনিমেষ খুবই ভাল ছেলে। তোমার কি মনে হয় ? সত্যি খুব ভাল ?

শক্তি—আমার তো তাই মনে হয়।

সুমিত্রার মুখের হাসিটা এবার বড় বেশি স্নিগ্ধ হয়ে যায়: —বেশ তো; ভালই; আজ আর কৃষ্ণার সংগে গল্প করতে গিয়ে বেশি রাত করে দিও না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে।

যেন ভাল ঘুম হয়, যেন শরীর খারাপ না হয়, তাই বেশি রাত না করে শুয়ে পড়তে বলেছেন বড় পিসি। রাত নটাও হয়নি, শুয়ে পড়ে শক্তি।

কিন্তু কিছুতেই যে ঘুম আসে না। বন্ধ চোখ দুটো হঠাৎ ছটফট করে খুলে যায়, ঘরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। বালিশটা তো বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু এপাশ-ওপাশ করলেও মাথাটা কোন ঠাণ্ডা খুঁজে পায় না কেন ? শক্ত করে বাঁধা বেণীটাই বোধহয় দুমড়ে গিয়ে ঘাড়টাকে জ্বালাচ্ছে।

বিছানা থেকে নেমে আলো জ্বালে শক্তি। বেণীটাকে ভেঙে দিয়ে ঢিলে করে একটা খোঁপা বাঁধে। এই ভাল। ওরকম একটা দোলানো বেণী আর দেখতে একটুও ভাল লাগে না। ভাল দেখায়ও না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে শক্তি। কিন্তু সন্দেহ হয়: ঘুম কি হবে ? চোখের পাতাগুলি যেন কাঁটার মত শক্ত, নরম হতেই চায় না। উঠে পড়তে ইচ্ছে করে: ছুটে গিয়ে বড় পিসিকেই জিজ্ঞেসা করতে ইচ্ছে করে: তুমি তো আজ আমাকে কোন অদ্ভুত কথা বলনি, তবে আমার ঘুম আসে না কেন, বড় পিসি ?

জাগা পাখির মত শক্তির প্রাণটাও যেন উসখুস করে, কখন ভোর হবে।

ভোর হয়। বৈশাখী সকালবেলার রোদও তেতে উঠতে দেরি করে না। দমদম এয়ার-পোর্টের রানওয়ের শুরু পথে সেই অনেক-চেনা শিকল-বেড়; ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে তেজপুর যাবার ডাকোটা। হেসে হেসে কৃষ্ণার আর সুকুর গলা জড়িয়ে ধরে শক্তি। বড় পিসিকে প্রণাম করবার সময় আর চোখ তুলে তাকাতে পারে না শক্তি: তাই দেখতে পায় না, বড় পিসির চোখে কোন মায়া আজও আবার আগের মত তেমনি সজল হয়ে উঠলো কিনা।

[তের]

দেখলে তো মনে হয় না যে, তেজপুরের জল মাটি আর আলো-ছায়ার চেহারা এই সাত মাসের মধ্যে একটুও বদলেছে। এদিকে ব্রহ্মপুত্র, ওদিকে নেফার পাহাড়; আর আশে-পাশে ধানের ক্ষেত; সবই তো ঠিক তেমনই আছে। সেই সার্কিট হাউস, স্টেশন ক্লাব আর চক-বাজার। সেই আদালত, নেহরু ময়দান আর রিজার্ভ পুলিস লাইন। মীনা পার্কের ফোয়ারার জল সেই পাথুরে শিশুর সাপজড়ানো মাথাটাকে ঠিক তেমনই করে ভিজিয়ে দিয়ে ঝরে পড়ছে। কিন্তু তেজপুরের জীবনের চেহারাতে রদবদলের নানা নতুন ঘটনার দাগ পড়েছে, পড়ছে ও আরও পড়বে মনে হয়।

একটি কম্বলে বিড়ির আগুনের পোড়া দাগ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সে কম্বল এখন শিশির হাজারিকার বাড়ির বাইরের ঘরের এক কোণে পড়ে আছে। এটা হলো গগন বসুর ড্রাইভার কৈলাসের কম্বল। কৈলাস এখন তেজপুর জেলের কয়েদী। পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্যকে বাজারের চকের কাছে দেখতে পেয়েই গলা টিপে ধরেছিল কৈলাস। সেই অপরাধের শাস্তি, এক বছরের শক্ত কয়েদ।

কৈলাসের জামিন হয়েছিল শিশির। মামলাতে কৈলাসকে ডিফেণ্ড করবার জন্য উকীল আর আদালতের সব খরচ দিয়েছিল শিশিরের তিন বন্ধু; অমল ঘোষ, তিতেন রায় আর জগদীশ কার্কি। কিন্তু কিছুই হলো না। রায় বেরোবার পর কৈলাস সবাইকে নমস্তে জানিয়ে পুলিশ ভ্যানের দিকে চলে গেল।

শীতল বিশ্বাসের সেই ক্ষুদ্র বস্ত্রালয়টিকে তেজপুরের বাজারে আর দেখতে পাওয়া যাবে না।

কী যন্ত্রণাই না ভুগলেন শীতল বিশ্বাস! দোকানের খাতা-পত্র ঝোলায় ভরে নিয়ে ইনকাম ট্যাক্সের অফিসে যান আর ফিরে আসেন। সামান্য আয়ের কৈফিয়ত দিতে দিতে হয়রাণ হন। সবই সহ্য করছিলেন শীতল বিশ্বাস। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী একদিন বেশ ভ্রূকুটি করে হাসলেন। —আপনি যে একজন শীতল অবিশ্বাস নন, সেটা প্রমাণ করতে পারবেন ?

—আজ্ঞে না।

—তা হলে এসব খাতাপত্রের সাধুতা দেখাতে আর আসবেন না।

—তাহলে কি করবো, বলুন।

—আমার একজন লোক, নাম মধুবাবু, আপনার কাছে যাবে। তাকে খুশি করে দেবেন।

মধুবাবু এসে বলেছিলেন। —অন্তত দেড় হাজার টাকা দিন। শীতল বিশ্বাস বলেন—না। টাকা থাকলেও দিতাম না।

একদিন মহিম দস্তিদারও বলেন—এবার নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুন শীতলবাবু। আর, আমার টাকাটাও শোধ করে দিন। আপনার কাছ থেকে ইণ্টারেস্ট পেতে আমি

আর ইণ্টারেস্টেড নই।

এর পর আর দেরি করেননি শীতল বিশ্বাস। দোকান বিক্রী করে দিয়ে মহিমবাবুর পাওনা টাকা সুদ সুদ্ধ শোধ করে দিয়েছেন। মহিমবাবু অবশ্য দুঃখিতভাবে হেসেছেন—কিন্তু আশা ছাড়বেন না শীতলবাবু। ভরসা রাখুন, আবার দাঁড়াতে পারবেন।

কোলিবাড়িতে শিশির হাজারিকা নিজেই এখন ওই বাড়ির একজন ভাড়াটিয়া বাসিন্দা; বাড়িটা এখন শৈলেশ্বর সইকিয়ার সম্পত্তি।

মালতী বলেছিল, চাকরি করতে চাই। মালতীর কথা শুনে সেই যে রাগ করে চেঁচিয়ে আর ধমক দিয়ে উঠলো শিশির, তার ঠিক সাতদিন পরেই বাড়িটাকে বিক্রী করে দিল।

জগদীশ বলে—তাড়াহুড়া করে এত অল্প দামে বাড়িটাকে বিক্রী না করলেই ভাল করতে, শিশির।

বাড়ির সামনে কাঁচ নারকেলের পাতার ঝালরে চাঁদের আলো চিকচিক করে; চোখ পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নেয় শিশির, জগদীশের কথার কোন জবাব দেয় না।

শৈলেশ্বর সইকিয়া দুঃখিতভাবে হেসেছেন।—তোমার বাবাকে আমি চিনতাম শিশির। মানুষটিকে আমার খুব ভাল লাগতো। তাই ইচ্ছে করেই আমি বাজার-দরের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে বাড়িটা কিনে নিলাম। কিন্তু আমি চাই, তুমি একদিন উন্নতি করে এর চেয়ে অনেক ভাল বাড়ি তৈরী করবে আর সুখে থাকবে।

নেফা মেডিক্যালের পিয়ন রতন বিশ্বাস আজকাল নতুনপাড়ার বাড়ির একটি ঘরের মেজেতে মাদুরের উপর যেন দুর্ঘটনায় জখম একটা মানুষের চেহারার মত করুণ হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে, যদিও রতনের হাতে পায়ে ও মাথাতে কোন ব্যাণ্ডেজ নেই।

ঘরের দেয়ালে অবশ্য একটা রঙীন নুড়ি-পাথরের মালা এখনও ঝুলছে। কিন্তু ঘরের জানালা সব সময় বন্ধ করে রাখে রতন, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত, যেন বাইরের কোন আলো এসে ঘরের অন্ধকার ভেঙে না দেয়, আর কোন রঙীন জিনিস যেন চোখে না পড়ে।

রতনের চাকরি নেই। নেফার আইন রতনকে ক্ষমা করতে পারেনি। কারণ, দফলাদের গাঁ বিলং একদিন দা হাতে নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নেচেছে আর নালিশ করেছে, গাঁওবুড়ার মেয়ে রেনাকিকে নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে মেডিক্যালের পিয়ন রতন।

শীতল বিশ্বাস তাঁর গলার স্বর চেপে চেপে আর আস্তে আস্তে কথা বলেন—হ্যাঁ, ম্যালেরিয়ার ইন্সপেক্টর ধীরেনের কাছ থেকে সব কথা শুনলাম। পলিটিকাল খোসলা সাহেব নিজের হাতে রতনকে গলাধাক্কা দিয়ে কোয়ার্টার গার্ডে পুরেছিলেন। তিনটে মাস কোয়ার্টার গার্ডে বন্ধ ছিল রতন। এক বছরের মাইনে থেকে জমানো টাকার সব টাকা, পুরো পাঁচশো টাকা জরিমানা দিয়েছে রতন। সে-টাকা নিয়ে বিলং-এর দফলারা মিথুন কিনেছে, কেটেছে আর খেয়েছে।

মীরা—কিন্তু রতন ঠাকুরপো কি সত্যিই ......আমার তো বিশ্বাস হয় না।

শীতল—কিন্তু রতন যে নিজেই স্বীকার করেছে।

চমকে ওঠেন মীরা—কি স্বীকার করেছে?

শীতল—রেনাকিকে একদিন জড়িয়ে ধরেছিল রতন।

মীরার মুখটা করুণ বিষাদে ভরে যায়। —রেনাকি কিছু বলেনি?

শীতল—রেনাকি শুধু একবার গাঁ থেকে পালিয়ে এসে কোয়ার্টার গার্ডের বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল আর কেঁদেছিল। তারপর আর কোন গণ্ডগোল না করে চলে গেল।... রতন জেগেছে মনে হচ্ছে?

শব্দ শোনা যায়, ঘরের জানালা খুলেছে রতন। কারণ সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ কালো হয়ে উঠেছে।

ডক্টর সি টি এলগিন, সেই বোটানিস্ট সাহেব, তিনিও নেফা থেকে ফিরে এসেছেন। সরকারী সমাদর তাঁকে তোয়াং থেকে হেলিকপটরে তুলে নিয়ে তেজপুরে পৌঁছে দিয়েছে। নেফা-অফিসার মনোহর লাল সার্কিট হাউসে এসে এলগিনের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন—অনুমান করি; আপনার কোন অসুবিধে ভুগতে হয়নি স্যার?

এলগিন হাসেন—একটুও না। আপনার কাছে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন।

মনোহরলাল—কর্তব্য করেছি, এইমাত্র। আমাদের সার্ভিস তো ঠিক চাকরির ব্যাপার নয় স্যার, এটা একটা ডেডিকেশন।

এলগিন—খুব সত্য কথা।

মহিমবাবু আসেন, শৈলেশ্বরবাবু আসেন; সরকারী গন্যমান্য আর পদস্থেরাও আসেন। সকলের কুশল-জিজ্ঞাসার জবাবে এলগিন বিনীতভাবে বলেন—আমার পিলগ্রিমেজ প্রায় শেষ হয়েছে। এবার শুধু সাতটা দিন এই তেজপুরের এদিক-ওদিক একটু ঘুরে-ফিরে আর চোখ তৃপ্ত করে চলে যাব।

মহিমবাবু—কিন্তু চলে যাবার আগের দিন যদি আমার বাড়িতে এসে সামান্য একটি চায়ের আসরে বসে, বিশিষ্ট এলিটদের সঙ্গে একটু আলাপ করেন, তবে আমাদের পক্ষে সেটা খুবই সুখের বিষয় হবে।

এলগিন—নিশ্চয় যাব; এ তো আমার সৌভাগ্য।

মহিমবাবু—তাহলে আশা করছি, আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনাকে আমাদের মধ্যে দেখতে পাব।

এলগিন—ও ইয়েস! নিশ্চয়।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা সার্কিট হাউসের বারান্দায় একা-একা একটি চেয়ারে বসে আর টেবিলের আলোর কাছে একটা কাগজ রেখে যখন দুটি চোখের সব আগ্রহ ঢেলে দিয়ে কি-যেন দেখছিলেন আর পড়ছিলেন এলগিন, তখন হঠাৎ কয়েকটা ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে উঠলেন। সেই মুহূর্তে কাগজটাকেও ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ঝুড়ির ভিতরে ফেলে দিলেন।

ছায়া নয়; শিশির হিতেন আর অমল এসে দাঁড়িয়েছে। আগন্তুকদের দিকে তাকিয়ে বেশ স্নিগ্ধভাবে হাসেন এলগিন। —আসুন।

শিশির—নেফার ফ্লোরা সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু শুনতে চাই।

একবার শিশিরের, একবার অমলের, একবার হিতেনের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে, তারপর খুব জোরে একবার কেশে নিয়েই হেসে ওঠেন এলগিন।—খুব ভাল কথা। আপনারা কাল বিকেলে আমার এখানে আসুন। আমি খুব খুশি হয়ে নেফার ফ্লোরার অনেক চমৎকার কথা আপনাদের শোনাবো।

কিন্তু পরের দিনের বিকালে নয়, শনিবারে সন্ধ্যাতেও নয়; এই তেজপুরের প্রায় একশোটি বিকেল আর সন্ধ্যা এসেছে আর চলে গিয়েছে, তবু বোটানিস্ট সাহেব এলগিনকে কেউ আর দেখতে পায়নি। সার্কিট হাউসে গিয়ে এলগিনকে দেখতে না পেয়ে শিশির অমল আর হিতেন হেসে ফেলেছিল। মহিমবাবুর বাড়িতে শনিবারের সন্ধ্যার চায়ের পার্টি একটু দুঃখিতভাবে বিস্মিত হয়েছিল—এভাবে হঠাৎ কেন উধাও হয়ে গেলেন এলগিন?

মহিমবাবুর বাড়ি ভারতীর কালোর মা একদিন কিন্তু বেশ একটু ভয় পেয়েই বাড়ির ছাদ থেকে তাড়াতাড়ি নেমে চলে এলেন।

রাতের কাজ শেষ হবার পর জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কালোর মা। হঠাৎ চোখে পড়ে, দূরে উষা-পাহাড়ের গায়ে আগুন জ্বলছে। আগুনটা যেন পাহাড়ের গায়ে উঠছে নামছে আর হেঁটে বেড়াচ্ছে।—ভাল লক্ষণ নয় মা। বলতে গিয়ে কালোর মা'র গলার স্বর কেঁপে ওঠে।

মণিমালা বলেন—ও কিছু নয়। ওটা সেই পাগলা সাধুর ধুনির আগুন।

বোধহয় খুব ভুল কথা বলেননি মণিমালা; অনেকেরই এ-গল্প জানা আছে; একজন পাগল সাধু, যার ভয়-ডরের কোন বালাই নেই, মাঝে-মাঝে উষাপাহাড়ে উঠে ধুনি জ্বালায় আর রাত কাটায়।

কিন্তু তেজপুরের ভিতরে বাইরে আনাচে-কানাচে আর আশে-পাশে সত্যিই যে একটা উপকথার জগতের যত অলক্ষুণে কায়া ছায়া আর ভাষা ঢুকেছে; ঘুরছে ফিরছে হাসছে

আর ছুটছে। বিচিত্র অদ্ভুত করুণ আর কুৎসিত।

মুরগীতে ভরতি হয়ে ছুটে যাচ্ছে টাস্কারের রোড-ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল সাহেবের জীপ। ফুটহিলের কাছে এসে ইনার লাইন পার হবার আগেই সড়কের গর্তে পড়ে মিলিটারীর ট্রাকের চাকা ভেঙে গিয়েছে। উল্টে গিয়েছে ট্রাক। ট্রাক থেকে গড়িয়ে পড়েছে সাজানো পেটির স্তূপ: পেটি ভেঙে বোতল: আর বোতল ভেঙে গড়িয়ে যায় তরল সোলান আর সাহারানপুর।

বাজারের আড়তদারের গদিতে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে শুধু হাসছেন আর হাসছেন মিলিটারীর এক খুশি অফিসার। ব্যাঙ্কের কাউন্টারে এসে সরকারী পারমিটের একজন কর্তা অফিসার তাঁর সভ্য-ভব্য স্যুট-শোভিত চেহারা নিয়েই এমন একজন কারবারী মহাজনের হাত ধরে হাসছেন আর কথা বলছেন, যাঁর পরনে একটি খাটো ধুতি আর কাঁধে একটি তোয়ালে। হোটেলের টেবিলের এপাশে কন্ট্রাক্টর, ওপাশে ইঞ্জিনীয়ার, মাঝখানে দুটি বীয়ারের বোতল। সাপ্লাইয়ের চালান তখনি তৈরী হয়; বিলও তখনি। সেই বিল আর চালান তখনি সই করে দিয়ে হেসে ওঠেন ইঞ্জিনীয়ার। কন্ট্রাক্টরও তখনই হাঁক দেন—জলদি করো বয়, আউর দু'বোতল বীয়ার।

বুঝতে পারা যায় না, চারজন বাইজী কেন এসে ডাকবাংলোতে ঠাঁই নিয়েছে। ওরা বমডিলাতেই বা কেন যেতে চায়? মাইফেলের বায়না পেয়েছে নাকি ওরা?

রাত্রিবেলা সিনেমা হাউসের সামনে ওটা কিসের ভিড়? মিলিটারীর দু'জন অফিসার মানুষের উপর মারমুখী হয়ে ঝগড়া করছে কেন শিশির আর অমল? একজন পুলিশ এস-আই বা কেন নির্বিকার অসহায়তার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন?

সিনেমা হাউসের সামনেই রাস্তার একপাশে একটা রিক্সার উপর বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়ে আছে একটা অল্পবয়সের মেয়ে, বোধহয় গাঁয়ের চাষীর ঘরের মেয়ে। মেয়েটার গায়ে নতুন কেনা একটা হালফ্যাশনের মেয়েলী ওভারকোট, মুখে মদের গন্ধ।

মিলিটারীর দুই অফিসার একসঙ্গে ছড়ি ঘুরিয়ে ধমক দেন—আমরা কিছুই জানি না। রিক্সাওয়ালা কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলে—আমিও কিছু জানি না। মেয়েটাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে পুলিশ এস-আই কাতরস্বরে ডাকেন—শিশিরবাবু; প্লীজ; আমার কথা রাখুন। মিথ্যে গোলমাল বাধা[illegible]ন না।

টাস্কারের পতাকার হাতির-মাথা দুলে দুলে হাওয়া খায়, ছুটে ছুটে হাওয়া খায় টাস্কারের গাড়ি। এ ব্যস্ততা যেন একটা মত্ততা। বাজারের লোকে বলাবলি করে, ওদের পান আনতে জীপ ছোটে, আর সিগারেট আনতে ট্রাক।

শিশির বলে—সত্যিই কি ওরা রোড তৈরী করে, না ম্যাপ আর মডেলের মধ্যে রোডের দাগ টানে?

জগদীশ বলে—তা জানি না; কিন্তু ওদের অফিসার-মেসের সন্ধ্যাবেলার আলোর ঝলমলানি দেখে মনে হয়; যেন একটা কার্নিভালের ফুর্তি চলছে সেখানে।

ফোর্থ ডিভিসনের একটা ব্যাটেলিয়ন এসেছিল অনেকদিন আগে। তারা নেফার পাহাড়ের এদিকে-ওদিকে কবেই চলে গিয়েছে। কিন্তু তারপর আর যারা এসেছে তাদের যেন কোথাও যাবার কথা নেই। তেজপুর আর মিসামারির সেনাবারিক যেন দুটো বিশ্রামসুখের ধরমশালা।

স্টেশন ক্লাবে এসে পানীয় মুখে ঢেলেই মেজর নায়ার বলেন—চীনারা অ্যাগ্রেস করবে, এটা একটা কক অ্যান্ড বুল স্টোরি।

রেলের ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার মুস্তফী তাঁর হাতের গেলাস নামিয়ে রেখে ঢেঁকুর তোলেন —আমি একজন ক্যাপ্টেনের মুখেও ঠিক একথাই শুনেছি।

—কাজেই আমাদের ফোর্স এখানেই থাকবে; এর চেয়ে বেশি এগিয়ে যাবার দরকার হয় না।

—ঠিক বলেছেন, ইউ আর রাইট!

—যেটা নিতান্ত বর্ডার পুলিসের কাজ, সে-কাজে আর্মিকে ভিড়িয়ে দেওয়া খুবই অসঙ্গত।

—আরও সত্যি কথা; ইউ আর মোর দ্যান রাইট!

—বর্ডার পুলিস যেন ভয় না পায়, মরেল ঠিক রাখতে পারে; সেজন্য বড় জোর ইনফ্যান্ট্রির কয়েকটা প্লেটুন পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

—উপরের এইরকম ইনস্ট্রাকশন আছে বোধহয়?

মেজর নায়ার হঠাৎ শক্ত করে ভুরু কুঁচকিয়ে বলে ওঠেন।—একজন সিভিল চ্যাপ কি করে আশা করেন যে, আমি তাঁর কাছে মিলিটারির একটা সিক্রেট প্রকাশ করে দেব?

মিস্টার মুস্তফী একটা হাই তুলে নিয়েই উঠে পড়েন; গেলাসের দিকে আর তাকান না। চলে যান।

কিন্তু কন্ট্রাক্টর তেজা সিং-এর মিসামারির বাগানে ককটেলের আসরে একদিন এই মিলিটারী নায়ার আর সিভিল মুস্তফী দুজনেই হাত ধরাধরি করে হাসলেন আর গল্প করলেন।

অনেকেই যাকে বলে তেজা সিং-এর এজেন্ট, সেই সুশান্ত মজুমদারের টেলিফোনের একটা ডাক শুনে উতলা হয়ে যান এমন পদস্থ সিভিলের সংখ্যাও কম নয়। মজুমদার সাহেব শিলং চলে যাবেন শুনতে পেয়ে সোজা একেবারে এয়ারপোর্টে হাজির
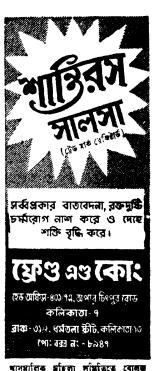
হলেন সেন্ট্রাল পাবলিক ওয়ার্কসের চন্দ্রনাথন্‌; ইনি সেই চন্দ্রনাথন্‌, যিনি পণ্ডিচেরী ভঙ্গীতে ফরাসী ভাষা বলে পোস্টমাস্টারকে একদিন খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। ফরেস্টের গোস্বামীও সোজা এয়ারপোর্টেই ছুটে আসেন। বিদায় নেবার আগে ব্যাগ উপুড় করে গাড়ির সীটের উপরেই নোটের তাড়া ঢালেন মজুমদার। গোস্বামী হাসেন—আশা করি আবার দেখা হবে। চন্দ্রনাথন্‌ হাসেন—ওর্‌ র্‌ রাভোয়ার!

মিসামারি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল; ছোট নদীর কিনারায় আমবাগানের ছায়াকে মিষ্টি করে দিয়েছে ফাল্গুন মাসের কোকিলের ডাক। পিকনিক সেরে নিয়ে শিশির আর শিশিরের স্কুলের ছেলের দল সড়কের ধারে নিমের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুটহিলের দিক থেকে বাস আসবে; ওরা সবাই আবার তেজপুরে ফিরে যাবে।

ছেলেদের চোখগুলি হঠাৎ এদিকে ঘুরে গেল। বুটের শব্দের সঙ্গে সড়কের ধুলো উড়ছে। কাঁধের উপর পুরো প্যাক আর রাইফেল, জাঠ রেজিমেন্টের একটা প্লেটুন আসছে। বেশ শান্ত চাহনি, বেশ শক্ত চেহারা, হাসিমাখা মুখ; জওয়ানদের কপালের ঘাম ধুলোতে ভরে গিয়ে কাদা-কাদা হয়ে গিয়েছে। কারও পায়ে ছেঁড়া বুট; কারও গায়ে ছেঁড়া আস্তিনের উর্দি। ওরা বোধহয় ফুটহিলের ক্যাম্পের কাছে গিয়ে জীপে উঠবে।

কিন্তু কী অদ্ভুত শিশির হাজারিকার কড়া মেজাজের মন! শিশিরের শুকনো চোখে কোন সমবেদনার একটুও ছায়াও কাঁপে না। বরং ছেলেদের সাবধান করে দেয় শিশির। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক আর দেখ। হাততালি দেবে না, কথা বলবে না, হই হই করবে না।

তেজপুরে যাবার বাস আসতে বোধহয় আরও আধঘণ্টা লাগবে। ছেলের দল নিমের ছায়ায় চুপ করে বসে থাকতে না পেরে ছটফট করে।

শিশির হঠাৎ আবার সাবধান করে দেয়, কেউ কথা বলবে না। কারণ ধুলো উড়িয়ে, বুটের শব্দ বাজিয়ে আর-একটা জওয়ানের দল কাছে এসে পড়েছে। এটা আসাম রাইফেল্‌সের একটা প্লেটুন।

কিন্তু নীরব শিশিরের শুষ্ক-উদাস চোখ দুটো হঠাৎ চমকে ওঠে। দেখতে পেয়েছে শিশির, বেশ লম্বা বলিষ্ঠ সুন্দর চেহারা আর বেশ তরুণ বয়স, প্লেটুনের হাবিলদার যেন শিশিরেরই মুখের দিকে তাকিয়ে আর হেসে হেসে চলে যাচ্ছে।

কথা বলে ফেলে শিশির—সুজিতবাবু, আপনি?

—হ্যাঁ।

—কোথায়?

হাত তুলে সেলার একটা পাহাড়ের মেখলা রঙের মাথাটাকে দেখিয়ে দেয় সুজিত।

ফাল্গুন গেল, চৈত্র গেল, বৈশাখও যায়-যায়; মণিমাসি একদিন খুব খুশির স্বরে হাসতে থাকেন—কি কালোর মা, উষা-পাহাড়ের আগুন আর কি কখনও চোখে পড়েছে?

—জানি না মা, আমি আর ওদিকে তাকাই না।

—তুমি তো মিথ্যে ভয় করে একটা অলক্ষণ দেখতে পেলে; কিন্তু লাহিড়ীবাবুর মেয়েরা কি বলে গেল শুনবে?

—বলুন, শুনি।

—সকালবেলাতে অগ্নিগড়ে বেড়াতে গিয়ে ওরা দেখতে পেয়েছে, বরফে ঢাকা সাদা গোরীচং, উত্তরের আকাশে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে রয়েছে।

শুনে খুশি হল কালোর মা—শুনেছি, এটা নাকি খুব সুলক্ষণ।

মণিমালা—খুব খুব। লাহিড়ীর মেয়েকে আমি বলেছি; তোর বিয়ে হবে শিগগির, শিবের মত বর হবে তোর।

কথা শেষ করেও হাসতে থাকেন মণিমাসি। হঠাৎ আরও খুশি হয়ে বলে ওঠেন—শুনেছো তো কালোর মা, আজ যে শান্তির আসবার কথা।

—শুনেছি মা।

—আমারও ইচ্ছে, শান্তি একবার অগ্নিগড়ে গিয়ে দেখে আসুক ওই গোরীচং; একটু ভাল করে দেখে আসুক।

| চৌদ্দ |

শান্তিকে দেখতে বেশ রোগা-রোগা মনে হয়েছে, এই একটু দুঃখিত হয়েছেন মণিমাসি। আর, দুঃখের ভাবনা যেন একটা উদ্বেগের ভাষা। এখন এরকম একটা রোগাটে মূর্তি ধরলে কে চলবে না। ঝাড়াঝাড়ি শরীর সারিয়ে ফেলতে হবে। শুনেছিস তো শান্তি?

শান্তি—শুনেছি।

মণিমাসি—শরীর ভাল না করে কদমবাড়ি যেতে পারবে না। আমি আগেই বলে রাখছি।

শান্তি—তাহলে তো আজকেই কদমবাড়ি যেতে হয়।

মণিমাসি—কেন? কেন?

শান্তি—আমার শরীর খুব ভাল আছে, যথেষ্ট ভাল আছে।

মণিমাসি—না, নেই।

শান্তি—তাহলে আমারও আর কিছু বলবার নেই।

মণিমাসি—আমি কিরণদিকে আজই চিঠি দিচ্ছি, তুমি বেশ কিছুদিন এখানেই থাকবে।

শান্তি হাসে—বেশ কিছুদিন কেন মণিমাসি; অন্ততঃ পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই সরে পড়বো।

মণিমাসি—পরীক্ষার ফলের কথা ভেবে এত ভয় করবার কি আছে?

শান্তি—আমার একটুও ভয় নেই। ফেল করলে বড় পিসি ভয়ানক কষ্ট পাবেন, শুধু এই ভয়।

—তা তো বটে; তোর বড়পিসি দুঃখিত না হয়ে পারবেন কেন? একে তো নিজে বিদুষী মানুষ, তার ওপর তোকে পড়াতে গিয়ে মানুষটা এই বয়সে নিজেও কত খেটেছে। কিন্তু এখন তো আর তোর পাস-ফেল নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই।

মাঝে মাঝে মনে হয়েছে মণিমাসির; শান্তি যেন বড় বেশি ভাবছে। হাতে কোন গল্পের বই নেই, রেডিওটারও মুখ বন্ধ, তবু ঘরের ভিতরে একা একটা চেয়ারে বসে শুধু আংটিটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আঙুল থেকে খুলছে, আবার পরিয়ে ফেলছে।

মণিমাসি বলেন—অনিমেষ এখন তেজপুরে নেই। থাকলে কি আর এই দশদিনের মধ্যে একটা দিনও না এসে পারতো? কিন্তু আসবে। অঞ্জলি বলেছে; বড়জোর আর দেড় মাস। তারপর ছুটি পেতে অনিমেষের আর কোন অসুবিধে হবে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় মণিমাসির, শান্তি যেন বড় বেশি শান্ত হয়ে গিয়েছে। গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করছে রাজবাহাদুর, শব্দ শুনে আর দেখতে পেয়েও ছটফট করে ওঠে না শান্তি।

মণিমাসি বলেন—কি হলো তোর শান্তি? না নীরা, না মালতী, কারও সঙ্গে একটিবার দেখা করতেও গেলি না, অথচ এক মাসেরও বেশি হলো তেজপুরে এসেছিস।

শান্তি—যাব একদিন।

মণিমাসি—আমি বলি, আগে একদিন অবজারভেটরী হিলে গিয়ে উত্তরের সেফার গোরীচং দেখে আয়।

শান্তি—যাব একদিন; এখন যেতে ইচ্ছে করে না।

মণিমাসি হাসেন—একা একা যেতে ইচ্ছে করে না বুঝি।

এক-একবার সন্দেহ হয় মণিমাসির, এবার যেন কলকাতা থেকে একটা ক্লান্ত শরীর নিয়ে তেজপুরে এসেছে শান্তি। তা না হলে আজকাল এত ঘুমোতে আর শুয়ে পড়ে থাকতে চায় কেন মেয়েটা?

তেজপুরের জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের জ্বালায় উষাপাহাড় যতই শুকনো আর রুক্ষ হয়ে যাক না কেন, রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর কোন ঘরে সে-জ্বালার কোন ছোঁয়া ঢুকতে পায় না। খস খাসের মোটা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে ভারতীর সব ঘরের জানালা আর দরজা। প্রতি ঘণ্টায় পিচকারী দিয়ে জল ছিটিয়ে সে পর্দা ভিজিয়ে রাখবার জন্য দুজন চাকর দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত

যাব, বল? আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করাই বা কেন?

মণিমালা—কেন নয়?

শক্তি—তোমরা আছ কি করতে?

মণিমালা—আমি থাকলেই বা কি, আর না থাকলেই বা কি?

শক্তি হাসে—কেন?

মণিমালা—আমি তো আমার বোকা মনে বিশ্বাস করেছিলাম, অনিমেষের সঙ্গে তোমার কোন আপত্তি নেই।

শক্তি—আমি কি কখনও বলেছি যে, আপত্তি আছে?

চমকে ওঠেন মণিমালা।—তোমার কথাটা আমার কিন্তু শুনতে একটুও ভাল লাগলো না। খুব বাজে কথা, খুব ভুল কথা।

শক্তি—কেন? কিসের ভুল হলো?

মণিমালার গলার স্বর যেন একটা ভৎর্সনার ধমক হয়ে ফেটে পড়তে চায়। তবু খুব চেষ্টা করে; গলার স্বরের সঙ্গে ভাষার রূঢ়তাও সামলে নিলেন মণিমালা। কিন্তু তাঁর চোখ দুটো রুক্ষ হয়ে কাঁপতে থাকে। —আমি জিজ্ঞাসা করি; তুমি কি একটা মানুষ, না দুটো মানুষ? তোমার কি একটা প্রাণ, না দুটো প্রাণ? গগনবাবুর কি শক্তি নামে দুটো মেয়ে আছে; একজনের মন ভবানীপুরে, আর একজনের মন তেজপুরে? খুব দুঃখের কথা; আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি যে, তোমার মত মেয়ে ঠিক বরেন ঘোষের মেয়েটার মত এরকম একটা দোমনা কাণ্ড করবে।

—মণিমাসি! চেঁচিয়ে ওঠে শক্তি।—আমিও কোনদিন ভাবতে পারিনি যে, তুমি এত শক্ত কথা বলতে পার।

শক্তির চোখের তারা দুটো যেন ভয় পেয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে। থেকে-থেকে শিউরে উঠছে এক-একটা নিঃশ্বাস। মণিমাসির কথাগুলি তো কথা নয়; উষা-পাহাড়ের আগুনটার যত ফুলকি, ছুটে এসে শক্তির মাথার উপর কুচি-কুচি জ্বালার মত ঝরে পড়ছে।

শক্ত কথা সামলাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন মণিমালা। শক্তি এগিয়ে এসে মণিমালার দুটো হাত শক্ত করে চেপে ধরে। শক্তির বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস যেন ক্ষেপে উঠেছে।—আমি ছাড়বো না, বলতেই হবে মণিমাসি, কি দোষ করলাম আমি?

মণিমাসি—আর কত বলবো?

শক্তি—না আরও বল। আমাকে বুঝিয়ে দাও।

মণিমাসি—তুমি বুঝে দেখ।

শক্তি—আমি বুঝতে পারছি না।

মণিমাসি—অনিমেষকে ভাল লাগে?

শক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—শ্যামলকে ভাল লাগে?

শক্তি—হ্যাঁ।

মণিমাসি—লজ্জার কথা। তুমি ভুল করে তোমার মনটাকেই নষ্ট করেছ।

হঠাৎ শান্ত হয়ে যায় শক্তি। মণিমালার হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু হাত তুলে আর খোঁপাটাকে বাঁধতে পারে না। দুঃসহ একটা লজ্জার ভারে ভারী হয়ে গিয়েছে হাত দুটো। সে লজ্জা শক্তির গলার স্বরেও একটা যন্ত্রণার আত্মবিলাপের মত বেজে ওঠে।—বুঝতে পেরেছি মণিমাসি; কিন্তু আমি ইচ্ছে করে ভুল করিনি।

মণিমালার চোখ-মুখ এইবার যেন অদ্ভুত এক উতলা করুণতায় ভরে যায়। শক্তির হাত ধরে টানতে থাকেন মণিমালা—আয়, চোখ মুখ ধুয়ে নিয়ে আমার কাছে একটু বসবি, আয়।

চোখ-মুখ ধুয়ে মণিমালার কাছে চুপ করে বসে থাকলেও শক্তিকে ঠিক আর সেই শক্তির মত দেখায় না। ঝড়বৃষ্টির পর ভারতীর বাগানের ছোট কামিনী গাছটাকে যেমন দেখায়, শক্তিকেও প্রায় সেইরকম দেখায়; শান্ত অথচ এলোমেলো। সবই তো বুঝতে পারা গেল, মনটা তাই শান্ত। কিন্তু এর পর যে কি হবে, বুঝতে না পেরে প্রাণটা এলোমেলো।

রাতের কাজ শেষ হবার পর জপের মালা হাতে নিয়ে ছাদে ওঠেন কালোর মা। শক্তিও ছাদে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মণিমালা আপত্তি করেন, না না না, হিম লাগবে শক্তি। কিন্তু শক্তি হাসে—সত্যি আমার খুব ভাল লাগে, তুমি মানা করো না, এখনই চলে আসবো।

যেন চেনা আকাশের তারা খুঁজছে শক্তির চোখ। দেখতেও অসুবিধে নেই। দুটো তারা জ্বলছে।

ভালই করলেন মণিমাসি। ভুল বুঝিয়ে দিতে গিয়ে কিছুই বলতে আর বাকি রাখেননি, বরেন ঘোষের মেয়ে! যে-টুকু বলতে বাকি ছিল সে-টুকু ওই একটি তুলনার কথা দিয়েই একেবারে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন।

বরেন ঘোষের মেয়ের গল্প করতে গিয়ে মীরাকাকিমা যে-কথাটা বলেছিলেন সে-কথাটাও কী ভয়ানক একটা স্পষ্ট কথা, ডবল প্রেম। শেফালিকা ঘোষ শিলংয়ে থাকতে দুজনকে ভালবেসে শেষে একটা বিশ্রী মামলার কাণ্ড বাধিয়ে ছিল। আদালতে একটা ফটো দাখিল করেছিলেন উকীল; দু'হাতে দুজনের হাত ধরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে শেফালিকা ঘোষ।

সেদিন শেফালিকা ঘোষের গল্প শুনে শিউরে উঠেছিল শক্তি। আজ নিজের কথা ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়। কেউ যদি আজ এখন চুপি-চুপি এখানে এসে শক্তির একটা ফটো তুলে নিয়ে চলে যায়, তবে সেই ফটোতেও দেখতে পাওয়া যাবে, চেনা-আকাশের দুটো তারার দিকে তাকিয়ে শক্তি বসুও দাঁড়িয়ে আছে।

লজ্জা পেলে তো সত্যটা আর মিথ্যে হয়ে যাবে না। গোলাপে যে নামে ডাক; শক্তি বসুর এই আপত্তি-নেই মনটা যে ভালবাসারই মন। বুঝতে চেষ্টা না করে, আর ভুলে থাকতে চেষ্টা করে, কিংবা লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে কি এই ছাই অদ্ভুত মনের হাত থেকে ছাড়া পাওয়া যায়? যায় না, যাবেও না। একটা মামলার আদালত যদি এখনই এসে শক্তির গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়ে বলে যে, মরবার আগে সত্যি কথাটা স্বীকার করে যাও, তবে তো বলতেই হবে, হাঁ, এখনও আপত্তি নেই। শ্যামলবাবুর জন্মদিনে একটা ফুলের তোড়া পাঠাতে, আর অনিমেষ-বাবুর সঙ্গে বিলের জলের নীলপদ্ম দেখতে যেতে একটুও খারাপ লাগলে না।

দোতলার বারান্দার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে মণিমালা ডাকলেন, আর দেরি করো না, শক্তি। এবার চলে এস।

এ-ছাড়া মণিমালার মনের মায়াটার যে আর কোন কাজও নেই। আশা করবার কিছু নেই; শক্তিকে শুধু যত্ন করে আর সাবধানে আগলে রাখতে হবে, যতদিন এখানে থাকতে চাইবে ওর মন।

সব চেয়ে কষ্ট হয় তখন, যখন বুঝতে পারেন মণিমালা, কিরণদিকে আর লিখে জানাবার মত কিছু নেই। আর কিছু লেখবার দরকারও হয় না। কিরণদি এবার তাঁর মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই সব বুঝে নিতে পারবেন। কিন্তু তবু, কষ্ট হয় বইকি। গগনবাবুর কথা ভেবেও কষ্ট হয়। কিরণদিরও যে বার বার শুধু এই কথাটাই মনে হবে শক্তিকে নিজের মেয়ের মত মনে করে যে-দুটি মানুষ শক্তির ভাল করতে চেয়েছিল, তাদের আর কিছুই চেষ্টা করবার রইল না। শক্তিই তাদের চেষ্টার হাত ভেঙে দিয়েছে। কিরণদির এই বয়সের জীবনে এটা কি একটা কঠিন আঘাত হয়ে বাজবে না?

কলম হাতে তুলে নিয়েও কিছু লিখতে পারেন না মণিমালা, একটিও কথা না লিখেও হাতটা যেন ক্লান্ত হয়ে যায়। তবু লিখে ফেললেন—আমি আর কিছু লিখতে পারছি না, কিরণদি। কিছু মনে করো না। তুমি শক্তিকেই জিজ্ঞেসা করে সব জেনে নিও।

ভাঁজ করা চিঠিটাকে খামে বন্ধ করতে গিয়ে আবার একটু ভাবেন মণিমালা। তারপর চিঠির ভাঁজ খুলে আবার লিখতে থাকেন।—না, চিন্তে করবার কিছু নেই, কিরণদি। শক্তির শরীর এখন বেশ ভাল আছে। আরও ভাল হবে। আরও কিছুদিন, অন্ততঃ পরীক্ষার ফল বের হওয়া পর্যন্ত শক্তি আমার কাছেই থাকুক।

নেফার পাহাড়ের মাথায় মাঝে মাঝে কালো মেঘ ঘনিয়ে ওঠে। এক-আধ পশলা বৃষ্টি

আশা করছে তপ্ত শহর তেজপুরে। শক্তিও আশা করে: আর দেরি নেই বোধহয়, এইবার পরীক্ষার ফল বের হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর?

শক্তি বলে—তারপর আর দেরি করো না মণিমাসি; মা'র চিঠি আমাকে যেতে বলুক আর না বলুক; তোমার ইচ্ছে হোক বা না হোক, আমাকে কদমবাড়ি পাঠিয়ে দিও।

মণিমাসি—তাই হবে গো মেয়ে। আমি তো একটা মাসি মাত্র, ইচ্ছে থাকলেও কত আর ধরে রাখতে পারবো।

সেদিনই কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের একটা চিঠি পেলেন মণিমালা, শক্তিকে বলবেন, আর সাতদিন পরে পরীক্ষার ফল বের হবে।

—তবে আর কি? মাসির বকা-ঝকা থেকে রেহাই পেয়ে আর সাতদিন পরেই হাঁপ ছাড়বি, শক্তি।

শক্তি হাসতে চেষ্টা করে।—তুমি ওরকম করে মিথ্যে কথা বলো না, মণিমাসি। তুমি কবে আবার আমাকে বকা-ঝকা করলে?

মণিমাসির চোখ ছলছল করে—করেছি বইকি। তুই হয়তো রাগও করেছিস, কিন্তু......।

শক্তি হাসে—এইবার কিন্তু আমি সত্যিই রাগ করবো, যদিও আগে কখনও রাগ করিনি।

মণিমাসি—তোকে চলে যেতে দিতে সত্যিই আমার একটুও ভাল লাগছে না।

শক্তি—কি আশ্চর্য, আমি যেন আর তোমার কাছে আসবোই না, তুমি যেন এরকম একটা মিথ্যে ধারণা করে যা-খুশি-তাই ভাবছো।

মণিমাসি—না না, কিছু ভাবছি না। যাবি, আসবি বইকি; যখন ইচ্ছে হয় তখনই চলে আসবি। তবে .....।

শক্তি—কি?

মণিমাসি—তবে, পরীক্ষার ফল বের হবার পর আরও পাঁচ দশটা দিন তোকে এখানে আটকে রাখলে কিরণদি কিছু মনে করবেন না বোধহয়।

শক্তি হাসে—সেটা তুমি জান, আর তোমার দিদি জানে।

কিন্তু পরের দিনই সকালবেলা মণিমাসির মনের এই মায়ার বিলাপ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে; স্তব্দ হয়ে যায়; আর বোবা হয়ে ছটফট করে। এখনই শক্তির কাছে ছুটে গিয়ে বলে দিতে ইচ্ছে করে না, তোর এখন আর এখানে থাকতে হবে না, থেকে কাজ নেই, থেকে লাভ কি, থাকা উচিত নয়, তুই আজই কদমবাড়ি চলে যা।

বলে দিতে ইচ্ছে করলেই কি বলতে পারা যাবে? শক্তি কি একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে না? তারপর হঠাৎ যদি মেয়েটা মুখ খুলে বলেই দেয়—তুমি যেন তোমার মান বাঁচাবার জন্যে সাবধান হয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাইছো, মণিমাসি। তবে সে-কথাটা সহ্য করবেনই বা কেমন করে? কিন্তু সেটা তো খুব-একটা মিথ্যে কথা হবে না।

সোম লজের মালী এসে মণিমালাকে খবর দিয়েছে; মা আপনাকে বলতে বললেন, শিলিগুড়ি থেকে দাদাবাবু কাল এখানে পৌঁছবেন।

তারপর? তারপর যা হবে সেটা কল্পনা করতেও অসুবিধে নেই। অনিমেষ নিজেই এখানে আসবে। শক্তির সঙ্গে কথা বলবে। শক্তিও হয়তো কথা বলবে। যে-কথা আর যেমন কথাই হোক না কেন, সে-সব কথার তো কোন মানে হতে পারে না। দেখতে ও শুনতে বড় জোর একটা ভাল থিয়েটারের মত লাগবে, এই মাত্র। অনিমেষ তেজপুরে পৌঁছবার আগেই শক্তির কদমবাড়ি চলে যাওয়া ভাল।

কিন্তু সে-কথা বলতে হলে যে মণিমালার বুকের ভিতরে একটা লজ্জা মাথা খুঁড়ে মরতে চাইবে। জীবনে কোনদিন শক্তিকে একথা বলবার দুর্ভাগ্য হয়নি মণিমালার, তুই এবার চলে যা, শক্তি। আজ কি সেই ভয়ানক নিষ্ঠুর কথাটা বলতে হবে?

দেখতে পাননি মণিমালা, শক্তি কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আর হাসছে। মণিমালার গলার স্বর ছটফট করে।—কি রে শক্তি? কি বলছিস, লক্ষ্মী মা?

শক্তি—পরীক্ষার ফল তো আর ছ'দিন পরে বের হবেই, সবাই জানতেও পারবে।

মণিমাসি—হ্যাঁ।

শক্তি—কিন্তু আমি তার আগেই কদমবাড়ি চলে যাই না কেন? পরীক্ষার ফল জানবার জন্যে আমার আর এখানে না থাকলেও তো কিছু আসে যায় না?

মণিমাসি—যেতে চাস?

শক্তি—হ্যাঁ। রাজবাহাদুর কোথায়?

মণিমাসি—কেন?

শক্তি—আমি আজই কদমবাড়ি যাব। রাজবাহাদুরকে গাড়ি বের করতে বল।

মণিমাসি—এখনই রওনা হতে চাস নাকি?

শক্তি—হ্যাঁ।

[পনের]

কদমবাড়ির চা-কলমের গায়ে কচি পাতা ধরেছে। নেফার পাহাড়ের মেঘ বার বার অনেকবার ভেসে এসেছে আর গুঁড়ো বৃষ্টি ঝরিয়ে দিয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে। আবার রোদ উঠেছে। আষাঢ়ের এই ফাঁকা চেহারা যে আর বেশিদিন থাকবে না, তারই আভাস দিয়ে কদমবাড়ির আকাশে ঘোর মেঘলা আবেশও মাঝে মাঝে কালো হয়ে ওঠে।

বুলডগ মহারাজা কতবার শক্তির কাছে এসে ছুটোছুটির হাতছানি দেখবার জন্যে ছটফট করে, শক্তির শাড়ির আঁচল কামড়ে ধরে টানাটানিও করে। কিন্তু সাহেবকুঠির

মেয়ে শুক্তি শুধু চুপ করে বসে থাকে। কখনও বারান্দার এককোণের একটি মেহগনির চেয়ারে, কখনও লনের পাশে কংক্রীটের ছোট বেদিটার উপরে, কিংবা পুরনো পিলখানার সামনে বকুলের ছায়ার কাছে রাখা পদ্মকাটা পাথরটার উপর, যেটাকে পঞ্চাশ বছর আগে পাব্লিক ওয়ার্কসের চীফ ইঞ্জিনীয়ার রবার্টসন ভালুকপংয়ের কাছাকাছি পুরাকালের একটা প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ থেকে কুড়িয়ে আর হাতি দিয়ে টানিয়ে এনে এখানে রেখেছিলেন।

কিরণলেখা বলেছেন—তোকে একটা কথা একটু বুঝিয়ে বলবার ছিল শুক্তি।

শুক্তি—বল।

কিরণলেখা—বলবোই তো, কিন্তু এটা কি? তোমার নতুন শখ, না নতুন বাতিক?

শুক্তি—কি?

কিরণলেখা—তোমার গায়ের এই শাড়িটা? একেবারে সাদা একটা গরদ।

সেই তো সাদা একটা গরদ, পাড়ও নেই। এ যেন এই বয়সের জীবনের সব রঙ ধুয়ে-মুছে দিয়ে একেবারে একেলা হয়ে থাকবার একটা ইচ্ছার সাজ। লনের এক পাশে সবুজ ঘাসের উপর নিথর ও শান্ত একটি সাদা অস্তিত্ব হয়ে বসে আছে শুক্তি। শুক্তিকে দেখতে তো একটুও খারাপ দেখায় না; তবু কিরণলেখার দেখতে ভাল লাগে না। চোখে পড়তেই তাঁর চোখের চশমার কাচ বেশ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে; তাই এগিয়ে এসেছেন আর প্রশ্ন করেছেন।

শুক্তি হাসে—খারাপ দেখাচ্ছে?

কিরণলেখা—না, খারাপ দেখাবে কেন? কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না।

শুক্তি—আমি তো ভাল দেখাবার জন্যে সাদা গরদ পরিনি।

কিরণলেখা—তবে কেন পরেছিস?

শুক্তি—ভাল লাগলো, তাই পরেছি।

আর কথা না বাড়িয়ে, শুধু শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মনের প্রশ্নটাকে মনের মধ্যেই চেপে রাখেন কিরণলেখা। বলতে ইচ্ছে করে, আজ হঠাৎ তোমার কেন ভাল লাগছে এই সাদা সাজ? কী এমন ব্যাপার হলো যে, এত শান্ত হয়ে বসে থাকতে হবে? কিসের এত ক্লান্তি যে, এত কম কথা বলতে হবে? সবই যে নতুন বাতিক বলে মনে হয়।

কিরণলেখার চোখে চশমার কাচ ঝাপসা হবেই বা না কেন? বেণী নেই, মস্ত বড় একটা খোঁপা, তার উপর এই সাদা গরদ। এ যেন অন্য একটা মেয়ে, শুধু মুখটা ঠিক শুক্তির মত। একটা বছরও পার হয়নি, এত হাসি-খুশি আর এত দুরন্ত মেয়েটাকে কে যেন মনে-প্রাণে আর চেহারাতেও একেবারে অন্যরকম করে সাজিয়ে কদমবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাঝে অবশ্য একটি দিন, যেদিন শুক্তির পাসের খবরটা নিয়ে কলকাতা থেকে সুমিত্রার চিঠি এল, সেদিন খুব খুশি হয়ে হেসেছিল শুক্তি—আঃ, আমার কী ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন কেটে গেল, মা।

—কি বললি?

তিনটে মাস ধরে সমস্তক্ষণ ভয়-ভয় করেছে; শুধু মনে হয়েছে, ফেল করলে বড়-পিসির মনে কী কষ্টই না হবে।

গগন বসুও না হেসে থাকতে পারেননি। —সুমির কাছে থাকলে কারও কি লেখা-পড়া না শেখবার সাধ্যি আছে?

কিরণলেখাও খুশি হয়ে হাসেন—আসল কথা হলো শুক্তির ভাগ্য। শুক্তিকে একটু হিংসে করলে মন্দ হয় না।

গগন বসু—কেন বল তো?

কিরণলেখা—সুমিত্রার মত পিসি আর মণিমালার মত মাসি থাকতে শুক্তির আর ভাবনা কিসের? পিসির যত্নে বি-এ পাস করা হলো, আর মাসির যত্নে রোগা চেহারা দুমাসেই ভাল হয়ে গেল।

গগন বসু—ঠিক কথা। শুক্তির মণিমাসির স্নেহচ্ছায়ায় থাকলে কি কারও রোগা হয়ে থাকবার সাধ্যি আছে?

কিরণলেখা—ঠাট্টা করছো কেন? যদি দেখো, এমন কিছু মোটা নয়।

কদমবাড়ির সাহেবকুঠির জীবনে সুখী কলরবের সেই দিনটির পর পরে, তিরিশটি দিন পার হয়ে গেলেও কিরণলেখা কিন্তু এখনও শুক্তির কাছে সেই কথাটা আজও বলতে পারেন নি, যে-কথা শুক্তির জীবনেরই একটি সুখী উৎসবের ইচ্ছার কথা।

বলতে গিয়েও অনেকবার কুণ্ঠিত হয়ে চুপ করে গিয়েছেন কিরণলেখা। শুক্তির চোখ দুটো যেন দুটো চোখ মাত্র, তার মধ্যে কোন ভাবনা আর কল্পনার চঞ্চলতা নেই। দুরন্তপনার সেই ছটফটে মেয়ের এই শান্ত-পনা দেখতে একটুও ভাল লাগে না কিরণলেখার। সুমিত্রার আর মণিমালার চিঠির অমন শুকনো হতাশ উদাস ভাষাও ভাল লাগে নি। কিরণলেখার শুধু মনে হয়েছে, আর মনে হতেই বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছেন যে, সবাই যেন চোখের ভুলে মিথ্যে একটা কালো ছায়া দেখে ভয় পেয়েছে আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। না, মোটেই না; সাদা গরদ পরতে ভাল লাগবে শুক্তির, এমন কোন অপরাধ করেনি শুক্তির মন।

তাই কিরণলেখা যেন একটা সুখী লগ্নের অপেক্ষায় আছেন। বোধ হয় কামনা করেন কিরণলেখা, রাতের আকাশের মেঘ হঠাৎ একটু ভেঙ্গে যাক, মুখঢাকা চাঁদটা একবার ঝিকঝিক করে হেসে উঠুক, কদমবাড়ির অন্ধকারের গায়ে একটু জ্যোৎস্না ঝরে পড়ুক, আর সাহেবকুঠির বারান্দার কোচের উপর বসে হঠাৎ গুনগুন করে গান গেয়ে ফেলুক শুক্তি; তখনই শুক্তির কাছে গিয়ে বসে আর হেসে-হেসে কথাটা তুলতে পারবেন কিরণলেখা। বলে দিতে পারবেন, না, তোমার এত গম্ভীর হয়ে যাওয়ার মত কিছুই হয়নি। এরকম হয়েই থাকে। ওটা একটা সমস্যাই নয়, কোন গিঁট নয়, কাঁটা নয়, ময়লা ধুলোও নয়।

আজ থাক তবে। আজ এখন এই লনের ঘাসের উপর চুপ করে বসে থাকুক শুক্তি। যদিও বিকেল ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু এমনই একটা ঘন মেঘলার দিন যে, পশ্চিমের আকাশে একটা লালচে আভার রেখাও ফুটে উঠতে পারে নি। আজ এ-সময় কথাটা তুলতে গেলে শুক্তির চোখ দুটোও বোধহয় ভয় পেয়ে মেঘলা হয়ে যাবে, মুখ ফিরিয়ে নেবে, হয়তো কোন কথাই বলবে না।

সন্ধ্যা হতেই সাহেবকুঠির সব ঘরে যখন আলো জ্বলতে শুরু করে, তখন বারান্দার চেয়ারে বসে অফিসের হিসাবের খাতায় সই করেন গগন বসু। তারপর পাইপ ধরান। তারপর খবরের কাগজটাকে হাতে তুলে নেন।

শুক্তি নেই; শুধু সন্ধ্যের হাওয়া। সাহেবকুঠির একটি ঘরের রঙীন কাপড়ের পর্দা ফুরফুরে কাঁপতে থাকে। সে ঘরের বিছানার উপর বসে আর কোলের উপর একটা বই রেখে অন্যমনার মত কি যেন দেখতে থাকে শুক্তি। তারপর কি যেন শুনতে পেয়ে চমকে ওঠে।

গগনবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন কুমুদ ডাক্তার। গগন বসু হাসছেন—তা আপনি আর কী করবেন? আপনিও ওইরকম দু-একটা কথা বলে ভদ্রলোককে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করে রাখুন।

কুমুদ ডাক্তার—তা তো বলছিই; সব সময়েই বলছি; কিন্তু মানতে কি চায়? মুন্সী চাপরাশি দফাদার কামদার সরদার, যাকে দেখতে পাবে, তাকেই ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, হ্যাঁ গো, বুমলা জায়গাটা কোথায়? এখান থেকে কত দূরে? একেলা গিয়ে একেলা ফিরে আসতে পারবো তো?

গগন বসু—ওরা কী জবাব দেয়?

কুমুদ ডাক্তার হাসেন—আমি ওদের সবাইকে যা শিখিয়ে দিয়েছি, তাই ওরা বলে দেয়। ওই তো ওখানে, চারদুয়ারের কাছে বুমলা। মুড়ি মুড়কি আর কইমাছ, সব কিছুই সেখানে পাওয়া যায়। তবে, এখন সেখানে যেতে অসুবিধা আছে। পথের উপর পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, কাউকে যেতে দেয় না।

গগন বসু—শুক্তিদের চিঠি-পত্র পাচ্ছেন?

কুমুদ ডাক্তার—পাচ্ছি। কিন্তু সে-সব চিঠি লুকিয়ে রাখতে হয়।

গগন বসু—কেন?

কুমুদ ডাক্তার—না লুকিয়ে উপায় কি?

সুজিতের কাকিমার হাতে সে-চিঠি পড়লে কি তার আর বুঝে ফেলতে কিছু বাকি থাকবে?

গগন বসু—কী লেখে সুজিত?

কুমুদ ডাক্তার—আমি ভাল আছি, শুধু এই একটি কথা লিখলেই তো কোন গোলমালের ভয় থাকতো না। কিন্তু হেন তেন অনেক আজে-বাজে কথা লেখে।

গগন বসু—আজে-বাজে কথা?

কুমুদ ডাক্তার—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার! খুব ভাল জায়গা বমেলা। খুব উঁচু পাহাড়ের ওপর ওদের পোস্ট। মাসে একবার করে হেলিকপটর উড়ে এসে ওদের চাল-ডালের বস্তা ড্রপ করে দিয়ে চলে যায়। রাত্রিবেলায় পাহারার সময় মাথার লোহার টুপির ওপর এক ইঞ্চি পুরু বরফ জমে যায়। খবর পাওয়া গিয়েছে, চীনেরা আমাদের সীমানার লাইনের কাছেই ঘুরঘুর করছে।

খবরের কাগজটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গগন বসু বলেন। —হ্যাঁ, আজ দেখছি, কাগজেও একথা বলছে।

কুমুদ ডাক্তার—একদিন পেট্রলে বের হয়ে হঠাৎ একটা কস্তুরী হরিণ দেখতে পেয়েছিল সুজিত। কিন্তু ধরতে পারে নি।

গগন বসু—হ্যাঁ, শুনেছি, ত্সোয়াং-এর কাছে পাইনের জঙ্গলে কস্তুরী হরিণ পাওয়া যায়।

কুমুদ ডাক্তার—এখন বলুন স্যার, এসব কথা জানতে পেলে কি আর কিছু বুঝতে বাকি থাকবে, বমেলা কোথায়? মানুষটা একটু বোকা বটে, কিন্তু খুব বোকা তো নয়।

ঘরের ভাবটা এতক্ষণে বেশ একটু উতলা হয়ে উঠেছে। চাকরাণের মত শিরীষ মাথা দোলাতে শুরু করেছে। শক্তির ঘরে ঢুকে তার আজকের জেরবারটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলেই যাচ্ছিলেন কিরণলেখা। কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন।

কিরণলেখা হাসেন। —তোর হাতে ওটা কিসের বই, শক্তি?

শক্তি—ওটা একটা বই ...... একটা গল্পের বই...... না না, ওটা একটা ছবির বই, এভারেস্টের ছবি।

যাই হোক, বইয়ের পাতায় এভারেস্টের ছবি যত সাদা হোক না কেন, শক্তির মুখটা যে রঙীন হয়ে হাসছে বলে মনে হয়। এগিয়ে এসে শক্তির বিছানার উপর বসেন কিরণলেখা। —কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় শ্যামলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

শক্তি—না।

কিরণলেখা—তেজপুর থেকে আসবার আগে অনিমেষের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

শক্তি—না।

কিরণলেখা—কিন্তু তোর তো নিশ্চয় ইচ্ছে হয়েছিল, দুজনের কেউ একজন এসে দেখা করুক।

শক্তি—কি বললে?

কিরণলেখা—শ্যামল হোক, কিংবা অনিমেষ হোক, যাকে দেখতে পেলে তোমার বেশি ভাল লাগে......।

শক্তি—না না, এসব কথা বলো না। আমি তোমার কথার কোন মানে বুঝতে পারছি না, পারবোও না।

কিরণলেখা—তা হয় না শক্তি।

শক্তি—কি হয় না?

কিরণলেখা—দুজন কখনও সমান হয় না। আর, দুজনকে কখনও সমান ভালও লাগে না।

শক্তির মাথাটা ঝুঁকে পড়ে যেন সাদা এভারেস্টের ছবির মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চায়। কিন্তু কিরণলেখা আজ বোধ হয় শক্তির প্রাণের ওই হেঁট-মাথা ভঙ্গীটাকেই একেবারে মিথ্যে করে দেবার জন্য তৈরী হয়েছেন। কিরণলেখা বলেন—লজ্জা করবার কিছুই নেই, শক্তি। দুজনের সঙ্গে চেনা-শোনা হয়েছে, দুজনকেই ভাল লেগেছে, ভালই হয়েছে। ওতে কিছুই আসে যায় না। ওরকম হয়েই থাকে। কিন্তু......।

শক্তির আরও কাছে এগিয়ে এসে, শক্তির মাথায় হাত রেখে কিরণলেখা বলেন,—শুধু একটু বুঝে নিতে হয়, কাকে বেশি লাগে।

এই যে তোমার বাণীকাকিমা, সে মেয়ে কী করেছিল, শুনবে? দু জায়গা থেকে বাণীর বিয়ের কথা এসেছিল। দুজনেই ভাল ছেলে। কিন্তু বাণী বলেছিল, প্রণব বসুকেই বেশি ভাল বলে মনে হয়। কাজেই তোমার প্রণবকাকার সঙ্গে বাণীর বিয়ে হয়ে গেল।

কিরণলেখার মুখের দিকে দুই চোখ অপলক করে তাকিয়ে থাকে শক্তি। শক্তির মাথায় হাত বুলিয়ে কিরণলেখা বলতে থাকেন। —তোমার অসুবিধে তোমার বাণীকাকিমার অসুবিধের চেয়ে একটুও কঠিন কিছু নয় শক্তি। ওই দুই ছেলের কারও সঙ্গে বাণীর চেনা-শোনা ছিল না, আর তোমার সঙ্গে দুজনের চেনা-শোনা হয়েছে, এই তো তফাৎ। তোমার তো বরং ভেবে নিতে ভুল হবার ভয় আরও কম, কাকে বেশি ভাল লাগে।

শক্তি—তুমি এবার চুপ কর।

কিরণলেখা—চুপ করছি। কিন্তু বলবি তো। বলিস লক্ষ্মী, আমার কাছে বলতে তো কোন লজ্জা নেই।

শক্তি—বলবো।

কিরণলেখা—কিন্তু বেশি দেরি করো না যেন। সুমিত্রা আর মণিকে একটু তাড়াতাড়ি
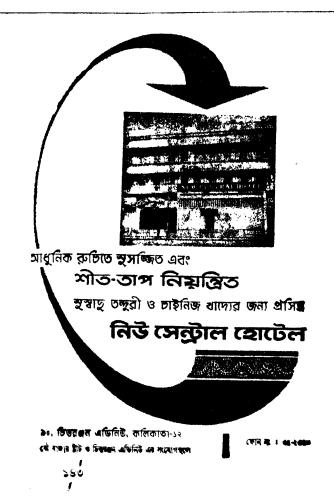
চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিলেই ভাল; ওরাও তো ভাবছে।

চলে গেলেন কিরণলেখা। শুক্তির মনের ভিতরে যেন একটা দীপের আলো জেলে দিয়ে চলে গেলেন। তা না হলে শুক্তির চোখে এমন একটা জলজলে হাসি এতক্ষণ ধরে ফুটে থাকতে পারতো না। এই কয়েকটা মাস নিজেকে একটা ভুলের অন্ধকার বলে বিশ্বাস করে যে লজ্জা পেয়েছে শুক্তি, সে লজ্জা যে একটা মিথ্যা ভয়ের অন্ধকার। মা'র কথাগুলি কত স্পষ্ট। কিন্তু এত স্পষ্ট করে বলে দিতে পারলেন বলেই তো শুক্তির মন এমন একটা সান্ত্বনা পেয়ে গেল। চেনা-আকাশে শুধু দুটো তারা; শুক্তিকে শুধু একবার বলে দিতে হবে, কাকে বেশি লাগে। তা তো বলতেই হবে। অন্তত মা'র কাছে বলে দিতে কোন লজ্জা নেই।

কিন্তু মাঝরাতের ঘুম হঠাৎ ভেঙে যাবার পর আর ঘুম আসে না যখন, ঝুরু ঝুরু বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাওয়া যায় না যখন, তখন ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারে শুক্তি, কিছুই বুঝতে পারা যাচ্ছে না। ভালবাসার আশাটা কাকে বেশি খোঁজে আর কাকে কম; হিসেব করতে গেলে যে সবই এলোমেলো হয়ে যায়। সন্দেহ হয় সবই মিথ্যে। শুক্তির জীবনের আকাশে ওরা দুজন দুটো তারাই নয়।

কিন্তু অস্বীকার করবার যে সাধ্য নেই। নীলপদ্মের গল্প শুনতে কি ভাল লাগেনি? কৃষ্ণার হাত দিয়ে ফুলের তোড়া পাঠাতে গিয়ে মনটা কি খুশিতে ভরে যায়নি? শুক্তির ঘুম-ভাঙা চোখের মত শুক্তির চিন্তার সব যুক্তি-বুদ্ধিগুলিও শুধু ছটফট করে; কিন্তু স্পষ্ট করে কিছুই বুঝিয়ে দিতে পারে না। এখন যদি শেষরাতের ঘুমটা হঠাৎ একটা স্বপ্ন এনে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারে, কাকে বেশি ভাল লাগে! কিন্তু স্বপ্নের দোহাই দিয়ে তো জবাব দেবার দায় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। বলতেই হবে। ছি ছি, তবে কি লটারি করে ঠিক করতে হবে?

ধড়ফড় করে উঠে বসে শুক্তি। সাহেব-কুঠির বারান্দায় যেন অনেকগুলি ছটফটে পায়ের শব্দ ঘোরাঘুরি করছে। টর্চের আলো জ্বলছে আর নিবছে।

শুনতে পাওয়া যায়; কথা বলছে মালী হরদেও, কথা বলছে দারোয়ান কপিলরাম। কথা বলছেন গগন বসু আর কিরণলেখা। শুক্তিও আশ্চর্য হয়ে আর ব্যস্তভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে বারান্দার এই সন্দেহের জটলার এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে।

দারোয়ান কপিলরামের সন্দেহ; অনেকক্ষণ ধরে যে অদ্ভুত একটা ছায়া ঘুরঘুর করছিল পুরনো গ্যারেজের কাছে; সেটা এখন গ্যারেজের ভিতরে ঢুকেছে।

মালী হরদেও বলে—বন্দুকের আওয়াজ করুন, তা হলেই বের হয়ে আসবে।

কিন্তু বন্দুকের আওয়াজ করতে হয়নি। একজন মানুষ হাসতে হাসতে পুরনো গ্যারেজের খালি ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এল। দারোয়ান কপিলরাম চেঁচিয়ে ওঠে।—মামাবাবু!

সত্যিই দুলাল দত্ত, শুক্তির দুলাল মামা এসেছেন। সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে অদ্ভুত-ভাবে হাসতে থাকেন দুলাল দত্ত। —সঙ্গে আমার একজন বন্ধুও এসেছেন কিনা, তাই তাঁকে পুরনো গ্যারেজের ওই খালি ঘরের ভিতরে রেখে এলাম।

গগন বসু—আপনার বন্ধু?

দুলাল দত্ত—হ্যাঁ মিস্টার বাসু।

কিরণলেখা উদ্বিগ্ন স্বরে কথা বলেন।—বন্ধুকে ওখানে কেন রেখে এলেন মেজদা? আপনার কথা যে কিছুই বুঝতে পারছি না। এত রাত্রে আপনি এলেনই বা কোথা থেকে?

দুলাল দত্ত—নেফা থেকে। আমার আশ্রম থেকে। তা ছাড়া আবার কোথা থেকে? কিন্তু তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না কিরণ, আমার বন্ধু চা খান না।

কিরণলেখার কাছে এগিয়ে এসে চাপা-স্বরে কথা বলেন গগনবাবু।—আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, কিরণ। তোমার মেজদার মেজাজ স্বাভাবিক নয়।

কিরণলেখা—আপনি এখন বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, মেজদা।

দুলাল দত্ত—নিশ্চয়।

কিন্তু বারান্দার একটা চেয়ারের উপরেই বসে পড়লেন দুলাল দত্ত। তার পর খুব জোরে একটা আরামের নিঃশ্বাস ছেড়ে নিয়ে হাসতে থাকেন।—ব্যাপারটা কি জানেন? আমি একজন অবাঞ্ছিত, একজন আন-ডিজায়ারেবল্। নেফা সরকার আমাকে নোটিস দিয়ে সাতদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে চলে যেতে বলেছে। আমিও কলা দেখিয়ে, তিনদিনের মধ্যে নেফা ছেড়ে বের হয়ে এসেছি। আর যাব না; ডেকে ডেকে মরে গেলেও, পায়ে ধরে সাধলেও যাব না।

গগন বসু—হঠাৎ এরকম একটা নোটিস কেন?

দুলাল দত্ত—ওই তো, ওরা ঠিক ধরে ফেলেছে, আমি একটা বাইরের মতলবের লোক; ট্রাইবাল বেচারাদের খাঁটি ধর্ম নোংরা করে দিচ্ছি। ওদের ঘরে ঘরে যত কেষ্ট বিষ্টুর ছবি বিলিয়েছি। বাস্, আর কি রক্ষে আছে? ভাগো অবাঞ্ছিত, জলদি ভাগো।

কিরণলেখা মিনতি করে বলেন।—মেজদা, আপনি এখন চুপ করে ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। যাও হরদেও, মামাবাবুকো বাত্তি দেখা কর লে যাও।

কিন্তু চেয়ার থেকে নড়েন না দুলাল দত্ত। এদিকে ওদিকে তাকান আর বিড়বিড় করেন। কী ভয়নাক শূন্য উদাস আর ঘোলাটে হয়ে গিয়েছে দুলাল দত্তের দুই চোখ।

—উঠুন মেজদা। কিরণলেখা আবার অনুরোধ করেন।

দুলাল দত্ত—তোমাদের এখানে ভাল গিরগিটি পাওয়া যায়?...নাঃ, আমি জানি পাওয়া যাবে না। আচ্ছা, গুডনাইট। আমি চললাম কিরণ।

উঠে গিয়ে পুরনো গ্যারেজের সেই খালি ঘরের ভিতরে ঢুকলেন দুলাল দত্ত, যেখানে কিছুক্ষণ আগে তাঁর রহস্যময় এক বন্ধুকে রেখে এসেছেন।

কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে বেশ দেরি করছেন দুলাল দত্ত। গগন বসু এইবার উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন—কপিলরাম, তুমি গিয়ে দেখ একবার, কি করছেন মামাবাবু। আমার ভয়ানক সন্দেহ হচ্ছে।

এগিয়ে যেয়ে, ঘরের ভিতরে টর্চের আলো ফেলেই আতঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে কপিলরাম—খুন হুয়া হুজুর!

দুলাল দত্তের রোগা ছিপছিপে চেহারাটা অদ্ভুত কঠোর ও গম্ভীর একটা মূর্তি হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে। হাতে একটা দা, কাদামাখা প্যান্টালুনে রক্তের দাগ, হাতেও ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ছিটে। আর, ঘরের ভিতরে রক্তমাখা একটা বস্তার ভিতর থেকে একটা মস্ত-বড় চন্দ্রবোড়া সাপের গলাকাটা ধড় অর্ধেক বের হয়ে রয়েছে।

হাতের দা'টাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর বেশ শান্ত স্বরে মালী হরদেওয়ের কাছে জল চাইলেন দুলাল দত্ত। হাত ধুয়ে নিয়েই বললেন—ওটা এতদিন আমার কাছেই ছিল। যেখানেই যাক না কেন, ফিরে এসে আমার চং-এর নীচে একটা গর্তের খাসের ভিতরে শুয়ে থাকতো। ওর চামড়া দিয়ে বেশ ভাল জুতো হবে, জান তো হরদেও?

আবার কিছুক্ষণ বিড়বিড় করলেন দুলাল দত্ত। তারপর সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে চললেন। কপিলরাম ডাকে—মামা-বাবু, শুনিয়ে!

কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে চলেই গেলেন দুলাল দত্ত।

সাহেবকুঠির বারান্দার আলো জ্বলে। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন গগন বসু আর কিরণলেখা। কথা বলতে গিয়ে শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠে।—আমার যে খুব ভয় করছে; মা।

কিরণলেখা বলেন—না; ভয় কিসের?

গগনবাবু বলেন—ভোর হয়ে এল বোধহয়।

[ষোল]

এটা আমার কিসের ভয়? কি রকমের

ভয়? বুঝতে পারলে হয়তো এই ভয় ভেঙে যেত। মনে হয়, তেজপুরের মণিমাসির বাড়ির কালোর মা'র মনটাও বোধ হয় ঠিক এই রকম ভয় পায়; একটা অলক্ষুণে সঙ্কেত দেখবার ভয়।

ভয়টা তখনই মনের ভিতরে ছমছম করে, মাঝরাতে যখন ঝুর-ঝুর বৃষ্টি শুরু হয়, আর ঘুম ভেঙে যায়।

মনে পড়ে, ছাদের উপরে জপের মালা হাতে নিয়ে এক-একদিন নিজেরই মনে কী সব অদ্ভুত কথা বলতেন কালোর মা।—তুমি অবিচার করবে আমার ওপর: কিন্তু আমার দুঃখ যে একদিন তোমার বিচার করবে। সেটা ভুলে যাও কেন?

নতুন পাড়ার মাঁরা কাকিমার কাছে শুনেছিল শুক্তি, কালোর মা'র স্বামী কলকাতার স্কুলের মাস্টার ছিলেন। কলকাতাতে তাঁর একটা বাড়িও ছিল। মিথ্যে মামলা করে একদিন বিধবা কালোর মাকে স্বামীর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তাড়িয়ে দিল তাঁরই সেই দেবর, যাকে তার ছেলেবেলার জীবনে কোলে বসিয়ে ভাত খাওয়াতেন কালোর মা। সে দেবরের এখন ভিখিরী-দশা; ঠোঙা বেচে, জুয়া খেলে আর ফুটপাথে শুয়ে থাকে।

হঠাৎ শুক্তিকে দেখতে পেয়ে যেন একটু লজ্জিত হতেন কালোর মা—তুমি এখন নীচে যাও দিদিমণি। অনেক রাত হয়েছে। আমার আবোল-তাবোল কথা শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।

শুক্তি—কিন্তু আপনি রোজ ছাদে উঠে আর এই রাতের বেলাতেই এখানে বসে ওসব কথা রোজই বলেন কেন?

কালোর মা।—ভয় হয়, তাই বলি। চুপি চুপি বলি। কাউকে শোনাবার জন্যে তো বলি না।

শুক্তি—সকলেই জানে, আমিও জানি; আপনি আপনার সেই কবেকার কলকাতার ভয়ের কথা মনে করে এসব কথা বলেন। কিন্তু আর বলে লাভ কি?

কালোর মা।—শুধু কলকাতার কথা মনে করে নয় দিদিমণি, তোমাদের এই তেজপুরেরও যা-সব দেখছি আর শুনছি, মনে করলে ভয় হয় বইকি। যদি শুনতে চাও, তবে একটা গল্প বলতে পারি।

শুক্তি—বলুন।

কালোর মা—এক রাজা সৈন্য-সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে চলেছেন। হঠাৎ কোথা থেকে একটা অতিক্ষুদ্র মৃগশাবক এসে রাজার পথের উপর দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, রাজপুত্র আমার মাকে হত্যা করে মাংস খেয়েছে। আমি এখনও ঘাস খেতে শিখিনি রাজা, মায়ের দুধই আমার বেঁচে থাকার সম্বল ছিল। এখন আমি বাঁচি কি করে? আপনি বিচার করুন। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার বেঁচে থাকবারই দরকার নেই। রাজা তখুনি তরবারির এক কোপে মৃগশিশুর প্রাণ সংহার করলেন। কিন্তু শেষে কি হলো শুনবে, দিদিমণি?

—শুনবো।

—শত্রুকে সংহার করবার জন্যে তরবারি তুলতে গিয়েই রাজা বুঝলেন, তরবারিটা যেন সাত-মণ পাথরের মত ভারী। তরবারি তুলতে পারলেন না রাজা, হাতটাই ভেঙে গেল। শত্রুরা হেসে হেসে রাজার মুণ্ডু কেটে নিয়ে চলে গেল।

শুক্তি হেসে ফেলে—বুঝতে পারছি না, এটা কিসের গল্প বললেন, কালোর মা?

কালোর মা—অবিচারের গল্প। রোজই ঠাকুরের কাছে এই ভয় নিবেদন করি আর বলি, অবিচার দূর কর ঠাকুর।

চুপ করে আবার মালা জপতে থাকেন কালোর মা।

আজ এখন এই কদমবাড়ির মাঝরাতের অবুঝ ভয়টাকে সহ্য করতে গিয়ে কালোর মা'কে মনে পড়ে, কালোর মা'র সব কথা আর সব গল্পও মনে পড়ে। তবু শুক্তির অবুঝ ভয়টা যেন ছায়া-ছায়া অস্বস্তির মত মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে-ঘুরে করে, সরে যেতে চায় না।

সরে যায় তখন, শুক্তির ঘরে ঢুকে যখন আলো জ্বালেন কিরণলেখা।—শুক্তি, শুনছিস?

—কি মা?

—আমি জেগেই আছি। তুই ঘুমো।

এটা কিরণলেখার একটা নতুন অভ্যেস। সে-রাতের সেই ভয়ানক বিদ্ঘুটে ব্যাপারের পর রোজই একবার মাঝরাতে উঠে এসে শুক্তির ঘরে ঢোকেন আর আলো জ্বালেন কিরণলেখা।

ভাদ্দুরে মেঘের শেষ ঝরানি ফুরিয়ে যেতে কতদিনই বা লাগে? বেশিদিন লাগেওনি। একদিন মাঝরাতেও যখন ঝুরু-ঝুরু বৃষ্টির কোন শব্দ আর শোনা গেল না, কদমবাড়ির চা-বাগানের উপর সিরসিরে শিহর ছড়িয়ে দিয়ে একটা উত্তুরে হাওয়া উড়ে চলে গেল, তখন শুক্তির বিছানার মাথার কাছের জানালার শার্সি একেবারে খুলে দিয়েই বলে উঠলেন কিরণলেখা।—তারায় ছেয়ে আছে আকাশ। নেফার পাহাড়েও মেঘ নেই। শুক্তি ঘুমোচ্ছিস?

আবার ঝলমলে আশ্বিনের দিন। ঘাসের শিশিরে সকালবেলার রোদ হেসে-হেসে চিকমিক করে। উত্তুরে হাওয়ার সঙ্গে উড়ে উড়ে নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে নতুন হাসের ঝাঁক আসছে; নামবে গিয়ে জিয়াভরলির জলে।

শুধু কদমবাড়ির আকাশে নয়, বোধহয় আলিপুরে শুক্তির বড়পিসি, আর তেজপুরে শুক্তির মণিমাসির মনেও মেঘের গুমোট ভেঙে গিয়ে নতুন রোদের আলো হেসে উঠেছে; তা না হলে কিরণলেখার কাছে ওরকম খুশি ভাষার দুটো চিঠি তাঁরা লিখতে পারতেন না।

সুমিত্রা লিখেছেন—আপনি আমার মনের খুব খারাপ একটা ভুল ভেঙে দিয়েছেন, কিরণ বউদি। এখন ভাবতে বেশ লজ্জাও হচ্ছে। নিজের পছন্দমত কিছু না হলেই আমরা মনে করে বসি যে, সংসারটা বুঝি ভুল করছে। আপনি শুক্তিকে যা বলেছেন, তার চেয়ে ভাল কথা ও সত্য কথা আর কিছু হতে পারে না।

মণিমালা লিখেছেন—তোমার চিঠি আমার মিথ্যে দুশ্চিন্তার সব কষ্ট দূর করে দিয়েছে। তুমি বুঝিয়ে দিলে বলেই তো বুঝলাম কিরণদি; তা না হলে আমার মূর্খ মন কোনদিনও বোধহয় বুঝতো না যে, ভুল করে মেয়েটাকে কত ভুল কথাই না শুনিয়েছি। শুক্তিকে দেখতে যে খুব ইচ্ছে করছে। খুব অন্যায় করেছি। ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি শুক্তিকে যে-কথা বলেছ, সেটাই তো খাঁটি কথা।

এরই মধ্যে কবে, সারাদিনের ঝলমলে রোদের ছোঁয়া পেয়ে শুক্তির সাজের চেহারা বদলে গিয়ে আবার রঙীন হয়ে গেল, সেটা শুক্তিও ঠিক হিসেব করে বলতে পারবে না। গায়ে আবার ফিকে-নীল তাঁতের শাড়ি, কাঁধের উপর পড়ে আলগা হয়ে পড়ে আছে আর ঝুলছে কচি-সবুজ রঙের একটা হালকা উলের জামা। সাহেব-কুঠির শিউলি গাছের ডাল নাড়া দিয়ে ফুল ঝরাতে গিয়ে শুক্তির হাতের উপর ফুলের সঙ্গে গাছের পাতার শিশির-জলও ঝরে পড়ে। শুক্তির চোখের তারাও কেঁপে কেঁপে হাসে। তবে কি এইবার শেষ কথাটা বলে দেবার জন্যে তৈরী হয়ে শুক্তির মন হাসতে শুরু করেছে। তাই তো মনে হয় কিরণলেখার। তাই জিজ্ঞাসা করতেও আর বেশি দেরি করেন না।—আর তো বেশি দেরি করা উচিত নয়, শুক্তি।

শুক্তি—কি?

কিরণলেখা—কি বুঝলে আর কি ঠিক করলে, এবার বলে দাও। লজ্জা করবার তো কিছু নেই।

শুক্তি কিন্তু বেশ লজ্জিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকায়।—পরে বলবো।

কিরণলেখা—তা বলো। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বলো। কি হলো? হঠাৎ গম্ভীর হয়ে আবার কি ভাবতে শুরু করলি?

শুক্তি—কিছু না।

কিরণলেখা—মনে হচ্ছে; বলতে খুব দেরি করবি?

শুক্তি—না না; শিগগিরই বলবো। দেরি হবে না।

কিরণলেখা চলে যাবার পর, সেই শিউলির ছায়ার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুক্তি যেন নিজেরই মনের যত এলোমেলো কথার শব্দ শুনতে থাকে। পিসেমশাইয়ের মক্কেলরা যেমন কৈফিয়ত দেবার জন্য সময় চেয়ে দরখাস্ত করে, শুক্তির প্রাণটাও যেন ঠিক সেরকম দরখাস্ত ক'রে ক'রে শুধু সময় চাইছে। এক-একবার মনে হয়, মা'কে এখনই স্পষ্ট করে একটা নাম বলে দিলেই তো হতো; শ্যামলবাবু। চিন্তা করবার সব ঝঞ্ঝাট মিটে যেত। কিন্তু তখুনি লজ্জা পেয়ে চমকে উঠেছে শুক্তির মন, ছি-ছি; বোধহয় একটা মিথ্যে কথাই বলে ফেলা হতো। এরকম করে না বুঝে-সুঝে হঠাৎ অনিমেষের নাম করলে সেটাও যে একটা তাড়াহুড়ো মিথ্যের কথা হবে না, তারই বা ঠিক কি?

কিন্তু বলতেই হবে যখন, তখন আর দেরি করে লাভ কি?

কে জানে কি মনে হয়েছে, কার কথা হঠাৎ মনে পড়েছে, শিউলির ছায়া হয়ে কার স্মৃতি হঠাৎ এখন শুক্তির ইচ্ছার মনটাকে জড়িয়ে ধরে স্নিগ্ধ করে দিয়েছে? শুক্তির সারা মুখের উপর যেন লাজুক রক্তের আভা লালচে হয়ে ফুটছে। হ্যাঁ, আর কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। আজ হোক, কাল হোক, কিংবা আর সাতটা দিন পরেই হোক, এই নামটাকেই বলে দিয়ে হাঁপ ছাড়বে শুক্তি।

বারান্দার সোফার উপর বসে থেকেই ডাক দিলেন গগনবাবু—ওখানে ওটা কিসের ভিড়, শুক্তি? কিছু বুঝতে পারছিস?

সাহেবকুঠি থেকে বেশ একটু দূরে, ম্যানেজার ব্যানার্জীর বাংলোর সামনে একটা চালতে গাছের ছায়া যেখানে ছড়িয়ে আছে, সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। একেবারে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, ভিড়টা যেন উৎকর্ণ হয়ে কিছু শুনছে।

শুক্তি আশ্চর্য হয়।—বুঝতে পারছি না বাবা। কিন্তু কপিলরাম কেন দৌড়ে দৌড়ে আসছে?

কপিলরাম এসেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথা বলে।—নেফা পর হামলা শুরু হুয়া হুজুর। থাগলামে চীনালোগ আসাম রাইফেলকা চৌকি ঘির লিয়া।

গগন বাবু—কওন বোলা?

কপিলরাম—রেডিও বোলতা হ্যায়, হুজুর।

সাতদিন হলো কদমবাড়িতে খবরের কাগজ এসে পৌঁছয়নি। চারদুয়ারের কাগজওয়ালা বসন্তলাল; আট-দশদিনের কাগজ একসঙ্গে বাণ্ডিল করে হঠাৎ একদিন আগরওয়ালার ঠিকে-জঙ্গলের গাছ-কাটা সরকারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়াই তার নিয়ম। তা ছাড়া, সরকারী ডাকঘরের ছাপ নিয়ে যে-কাগজটা আসে, সেটা খুব দ্রুত-গতিতে এলেও পাঁচদিন দেরি না করে আসবে না।

লোখরা থেকে শুধু মেজর পি বোসের একটি চিঠি এল।—বাণী এখন তাঁর শান্তি-পুরে পিত্রালয়ে আছেন। আমিও এখন স্ট্যাণ্ড-বাই অবস্থায় আছি; বউদি। নেফার গোলমাল বেড়েছে। আরও ফোর্স পাঠাতে হচ্ছে। খুব ব্যস্ত আছি। তাই শুক্তিকে এখন আর লোখরাতে বেড়াতে আসতে বলবো না।

লোখরার চিঠিটা পড়ে নিয়ে, আর গগন বাবুকেও একবার শুনিয়ে দিয়ে কিরণলেখা যখন শুক্তির ঘরে ঢুকলেন তখন টেবিলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে শুক্তি। শুক্তির মাথার কাছে রেডিওটা তখন শুধু খুব চাপা-স্বরে একটা গান গাইছে। থাগলার খবর অনেকক্ষণ হলো শেষ হয়ে গিয়েছে।

—শুনছিস শুক্তি?

চমকে জেগে ওঠে শান্তু—কি মা?

—বাণী এখন লোখরাতে নেই।

—কোথায় তবে?

—শান্তিপুরে।

শান্তি হাসে—এবার তাহলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেননি প্রণব কাকা।

কিন্তু ওরা আবার কারা, নতুন তিনজন আগন্তুক মানুষ, কপিলরাম যাদের পথ দেখিয়ে সাহেবকুঠির ফটকের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসছে?

একজনের তো গায়ের খাকি পোষাক দেখেই বোঝা যায়; উনি একজন পুলিশ অফিসার। ঢিলে-ঢালা বুশশার্ট আর চলচলে ট্রাউজার, আর-দুজনের একজনের হাতে একটা ফাইল, একজনের হাতে চুরুট। এরাও অফিসার বোধহয়।

তিনজনেই সাহেবকুঠির বারান্দায় উঠে গগন বসুর কাছে একে একে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করেন।

—আমি মেহরা, সি আর পি।

—আমি মতিলাল, সি আই বি।

—আমি কালিতা, এস আই বি।

গগন বসু আশ্চর্য হয়ে বলেন—বসুন।

আশ্চর্য হবারই কথা। একজন নেফা-পুলিশ, একজন খাস সেণ্টারের গোয়েন্দা পুলিশ, একজন সাবসিডিয়ারি গোয়েন্দা-পুলিশ; সাহেবকুঠির বারান্দায় একসঙ্গে এহেন তিন অফিসারের আবির্ভাব, একটা অভাবিত বিস্ময় বলেই তো মনে হবে।

নেফা-পুলিশ মেহরা তাঁর খাকি ক্যাপ তুলে নিয়ে মাথা চুলকিয়ে নিলেন। সেণ্ট্রাল ইনটেলিজেন্সের মতিলাল রুমালভাবে হাই তুলে নিলেন। আর এস-আই-বির কালিতা তাঁর নিব্-নিব্ চুরুটে মুখ দিয়ে বেশ জোরে একটা টান দিলেন।

মতিলাল বলেন—ডক্টর সি টি এলগিনের সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়?

গগন বসু—এলগিন? কে সে?

কালিতা—আপনি তাকে চেনেন না?

গগন বসু—না।

মেহরা—কিন্তু আমাদের ইনফরমেশন এই যে, এলগিন আপনার এই বাগানে অনেকদিন ছিল।

কালিতা—সে একজন স্পাই, আমাদের শত্রুর চর।

মতিলাল—কোনাতে ঢুকে সে লোকটা অনেক কিছু জেনে নিয়ে সরে পড়েছে।

গগন বসু ভ্রূকুটি করে তাকান—বুঝলাম, স্পাই পালিয়ে যাবার পর আপনারা খুব অ্যাক্টিভ হয়েছেন। ভাল কথা, কিন্তু এই অদ্ভুত ইনফরমেশন কোথা থেকে পেলেন যে, স্পাইটা আমার এখানে ছিল?

মেহরা—হাই কোয়ার্টার থেকে পাওয়া ইনফরমেশন, অদ্ভুত বললে তো চলবে না।

গগন বসু—আপনার হাই কোয়ার্টার মানে কি? মিনিস্টার?

ম্যানেজার ব্যানার্জীর বাংলোর সামনে একটা ঢালতে গাছের ছায়া যেখানে ছড়িয়ে আছে, সেখানে অনেক মানুষের ভিড়

মেহরা—তা তো বটেই; কিন্তু এক্ষেত্রে মিনিস্টারের একজন বিশেষ ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তি। তিনিই বা অকারণে একটা মিথ্যে ইনফরমেশন দেবেন কেন, বুঝতে পারছি না।

গগন বসুর দুই চোখের তারা হঠাৎ যেন আগুন-রঙের ঝিলিক দিয়ে কেঁপে ওঠে। ভুরু দুটো কুঁচকে যায়। তামাকের পাইপটাকে হাঁটুর উপর একবার ঠুকে নিয়েই গগন বসু বলেন—একবার খোঁজ করে দেখুন, মিনিস্টারের এই ট্রাস্টেড ও রেস্পেক্টেড ব্যক্তিটি একটি স্কাউণ্ড্রেল কিনা?

মেহরা—আপনি বেশ উত্তেজিত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে।

গগন বসু—খোঁজ করে দেখুন, এই স্কাউণ্ড্রেলের নাম সুশান্ত মজুমদার কিনা?

—ওয়েল ওয়েল! দিল্লির আই বি মতিলাল যেন চমকে উঠে নেফা-পুলিশ মেহরার মুখের দিকে তাকান। এস আই বি কালিতা তাঁর নিব্ নিব্ চুরুট শক্ত করে কামড়ে ধরে

মতিলালের মুখের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে থাকেন।

হঠাৎ হেসে ওঠেন মতিলাল—তিন পিয়ালি চা ফরমাইয়ে মিস্টার বাসু।

কলিতা বলেন—আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস্টার বাসু।

মেহরা বলেন—আর আপনাকে কিছু বলবার নেই, স্যার।

আবার হাই তুলে নিয়ে মতিলাল বলেন।—দেখুন তো, মিছিমিছি কী পরেশানি। আমাদের সবারই সন্দেহ ছিল, মজুমদারের ইনফরমেশন বোধহয় একটা ব্লাফ। সে মহাশয়ের কিছু খবর তো রাখি। কিন্তু...।

গগন বসু—কিসের কিন্তু?

মতিলাল—কিন্তু কি করবো বলুন? মজুমদারের ম্যাজিক স্টিক যে দিল্লি শিলং গোহাটি আর কলকাতাকেও ছুঁয়ে রয়েছে।

কলিতা—ধরুন, আপনি কাস্টমকে ফাঁকি দিয়ে বিদেশ থেকে দশ লাখ টাকার ডিউটিয়েবল্ জিনিস আনতে চান; আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। মজুমদারকে বললেই চমৎকার ব্যবস্থা করে দেবে।

চা আসে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মেহরা বলেন।—কোন্ এক বন্ধু-বিদেশের এমব্যাসি থেকে খবর পাওয়া গেল, বোটানিস্ট বলে নিজেকে পরিচিত করে আর ডক্টর এলগিন নাম নিয়ে একটা লোক নেফাতে ঢুকে নেফার যত লজিস্টিক আর মিলিটারী পোস্টের খবর নিয়ে সরে পড়েছে। তখন তো আর...।

গগন বসু হাসেন—তখন আপনাদের হুঁস হলো।

মেহরা—আমাদের দোষ কোথায় বলুন? সরকারের অর্ডার ছিল, এলগিনের সব সুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। আমিই তো মশাই সে বেটাকে রোজ মুর্গী খাইয়ে খাইয়ে তোয়াং থেকে সেলা, সেলা থেকে দিরাং, দিরাং থেকে রূপা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি।

গগন বসু হাসেন—জানি না, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। সরকারকে না আপনাদের সবাইকে?

মতিলাল উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।—আচ্ছা! আচ্ছা! আপভি উপনিষদ পড় চুকে?

গগন বসু—জী হাঁ, বহুত থোড়া।

মতিলাল—তব্ তো হমভি উপনিষদ বোলেংগে। আমিও উপনিষদের ভাষায় আপনার জবাব দেব।

গগন বসু—দিন।

মতিলাল—অপেন নীয়মানা যথান্ধাঃ। জৈসা সরকার তৈসা অফিসার। জৈসা গাঁও তৈসা ভইস। আচ্ছা...গুড্ বাই।

চলে গেলেন তিন অফিসার। গগন বসুও ক্লান্তভাবে আর বেশ বিষণ্ণ-উদাস স্বরে ডাক দেন।—শুক্তি, আমাকে একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াবি?

[সতের]

তেজপুর থেকে মণিমালার তিনটে চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা। সব চিঠিরই সার-কথা, তেজপুরে চলে এস, কিরণদি।

মণিমালার শেষ চিঠিটা বেশ একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বলছে।—বুঝতে পারছি না, গগনবাবুর শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল কেন? কুমুদ ডাক্তারের চিকিৎসায় কোন সুফল হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া নেফার খবরও ভাল নয়। কাজেই, তোমাদের সবারই এখন তেজপুরে চলে এলেই ভাল হয়।

ঠিকই, বেশ অসুস্থ হয়েছেন গগন বসু! সব সময় একটা কষ্টকর অবসন্ন ভাব; মাথাটা ভার-ভার; শ্বাস টানতেও একটা হাঁস-ফাঁস ভাব। আর যখন-তখন পিপাসা। দশ মিনিট পর-পর জিভ শুকিয়ে যায়; ঠাণ্ডা জল খেতে চান গগন বসু।

হঠাৎ অসুস্থতা বটে; কিন্তু বুঝতে তো কোন অসুবিধে নেই, এই অসুস্থতা শুরু হয়েছে ঠিক সেইদিন থেকে, যেদিন পুলিশ আর গোয়েন্দা-পুলিশের তিন অফিসার এসে একটি ইনফরমেশনের রহস্য প্রকাশ করে দিয়ে চলে গেলেন।—মানুষ কত নীচ হতে পারে। চেঁচিয়ে উঠেছিলেন গগন বসু।—আমার মনে হয়, কিরণ, তোমাদের ভগবানও স্কাউণ্ড্রেল সুশান্তকে ভয় করে।

কিরণলেখা—চুপ কর। শান্ত হও। জল খাও।

শুধু বিকেল পর্যন্ত, তারপর আর সাহেবকুঠির বারান্দার চেয়ারে বসে থাকতে পারেন না গগন বসু। যতক্ষণ রোদ থাকে ততক্ষণ একটু ভাল লাগে। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই যখন অক্টোবরের কুয়াশা নিবিড় হয়ে কদমবাড়িকে ছেয়ে ফেলে, তখন আর কিছু ভাল লাগে না। ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে পড়েন।

শুক্তিও দেখে বেশ আশ্চর্য হয়। সন্ধ্যা হলেও বাগানের কামিনদের ঝুমুরের নাচ-গান আর হই-হল্লার সাড়া শোনা যায় না। মালী হবদেও হঠাৎ এক-একবার ব্যস্ত হয়ে ফটকের বাইরে কোথায় যেন চলে যায়; আর কি-যেন শুনে মুখ শুকনো করে ফিরে আসে। সন্দেহ হয়, কুয়াশার ভিতরে যেন নানা রকমের জল্পনা আর কল্পনা চুপি-চুপি ফিস-ফাস করে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন সত্যিই যত মেচ আর ভোটিয়া মজুর-কামিন কাউকে কিছু না বলে পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় চাপিয়ে আর বাগান ছেড়ে চলেই গেল।

তার দু'দিন পরেই চলে গেল সব দফাদার কামদার আর ডাণ্টি-চুনাই কামিন দল।

যেদিন সিটি বাজলো না, কলঘরের বয়লার নীরব হয়েই রইল, সেদিন ম্যানেজার ব্যানার্জী বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে গগন বসুর কাছে এসে দাঁড়ালেন।—খুব সন্দেহ হচ্ছে, স্যার।

গগন বসু—কি?

ব্যানার্জী—বাগানে কেউ আর থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।

গগন বসু—কেন? চীনেরা কি কদমবাড়ির ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে?

ব্যানার্জী কুণ্ঠিতভাবে হাসেন।—না স্যার; সে-কথা নয়। কিন্তু মজুমদার সাহেবের লোক রোজই এসে বাগানের লোকের কাছে যে-সব খবর পৌঁছে দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে তো...।

চমকে ওঠেন গগন বসু। গগন বসুর শুকনো চোখ দুটো হঠাৎ যেন রক্তমাখা হয়ে গিয়েছে, লালচে হয়ে কাঁপতে থাকে, গলার স্বর কাঁপে।—বলুন, থামলেন কেন?

ব্যানার্জী—মনে হচ্ছে, খুব শিগগির কদমবাড়ির উপর চীনা হামলা এসে পড়বে। যারা থাকবে, তারা বিপদে পড়বে।

গগন বসু—আপনিও কি মজুমদারের লোকের কথা বিশ্বাস করেন?

ব্যানার্জী—লোকের কথা নয়, স্যার। মজুমদার সাহেব নিজে বলেছেন।

গগন বসুর চোখে একটা কঠোর ভ্রূকুটি থরথর করে—কোথায় মজুমদার?

ব্যানার্জী—তিনি কদমবাড়ি রোডের উনিশ মাইল পোস্টে প্রায়ই আসেন। আমাদের কেরাণী বাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি অনেক কথা বলেছেন। তাঁর মত মানুষের কথা তুচ্ছ করা কি উচিত হবে? ঘটনা খুবই জটিল, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, নয় কি স্যার?

গগন বসু—কিন্তু কী এমন একটা ওলট-পালট কাণ্ড হয়েছে যে, এখনই এত বিচলিত হতে হবে? খবর তো শুধু এই যে, থাগলাতে গোলাগুলী চলেছে।

ব্যানার্জী—সেটা তো জানি! কিন্তু বুঝতে পারছি না স্যার, তিলগাঁও, রাজভাটি আর সবুবাড়ির সব সাহেব কেন প্লেন চার্টার করে করে সপরিবারে সরে পড়েছেন?

গগন বসু—তাই নাকি?

ব্যানার্জী—আজ্ঞে হাঁ, স্যার। আজ সকালে জিতনগর টি এস্টেটের ম্যাকফার্সন আমাদের এই কদমবাড়ি রোড দিয়েই গাড়ি ছুটিয়ে চলে গেলেন।

গগন বসু—কিন্তু ম্যাকফার্সনের বাগান কি খালি হয়ে গিয়েছে?

ব্যানার্জী—না।

গগন বসু—তাহলে বলুন, শুধু কদমবাড়ি বাগান খালি হতে শুরু হয়েছে?

ব্যানার্জী—হ্যাঁ।

গগন বসু—আপনি কি আমার কাছে কোন পরামর্শ চাইছেন?

ব্যানার্জী—হ্যাঁ, স্যার।

গগন বসু—আমার কিছুই বলবার নেই। আপনি আসুন এখন।

ম্যানেজার ব্যানার্জির চোখ-মুখের চেহারা দেখলে মনে হয়, ভদ্রলোকের সব যুক্তি-বুদ্ধি যেন জটিল একটা বিপদে পড়ে করুণ হয়ে গিয়েছে। গগন বসুর কথা শুনে তাঁর চোখ-মুখ আরও করুণ হয়ে যায়।—কিন্তু আপনারও তো এখন...।

গগন বসু—না, আমি কোথাও যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি। কিন্তু এই চলে-যাওয়া যেন ফিরে এসে গগন বসুকে শেষ কথাটা বলে দেবার জন্য তৈরী হওয়া।

তিনদিনের মধ্যে বাগানের সব লোকজনের মাইনে-কড়ির পেমেন্ট চুকিয়ে দিয়ে ব্যানার্জি আবার যেদিন গগন বসুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সেদিন কদমবাড়ির সন্ধ্যার কুয়াশা নিরেট হয়ে গেল। অদ্ভুত স্তব্ধতা, তার মধ্যে ম্যানেজার ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তারের পায়ের জুতোর সামান্য শব্দও যেন অমানুষিক আগন্তুকের ভয়ানক পায়ের শব্দের মত বাজতে থাকে।

গগন বসুর ঘরে ঢুকে বিছানার কাছেই দাঁড়ালেন ম্যানেজার ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তার। গগন বসু বলেন—আপনারা বোধ হয় এখন রওনা হবেন ?

ব্যানার্জি—আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি অনুমতি দিন স্যার।

কুমুদ ডাক্তার—মিথ্যে কথা বলবো না, সত্যিই থাকতে খুব আতঙ্ক বোধ করছি। আপনি খুশী হয়ে আমাকে যেতে আজ্ঞা করুন স্যার।

গগন বসু হাসেন—খুশী হয়েই বলছি, আপনারা চলে যান। যেদিন ফিরে আসতে ইচ্ছে হবে, সেদিনই চলে আসবেন। ইচ্ছে না হয়, আসবেন না।

ব্যানার্জি—এই ক্যাশ; সব পেমেন্টের পর যা ছিল, সেটা এখন তো আপনারই কাছে রাখতে হয়, স্যার।

গগন বসু—রাখুন।

ম্যানেজার ব্যানার্জির আর কুমুদ ডাক্তারের চোখ ছলছল করে—আপনি এখন......।

গগন বসু—আমি যাব না।

চলে গেলেন ব্যানার্জি আর কুমুদ ডাক্তার।

ঘরের বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দেন কিরণলেখা—হরদেও, শুনে যাও।

কোন সাড়া শোনা যায় না। কেউ জবাব দেয় না।

কিরণলেখা ডাকেন—কপিলরাম, তুমি কোথায় ?

কেউ জবাব দেয় না। কোন সাড়া শোনা যায় না।

গ্যারেজের পিছনের ঘরে শুধু একটা আলো দেখা যায়। আর দুটো ছায়া নড়ছেও দেখা যায়।

লণ্ঠন হাতে নিয়ে সাহেবকুঠির বারান্দার কাছে এগিয়ে এল উপেন মিস্তিরি আর তার বউ।—কাকে ডাকছেন মা ? কেউ আর নেই !

কিরণলেখার গলার স্বর শিউরে ওঠে।—কেউ আর নেই ? শুধু তোমরা দুজন আছ ?

উপেন—হ্যাঁ, মা। এই আট মাস ভারী মানুষটাকে নিয়ে হঠাৎ এখন যাব কোথায় ? যাবই বা কেমন করে ?

মাথার কাপড় টেনে দিয়ে উসখুস করে উপেন মিস্তিরির বউ।

কিরণলেখা—আচ্ছা, এস।

উপেন—দরকার হলেই ডাক দেবেন, মা।

বিছানার উপর উঠে বসেন গগন বসু।—আমি বলি, কাল সকালে উপেন তোমাদের দুজনকে তেজপুরে পোঁছে দিয়ে চলে আসুক।

কিরণলেখা—আমি যাব না। শুক্তি যাক।

শুক্তি বলে—আমি যাব না।

রাতের কদমবাড়ি যেন প্রেতকুয়াশার আঁচল দিয়ে ঢাকা একটা সমাধি; তার মধ্যে সাহেব-কুঠির ঘর আর বারান্দার আলোগুলি শুধু জীবন্ত প্রাণের চক্ষু। শুক্তির ঘরের টেবিলের উপর ছোট্ট রেডিও সেট শুধু কথা বলে; কী অদ্ভুত হয়ে গুমরে ওঠে রেডিওর খবরের এক-একটা কথা—চীনা দুশমনের হেভি মর্টার ফায়ার তুচ্ছ করে ডোগ্রা এখন মরিয়া হয়ে লড়ছে। খিজেমানের তিনটি কোম্পানি পোস্ট দিন-রাত সমানে মেশিনগান চালিয়ে দুশমনের অ্যাডভান্স ঠেকিয়ে রেখেছে। ফয়ারিং লাইনের বাংকার থেকে বের হয়ে একাই জয় হিন্দ হাঁক দিয়ে আর গ্রেনেড হাতে নিয়ে চার্জ করেছে, দুশমনের মেশিন-গানের গর্জন স্তব্ধ করে দিয়েছে আর মরে গিয়েছে এক জমাদার।

দুই চোখ অপলক করে আর একেবারে নিথর নীরব হয়ে রেডিওর কথা শুনছে শুক্তি, দেখতে পেয়ে কিরণলেখা একটু আশ্চর্য না হয়ে পারেন না। ওসব খবরের মধ্যে এরকম মন-প্রাণ দিয়ে শোনবার কী আছে ? খবর তো নয়, এক-একটা সর্বনাশের হুংকার।

বিছানা থেকে নেমে ঘরের ভিতরে পায়চারি করেন গগন বসু। বোধ হয় রেডিওর সব খবর শুনতে পেয়েছেন, তাই হঠাৎ এই অস্থিরতা।—আমি আবার বলছি, তোমরা দুজনে তেজপুরে চলে যাও।

কিরণলেখা—তুমিও চল।

গগন বসু—না। এদিকে-ওদিকে কোন চা-বাগানের লোকজন সরে পড়েনি; সবার আগে আমার কদমবাড়ির বাগান খালি হয়ে গেল, এটা শুধু আমাকে জব্দ করবার জন্যে এক শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কী হতে পারে ?

কিরণলেখা ভয় পান—তাহলে তো তোমারই সবার আগে চলে যাওয়া ভাল ছিল।

গগন বসু—না। হাতে হাতে একটা নিষ্পত্তি করে দিয়ে তারপর যাব।

ঝিক করে জ্বলে উঠেছে গগন বসুর চোখ। প্ল্যান্টার সাহেব গগন বসু তো কবেই তাঁর সেই ভয়ানক শিকারের শখ ছেড়ে দিয়েছেন। মাচানে বসে নরখাদক বাঘের মাথা তাক করে বন্দুক তুলতে গিয়ে তাঁর চোখ দুটো যে ঠিক এইরকমই ঝিক করে জ্বলে উঠতো।

কিন্তু মনের জেদ দিয়ে কি শরীরের অসুখটাকে সব সময় জব্দ করা যায় ? যায় না। গগন বসুও পারেন না। ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে আর জানালা খুলে সাহেব-কুঠির ফটকের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটা রাত পার করে দিয়েই বুঝলেন, গগন বসু; জ্বর হয়েছে। রাতজাগা ক্লেশ আর জ্বরের ঘোর, বিছানার উপর শুয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া তন্দ্রার মধ্যেই শুনতে থাকেন, শুক্তির ঘরের রেডিওটা খবর বলছে—খিজেমান নেই, ডোলাও নেই। এগিয়ে এসেছে চীনারা।

শুক্তিরও যেন আর কোন কাজ নেই। শুধু গল্পের বইপড়া, বার বার খোঁপা বাঁধা, আর যখন-তখন রেডিওর সামনে এসে বসে থাকা। একটি একটি করে পার হয়ে যায়, নীরব নির্জন কদমবাড়ির রোদভরা দিন আর কুয়াশা-ভরা রাত।

সেদিন সকালবেলাতেই রেডিওর খবরটা যেন চেঁচিয়ে উঠলো।—বুমলা।

এগিয়ে যেয়ে রেডিওর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে থাকে শুক্তি। বুমলাতে যুদ্ধ চলছে। ফিয়ার্স ফাইটিং। চীনাদের পুরো একটা ডিভিসন বুমলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সন্ধ্যাবেলার রেডিও বলে—বুমলার পতন। শুক্তির মাথাটা হঠাৎ অলস হয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে, ঠক করে ঠোকা খায় কপালটা। এক হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কপালটাকে শক্ত করে টিপে ধরে শুক্তি। এই তো সেই বুমলা, যেখানে বরফে ঢাকা পাহাড়ের পাথুরে বুকের উপর দিয়ে দৌড়ে ছুটে পালিয়ে যায় কস্তুরী হরিণ, তাকে আর ধরতে পারা যায় না।

আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আর বই হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দার আলোর কাছে একটা চেয়ারে বসে শুধু কদমবাড়ির রাতের নিরেট কুয়াশার চেহারা দেখতে থাকে শুক্তি।

গগন বসুর জ্বরের শরীরটা সন্ধ্যা থেকেই গভীর ঘুমে অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। গভীর ঘুম হলেই তো ভাল, বাবার জ্বর তাড়াতাড়ি সেরে যাবে। একবার উঠে গিয়ে আর ঘরের ভিতরে ঢুকে দেখে এসেছে শুক্তি, মা-ও ঘুমিয়ে পড়েছেন আর চোখের উপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে।

উপেন মিস্তিরির ঘরেও আর আলো জ্বলে না। কদমবাড়ির সব শব্দ মরে গিয়েছে। শুধু বারান্দার আলোর কাছে পোকাগুলির ছটফটানির শব্দ শোনা যায়।

ফটকের কাছে মুখ লুকানো জানোয়ারের

মত দাঁড়িয়ে আছে, কী ওটা? গাড়ি! এত শব্দহীন হয়ে কখন এল গাড়ি? কার গাড়ি? শক্তির চোখের কালো তারা দুটো যেন জ্বলে জ্বলে আর ফুলে-ফুলে দেখতে থাকে। এগিয়ে আসছে সুশান্ত মজুমদার।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় শক্তি। ততক্ষণে সুশান্ত মজুমদারও বারান্দার সিঁড়ির ধাপের কাছে এসে গিয়েছে। শক্তি বলে—স্টপ! আর এক-পাও এগুবেন না।

সুশান্ত—তোমার সেই বেটা বয়ফ্রেণ্ড, কি যেন নাম, হ্যাঁ, সেই সুজিত রায় কোথায়?

শক্তি—আছে।

সুশান্তর হাতে একটা ফ্লাস্ক টলমল হয়ে দুলছে। এক ধাপ উপরে উঠে এসেই চোখ কুঁচকে হেসে ওঠে সুশান্ত—কোথায় আছে? ঘুমোচ্ছে? এসে তো গেছে।

শক্তি—না, আছে।

সুশান্ত দাঁত চিবিয়ে হাসে—তবুও আছে? কোথায়? হৃদয়ে নাকি?

শক্তি—দেখবেন, আছে কিনা? আচ্ছা, দেখিয়ে দিচ্ছি।

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে রাইফেলটাকে আঁকড়ে ধরে শক্তি। টেবিলের দেরাজ থেকে দুটো বুলেট নিয়ে লোড করতে করতেই আবার ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। কিন্তু সুশান্ত মজুমদারও ততক্ষণে সরে গিয়েছে। গাড়িটাকেও কে যেন স্টার্ট করে ফেলেছে। আর, শক্তির রাইফেলের বুলেট সেই মুহূর্তে চোরাগাড়ির হুডের উপর দিয়ে আছড়ে পড়েছে। ছবির মত ..... আবার একটা আওয়াজ। যেন বন্দরবাড়ির বাগানের নিরেট কুয়াশার বুকটার সব আক্রোশ ফেটে পড়েছে। একটা বুলেটের চোট খেয়ে চুরমার হয়ে ঝরে পড়েছে চোরাগাড়ির কাঁচ। আর-একটা বুলেট যেন চোরাগাড়ির বুকের ভিতরের একটা কালো কুণ্ডলীকে উল্টে ফেলে দিয়েছে। ঝুপঝাপ করে জখম ভালুকের মত দৌড়ে দৌড়ে চলে গেল গাড়িটা।

উপেন মিস্তিরির ঘুম-ভাঙা ভয়-পাওয়া ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। কিরণলেখা এসে শক্তির হাত চেপে ধরে কাঁপতে থাকেন।

গগন বসু এসে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শক্তি বলে—সুশান্ত মজুমদার।

গগন বসু—আরও ভাল হয়, যদি শুনতে পাই যে ওটা মরে গিয়েছে। আমি তো তিনশো দুইয়ের আসামী হবার জন্য তৈরী হয়েই ছিলাম, কিরণ।

কিরণলেখা বলেন—আর কি আমাদের এখানে থাকা উচিত।

গগন বসু বলেন—না; এবার আমারও যেতে আপত্তি নেই।

| আঠার |

তেজপুরে সহর যেন দম-বন্ধ করে রাত সাড়ে আটটার আকাশবাণীর খবর শুনেছে। ঘরে ঘরে রেডিওর সামনে বসে আছে উৎকণ্ঠ আর উৎকর্ণ বাপ-মা-ছেলেমেয়ের জটলা। নাতিকে কোলে নিয়ে ঠাকুমাও শুনেছেন। মুখ শুকনো, চোখ করুণ, এক-একটা স্তব্ধতা; কিন্তু সে স্তব্ধতার ভিতরের প্রাণটা ছটফট করছে।

বাজারের যেখানে যেখানে যে-দোকানে রেডিও বাজে সেখানে সেখানে সে-দোকানের সামনে মানুষের বিপুল ভিড়। সাইকেল থামিয়ে ব্যস্ত মানুষ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর শুনেছে। থমকে আছে রিক্সা, শুনেছে রিক্সাওয়ালা আর রিক্সার আরোহী। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনেছে পথের মুটে-মজুর আর ফেরিওয়ালা।

আকাশবাণীর খবর হঠাৎ বলতে শুরু করে।—দুঃখের বিষয়......।

সব ভিড়ের সব প্রাণ চমকে ওঠে। সব শ্রোতার গলা শক্ত হয়ে ভয়ানক এক খবরের আঘাত সহ্য করবার জন্যে তৈরী হয়।

আকাশবাণীর খবর যেন কাটা-কাটা স্বরে গরগর করে।—তোয়াং নেই; দুসমনরা কব্জা কর লিয়া! আমাদের ফৌজ পিছনে হটে এসে নতুন পজিশন নিয়েছে, লড়বার জন্যে তৈরী হয়েছে।

গুমরে ওঠে ভিড়ের বিচলিত বোবা স্তব্ধতা। এ কী হলো? ঘরের রেডিওর দিকে তাকিয়ে ঠাকুমা ডুকরে ওঠেন—হায় ভগবান।

রবার বাগানের বাড়ি ভারতীর দোতলার একটি ঘরে রেডিওর দিকে তাকিয়ে শক্তি বসুর চোখের তারা দুটোও কেঁপে ওঠে।

কে জানে কেমন দেখতে এই তোয়াং। কল্পনা করে দেখতে চেষ্টা করলে যে শুধু ছোট্ট একটা নীল আলোর বুদ্বুদ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

পাশের ঘরের বিছানায় শুয়ে আছেন গগন বসু। বিছানার কাছে দুই চেয়ারে বসে গল্প করছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। কিন্তু মহিম দস্তিদার কোথায়?

কালোর মা দোতলার বারান্দায় এসে ডাক দেন। মা, আপনি কোথায়? একবার নীচের তলায় যান।

মণিমালা—কেন?

কালোর মা—একবার দেখুন গিয়ে; বাবা কেমন যেন ছটফট করছেন। আমার কথার জবাব দিলেন না।

দেখেছেন কালোর মা, মহিমবাবুর গায়ের মুগার চাদরটা পড়-পড় হয়ে গায়ের সঙ্গে ঝুলছে। এক পায়ে জুতো নেই, অস্থির হয়ে ঘরের এদিকে-ওদিকে হাঁটাহাঁটি করে ঘুরেছেন।

ব্যস্ত হয়ে আর বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উপর-তলা থেকে নেমে এলেন সবাই; প্রথমে মণিমালা আর কিরণলেখা। তারপর গগন বসু আর শক্তি।

—কি হলো? এরকম করছো কেন? কিসের অস্থিরতা? মণিমালা জিজ্ঞেস করেন।

মহিম দস্তিদার হাসেন।—এমন কিছু ব্যাপার হয়নি। তোয়াং গিয়েছে, তাতে আমাদের এত বিচলিত হবার কি আছে? কিন্তু......।

গগন বসুর দিকে তাকিয়ে কথা বলেন মহিম দস্তিদার।—কিন্তু কথাটা কি জানেন? এই গবমেণ্ট কি আমাদের বাঁচাতে পারবে?

আশা করবার মত যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

গগন বসুও হাসেন—আমার কাছ থেকে এসব প্রশ্নের জবাব পাবেন না। আমি জবাব জানি না। তবে আমি বিচলিত নই ; কারণ আমার কোন আশা-টাশা নেই।

মণিমালা— কিন্তু কে যে কোথায় আর কখন্ বিচলিত হলো, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু—তুমি ঠিকই বুঝতে পারছো না।

মণিমালা—এই তো, রাজবাহাদুরের কাছে এখনই শুনলাম, কাল বিকালে নেহরু-ময়দানে মস্ত বড় সভা হবে। লড়বার জন্যে জান কবুল করবে সবাই ; চীনেদের শয়তানি কেউ সহ্য করবে না। তাছাড়া, তুইও তো দেখতে পেয়েছিস শুক্তি, কিছুক্ষণ আগে কত বড় দুটো মিছিল জয় হিন্দ করে চলে গেল।

মহিমবাবু হাসেন—ওদের কথা ছেড়ে দাও। যাদের কিছু নেই, তাদের কোন ক্ষতির ভয়ও নেই, বিচলিত হবার প্রশ্নও নেই। থাক সে-সব কথা।......আপনি আজ একটু ভাল বোধ করছেন তো, গগনবাবু ?

গগন বসু—হ্যাঁ, অনেকটা ভাল।

মহিম দস্তিদার মানুষটি যে হেঁয়ালির ভাষাতে কথা বলেন, সেটা শুক্তিরও কিছু-কিছু জানা আছে। আজ কিন্তু মনে হয়, মেসোমশাই নিজেও একটা হেঁয়ালি। আজই সকালে এই ভারতীর দোতলার ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পেয়েছিল শুক্তি, নীচের তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির বাচ্চা ছেলেটা, যার নাম হীরক, তার সঙ্গে কথা বলছেন মেসোমশাই ; রাজপুত বীর বালকের নাম করে হীরককে উপদেশ দিচ্ছেন : সময় এসে গেছে হীরক, দেশের মাটির মান রাখবার জন্যে এবার তোমাকেও তরোয়াল ধরতে হবে। মরবো তবু নড়বো না, এই হবে তোমার আমার সবারই প্রতিজ্ঞা।

একটু পরেই শুক্তিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন মহিমবাবু।—তুই কি ঠিক বলতে পারবি, গগনবাবু তাঁর চা-বাগান বিক্রী করবার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন কিনা ?

শুক্তি—না।

মহিমবাবু—করে ফেললেই ভাল করতেন। আমিও তো দেখছি, এখন আর আমার এই বাড়িটাকে উচিত দাম দিয়ে কেনবার গরজ কারও নেই।

শুক্তি হাসে—আপনি এসব কী বলছেন, মেসোমশাই ? মণিমাসি শুনলে যে খুব রাগ করবেন।

মহিমবাবু—তাঁর কথা ছেড়ে দাও। তাঁর অসীম ধৈর্য ; তিনি মনে করেন ধৈর্য ধরা একটা মস্ত গুণ। কিন্তু ধৈর্য ধরতে গিয়ে এই তো দেখা গেল যে, আমার এই বাড়ি কিনে নেবার মত খদ্দের আর নেই।

মহিম দস্তিদার যতই আরও জটিল হেঁয়ালি হয়ে উঠুন না কেন, তেজপুর শহরের জীবনে কোন হেঁয়ালি নেই। পরের দিন বিকালে যখন নেহরু-ময়দানে বিপুল জনতার সভায় জান-কবুল প্রতিজ্ঞা গুমরে ওঠে, ঠিক তার কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার আকাশবাণীও জানিয়ে দেয় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা ; এমার্জেন্সি !

গগনবাবুর কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন মহিমবাবু। তারপর বলেন—এমার্জেন্সি কথাটার সরল অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, সরকার এখন যা-খুশি-তাই করবেন। ভদ্রলোকদের বাড়ি-টাড়ি কেড়ে নিয়ে সৈন্য-সামন্ত রাখবেন। আপনি কী মনে করেন, গগনবাবু ?

গগনবাবু—আমি কিছুই মনে করি না।

চলে গেলেন মহিমবাবু। ফিরে গিয়ে তাঁর বারান্দাতে নয় ; ঘরের ভিতরে তাঁর প্রিয় সেই সবুজ রঙের রেক্সিনের আরাম-কেদারাটিতে আধ-শোয়া হয়ে বসে থাকেন। এই ভারতীর বারান্দায় পায়চারী করে বেড়াতে আর ভাল লাগে না। ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে একটা উঁকি দিতেও ইচ্ছে করে না। পাশের বাড়ির হীরক চিৎকার করে গান গাইছে—বল বল সবে...। উঠে গিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দেন মহিমবাবু। শুনতে ভাল লাগে না।

কিন্তু তেজপুরের ঘরে ঘরে তখন হীরকেরই মত এই গান গাইছে যত রেডিও।

সকাল হলে আরও স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, বদলে গিয়েছে তেজপুর। সেই অদ্ভুত আর ভয়ানক উপকথার তেজপুর যেন হঠাৎ স্নানশুচি হয়ে একটা নতুন রকমের প্রাণ পেয়েছে আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজের হকারের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর কাগজ কিনছে পথের লোক।

উড়ছে হেলিকপ্টার ; আকাশে অদ্ভুত শব্দের হর্ষ ছড়িয়ে দিয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে চলে যাচ্ছে। মুখ তুলে হেলিকপ্টারের দিকে তাকিয়ে পথের লোকের অনেক আশার চোখগুলি চিকচিক করে ; হাত তুলে আর রুমাল উঠিয়ে হই-হই করে ওঠে শুভযাত্রার কামনা।

শিলিগুড়ি থেকে একটানা ছুটে এসে তেজপুরে স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছে মিলিটারীর তিনটে স্পেশাল ট্রেন। এসেছে শিখ ব্যাটালিয়ন, জাঠ কোম্পানি আর গোর্খা ব্রিগেড। স্টেশনে লোকের ভিড় জয় হাঁক দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। স্কুলের একদল ছেলে জওয়ানদের মাথার উপর ফুল ছুঁড়তে থাকে। একটা ফুল হাতে লুফে নিয়ে পকেটে রাখে আর হাসতে থাকে একজন অল্পবয়সী শিখ ক্যাপটেন।

যো বোলো সো নিহাল, সৎশ্রী অকাল ! হাঁক দিয়ে আর মার্চ করে চলে গেল শিখ ব্যাটালিয়ন।

দিনে রাতে সব সময় এয়ারপোর্টের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, নামছে, থামছে ; আবার ফিরে চলে যাচ্ছে এয়ারফোর্সের ট্রান্সপোর্ট প্লেন। মিলিটারীর সম্ভার নিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ভাইকাউণ্টও আসছে আর চলে যাচ্ছে। ঘুমোবার মত একঘণ্টারও সময় পান না প্লেনের কম্যাণ্ডার ; লাল হয়ে ফুলে আছে চোখ, কিন্তু মুখে শান্ত হাসি।

তেজপুর থেকে মিসামারি, মিসামারি থেকে ফুটহিল ; ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে ছুটে চলে যায় মিলিটারীর জীপ। যাচ্ছে আর্মি মেডিক্যালের সম্ভার। যাচ্ছে ফিল্ড সিগন্যালের ইউনিট আর আর্টিলারির জওয়ানদের একটি সেকশন।

আর দেখা যায় ; কোলিবাড়িতে শিশির হাজারিকার বাড়ির নারকেল-গাছের গায়ে ছোট একটি কাঠের বোর্ড, তার উপর সাদা হরফে ইংরেজীতে লেখা ছোট একটি কথা—ইয়েস ; ইয়ুথ এমার্জেন্সি সার্ভিস।

টাকা-পয়সার সম্বন্ধ নেই, জনসেবার রেসিং নেই, সরকারী কর্তার পেট্রনী শুভেচ্ছার বাণী নেই ; ইয়েস যেন তেজ-পুরের সামান্য-সাধারণ প্রাণের একটা ব্যস্ততা। শিশির ছিলেন অমল ও জগদীশ আর, আরও ওইরকম কয়েকজনের ব্যস্ততা। ওরা ছুটে ছুটে কাজ করতে চায়। কাজের জন্য তৈরী হতে চায়। ওরা ট্রেঞ্চ কাটে, ফার্স্ট-এড আর ফায়ার ফাইটিং-এর ট্রেনিং নেয়।

দেখতে অদ্ভুত লাগে, সেই শিশির হাজারিকা আজ ইয়েস ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে রাঙ্গাপাড়ার সড়কের পাশে ক্যাণ্টিন করে জওয়ানদের হাতে গরম চায়ের পেয়ালা তুলে দিচ্ছে।

কম্বল দাও, লেপ দাও, গরম কাপড় দাও। নেফার পাহাড়ের দুরন্ত বরফ আর শীতের কামড় সহ্য করছে লড়াইয়ের জওয়ান, তাদের জন্য মমতার উপহার চাই। আবেদন জানিয়ে তেজপুরের সড়কে সবার আগে মিছিল করে ঘুরে গেল যারা, তারা ওই ইয়েস ছেলের দল।

মিছিলটা রবার বাগানের ভারতীর সামনে এসে দাঁড়াতেই বাইরের ঘর ছেড়ে ভিতরের ঘরে চলে যান মহিমবাবু। সবার আগে কলোর মা বের হয়ে এসে মিছিলের হাতে তার নিজের গায়ের কম্বলটাকে তুলে দিয়ে চলে যান। বের হয়ে আসে শুক্তি, হাতে দুটো গরম আলোয়ানের একটা প্যাকেট। একটু আশ্চর্য হয়ে হেসে ওঠে শুক্তি—আপনি ? মালতীর খবর কি ?

শিশির হাসে—ভাল আছে।

শুক্তি—প্রমীলা ?

শিশির—ভালই আছে।

মিছিলটা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। মিছিলের গানের স্বর কানে এলেও গানের ভাষার কোন কথা আর স্পষ্ট করে শোনা

যায় না। শক্তির মনটা কিন্তু বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পারে, কিছুই ভাল লাগছে না। ভাবতে গেলে মনের সব চেষ্টা মিথ্যে করে দিয়ে আর নাগাল-ছাড়া হয়ে শক্তির প্রাণটা হঠাৎ এক-একবার যেন দুরন্ত ছেলেমানুষের মত একটা দৌড় দিয়ে ওই কদমবাড়িতেই ফিরে যেতে চায়। কেউ নেই কদমবাড়িতে, তবু যেন অনেক কিছু আছে। বাগানের নালার জলে হাঁস সাঁতার দেয়, ছায়া-শিরীষের গায়ে কাকলাস বসে থাকে, কুঞ্জলতার পাতার ঝোপে কিচির-মিচির করে চড়ুই লাফিয়ে বেড়ায়। তেজপুরের যত মিছিল মুখরতা আর চঞ্চলতার কাছে এসে যেন আরও একলা হয়ে গিয়েছে শক্তি।

উপরতলার ঘরে মা'র কাছে বসে এখন কত কথাই তো বলছেন মণিমাসি। কিন্তু কোন নতুন কথা নয়। সোম লজে এখন কেউ আর নেই। ওরা এখন দার্জিলিং-এ আছে। অনিমেষ কয়েকবার এসেছিল। আশা করেছিল অনিমেষ, শক্তি নিশ্চয় কদমবাড়ি থেকে তেজপুরে শিগগিরই চলে আসবে। অনিমেষের মা কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, কবে আসবে শক্তি?

কিরণলেখা বলছেন—সুমিত্রার চিঠি পেয়েছি। শ্যামল বলেছে, নেফাতে যখন একটা গোলমাল বেধেছে, তখন ওদিকে এখন আর না-থাকাই ভাল; শক্তির এখন কলকাতায় চলে আসাই তো উচিত।

এসব কথা আর এরকমের কথা তো অনেক শোনা হয়েছে। আরও শুনতে হবে; যতদিন মা শক্তির নিজের মুখের একটা কথা ওসব জল্পনার ব্যস্ততা শান্ত করে দেয়। কিন্তু তার আগে কি একটা ভাল খবরের কথা শুনতে পাওয়া যাবে না? কি আশ্চর্য, এত খবর শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে-খবরটা যেন নিরেট বোবা একটা পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ে কোথায় কোন্ জঙ্গলে না বরফ-ঢাকা বাংকারের ভিতরে পড়ে আছে।

পার্লামেণ্টে প্রাইম মিনিস্টার বলেছেন, চীনাদের আমরা থামিয়ে দিয়েছি, উই হ্যাভ হল্টেড দেম। ভালই তো। এবার তাড়াতাড়ি তাড়িয়ে দিলে আরও ভাল হয়।

রেডিওতে দিল্লির সরকারী বক্তৃতা শুনে শুনে ঝিমিয়ে পড়া, তারপর একটা বই হাতে নিয়ে, হয় চেয়ারে বসে নয় বিছানায় শুয়ে বই-এর একটা পাতাও না পড়া, তেজপুরের জীবনের দিনগুলি কেটে যাচ্ছে বেশ; বেশ চমৎকার একটা কুয়াশার ফাঁকি। কিছুই দেখতে বুঝতে আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যিই হেসে ফেলতে আর সব ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

বিকাল হয়েছে; এখন এভাবে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকলে মা আবার ডাকাডাকি করবেন, মণিমাসি এসে হাত ধরে টানটানি করবেন।

উঠে পড়ে শক্তি। বার বার মিছিমিছি খোঁপা বেঁধেই না কতটুকু সময় কাটিয়ে দিতে পারা যায়? তার চেয়ে ভাল, বাগানের রোদ গায়ে লাগিয়ে...।

চমকে ওঠে শক্তির চোখ। জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছে শক্তি, মালতী আর একজন অচেনা মহিলা ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে রাজবাহাদুরকে কি-যেন বলছে। হাত দুলিয়ে ডাক দেয় শক্তি।—মালতী, এস। ওপরে উঠে এস।

কি আশ্চর্য মালতীও যেন একটা ব্যস্ততা। খুব ব্যস্তভাবে কথা বলে মালতী। —দাদার কাছে শুনেছি, তুমি এখানে আছ। তাই মনে হলো, তোমাকে ছেড়ে দেব কেন? তোমাকেও কাজ করতে হবে।

শক্তি—কাজ?

অচেনা মহিলা বলেন—আমাদের সমিতি...।

মালতী—ইনি কমলা দত্তবড়ুয়া। প্লীডার শরৎবাবুর স্ত্রী।

কমলা—আমাদের সমিতির পক্ষ থেকে আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি, আর্মির জওয়ানদের জন্য উলের মোজা সোয়েটার কিংবা মাফলার, যা-হোক কিছু, যেটা আপনার সুবিধে হয়, বুনে দিন। খাকি রঙের উল হলেই ভাল। সোয়েটার হলে ফুল স্লীভ হবে।

শক্তি—তাই বলুন! এই কাজ! আচ্ছা, বেশি না পারি, অন্তত একটা সোয়েটার বুনে দেব।

কমলা—আপনাকে কিন্তু আমরা উল এনে দেব না। আপনি নিজেই কিনে নেবেন।

মালতী—ওকথা আর শক্তিকে বলবার দরকার হয় না। এখন চলুন, নতুনপাড়ার দিকে একবার যাই।

শক্তি হাসে—উঃ, মালতীর যেন একটু হাঁপ ছাড়বারও সময় নেই মনে হচ্ছে।

মালতী হাসে—রাগ করো না, আবার দেখা হবে।

নানা রঙের উলের গোছা দিয়ে ঠাসা-ভরতি, ঝোলাটাকে হাতে তুলে নিয়ে চলতে থাকে মালতী। বিদায় নিলেন কমলা দত্ত-বড়ুয়া, তাঁরও হাতে একটা ঝোলা।

মালতীর সংগে দেখা হলো, ভালই হলো। মনের কাছে না হোক, অন্তত হাতের কাছে একটা ছুতো ধরিয়ে দিয়ে গেল মালতী। দিনের কিছু সময় একটা কাজের নামে ফুরিয়ে দিতে পারা যাবে। মা আর মণিমাসি অবশ্য মনে করবেন যে শক্তি খুব ব্যস্ত হয়ে একটা চ্যারিটির কাজ করছে।

উল কেনার জন্যে টাকা দিয়ে রাজবাহাদুরকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়েই সন্দেহ হয় শক্তির, রাজবাহাদুর কি উল পছন্দ করতে ভুল করে ফেলবে না? কিন্তু বেশ ভাল করেই তো বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। রং খাকি হবে বটে, কিন্তু যেন খসখসে না হয়। পাকা ধানের রং হলেই ভাল। একেবারে চকচকে রেশমী ভাব না হোক, একটু নরম মোলায়েম ভাব যেন থাকে। কিন্তু টু-প্লাই হলে চলবে না। যা শীত, ফোর-প্লাই চাই।

ভুল সন্দেহ করেনি শক্তি। শক্ত দড়ি-দড়ি চেহারার উল নিয়ে এল রাজবাহাদুর; সে উল দিয়ে সোয়েটার বুনতে শক্তির হাতে রুচি নেই, রুচি হবেও না। আরও দু'বার বাজারে গিয়ে অনেক বাছাই করে যে উল কিনে নিয়ে এল রাজবাহাদুর, সেটা অবশ্য অপছন্দ করবার মত কিছু নয়।

কাজটা মন্দ নয়। ভালই তো লাগে। তিনদিনের মধ্যে শুধু দুপুরবেলার সময়-টুকু বিছানায় গা গড়িয়ে, সোফার কোণ ঘেঁষে বসে এই সোয়েটারের যে-টুকু বুনতে পেরেছে শক্তি, তাতেই পিঠের সবটা আর বুকের অর্ধেকটা হয়ে গিয়েছে। শক্তির হাতে একটা কাজ ধরিয়ে দিতে গিয়ে মালতী যেন শক্তির মনেও একটা ব্যস্ততার ছোঁয়াচ ধরিয়ে দিয়েছে।

মিছিমিছি খোঁপাটাকে এক টানে খুলে দিয়ে মিররের সামনে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা, আর, আবার নতুন করে খোঁপা বাঁধা; শুক্তি বসুর এই নতুন বাতিক কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি। উলের কাঁটা থামিয়ে রেখে, আর কোলের উপর থেকে উলের গোছা আর সোয়েটারের আধখানা বুকে নামিয়ে রেখে হঠাৎ এক-একবার ব্যস্তভাবে সোফা থেকে উঠে পড়ে শুক্তি। মিররের সামনে এসে দাঁড়ায় আর খোঁপা খুলে ফেলে। আর, দেখতেও থাকে, কপালের মাঝখানে সেই ফিকে কালশিরার আবছা কালো দাগটা এখনও আছে, একেবারে মুছে যায়নি।

মা বোধ হয় এর মধ্যে একটি দিনও শুক্তির মুখের দিকে ভাল করে তাকাননি। তাই কপালের এই আবছা কালো-দাগটাকে দেখতে পাননি। দেখতে পেলে নিশ্চয় চোখ বড় করে আর গলা কাঁপিয়ে বলেই ফেলতেন, কোথায় মাথা ঠুকেছিস, বল? গাড়ি থেকে নামতে, না অন্ধকারে আলোর সুইচ হাতড়াতে গিয়ে ঘরের দেয়ালে? মনে করে দেখ!

হেসে ফেলে শুক্তি।

আর তো কোন কাজ নেই। আর যা আছে, সেটা যেন তিনটে তিনরকম জগতের ভাষা চুপ করে শোনা, আর শুনে নিয়েই সরে যাওয়া।

তেজপুরের এই নবেম্বরী শীতের বিকালের নরম রোদের আলো গায়ে মেখে বাগানের কামিনী গাছের মাথায় একটা একলা টুনটুনি যখন চুপ করে বসে থাকে, তখন ড্রাইভার রাজবাহাদুরও গ্যারেজের সামনের চাতালের এক পাশে ঘাসের উপর বসে ওর মাথার নেপালী টুপির ছেঁড়া-গুলিকে সেলাই করে করে হাসতে থাকে।

রাজবাহাদুর বলে—বোহোৎ মজা হুয়া, দিদি।

শুক্তি—কি বললে?

রাজবাহাদুর—লড়াইকে লিয়ে হামি চান্দা দিয়েছে সাত রুপিয়া। হাসপাতালকা জমাদারিনলোগ দিয়েছে বিশ রুপিয়া। নতুন-পাড়াকা শীতল কাকাবাবু দিয়েছে, দুশো রুপিয়া। লেকিন...।

কি-যেন বলতে গিয়ে থেমে যায় রাজ-বাহাদুর, আর মাথা চুলকোতে থাকে। শুক্তি বলে—লেকিন কেয়া? বলেই ফেল না।

রাজবাহাদুর—লেকিন বাবা কুছ নেহি দিয়া।

শুক্তি—কে? মেসোমশাই?

রাজবাহাদুর—হাঁ, দিদি। বাবা এক পয়সাভি নেহি দিয়া। সইকিয়া সাহেব আওর চৌধুরী সাহেবভি নেহি।

সন্ধ্যাবেলার রেডিওতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা বলে—আমাদের জয় হবেই। রেডিওর গানগুলিও বলে, হবে জয়।

কালোর মা বলেন—হবে বিচার।

রাত হয়েছে। স্তব্ধ নীরব প্রহর। তারায় ভরে আছে আকাশ। কালোর মা'র গায়ে কম্বল নেই; ছাদের উপর একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন। আর পুরু রেজার ফ্লানেলের গ্রেট-কোট গায়ে জড়িয়ে ছাদের এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়ায় শুক্তি।

কালোর মা'র কথা শুনেই থমকে দাঁড়ায় শুক্তি।—কি বললেন?

কালোর মা—বলছি, আরও কত অবিচার হলো।

একগাদা অবিচারের গল্প বলেন কালোর মা। তোমাদের ড্রাইভার কৈলাসের জেল হয়েছে। রতনের চাকরি গিয়েছে। শীতল-বাবুর দোকান গিয়েছে। শিশিরের বাড়ি গিয়েছে।

হঠাৎ গল্প থামিয়ে আর জপের মালা হাতে তুলে নিয়ে চোখ বন্ধ করেন কালোর মা।

চোখে পড়ে শুক্তির; অনেক দূরের একটা গাছের মাথার অন্ধকারে মিটমিট করছে জোনাকির কুচি-কুচি আলো। আর নেফা-পাহাড়ের শক্ত নিরেট ধড় যেন কুয়াশা হয়ে গলে গিয়েছে।

শুক্তির চোখের তারা দুটো যেন শীতে শিউরে উঠে ঠান্ডা হয়ে যায়, সরে যায় শুক্তি। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে সিঁড়ি ধরে নেমেই চলে যায়।

কিন্তু থামতে বোধহয় ইচ্ছে করে না। ঘরে ঢুকে আর বিছানাটার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই আবার বের হয়ে যায় শুক্তি। যেন শুক্তির বুকের ভিতরে একটা অবিচারের গল্প আজ হঠাৎ উতলা হয়ে উঠেছে। বাঃ, এ তো বেশ অদ্ভুত ভুলো মন, একবার খোঁজ নিতে চেষ্টাও করে না, মানুষটার কি হলো বা না হলো?

লোখরার প্রণব কাকা নিশ্চয় একটা কিছু খবর দিতে পারেন। এতক্ষণে কি ঘুমিয়ে পড়েছেন প্রণব কাকা? রাত এগারটা তো এখনও হয়নি।

নীচের তলার একটি ঘরের কাছে এসে দেয়ালের গায়ের আলোর সুইচ টিপে দেয় শুক্তি। দরজা ঠেলে দিয়ে ভিতরে ঢোকে। টেবিলের উপর থেকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে আর অনেক ডাকাডাকি করেও কিন্তু কোন ফল হয় না। এক্সচেঞ্জ শুধু বার বার ওই একটা কথা বলে।—প্লীজ ছেড়ে দিন। নো পার্সোনাল কল।

শুক্তি—কেন?

—সিকিওরিটি!

রিসিভার নামিয়ে রেখে দিয়ে শুধু একটা করুণ স্তব্ধতার মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম; চোখের তারা নড়ে না।

চমকে ওঠে শুক্তি। মণিমাসির গলার স্বর ঘরের দরজার কাছে এসে পৌঁছেছে। ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে কথা বলেন মণিমালা—এত রাতে এখানে এসে তুই কার সঙ্গে হ্যালো হ্যালো করছিস?

শুক্তি—লাইন পেলাম না। লোখরাতে প্রণব কাকার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।

মণিমালার পিছন থেকে কিরণলেখার গলার স্বর আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করে।—কেন?

শুক্তি হাসে—যুদ্ধের একটা খবর জানতে ইচ্ছে হয়েছিল।

কিরণলেখা—যুদ্ধের খবর? রেডিও তো সব সময় যুদ্ধের খবর বলছে।

শুক্তি—রেডিওতে সুজিতবাবুর কোন খবর তো থাকে না?

হেসে ফেলেন কিরণলেখা।—সুজিত কি একটা জেনারেল, যে ওর খবর বলবে রেডিও? সবারই কথা বলতে গেলে রেডিওতে কুলোবে না।

শুক্তি—কিন্তু বলবে তো, বুমলার যুদ্ধের পর রাইফেলের লোকগুলোর কি দশা হলো? রইল, না গেল? আছে, কি নেই?

কিরণলেখা— সে-সব খবর একদিন পাওয়াই যাবে। খবরের কাগজ আছে কি করতে? কিন্তু সেজন্যে কি এত রাত্রে রিং করে প্রণবের ঘুম ভাঙাতে হবে? খেয়ালের যে কোন মাত্রা নেই! তা ছাড়া আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবি তো?

শুক্তি আশ্চর্য হয়।—তোমাকে আবার কি জিজ্ঞেস করবো?

কিরণলেখা—আমাকে জিজ্ঞেস করলেই তো বলে দিতাম, প্রণব এখন লোখরাতে নেই, জোড়হাটে আছে।

মণিমালা হাসেন—যা, এবার শুয়ে পড় গিয়ে, যদি আবার রোগা হবার বাতিকে না পেয়ে থাকে।

কী আশ্চর্য! ঘুমটাও যে একটা দুঃসহ

লজ্জার ঘুমে। বিশ্রী স্বপ্ন তাড়াতে গিয়ে ঘুমটা বার বার ভেঙে যায়। ডান পায়ের গোড়ালিতে কোন ফুস্কুরির ব্যথা টনটন করছে না, তবু একজনের কোলের উপর পা তুলে দেওয়া! স্বপ্নটার একটুও লজ্জা হলো না। কোন বিপদ-আপদ নেই, বাঘে-ভালুকে তাড়াও করেনি, তবু ছুটে গিয়ে একজনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরা! ঘুম ভেঙে যাবার এতক্ষণ পরেও স্বপ্নটার ছোঁয়া যেন গায়ে লেগে রয়েছে। নিঃশ্বাসের সব বাতাস অলস হয়ে গিয়েছে। বুকটা টিপ টিপ করছে। জীবনের কোন মুহূর্তেও এমন লজ্জা পায়নি শুক্তি।

ঘুম আর হবে না। এমন ঘুম আর না হলেই ভাল। রাত আর কতটুকুই বা আছে? আর না ঘুমোলেও চলবে। বাকি রাতটুকু জেগে বসে কাটিয়ে দিলে ক্ষতি কি? চোখের চেহারা দেখে মণিমাসি শুধু একটু সন্দেহ করে বলবেন, আজ তোকে এত রোগা-রোগা দেখাচ্ছে কেন রে, শুক্তি?

বিছানা থেকে নেমে পড়ে শুক্তি। আলো জ্বালে আর জানালাটাকেও খুলে দেয়।

না, এটা রাত নয়। ভোর হয়েছে। হিমেল বাতাসের কনকনে ঠাণ্ডায় গাছপালার মাথা শিউরে শিউরে কাঁপছে। দূরের শঙ্খের শব্দের মত একটা ফিকে গম্ভীর শব্দ ভেসে আসছে। ভোমরাগুড়ি ঘাট থেকে ভোরের ফেরির স্টীমার ছাড়লো বোধহয়। স্টীমারের বিদায়ধ্বনির স্বরও শীতে কাঁপছে।

[উনিশ]

তেজপুরের এদিকে-ওদিকে সবদিকেই ধুলো উড়ছে। পথের লোক একটু বেশি তাড়াতাড়ি করে হাঁটে; রিক্সা একটু বেশি বেগ নিয়ে দৌড়ে যায়। আর গাড়ির হর্নের শব্দগুলি যেন ছুটে চলে যাবার জন্য একটা হঠাৎ-ব্যাকুলতার চিৎকার।

তোয়াং-এর গোম্ফার বুদ্ধমূর্তির কাছে দীপ জেলে দিতে সেখানে কেউ আর আছে কিনা, ঠিক বুঝতে পারা যায় না; বরং সন্দেহ হয়, কেউই বোধ হয় নেই।

চলে এসেছে, চলে আসছে, আরও চলে আসবে নিশ্চয়, ঘর-ছাড়া মোনপা ভোটিয়া আর শারদুক পেন। আসছে, এসে পড়েছে, আশ্রয় ক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে ঘরছাড়াদের এক-একটা দল। রিনচিন, স্রিং, লেই, দোরাজি, সাংগে সাংজা আর কেজাং; ওরা বড় গম্ভীর। মাথাতে মোটা বেণী দুলছে যাদের, রিলিম, সোনাম, পেম, আর পুতি; ডোয়েমা হোক বা লামু হোক; ওরা সবাই মিটিমিটি হাসে। ছোয়াং মৌদ ডাবু আর নোরবু; বুড়ো আচি সেতু আর ছোকরা মুখরো সেতু; ওরা বেশ বিরক্ত হয়ে তাকায় আর হাঁপায়। ওদের কাঁধে পিঠে আর মাথায় বোঝা, ওদের টাট্টু খচ্চর আর বুড়ো ঘোড়ার পিঠে বোঝার ভার। ধুলো-মাখা হয়ে, হেসে কেশে রেগে হাঁপিয়ে আর ফুঁপিয়ে, অসহায় ক্লান্তির মিছিলের মত ওরা তেজপুরের গা-ঘেঁষা সড়ক ধরে চলে যাচ্ছে। বাচ্চা-কাচ্ছা, বুড়ো-বুড়ি আর ছোঁড়া-ছুঁড়ি; কে না আছে?

কিন্তু কোন দফলা-গাঁয়ের একটিও মানুষ আসেনি। রতন যতই ছুটোছুটি করুক, কঠিন আশার মূর্তি হয়ে সড়কের মাইল স্টোনের উপর বসে আর চোখ তুলে আগন্তুকের মিছিলের মধ্যে চেনামুখ খুঁজতে যতই চেষ্টা করুক, শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই ফিরে যায় রতন।

ক্লাস ওয়ান টু থ্রি আর ফোর: নেফার সরকারী কাজের উত্তমাধম সবাই চলে আসছেন। উত্তমেরা অনেকেই একটু আগেই এসে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার কোথায় যেন চলে গিয়েছেন। বোধহয় নর্থ ব্যাঙ্কের এদিকে কোথাও নয়; হেথা নয়, আরও দূরে; অন্য কোনখানে।

চলে গিয়েছেন দশটি বাড়ির মালিক লাহিড়ী মশাই, তাই হীরকের গলার স্বদেশী গানের কাকলি আর শোনা যায় না। চলে গিয়েছেন, একুশটি বাড়ির মালিক শৈলেশ্বর সইকিয়া। চলে যাবার জন্যে ছটফট করছেন ইনকাম ট্যাক্সের মহাদেব চৌধুরী; সিক লীভ চেয়ে দরখাস্ত করেছেন, তার উপর গোহাটিতে তিনবার টেলিগ্রাম করে রিমাইণ্ডারও দিয়েছেন। চার্টার প্লেন উড়ে উড়ে এসেছে, আর এদিক-ওদিকের যত চা-বাগানের বিদেশী সাহেবকে সপরিবারে তেজপুরের মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছে।

মণিমালার হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে; আজকের দিনটা যে স্মরণ করে খুশি হবার একটা দিন। অনেক আনন্দের স্মৃতি দিয়ে চিহ্নিত একটি দিন, সেদিন এই ভারতীর ফটকের দু'পাশে দুটি মঙ্গলঘট রেখে তিনি গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। মুগার চাদরটি গায়ে জড়িয়ে আগে-আগে চলেছেন মহিমবাবু, পিছনে মণিমালা। তাঁর হাতের থালার উপর কপূরের বাতি জ্বলছে। সেদিনটি ছিল আজকেরই মত একটি আঠারই নবেম্বর।

কোন বছরেই এই দিনটিতে গগনবাবু, কিরণদি আর শুক্তিকে কাছে পাননি মণিমালা। তাই তাঁর ইচ্ছে হয়েছে, খুব একটা হইচই উৎসব নয়, একটু হাসিখুশির কলরব নিয়ে গৃহপ্রবেশের বার্ষিকীর দিনটা সুখী হোক। কিংবা বোধহয় ছানার পোলাও, রুইয়ের পেটি দিয়ে কোর্মা আর সরভাজা তৈরী করবার মত একটা দিন খুঁজছিলেন মণিমালা। আজ সেইরকম একটি দিন পেয়েছেন।

নিজে খাটলেন, কালোর মা তো খাটছেনই; তার উপর শুক্তিকেও একটু না খাটিয়ে থাকতে পারলেন না মণিমালা। শুক্তিকে দিয়েই সর ভাজিয়ে নিলেন।

দিনটাও না হেসে থাকতে পারবে কেন? ভাজতে গিয়ে প্রথমেই সরের তিনটে পাঁস কড়া জ্বালে পুড়িয়ে লাল করে দিয়ে শুক্তি যখন আতঙ্কিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, সর্বনাশ হলো, সব গেল মণিমাসি; তখন শুক্তির হাত থেকে ঝাঁঝরাটাকে কেড়ে নিয়ে হেসে ওঠেন মণিমালা।

কিন্তু শুধু একবার, আর ভুল হয়নি শুক্তির।

দুপুরবেলায় খাবার টেবিলের উপর দিয়েও মাঝে মাঝে যেন হাসির শব্দ গড়িয়ে যায়। গগন বসু বলেন—প্রণবের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে শান্তিপুরে গিয়ে যে সরভাজা খেয়েছিলাম, তার স্বাদ মনে আছে। কিন্তু আজকের সরভাজা খেয়ে মনে হচ্ছে, আরও পাকা কোন কারিগরের হাতের সরভাজা; অদ্ভুত স্বাদ।

মহিমবাবু—হ্যাঁ; আমাদের তেজপুরের লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের হরগোবিন্দ খুবই ওস্তাদ কারিগর।

গগন বসু—ভুল নাম বললেন, মহিমবাবু।

মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু হাসেন।—বোধ হয় গোলকবিহারীর দোকানের সরভাজা? তাই না?

গগন বসু—না, কারিগরের নাম হলো শুক্তি বসু।

শুক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে মহিমবাবু কুণ্ঠিতভাবে হাসেন—তুই? কলকাতার কলেজে সরভাজাও শেখায় নাকি?

শুক্তি—না। তেজপুরের ভারতী কলেজে শেখায়।

মহিমবাবু—ভারতী কলেজ?

শুক্তি—জানেন না?

মহিমবাবু—না। কখনও তো শুনিনি।

শুক্তি—প্রিন্সিপালের নামটাও শোনেননি?

মহিমবাবু—না।

শুক্তি—তা হলে শুনবেন? বলবো?

মহিমবাবু—বলবে বইকি।

শুক্তি—নাম, শ্রীযুক্তা মণিমালা দস্তিদার।

হাসতে গিয়ে গগনবাবুর হাতের চামচ পড়ে যায়। কিরণলেখা হাসি চাপতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শুক্তিকে ধমক দিতে গিয়ে হেসেই ফেলেন।—মুখ-কাটা মেয়ে। এরকম একজন গম্ভীর গুরুজন মেসোর সঙ্গে কি-রকম ঠাট্টা তামাসা শুরু করেছে।

মহিমবাবু এইবার কিরণলেখার মুখের দিকে তাকান—মনে হচ্ছে, আপনিই শুক্তিকে এই ঠাট্টাটা শিখিয়ে দিয়েছেন।

মণিমালা, ব্যাপার দেখে সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন যিনি, তিনি তাঁর হাসির ভার সামলাতে গিয়ে কোন কথাই বলতে পারেন না।

বিকাল হতেই গানের মিষ্টি সুরের ছোঁয়া লেগে ভারতীর ঘরের বাতাসও মিষ্টি হয়ে গেল। শুক্তিকে বেশি বলতে হয়নি, শুধু

একবারই বলেছিলেন মণিমালা—কতদিন তোর গান শুনিনি, শুক্তি।

শুক্তির গান শেষ হবার পর মণিমাসি আরও খুশি হয়ে বলেন।—শুক্তির গলার এত মিষ্টি গান আমি আগে কখনও শুনিনি।

কি যেন ভেবেছেন কিরণলেখা; শুক্তির ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর চোখে যেন আর-একটা উৎসবের আশার ছবি আজ খুব ব্যস্ত হয়ে হাসছে।

যদি এখন মালতী হঠাৎ উপস্থিত না হতো, তবে বোধ হয় এখনই শুক্তির ঘরে ঢুকে আর শুক্তিরই চোখের সামনে বসে গল্প করতেন কিরণলেখা।

—এস মালতী। ডাক দিলেন কিরণলেখা।

চমকে ওঠে শুক্তি। মালতীকে দেখতে পেয়ে খুব খুশি হয়েও শুক্তি যেন একটু কুণ্ঠিত হয়ে হাসে।—এখনও ফিনিশ করতে পারিনি মালতী।

মালতী—এতদিনের মধ্যে একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারলে না? একটু তাড়াতাড়ি কর, শুক্তি।

চলে গেল ব্যস্ত মালতী। শুক্তির ঘরে ঢুকে কিরণলেখা হাসেন।—আজ নিশ্চয় স্পষ্ট করে বলতে পারবি। তাই জিজ্ঞেস করতে এলাম।

বুঝতে অসুবিধে নেই শুক্তির, মা আজ কোন্ জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বিকেল শেষ হয়ে এসেছে। তেজপুরের বাতাসের ধুলো যেন লালচে গোধূলির মত রঙীন হয়ে উঠতে চাইছে।

কিরণলেখা—আর তো দেরি করা উচিত নয়। ভেবে দেখতে এত দেরিই বা হবে কেন? তুমি বড় হয়েছ, তোমার তো বুঝে নিতে কোন অসুবিধে নেই।

শুক্তির নীরব মুখটার উপরেও যেন রঙীন গোধূলির একটা স্নিগ্ধতার আভা লুটিয়ে পড়েছে। কিরণলেখা বলেন—তুমি কৃষ্ণার মত একটা খুকু মেয়ে হলে, কিংবা ষোল বছর বয়সের একটা বোকা অবুঝ মেয়ে হলে তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতাম না। যা করতাম আমরাই করতাম। তা ছাড়া, তোমার বাবার ইচ্ছের কথাটাও তো জান; তুমি যা বলবে, তাই হবে।

শুক্তি বলে—বলবো। আর দেরি হবে না।

কিরণলেখা—কবে বলবি?

শুক্তি—আজই।

কিরণলেখার মুখের শান্ত হাসিটা যেন নিবিড় তৃপ্তি নিয়ে থমথম করে। চলে যান কিরণলেখা।

টেবিলের উপর পড়ে আছে উলের গোছা, কাঁটা দুটো আর পরিপাটি করে গোটানো সোয়েটার। ঠাসা বুনোট পেয়ে উলের পাকা ধানের রঙ আরও ঘন আর আরও চকচকে হয়েছে। বুকের সবটাই হয়েছে, পুরো একটা হাতও হয়ে গিয়েছে। আর একটা হাতের অর্ধেক হয়েছে। এত কুঁড়েমি না করলে

আশ্রয় ক্যাম্পের দিকে চলে যাচ্ছে ঘরছাড়াদের এক একটা দল

বাকি অর্ধেক হাতটাও কবেই হয়ে যেত।

না, আজ আর ইচ্ছে করে না। শুধু হাত দুটো নয়, মনটাও আর ওই উলের কাঁটা ধরবার জন্য ব্যস্ত হতে চায় না। বরং চুপ করে খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। দেফার পাহাড়ের মাথায় রোদের ছোঁয়া সিরসির করে কাঁপছে। আর ক্লান্তস্বরে গুর্‌গুর্ শব্দ করে উড়ে আসছে দুটো হেলিকপটার; পাখাতে রোদের আভায় সোনা-রং জ্বলছে। দুটো সোনালী পাখি বলে মনে হয়।

কিন্তু রাজবাহাদুর যেন কেমন অদ্ভুত একটা ভঙ্গীতে ঘাড় কাত করে, আর ছোট-ছোট চোখ দুটোকে কুঁচকে আরও ছোট করে দিয়ে, আর্ত মানুষের মত একটা বিষাদের মুখ নিয়ে হেলিকপটর দুটোর দিকে তাকিয়ে আছে।

—ওরকম করে কী দেখছো রাজবাহাদুর? জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে হেসে ফেলে শুক্তি।

রাজবাহাদুরের গলার স্বর যেন ছটফট করে চেঁচিয়ে ওঠে—জওয়ানকা লাস আতা হ্যায়, দিদি।

—কি বললে? প্রশ্নটা যেন শুক্তির বুকের পাঁজর কাঁপিয়ে দিয়ে আর স্তব্ধ নিঃশ্বাসটার ভিতর থেকে ঠিকরে বের হয়ে আসে।

রাজবাহাদুর বলে—জখম লোগভি আতা হ্যায়।

শুক্তি—কিন্তু কোথায় আতা হ্যায়?

রাজবাহাদুর বলে—এয়ারপোর্টকা ময়দানমে; কিন্তু আমি ঠিক জানি না, দিদি।

সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। কত তাড়াতাড়ি কালো হয়ে গেল আর কনকনে ঠাণ্ডায় ভরে গেল তেজপুরের শীতের এই অদ্ভুত সন্ধ্যা।

শুক্তির ঘরের ভিতরে কিন্তু দপ করে আলো জ্বলে ওঠে। কে যেন ঘরে ঢুকেছে আর সুইচ টিপেছে। মুখ ফিরিয়ে না

তাকিয়েও বুঝতে অসুবিধা নেই শুক্তির, কে এসেছে।

কিরণলেখা বলেন—শুক্তি, চা খাবি চল।

কিন্তু কিরণলেখার এই স্নিগ্ধ আহ্বানের শান্ত হাসিটাকে চমকে দিয়ে ধুলো-ধুলো করে দেয় শুক্তির মুখের একটা কথা, শুকনো পাতার ঝড়ের মত একটা কথা।—আমি কিন্তু আজ কিছুই বলতে পারবো না, মা।

কিরণলেখা—কেন?

শুক্তি—সুজিতবাবুর একটা খবর না পেয়ে আমি কিছুই বলতে পারবো না।

কিরণলেখা—কেন?

শুক্তি—আমার কথায় চাকরি নিয়ে একটা মানুষ খুশি হয়ে যুদ্ধ করতে বমলাতে চলে গেল। আজ পর্যন্ত তার কোন খবরই পাওয়া গেল না। ভাবতে আমার খুব খারাপ লাগছে; লজ্জা হচ্ছে, স্বস্তিও পাচ্ছি না।

কিরণলেখা—কথাটা ঠিক। আমারও তো কয়েকবার মনে হয়েছে, কি হলো ছেলেটার? কিন্তু সে-কথা ভেবে এদিকের সব কিছু তো অন্ধকার করে রাখা চলে না। সেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

শুক্তি—কিন্তু এরকম বিশ্রী একটা অস্বস্তির মন নিয়ে আমিও যে কিছু বলতে পারছি না। বলতে ইচ্ছেই করছে না; বলতে ভালও লাগছে না।

কিরণলেখা—অদ্ভুত তোমার মন। বড় গোলমেলে মন।

শুক্তি হাসে—তুমি আমাকে মিথ্যে নিন্দে করছো, মা!

কিরণলেখাও হাসতে চেষ্টা করেন।—বড় নরম মন তোমার। যাই হোক, এখন তাহলে জোড়হাতে তোমার প্রণব কাকার কাছেই একটা চিঠি দিয়ে দেখ, সুজিতের কোন খবর পাওয়া গিয়েছে কিনা।

ও কি? রাস্তা দিয়ে একটা হল্লা ছুটে গেল কেন? এগিয়ে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিরণলেখা। ফটকের কাছে আবছা আলো-আঁধারের ভিতর থেকে রাজবাহাদুরের গলার স্বর চেঁচিয়ে ওঠে।—সেলা খতম।

—দুঃখের বিষয়...। ওদিকের ঘরে কড়-কড় করে বেজে উঠেছে রেডিও।—আমাদের সেলা ঘাঁটির পতন হয়েছে। শত্রুর হামলা আরও এগিয়ে এসেছে; আমাদের জওয়ানেরা পিছিয়ে এসে বমডিলার ঘাঁটিতে দাঁড়িয়েছে। দিনরাত যুদ্ধ চলছে।

টলমল করছে তেজপুর। খবরের চকিত আঘাতে আহত আর উদ্বিগ্ন তেজপুর। সিনেমা হাউসের কাউন্টারে টিকিট-কেনার ভিড়ও বিচলিত হয়ে সরে যায়। রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সীট বুকিং-এর তাড়া-হুড়া ব্যস্ততার ভিড়ে ভরে যায়। বড়-বড় আর ভাল-ভাল অনেক মোটরকারের ধকধকে জ্বলন্ত হেডলাইট এয়ারপোর্টের সড়ক ধরে ছুটে চলে যেতে থাকে।

নীচের তলা থেকে একটা উতলা কণ্ঠস্বরও যেন টলমল করে আর সিঁড়ি ধরে উপরে উঠতে থাকে।—মা আপনি কোথায়? একবার দেখুন এসে, বাবা কার সঙ্গে কী সব অদ্ভুত কথা বলছেন।

কালোর মা এসে যে কথা বলেন, সে কথা ভারতী নামে এই বাড়িটারই অদৃষ্টের একটা ভয়ানক খবর। বাড়ি বিক্রী করতে চাইছেন বাবা।

কালোর মা'র কথা শুনে মণিমালার চোখেও একটা নির্বোধ বিস্ময় টলমল করে। নীচে চলে যান মণিমালা। গগন বসু আর কিরণলেখাও নামেন, পিছনে শুক্তি।

মহিমবাবুর হাতে বাড়ি-বিক্রীর একটা ডীডের খসরা। টেলিফোনে কথা বলছেন মহিমবাবু।—আপনি আজ এখনই চলে আসুন মিস্টার দোরাজি। আমরা সবই রেডি।...ও ইয়েস, আজই তেজপুর ছেড়ে চলে যাব।...না, কোন আক্ষেপ নেই। টাকা হাতে থাকলে সবই আমার দেশ।

টেলিফোনের আলাপ বন্ধ হবার পর গগন বসুর দিকে তাকিয়ে আর মৃদুভাবে হেসে কথা বলেন মহিমবাবু।—এবার চীনারা এসে গৃহপ্রবেশ করুক; আমার কোন আপত্তি নেই; আমার আর কোন আক্ষেপও নেই, গগনবাবু।

গগন বসু—আপনার কথা তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

মহিমবাবু—বাড়ি বিক্রীর ব্যবস্থা করে ফেলেছি। কালিম্পং-এর মার্চেণ্ট মিস্টার দোরাজি এই বাড়ি কিনতে রাজি হয়েছেন।

—শুনলে তো কিরণদি! কী সুন্দর ব্যবস্থা। আমার গৃহপ্রবেশের স্মরণদিন কী চমৎকার স্মরণীয় হয়ে উঠলো! মণিমালার দু'চোখ থেকে বড়-বড় জলের ফোঁটা ঝরতে থাকে।

মহিমবাবু—আমি আজই রাত্রে তেজপুর ছেড়ে চলে যাব। আপনি কী করবেন, গগনবাবু?

গগন বসু—যা বলেন। থাকতে বলেন, থাকবো; যেতে বলেন, যাব। আর, এরা কেউ যদি আমাকে বাধা না দেয়, আমি তবে কদমবাড়িতেই চলে যাব। আমার তো কোন অসুবিধে নেই।

কিরণলেখা—আমরা তাহলে কলকাতা চলে যাই।

কালোর মা বলেন—আমি আর কোথায় যাব? শিববাড়ির মন্দিরে গিয়ে পড়ে থাকবো।

এতক্ষণ মণিমালার হাত ধরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল শুক্তি। এইবার আস্তে আস্তে এগিয়ে যেয়ে মহিমবাবুর চোখের সামনে দাঁড়ায় আর হাসতে থাকে।—মেসোমশাই।

শুক্তির মুখের হাসিটাও অদ্ভুত; যেন দুরন্ত-করুণ একটা আবেদন। মহিমবাবু বলেন—তুই আবার কী বলতে চাইছিস?

শুক্তি—রাগ করে বাড়িটা বিক্রী করবেন না, মেসোমশাই।

মহিমবাবু—কিন্তু...।

শুক্তি—না না, আপনি আর কোন কিন্তু-টিন্তু বলবেন না। বলতে বলতে মহিমবাবুর হাতের উপর লুটিয়ে পড়ে বাড়ি-বিক্রীর ডীডের খসড়াটাকে ধরে টানাটানি করতে থাকে শুক্তি।

মহিমবাবু—ওরকম করতে নেই শুক্তি। তুমি সংসারের নিয়ম-কানুন বোঝ না।

শুক্তি—হ্যাঁ, আমি কিছুই বুঝি না, বুঝবোও না। কিন্তু আপনি এটাকে এখন আমার কাছে রেখে দিন।

মহিমবাবু—কিন্তু গবমেণ্ট তো আমার সম্পত্তি বাঁচাতে পারবে না।

শুক্তি—দেখুন না কি হয়? আরও কটা দিন ধৈর্য ধরতে দোষ কি?

মহিমবাবু—আর ধৈর্য!

মুখ ফিরিয়ে নিলেন মহিমবাবু; শুক্তির হাতে খসড়াটাকে ফেলে দিলেন।

কিরণলেখার চোখে তবু একটা প্রশ্নের ছায়া লেগে থাকে।—আজই যদি চলে যেতে হয়, তবে...।

মণিমালা চেঁচিয়ে ওঠেন।—না, কখ্খনো না, কারও যাওয়া হবে না। এত যাব-যাব করবার মত কিছু হয়নি।

[কুঁড়ি]

খবরটা যেন তেজপুরের শেষ আশার উপর একটা কঠোর ঠাট্টার বিস্ফোরণ, শেষ ধৈর্যের উপর একটা রূঢ় ধিক্কার, আর শেষ বিশ্বাসের উপর একটা তিরস্কারের ঘোষণা। সন্ধ্যার রেডিও বলে দিল—বমডিলা শেষ!

রাতের রেডিওতে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা জানিয়ে দিল—আসামের প্রতি আমাদের সহানুভূতি রইল।

মাঝরাতের আকাশে একটি হেলিকপটর তীব্র আলোর ছটা ছড়িয়ে ঘুরিয়ে নীচের তেজপুরের চেহারা দেখতে থাকে, কেমন করে ছটফট করছে তেজপুর।

পথের জনতার মুখে আতঙ্কের রব—চীনা প্লেন! বোমা ফেলবে চীনারা!

পুলিস নয়, শিশির অমল আর আরও কয়েকটি ইয়েস ছেলে সারা শহর ছুটোছুটি করে বলে বেড়ায়—চীনা প্লেন নয়; আমাদের হেলিকপটর।

তেজপুরের ঘরে ঘরে রাতজাগা মানুষের প্রাণ ছটফট করে। পাড়ায় পাড়ায় বাড়ির দরজার কাছে ঘরের মানুষের জটলা আর অনিশ্চয় অদৃষ্টের গুঞ্জন—যাব কি যাব না? থাকতে পারা যাবে কি যাবে না? আর থাকা উচিত হবে কি?

গোটা পাঁচেক আতঙ্কিত সাইকেল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে যায়।—চীনা আইলো! চীনা আহি গইছে। চীনালোগ আ গিয়া! এসে পড়েছে চীনারা!

—কোথায়? কোথায়? কত দূরে? এক সঙ্গে শত লোকের শত মুখের করুণ প্রশ্ন হল্লা করে বেজে ওঠে।

—এই তো বালিপাড়ার কাছে এসে পড়েছে। আতঙ্কিত সাইকেলের ছুটন্ত ছায়া পাড়ার রাস্তা ছাড়িয়ে উধাও হয়ে যায়।

জগদীশ হিতেন আর আরও কয়েকটি ছেলে সাইকেল নিয়ে ছুটে ছুটে ভুল আতঙ্কের ঝড় শান্ত করতে চেষ্টা করে—না না, সব মিথ্যে কথা। বাজে কথা, ওসব গুজবে একটুও বিশ্বাস করবেন না।

—কিন্তু মশাই, এটাও কি একটা গুজব যে, টাস্কারের দল দুমদাম করে সব সরঞ্জাম আছড়ে ভেঙে পুড়িয়ে আর গুঁড়ো করে দিয়ে সরে পড়ছে?

জগদীশ বলে—শুনেছি, ওরা পালিয়ে যাচ্ছে।

—টাস্কার অফিসার-মেস তো একেবারে শূন্য। নয় কি? ওরা বোধ হয় কালকেই যঃ পলায়তি স জীবতি করেছে!

হিতেন হাসে—তাই তো মনে হয়।

পাড়ায় পাড়ায় মিলিটারীর অফিসারদের ভাড়া-করা এক-একটি বাড়ির ভিতরে নিঃশব্দ চুপি-চুপি ব্যস্ততা। লটবহর বাঁধাছাঁদা করে তৈরী হয়ে গিয়েছে অফিসারের দারা-সুত-পরিবার। হুস হুস করে মিলিটারীর জীপ আসছে, আলো মৃদু করে দিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে। অফিসারের প্রিয়-পরিজনে বোঝাই হয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে মিলিটারী জীপ।

—ও শিশিরবাবু, মিলিটারীর সব ফ্যামিলি যে চমৎকার সরে পড়ছে।

শিশির বিরক্তভাবে বলে—তা, কি আর করা যাবে বলুন।

—কিন্তু মুর্গীর খাঁচা আর মদের বোতলের বাক্সে বোঝাই হয়ে মিলিটারীর ট্রাকও যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে শুরু করেছে।

অমল—হ্যাঁ, দেখেছি।

—একবার খোঁজ নিলেই তো পারেন, আমাদের মেজর কর্নেল আর ক্যাপ্টেন মশাইরা আর্মি কোয়ার্টারে এখনও আছেন, না কেটে পড়েছেন?

শিশির—মনে হচ্ছে, এখনও আছেন।

—চম্পট দেবার তালে আছেন বোধ হয়।

শিশির—ঠিক বুঝতে পারছি না।

—জওয়ান মশাইরাও কি বোঁচকাবুঁচকি কাঁধে তুলে ফেলেছেন?

অমল—তাঁবু গুটিয়ে ফেলছে।

—এরাও কি বমডিলার টাইগারদের মত জঙ্গলে ঢুকে পড়বে?

অমল—সেটা আমি কি করে বলি? তবে শুনেছি; ওরা শিলিগুড়ির দিকে সরে পড়তে চায়।

—লজ্জার কথা! এই সব চম্পটপটু বীরদের জন্যেই না শীতের রাতে বাচ্চা ছেলেটার গায়ের উপর থেকে লেপ তুলে নিয়েছি আর দান করেছি। ছিঃ।

যাব কি যাব না? রাতজাগা সহরের স্বস্তিহীন প্রাণের আক্ষেপ আর প্রশ্ন ভোরের আলো দেখতে পেয়েও কোন ভরসার সংকেত দেখতে পায় না। বরং দেখা যায় এক রাতের মধ্যেই সহরের এখান-ওখান থেকে কেউ যেন এক একটা খাবলা দিয়ে মানুষের সাড়া তুলে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছে। নীরব হয়ে গিয়েছে বড়-বড় বাড়ি। গ্যারেজ খালি। এয়ারপোর্টের এপাশে-ওপাশে সব ডাঙ্গা জুড়ে প্রভুবিহীন মোটরকার ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দোকানে বেচা-কেনার সাড়া জাগে না, যদিও সকালবেলার রোদ তেতে উঠে বেলা বাড়িয়ে দিতে থাকে। সড়কের পাশে অলস হয়ে পড়ে আছে রিক্সার সারি। পানওয়ালার দোকানের ঝাঁপ অর্ধেক খোলা। কোর্ট কাছারী নিঝুম।

চক-বাজারের পথের জনতা হঠাৎ চমকে ওঠে, ও কি? কি বলছে মাইক?

—আপনা লোকে যেনে পারে টাউন এরি নিরাপদ ঠাঁই লৈ যাওক। আপনা লোকে যেনে পারে...। উচ্চকিত মাইকের স্বরে উপদেশ প্রচার করে করে চলে যাচ্ছে সরকারী পাবলিসিটির মোটর ভ্যান।

টলমল তেজপুর ভেঙে পড়ে। ধর বাস, ধর ট্রাক, ধর ট্রেন, চল ভোমরাগুড়ি ঘাট।

নেবাও উনানের আগুন, হাঁড়ি নামিয়ে রাখ, চল বেরিয়ে পড়।

গরুর গলার দড়ি খুলে দাও, থাক সাইকেলটা বারান্দাতেই পড়ে থাক, শুধু যা আছে একটা ছোট ঝোলাতে ভরে নাও। আর যদি পার তো সের দুয়েক চাল, কয়েকটা আলু আর নুন।

আরে, রেখে দাও এখন তোমার নিত্য-সেবার দেবী এই পিতলের জগদ্ধাত্রীটাকে; শিববাড়ির মন্দিরের দরজার কাছে রেখে দিয়ে চলে এস। ট্রাক না পাই হেঁটেই রওনা হব।

আঃ, মানুষ বসতে জায়গা পাচ্ছে না,
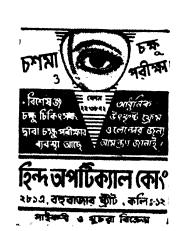
আপনি আবার আপনার টিয়ে পাখিটাকে ট্রাকে তুলছেন। উড়িয়ে দিন ওটাকে।

না মশাই, চলুন আমরা বরং ভোমরাগুড়ি হয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে চলে যাই। মঙ্গলদই যেতে হলে ধানসিরি ব্রিজের কাছে আটক হয়ে পড়ে থাকতে হবে। কেন জানেন তো? শোনেননি কিছু? আগে মিলিটারী পালাবে, তারপর আমরা সিভিলেরা। শীতলবাবুর ট্রাক বোকা হয়ে ফিরে এসেছে।

পুলিশ কোথায়? সরকারী কেস্টবিস্টুরা কোথায়? সবাই বুঝি ভাগীরথী হবার চেষ্টায় আছে। শুধু এই কয়েকটা ইয়েস ছোকরা আর কত ছুটোছুটি করে খাটবে?

না, ভোমরাগুড়ি ঘাটে খুব বেশি অসুবিধে হবে না। ওখানে ইয়েস ছেলেরা আছে। ওরা খুব যত্ন করে স্টীমারে তুলে দেয়।

একজন নিউমোনিয়া রোগী, তিনটি পোয়াতি মানুষ, আর একজন অন্ধ; আমাদের পাড়ার এই মানুষগুলোর কি গতি হবে, ও শিশিরবাবু? এরা যাবে কি করে?

শিশির—চিন্তা করবেন না। একটু অপেক্ষা করুন। আমরা ঠিক সময় মত এসে এদের ট্রাকে তুলে নিয়ে ভোমরাগুড়ির ঘাটে পৌঁছে দেব।

যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে চলে যেতে থাকে সহরের অসহায় প্রাণটার যত দুঃখ আক্ষেপ আর আতঙ্কের কলরব। ব্যাগ ঝোলা আর পোঁটলা হাতে নিয়ে বাড়ির মানুষ পথের উপর ছোট ছোট ভিড় হয়ে, আর ট্রাকের আশায় উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বিকেল ফুরিয়ে যায়, সন্ধ্যা ফুরিয়ে যায়, রাত হয়; তবু ওরা নড়ে না। সাড়া জাগে তখন, যখন এক-দুজন ইয়েস ছেলে ট্রাক নিয়ে এসে ডাক দেয়—চলে আসুন।

তেজপুরের এই রাত; কী অদ্ভুত একটা চঞ্চল-নির্লজ্জ কলোরাত। কত বাড়ীঘাড়ি খালি হয়ে গেল, নীরব নির্জন আর স্তব্ধ হয়ে গেল সহরটা!

সার্কিট হাউসে আলো নেই। থানাতে পুলিশ নেই। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, মেথর কেউ নেই। একলা রোগী বিছানায় শুয়ে ছটফট করে। জেলে কয়েদী নেই, ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পাগলা ফটক খুলে দেওয়া হয়েছে।

পদ্মপুকুরের কিনারায় মাঠের ঘাসের উপর দাউ-দাউ করে নতুন নোটের স্তূপ জ্বলছে আর পুড়ছে। ছায়া-ছায়া চেহারা, কারা যেন আসরে চারদিকের এক অন্ধকারে ভয়ানক এক গোপন উৎসবের মত সরকারী অফিসের ফাইল পোড়াচ্ছে। শেয়াল ডাকছে ব্রহ্মপুত্রের চরে।

আর, বড়লোকের বাড়ি হয়েও, গ্যারেজে দুটো গাড়ি থাকতেও, ভারতীর নীচের তলার বড়ঘরে রাতজাগা আলো জ্বলছে। এবাড়ির মানুষগুলি এখনও যায়নি।

সামনের সড়কের অন্ধকারের মধ্যে একটা জ্বলন্ত টর্চের আলো দুলছে। থেমে আছে হিতেনের সাইকেল। ভারতীর গেটের কাছে এগিয়ে এসে ডাক দেয় হিতেন।—এবাড়ির কেউ এখনও আছেন নাকি?

রাওবাহাদুর জবাব দেয়—আছে। কেন?

হিতেন—এখন তো চলে যাওয়াই ভাল।

আবার টর্চ দুলিয়ে আর সাইকেল ছুটিয়ে চলে যায় হিতেন।

কিরণলেখা বলেন—শুনলি তো শুক্তি। এখন চলে যাওয়াই ভাল।

শুক্তি—হ্যাঁ...আর একটুখানি থেকে যাই, মা।

যাবার জন্য তৈরী হয়েই আছে এবাড়ির সব মানুষ। যা-কিছু সঙ্গে নেবার ছিল, তার সবই দুই গাড়িতে তোলা হয়ে গিয়েছে। তবু যে রওনা হতে এত দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছু নয়; শুধু ওই শুক্তি।

মণিমালা তো অনেকক্ষণ হলো চোখ মুছে শান্ত হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু শুক্তি হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছে। যেন চলে যেতে বাধছে। যেন বিপদের সঙ্গে প্রাণটাকে জড়িয়ে নিয়ে বসে থাকাও একটা মায়ার খেলা। তাই বার বার অনেকবার শুধু ওই একটি কথা বলে এই চলে যাওয়ার ব্যস্ততাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে শুক্তি—যাচ্ছিই তো, কিন্তু একটু দেরি কর মণিমাসি।

মণিমালা—কিন্তু আর দেরি করা কি উচিত হবে? শহরে তো আর কেউ আছে বলে মনে হয় না।

সত্যিই কি তেজপুরের কোন ঘরে কেউ আর নেই?

আছে। নতুন পাড়ার শীতল বিশ্বাস আছেন; এই মাঝরাতে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে নড়বড়ে একটা পুরনো ট্রাকের চাকায় জল ঢালছেন। আর, রতন যেন একটা নতুন আশার কালো-ছায়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়; মাঝে মাঝে ডাকবাংলোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এক-একবার শিশিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। শিশির বলে—জ্বর গায়ে নিয়ে তুমি আবার এত রাতে মিছিমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? বাড়ি যাও রতন।

আছে; শীতল বিশ্বাসের মত আরও দু'চারজন এখনও আছে, যারা বুঝে নিয়েছে যে, রামেও মারবেন রাবণেও মারবেন, পালিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই।

আর আছেন তাঁরা, যাঁরা মুখ লুকিয়ে সরে পড়বার জন্য মাঝরাতের গভীর অন্ধকার-টার অপেক্ষায় এতক্ষণ আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

হেসে ফেলে শিশির—ওই দেখ অমল, দণ্ডমুণ্ডের একজন মহাপ্রভু বোধহয় চুপি-চুপি সরে পড়লেন।

ঠিকই, অগ্নিগড়ের উঁচু টিলার মাথাতে একটি সরকারী অফিসার-ভবনের জানালার আলো হঠাৎ নিভে গেল, আর সড়ক ধরে একটা গাড়ি আস্তে আস্তে গড়িয়ে এসে তারপর জোরে স্পীড নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

—কিন্তু ওখানে একটা গাড়ি যে পিছু-বাতি নিবিয়ে দিয়ে একেবারে চুপটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। চলতে চলতে কথা বলে অমল। গাড়িটার কাছে এসেই টর্চ ফ্ল্যাশ করে শিশির।

চমকে ওঠে অমল—আঁ? মাফলার দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে একটা বুদ্ধুর মত গাড়ির ভিতরে বসে আছে, কে ওটা?

শিশির বলে—তাই তো! এ যে দেখছি বিখ্যাত নেফা-অফিসার মিস্টার মনোহর লাল, নেফা যার জমিদারী। কথা বলতে গিয়ে শিশিরের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে।

গাড়ির বাম্পারের উপর একটা পা তুলে দিয়ে অমল চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার তো পালিয়ে গেলে চলবে না স্যার। আপনি চলে গেলে ইনার লাইন যে কেঁদে মরে যাবে।

কোন কথা বলেন না মনোহর লাল। একেবারে ধীর স্থির শান্ত বোবা একটি মাটির পুতুলের মত নিরীহ হয়ে গাড়ির সীটের কোণে বসে থাকেন। তারপর চমকে-চমকে আর কেঁপে কেঁপে এপাশ-ওপাশ করতে থাকেন, যেন একটা ভুতুড়ে হাত তাঁকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

হেসে ফেলে শিশির—যেতে দাও, অমল। চল, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

সরে আসে অমল। সঙ্গে সঙ্গে মনোহর লালের গাড়িটাও স্টার্ট নিয়ে নড়ে ওঠে। অমল বলে—তবে যান মিস্টার আই এফ এ এস! পদ্মশ্রী পেলে আমাদের স্মরণ করবেন।

ভাগিস পাওয়ার হাউসের কয়েকটি কাজের মানুষ পালিয়ে যায়নি; তাই এই মাঝরাতের তেজপুরের নিরেট অন্ধকারে ভরা সড়কের এখানে-ওখানে লাইটপোস্টের মাথায় কিছু আলো জেগে আছে। কিন্তু ওখানে, একটু দূরে, গাছতলার বিদঘুটে অন্ধকারটাকেই বেছে নিয়ে কয়েকটা অপ্রাকৃত প্রাণী সেখানে যেন ধস্তাধস্তি করছে। একটা গোঙানির শব্দও যে শোনা যায়; কেউ যেন কারও গলা টিপে ধরেছে। দৌড়ে এগিয়ে যায় শিশির আর অমল।

পাওয়ার হাউসের বুড়ো চাপরাশী বেচারাকে জাপটে ধরেছে একটা লোক। আর, একটা লোক এক হাতে বুড়োর মুখ চেপে ধরে বুড়োর জামা-কাপড় আর টাকা-পয়সা কাড়ছে। খাটো জাঙিয়া আর ছোট কোর্তা পরা রুক্ষ চেহারার দুটো জেল-ছাড়া কয়েদী।

অমলের হাতের স্টিকের বাড়ি খেয়ে সরে যায় কয়েদী দুটো। তারপর দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায়। বুড়োর হাত ধরে শিশির—ভয় নেই। কিন্তু এত রাত্রে বের না হলে কি চলতো না?

বুড়োকে বাজারের কাছাকাছি রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েই আবার ঘুরে যায় শিশির আর অমল।

এদিকের অন্ধকারে নয়, শহরের ওদিকে আমলাপটির রাস্তার একটা আলোরই কাছে একটা লোক যেন শক্ত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর, সামনেই একটা বাড়ির দরজার কাছে একটা জীপগাড়ি, জিনিসপত্রে বোঝাই। বাড়ির দরজা বন্ধ, জানালাও বন্ধ। কিন্তু জানলাটা মাঝে মাঝে একটু ফাঁক হয়, তার-পরেই যেন শিউরে উঠে বন্ধ হয়ে যায়।

শূন্য তেজপুরের এই ভয়ানক কালো মাঝরাত কি নিদারুণ এক কৌতুকের সুখে বিচার-অবিচারের হিসাব-নিকাশ করবার একটা খেলা দেখাতে চায়? তা না হলে এরকম এক-একটা ঘটনা এখানে-ওখানে চমক-ছবির মত দেখা দেয় কেন?

শক্ত পাথরের মত দেখতে ওই লোকটা হলো জেল-ছাড়া কয়েদী, কৈলাস। আর ওই যে জীপ জিনিসপত্রে বোঝাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ওটা পুলিশ লাইনের একটা জীপ। আর, মাঝে মাঝে বন্ধ জানালা ফাঁক করে কৈলাসকে দেখতে পেয়েই কাঁপা হাতে জানালা বন্ধ করে দিচ্ছেন যিনি, তিনি সেই উন্নতিময় পুলিশ অফিসার পরেশ ভট্টাচার্য, সরে পড়বার জন্য তৈরী হয়েও সরে পড়তে পারছেন না।

কিন্তু আর কতক্ষণ? বাড়ির বন্ধ দরজার কপাট খুলে বাইরে বের হয়ে এলেন পরেশ ভট্টাচার্য, পিছু পিছু পরেশ ভট্টাচার্যের স্ত্রী, যিনি উসকো-খুসকো মাথা আর শুকনো মুখ-চোখ নিয়ে, আর একটা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছেন।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে পরেশ ভট্টাচার্যের গলার স্বর ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাকে।—আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ। সাত দিনেরও বেশি হলো জ্বরে ভুগছে।

কৈলাসের চোখ, ইস্পাতের গুলির মত চকচকে শক্ত চোখ হঠাৎ যেন চুপসে নরম হয়ে যায়। কৈলাসের পাথুরে মাথাটাও দুলে ওঠে। মুখে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ছটফটে হাসি।

খাটো জাঙিয়া, গায়ে ছোট কোর্তা, কাঁধে বিড়ির আগুনে পোড়া ফুটো-ফুটো একটা কম্বল, কৈলাস যেন একজন যোগী পরম-হংসের মত ভঙ্গী ধরে চলে গেল। পরেশ ভট্টাচার্যের মুখের দিকে আর একবারও তাকালো না; একটি কথাও বললো না।

এদিকে ডাক বাংলোর গেটের কাছে হঠাৎ ছুটে গিয়ে রতনকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে নিল শিশির। আর, একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে অমলের পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন পলিটিক্যাল খোসলা সাহেব।

সরে পড়ছিলেন খোসলা সাহেব। গাড়ির ভিতরে সব জিনিসপত্র তুলেও ফেলেছিলেন। আর স্ল্যাক-পরা ও ঘাড়ছাঁটা অদ্ভুত চেহারার এক ফিরিঙ্গী তরুণী-নারীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠতেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু উঠতে পারেননি। কোথা থেকে ছুটে এসে খোসলা সাহেবের ঘাড়ে হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে রতন—ক্যারেক্টার! পিয়নকা ক্যারেক্টার তো বহুত খারাপ হ্যায়, লেকিন বড়া সাহেবকা ইয়ে কওনসা ক্যারেক্টার?

রতনকে ঠেলে ঠেলে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় শিশির।—ওর ক্যারেক্টার নিয়ে ওকে সরে পড়তে দাও, তুমি বাড়ি যাও।

রাগে ফুলে ফুলে গজগজ করে রতন। —আমার চরিত্র খারাপ বলে ইনি আমার চাকরি খেয়েছেন? এখন ওর চাকরি খায় কে?

অমল হাসে—ওর চাকরি কেউ খাবে না। ওটা গ্রেট ডেমোক্রেসির নিয়ম নয়। কিন্তু তুমি চল এখন।

কে জানে জগদীশ আর হিতেন এখন কোন্ দিকে ঘুরছে। হাসপাতালে রোগী

দুটোর কাছে এখন কে আছে? বিলাস আর বিভূতি বোধ হয়। কিন্তু লুটপাট করতে পারে, এমন কুমতলবের কিছু প্রাণী এদিকে-সেদিকে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে। টাউনটাকে একবার চক্কর দিয়ে ঘুরে দেখলে কেমন হয়?

নতুন পাড়াতে এসে শীতল বিশ্বাসের তোবড়া লক্কড় ট্রাকটাকে নিয়ে ঘুরতে থাকে শিশির আর অমল। স্টেট ব্যাঙ্কের কাছে হিতেন আর জগদীশকে দেখতে পেয়ে ট্রাকে তুলে নেয়। চেঁচিয়ে হাসতে থাকে জগদীশ।—আমার যে কেমন একটা রাজা-রাজা ভাব হচ্ছে হিতেন। তোমার হচ্ছে না বোধহয়।

হিতেন—না। আমার এখন এক পেয়ালা গরম চায়ের জন্য প্রাণটা ভিক্ষুক-ভিক্ষুক হয়ে রয়েছে।

মাধববাবুর শূন্য বাড়ির সামনের ঘরের দরজাটা খোলা; টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যায়, চা চিনি দুধ কেটলি টিপট আর পেয়ালা, সবই এক জায়গায় জড়ো হয়ে পড়ে আছে। কোন অসুবিধে নেই, শুধু জল গরম করে নিলেই পেয়ালা ভরে চা খেয়ে নিতে পারা যায়। শিশির বলে—না হিতেন, এখানে থামবো না। চল।

এস আই বি'র অফিসবাড়ি উত্তরায়ণ: [illegible] বিনা এ বৃন্দাবনও অন্ধকার। উত্তরায়ণের বারান্দাতে একটা বাছুর দাঁড়িয়ে আছে। সড়কের একটা লেটারবক্সের উপর একটা সাদা বিড়াল।

রবার বাগানের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ট্রাক থামিয়ে কি যেন দেখতে থাকে শিশির: নীরব নির্জন সড়ক ধরে এক বুড়ো ভদ্রলোক বিড়বিড় করে কথা বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন কোথায়?

ট্রাক থেকে নামে শিশির।—শুনছেন? কোথায় যাবেন আপনি?

—মহিম দস্তিদারের বাড়ি খুঁজছি।

শিশির—এই তো, এই যে সামনেই মহিমবাবুর বাড়ির ফটক।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি।

বুড়ো ভদ্রলোক ভারতীর ফটকের ভিতরে ঢুকতেই আবার ট্রাক ছুটিয়ে চলে গেল শিশির আর ইয়েস ছেলের দল।

ভারতীর বারান্দায় উঠে ডাক দেন বুড়ো ভদ্রলোক—কেউ আছেন নাকি?

রাজবাহাদুর এসে চেঁচিয়ে ওঠে।—মামাবাবু!

বড় ঘরের দরজা খুলে কিরণলেখা আর মণিমালা বাইরে এসে চমকে ওঠেন—মেজদা!

শুক্তি এসে হেসে ওঠে।—কি আশ্চর্য, দুলাল মামা এসেছেন? দেখলে তো মণি-মাসি, আমি দেরি করিয়ে দিলাম বলেই না দুলাল মামাকে ফিরে পাওয়া গেল?

সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে দুলাল দত্ত হাসেন।—পাগলী ফটক খুলে দিয়েছে, না এসে উপায় কি?...আচ্ছা, আমি এখন একটু জিরিয়ে নিই, কি বল কিরণ?

শুক্তির মুখের হাসিটা এইবার যেন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—এখন আর জিরোতে পারবেন না, দুলাল মামা।

—কেন?

—এখন তেজপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে! আমরা সবাই যাব।

—কেন? তোমরাও সবাই অবাঞ্ছিত হয়ে গেলে নাকি?

—একরকম তাই।

—শুনলাম, নেফা থেকেও নাকি অবাঞ্ছিত হয়ে দলে দলে সবাই চলে আসছেন।

—আমিও শুনেছি। আপনি কিন্তু এখন আমাদেরই সঙ্গে যাবেন।

—তা মন্দ হয় না।

বাইরে আসেন গগন বসু।—আমিই স্টিয়ারিং-এ বসি। শুক্তি আমার পাশে বসুক।

শুক্তি—আমিই ড্রাইভ করি, বাবা।

গগন বসু—না, আমিই পারবো। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও তোর চেয়ে কিছু কম নয়।

কালোর মা বলেন—আমি তাহলে শিব-বাড়ির মন্দিরে...।

মণিমালা আর কিরণলেখা এক সঙ্গে ধমক দেন।—বাজে কথা বলো না, কালোর মা। চুপ করে গাড়িতে উঠে পড়।

রাজবাহাদুর ডাকে—বাবা আসুন।

মহিমবাবু তাঁর পায়ের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন, এগিয়ে যান, গাড়িতে উঠেই চোখ বন্ধ করেন।

ভারতীর ফটক খোলা রেখে দিয়েই ছুটে বের হয়ে গেল দুই গাড়ি। এখান থেকে বের হয়ে, তারপর নর্থ ট্রাংক রোড ধরে এগিয়ে...তারপর দেখা যাক, কোথায় কত-দূরে গিয়ে থামা যায়। মঙ্গলদই পৌঁছতে পারলে নরেশ কাঞ্জিলালের বাড়িতে কিছুক্ষণ রেস্ট নিতে পারা যাবে।—নরেশ কাঞ্জিলালকে চিনলি তো, শুক্তি?

শুনতে পায় না শুক্তি। শুক্তির শূন্য মনটা যেন মানুষের পরিত্যক্ত ওই তেজপুরের ভয়ানক কালো মাঝরাতের অন্ধকারের মধ্যেই পড়ে আছে।

গগন বসু ডাকেন—শুক্তি।

যেন ধড়ফড় করে জেগে উঠে জবাব দেয় শুক্তি—কি বলছো, বাবা?

গগন বসু বললেন—আমাদের বাগানের মেশিনারী সাপ্লাই করে কলকাতার যে কাঞ্জিলাল অ্যান্ড সন্স, তারই মালিক নরেশ কাঞ্জিলাল।

[একুশ]

ফিরে চল ঘরের টানে! একদিন, দুদিন, তিনদিন; তারপরেই পাল্টে গেল নাটকের সীন। পালিয়ে যাবার স্রোত এইবার যেন ফিরে আসার স্রোত হয়ে শূন্য দহ ভরে ফেলতে শুরু করেছে। ফিরে আসছে তেজপুরের লোক।

তেজপুরের ভাগ্যটাও বোধ হয় সেই সার্কাসের মেয়েটার মত একটা মেয়ে, তারের উপর নাচছে। একবার ওদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে ওদিকে চলে যায়, আবার এদিকের ক্লাউনের হাতছানিতে এদিকে ফিরে আসে।

ট্রেন ভর্তি হয়ে, স্টীমার ভর্তি হয়ে, আর চারদিকের যত সড়ক ধরে ছুটন্ত জীপ-ট্রাক-বাস আর মোটরকারে ভর্তি হয়ে চলে আসছে তেজপুর সহরের পলাতক প্রাণের কল্লোল।

চীনেরা যুদ্ধ-ক্ষান্তি ঘোষণা করেছে। বলেছে, ওরা আর এগুবে না। কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে যেতে শুরু করবে। কিন্তু সর্ত এই যে...।

প্লেন-ভর্তি হয়ে উড়ে উড়ে আসছেন যত পলাতক সম্পত্তিময় প্রাণ। এয়ারপোর্টের কাছে অনাথ হয়ে পড়েছিল যত মোটরকার, তারা আবার সনাথ হয়ে আর খুশি-হর্নের হর্ষ তুলে বড়-বড় বাড়ির গ্যারেজে ফিরে এসেছে আর আসছে।

দোকান-পাট খুলছে। ঘরে ঘরে উনানের ধোঁয়া। ছাড়া গরুর গলায় আবার দড়ি পড়েছে। আর পাব্লিকের মরেল বুস্ট করবার

জন্য নেতা, ভি আই পি আর মন্ত্রীও আসতে শুরু করেছেন। সার্কিট হাউসের খানসামার হাতে ট্রে-ভরতি পেয়ালাতে আবার গরম চা টলমল করে।

শিলিগুড়ি থেকে মিলিটারীর ট্রেন এসে পড়েছে। কোর হেডকোয়ার্টারে অফিসারের ব্যস্ততা উঁকি-ঝুঁকি দেয়। ময়দানে সকাল-বেলার রোদে জওয়ানের প্যারেড মচমচ করে।

কি আশ্চর্য! হাসপাতালে ডাক্তার, পুলিশ লাইনে পুলিশ, আর আদালতে ম্যাজিস্ট্রেট! তেজপুরের মানুষের চোখে দৃশ্যটা যেন ডি এল রায়ের কবিতার কথার মত একটা বল-কি-হে বিস্ময়!

মঙ্গলদই-এর কাঞ্জিলাল মশাই একটা জেদ করে ভালই করেছিলেন, গগন বসুকে আর তাঁর সঙ্গের সবাইকে শুধু দু'চার ঘণ্টার রেস্ট নিয়েই চলে যেতে দেননি। পুরো তিনটে দিন সবাইকে খুব যত্ন-সমাদর দিয়ে প্রায় বন্দী করেই রেখেছিলেন।—এখান থেকে আবার এত তাড়াতাড়ি সরে যাবার কি দরকার, গগনবাবু? কিছুদিন থেকেই যান না কেন? সরে যাবার হলে আমাদেরও তো সরে পড়তে হবে।

কিন্তু রেডিও, খবরের কাগজ আর মঙ্গল-দই-এর রাস্তার হল্লা একটা নতুন খবর ছড়িয়ে দিতেই হেসে উঠেছিলেন কাঞ্জিলাল মশাই—এখন আপনাদের তাহলে তেজপুরেই ফিরে যাওয়া ভাল, গগনবাবু।

হ্যাঁ, তাই আর দেরি করেননি, ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হলেন কদমবাড়ির গগন বসু, কিরণলেখা আর শুক্তি। তেজপুরের মহিমবাবু, মণিমালা, কালোর মা আর রাজবাহাদুর। আর একজন মানুষ, নেফার এক আকা গাঁয়ের পাশে আর বনসুমের জঙ্গলের ছায়ার কোলে যাঁর নিঃস্ব জীবনের একমাত্র শখের বাসাঘর, বাঁশ-বাখারির একটা ঘর এখনও নড়বড় করছে কিনা কে জানে, সেই দুলাল দত্ত তাঁর সাদা মাথায় হাত বুলিয়ে আর বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বলেন, —আবার তেজপুর!

ফিরে যাবার টানে আবার দুটি মোটর গাড়ি সকালবেলার রোদে ছুটে ছুটে আর ধুলোমাখা হয়ে তেজপুরে ফিরে আসে, আর রবার বাগানের ভারতীর খোলা ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকেই যেন রেস্ট ফিরে পাওয়ার সুখে অলস হয়ে থেমে যায়।

দোতলাতে শুক্তির ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যেয়েই চেঁচিয়ে হেসে ওঠে শুক্তি—আশ্চর্য মণিমাসি, আমার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে। নিবিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম নাকি?

মণিমালার সারা মুখ জুড়ে আর-একরকমের খুশির হাসি থমথম করে—ওঘরের ঘড়িটা এখনও কেমন টিক-টিক করে বেজে চলেছে, শুনেছিস শুক্তি?

শুক্তির ঘরের টেবিলে দোয়াতের কালিও শুকিয়ে যায়নি, কলমটাও ঠিক সেখানেই পড়ে আছে, আর চিঠি লেখার কাগজের প্যাডও আছে।

এখন একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপাটাকে খুলে ফেলতে, তারপর একটা হাঁপ ছেড়ে নিয়ে কোচের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার আগে জোড়হাটে প্রণবকাকার কাছে চিঠিটা লিখে ফেলাই ভাল।

কালোর মা যখন চা খাওয়ার জন্যে শুক্তিকে ডাকতে আসেন, তার আগেই শুক্তির চিঠি-লেখা শেষ হয়ে যায়। খুব বেশি কথা লেখবার তো কিছু নেই।—আপনি শুধু খোঁজ নিয়ে জানাবেন কাকা, আপনাদের নতুন প্লেটুনের হাবিলদার সুজিত রায়, বমডিলাতে পোস্টিং হয়েছিল যার, সে এখন কোথায়? ফিরে এসেছে কি?—প্রণতা শুক্তি।

রবার বাগানের ভারতীর দোতলার একটি ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আর উঁকি দিয়ে তেজপুরের জীবনের কতটুকুই বা দেখতে চিনতে আর শুনতে পারা যায়, আবার কি-রকমের মুখর উপকথায় ভরে গিয়েছে তেজপুর? আর নেফার পাহাড়ের শুধু ওই মেঘলা রঙের চেহারাটাকে দেখেই বা কি আর কতটুকু বুঝতে পারা যাবে, ওখানে ঝুমের আগুনে পোড়া ক্ষেতের মাটির শক্ত ঢেলা ভাঙতে গিয়ে দফলা মেয়ে রেনকি এখনও রতনকাকার জন্যে কেঁদে উঠছে কিনা? নেফার পাহাড়, চীনাদের দাপটে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা জড়তার পাহাড়। সত্যিই, একটা নিরেট বোবা পাথরের পাহাড়।

খবরের কাগজে বিবৃতি হয়ে ছাপা হবার জন্যে কী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এক-একটি ত্যাগ সাহস আর কর্তব্যনিষ্ঠার গল্প। টেলিফোনে ডেকে ডেকে আর গাড়ি পাঠিয়ে হোটেলে-হোটেলে প্রেসের মানুষ খুঁজছেন ও'রা, বিবৃতি দেবার জন্য উন্মুখ কয়েকটি সিভিল মিলিটারী আর পলিটিক্যালের অফিসারী পৌরুষ। কাগজে ছাপার হরফের গল্প পড়ে তেজপুরের মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়, অফিসার মনোহর লাল সারারাত জেগে একাই হাসপাতাল পাহারা দিয়েছেন; মাঝে মাঝে রোগীদের মুখে জল দিয়েছেন। আর সিনহা সাহেব একা বন্দুক হাতে নিয়ে সারারাত টেলিগ্রাফ অফিসের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। পুলিসের ভট্টাচার্য তাঁর অফিসের টেবিলের উপরেই সারারাত শুয়ে-ছিলেন, এক পা'ও নড়েননি।

কিন্তু ওরা কোথায়, যারা শূন্যনগর তেজ-পুরের দুটো ভয়ানক কালো রাতে রাজা-রাজা হয়ে ঘুরে বেড়ালো? ওরাও আছে বইকি। কিন্তু থেকেও নেই। ওরা আবার সেই সামান্য সাধারণ পুরনো ছায়া হয়ে গিয়েছে। প্রাইমারী স্কুলের হাজিরা খাতার

দিকে তাকিয়ে হিসেব করে শিশির, আর কতজন ছাত্রের ফিরে আসতে বাকি আছে। সামনের টেস্ট পরীক্ষার ভয় ভুলতে গিয়ে সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে হাউসের বারান্দায় ঘুরে-ঘুরে করে হিতেন। অমল আর জগদীশ বাস-ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে পান খায় আর গল্প করে।—আজ আবার ডোগরা রেজিমেণ্টের কিছু লোক বের হয়ে চারদুয়ারে পেঁছেছে।

—তুমি আজ চারদুয়ার গিয়েছিলে নাকি?

—হ্যাঁ। বমডিলা থেকে ওরা জঙগলে-জঙগলে দিনরাত হেঁটেছে, এক মুঠো ছোলাও খেতে পায়নি, মাঝে মাঝে শুধু বুনো কলা পুড়িয়ে খেয়েছে; শীতে মুখের চামড়া ফেটে গিয়েছে, পায়ের ফোস্কা ঘা হয়ে গিয়েছে। ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতো, কথা বলতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়ছে, দেখলে মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়।

লোখরা থেকে প্রণব কাকার চিঠি আসতে খুব বেশি দেরি হলো না। শুক্তিকে শুধু সাতটা দিনের অপেক্ষা সহ্য করতে হয়েছে।

ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চিঠি পড়ে শুক্তি। হাতটা চমকে চমকে কাঁপতে থাকে। তারপর শুক্তির দুই চোখ যেন অন্ধের দুটো নকল চোখের মত চকচকে পাথর হয়ে নেফার পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লিখেছেন প্রণবকাকা।—কোন খবর নেই, শুক্তি। তবে বুমলাতে আমাদের আসাম রাইফেলের পোস্টের কী দশা হয়েছে, সেটা অনুমান করতে অসুবিধে নেই। হয় সবাই মরেছে; নয়, কিছু মরেছে কিছু বেঁচেছে। যদি কিছু লোক বেঁচে থাকে, তবে তারাও হয় চীনাদের হাতে সবাই বন্দী হয়েছে, নয় কিছু বন্দী হয়েছে, কিছু পিছনে সরে আসতে পেরেছে। যদি কিছু লোক পিছনে সরে আসতে পেরে থাকে, তবে তারাও শেষে নিশ্চয় স্ট্র্যাগ্‌ল্ আউট করেছে।

শুক্তির দুই ঠোঁটও যেন শক্ত পাথর হয়ে গিয়েছে, কোন করুণ আক্ষেপও তাই বিড়বিড় করে উঠতে পারে না। শুধু মাথাটা যেন রাগ করে করে জ্বলছে আর বলছে—সবাই মরেছে, বাঃ, তার মানে সুজিতও মরেছে। মরলেই হলো। এত সহজে মরে গেলেই হলো? চালাকী? অসম্ভব! একটুও বিশ্বাস করা উচিত নয়।

চিঠিটাকে শক্ত মুঠোর চাপে দুমড়ে-মুচড়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয় শুক্তি।

চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছে? হোক না। মন্দ কি? একদিন তো ফিরে আসবে। ফিরে এসে না হয় আবার লড়তে যাবে।

স্ট্র্যাগ্‌ল্ আউট করেছে? তাহলে তো ভালই করেছে। না করে উপায়ই বা কি? জঙগলে জঙগলে গা-ঢাকা দিয়ে আর দিশে-হারা পথে ঘুরে ঘুরে অনেক কষ্ট পাবে। তবু তো একদিন ঘরে পৌঁছে যাবে। হাত-পা না ভাঙলেই হলো।

তবে কি সুজিত সত্যিই ফিরে আসছে? নিশ্চয় আসছে।

কিন্তু ফিরে আসতে আর কত দেরি করবে সুজিত? আর কাউকে ভাল করে না চিনুক সুজিত, অন্তত ওর কাকিমাকে তো ভাল করে চেনে। ভেবে ভেবে কত ছটফট করছেন ওর কাকিমা বেচারা, সেটা সুজিতের মত মানুষের পক্ষে ভুলে থাকা সম্ভব নয়। সুজিতের মনও সে-রকম নয়। তবে আর দেরি না করে চলে এলেই তো পারে। কিন্তু দোষ দিয়ে লাভ নেই; নিশ্চয় ইচ্ছে করে দেরি করছে না। যা বিশ্রী পাথর জঙগল আর পোকা-মাকড়ে ভরা ওই নেফা।

কিরণলেখা এসে বেশ একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞেস করেন—জোড়হাট থেকে তোর প্রণব কাকার চিঠি এসেছে মনে হলো?

শুক্তি—হ্যাঁ।

কিরণলেখা—কি লিখেছে? সুজিতের খবর কি?

শুক্তি—হয়তো মরেছে; কিংবা...।

কিরণলেখা শিউরে ওঠেন—ছি, ওরকম ভয়ানক বাজে কথা হয়তো করেও বলতে নেই!

শুক্তি—প্রণব কাকা যা লিখেছেন, আমি তাই বলছি। হয়তো বেঁচে আছে। বেঁচে থাকলে চীনাদের হাতে বন্দী হয়েছে কিংবা লুকিয়ে জঙগলে জঙগলে হাঁটা দিয়ে চলে আসছে।

কিরণলেখা—তাই বল! তাই যেন সত্যি হয়। তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক ছেলেটা।

চলে গেলেন কিরণলেখা। বললে একটু খারাপ শোনায়, তাই শুক্তিকে একটা কথা বলতে পারলেন না। তাই পাশের ঘরে গগন বসুর কাছে গিয়ে কথাটাকে বলেই ফেলেন কিরণলেখা।—এটা তো একরকম খবর পাওয়াই হলো।

মরে-টরে যাওয়া, চীনাদের হাতে বন্দী হওয়া, আর জঙগলে-জঙগলে লুকিয়ে চলে আসা; এই সবই তো এক-একটা খবর। সুজিত ছেলেটার ভাগ্যে নিশ্চয় এই তিন খবরের কোন একটা খবর হয়ে গিয়েছে।

গগন বসু—কিন্তু কোন্ খবরটা ঠিক?

তবে তো এই দাঁড়ায় যে, সুজিতের ভাগ্যের একটা ঠিক খবর যেদিন মুখর হয়ে উঠবে, সেদিন শুক্তির মনের ইচ্ছাটাও মুখ খুলবে। তার আগে নয়। এটাই বা কেমনতর কথা। ওরকম একটা খবরের অপেক্ষা করে করে শুক্তির ভাগ্যটাও কি দিনের পর দিন অচল হয়ে পড়ে থাকবে?

শুক্তি কিন্তু ভাবতে ভুল করে না। না, এরকম করে শুধু একটা আগুনিক আওয়াজ শোনবার জন্যে কান পেতে আর চুপ করে বসে থাকবার কোন মানে হয় না। শুক্তির প্রাণটা কি রাতের রেলগাড়ি যে, কেউ একজন এসে সবুজ বাতি দুলিয়ে দেবে, তবে চলতে শুরু করবে? শুক্তির মনের আক্ষেপটা মাঝে মাঝে হেসেই ফেলে।

মণিমালা জিজ্ঞেসা করেন একদিন—তুই তো এখনও কিরণদিকে ঠিক করে কিছু বললি না, শুক্তি। আমরা সবাই যে আশা করে তৈরী হয়ে রয়েছি।

শুক্তি—কি বললে?

মণিমালা—মাঘ হলে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যায়; না হয় ফাল্গুনেই হলো। কিন্তু তুই বলবি তো?

শুক্তি—বলবো।

মণিমালা—কিন্তু তুই নাকি বলেছিস যে...।

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ বলেছি, কিন্তু তার মানে তো এ নয় যে, আমি একটা খবরের সঙ্গে চুক্তি করে বসে আছি। খবর পেলে পাওয়া যাবে, না পেলে পাওয়া যাবে না।

মণিমালা—তাহলে...।

শুক্তি—প্রণব কাকাকে আর-একটা চিঠি দিয়েছি। সে চিঠির জবাব আসুক। তার পর...।

মণিমালা—তারপর কি?

মণিমালার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে হাসতে থাকে শুক্তি—তারপর যা বলবার বলেই দেব। তুমি এখন যাও তো মণিমাসি।

কিন্তু জোড়হাট থেকে প্রণব কাকার চিঠির আশায় চুপ করে বসে থাকতেও যে ভাল লাগে না। বার বার শুধু মনে হয়; এতদিনে নিশ্চয় এসে পড়েছে সুজিত। শুধু ওর খবর জানবার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয় বলেই সুজিত একটা অচেনা বস্তুর মত কোথাও পড়ে আছে। কে জানে কুমুদ ডাক্তার এখন কোথায় আছেন? সুজিতের কাকিমাই বা কোথায়? ওঁরা কিছু জানতে পেলেন কি না পেলেন, সেটাও তো জানবার কোন উপায় নেই।

ও দৃশ্য দেখলে যে চোখ জ্বলে যায়। নেফার পাহাড়ের উপর দিয়ে কত হেলি-কপ্টর রোজই আসছে। রাজবাহাদুরও রোজ সেই একই কথা বলছে; আওরভি আয়া, আওরভি জখম জওয়ান লোগ আ রহা।

কিন্তু নাম-ধাম জানবার তো কোন উপায় নেই। অদ্ভুত এক সিকিওরিটি ওদের কম্বলে জড়িয়ে আর আড়ালে আড়ালে সরিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

শুক্তির ইচ্ছের জেদ সহ্য করতে গিয়ে রাজবাহাদুরকে একদিন লোখরা ঘুরে আসতে হলো। না, লোখরাতে এখনও কোন ফিরতি জওয়ান পৌঁছেনি। হাবিলদার সুজিত রায়ের খবরও কেউ বলতে পারেনি। রাজ-বাহাদুরের পুরনো বন্ধু, জমাদার ধনরাজ লিম্বু খুব জোরে মাথা কাঁপিয়ে আক্ষেপ করেছে, না, আর ভাবনা করবার কিছু নেই। গঙ্গাপানি পি লিয়া হাবিলদার সুজিত।

—কি বললে রাজবাহাদুর? শুক্তির গলার স্বর শিউরে ওঠে।

রাজবাহাদুর—জমাদার লিমবু বোলতা হ্যায়, বুমলাওয়ালা জওয়ান লোগ সব খতম হো গিয়া।

—যত সব মিথ্যে কথা। মাথামুণ্ডু নেই বাজে কথা।

সরে যায় শুক্তি। রাজবাহাদুর যা বলছে, সেটা তো একটা নিরেট অজ্ঞতার মন-গড়া যত জল্পনার রক্তমাখা উল্লাস। জঘন্য। শুনলে যেন কান দুটোও ঘিনঘিন করে।

সরে গিয়েও কোথাও কিন্তু শান্ত হয়ে বা শ্রান্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না শুক্তি। ঠিক খবর যে পেতেই হবে। চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না!

নীচের তলায় নেমে গিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডাকাডাকি করে শুক্তি।—হ্যালো...পি টি আই...আপনি পি টি আই? মিস্টার গাঙ্গুলী?

—হ্যাঁ।

—আপনি নিশ্চয় বলতে পারবেন, স্ট্র্যাগলার যারা চলে আসতে পেরেছে, তাদের নাম কেমন করে জানা যায়?

—এখন জানবার উপায় নেই। ডিফেন্স মিনিস্ট্রি যেদিন জানাবেন, সেদিন জানতে পারা যাবে, তার আগে নয়।

—যারা আসছে, কিন্তু এখনও পৌঁছতে পারেনি, তাদের নামও কি জানতে পারা যায় না?

—এটা কি-রকমের কথা বললেন? হেসে ফেলেন গাঙ্গুলী।

—আমি বলছি, যারা চলে আসতে পেরেছে, তারা তো বলতে পারে, আর কে কে আসছে, কোথাও তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে থাকতেও তো পারে।

—তা হয়তো হয়েছে। তাহলে আপনি একটা কাজ করুন। কাউকে চারদুয়ারে পাঠিয়ে খোঁজ নিতে চেষ্টা করুন। শুনেছি, সেখানে রাজপুত রেজিমেন্টের কিছু লোক এসেছে।

—আমি আসাম রাইফেলের একজনের খবর চাইছি।

—তাহলে বরং আপনি আজই কাউকে রাঙ্গাপাড়া পাঠিয়ে দিন। আসাম রাইফেলের একজন ডাক্তার, ডাক্তার চক্রবর্তী সেখানে আজ তিন-চারদিন হলো এসেছেন। শুনেছি, তিনি স্ট্র্যাগল্ করে প্রায় একুশদিন পরে খুব কাহিল অবস্থায় রাঙ্গাপাড়াতে পৌঁছেছেন।

—রাজবাহাদুর! তুমি কোথায়? ডাকতে থাকে শুক্তি।

—জী হ্যাঁ, দিদি; বলুন।

শুক্তি—তোমাকে এখনই একবার রাঙ্গাপাড়া যেতে হবে।

—বোহোৎ আচ্ছা।

শুক্তির সব উপদেশ আর নির্দেশ মনে দিয়ে শুনে নিয়ে রাঙ্গাপাড়া রওনা হয়ে যায় রাজবাহাদুর।

সবই দেখতে আর শুনতে পান কিরণলেখা। শুক্তি যেন মরিয়া হয়ে একটা ব্যাকুল ব্যস্ততার খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। আর ছুটে ছুটে হয়রান হচ্ছে বেচারা রাজবাহাদুর।

সারাদিনের মধ্যে অন্তত একবার টেলিফোন করে পি টি আই-এর গাঙ্গুলীকে বিরক্ত করা আর জেনে নেওয়া, নেফার জংলী বাধা ভেদ করে কে কোথায় ফিরে এল। তারপর রাজবাহাদুরকে একবার তাড়া দিয়ে দৌড় করানো—যাও, রাজবাহাদুর। শুনে এস, কী বলে ওরা, কোন খবর দিতে পারে কি না?

যাও রাজবাহাদুর, আজ একবার ফুটহিলের ক্যাম্পে গিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে এস। আজ একবার চারদুয়ারে যেতে হবে রাজবাহাদুর। আজ একবার এল বি রোডে সামন্তবাবুর বাড়িতে যাও। একজন ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন রায় এখন সে বাড়িতে আছেন। নেফার ভেতর থেকে এই তিন দিন হলো বের হয়ে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞেসা করে এস তো, কোন খবর দিতে পারেন কিনা।

আরও দুদিন দুবার দু' জায়গাতে গিয়ে আর খোঁজ নিয়ে ফিরে এসেছে রাজবাহাদুর। শুধু শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে রাজবাহাদুর। যার খবরই নেই, তার খবর দেবে কে? আপনি ঝুটমুট এত তকলিফ করছেন, দিদি।

অনেক গল্প এনে দিয়েছে রাজবাহাদুর। আর কত আনবে? ডাক্তার চক্রবর্তীর গা বিছুটির ঘসা খেয়ে খেয়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। একটা পাথরের খাড়াই টপকাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন, বাঁ পায়ের দুটো আঙুল ভেঙে গিয়েছে।...কিন্তু সুজিত হাবিলদার নামে কারও খবর তো আমি জানি না। তবে সেলা থেকে সরে আসবার আগে শুনেছিলাম, আমাদের বুমলা পোস্টের কয়েকজন জওয়ান রিট্রিট করতে পেরেছিল।

ক্যাপ্টেন রায় বলেছেন—আমাদের খুব বেশি অনাহার সহ্য করতে হয়নি। বুঝলাম না, সানাস বস্তির আকারা আমাদের কেন এত সাহায্য করলো। মজার ব্যাপার: পাকা চুলে ভরা সাদা মাথার এক সুবেদারকে দেখে ওরা দুলাল দুলাল বলে ডেকে খুব যত্ন করেছে। মকাই চাল মাংস, যা যোগাড় করতে পেরেছে, তাই এনে ওরা আমাদের খাইয়েছে। আমাদের অনেক লোককে ওরা ওদের জামা-কাপড় পরিয়ে ঘরে লুকিয়ে রেখেছিল। চীনেরা দেখেও কিছু বুঝতে পারেনি।...হ্যাঁ, বেশ কষ্ট হয়েছিল পিঙ্গোলি রোড হেড পর্যন্ত পৌঁছতে। সারা রাত ধরে বেতের জঙ্গল কেটে কেটে সাফ করে রাস্তা করা, আর আগুন জেলে হাতি খেদানো।...কিন্তু আসাম রাইফেলের কারও সঙ্গে তো আমার দেখা হয়নি। শুনেছি, বুমলার কেউই সরে আসতে পারেনি।

চারদুয়ার ক্যাম্পের রাজপুত রেজিমেন্টের নায়েক কুন্দন সিং বলেছে, হ্যাঁ শুনেছি, বুমলাতে আসাম রাইফেলের একজন হাবিলদার একা দাঁড়িয়ে আর এল এম জি নিয়ে কভারিং ফায়ার রেখেছিল; কিন্তু সে কি আর আছে?

ফুটহিলস-এর এক ক্যাম্পের কাছে গিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আর অনেক চেষ্টা করেও কিছু জানতে পারেনি রাজবাহাদুর। ক্যাম্পের বাইরে একজন সুবেদারকে জিজ্ঞেসা করতেই তিনি বড়-বড় চোখ করে চমকে উঠেছেন—

বুমলা? আসাম রাইফেলকা হাবিলদার? বাস্, আওর কুছ পুছিয়ে নেহি। নমস্তে!

বাস, তবে আর কি? এইবার একটা উড়ন্ত হেলিকপটরের দিকে তাকিয়ে, আর হাত তুলে একটা নমস্তে জানিয়ে দিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেই তো হলো। ডেড বডি কোলে নিয়ে আর উড়ে-উড়ে খবরহীন জগতের মেঘের ভিতরে চিরকালের মত মিলিয়ে যাক হেলিকপটর। শুক্তির প্রাণটাও এই অদ্ভুত মিথ্যে ব্যস্ততার সব ধুলো ধুয়ে-মুছে দিয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কিন্তু সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতেই শুক্তির মনে যেন একটা পাগল-পাগল শখের লোভ ছটফট করে হাসতে থাকে। একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন? মা বলবেন, তোর মাথা খারাপ হয়েছে। বাবা বলবেন, ওখানে সিকিওরিটির নিষেধ আছে, কাছে যেতে পারবি না, জেনে শুনে মিথ্যে হয়রান হবার দরকার কি? মণিমাসি বলবেন, এতদিন পরে আজ আবার হঠাৎ ছুটোছুটি করবার ইচ্ছে হলো কেন?

শুক্তি—রাজবাহাদুরকে একবার বলে দাও, মণিমাসি।

মণিমালা—কি বলবো?

শুক্তি—আমি একবার বের হব।

কিরণলেখা—কোথায় বের হবি?

শুক্তি হাসে—একবার এয়ারপোর্ট ঘুরে আসি।

মণিমালা—এয়ারপোর্ট কি বেড়াবার জায়গা?

শুক্তি—বেড়াতে তো যাচ্ছি না, শুধু একটু দেখতে যাচ্ছি।

কিরণলেখা—কী দেখবার আছে সেখানে?

শুক্তি—রাজবাহাদুর বললে, ফুটহিলের ক্যাম্প থেকে ট্রাকে করে জখম জওয়ানদের এয়ারপোর্টে আনছে আর প্লেনে তুলে দিচ্ছে।

কিরণলেখা—ওটা কি দেখবার মত একটা চমৎকার দৃশ্য?

শুক্তি—আমি ভাবছি, হঠাৎ যদি সুজিত বাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

কিরণলেখার কথাগুলি বেশ রুক্ষস্বরে বেজে ওঠে।—কী অদ্ভুত তোমার শখ। দেখে এসো তাহলে।

অদ্ভুত শখ নয়; জাগা-চোখে স্বপ্ন দেখবার অদ্ভুত বাতিক। মিথ্যে বলে বুঝতে পেরেও দেখতে ভাল লাগে। এয়ারপোর্টে গিয়েও কিছু দেখতে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। একটা ট্রাকের ভিতর থেকে ব্যান্ডেজ-বাঁধা মাথা তুলে সুজিত উঁকি দিয়ে তাকাবে, এটাও একটা মিথ্যে আশা। কেউ কাউকে দেখতে পাবে না, তবু এয়ার-পোর্টের বাতাসে প্রতিধ্বনির মত একটা শব্দ বেজে উঠবে, আমি এসেছি; এমন চমৎকার একটা ম্যাজিক ব্যাপারও সম্ভব নয়। তবু সত্যিই যে একবার ঘুরে আসতে ইচ্ছে করে। কত খোঁজই তো মিথ্যে হয়ে গেল, না হয় এই শেষ খোঁজও মিথ্যে হয়ে যাবে।

শুক্তি বলে—আমি শুধু একটা চান্স নিচ্ছি মা। জানি কিছুই দেখতে পাওয়া যাবে না, তবু যদি হঠাৎ......।

হেসে ফেলেন কিরণলেখা—যাও, কিন্তু ফিরতে দেরি করো না।

[বাইশ]

শুক্তি বলে—একটু আস্তে চল রাজবাহাদুর।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড মৃদু করে দেয় রাজবাহাদুর। শুক্তি যদি না বলতো, তবে রাজবাহাদুর বোধহয় সামনের ওই দুই মিলিটারী ট্রাকের পাশ কাটিয়ে সবেগে এগিয়ে চলে যেত।

তাঁবুর মত করে ছাউনি দিয়ে ঢাকা দুটো ট্রাক আস্তে আস্তে এয়ারপোর্টের দিকে চলে যাচ্ছে। পিছনে শুক্তির গাড়ি। দেখতে অসুবিধে নেই, বুঝতেও অসুবিধে নেই, কয়েকজন জখম সৈনিককে বয়ে নিয়ে চলেছে এই দুই ট্রাক। ট্রাকের ভিতরে আর্মি মেডিক্যালের একজন অফিসার একটা কাঠের বাক্সের উপর চুপ করে বসে আছেন। দুটো স্ট্রেচারকে তো বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কম্বলে ঢাকা হয়ে ওই স্ট্রেচারে শুয়ে আছে যে-দুজন আহত, তাদের মুখের সামান্য একটু আবছা-চেহারা শুধু দেখা যায়।

নিঃস্পন্দ মূর্তি, নিষ্পলক চোখ, শুক্তির বুকটাও যেন সব নিঃশ্বাসকে নীরব করে দিয়ে ধরে রেখেছে।

সামনের ট্রাকের চাকা বড় বেশি ধুলো ওড়াতে শুরু করেছে। শুক্তির নিষ্পলক চোখ দুটো চমকে ওঠে।—একটু থাম রাজবাহাদুর।

গাড়ি থামে। ট্রাক দুটো বেশ দূরে চলে যায়। দেখতে পাওয়া যায়, ওদিক থেকে উড়ন্ত ধুলোর ভিতর দিয়ে একটা সাইকেল-রিক্সা সড়কের গর্ত মাড়িয়ে আর ঝাঁকুনি খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে।

বড় ভুল হতো শুক্তির, যদি এই সময় ধুলোর ভয়ে রুমাল তুলে চোখ-মুখ ঢাকা দিত। দেখতেই পেত না যে, রিক্সার উপরে এমন একটি মানুষ বসে আছেন, যাঁর কথা আজও শুক্তির একবার মনে পড়েছে। রিক্সাতে বসে আছেন আর হাসছেন সুজিতের কাকিমা। তাঁর পাশে খুব রোগা দেখতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক একটা লালসুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন।

এটা তো আর জাগা-চোখে দেখা একটা স্বপ্ন নয়। এটা কল্পলোকের একটা জায়গাও নয়। গর্তে ভরা একটা সাঁতাকারের সড়কের উপর দিয়ে তেজপুরের সাইকেল-রিক্সা লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে। কিন্তু শুক্তির চোখ দুটো যেন কল্পলোকেরই একটা বিস্ময় দেখে ছটফট করছে। আর বুঝতেও দেরি হয় না, সুজিতের কাকিমা কেন এত হাসছেন।

—এই রিক্সা থাম।......শুনছেন? চিনতে পারছেন? শুক্তির ডাক শুনে রিক্সার ভিতর থেকে একটা খুশি-উতলা মূর্তি ধরে নেমে আসেন সুজিতের কাকিমা, প্রিয়বালা।—ওমা? এ কি? সাহেবের মেয়ে নাকি?

গাড়ি থেকে নামে শুক্তি। —হ্যাঁ, আমি শুক্তি। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

—গিয়েছিলাম ওখানে, এয়ারপোর্টে। রোজই তো যেতাম। তিনদিন হলো তেজপুরে এসেছি।

—আপনি ওখানে কেন যেতেন?

—যাব না? না গিয়ে পারি? কেউ যখন কোন খবর দিল না, তখন বলাই বললে, চল মামী, এয়ারপোর্টে গিয়ে দেখি, শুনেছি ওখানে রাইফেলের লোকজন আসছে আর চলে যাচ্ছে।

—বলাই কে?

—এই তো বলাই।

লাল সুতির চাদর গায়ে জড়ানো, রোগা ভদ্রলোক রিক্সা থেকে নেমে এসে বলেন—আমি রিফিউজি মানুষ। একটা রিক্সা খাটাই, এ ছাড়া আর কোন রোজগার নেই। পঙ্গু স্ত্রী, বুড়ো মা, আর...।

প্রিয়বালা।—তেজপুরে বলাইয়ের বাড়িতেই আছি। আপনাদের ডাক্তারবাবু এখন আছেন রঙিয়াতে। খুব অসুস্থ। আমিও রঙিয়া থেকেই এখানে এসেছি। এইবার ফিরে যাব।

—সুজিতবাবুর খোঁজ পেয়েছেন নিশ্চয়?

—পেয়েছি, পেয়েছি। এই তো আজ এইমাত্র পেলাম। তাই তো ফিরে যাচ্ছি।

—কে দিল খবর?

বলাইবাবু বলেন—লোখরার একজন জমাদারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তার কাছেই শুনলাম, সুজিত ফিরেছে, ভাল আছে, শুধু তিনটে দিন হাসপাতালে ছিল।

প্রিয়বালা মাথা নাড়তে থাকেন।—বাবা রে, বাবা, কী মিথ্যুক ছেলে এই সুজিত। ওর কাকাও কী ভয়ানক মিথ্যুক। আমাকে হেন-তেন কত কী না বুঝিয়ে দিলে, বুমলা নাকি চারদুয়ারের কাছে খুব ভাল একটা জায়গা। ও ছেলে যে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে সেই নেফা পাহাড়ে সরে পড়বে, যে নেফার পাথর ওর বাপকে মেরেছে, এ তো আমি স্বপ্নেও সন্দেহ করিনি। কেঁদে কেঁদে আমার চোখে ঘা হয়ে গিয়েছে, এই দেখুন আপনি, একবার নিজের চোখে দেখে নিন।

শুক্তি—যাক্, যা হবার হয়ে গেছে; এবার নিশ্চিন্ত হয়ে রঙিয়া ফিরে যান।

প্রিয়বালা—হ্যাঁ, খুব নিশ্চিন্ত। দুঃস্বপ্ন গেল।...তা আপনি এখানে কেন? সাহেব কোথায় আছেন? আপনার মা কোথায়?
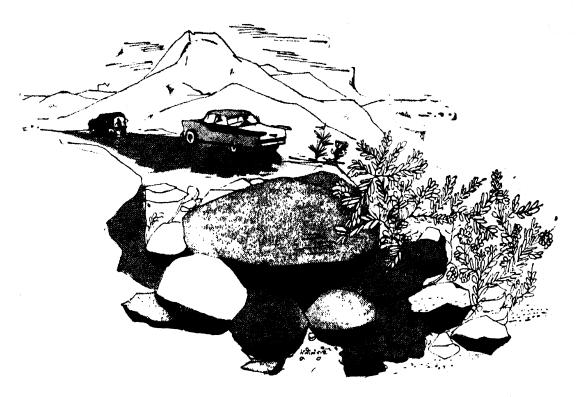
শুক্তি—আমরা সবাই এখন তেজপুরে আছি।

বন্ধুতে অসুবিধে নেই, কয়েকজন জখম সৈনিককে বয়ে নিয়ে চলেছে এই ট্রাক

প্রিয়বালা—কদমবাড়ি যাবেন কবে?

শান্তি—ঠিক জানি না।

প্রিয়বালা—আমাদের আর কদমবাড়ি যাওয়া হবে না। ভাবলে বড় দুঃখ হয়।

শান্তি—কদমবাড়ি আর যাবেন না কেন?

প্রিয়বালা—ওর ভাঙা শরীরে আর চাকরি পোষাবে না। ভাগ্যি ভাল যে, এককালে রাঙিয়াতে একটা কুঁড়েঘর তুলে রেখেছিল, এখন তাই একটা ঠাঁই হলো।

শান্তি—আচ্ছা, আপনি আসুন এখন।

প্রিয়বালা—আপনারা কোন্ পাড়াতে আছেন?

শান্তি—রবার বাগানে; বাড়ির নাম ভারতী।

বলাইবাবু বলেন—হ্যাঁ, মাহমবাবুর বাড়ি; স-বাড়িকে কে না চেনে?

প্রিয়বালা—যাই বলুন, রাঙিয়া বলুন আর তেজপুর বলুন, কদমবাড়ির মত সুন্দর কেউ নয়। কদমবাড়ির গাছের দুটো রাঙাজবাতেই পুজোর থালা ভরে যায়। এক জালের দুধে এই মোটা সর পড়ে। জল-বাতাসও কত মিষ্টি!

শান্তি হাসে—তবুও তো কদমবাড়িকে ছেড়ে দিলেন।

প্রিয়বালা—ভাগ্য যদি ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে আর কি করবার আছে বলুন। আচ্ছা, চলি।

চলে গেল রিক্সা।

এইবার রাজবাহাদুরকে গাড়ি ফেরাতে বললেই তো হয়। কত খুশি হয়ে হাসছে রাজবাহাদুর। সুজিতের কাকিমার সব কথার সবই তো শুনতে পেয়েছে।

অনেকক্ষণ তো হলো, তবু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে শান্তি। পথের লোক দেখলে সন্দেহ করবে, গাড়িটা বুঝি অচল হয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাজবাহাদুর সন্দেহ করবে, অচল হয়ে গিয়েছে দিদি।

কিন্তু রাজবাহাদুর এখন যদি সত্যিই হঠাৎ একটা কবিত্ব করে বলে দেয়: আওন কি আওয়াজ তো মিল গিয়া; দিদি, এখন ফিরে চলুন; তবে? শান্তি কি তবে না হেসে আর খুব গম্ভীর হয়ে বলতে পারবে, হ্যাঁ চল।

কি আশ্চর্য, রাজবাহাদুর সত্যিই যে গাড়িটাকে ফেরাতে শুরু করেছে। গম্ভীর হতে গিয়ে হেসে ফেলে শান্তি।—হ্যাঁ, ঠিক করেছো, বেশ করেছো, চল।

ভারতীর একটি ঘরের ভিতরে বসে কিরণলেখাও হাসছেন। শান্তি এসে পৌঁছতেই আরও খুশি হয়ে হেসে উঠলেন কিরণলেখা। —জোড়হাট থেকে তোর প্রণবকাকার চিঠি এসেছে, শান্তি।

শান্তি—বলতে পারি; কি লিখেছেন প্রণব-কাকা। সুজিতবাবু ফিরে এসেছেন।

কিরণলেখা—কি করে বুঝলি?

শান্তি—তোমার মুখের হাসি দেখেই বুঝেছি। তা ছাড়া পথেও একজনের মুখে হাসি দেখলাম।

কিরণলেখা—কে?

শান্তি—ডাক্তারবাবুর স্ত্রী; সুজিতের কাকিমা।

কিরণলেখা—তাই নাকি? যাক, খুব ভাল হলো, ডাক্তার-গিন্নী এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারবে।

শান্তি হাসে—আমাদের রাজবাহাদুরও এইবার হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হবে।

কিরণলেখা—হবেই তো। সামান্য একটা খবর জানবার জন্যে ছুটোছুটি করে লোকটা এতদিন কী হয়রানই না হয়েছে।

হাঁপ ছেড়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে কিরণ-লেখারও মন। তা না হলে এখন শান্তির মুখের দিকে ওরকম শান্ত আর স্নিগ্ধ দুটো মায়ার চোখ তুলে তিনি তাকিয়ে থাকতে আর হাসতে পারতেন না। আর শান্তি? কিরণ-লেখার চোখের সামনের কোচের উপর একটা ক্লান্ত শরীরের সব ভার অলস করে লুটিয়ে দিয়ে বসে আছে যে শান্তি, সে শান্তি সত্যিই একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর উঠে দাঁড়ায়; আস্তে আস্তে হেঁটে চলে যায়। আজ শান্তি নিজেই যে সব চেয়ে বেশি নিশ্চিন্ত একটা শ্রান্তি।

নিজের ঘরে ঢুকে আর মিররের সামনে দাঁড়িয়ে খোঁপা খুলতে গিয়েই শান্তি হঠাৎ চমকে ওঠে আর কথা বলে ফেলে—এ কি হলো?

ছিছি, চোখ দুটো জলে ভরে গেল কেন?

বুকটা এমন করে কেঁপে উঠলো কেন? শুধু একটা কথাই বা বারবার মনে পড়ছে কেন?

খোঁপা বাঁধে শুক্তি, তোয়ালেটাকে হাতে তুলে নেয়। ভাবতে অদ্ভুত লাগে, কি আশ্চর্য, একথা তো কোনদিনও মনে হয়নি। কোনদিন তো বুঝতেও পারা যায়নি।

তবে আর কি? কিছুই না। কিন্তু মা যেন সেই অদ্ভুত কথাটা আর জিজ্ঞেসা না করেন যে, কাকে ভাল লাগে? ও কথার জবাব দেবে না, দিতে পারবে না শুক্তি। মা যেন শুধু জিজ্ঞেসা করেন, কাকে ভাল মনে হয়।

তেজপুরের শীতের বিকেলের শেষ আলোতে দূরের ধূলোর চেহারা রঙীন গোধূলির মত হয়ে উঠলো কিনা, সেটা আজ আর দেখতে চেষ্টা করে না শুক্তি। হাতে-ধরা বইটার উপর যেন ঘুম-ঘুম চোখের একটা ক্লান্ত দৃষ্টি গাড়িয়ে দিয়ে সোফার উপর চুপ করে বসে থাকে। হঠাৎ এক-একবার মনে পড়ে যায়, আর মনে পড়তেই হেসে ফেলে শুক্তি, দিবুদা মাঝে-মাঝে যে কবিতার বইটা খুব সুর করে পড়তেন, সে কবিতার শেষে একটা চমৎকার কথা ছিল—তমাম শোধ।

এই বিকালের ডাকে আরও কয়েকটা চিঠি এসেছে, সেগুলিও যেন এক-একটা নিশ্চিন্ততার চিঠি। কদমঝাড়ি থেকে ম্যানেজার ব্যানার্জির অনেক চিঠি নিয়ে একজন লোক এসেছে। সেসব চিঠি এখনও পড়ে শেষ করতে পারেননি গগন বসু।

শৈলেশ্বরবাবুর চিঠি পেয়েছেন মহিমবাবু। সাতদিনের মধ্যেই তেজপুরে ফিরে আসছেন শৈলেশ্বরবাবু, কারণ তিনমাসের বাড়ি ভাড়া বাকি ফেলেছে কয়েকজন ভাড়াটিয়া। বাড়িভাড়া আদায়ের জন্য তিনি মামলা করতে চান।

মহাদেব চৌধুরীর চিঠিও পেয়েছেন মহিমবাবু। তিনিও আসছেন। কারণ বিশেষ কয়েকজন অ্যাসোসির জন্য বিশেষ দরকারের কথা বলতে সুশান্ত মজুমদার খুব শিগগির তেজপুরে এসে পড়বেন।

কলকাতা থেকে সুমিত্রা সরকারের চিঠি পেয়েছেন কিরণলেখা।—এবার স্পষ্ট করে একটা খবর দিন, কিরণ বউদি। আর দেরি করা কি ভাল দেখায়?

আরও যে দুটো চিঠি এসেছে, সে দুটো চিঠি দু'বার পড়ে নিয়ে হাসাহাসি করেছেন কিরণলেখা আর মণিমালা। নাসিক থেকে মীরার একটি চিঠি এসেছে। শান্তিপুর থেকে বাণীর একটি চিঠি।

কিরণলেখা—বাণী দেখছি এখনও শান্তিপুরেই আছে।

মণিমালা—মীরা যে গোলমালের সময় তেজপুর ছেড়ে একেবারে অতদূরে নাসিকে চলে গিয়েছে, এ-খবর তো আমাকে কেউ দেয়নি।

কিরণলেখা হাসেন—যাই হোক, বাণীর আর মীরার এসব কথার এখন তো আর কোন মানে হয় না।

মণিমালা—না। শুক্তিকে তবে এখানেই ডাকি।

এখানে মানে ভারতীর বাইরের চওড়া চকচকে বারান্দার এইদিকে, যেখানে এরই মধ্যে একটি আলো জ্বলতে শুরু করেছে, কয়েকটি চেয়ার পড়ে আছে, আর দুই চেয়ারে বসে এতক্ষণ কথা বলছিলেন কিরণলেখা আর মণিমালা। এখানে বসেই দেখতে পাওয়া যায়; এদিকেরই বাইরের ঘরের ভিতরে একটি টেবিলের কাছে বসে চেক লিখছেন গগন বসু। ম্যানেজার ব্যানার্জি জানিয়েছেন বাগান চালু করতে হলে এখন বেশ কিছু টাকার দরকার হবে।

মণিমালার ডাক শুনতে পেয়েই চলে আসে শুক্তি।—বাঃ, সন্ধ্যে ভাল করে না হতেই আলো জেলে বসে আছ, মণিমাসি!

মণিমাসি—না রে মেয়ে; সে জন্যে নয়। অনেক চিঠি পড়তে হলো। আলো না থাকলে চিঠির লেখা কি এ বয়সের চোখে আর পড়া যায়?

কিরণলেখা বলেন—কলকাতা থেকে তোর বড় পিসির চিঠি এসেছে, শুক্তি। জানবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সুমিত্রা, তুই কী বলতে চাস?

তড়বড় করে হেঁটে বেড়ায় না, ছটফটও করে না; বেশ শান্ত হয়ে এক-ঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকে শুক্তি। কিন্তু জবাব দিতে গিয়ে হেসে ফেলে—আমি কিছু বলতে পারবো না।

কিরণলেখা—একথার মানে?

শুক্তি—তোমরা ভেবে ঠিক করে নাও, কাকে বেশি ভাল মনে হয়।

কিরণলেখা—আমরা যদি বলি, শ্যামল?

শুক্তি—হ্যাঁ, তবে তাই।

মণিমাসি—আমি তো মনে করি, অনিমেষই ভাল।

শুক্তি হাসে—হ্যাঁ, তবে তাই ভাল।

কিরণলেখার চশমার দুই কাচ আশ্চর্য হয়ে চিকচিক করে।—তোমার নিজের কোন পছন্দ-অপছন্দ থাকবে না, এটা কেমন কথা?

শুক্তি—এ কথা তুলে আর কোন লাভ নেই, মা।

কিরণলেখা—তুমি সত্যি কথা বলছো?

শুক্তি—একটুও মিথ্যে বলছি না।

কিরণলেখা—তাহলে তোমার বাবাকে এই কথা বলি?

শুক্তি—বল। কিন্তু বলে লাভ কি? বাবা তো বলেই রেখেছেন যে...।

কিরণলেখা— কি বলে রেখেছেন?

শুক্তি—বাবার মানুষ চিনতে খুব ভুল হয়। অনেক দেখেও মানুষ চিনতে পারেন না।

হঠাৎ মাথাটাকে ঝুঁকিয়ে হেঁট করে দিয়ে হাসতে থাকে শুক্তি। কারণ, বাইরের ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন গগন বসু, আর বারান্দার শুক্তির মুখের দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছেন। গগন বসুর হাতের পাইপে ধোঁয়া নেই; তাঁর কপালের সেই গভীর তিনটে রেখা হঠাৎ যেন আরও গভীর হয়ে গিয়েছে। আবার ঘরের ভিতরে চলে গেলেন গগন বসু।

কিরণলেখা বলেন—শান্তিপুর থেকে বাণীও যে একটা অদ্ভুত চিঠি লিখেছে। পাইলট অফিসার পরিতোষের সঙ্গে তোমার তো কয়েকবার দেখা আর আলাপও হয়েছে।

শুক্তি—হ্যাঁ।

কিরণলেখা—তবে কি বলবো যে, পরি-

তোমরও ভাল?

শক্তি—ভাল বইকি। খারাপ কেন হবে?

কিরণলেখা—তোমার আপত্তি নেই?

শক্তি—না।

কিরণলেখার মনের এতক্ষণের দুঃসহ বিস্ময় এইবার যেন আর্তনাদ হয়ে বেজে উঠবে।—মীরার মামার ছেলে রাজীবের কথাও তো মীরার কাছে তুমি শুনেছো।

শক্তি—শুনেছি।

কিরণলেখা—রাজীবও নিশ্চয় খুব ভাল ছেলে।

শক্তি—হ্যাঁ। শুনে তাই তো মনে হয়।

কিরণলেখা—তবে কি রাজীবের মা'র কাছেই চিঠি দেব?

শক্তি—দাও।

কিরণলেখা—আপত্তি নেই তোমার?

শক্তি—না।

কিরণলেখা—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?

শক্তি—রাগ করো না, মা। কেউ চেনা, কেউ শোনা, এই মাত্র। তার বেশি তো কিছু নয়। কাকে কার চেয়ে ছোট মনে করবো বল? সবাই সমান।

কিরণলেখা আর কোন কথা বলেন না। কথা বলেন মণিমালা।—আমি বলি কিরণদি, শুনেছেন কিরণদি?

কিরণলেখা—বল।

মণিমালা—শক্তিকে আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত নয়। বরং আমরাই ভেবে দেখি...।

কিরণলেখা—হ্যাঁ, অগত্যা তাই। আচ্ছা, শক্তি, তুই এবার যা।

চলেই যাচ্ছিল শক্তি। কিন্তু থমকে দাঁড়ায়। চোখে পড়েছে শক্তির, গেটের দিক থেকে হেঁটে আসছে রাজবাহাদুর, তার পিছনে আরও দুজন। গেটের বাইরে রাস্তার উপর একটা রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে।

সে-দুজন সোজা এগিয়ে এসে একবারে বারান্দার উপরে উঠে দাঁড়ায়। হেসে কথা বলেন কিরণলেখা।—এ কি? ডাক্তার গিন্নী যে! এখন কোথায় আছেন আপনি?

প্রিয়বালা—আছি রাঁচিয়াতে।

কিরণলেখা—এই মেয়েটি কে?

প্রিয়বালা—আমার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে হয় বলাই, তারই বাড়িতে এই মেয়ে এইতো মাত্র মাস দুই হলো এসেছে। বলাইয়ের এক জ্ঞাতিখুড়োর মেয়ে। এ মেয়ের বাপও নেই, মাও নেই।

কিরণলেখা—বসুন আপনি; তুমিও বসো।

প্রিয়বালা—সাহেব ভাল আছেন?

কিরণলেখা—হ্যাঁ।

প্রিয়বালা—কিন্তু আর বসবো না। যাচ্ছি ইস্টিশানে। সন্ধ্যের ট্রেনেই রাঁচিয়া ফিরে যাব।

এগিয়ে আসে শক্তি।—ট্রেন ছাড়বে কখন?

প্রিয়বালা—এই তো, এই সন্ধ্যে ছ'টায়।

শক্তি—তবে তো এখনও সময় আছে।

প্রিয়বালা—তা...সময় একটু তো আছে... কিন্তু নেই বললেই চলে।

শক্তি—আপনি আর মাত্র পাঁচটি মিনিট বসুন।

প্রিয়বালা হাসেন—কেন? আপনার ইচ্ছেটা কি?

শক্তি হাসে—না, আপনাকে কেক-বিস্কুট খাওয়াবো না। শুধু একটা জিনিস দেব।

প্রিয়বালা—জিনিস?

প্রিয়বালার কথার কোন জবাব না দিয়ে চলে যায় শক্তি। ফিরে এসে একটা চেয়ারের উপর শক্ত হয়ে বসে, হাসে, আর কাগজে মোড়া একটা সোয়েটারকে কোলের উপর রাখে; উলের কাঁটা হাতে তুলে নেয়।—আপনি একটু দেরি করুন। এমন কিছু সময় লাগবে না। হাতটা পুরো হয়েই গিয়েছে। শুধু কাঁধের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া বাস্...শুনেছেন, সুজিতবাবুকে দেবেন এই সোয়েটার। ভুলে যাবেন না যেন।

প্রিয়বালা হাসেন—সোয়েটার?

শক্তি—হ্যাঁ। মালতী এসে যদি কখনও জিজ্ঞেস করে, তবে বলে দিতে পারবো, হ্যাঁ, সোয়েটার বোনা ফিনিশ করেছি, একজন খুব্বের মানুষকেই ওটা দিয়ে দিয়েছি; ফাঁকি দিইনি।

খুব ব্যস্ত শক্তি। শক্তির হাতে উলের কাঁটা যেন সময় জয় করবার জন্য ছটফটিয়ে কাজ করছে। পাকা ধানের রঙ, নরম তোল-প্লাই উলের সোয়েটার শক্তির কোল থেকে হঠাৎ এক-একবার পড়-পড় হয়ে ঝুলে পড়ে। তখুনি ব্যস্ত হাতে আবার কোলের উপরে টেনে তুলে নেয় শক্তি।

কিরণলেখা কিংবা মণিমালা, দুজনে শুধু নীরব হয়ে বসে আছেন আর দেখছেন। সুজিতের কাকিমা প্রিয়বালাও তাই একেবারে নীরব। তিনি শুধু সাহেবকে একবার দেখতে পেলেন, ঘরের ভিতরে সাহেব যেন ছটফট করে ঘুরছেন। মাথার কাপড়টাকে টেনে আরও বড় করে নামিয়ে দেন প্রিয়বালা।

—এই নিন, হয়ে গেছে। সোয়েটারটাকে প্রিয়বালার হাতে তুলে দেয় শক্তি। বেশ জোরে একটা হাঁপ ছাড়ে। তারপর, যাকে চোখে দেখতে পেয়েও এতক্ষণের এই ব্যস্ততার জন্য যার সঙ্গে একটা কথাও বলতে পারেনি শক্তি, তারই সঙ্গে কথা বলে—তুমি কে? তোমার নামটাও তো শুনতে পেলাম না।

মেয়েটি বলে—পূরবী।

বেশ দেখতে পূরবী। একটু রোগা-রোগা বটে, কিন্তু বেশ নরম দুটো ঠোঁট। চোখেও বেশ জ্বলজ্বলে একটা হাসি। বয়স কত হবে? শক্তির সমান না হোক, বড় জোর দু-তিন বছর ছোট। ঢাকাই তাঁতের শাড়িতে ছোট ছোট রঙীন বুটি। গায়ে-জড়ানো ধূপ-ছায়া ছাপের একটা স্কার্ফ। খোঁপাটাও ঢিলে ছাঁদে বাঁধা হয়ে ঘাড়ের একদিকে তোলা।

প্রিয়বালা এইবার অদ্ভুত একটা তৃপ্তি-ভরা হাসি মুখে নিয়ে কথা বলেন—আপনাদের কাছে পূরবীকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাব বলেই তো এলাম। এ মেয়ে এখন আমার কাছেই থাকবে। বুঝলেন তো, সুজিতের জন্যেই এই মেয়েকে রাঁচিয়া নিয়ে চললাম। ওখানেই বিয়ে হবে।

শক্তি—তাই বলুন। এমন চমৎকার খবরটা এতক্ষণ চেপে রেখেছিলেন কেন? আর তুমিই বা কেমন? ধরা পড়ে যাবার ভয়েই বুঝি চুপটি করে বসে আছ, কোন কথা বলছো না?

পূরবী হাসে—ধরা তো পড়েই গিয়েছি।

শক্তির হাসিটা যেন ঝর্ণার উচ্ছল খুশির শব্দের মত উথলে ওঠে।—আপনি শুনলেন তো, কি বলছে পূরবী, বিয়ে হবার আগেই ধরা পড়ে গিয়েছে।

—শুনেছি। খুব খুশি হয়ে হেসে ফেললেন প্রিয়বালা। তারপরেই উঠে দাঁড়ালেন—এবার আমরা আসি।

প্রিয়বালা আর পূরবী দুজনেই কিরণলেখা আর মণিমালার দিকে হাত তুলে নমস্কার জানায়। আর, শক্তির দিকে হাত তুলে নমস্কার জানাতে গিয়ে পূরবীর মুখটা হঠাৎ লাজুক হয়ে হাসি লুকোতে চেষ্টা করে।

পূরবীর কাছে এগিয়ে আসে শক্তি। গলার স্বর একটু চেপে দিয়ে, দুই চোখ বড় বড় করে, হেসে হেসে আর ফিসফিস করে কথা বলে শক্তি—খুব ভাল হলো। ছুটির সময় দুজনে মিলে একবার বেড়াতে বের হয়ে জিয়াভরলি নদীটা দেখে এসো। কী চমৎকার সেই জিয়াভরলি। দেখলে প্রাণ ভরে যাবে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

শমীবৃক্ষ

মফস্বলের আদায় তোলা হচ্ছে লোহার সিন্দুকে।

পুরঞ্জয় এসে উপস্থিত।

হরিতোষ সিন্দুকের মধ্যে প্রায় ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, চমকে উঠল।

হঠাৎ একটা থলে তুলে নিয়ে পুরঞ্জয় জিগগেস করল, 'এটার মধ্যে কত আছে?'

'এক হাজার।' বললে হরিতোষ।

'আমি এটা নিয়ে চললাম।'

কী বলবে প্রথমটা কিছু ভেবে পেল না। হরিতোষ। ঢোক গিলল। গলা ভিজতে না ভিজতেই বললে, 'বড়বাবুকে একটু বলে যান।'

'কাকে?' হুমকে উঠল পুরঞ্জয়।

'বড়বাবুকে।' হরিতোষ কান চুলকোলো।

'কেন, এ টাকা বড়বাবুর একলার নাকি?

'আপনাদের সকলের টাকা।'

'শুধু এ থলেটা নয়, সিন্দুকের মধ্যে যত আছে, যত আছে আপনার পেটে,—সমস্ত, সমস্ত সকলের টাকা।'

তাতে আর সন্দেহ কী, আপ্যায়িতের মত হরিতোষ ঘাড় কাত করল।

'আ: আপনি এস্টেটের নায়েবমাত্র।'

'আপনাদের সকলের চাকর।'

'হ্যাঁ, আমারও। খালি বড়বাবুর নয়। সেটা মনে রাখবেন।' থলের গলাটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরল পুরঞ্জয়: 'সিন্দুকে নগদ যা মজুত আছে তাতে আমার অংশে এক হাজার হবে না?'

'নিশ্চয়ই হবে।'

'তবে আমার নিতে বাধা কী?'

'বাধা কিছুই নেই' গাল চুলকোলো হরিতোষ: 'শুধু বড়বাবুকে একবারটি বলে নিন।'

'আমার টাকা আমি নেব, দাদাকে বলতে যাব কেন?'

'জানেনই তো উনি এস্টেটের এক্সিকিউটর —ওঁকে জানানো দরকার, ওঁকে না জানিয়ে হয় না, সেটা ঠিক নয়—'

'বেশ, খাতায় লিখে রাখুন। আমার নামে হাজার টাকা খরচ দেখান।'

'প্রমাণ হবে কী করে, ও টাকা আমি নিইনি?'

'তার মানে?' চোখ গোল করল পুরঞ্জয়।

হরিতোষ শান্তমুখে বললে: 'আমি তো তা হলে নিজে তছরুপ করে খাতায় অন্যের নাম লিখে রাখতে পারি। বড়বাবু যদি বিশ্বাস না করেন?'

'তা হলে আমাকে কী করতে হবে?'

'তার আমি কী বলব! আমি শুধু আমার দিকটা দেখতে বলছি।'

'তা হলে বলতে চান, আমাকে বড়বাবুর কাছ থেকে লিখিত আদেশ আনতে হবে?'

'লিখিত না হলেও চলবে।' বিনয়ের থেকে একচুল বিচ্যুতি নেই হরিতোষের : 'উনি যদি মৌখিক হুকুম করেন তা হলেই যথেষ্ট। অন্তত ওঁর একটা সম্মতি। আমি চাকর, আমার অবস্থাটা বুঝুন—'

'কিন্তু বড়বাবু যখন নিজে নেন তখন কার হুকুমে থলে ছাড়েন?'

'তিনি কর্তা, এক্সিকিউটর—সুতরাং—'

'আচ্ছা—' থলেটা মেঝের উপর ছুঁড়ে দিয়ে খালি-হাতে বেরিয়ে গেল পুরঞ্জয়।

ধনঞ্জয়কে ডাকল। বললে, 'আর দেরি নয়, চল সদরে। কাল ভোরের ট্রেনেই।'

মৃত্যুঞ্জয়ও বেরিয়ে এলেন লাঠি হাতে। এ কী, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

থানায়। নায়েব মশাইকে জিজ্ঞেস কর কটা থলে নিয়ে গেছে। মোট কত টাকা?

'না, নেয়নি। পারেনি নিতে।' বেরিয়ে এল হরিতোষ।

'ডাকাতি হয়নি তা হলে?'

'হলে তো আমিই বলতাম, আমিই যেতাম থানায়।'

'তবে কে যে বলল থাবা মেরে থলে তুলে নিয়েছে—'

'নিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরাতে পারেনি।' হরিতোষ তপ্ত মুখে বললে, 'আপনার হুকুম লাগবে শুনেতেই ফেলে দিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, আমার হুকুম।' সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মৃত্যুঞ্জয় : 'এস্টেটকে আমি তছনছ হতে দেব না, কিছুতেই না।'

ফিরে চললেন অন্দরের দিকে। উষা-বালাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'এত টাকার ওর দরকার কিসে?'

পাশের জানলা থেকে উত্তর করল জ্যোতির্ময়ী : 'টাকা থাকলেই টাকার দরকার।'

সদরে পৌঁছেই সটান অক্ষয় দত্তের বৈঠক-খানায় এসে হাজির। মক্কেলের ভিড়-ভাড় সরিয়ে একেবারে সামনে গিয়ে উপস্থিত।

'এ যে আপনি—আপনারা!' বিহ্বল হলেন অক্ষয় : 'কী মনে করে?'

'একটা পার্টিশান সুটের আর্জির মুশাবিদা করুন।'

'বসুন, বসুন।' মনের আনন্দ মুখে ফুটতে না দিয়ে অক্ষয় বললেন, 'কাদের মধ্যে পার্টিশান?'

'আর কাদের মধ্যে!' একটা পরিত্যক্ত চেয়ারে বসে পড়ল পুরঞ্জয় : 'আমাদের সরিকদের মধ্যে।'

সে যে এক বিশাল বাড়ি। এলাহি ব্যাপার। তবু মুখে তেলতেলে আভা না ফুটিয়ে শুকনো-শুকনো দুঃখের ভাব আনলেন অক্ষয়। বললেন, 'বনিবনা হচ্ছে না বুঝি?'

'একদম না। সব সময়ে সব ব্যাপারে ডিকটেটরশিপ চালালে কি চলে?'

'সব সময়েই চোটপাট!' ধনঞ্জয়ও পুরঞ্জয়কে সমর্থন করল।

'বড়ই দুঃখের কথা।' মামলা করতে আসাটা নয়, চোটপাট করাটা। পরক্ষণেই বক্তব্য প্রাঞ্জল করলেন অক্ষয় : 'যে বড় তার ইচ্ছেই হয় ছোটদের উপর জুলুম করি।'

'অথচ আমাদের সমান অংশ।'

'তা হলে কী হয়! বড়র মেজাজ সব-সময়েই ঝাঁজালো। যেহেতু উনি বড়, মাছের মুড়োটা তাঁরই প্রাপ্য। না পেলেই একেবারে ফোঁসকেটটে।' অক্ষয় তাক বুঝে প্রতি পক্ষের একটুকু গাইল।

'মামলার মধ্যে না গিয়ে আপোষে ভাগ করে নেওয়া যায় না?' পাশের বসা ভদ্রলোক, কোনো সম্পর্ক নেই কারু সঙ্গে, মধ্যস্থের মত বললে।

'তার কি আর চেষ্টা হয়নি?' ভদ্র-লোকের মুখে কথা কেড়ে নিলেন অক্ষয় : 'আপোষে ভাগবণ্টন সম্ভব হয়নি বলেই তো আদালতে আসা।'

'হ্যাঁ, পাকাপাকি করে ফেলাই ভালো।' পুরঞ্জয় বললে নির্মমের মত।

'নইলে নিত্যি ঠেলাঠেলি অসহ্য।' ধনঞ্জয়ও সায় দিল।

ভদ্রলোক ওদেরকে নামে চেনেন বোধ হয়। বললেন, 'আপনাদের এমন একটা নামী পরিবার ছত্রখান হয়ে যাবে সেটা ঠিক নয়।'

অক্ষয় ভীষণ বিরক্ত হলেন। ফালতু লোক, তুই কেন ফোপর দালালি করতে আসিস? বললেন, 'ছত্রখান কী মশাই! তাই বলে নিজের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেবে?'

'না, তা দেবে কেন?' ভদ্রলোক তবুও মাথা গলাবেন। 'আপোষে একটা ফ্যামিলি সেটলমেণ্ট করে নেবে।'

'তা হলে দেখবেন মাছের মুড়োটা আবার সেই বড়র পাতে।' কুটিল চোখে হাসলেন অক্ষয় : 'তখন আবার যন্ত্রণা। দলিল রদের মামলা। সুখের থেকে স্বস্তি ভালো। নাম দিয়ে কী হবে যদি শান্তি না থাকে। তখন বরং আরো দুর্নাম। এত বড় একটা পরিবার, ভায়ে-ভায়ে লাঠালাঠি করছে!'

'সবার চেয়ে দামী হচ্ছে স্বাধীনতা।' হাত মুঠ করল পুরঞ্জয়।

'মাথা কাত না রেখে সোজা করে চলা।' ধনঞ্জয় সায় দিল : 'নিজের রুচি নিজের মর্জি মাফিক খাওয়া-দাওয়া।'

'না, না, আপনি মুশাবিদা করুন।' টাকা বার করল পুরঞ্জয়।

সে এক রাজসূয় যজ্ঞ।

সমস্ত সম্পত্তির ফিরিস্তি দিন। স্থাবর-অস্থাবর, সমস্ত। কোথায় কী তালুক-মুলুক জমি-জমা খাল-বিল জলকর-ফলকর, কিছুই বাদ দেবেন না। ব্যবসা-বাণিজ্য থাকে, তাও। বাড়ি-ঘর দোকান-পসার টাকা-পয়সা শেয়ার-সার্টিফিকেট যেখানে যা সম্পত্তি আছে একত্র করুন। বাসন-কোসন আসবাব-পত্র গৃহবিগ্রহের অলঙ্কার পর্যন্ত। মোট কথা যা কিছু এজমালি সব ঢোকান আর্জির তপশীলে।

সে এক এলাহি কারখানা। সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে ঠিকঠাক ফিরিস্তি করতে গেলে মামলা রুজু করতেই ঢের দেরি হয়ে যাবে। এক্ষুনি-এক্ষুনি আর্জি ফাইল করে নিয়ে রিসিভার বসিয়ে দেওয়া দরকার। তা হলেই বড়বাবুর দপদপানি বন্ধ হয়ে যাবে। কর্তাগিরির ভেঙে যাবে শিরদাঁড়া।

'তাই ভালো।' অক্ষয় বুদ্ধিতে শান দিয়ে দিলেন : 'রিসিভার শুধু আদায়-তশিলই করবে না, সমস্ত অস্থাবর মালামালের ইনভেন্টারি করতে পারবে। আর স্থাবর, যা কিছু শাঁসালো মনে করেন, সম্প্রতি ঢোকান, পরে আরো কিছু বেরোয়, আর্জি য়্যামেণ্ড করে নিলেই হবে। আংশিক বণ্টন হতে পারে না ও-পক্ষ যদি এমন আপত্তি তোলে তখন ডিসকাভারি করে জেনে নিলেই হবে কোন সম্পত্তি বাদ পড়েছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, যতবার খুশি চলবে য়্যামেণ্ডমেণ্ট। য়্যামেণ্ডমেণ্টে কোনো তামাদি নেই।'

'এই শহরেই দুটো বাড়ি আছে, একটার নাম 'উষসী', আরেকটার নাম 'শিবালয়'।' বললে পুরঞ্জয়, 'উষসী-টা বৌদির নামে,

আর মৃত্যুঞ্জয় তো শিব, তাই 'শিবালয়'টা দাদা নিজের নামে খরিদ করেছে—'

'যার নামেই খরিদ করুক, আর্জিতে ঢুকিয়ে দিন।'

'হ্যাঁ, ও সমস্তই এজমালি টাকায় কেনা, ও দুটো বাড়িতেও আমাদের সমান অংশ।' পুরঞ্জয় তপ্তশ্বাস ছাড়ল : 'এমনি কত সম্পত্তি এজমালি টাকায় কিনে নিজের বলে চালাচ্ছে তার ঠিক নেই।'

'দখলে কার?' শ্যেনদৃষ্টিতে তাকালেন অক্ষয়।

'দাদার বড় ছেলে মঙ্গল আছে তার বউ নিয়ে—উষসীতে।' পুরঞ্জয় বললে, 'মঙ্গল এখানেই লোন-আফিসে চাকরি করে।'

'একা মঙ্গলের দখলে হবে কেন?' ধনঞ্জয় অস্থির হয়ে উঠল : 'আমরা যখন শহরে আসি তখন আমরাও উষসীতে উঠি।'

'সে কালে-ভদ্রে। কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দে মঙ্গল।'

'তা হোক।' অক্ষয় গোঁফের ফাঁকে হাসলেন : 'ধনঞ্জয়বাবু ঠিকই বলেছেন। মঙ্গলের দখল ওর বাপের দখল। আর মৃত্যুঞ্জয়বাবুর দখল একার পক্ষে নয়, সকল সরিকের পক্ষে। সুতরাং উষসীর আপনারাও দখলিকার। আর 'শিবালয়'?'

'ওটা ভাড়ায় আছে।'

'কিন্তু ভাড়ার টাকা সব দাদার পকেটে।' ধনঞ্জয় বললে, 'মহালের আর সব আদায় সিন্দুকে উঠলেও বাড়ি ভাড়ার টাকাটা ট্যাঁকে।'

'আর চলবে না কেরদানি।' অক্ষয় গোঁফে ফোলালেন : 'এজমালি জমির প্রতি ইঞ্চিতে এজমালি টাকার প্রতি পাইয়ে আপনাদের অংশ। জলে মিশে গেলে প্রতি জলকণায় যেমন নুন, তেমনি।'

সুতরাং শ্রীশ্রীদুর্গা বলে মামলা রুজু করে দিন।

হ্যাঁ, আজকের দিনটাই শুভ। বেলা বারোটার মধ্যেই লগ্নকাল।

'কিন্তু আমাকে একবার জিগগেস করতে কী হয়েছিল?' পুরঞ্জয়কে ডেকে পাঠালেন মৃত্যুঞ্জয় : 'সটান একেবারে আদালতে ছুটলি?'

পুরঞ্জয় দূরে দাঁড়িয়ে রইল। কথা কইল না।

'কী দরকার ছিল পার্টিশানের?' গর্জে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়।

'ভোগদখলের অসুবিধে হচ্ছিল।' পুরঞ্জয় নিম্নস্বরে বললে সংক্ষেপে।

'কী অসুবিধে?'

এর আবার ব্যাখ্যা কী! পুরঞ্জয় চুপ করে রইল।

'হাজার টাকা দরকার, আমার কাছে চাইলেই হত।'

'আপনি দিতেন না।'

'দিতাম না। কিন্তু এখন যে কত হাজার টাকা উড়ে যাবে মামলায়, তার খেয়াল আছে?'

তার আর কী করা! স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দাম দিতে হবে বৈকি। স্তব্ধতায় অনড় পুরঞ্জয়।

'উকিল-মোক্তারে আমলা-ফয়লায় লুটে খাবে।' মৃত্যুঞ্জয়ের কণ্ঠে দুঃখের সুর বাজল : 'সুখের হীরে ভেঙে কাঁচের টুকরো হয়ে যাবে।'

এক পা পিছু হটল পুরঞ্জয়। মুখে এসেছিল, যতক্ষণ আপনার ততক্ষণই সুখের হীরে, আমরা নিতে চাইলেই কাঁচের টুকরো। কিন্তু জিভকে শাসন করল, কথাটা ফুটতে দিল না। দরকার নেই দাঁড়িয়ে থেকে। কখন রাগের মাথায় কোন কথা বেরিয়ে পড়ে তার ঠিক কী।

কে জানে, মৃত্যুঞ্জয়ের আরো কোনো কথা আছে কিনা।

'স্বার্থপরের মত যদি নিজের অংশেই খুশি হতে চাস তা হলে একটা সালিশি করে বুঝসমুঝ করে নিলেই তো হত।'

এ কথাও নিরর্থক। যখন আপোষে না গিয়ে আদালতেই গিয়েছে তখন আর এ কথা ওঠে না। মীমাংসা চূড়ান্ত হয়ে যাওয়াই ভালো। রোগের আমূলে উৎখাত।

'সমস্ত পরিবারকে তুই আদালতের কাঠ-গড়ায় নিয়ে দাঁড় করাবি?'

আদালত তো ভালো জায়গা। যেখানে অন্যায়ের শাস্তি, বঞ্চনার ক্ষতিপূরণ, অবিচারের প্রতিকার।

এই তো কথা। তবে দাঁড়িয়ে থেকে কী লাভ! পুরঞ্জয় ধীরে ধীরে সরে পড়বার উদ্যোগ করল।

'কিন্তু তোকে বলে রাখছি এ তুই কেউটের গর্তে হাত দিয়েছিস।' রুখে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয় : 'সর্বস্বান্ত হয়ে যাবি।'

চলে যেতে-যেতে মনে মনে হাসল পুরঞ্জয়। সরিক যে কালসাপ এ কে না জানে!

ডেকে পাঠাতে ধনঞ্জয়ও এসে হাজির হল। দশ গজ দূরে দাঁড়াল। খেপে গিয়ে গাল-গাল জুড়ে না চড় বসিয়ে দেন। প্রতিবাদে না হঠাৎ কিছু দুর্বিনয় করতে হয়।

'তুইও আছিস এর মধ্যে?' মুখিয়ে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়।

'পার্টিশান সুটে না থেকে উপায় কী?' ধনঞ্জয় মিনমিনে গলায় বললে।

'বলি তুই বাদী, না, বিবাদী?'

'পার্টিশান সুটে সরিকেরা সবাই বাদী।'

'আমাকে তোর শেখাতে আসতে হবে না।' তেড়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয় : 'বাদী পক্ষের মামলার খরচা কে দিচ্ছে? একা পুরঞ্জয়? না, তুইও?'

কুঁই-কুঁই করে উঠল ধনঞ্জয় : 'তা মেজদা
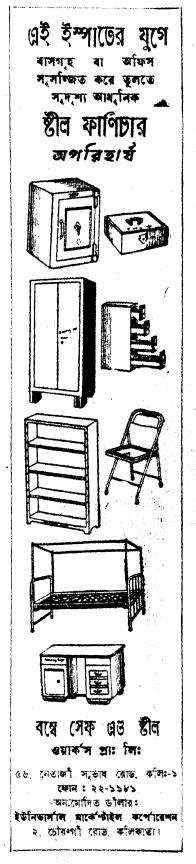
বলতে পারবে।'

শত্রুপুরীতে কখন কী অপ্রিয় কথা বেরিয়ে পড়ে সরে পড়াই সমীচীন। সরে পড়ছিল, ডাকলেন মৃত্যুঞ্জয় : 'শোন, তোদের বলে রাখছি, আমার চোখের সামনে যেন কোনোদিন না পড়িস। যেন কোনোদিন আর তোদের মুখদর্শন না করতে হয়।'

আপনি অমনি হুট করে না ডাকলেই মুখদর্শন করতে হয় না। জিভের ডগায় এসেছিল কথাটা, ফিরিয়ে নিল ধনঞ্জয়।

উষাবালা বললে, 'তোমার এ রাগের কোনো মানে হয় না।'

'মানে হয় না?' মৃত্যুঞ্জয় রুখে উঠলেন : 'তাই বলে ওরা আমার বিরুদ্ধে মামলা করবে? কজ অফ য়্যাকশান বা মামলার কারণ বলতে বলবে আমি ওদের আপোষে বাঁটোয়ারা করে দিতে রাজি হইনি? মিথ্যে কথা বলবে?'

'বা, তাই বলে ওরা ওদের ন্যায্য অংশ বুঝে নেবে না?'

'কে বলে নিচ্ছে না? খরচ খরচা বাদ দিয়ে যা নিট মুনাফা থাকছে সমান ভাগ হচ্ছে ফি-বছর। তা ছাড়া—'

'ওরা ও হিসেব মানতে চায় না।'

'মানতে চায় না, আমাকে তা বলুক, আপোষ-রফায় বাঁটোয়ারা হোক, পাঁচজনকে ডাকুক, সালিশি করে দিক।'

'তাতে ওরা রাজি নয়। হয়তো তুমি যেটা চাইবে সেটায় ওদেরও লোভ, কিন্তু চক্ষু-লজ্জার খাতিরে বলতে পারবে না। তার চেয়ে আদালতে—'

'তার চেয়ে আদালতে—' মৃত্যুঞ্জয় জ্বলে উঠলেন : 'কিন্তু খরচের কথাটা ভাবছ? সমস্ত এস্টেটের ভরাডুবি হবে। যত রোজগার হবে আদালতের আর উকিল-ব্যারিস্টারের। তোরা লক্ষ্মীর পো-রা ভিক্ষে মেগে খাবি।'

'তার আর কী করা!' উষাবালা বললে, 'আমি তো বলি একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়াই ভালো। নিত্যি ঠেলা-মারা কথা, চিপটেন ঝাড়া—সহ্য হয় না। হাঁড়ি আলাদা হয়েও শান্তি নেই।'

কী করে হবে? ও প্রান্তে পুরঞ্জয়ের স্ত্রী জ্যোতির্ময়ী আর ধনঞ্জয়ের স্ত্রী করুণা গলাগলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি যে একখানা। আর সেখানা যে বড় তরফের। দক্ষিণ খোলা ঘরগুলি যে সব বড়র দখলে। আর মুখে জাঁক করে শুধু বলা, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি। আমার নায়েব-গোমস্তা। কখনো আমাদের বাড়ি, আমাদের গাড়ি আমাদের নায়েব-গোমস্তা বলা নেই। ঠাট-বাট বেরিয়ে যাবে এবার। তোমার গায়ের গয়নাও এজমালি টাকায়। গায়ের গয়নাও ভাগ হবে। শুধু হাঁড়ি-ভাগে কিছু হবে না, বাড়ি-ভাগ হবে। এখানে-ওখানে দেয়াল উঠবে। আর নাক-উঁচু করে তাকাতে পারবে না। তিনখানা দক্ষিণের ঘরের দুখানা আমরা নেব। পঙক্তিভোজনে আর চেয়ার পাবে না। দাঁড়িপাল্লা সমান-সমান।

হেসে-হেসে গা-টেপাটেপি করতে লাগল দুজনে।

মুখ দেখবেন না বলেছিলেন, মৃত্যুঞ্জয় আবার একবার দু ভাইকে ডেকে পাঠালেন।

গভর্নমেন্টের ঘরে মোটা একটা টাকা পাওনা হয়েছে এস্টেটের। টাকা নিয়ে সাধছে গভর্নমেণ্ট। এখন তিন সরিকে মিলে একটা যৌথ দরখাস্ত করলেই টাকাটা উঠে আসে। মৃত্যুঞ্জয় দরখাস্তে সই করেছেন, এখন দু ভাইও পিঠ-পিঠ করে দিক, সরেজমিনেই না হয় টাকাটা তিন অংশে ভাগ করে নেওয়া যাবে, সিন্দুকে উঠবে না। দরখাস্ত আর ওকালতনামা বাড়িয়ে ধরল মৃত্যুঞ্জয়।

পুরঞ্জয় গড়িমসি করতে লাগল। আর পুরঞ্জয় বেঁকলে ধনঞ্জয়ও বেঁকে।

'কেন? এ টাকাটা তো আর মামলার বিষয় নয়।' মৃত্যুঞ্জয় রুখে উঠলেন।

'বিষয় হওয়া উচিত।' বললে পুরঞ্জয়, 'উকিলবাবুকে বলি। আর্জি য়্যামেণ্ড করে ও টাকাটা ঢুকিয়ে দিই।'

'তাতে লাভ কী!' তড়পে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয় : 'আদালতে যাওয়া মানেই তো অকুলে পড়া। তার চেয়ে কেউ জানবে না-শুনবে না, আলগোছে টাকাটা তুলে নেওয়া যাবে।' প্রায় আবেদনের মত সুর বেরুল।

পুরঞ্জয় অগ্রাহ্যের হাসি হাসল। বললে, 'ও সব ফন্দিফিকিরের মধ্যে আমি যাব না। যখন মামলা হয়েছে সমস্ত পাওনা-দেনা মামলাতেই সাব্যস্ত হবে।'

'তার মানে আমি যাতে সহজে কিছু না পাই তার চেষ্টা। তোরাও যে পাবি না তাতে মাথা ব্যথা নেই, শুধু আমাকে জব্দ করা। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।'

সই না দিয়েই চলে গেল পুরঞ্জয়। আর ধনঞ্জয় তো ঢাকের বাঁয়া।

'আচ্ছা, আমি দেখব—' নিষ্ফল আক্রোশে বিড়বিড় করলেন মৃত্যুঞ্জয়।

'আপনাকে কষ্ট করে দেখতে হবে না, রিসিভার দেখবে।' পুরঞ্জয় দূর থেকে বললে।

'রিসিভার!' থাম ধরে নিজেকে সামলালেন মৃত্যুঞ্জয় : 'তার মানে', উষাবালাকে বললেন, 'আমার হাতে সম্পত্তির অপচয় হচ্ছে। তার নিবারণ দরকার।'

'যা হবার তা হোক। তুমি লড়ো। যখন যেমন তখন তেমন।' উষাবালা স্বামীকে সাহস জোগাল : 'তুমি যাও সদরে। বড় উকিল দাও।'

'হ্যাঁ, সব চেয়ে বড় উকিল দামোদর ঘোষকে এনগেজ করব। ছাড়ব না কিছু। যুদ্ধে নেমে সাজসরঞ্জামে ত্রুটি রাখব না। কিন্তু কথা হচ্ছে,' মুখ ঘোরালো করলেন মৃত্যুঞ্জয় : 'কথা হচ্ছে রিসিভার কে হয়!'

রিসিভার কে হয়!

সাবজজ কোর্টের মামলা, সাবজজই রিসিভার নিযুক্ত করবে।

এমন একজনকে নিশ্চয়ই করবে যার তেমন প্র্যাকটিস নেই। পসারওলা উকিল এ সব দিকে আসবে কেন? তার সময় কই? সেই এতে আকৃষ্ট হবে যে প্রায়-বেকার প্রায়-দুঃস্থ। ছোকরা হলে গার্জিয়ান, আধ-বয়সী হলে সাক্ষীর কমিশনার আর প্রৌঢ় হলে রিসিভার।

সাবজজের ঘরে-বারান্দায় নানারকম তদবির হচ্ছে, এভাবে ওভাবে, উপর থেকে পাশ থেকে তলা থেকে, এ-জানলায় ও-দরজায়, হাটে-মাঠে-ঘাটে, গাঁয়ে-গঞ্জে, বাজারে-ব্যাপারে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর মারফৎ, খোদ জজসাহেবের মারফৎ।

এত বড় এস্টেটের রিসিভার, মাসোয়ারা মোটা হবে নির্ঘাৎ। তারপর এদিক-সেদিক, গলি-ঘুঁজি, আনাচ-কানাচ। তদবির করার মত বিষয় বটে।

যাকেই নিযুক্ত করবে, কথা উঠবে। খুঁজে বের করবে অভিসন্ধি। স্থূলে না পায় সূক্ষ্মে যাবে।

তাই এমন একজনকে নিযুক্ত করো যে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে।

বেকার উকিলদের মধ্যে সবচেয়ে যে সিনিয়র, সেই শশধর পালিতকে সাবজজ নির্বাচিত করলে।

হ্যাঁ, মাস-মাইনে চারশো টাকা।

এখন বলো কার কী বলবার। সোর তোলো।

উকিলের দল মাথায় হাত দিয়ে বসল। এত শকুনি-গৃধিনী থাকতে শেষকালে এই বুড়ো কাক? শুঁটকো কোলকুঁজো, ঢিলে চশমা নাকের ডগায় নড়বড় করছে, গায়ে কবেকার রং-জ্বলা কোট, আলপাকা এখন লালচে মারছে, দু কনুইয়ে দুটো হাঁ, পায়ে ক্যাম্বিশের জুতো—এই বুড়ো বেরালের ভাগ্যে কিনা শিকে ছিঁড়ল শেষ পর্যন্ত! কিন্তু কিছু বলবার নেই, সাবজজের মনোনয়নই চূড়ান্ত।

অন্তত আর-কিছু বলবার নেই। সূক্ষ্ম-স্থূলে প্রচ্ছন্নে-প্রকটে কোনো রকমেই কোর্ট প্রভাবিত হয়েছে এ নালিশ কেউ করতে পারবে না।

শশধর সমস্ত নালিশের বাইরে।

এক, অথর্ব বলতে পারো। তা খুঁটির জোরে মেড়া লড়বে ভাবনা কী। আর তেমনি যদি ল্যাজে-গোবরে করে বসে, সরিয়ে দিয়ে কম-অথর্ব আরেকজনকে এনে বসালেই চলবে। যাই বলো ফুসুর-ফুসুর তে করতে পারছ না। আর তোমাদেরই মধ্যে একজন গণ্যমান্য বৃদ্ধ ভদ্রলোক যদি তাঁর

জীবিকার পথটা একটু সুগম করতে পারেন, তোমরা কেন আপত্তি করবে, করলেই বা কতক্ষণ করবে?

একেই বলে অদৃষ্ট। বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মৃত্যুঞ্জয়। কে কোথাকার একটা উড়ো লোক অকারণে চারশো টাকা মাস-মাস বার করে নেবে, এও দেখতে হবে চোখের উপর!

তার আর উপায় কী। ও প্রান্ত থেকে পুরঞ্জয় চিপটেন ঝাড়ে। আর সব নৈবেদ্যের মত এও একটা।

শশধরকে সাবজজ খাসকামরায় ডেকে আনলেন। বললেন, 'কী, পারবেন তো?'

এক গাল হাসলেন শশধর: 'কেন পারব না?'

'হ্যাঁ, পিছনে আমি আছি, ভাবনা কী?'

'নিশ্চয়ই। আমি তো এখন কোর্টের অফিসর, হুজুরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।'

'যখনই কোনো ডিফিকালটি হবে আমাকে জানাবেন, আমি ঠিক করে দেব।' সাবজজ শশধরকে আশ্বাস দিলেন: 'সব ডিরেকশান বিশদ করে বলা আছে। তবু যদি কোনো-ক্ষেত্রে অসুবিধে হয় কখনো—'

'বা, আমি তো আপনারই হুকুমের গোলাম।' কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কারের ভঙ্গিতে কুঁজো হয়ে দাঁড়ালেন শশধর।

দুজন অমর হয়ে আছে সমাজে। এক বিভীষণ আরেক হনুমান। ঘরভেদে বিভীষণ, আর খোসামোদে হনুমান।

সব সহ্য হয় মৃত্যুঞ্জয়ের। যাঁকে সকলে নজরানা দিত, এখন তাঁকেই, কী ভাগ্যের ফের, তাঁকেই সেরেস্তায়-সেরেস্তায় নজরানা জোগাতে হচ্ছে। এক ডাকে যেখানে দশটা উকিল তাঁর বৈঠকখানায় এসে জড়ো হত, সেখানে তাঁকেই কিনা উপযাচক হয়ে উকিলের বাড়ি ঘুরতে হচ্ছে। চিরদিন কারু সমান যায় না। এ হীনাবস্থাও না হয় সহ্য হয়, কিন্তু মিথ্যে, মিথ্যে সইব কী করে?

ওরা বলে কিনা 'উষসী' আর 'শিবালয়'ও এজমালি!

কে না জানে ও দুটো বাড়ি মৃত্যুঞ্জয় নিজের পয়সায় করেছেন। বাবা মারা যাবার সময় তিন ভাইকে নগদ টাকা দিয়ে যান সমান অংশে—ওরা বলুক, ঠিক কিনা, আর সেই টাকাই লগ্নি করে বাড়িয়েছি আস্তে-আস্তে—বলুক, ওরা তাই জানে কিনা, সত্যি কিনা—

'রাখুন।' বাদীপক্ষের অক্ষয় উকিল লাফ মেরে ওঠেন: 'মূলে সবই সেই এজমালি টাকা। কী দেখাবার আছে যে বাড়ির টাকাটা ব্যক্তিগত? শুধু মুখের কথা?'

'হ্যাঁ, শুধু মুখের কথা।' গর্জে উঠতে চাইলেন মৃত্যুঞ্জয়, গলায় আওয়াজ তেমনি গম্ভীর হয়ে ফুটল না, কাঁপতে লাগলেন: 'ওরা বলুক—'

'ওরা তো বলছেই, ওদের আর্জিতেই তো সেই কথা, দুটোই এজমালি—'

'সে তো আপনি বলছেন, লিখিত আর্জি বলছে', মৃত্যুঞ্জয় আবার চাইলেন হুমকে উঠতে: 'ওরা নিজের মুখে বলুক, বলুক বুকে হাত দিয়ে, আমার চোখের দিকে চেয়ে, উঠে দাঁড়াক কাঠগড়ায়—'

কোর্টভরা লোক হেসে উঠল। শুধু মৌখিক বলা না-বলায় স্বত্বের বিচার হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের ভীমরতি হয়েছে।

'এ সব নিয়ে এখন তর্ক করে লাভ কী।' দামোদর ঘোষ বললেন, 'যথাসময়ে আমরা দালিলী প্রমাণ পেশ করব। দেখাব ও দুটো বাড়ির নিউক্লিয়াস আমাদের ব্যক্তিগত টাকা।'

এখন প্রাথমিক অবস্থায়, মামলার বিচার্য বিষয়ই তো এই, কার কত অংশ এবং কোন কোন সম্পত্তি এজমালি। যদি কারু নিজস্ব স্বোপার্জিত সম্পত্তি থাকে তা নিশ্চয়ই এ মামলায় আসবে না, ছুট যাবে।

অংশ নিয়ে ঝগড়া নেই। আসল বিবাদ শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়াল 'উষসী' আর 'শিবালয়' নিয়ে। ওরা এজমালি, না মৃত্যুঞ্জয়ের স্বোপার্জিত।

বাড়ির মধ্যে নিজেকে আড়াল করবার জন্যে বেড়া তুলেছেন মৃত্যুঞ্জয়। ওদের মুখ তো দেখবই না, ওদের কথাও যেন না শুনি।

পুরঞ্জয়-ধনঞ্জয় যত না হাসে তার দশগুণ বেশি হাসে জ্যোতির্ময়ী আর করুণা।

ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত চেঁচায়।

শশধর বললেন : 'যদি বলেন তো কোর্টে রিপোর্ট করি। ইনজাংশান নিয়ে এসে বেড়া ভেঙে দি। মামলা চলা-কালে স্টেটাস-কো ডিস্টার্ব করে কী করে?'

'যাক গে। বুড়োর শখ হয়েছে, বেড়া তুলেছে।' বললে পুরঞ্জয়, 'কদিন বাদে তো কমিশনার এসে পাকা দেয়ালই গেঁথে দেবে।' তারপর ব্যঙ্গ করে বললে, 'দিনের দিন যখন আদালতে দেখা হয় তখন তো চোখে ঠুলি বাঁধতে বা কানে তুলো গুঁজতে দেখি না। তবে এবার যদি আদালতে ঠুলি আর তুলোর জন্যে দরখাস্ত করে—'

ছেলেমেয়ে স্ত্রী সবাই আবার হেসে উঠল।

রিসিভার শশধরও হাসলেন। বললেন, 'বুড়ো বয়সে যত ধেড়ে রোগ।'

যথাসময়ে মামলার রায় বেরুল।

কী হল? ডিক্রি না ডিসমিস?

ডিসমিস হয় কী করে? প্রিলিমিনারি ডিক্রি হল, উইথ কস্ট। তা হোক, কিন্তু উষসী আর শিবালয়? ওরা কী সাব্যস্ত হল? এজমালি, না, স্বোপার্জিত?

এজমালি। তার মানে ওদের মধ্যেও পুরঞ্জয় আর ধনঞ্জয়ের সমান অংশ।

'এই সাবজজের বিদ্যে?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল উষাবালা।

ও-দল আনন্দে কোলাহল করে উঠল। যত বিদ্যে বিদ্যেধরীর। গাউন পরে এজলাসে বসলেই হয় এবার।

'তুমি ভেঙে পোড়ো না। কলকাতায় যাও। হাইকোর্ট করো।' উষাবালা স্বামীকে উত্তেজিত করতে লাগল : 'ঘাড় পেতে নেবে না অপমান।'

'তুমি না বললেও যাব। যখন মামলায় পড়েছি তখন তো ভূতে ধরেছে।' স্বাস্থ্য জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, রুগ্ন ক্ষীণ কণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয় বললেন, 'তখন শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর নিষ্পত্তি নেই।'

তুমি যদি আপিলে যাও, আমরাও নিশ্চয়ই লড়ব প্রাণপণে। নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখব। পুরঞ্জয়-ধনঞ্জয়ও কাছা-কোঁচা আঁটি করল।

কিন্তু ইতিমধ্যে রিসিভার তার চূড়ান্ত হিসেব দাখিল করুক।

সাবজজের কাছে শশধর পালিত নালিশ করল।

শিবালয়ের দরুন মামলার আগেকার তিন বছরের মধ্যে কত ভাড়া আদায় করেছেন তার পাকা হিসেবের খাতা মুড়ি-চেক, বহু তলব তাগাদা সত্ত্বেও দিচ্ছেন না মৃত্যুঞ্জয়। মনগড়া এমনি একটা টানা হিসেব দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতেই সন্তুষ্ট হওয়া যাচ্ছে না, খাতা-পত্র চাই। তা ছাড়া আরো প্রকাশ, মামলা চলাকালীন শিবালয়ের দরুন বে-আইনী ভাড়া আদায় করেছেন মৃত্যুঞ্জয়। উনি অবশ্য বলছেন, অবস্থা পড়ে গিয়েছে, টাকাটা ধার নিয়েছি কিন্তু ভাড়াটে বলছে, ধার দেব কোন সুবাদে। মৃত্যুঞ্জয়কে বলছি টাকাটা আদালতে জমা দিতে, কথা শুনছে না। চোরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

কলিং বেলে প্রকাণ্ড থাবা মারলেন সাবজজ : ডাকো মৃত্যুঞ্জয়কে।

কী রকম না জানি নাকাল হন দৃশ্যটা উপভোগ করবার জন্যে পুরঞ্জয় আর ধনঞ্জয় এ পাশে ভিড়ের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে রইল।

চোরের মত, ছন্নছাড়ার মত হাকিমের খাসকামরায় ঢুকলেন মৃত্যুঞ্জয়। হাঁক নেই ডাক নেই যেন একটা রাস্তার উদ্বাস্তু।

'এই যে এসেছেন—' ব্যঙ্গের টান দিলেন শশধর। যেন এক আসামী পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, ধরা পড়েছে—এমনি ভাব করলেন। চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। কেন উঠবেন? তিনি এখন কোর্টের অঙ্গ, তাঁর ডাঁট এখন দেখে কে!

নইলে সেই শশধর, বুড়োহাবড়া, হোঁৎকা-পোঁৎকার অধম, একটা তেমন হুংকার ছাড়লে যার পিলে চার টুকরো হয়ে যায় তার এই ঔদ্ধত্য! তা এমনি বুঝি ভাগ্যের প্রহসন! দয়ে হাতি পড়লে তাকে পতঙ্গেও প্রহার করে।

কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়ালেন মৃত্যুঞ্জয়।

সাবজজ তাঁকে বসতে চেয়ার দিলেন না। কোর্টের আদেশ যে অমান্য করে সে তো ক্রিমিন্যাল!

'আপনার নামে কনটেম্পট প্রসিডিং করব।' খাঁখিয়ে উঠলেন সাবজজ।

'কনটেম্পট!'

'হ্যাঁ, জেলে পাঠাব আপনাকে।' তর্জনী তুললেন সাবজজ : 'আমার অফিসর, রিসিভারের হুকুম মানছেন না কেন?'

বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মৃত্যুঞ্জয়।

'কী অমন হাঁদারামের মত দাঁড়িয়ে আছেন? যান ভালোয়-ভালোয় আদেশ মান্য করুন, নয়তো বলে দিচ্ছি নির্ঘাৎ শ্রীঘর।' পেশকারকে ডাকালেন সাবজজ : 'ওঁর উকিলকে ডাকুন। অর্ডার সিটে সই করিয়ে নিন।'

টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন মৃত্যুঞ্জয়।

ভিড় সরে-সরে পথ করে দিল।

'এই ধনা, ও পাশে ইঙ্গিত করে ধনঞ্জয়কে ডাকল পুরঞ্জয় : 'চল উকিলের বাড়ি চল—'

সেখানে না জানি নতুন কী মজা, ধনঞ্জয় চলল সঙ্গে সঙ্গে।

অক্ষয়বাবু, আসতেই হামি হয়ে পড়ল পুরঞ্জয়। বললে, 'মশাই, আপনার ঐ সাবজজ কত টাকা মাইনে পায়? সাত শো না আট শো?'

'কেন, মাইনে দিয়ে কী হবে?' মক্কেলের চেহারা দেখে প্রমাদ গণলেন অক্ষয়।

'একটা সাতশো-আটশো টাকা মাইনের সাবজজ আমার দাদাকে অপমান করে, বলে কিনা কনটেম্পট করব, জেলে পাঠাব—'

'তা যদি অপরাধ করে থাকে—' অক্ষয় আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

'আর ঐ আপনার শশধর, মাংসে-মজ্জায় শয়তান, কদর্যেরও অধম, দাদার একটা ধমক খেলে যে অক্কা পেত, সে কিনা দাদাকে চোর বলে, ক্রিমিন্যাল বলে!' রাগে-দুঃখে মুখ চোখ লাল পুরঞ্জয়ের : 'বংশের এ অপমান আমরা সইব না।'

'সত্যি।' ধনঞ্জয়ও সায় দিল : 'দাদাকে জেলে পাঠাবে বলে! আমরা বেঁচে থাকতে! এ অসম্ভব।'

'তা হলে কী করতে চান?' একবার এর আরেকবার ওর মুখের দিকে তাকালেন অক্ষয়।

'এ মামলা আমরা তুলে নেব।' পুরঞ্জয় বললে। 'সাতশো টাকার সাবজজ, তাকে ফুটুনি করতে দেব না।'

'না, সত্যি, চালাব না মামলা।' সায় দিল ধনঞ্জয়। 'হাড়ে-বজ্জাত শশধর অনেক খেয়েছে আমাদের, আর নয়।'

'ডিক্রির পর মামলা তুলবে কী করে?' রাজ্যহারার মত মুখ করলেন অক্ষয়।

'এখনো তো ফাইনাল হয়নি। উইথড্র না করা যায়, মামলা মিটিয়ে ফেলব আমরা। সোলেনামা করে চূড়ান্ত করে নেব।'

ধনঞ্জয়ও সায় দিল : 'জগন্নাথের রথ আর টানতে পারব না।'

হৈ-হৈ রব পড়ে গেল শহরে। শুধু শহরে নয়, গাঁয়ে-গঞ্জে, মহকুমায়। এত বড় জেদের মামলা 'ফোস' হয়ে যাচ্ছে। রাগই যদি জল হয়ে যায়, তা হলে টাকা আর জল হয় কী করে?

দামোদর আর অক্ষয় বসলেন খসড়া করতে। সাঙ্গোপাঙ্গরাও বসল আশেপাশে।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে কী?

দাঁড়াচ্ছে সেই সাবেক অবস্থা। স্টেটাস কো। সেই মূলে প্রত্যাবর্তন।

আর উষসী?

'মঙ্গল আমাদেরই ঘরের ছেলে, সেটা থাকবে ওর দখলে। যেমন এতদিন ছিল।'

আর শিবালয়?

'এতদিন দাদা যেমন ভাড়া আদায় করছিলেন তেমনি করবেন।'

তা হলে কিছুই রদ-বদল হচ্ছে না?

'শুধু এক জায়গায় হচ্ছে।' হাসল পুরঞ্জয় : 'লোহার সিন্দুক থেকে টাকার থলে তুলে নেবার আগে দাদাকে জিগগেস করে নেব।'

'আর একটা না হয় সই করব নায়েবের খাতায়।' ধনঞ্জয়ও হাসল।

'শুধু এইটুকু।' হাসতে লাগল দুজনে।

প্যারিসে থাকিবার সময়ে ফরাসী সরকার দশদিনের জন্য আমাকে একটি ইংরেজি জানা 'গাইড' দিয়াছিলেন। প্রৌঢ়া শিক্ষিতা মহিলা, ইংরেজি তেমন ভাল জানেন না, কোনো রকমে কাজ চালাইতে পারেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের ভারতবাসী-দের ধর্ম কি?' আমি বলিলাম, 'ভারতবর্ষে অনেক ধর্মমতাবলম্বী লোক আছে, তবে অধিক সংখ্যক হিন্দু, ধর্মমতে আমিও এক-জন হিন্দু।' মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা হিন্দুধর্মে ঈশ্বর মান?'

আমি বলিলাম, 'হিন্দুধর্মে নিরীশ্বর মতও আছে, ভারতীয় ধর্মগুলির ভিতরে তো আছেই। তবে সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম ঈশ্বরে বিশ্বাসী।'

মহিলাটি বলিলেন, 'তোমাদের ঈশ্বর কি রকম?'

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'ঈশ্বর কি কখনও দুই রকম হয়? ঈশ্বরের মধ্যে আর তোমাদের ঈশ্বর—আমাদের ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। ঈশ্বর সকলেরই এক।'

ভদ্রমহিলা তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীতে কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'তোমরাও আমাদের ঈশ্বরকে মান?'

—'হ্যাঁ।'

—'তবু তোমরা খ্রীস্টান নও কি করিয়া?'

—'আমরা যে যিশুখ্রীস্টকে ঈশ্বরজাত একমাত্র পুত্র বলিয়া মানি না!'

এইবারে দেখিলাম, ভদ্রমহিলার বিস্ময় আর কিঞ্চিৎ নয়, বিস্ময়ের যেন তাঁহার আর কোন অন্ত নাই। এইরূপ একটি মুখভাব ব্যঞ্জিত করিয়া তিনি বলিলেন,—'মাই গড্! তোমরা ঈশ্বর মান, অথচ যিশু-খ্রীস্টকে মান না! এটা হয় কি করিয়া আমাকে একটু বুঝাইয়া দাও তো!'

আমি বলিলাম, 'আমরা যিশুখ্রীস্টকে মানি না তাহা নয়; মানুষের মধ্যে তিনি একজন মহাপুরুষ এ-কথা মানি; তিনি যে ঈশ্বরের একমাত্র সন্তান, এ-কথা মানি না।'

তিনি বলিলেন, 'তোমরা মনে কর, যিশু-খ্রীস্টের মতন ঈশ্বরের আরও অনেক সন্তান আছে?'

আমি বলিলাম, 'এই যিশুখ্রীস্টের মতন' কথাটা বলিয়া একটু গোলমাল বাধাইলে; এক্ষেত্রে আমরা কোনও তুলনা না করিয়া সোজাসুজি বলিয়া থাকি, সব মানুষ—সব মানুষ কেন—সব জীবই ঈশ্বরের সন্তান।'

—সব মানুষ ঈশ্বরের সন্তান আর যিশু-খ্রীস্ট ঈশ্বরের সন্তান—এ তো আর এক কথা হইল না। যিশুখ্রীস্টকে ছাড়া মানুষ ভগবানকে জানিতে বুঝিতে বা পাইতে পারে না—এ-কথা তো স্বীকার করিবে?'

—'তাহা কেন স্বীকার করিব?'

—'তাহা হইলে তোমরা ঈশ্বরই মান না।'

—'তাহা কেন? ঈশ্বরকে তোমরা যেটুকু মান, আমরা তাহা অপেক্ষা একটুও কম মানি না।'

ভদ্রমহিলা বিরক্তিতে হাতের একখানা খাতা ও বইকে জোরে গাড়ির বসিবার গদির উপর ধপাস করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, 'তোমাদের এই বিদ্ঘুটে হিন্দুধর্মের কোনো মাথামুণ্ডুই আমি বুঝিতে পারিলাম না।' পরক্ষণেই অবশ্য আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করিও—বিদ্ঘুটে কথাটা বলা আমার উচিত হয় নাই; তোমার মনে কোন আঘাত দিবার ইচ্ছা আমার ছিল না।'

আমি আবার হাসিয়া বলিলাম, 'সেটা তোমাকে বলিতে হইবে না, আমার মনে আঘাত দিবার ইচ্ছা তোমার থাকিবে কেন?'

আমি আর বেশি তর্ক করিলাম না; কারণ দেখিলাম, তর্ক করিয়া এ-ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ কোন লাভ নাই। খ্রীস্টীয় পরিবেশে তাঁহার মনের কাঠামোটি এমনভাবে তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে যে, যিশুখ্রীস্ট ব্যতীত কোন ভগবানের ধারণা তাঁহার মনে আসিতেই পারিতেছে না।

এই ভদ্রমহিলা কেন, ইউরোপের বিশ্বাসী অধ্যাপক-সাহিত্যিকগণের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিয়াছি, ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্ন মনীষিগণও যীশুখ্রীস্টের শরণ ব্যতীত মানবের পক্ষে অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে তাঁহাদের মনগুলিকে যেন কিছুতেই রাজি করাইতে পারেন না। সত্যস্বরূপ প্রেমস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে যতটুকু জানিতে হইবে, তাহা সবটুকুই যিশুখ্রীস্টের ভিতর দিয়া লাভ করিতে হইবে। যিশুখ্রীস্টের ভিতর দিয়া ছাড়া দিব্য সত্যের সন্ধান একটা বাজে কল্পনা মাত্র।

আর এক দিনের কথা মনে আছে। ফিলিপিনস্-এর রাজধানী ম্যানিলায় একটি বিশ্বধর্ম সম্মেলন বসিয়াছে। বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মগুলি সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। আলোচনার দুইটি পদ্ধতি। সকালে প্রকাশ্যে সাধারণ সভা; কোনও বিশেষ ধর্মের প্রতি-নিধি তাঁহার নিজের ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন; তাহার পরে চলিবে ঐ ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর। বিকালে রুদ্ধদ্বারে গোপন বৈঠক, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিগণই নিজে-দের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যা লইয়া খোলাখুলি আলাপ-আলোচনা করিবেন ও চিন্তা-বিনিময় করিবেন। কি করিয়া জানি না, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিবার জন্য ও আলাপ-আলোচনার জন্য আমি আহূত হইয়াছিলাম।

একদিন বৈকালিক অধিবেশনে কথা উঠিল, 'রেভেলেশন্' বা ঈশ্বরের আত্ম-প্রকাশের রহস্য লইয়া। সেমেটিক প্রধান ধর্মগুলি— যথা ইহুদী ধর্ম, খ্রীস্টান ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরের এই 'রেভেলেশন্' বা দিব্যপ্রকাশে বিশ্বাসী। খ্রীস্টান ধর্মের গোড়ার কথাই হইল, ঈশ্বর তাঁহার যাহা কিছু দিব্যসত্য তাহা একমাত্র যিশুখ্রীস্টের ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিয়া-ছেন। আমি আমার খ্রীস্টান বন্ধুগণকে যখন জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যত ধর্মপরায়ণ তপস্বী সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ মুক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া আপনারা কেহ বিশ্বাস্ করেন কি?' তাঁহারা সমস্বরে বলিলেন, 'না'। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন?' তাঁহাদের মুখপাত্র বলিলেন, 'যিশুখ্রীস্টের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের কাছে না গেলে মুক্তি

যে আদৌ সম্ভবই হয় না।' আমি আবার এক ধাপ নীচে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, অখ্রীস্টান ভারতবাসী কোনও লোকের মুক্তি না হয় কোনও দিন না-ই হইল; কিন্তু ভারতবর্ষের কোনও সাধক কোনও কালে দিব্যসত্যের কোনদিন কোনও রকম অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তাহা আপনারা বিশ্বাস করেন কি?'

একইভাবে দ্বিধা-সংশয়-বর্জিত উত্তর আসিল, 'না'।

এবারে আর 'কেন'র কথা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম না; কারণ 'কেন' তো জানাই আছে—ঐ এক 'কেন'—যিশুখ্রীস্টের ভিতর দিয়া ব্যতীত কোনও দিব্যানুভূতি মানুষের কাছে আসিয়া পৌঁছিতেই পারে না। যাঁহারা এ-কথা বলিতেছিলেন, তাঁহারা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লোক, তাঁহারা বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক দিন ধরিয়া ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া দেখিয়াছি, তাঁহারা সজ্জন, অযথা কোনও লোকের মনে আঘাত করিবার কোন ইচ্ছা তাঁহাদের মোটেই নাই।

আমরা যাহারা ভারতীয় হিন্দু, আমাদের নিকটে কিন্তু কথাটা আবার অত্যন্ত বিস্ময়কর। যাহারা গোঁড়া হিন্দু, তাহাদের নিকটেই নহে, যাহারা খোলামনে অন্য ধর্মকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও মূল্য দিতে প্রস্তুত, তাহাদের কাছেও। এত বড় একটা দুনিয়া পড়িয়া রহিল, চারিদিকের এত বড় একটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—লক্ষ লক্ষ বৎসরের তাহার ইতিহাস; আর যে বিশ্বপ্রকৃতির সুদীর্ঘকালের বিবর্তন—এত যে প্রাণি-কুলের জীবনযাত্রার অজস্র ধারা—তাহার আর কোথাও বিধাতার কোন সত্যের বিন্দুমাত্র প্রকাশ ঘটিল না? এ বিষয়ে দেখিয়াছি, খ্রীস্ট বিশ্বাসিগণের মনের মধ্যে একটি স্থিরবন্ধ ছক রহিয়াছে, ইহার বাহিরে অতি কম লোকই যাইতে পারেন। ইউরোপের দু'একটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপকগণের সঙ্গে কথা বলিয়া দেখিয়াছি; তাঁহারা পণ্ডিত—তাঁহারা মনীষী—এ-বিষয়ে মনে কোন সংশয় দেখা দেয় নাই; কিন্তু যিশুখ্রীস্ট সম্বন্ধে চিত্তের যে একটা 'ফিক্সেশন্' বা স্থিরবন্ধতা ইহার নড়চড় হইবার সম্ভাবনা দেখি নাই।

যিশুখ্রীস্টের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার অভাব নাই; তাঁহার অনেক বাণী আমাদিগকে অবনতশির শুশ্রূষু করে, আমাদের মন করুণায় বিগলিত করে, আবার প্রেরণায় উদ্দীপ্তও করে; তথাপি দেখিয়াছি, যিশু-খ্রীস্টকে লইয়া খ্রীস্টধর্মের অনেক কথা আমাদের নিকটে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু ঠিক আবার একইভাবে দেখিয়াছি, একেবারে আজগুবি মনে হয় হিন্দুধর্মের বহু জিনিস বিদেশীয়দের কাছে। আশ্চর্য এই, সেগুলি যে এত আজগুবি মনে হইতে পারে, তাহা আমাদের পূর্বে কোনও দিন সচকিত করে নাই। ম্যানিলাতেই একদিন একটি ক্যাথলিক ফাদার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে সাগ্রহে ব্যক্তিগতভাবে কিছু আলাপের জন্য আসিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার সামনে যখন আমাদের ধর্মের মোটামুটি একটি তত্ত্বরূপ তুলিয়া ধরিতেছিলাম, তিনি খানিকক্ষণ শুনিয়া একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'দেখ, তোমাদের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মোটামুটি এসব কথা আমি আরও শুনিয়াছি; কিন্তু একটা কথা তোমাকে অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্য সত্য তোমাদের দেশে যে ধর্ম চলিতেছে, তাহা কি তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই—না অন্যরূপ?'

কথার সুর শুনিয়া বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, সাহেব নিজে আমাদের দেশে আসিয়াছেন এবং নিজের চোখে বহু জিনিস দেখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শুধু অমূর্ত তত্ত্বালোচনা এবং মহৎ আদর্শের প্রচারের দ্বারা সাহেবের মন বেশি ভিজান যাইবে না। আমি সহৃদয়ের সুরে বলিলাম, 'আমাদের ধর্মের ঠিক কোন জিনিসটা তোমার খারাপ লাগিয়াছে আমাকে বল, আমি সেটার সত্যরূপ কি তাহা তোমার কাছে উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব।'

দেখিলাম, ক্যাথলিক ফাদার নিতান্ত ভদ্র। খানিকটা ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলিলেন, 'না, ঠিক খারাপ লাগিয়াছে, এ-কথা বলা বোধহয় শোভন হইবে না। তবে জিনিস-গুলি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। ধর তোমাদের শরৎকালের দুর্গাপূজার কথা। তোমরা বল, যে পরম-সত্যকে তোমরা নির্গুণ নিরাকাররূপে ব্রহ্ম বল, তাহাকেই আবার সগুণ সক্রিয়রূপে একটি সর্বব্যাপী এবং সর্বকর্ত্রী শক্তিরূপে আরাধনা কর। বেশ, তাহা না হয় বুঝিলাম; কিন্তু সেই সর্বব্যাপিণী সর্বশক্তির সঙ্গে আবার একটি বাহন সিংহ, ডাইনে বাঁয়ে দুই ছেলে, দুই মেয়ে—ইহারা সব আসিয়া জটিল কখন কি প্রকারে তাহা ত বুঝিলাম না।' বলিয়াই তিনি প্রত্যুত্তরের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

কথাটা শুনিয়াই আমি মনে মনে ভাবিতে-ছিলাম, একজন বিদেশীয়ের পক্ষে প্রশ্নটা একেবারে অবশ্য অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনের মধ্যে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে পাইলাম, সে কি? আশ্বিন মাসে মা আসিবেন, সঙ্গে দুই দিকে দুই ছেলে কার্তিক-গণেশ আসিবে না, দুই কন্যা লক্ষ্মী-সরস্বতী আসিবে না—তবে এ আসায় কাহার মন ভরিবে? কোনো বাঙ্গালীর নিশ্চয়ই নয়। মা আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আবার কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী কেন আসিল—এ কি আর একটা প্রশ্ন হয়? মা আসিলে ইহাদের সকলের যে সঙ্গে আসিতেই হইবে। আমি ক্যাথলিক ফাদারটির দিকে তাকাইয়া বলিলাম, 'দুর্গা দেবী সম্বন্ধে তোমার আর কি মনে হইয়াছে বল, আমি এক সঙ্গে তোমার সব কথার উত্তর দিব।'

তিনি দেখিলেন, আমি মনে তেমন কোন আঘাত পাই নাই; তাহাতে তিনি উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, 'দেখ, দুর্গাদেবীর দুই ছেলের মধ্যে কার্তিকের কথা না হয় বুঝি। সে সুপুরুষ, সে একজন সেনাপতি—বেশ কথা। তোমাদের ভারতবর্ষের 'জাতীয় পাখী' হইতেছে ময়ূর, তাহাকে তোমরা এই কার্তিকের বাহন করিয়া দিয়াছ, তাহাতেও তোমাদের একটা শিল্প-সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সত্য বলিতে, তোমাদের গণেশ দেবতাটিকে আমি কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। একে অকারণে চারিখানি হাত—তাহাতে আবার ঘাড়ের উপরে একটি হাতীর মুণ্ড!'

আমি বলিলাম, 'তুমি অকারণে চারিখানি হাত বলিতেছ কেন?'

তিনি বলিলেন, 'তোমাদের মা দুর্গার না হয় যুদ্ধ করিতে হয়, তাহার জন্য দুইখানি হাতের পরিবর্তে না হয় দশখানি হাতের প্রয়োজন বুঝিলাম; কিন্তু তোমাদের গণেশ দেবতা তেমন কোন কাজ করেন বলিয়া তো আমার জানা নাই; তাহার চারিখানি হাত তো একেবারে অকারণে বলিয়া মনে হইয়াছে।'

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, 'বেশ তাহার পরে—'

তিনি বলিলেন, 'তাহার পরে দেখ, তোমাদের গণেশের যে সংস্কৃতে লেখা ধ্যান আমি দেখিয়াছি, তাহাতে সে খর্ব হইলেও তো বেশ স্থূলতনু'—

আমি ভ্রূ কুঁচকাইয়া বলিলাম, 'তাহাতে কি ক্ষতি হইয়াছে?'

তিনি বলিলেন, 'না ক্ষতির কথা কিছু নয়, তবে অতবড় স্থূলতনু দেবতা, তাহার বাহনটি তোমরা মূষিক করিতে গেলে কেন?

আমি চট করিয়া কোন উত্তর দিলাম না। আমাকে গম্ভীর দেখিয়া ফাদারটি আবার সবিনয়ে বলিলেন, 'তুমি আমার কথায় মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইতেছ না তো?'

আমি অবস্থাটিকে অত্যন্ত সহজ করিয়া লইবার জন্য মৃদু হাসিয়া বলিলাম, 'না,

পলাটি পাছু হেরি

শিল্পী : তুফান রাফাই

আমি ক্ষুণ্ণ হই নাই, তোমার আরও যাহা বক্তব্য আছে বলিয়া যাও—'

তিনি বলিলেন, 'না, আর বেশি বলিয়া কি হইবে,—সেই একই তো কথা। তোমাদের শ্বেতবর্ণা সরস্বতী দেবীকে যে তোমরা শ্বেতপদ্মের সঙ্গে যুক্ত করিয়া শ্বেত মরাল-বাহিনী করিয়া দিয়াছ, তাহা ধর্মের দিক হইতে না হোক, শিল্পের দিক হইতে আমার ভালই লাগে। কিন্তু মুসকিলে পড়ি তোমাদের লক্ষ্মীকে লইয়া। তিনি-না শ্রী এবং সম্পদের দেবী—তাহাকে তোমরা অমন কালো ভূতুড়ে একটা প্যাচা জোগাড় করিয়া দিয়াছ কেন বলিতে পার?'

মুশকিলে যে আমিও একটু না পড়িলাম এমন নয়। খর্ব স্থূলতনু গজেন্দ্রবদন লম্বোদর গণেশ ঠাকুরকে বহন করিয়া বেড়াইবার জন্য কেন যে মূষিক জোগাড় করিয়া দিয়াছি এবং শোভা-সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে যে কেন পেচকবাহনা করিয়া দিয়াছি, এক কথায় তাহা বলা শক্ত। কিন্তু মজা এই, ইহার মধ্যে সাদামাটা দৃষ্টিতে এতবড় যে একটা অসঙ্গতি রহিয়াছে, এতদিন তো তাহা চোখে পড়ে নাই! প্রশ্নবাণে আহত হইয়া এখন তো দেখি, জিনিসটায় আমারও একটু কিন্তু কিন্তু ঠেকিতেছে! অবশ্য তর্ক যদি করিতে হয়, তবে চট করিয়া তর্কে আমি পরাজিত হইব না; কারণ এই সব বাহন-প্রথার পিছনেই হিন্দুগণ যে গভীরতত্ত্ব একেবারে কিছুই আবিষ্কার করেন নাই তাহা নহে। গণেশ হইলেন সিদ্ধিদাতা গণেশ। যাঁহাদের ব্যবহারিক বাসনা, তাঁহাদের ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ শব্দের অর্থ ব্যবহারিক কার্যসিদ্ধি লাভ; কিন্তু যাঁহাদের অধ্যাত্ম বাসনা, তাঁহাদের ক্ষেত্রে সিদ্ধি অর্থ মুক্তি: সুতরাং সিদ্ধিদাতা গণেশ সেখানে দেখা দেন মুক্তিদাতারূপে। বেদ-ভাষ্যকার স্বয়ং সায়নাচার্য বলিয়াছেন, 'মুষ্ণাতি অপহরতি কর্মফলানি ইতি মূষিকঃ'— যাহা কর্মফলসমূহ অপহরণ করে, তাহাই হইল মূষিক। অতএব তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে গণেশের মূষিকবাহন হইবার ভিতরে কোনই অসংগতি নাই। তাহার পরে দেখি, লক্ষ্মীর বাহন করা হইয়াছে সেই প্রাণীটিকেই, যে হইল সর্বদা আলোভীত। আলোভীত শব্দের অর্থ হইল জ্ঞানভীত। সম্পদের সঙ্গে বিশুদ্ধজ্ঞানের নিত্যবিরোধ; উভয়ের পরস্পর-বিরোধী পন্থা। সুতরাং লক্ষ্মীর বাহনরূপে যে আলোভীত পেচককে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহাতে অসংগতি তো কিছু নাই-ই, বরঞ্চ সে দৃষ্টিতে বিষয়টি তো সুসঙ্গতই হইয়াছে। কথা আরও আছে। আলোভীত পেচকের বিশুদ্ধজ্ঞানবিরোধিতা সূচিত হইয়াছে, তাই বলিয়া পেচক কিছু বোকা প্রাণী নহে; বরঞ্চ ব্যবহারিক বুদ্ধিতে সে বেশ পাকা এ-প্রসিদ্ধি কিন্তু অনেক দেশেই চলিত। ইংরেজিতে তো একটি প্রবাদ আছে, 'wise as an owl'—পেচকের মত বিচক্ষণ। শ্রীসম্পদের জন্য চাই এই বিচক্ষণতা—ব্যবহারিক প্রজ্ঞা, আধ্যাত্মিক বা তাত্ত্বিক জ্ঞান নহে। অতএব লক্ষ্মীর বাহন পেচক ছাড়া কে হইবে?

কিন্তু এ-সব তত্ত্ব কথা বা তর্ক কথা আমার জানা থাকিলেও আমি তাহা প্রয়োগ করি নাই, কারণ জানি, ইহাতে ক্যাথলিক ফাদারের মন ভিজিবে না, আসলে আমার নিজেরও কোন দিন মন ভেজে নাই। তবে কি মূষিকবাহন গণেশ তাহার একটা বিসদৃশতা লইয়া আমার মনে কোনো বিরূপতা জাগাইয়া রাখিয়াছিল? তাহাও তো নয়। মনে আছে ছাত্রাবস্থায় 'সিদ্ধিদাতা গণেশ' নামে পাঠ্য-পুস্তকে একটি লেখা পড়িয়াছি। লেখাটির মূল বক্তব্য ছিল এই যে, গণেশের ধ্যান-স্তিমিত শান্তসমাহিত মূর্তিখানির চারি-পাশে এমন একটি প্রশান্তির স্নিগ্ধ পরি-মণ্ডল আছে, যে তাহা মানুষের চিত্তকেও শান্ত ধীর করিয়া সর্বসিদ্ধির পথ সুগম করিয়া দেয়; তাই আমরা যাত্রাকালে হোক, ব্যবসাকালে হোক—অথবা অন্য কোন কার্যারম্ভে হোক—গণেশের মূর্তিখানি সামনে রাখি, দেখিয়া যাহাতে মনে প্রসন্নতা আসে: কার্যারম্ভে চিত্তের সেই প্রসন্নতাই কার্যসিদ্ধিকে সহজ করিয়া তোলে। যখন এই লেখাটি পড়িতাম, তখন বড় ভাল লাগিত, লেখককে মনে হইত একটি বড় ঋষি! লেখাটি পড়িয়া গণেশের মূর্তির দিকে নূতন করিয়া চাহিয়া দেখিতাম—দেখিতে পাইতাম শান্ত সমাহিত নূতন মহিমা!

কিন্তু পৌরাণিক বর্ণনায় কোথাও এই প্রশাস্তির মহিমার উল্লেখ বা ইঙ্গিতমাত্র নাই। সেখানে কিন্তু দেখিতে পাই, তাঁহার গণ্ড দিয়া মদস্রাব হইতেছে, তাহার গন্ধে মধুপে সকল লুব্ধ হইয়া গণ্ডস্থলকে একেবারে 'ব্যালোল' করিয়া দিয়াছে; তাঁহার দন্তাঘাতের দ্বারা বিদারিত অরির রুধিরের দ্বারা তিনি সিন্দুরশোভা ধারণ করিয়া আছেন!

সিংহবাহনা দুর্গা, পেচকবাহনা লক্ষ্মী, মূষিকবাহন গণেশকে আমাদের তাহা হইলে এত ভাল লাগে কেন? ভাল লাগিবার কারণ তাঁহাদের আমরা তর্ক বিচারের ভিতর দিয়া পাই নাই, মূলে পাইয়াছি একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে। সেই উত্তরাধিকার আমরা শুধু আমাদের পরিশীলিত চেতনার মধ্যে লাভ করি নাই, লাভ করিয়াছি আমাদের অস্থিমজ্জার ভিতরে। অস্থিমজ্জার ভিতরে লব্ধ সেই উত্তরাধিকারের উপরে আমরা জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে কেবলই আমাদের সৌন্দর্যবোধ — আমাদের শিল্পবোধ—আমাদের পরমশ্রেয়োবোধের আরোপ করিতে থাকি। উত্তরাধিকারের সঙ্গে সহজাতভাবেই আমাদের একটা মমতাবোধ জড়ান থাকে; সেই মমতাবোধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমরা কোন বিসদৃশতা অসঙ্গতি আত্মবিরোধ আর দেখিতেই পাই না, সর্বত্রই আবিষ্কার করিতে চাই পরম সুন্দরকে, পরমপ্রেয় এবং শ্রেয়কে।

ধর্মের ক্ষেত্রে সামাজিক উত্তরাধিকারের উপরে এই সহজাত মমতাবোধ ও আকর্ষণ যে কত প্রবল হইয়া উঠিতে পারে, সেই কথাটিই বিদেশযাত্রার অভিজ্ঞতায় নানাভাবে লাভ করিয়াছি। প্যারিসে কয়েকজন জেসুইট ফাদারের সঙ্গে একদিন এক ঘরোয়া আলোচনায় বসিয়াছিলাম। বেশ মন খুলিয়া কথা বলিতেছিলাম। একজন ধর্মযাজক হাসিয়া বলিলেন, 'দেখ হে, তোমরা হিন্দুরা বড় মিস্টিক। যুক্তি দিয়া কথা তোমরা মোটে যেন বলিতেই পার না; যদি বা যুক্তি দিয়া আরম্ভ কর—একটু অগ্রসর হইতে না হইতেই তোমরা মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর ধোঁয়া ছাড়িয়া সব জিনিসটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখ।'

আমি বলিলাম, 'এরূপ একসঙ্গে সব জড়াইয়া একটা কথা বলিলে তাহার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসুবিধা; একটা বিশেষ বিষয় ধরিয়া জিনিসটি আমাকে বুঝাইয়া দিলে তবে আমি আমার বক্তব্য বলিতে পারি।'

তিনি বলিলেন, 'এই ধর তোমাদের কর্মবাদ। আরম্ভে যেন মনে হয় তোমরা যেন যুক্তি-সঙ্গত বিজ্ঞান-সম্মত একটা পথ গ্রহণ করিতেছ, একটু আগাইলেই দেখা যায়—তোমরা সব তালগোল পাকাইয়া রাখিয়াছ। কর্ম দ্বারাই যদি মানুষ সর্বভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে কর্মকেই তোমরা জগদ্ব্যাপারের পিছনে একমাত্র নিয়ন্তা বলিয়া মান না কেন? আবার সর্বনিয়ন্তা একজন ঈশ্বর মানিতে যাও কেন? কর্মেরই বা কতটুকু নিয়ন্তৃত্ব আর ঈশ্বরেরই বা কতটুকু নিয়ন্তৃত্ব? এ-বিষয়ে দেখ বরঞ্চ বৌদ্ধধর্মকে সুসমঞ্জস বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধেরা যখন কর্ম কর্তৃত্ব স্বীকার করে, তখন আর ঈশ্বর কর্তৃত্ব স্বীকার করে না; কর্ম-কর্তৃত্বের পথ ধরিয়া তাহারা তাই একেবারে নিরীশ্বরবাদী। তোমরা কর্মও মান, ঈশ্বরও মান—আবার ঈশ্বরের কৃপাও মান। কর্মফলের দ্বারাই যদি জীবের সব কিছু সাধিত হয় তোমরা তবে আর ঈশ্বর কৃপা মান কেন?'

আমি বলিলাম, 'কর্মফল এবং ঈশ্বর-কৃপার মধ্যে কোনো নিত্যবিরোধ নাই; এক জীবনে উভয়ই সুসমন্বিত হইতে পারে'—

আমাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়াই ধর্মযাজকটি বলিলেন, 'জানি জানি, তোমাদের তো সেই এক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে,—ক্ষেত্ররূপে বা বীজরূপে হইল জীব—আর বৃষ্টিরূপে হইলেন ঈশ্বর। অনেক শুনিয়াছি, শুনিতে শুনিতে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। এটাকেই আমরা বলি মিস্টিজিম্‌ম্‌-এর ধোঁয়া—খানিকটা এ-ও হয়, খানিকটা ও-ও হয়, তাহার পরে দুইটা টানিয়া কোনো রকমে মিলাইয়া দাও।'

বিষয়টি লইয়া ধর্মযাজকটি আমাকে যখন আর কথা বলিতেই দিতেছেন না তখন আমি বিষয়ান্তরের কথা তুলিলাম। আমি বলিলাম, 'দেখ, খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে আমার মনের মধ্যে একটা মস্ত বড় সংশয় রহিয়াছে, সংশয়টি আমি একেবারে খোলাখুলি উপস্থিত করিতেছি। যিশুখ্রীস্ট অবতীর্ণ হইলেন জন্মগতভাবেই পাপী যে মানুষ-সমূহ তাহাদিগকে তাঁহার অনন্ত কৃপার দ্বারা উদ্ধার করিতে। আদম-ইভের পরে যত মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে জন্মগতভাবে তাহারা সকলেই তো পাপী। যীশুখ্রীস্ট তো দুই হাজার বৎসর পূর্বে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন; তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ববর্তী যে অসংখ্য জীবসমূহ তাহারা তো পরম দয়াল যিশুখ্রীস্টের কৃপালাভে একেবারেই বঞ্চিত ছিল; তাহাদের পাপ-মুক্তির উপায় কি হইবে? আমি আরও স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাপ-মুক্তির উপায় ঈশ্বর যিশুর আবির্ভাবের পর হইতেই করিলেন,—অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিশ্বপ্রবাহের এবং জীবন-প্রবাহের ভিতরে পাপমুক্তির প্রক্রিয়াটি শুধু দুই হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই প্রবর্তিত হইল। কিন্তু কেন? দু'হাজার বৎসরের মধ্যে সৃষ্ট প্রাণিসমূহের প্রতিই বা বিধাতার এই পক্ষপাত কেন, তাহার পূর্ববর্তী হাজার হাজার বৎসরের জীবসমূহের প্রতিই বা বিধাতার এই বিরূপতা কেন? তাহারা কি বিধাতারই সৃষ্ট প্রাণী নয়? তাহাদের উদ্ধার করিবার তাঁহার কি কোন দায় ছিল না?'

প্রশ্নটা শুনিয়াই ধর্মযাজকটি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'দেখ হে, এ কেনর কোন উত্তর নাই—জগতের এইটাই হইল সবচেয়ে বড় মিস্টিসিজম্‌—সবচেয়ে বড় এবং সব চেয়ে অজ্ঞাত রহস্য! বিধাতার ইচ্ছা—তাঁহার বিধান—তাঁহার মধ্যে কি আর কেন আছে? এ মিস্টিসিজ্‌ম্‌কে সকলকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে।'

আমি স্মিত হাসিয়া বলিলাম, 'এতবড় একটা মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের মহিমা যে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে তাহা তুমি লক্ষ্য করিতে পারিতেছ কি?'

ধর্মযাজকটি আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছি; তোমার ধর্মের বিরুদ্ধে আমি যে মিস্টিসিজ্‌ম্‌-এর অভিযোগ আনিয়াছিলাম তুমি তাহারই উল্টা খোঁচা আমাকে দিবার চেষ্টা করিতেছ!'

খোঁচা কাহাকেও দিবার কোনও ইচ্ছা বস্তুতঃ আমারও ছিল না; কিন্তু আমি শুধু বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম, এই শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ এবং পরিশীলিতচিত্ত ভদ্রলোকটি হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে মিস্টিসিজম্‌-এর কথায় কেমন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আঁটসাঁট হইয়া উঠিয়াছিলেন, আর খ্রীস্টধর্মের ক্ষেত্রে মিস্টিসিজম্‌-এর কথাকে তিনিই কেমন হাসির হিল্লোলে সহজগ্রাহ্য করিয়া তুলিতেছিলেন।

ভাবিয়া দেখিলাম, আমরাও তাহাই করি। যে-ধর্মকে আলো-হাওয়ার মত জীবনের প্রথম হইতে লাভ করি তাহার সঙ্গে বহু সুখ-দুঃখে আনন্দে-অশ্রুতে নিজেকে এক করিয়া লইয়াছি। আনন্দে অশ্রুতে যাহাকে লাভ করিয়াছি নিজের ধ্যান মননকে তাহার সঙ্গে শুধু বনাইয়া লইবার চেষ্টা করি নাই, সেই ধ্যান-মননের মধ্য দিয়া যখন যাহা কিছু লাভ করিয়াছি সুন্দর মধুর এবং মহৎ, তাহাকে আমাদের সকল দেব-দেবী আচার-অনুষ্ঠান আরাধনা-উপাসনার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছি। ধর্মের মধ্যে তত্ত্বকেই আমরা প্রথম হইতে বড় করিয়া বা পরিস্ফুট রূপে পাই না; ঐতিহ্যের মধ্য দিয়া পাই দেব-দেবী বা ভগবৎ-প্রেরিত পুরুষগণকে, তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া পাই কতকগুলি উপাখ্যান-কিংবদন্তী অনুষ্ঠানউৎসব; এই সকলের সঙ্গে যুগে যুগে আমরা যুক্ত করিতে থাকি আমাদের সকল সুকুমারবোধ—আর আমাদের ভিতরকার মহত্তর প্রেরণা।

যে শেয়ালদা স্টেশনের ফুটপাথে কোলে-বাজারের বাসি শুকনো বেগুন। হরকিংকর ভটচাযির চেহারাটা দেখলে সপ্তাহ-খানেকের শুকনো বেগুনের কথাই মনে পড়ে। বাইরের চামড়াটা কুঁকড়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে ভেতরের মাংসও যেন রোদে শুকিয়ে ছোবড়া হয়ে রয়েছে। সরু লম্বা নাকটা যেন একটা বিস্ময়সূচক চিহ্ন! রঙটা এককালে বেশ ফর্সা ছিল দেখলেই বোঝা যায়—এখনও খানিকটা আছে। চোখ দুটোও বেশ বড় বড়, কিন্তু এখন ঝিমিয়ে পড়েছে—যেন একশো পাওয়ারের লাইট থেকে পঁচিশ পাওয়ারের আলো বেরোচ্ছে।

খালি গায়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে হরকিংকর নিজের পৈতেটা দুহাতে ধরে পিঠ চুলকোচ্ছিলেন। এমন সময় ডাকপিওনকে দেখে বললেন, "হরকিংকর ভটচাযির নামে কিছু আছে নাকি?"

পিওন বললে, "কোনো চিঠি নেই।"

"হরকিংকর দেবশর্মাও লেখা থাকতে পারে।"

"চিঠি থাকলে কেন দেব না বলুন?"

"ওইরকম তো তোমরা বল বাপু; অথচ লোকের চিঠি তো হারাচ্ছেও। সেবার আমার যজমানের চিঠি তোমরাই তো দেরি করে দিলে। চিঠি যখন এসে পৌঁছল তখন রমেশ ঘোষালের শ্রাদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এতে

পুরোহিত-দর্পন

শংকর

যে ব্রাহ্মণের কি ক্ষতি হয়, তা তোমরা বুঝবে কী করে?"

পিওন বিরক্ত হয়ে বললে, "আমাদের বিশ্বাস না হয়, পি-এম-জি কে কমপ্লেন করুন।"

কথা আরও বাড়তো। কিন্তু দূরে থেকে হরকিংকরের মেয়ে সুব্রতাকে দেখা গেল। সুব্রতা সকালে সরকারী দুধের দোকানে কাজ করে। সেখান থেকেই ফিরছিল। পিওনকে সেই সরিয়ে দিল। তারপর বাবাকে বললে, "আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।"

হরকিংকর গভীর হতাশার সঙ্গে বললেন, "শুধু শুধু কি আর ব্যস্ত হচ্ছি মা। নাকতলার সুদর্শন রায় কি সত্যিই এবার দুর্গা পুজো করবে না? কিন্তু কী করে তা হয়? সুদর্শনদের পুজো কি আজকের? আমার ঠাকুর্দা ওদের বাড়িতে মায়ের অর্চনা করেছেন, আমার বাবা করেছেন, আমিও করে আসছি এই এত বছর। পাকিস্তান হবার পরও তো ওদের কাজ বন্ধ হয়নি। মাকে ওরা যশোর থেকে সোজা নাকতলায় এনেছে। ঈশ্বরের আশীর্বাদে, সর্বস্ব যায়নি ওদের। এখানেও তো ক'বছর পুজো করলাম আমি। এবারই বা পুজো হবে না কেন? নিশ্চয় চিঠি হারিয়েছে!"

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিংকর বললেন, "স্বীকার করলাম, প্রথম চিঠিটা না হয় গোলমাল হয়েছে। কিন্তু আমি যে জোড়া পোস্টকার্ডে ছাড়লাম, তার উত্তর?"

সুব্রতার মুখটা এবার সত্যিই মলিন হয়ে উঠলো। "কেন বাবা, সে-উত্তর তো কালই এসে গিয়েছে!"

"কালই এসেছে? আর আমি পিওনের সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি"—হরকিংকর রেগে উঠলেন।

"আপনি তখন গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলেন", সুব্রতা উত্তর দিলে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে, হরকিংকর গুম হয়ে বসে রইলেন। সুদর্শন রায়রা এবার থেকে পুজো বন্ধ করে দিলেন। ছেলেরা পুজোটাকে বাজে খরচ মনে করছে।

হরকিংকর মুখ বিকৃত করে বললেন, "সনাতন ধর্মের কিছুই আর থাকবে না।"

সুব্রতা বললে, "বা, তুমি চা খাবে তো? জল চাপাই?"

হরকিংকর নিজের মনেই বললেন, "ভালই হয়েছে আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ওদের বড় ছেলেটা কোথাকার এক বদ্যির মেয়ে বিয়ে করেছে। বামুনের ঘরে যত অনাসৃষ্টি। সে-বাড়িতে পুজো

করে নিজের অমঙ্গল ডেকে না আনাই ভাল।"

সুব্রতা চা নিয়ে এল। হরকিঙ্কর নিজের মনেই বললেন, "ওদের কর্তা কিন্তু জানতো কেমন করে দেব-দ্বিজের সেবা করতে হয়। ওদের দেওয়া গামছাগুলোর সাইজ দেখেছিস। অন্য লোকেরা আজকাল যে গামছা দেয়, তা দিয়ে রুমালের কাজও হয় না। নামই হয়ে গিয়েছে—পুজোর গামছা!"

মেয়ে বললে, "বাবা, চা খাও।"

বাবা বললেন, "এ-যুগে আর পুরোহিতের কাজ চলবে বলে মনে হয় না। লোকে ভাবে আমরা একটা নুইসেন্স। আমরা কিছু না করেই পয়সা আদায় করি, ভিখিরীর ভদ্র-সংস্করণ।"

মেয়ে বললে, "বাবা, নবারুণ স্পোর্টিং খুব জাঁকিয়ে পুজো করছে এবার। ওদের সেক্রেটারি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। আজও বলছিলেন আপনার কথা।"

"কী বললি?" হরকিঙ্কর এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠলেন যেন কেউ ভারি বুটজুতোসমেত পা তাঁর পায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। "বারওয়ারি পুজো করতে হবে আমাকে এই বয়সে? কোনদিন হয়তো কেউ বলবে......" পরের কথাগুলো হরকিঙ্কর মেয়ের সামনে উচ্চারণ করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, "হয়তো কোনদিন আমাকে বেশ্যাবাড়িতে শীতলা পুজো করে আসবার কথাও বলবে।"

মেয়ে বললে, "সেক্রেটারি বলছিলেন, নবারুণ স্পোর্টিং-এর পুজো করবার জন্যে পুরুতদের মধ্যে কাড়াকাড়ি।"

"ভাগাড়ের মড়ার জন্যেও কাড়াকাড়ি হয়। বারওয়ারি পুজোর পত্তন করেই সনাতন ধর্ম উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। ও-সব জায়গায় পুরুত না এলেও কেউ খোঁজ করে না; একটা পুরুতেই তিনটে বারোয়ারি পুজো সারে।"

সুব্রতা চুপ করে রইল। হরকিঙ্কর বললেন, "মা মহামায়ার পুজো বলে কথা। তাঁকে তুষ্ট করে রামচন্দ্র রাবণ বধ করলেন। দেবী দশভুজা মহিষাসুর নিধন করে দেবগণকে স্বর্গে পুনপ্রতিষ্ঠা করলেন। পুজোর ত্রুটি হলে তাঁর রোষ থেকে কে আমাকে রক্ষে করবে?"

মেয়ে আর প্রতিবাদ করবার সাহস পেলে না। হরকিঙ্কর বললেন, "একবার মোড়ের বাসনের দোকানে যাবো। যদি কয়েকটা দানের সামগ্রী বিক্রি করতে পারি। বেটা দিনদুপুরে চৌরাস্তার মোড়ে বসে গলাকাটে। অমন সুন্দর পিতলের চাদরের ঘড়া, ছাঁকা কাঁসার থালা বলে কিনা আড়াই টাকার বেশী দেবে না। কিছুদিন ধরে রাখলে দাম উঠতো। কিন্তু সে সামর্থ্য কোথায়?"

সুব্রতা বললে, "দোকানদারের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি কোরো না বাবা। জানই তো ওরা চোর।"

হরকিঙ্কর ভাবলেন, "সবই ভাগ্য। মায়ের ইচ্ছা—না হলে সনাতন ধর্মের এমন সর্বনাশ হবে কেন? কেন আমাদের নিজের দেশঘর ছেড়ে এই বিদেশের বস্তিতে এসে উঠতে হবে?"

হরকিঙ্কর বাইরে যাবার জন্যে উঠে পড়েছেন। ঠিক সেই সময়ই বাইরে আওয়াজ শোনা গেল, "সুব্রতা ভট্টাচার্যের বাড়ি কোনটা?"

সুব্রতা দরজা খুলে দিয়ে অবাক হয়ে গেল। "আরে শুভ্রাদি! আপনি? এখানে?"

"কেন আসতে নেই?" শুভ্রাদি হেসে বললেন।

শুভ্রাদিকে বাবার কাছে নিয়ে এসে সুব্রতা পরিচয় করিয়ে দিলে, "বাবা, মহিলা মহাবিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপিকা শুভ্রা রায়। ইনিই আমাকে কলেজে স্কলারশিপ পাইয়ে দিয়েছিলেন।"

"ও।" নমস্কার করলেন হরকিঙ্কর। মেয়ে ততক্ষণ অতিথির দিকে একটা আসন এগিয়ে দিয়েছে। শুভ্রাদির বয়স বেশী নয়। খোঁজ করলে ওই বয়সের মেয়ে কলেজেই পাওয়া যাবে। তাছাড়া শুভ্রাদির মুখে এমন একটা লাবণ্য আছে যে মনে হয় আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে। ও'র মুখের সঙ্গে হরকিঙ্কর নিজের মেয়ের মুখটাও মিলিয়ে নিলেন। অভাবে অযত্নে থাকলেও তাঁর মেয়ের রঙটা অনেক ফর্সা, দৈর্ঘ্যেও কয়েক ইঞ্চি বেশী হবে। এত অনটনের মধ্যেও বাড়ন্ত গড়ন—দেখে কে বলবে এখনও সতেরো পুরো হয়নি।

একটু বিব্রত হয়েই হরকিঙ্কর সুবেশা শুভ্রাদিকে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, একটু বসতে দেবার জায়গাও নেই।"

"কী ব্যাপার, শুভ্রাদি?"

"ব্যাপারটা তোমার বাবার সঙ্গে। আমি তোমাদের কাছাকাছি থাকি, তাই প্রিন্সিপ্যাল বললেন তুমি নিজেই দেখা করে এস।"

"কেন বলুন তো?" হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

"কলেজে এবার আমরা দুর্গাপুজো করবো ঠিক করেছি"—শুভ্রাদি জানালেন।

"কলেজে দুর্গাপুজো, তাও কিনা মেয়ে কলেজে!" হরকিঙ্কর তাঁর বিস্ময় চেপে রাখবার কোনো চেষ্টা করলেন না।

শুভ্রা রায় স্নিগ্ধ হাসিতে মুখ ভরিয়ে ফেললেন। সুব্রতা লক্ষ্য করছিল, কি সুন্দর ব্যবহার শুভ্রাদির। শুনেছে খুব বড়লোকের মেয়ে, অথচ কেমনভাবে কথা বলেন। শুভ্রাদি বললেন, "অনেকেই কথাটা শুনে অবাক হচ্ছেন। পরিকল্পনাটা আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সুভদ্রা হালদারের। ও'র ধারণা, দেশের যা অবস্থা তাতে মেয়েদের শক্তিপুজোর দরকার হয়ে পড়েছে।"

হরকিঙ্কর বললেন, "আচ্ছা।"

শুভ্রাদি বললেন, "আমাদের মধ্যে যারা একটু তথাকথিত মডার্ন তারা খুব আগ্রহ দেখায়নি। কিন্তু প্রিন্সিপ্যালের ইচ্ছে মেয়েরা পুজো-মাইণ্ডেড হোক—তারা পুজোর কাজকর্ম শিখুক। শেলি বায়রণ, কীটস পড়ে দেশের কোনো মঙ্গলই হবে না।"

হরকিঙ্কর জানতে চাইলেন, "আগে কখনও এমন পুজো হয়েছে?"

শুভ্রাদি জানালেন, "সুভদ্রা হালদার বলেছেন, আগে কি হয়েছে না হয়েছে সে নিয়ে মাথাব্যথা করে লাভ নেই। জিনিসটা যখন ভাল, তখন করতে বাধা কোথায়? মহিষমর্দিনী পুরুষমানুষ ছিলেন না। সুতরাং মেয়েরা ইচ্ছে করলেই নতুন আদর্শ স্থাপন করতে পারে।"

হরকিঙ্কর বললেন, "পুজোর তো আর দেরি নেই।"

শুভ্রাদি বললেন, "ঠিক বলেছেন মোটেই সময় নেই। অনেকে ভয় পাচ্ছিল, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সব হয়ে উঠবে না। কিন্তু মিসেস হালদার বললেন, চব্বিশঘণ্টার নোটিশে তাঁর নিজেরই বিয়ে হয়েছিল!"

সুব্রতা যা ভয় পাচ্ছিল এবার তাই হলো। হরকিঙ্কর কোনোরকম দ্বিধা না করে শুভ্রাদির মুখের উপরই বললেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বারোয়ারি পুজোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। হাজারজন যেখানে মাতব্বর—পুজোর নাম করে সেখানে কেবল নাচগান হাসিঠাট্টা আর বেলেল্লাপনা হয়—না খেয়ে মারা গেলেও আমি সেখানে পুজো করবো না।"

সুব্রতা বাবাকে বুঝিয়ে শান্ত করবে ভেবেছিল। কিন্তু তাঁর চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে সাহস করলে না। শুভ্রাদি কিন্তু মোটেই অসন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "মিসেস হালদার আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। উনিও চান শুদ্ধ পুজো—যেখানে ধর্মীয়ভাবটা বজায় থাকবে। মাইক, আলোক-সজ্জা, প্যাণ্ডাল, প্রসেশন এসব আমরা কিছুই করবো না। আমাদের প্রতিমাও হচ্ছে শাস্ত্র-সম্মত।"

"ফিল্ম অ্যাকট্রেসের মুখের আদলওয়ালা আলট্রামডার্ন ফিগার চাইছেন না আপনারা?" হরকিঙ্কর প্রশ্ন করলেন।

চিত্রতারকার কথা উঠতেই সুব্রতা কেমন চমকে উঠেছিল। কিন্তু এ'দের দুজনের কেউই তা লক্ষ্য করলেন না।

শুভ্রাদি বললেন, "আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ইচ্ছে, সনাতন আদর্শে পুজো হোক—তবেই তো মেয়েদের মঙ্গল হবে। আমরা সব কিছুর দায়িত্ব নিজেরাই নিয়েছি। মেয়েরাই সব কিছু করছি। আমাদের সকলের অনুরোধ পুজোটা আপনি করুন। মিসেস হালদার আপনার কথা শুনেছেন কোথাও। আপনি যদি ও'র সঙ্গে একবার সময় মতো দেখা করেন।"

হরকিংকর নিজের মনকে বোঝালেন, কলেজের মেয়েদের পুজোকে বারোয়ারি পুজো বলা চলে না। শুভ্রাদিকে বললেন, আপনি আমার মেয়েটাকে সাহায্য করেছেন অনেক, কী করে ধন্যবাদ দেবো জানি না। তিনপুরুষ ধরে আমরা রায়দের বাড়িতেই পুজো করে এসেছি।—আর কোথাও কখনও বোধন করিনি। এবার করে দেখি, মা কি বলেন। আমি আজই কলেজে যাবোখন।"

হরকিংকর শুভ্রাদিকে বসিয়ে এবার উঠে পড়লেন, বাসনওয়ালার সঙ্গে এখনই দেখা করা প্রয়োজন। বেরোবার আগে মেয়েকে বললেন, "দিদিমণি তোমার বাড়িতে এসেছেন একটু চা অন্ততঃ করে দাও।"

শুভ্রাদি এবার হতশ্রী ঘরখানা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। "ছাদটা ফেটে রয়েছে দেখছি। জল পড়ে?"

"জলে ভেসে যায়।" সুব্রতা উত্তর দিলে। "প্রায় পোড়োবাড়ি।"

"কলেজ যাও না কেন?"

"অনেকদিন যাচ্ছি না। কাউকে যেন বলবেন না শুভ্রাদি। তাহলে সকালে দুধের চাকরিটাও যাবে। স্টুডেন্ট ছাড়া গভর্নমেন্ট কাউকে রাখে না।"

ঘরের অবস্থা এবং সুব্রতার মুখ চোখ দেখে শুভ্রাদি যেন সব বুঝতে পারছেন।

লজ্জা পেয়েছে সুব্রতা। বললে, "বাবার কথায় রাগ করবেন না, শুভ্রাদি। শাস্ত্রীয় ব্যাপারে ওঁকে একগুঁয়ে বলতে পারেন। ওখানে কোনোরকম শৈথিল্য সহ্য করতে পারেন না। তাই কষ্টও পাচ্ছেন।"

"কেন?"

"অনাচার হলে যজমানের মুখের উপর যা-তা বলেন। তাতে যজমান সন্তুষ্ট থাকবে কেন? পাড়ায় কিছু পুরুতের অভাব নেই। তাছাড়া আমরা বাইরের লোক, পাকিস্তানে ভিটেমাটি হারিয়ে ভাসতে ভাসতে এখানে হাজির হয়েছি। স্থানীয় যজমানরা নিজেদের লোক ছেড়ে কেনই বা বাবাকে ডাকবে?"

শুভ্রাদির চুপ করে ওর কথা শুনে যেতে লাগলেন—"বাবাকে বলি, তুমি তো লেখাপড়া জানতে, কেন এই বাজে লাইনে এলে। বাবা বলেন, ওঁদের পরিবারের অন্ততঃ একটি ছেলেকে এই লাইনে আসতে হবে, এই নিয়ম ছিল। তাছাড়া ওঁদের যৌবনকালে পুরোহিতের সম্মানও ছিল।"

"তোমার কে কে আছেন?" শুভ্রাদি প্রশ্ন করলেন।

"এক দাদা, বাইরে চাকরি করেন। মা নেই। এখন আমিই সংসার দেখছি।"

"তুমি কলেজ বন্ধ করলে কেন? বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে বুঝি?"

সুব্রতা কোনো উত্তর দিলে না, শুধু হাসলো।

"আচ্ছা এবার আসি। পুজোর ক'দিন কলেজে যেও।" বলে শুভ্রাদি বিদায় নিলেন।

সুব্রতার হাসি থেকে শুভ্রাদি কি বুঝলেন কে জানে। সুব্রতা কিন্তু গুম হয়ে বসে থাকলো। বিয়ে! বিয়েই বটে! ধানবাদে চাকুরে দাদা! তাই বটে। গতমাস থেকে টাকা আসছে না। দাদা নাকি ওখানে কি একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসেছে, রেল কলোনির কোন একটা বেজাতের মেয়ের সঙ্গে। ধন্য পুরুষ জাত। কি দায়িত্ব বোধ। একশ তিরিশ টাকা মাইনের রেলবাবুর আবার প্রেম!

বাবা যতই গলা ফাটিয়ে ধর্মের জয়গান করুন, টাকা—টাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। বেঁচে থাকতে গেলে টাকা চাই-ই।

ডাল্টন কোম্পানি এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ড্রামা সেক্রেটারি মিস্টার চ্যাটার্জি রোজ সকালে দুধ নিতে আসেন। তিনিই সেবারে বলেছিলেন—"আপনার গলায় স্বরটা খুব সুইট।"

বিরক্ত কণ্ঠে সুব্রতা জিজ্ঞেস করেছিল, "কেন বলুন তো?"

ভদ্রলোক মোটেই বিব্রত না হয়ে বলেছিলেন, "অভিনয়ের লাইনে এলে উন্নতি করতে পারতেন। আজকাল পাড়ায় পাড়ায়, অফিসে অফিসে খুব চাহিদা। আমরা হঠাৎ বিপদে পড়ে গিয়েছি। আমাদের পার্ট করছিল কমলিনী। বেচারার টাইফয়েড হয়েছে। অথচ অভিনয়ের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে স্টেজের জন্যে বুকিংও করা রয়েছে। এখন পেছোবার উপায় নেই। আসুন না। টাকা পাবেন। মেডেলও পেতে পারেন। একবার নাম হলে তখন দেখবেন বাড়িতে লোক এসে সাধাসাধি করছে।"

সুব্রতা রাজী হয়ে গিয়েছে। লুকিয়ে কয়েকদিন রিহার্সাল দিয়ে এসেছে। তারপর অভিনয়ও। মেডেল পায়নি, কিন্তু টাকা পেয়েছে ষাটটা। কাজে লেগে গিয়েছে টাকাগুলো। সুব্রতা প্রশ্ন করেছিল, "আপনাদের অফিসে একটা চাকরি পাওয়া যায় না?"

"মেমসাহেব ছাড়া এরা রাখে না। তাছাড়া, কোন দুঃখে আপনি চাকরি করতে যাবেন? এ-লাইনে চাকরির দশগুণ রোজগার করবেন। আর যদি একবার কোনো সিনেমা প্রোডিউসারের নজরে পড়ে যান, তাহলে তো কথাই নেই!"

কথাটা মন্দ বলেননি ভদ্রলোক। একবার নজরে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। মিস্টার চ্যাটার্জির এক বন্ধু স্টুডিওর অ্যাসিস্টান্ট ক্যামেরাম্যান। তার সঙ্গে দেখাও করেছে সুব্রতা। সে বলেছে, ফিচার খুব শার্প, ক্যামেরায় খুব ভাল আসবে। নায়িকা হবার সমস্ত গুণই রয়েছে আপনার। এ-লাইনে কোনো চাইকে ধরবার চেষ্টা করুন। ওই প্রথমবারই যা একটু ধরা-করা প্রয়োজন। তারপর যদি তেমন লাক ফেভার করে, সেই একই লোক আবার বাড়িতে গিয়ে সুটিং

ভেটের জন্যে কান্নাকাটি করবে।

লোকে হয়তো যা-তা বলতে চাইবে। কিন্তু কিছুই তোয়াক্কা করে না সুব্রতা। নিজের ভবিষ্যতের জন্যে তার যা খুশি সে করবে। টাকা যখন কেউ দেবে না, তখন কারুর কথাতেই সে কান দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, বাবা নিতান্তই ভাল মানুষ, একমাত্র বাবাকে নিয়েই চিন্তা। এত শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য নিয়েও অন্নের সমস্যা সমাধান করতে পারছেন না। বাবা না বুঝেই বাধা দেবেন। ওঁকে এখন কিছু না-বলাই ভাল। তবে যখন শুভ্রার অনেক টাকা হবে, সে তখন বাবাকে একটা খুব সুন্দর মন্দির করে দেবে। সেখানে নিজের মনে নিজের ঠাকুরকে পুজো করবেন। যজমানদের দরজায় দরজায় তখন ওঁকে আর ঘুরে বেড়াতে হবে না।

ভেবেছিল, শুভ্রাদিকে সে সব বলবে। কিন্তু বলা হয়নি কিছুই। বোধ হয় ভালই হয়েছে। এখন নয়। যখন সুব্রতা ভট্টাচার্য দেশজোড়া সুনাম পাবে, সবার মুখে মুখে যখন তার নাম ফিরবে, তখন সব প্রকাশ করবে। কাগজের প্রতিনিধিরা যখন তার জীবনী লিখতে আসবে, সুব্রতা তখন শুভ্রাদির মহৎ হৃদয়ের কথাও বলবে। তাঁর জন্যেই যে বিনা মাইনেতে কলেজে পড়বার সুযোগ পেয়েছিল সে কথা গোপন করবে না।

তাকের উপর টাইমপীসটার দিকে এবার নজর পড়ে গেল। বসে বসে আর সময় নষ্ট করা চলবে না। এখনই একবার বেরনো প্রয়োজন।

আর ও ভাবা চলবে না। এখনই সুযোগের সন্ধানে বেরোতে হবে।

বালিকা মহাবিদ্যালয়ে পূর্ণোদ্যমে পুজোর আয়োজন চলেছে।

হরকিঙ্কর গায়ের চাদরটা ঠিক করে নিয়ে বললেন, "শাস্ত্র মতো সব জোগাড়-যন্তর না করলে, শুধু আপনাদের নয় আমারও অমঙ্গল। দুর্গা পুজো বলে কথা। অনেক জিনিস লাগে—সিঁদুর, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চপল্লব, পঞ্চরত্ন, পঞ্চশস্য ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি, দর্পণ, তেকাঠা, তীর, পুষ্প, দূর্বা, বিল্বপত্র, তুলসী, ধূপ, দীপ, কলা গাছ, কচু গাছ, হলুদ গাছ, জয়ন্তী গাছ, ডালিম ডাল, অশোক ডাল..."

তালিকা আরও দীর্ঘ হতো, কিন্তু শুভ্রা বললেন, "আপনি চিন্তা করবেন না, আমরা সব গুছিয়ে যোগাড় করে রাখবো। আপনি শুধু পুরো ফর্দটা আমাকে দিয়ে যান।"

হরকিঙ্কর বললেন, "তুমি মা বোধহয় কখনও পুজোর যোগাড় করনি।"

শুভ্রা সলজ্জ ভাবে বললেন, "শুনেছি এক সময় নাকি আমাদের বাড়িতে পুজো হতো। কিন্তু তখন আমি খুব ছোট। এবার কিন্তু আপনার কাছে সব শিখে নেবো।"

হরকিঙ্কর অনেকদিন এমন মধুর ব্যবহার পাননি। অন্ততঃ পাঁচভূতের রাজত্বে এমন নিষ্ঠাবতীর সন্ধান পাবেন তা আশাই করেন নি। উৎসাহ দিয়ে বললেন, "কিছু চিন্তা নেই মা, এবার আমি সব শিখিয়ে দেবো আপনাদের। আমাদের মায়েদের জন্যেই তো সনাতন ধর্ম আজও কোনোরকমে টিকে আছে। লেখাপড়া জানা মায়েরা যদি আবার আগ্রহ নিয়ে সব শিখতে আরম্ভ করে, তবে আমাদের কিসের ভয়?"

শুভ্রা নম্রভাবে বললেন, "নিজের দেশের, নিজের ধর্মের নিয়মকানুন জানবো না, এটা তো গর্বের কথা নয়। এর মধ্যেই তো আমাদের দেশের, সভ্যতার এবং সমাজের যুগ যুগান্তের ইতিহাস নিহিত রয়েছে।"

"কিন্তু সে-কথা কে বোঝে মা? বারোয়ারি পুজো আমি করি না; লোকে বলে গোঁড়া পুরুত; কেউ কেউ পাগলও বলে। কিন্তু মা ওখানে পুজোর পণ্ড থাকে না। কেউ জিজ্ঞেস করে না পুজোর সব উপকরণ ফর্দ অনুযায়ী এলো কিনা। যদি কোনো কিছু না থাকে, বলবে যা এসেছে তাই দিয়ে সেরে নাও। কিন্তু মা, সেরে নেবার মালিক কি পুরোহিত? তার পিতৃপুরুষেরও জন্মাবার হাজার হাজার বছর আগে এ-সব কাগজে কলমে লেখা হয়ে গিয়েছে।"

শুভ্রা বললেন, "আমরা আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমাদের প্রিন্সিপ্যাল বলেন, যদি পুজো করতে হয় ভালভাবে করো, না হলে কোরো না।"

হরকিঙ্কর বললেন, "ফর্দ আমার মুখস্থ। বলে যাচ্ছি, টপাটপ লিখে নিন। প্রথমে নবপত্রিকার দ্রব্যাদি, নিয়ম হচ্ছে প্রতিপদ থেকে দেওয়া। প্রথম দিন—মাথাঘষা ফুলেল তেল, আতর, চিরুণী, গোলাপজল। দ্বিতীয়াতে মাথা বাঁধবার পাটি, তৃতীয়াতে দর্পণ, সিঁদুর, আলতা। চতুর্থীতে মধুপর্ক, কাঁসার বাটি, তিল, চন্দন। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ এবং অলঙ্কার।"

হরকিঙ্কর একটু থামলেন। তারপর বললেন, "বরং পুজোর ফর্দটাই আগে লিখুন—বোধনের দ্রব্যাদি......"

আমন্ত্রণের জিনিস, অধিবাসের ডালার তালিকা শেষ করে হরকিঙ্কর সপ্তমী পুজোর ফর্দ শুরু করলেন—"নারায়ণবরণ, গুরুবরণ, পুরোহিতবরণ, ব্রহ্মবরণ, সদস্যবরণ, হোতৃবরণ, আচার্যবরণ, বরণাঙ্গুরীয়, তিল, হরীতকী, পুষ্প, দূর্বা, তুলসী, ধূপ, দীপ, ধুনা......"

ছাত্রী জীবনে শুভ্রা অত্যন্ত দ্রুত লিখতে পারতেন। কিন্তু পুরুতমশায়ের গতির কাছে তাঁকে হার মানতে হলো। হরকিঙ্কর হেসে ফেললেন। বললেন, "দরকার নেই; আমিই লিখে দিচ্ছি মা। অনেকে লিস্টিও নেয় না, দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে সোজা গিয়ে সাপ ব্যাঙ যা পায় তাই কিনে নিয়ে আসে। আগেকার সে-সব দশকর্মা ভাণ্ডারও নেই—বেশীর ভাগই জোচ্চোর। যা-তা জিনিস দিয়ে দেয়।"

শুভ্রা এবার হরকিঙ্করের দিকে কাগজ এগিয়ে দিলেন। ফর্দ লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, "যে কোনো ফর্দের প্রথমেই লিখতে হয়—সিদ্ধিঃ সিদ্ধিদাতা গণেশ তবেই তো সিদ্ধি দেবেন।"

শুভ্রা পণ্ডিতমশায়ের হাতের লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লিখতে লিখতে হরকিঙ্কর বললেন, "মহাস্নানের জিনিসগুলো একটু সাবধানে যোগাড় করতে বলবেন মা। দোকানে যা দেয় তা প্রায়ই ভেজাল।"

"শুভ্রা, কাজ কেমন এগোচ্ছে?" সুভদ্রা হালদার প্রশ্ন করলেন।

"খুব ভাল। পুরুতমশাইটি চমৎকার—একটু রাগী বটে, কিন্তু নিষ্ঠাবান।"

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, "নিষ্ঠাবান পুরোহিতের আজকাল খুবই অভাব। অবশ্য দোষ আমাদেরই। আমাদের কাছে আজকাল পুরুতঠাকুরও যা রাঁধুনীঠাকুরও তাই।"

কলেজের সর্বত্র এখন পুজো পুজো ভাব। বেশ হৈ চৈ চলেছে। কাজের বাড়ির চাপে প্রিন্সিপ্যালও তাঁর চিরাচরিত গাম্ভীর্যের মুখোসটা খুলে রেখেছেন। সেই সুযোগ নিয়েই চিরসুন্দরী অর্থনীতির অধ্যাপিকা শিপ্রা মিত্র প্রশ্ন করলেন, "একথা বলছেন কেন মিসেস হালদার?"

"ঠিক কথাই বলছি। আমাদেরও তো বলতে গেলে পুরোহিতের বংশ। কিন্তু আয় নেই বলে কেউ আর ও-লাইনে যায়নি। আজকাল যার লেখাপড়া হয় না সেই যাজক হচ্ছে—কিন্তু শিক্ষিত না হলে, সে কি করে শাস্ত্র পাঠ করবে?"

অনেক অধ্যাপিকা প্রিন্সিপ্যালের কথায় সায় দিলেন। মিসেস হালদার বললেন, "এ-যুগে মুড়ি মিছরির একদর—এইটাই দুঃখ। ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একখানা সুরেন ভট্টাচার্যির পুরোহিত দর্পণ ছিল। তাতে দেখেছি তিনি দুঃখ করছেন সূপকার ষষ্ঠীপুজো করলে যা পাবে; একদল জ্ঞানী পুরুষও সেই পাবে। এই জন্যেই ভাল লোক ব্যবসা ছেড়ে যাচ্ছে।"

"সূপকার মানে কি, দিদিমণি?" স্বেচ্ছাসেবিকাদের লিডার ও ছাত্রী ইউনিয়নের সেক্রেটারি রমলা প্রশ্ন করলো।

সুভদ্রাদি বললেন, "শুভ্রা, আজকাল তোমরা কি যে বাংলা শেখাচ্ছো। আমাদের সময় বাংলার কোশ্চেনও ইংরিজী হতো—তবু আমরা অনেক কথা জানতাম। এখন তোমরা শুধু নাটক নভেল পড়াচ্ছ—তাও আধুনিক। তাই ছাত্রীরা সূপকার মানে জানে না।"

দিদিমণির কথায় রমলা লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু সুভদ্রা হালদার বললেন, "লজ্জার কিছু নেই। না-জেনে পণ্ডিত সেজে থাকার

চেয়ে, বোকার মত প্রশ্ন করে জেনে নেওয়া অনেক ভাল। সূপকার মানে রাঁধুনী—আজকাল নভেলে যাদের বাবুর্চি বলে!"

অধ্যাপিকাদের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা হালদার বললেন, "আপনারা অনেকে হয়তো এইভাবে পুজোর ব্যবস্থা করায় আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন—ভাবছেন আমি সময় এবং অর্থ অপব্যয় করছি। কিন্তু একটা দুর্গা-পুজো হাতে কলমে করলে, আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে মেয়েরা যা জ্ঞান লাভ করবে, তা দেড় ডজন টেক্সটবুক থেকেও পাবে না।"

একবার ঢোক গিলে তিনি বললেন, "কত অদ্ভুত সব জিনিস লাগে, আমি পুরুত-বাড়ির মেয়ে হয়েও খোঁজ রাখতাম না। যদি চোখ কান খুলে রেখে, ওগুলোর মধ্যে একটু ঢোকা যায়, তাহলে আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, আমাদের জীবন-যাপন সম্বন্ধে আমরা কত কি জানতে পারি!"

সুভদ্রাদি বললেন, "এই মহাস্নানের কথাই ধরু, না কেন। সপ্তমীর দিনের দর্পণ স্নান—শুভ্রা তোমার হাতেই তো লিস্টি রয়েছে, পড় না!"

শুভ্রা পড়তে লাগলেন, "শোধিত পঞ্চ গব্য—অর্থাৎ গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। শিশির, আখের রস, সাগরোদক, গজদন্ত মৃত্তিকা, রাজদ্বারমৃত্তিকা, চতুষ্পথমৃত্তিকা..." এবার হঠাৎ শুভ্রা থমকে দাঁড়ালেন।

"কী থামলে কেন? পড়ে যাও", সুভদ্রাদি বললেন।

তবু শুভ্রা আর পড়তে পারছেন না। তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো।

"কী হলো?" বলে শিপ্রা মিত্র এবার একটু সরে এসে তালিকার দিকে তাকালেন। এবার তাঁরও মুখটা যেন কেমন অপ্রস্তুত দেখালো।

"কী আছে, শিপ্রাদি?" দুজন ছাত্রী এক সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলো।

"না কিছু নয়, ও-নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।" শিপ্রাদি উত্তর দিলেন।

ঠিক বুঝতে না পেরে, প্রিন্সিপাল বললেন, "হাতে অনেক কাজ রয়েছে—এখন এ-ভাবে সময় নষ্ট করলে চলবে না। পড়ে যাও।"

শিপ্রা বললেন, "ওটা বাদ দিয়েই না হয় পড়ে যা।"

বাদ দেবার কথা উঠতেই সবার কৌতূহল যেন বেড়ে গেল। আরও কয়েকজন অধ্যাপিকা এবার শুভ্রার কাছে উঠে এসে ফর্দ'র দিকে তাকালেন। তাঁদের মুখের অবস্থাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টাতে শুরু করলো।

একজন বললেন, "সত্যি নাকি? ও-সব লাগে, তাতো কখনও শুনিনি, এতো পুজোয় গিয়েছি!"

আর একজন বললেন, "লাগে নিশ্চয়, না হলে পুরুতমশায় লিখে দেবেন কেন?"

ছাত্রীরা তখনও বুঝে উঠতে পারছে না। তারা বললে "কী দিদিমণি? পুজোতে কী লাগে?"

অধ্যাপিকারা এবার সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। শুভ্রাদি কোনোরকমে বললেন, "না কিছু নয়।" তিনি এবার সেই বিশেষ জিনিসটি বাদ দিয়ে পড়া শুরু করবার চেষ্টা করলেন—"মধু, কর্পূর, অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম......" কিন্তু বাদ দেওয়া চললো না। সবার দৃষ্টি যেন বাদ-দেওয়া জায়গাতেই আটকে গিয়েছে।

সুভদ্রা হালদার বললেন, "কী ব্যাপার?"

শুভ্রা অগত্যা এবার নিজের চেয়ার থেকে প্রিন্সিপ্যালের কাছে উঠে এসে তালিকাটা দেখালো। এবার তাঁর চোখেও বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। ঘরের মধ্যে ক'জন ছাত্রী আছে তিনি দেখে নিলেন। মাত্র দুজন। তাদের বললেন, "তোমরা এবার ফল-টলের ব্যবস্থা গুলো দেখো! আর তো সময় নেই!"

মেয়েরা বুঝলে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। তারা আর কোনো কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সিপাল এবার বললেন, "হুঁ—জানতাম না।"

শিপ্রা মিত্র বললেন, "মোস্ট এমব্যারাসিং। কম বয়সের কুমারী মেয়েরা রয়েছে। পৃথিবীতে এত জিনিস থাকতে পুজোতে কিনা বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা লাগে!"

"বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা দিয়ে কী হবে?" আর একজন অধ্যাপিকা প্রশ্ন করলেন।

"হরকিংকরবাবুর তালিকা অনুযায়ী ওই দিয়ে সপ্তমীর দিনে মহাস্নান হবে"—শুভ্রা বললেন।

ইতিমধ্যে আর সবাই লজ্জায় এমনই লাল হয়ে উঠেছেন যে কথা বলতে পারছিলেন না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, "স্বীকার করছি জিনিসটা এমব্যারাসিং—বিশেষ করে আমাদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে। কিন্তু অনেকদিন আগে থেকে যা হয়ে আসছে তার উপায় কি?"

"ওইটুকু বাদ দিলেই হয়", একজন প্রস্তাব করলেন।

সুভদ্রাদি বললেন, "তার উপায় কোথায়? বাদ দিলে সমস্ত পুজোটাই বাদ দিতে হয়।"

সুভদ্রাদি এবার সমাজনীতির অধ্যাপিকার তন্দ্রা রায়ের মুখের দিকে তাকালেন। "ব্যাপারটা কি বলুন তো? শুভকাজে এই সব নোংরামি কি করে ঢুকতে দেওয়া হলো?"

অধ্যাপিকা রায় সদ্যডক্টরেটপ্রাপ্তা। বললেন, "এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিকসটা খুঁজে দেখলে হয়। কিছু

পাওয়া যেতেও পারে। তবে আমার মনে হয়, দুটো কারণ হতে পারে।"

"কী কারণ?"

তন্দ্রা রায় বললেন, "আমাদের দেশের বিশ্বাস পতিতাগৃহে প্রবেশের পূর্বে পুরুষ তার সমস্ত সদগুণ দরজার বাইরে ফেলে রেখে যায়। হয়তো সেইজন্যেই এই মৃত্তিকা বিশেষভাবে গুণান্বিত।"

কারুর মুখেই তখন কথা নেই। সবাই, এমন কি শিপ্রা মিত্রও, তন্দ্রা রায়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তন্দ্রা রায় বললেন, "আর একটা হতে পারে, হিন্দু ঋষিরা দুর্গোৎসবে উচ্চনীচ সবার সহযোগিতা কামনা করতেন। 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' বলতে পারেন।"

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, "ইন্টারেস্টিং। তবে ছাত্রীদের সামনে এ-সব আলোচনা না করাই ভাল। আপনারা এখন যে-যার কজগুলো সেরে ফেলুন।"

হরকিংকর সন্ধ্যাহ্নিকে বসেছেন। মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা কিলবিল করছে। ছেলেটা মনের মতো হয়নি। অমানুষ, জানোয়ারও বলা চলতে পারে। না হলে নিজের সমস্ত দায়িত্ব ভুলে গিয়ে শূদ্রা রমণীর অঙ্কশায়িনী হয়ে, ধানবাদে সে কী করে পড়ে রয়েছে? কেন এমন হয়? ছেলেটা জন্মাবার আগে তিনি তো কোনো প্রকারের শাস্ত্রীয় আচরণের ত্রুটি করেন নি। যথাসময়ে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, সাধভক্ষণ, জাতকর্ম, ষষ্ঠি, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন—শাস্ত্রীয় কোনো পুজোতেই কোনো অনাচার হয়নি। তবুও ছেলেটা শেষপর্যন্ত কেন এমন হলো স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন।

মা এবার মা মহাশক্তির বোধনের সময় মার কাছে তিনি সব দুঃখের কথা নিবেদন করবেন।

কারা যেন কড়া নাড়ছে। কারা আবার এই সময় জ্বালাতন আরম্ভ করলে? বাড়িটা সত্যিই যেন ভূতের হাট হয়ে উঠছে। ওরা কারা কে জানে? মেয়েটা ওদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে মনে হচ্ছে। বলছে, "শোভনবাবু, আসুন আসুন। কতদিন খবর পাই না। শেষপর্যন্ত মনে পড়লো তাহলে?"

লোকটা যেন অভিনয় সম্বন্ধে কী আলোচনা করছে। সুব্রতাকে বলছে, "তুমি চিন্তা কোরছো কেন, তোমাকে একটা ভাল রোল দেবই।"

"সে তো কতদিন হয়ে গেল শোভনবাবু। এই অ্যামেচার থিয়েটার অসহ্য হয়ে উঠেছে। থিয়েটারের দিনটা তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু এই রিহার্সেলটাই আর পারি না। আগে তবু দু'তিনদিন রিহার্সাল হলেই চলতো। এখন চোদ্দদিন হলে বাবুরা খুশী হন। তাও ট্যাক্সি ভাড়া দিতে চান না।"

হরকিংকরের কানে কথাগুলো ভেসে আসছে। ইচ্ছে হচ্ছে একটা লাঠি নিয়ে তিনি দরজার দিকে তেড়ে যান। কিন্তু যেন পক্ষাঘাতের রোগী তিনি। আসন থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তিও নেই তাঁর।

হরকিংকর শুনলেন, মেয়ে চলচ্চিত্রে নামবার জন্যে পাগল। লোকটা বলছে, "সাইড পার্ট থেকে শুরু করো। তারপর আসতে আসতে উঠবে।"

মেয়ে বলছে, "শোভনবাবু, তা হয় না। আপনি তো এ লাইনে অনেকদিন রয়েছেন। যে হিরোইন হয়, সে প্রথম দিন থেকেই হয়। সাইডগার্ল যে সে চিরকাল সাইডগার্লই থেকে যায়।"

মেয়ে যেন শোভনবাবুর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে। বলছে, "না শোভনবাবু, আপনার 'একস্ট্রা' যোগাড় করবার কনট্রাক্ট—আপনি যোগাড় করুন, সাপ্লাই করুন। কিন্তু আমাকে ভাল একটা প্রোডিউসার ধরিয়ে দিন। সুযোগ যদি পাই, দেখিয়ে দেবো কোথায় লাগে আপনাদের......

শোভনবাবুর গলা যেন এবার নিচু খাদে নেমে এল। ফিসফিস করেই কি বলছে মেয়েটাকে। বাড়িটা হলো কি? এতো বড়ো আস্পর্ধা, বাড়ির কর্তা কি মারা গিয়েছে? কিন্তু প্যারালিসিসটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে আঙুল নাড়াবার শক্তিও নেই হরকিংকরের।

হরকিংকরের মনে পড়লো বাড়িভাড়া বাকি। মালিক উকিলের চিঠি দিয়েছে, ছাড়তেই হবে বাড়ি। ওরা বলেছে, বাড়ি ভেঙে ফেলবে। কিচ্ছু নেই বাড়িটার। অন্য বাড়ি দেখেছেন হরকিংকর। অনেক ভাড়া চায়। তিন মাসের আগাম। এখানেও সাত মাস বাকি। টাকা চাই—অনেক টাকা। তবে যদি বাঁচা সম্ভব হয়। টাকাটাই যেন বিষ হয়ে গলে গলে দেহের রক্তের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে—যেন তারই ক্রিয়ায় স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে প্যারালিসিসের সূচনা করেছে।

ওরা ফিসফিস করে কথা বলছে। হরকিংকর চোখ বুজে তখন গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন—ওং ভূভুর্বস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি......

আবার যেন বল ফিরে পাচ্ছেন হরকিংকর। তিনি এবার আসন থেকে উঠে পড়লেন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলছে, "আচ্ছা, তাই ঠিক রইল। কোনো অসুবিধে হবে না।"

ভুলে যাবার চেষ্টা করছেন হরকিংকর। যেন তাঁর চোখ কান সব বিষে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিরাট পেট নিয়ে এক সর্বভক্ষ হরকিংকর যেন শুধু বেঁচে রয়েছেন।

মেয়ে এবার বাবার দিকে তাকালে। "বেরোচ্ছিস নাকি তুই?"

"হ্যাঁ বাবা, একটু কাজ আছে।"

বাবা চুপ করে রইলেন, মেয়ে বললে, "একটা বাড়ির খবরও সেই সঙ্গে নিয়ে আসবো।"

বাবার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুচ্ছে না। মেয়ে বললে, "বাবা, তুমি কি এতো ভাবো বলতো? সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হরকিংকর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দশকর্মা ভাণ্ডারে গিয়েছেন। পুজোর জিনিসগুলো কেনবার দায়িত্ব শুভ্রা শেষপর্যন্ত ওঁর ঘাড়েই চাপিয়েছেন। পৃথিবীর যত উদ্ভট জিনিস সব এই ভাণ্ডারে পাওয়া যায়। ফর্দ মিলিয়ে কিনতে শুরু করেছেন হরকিংকর। "আপনারা সব আসল জিনিস দেন তো? না পুজোর জিনিসেও ভেজাল ঢুকেছে আজকাল?" দোকানদার বিরক্ত হয়ে বলেছেঃ "কেন বলুন তো?" হরকিংকর উত্তর দিয়েছেন "মায়ের পুজোয় আজকাল তেমন ফল হয় না কেন? হয়তো ভেজালের জন্যেই।"

দোকানদার গুম হয়ে থেকেছে। "ভরসন্ধ্যেবেলায় এমন কথা শুনিয়ে গেলেন?"

জিনিস মেলাতে মেলাতে হরকিংকর বললেন, "মৃত্তিকা কই? বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথায়?"

"নেই।"

"রাখেন না?"

"ভেজাল। এমনি মাটি তুলে পুরিয়া করে বিক্রি করি আমরা," দোকানদার উত্তর দিয়েছে।

"তাহলে চাইনে।" মুটের মাথায় মাল চাপিয়ে হরকিংকর সোজা কলেজে চলে এসেছেন। সেখানে তখন পুরোদস্তুর হৈ-হৈ চলেছে। রাত পেরোলেই পুজো। ঢাকি আসবে এখনই। আর ঢাকের বাদ্যি শুরু হলেই তো পুজো আরম্ভ হয়ে গেল।

হরকিংকর মেয়েগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এরা মা মহাশক্তির পুজো করবে? করুক না, করতে আপত্তি কি, তিনি নিজের মনেই বললেন।

শুভ্রা জিজ্ঞেস করলেন, "সব জিনিস পেয়েছেন তো হরকিংকরবাবু?"

"একটা বাকি আছে, এখনই আনছি," হরকিংকর উত্তর দিলেন।

আবার পথে বেরিয়েছেন হরকিংকর। কি যেন খুঁজছেন তিনি। জায়গাটা কোথায়? নিশ্চয় কাছাকাছি কোথাও পল্লীটা আছে। ছোটবেলায় ওঁদের দেশের পল্লীটা চিনতেন। গ্রামের এককোণে, কয়েকখানা মেটে বাড়ি। আমোদিনী দাসী বলে একটা বুড়ি ও-লাইন ছেড়ে তো দুধের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। ছোটবেলায় কয়েকবার তাঁর বাড়িতেও গিয়েছিলেন হরকিংকর। কিন্তু এখানে পাড়াটা কোথায়? খবর রাখেন না কোনো কিছুরই তিনি। রাস্তার মোড়ে পুলিশকে জিজ্ঞেস করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিছুদিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল বেশ্যাবৃত্তি

বেআইনী হয়ে গিয়েছে। সত্যিই যদি কোনো দিন পতিতাবৃত্তি উঠে যায়, তাহলে পুজোর সময় বেশ্যাদ্বারমৃত্তিকা কোথা থেকে আসবে?

কিন্তু কাগজেই তিনি পড়েছেন, আইন করে কিছুই হয়নি—ব্যবসা পুরোদস্তুরই চলেছে। সুতরাং এখন থেকে সুদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী লাভ?

পানের দোকানে খোঁজ নেওয়াই বোধ হয় ভাল, ওরা নিশ্চয় খবর রাখে। সোজা গিয়ে দোকানদারকেই প্রশ্ন করেছিলেন। ওরা ফিকফিক করে হেসেছে। 'এই বয়সেও! বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে এখনও!' একজন বললে, 'তোর অত গার্জেনগিরিতে দরকার কি? জিজ্ঞেস করছেন, রাস্তাটা বলে দে।' পানে চুন লাগাতে লাগাতে দোকানদার বলেছে, 'জরুর। বহুতে আদমীই খবর নেয়। কিন্তু ঠিক এই সময় নয়, আর কিছুক্ষণ পরে।' তারপর হরকিংকরকে আর একবার ভালভাবে দেখে, মুখ-টিপে হাসতে হাসতে বলেছে, 'নতুন শখ হয়েছে বুঝি? বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যান। মিনিট পাঁচেক পরে ডান দিকের পাকা রাস্তাটা ধরবেন। ওইখানেই সিনেমা হল। হলের পিছন দিকেই গোটা কয়েক গলি—ওইখানেই যা চাইছেন, তা পাবেন!

আর সময় নষ্ট না করে হরকিংকর এগোতে শুরু করেছেন। সিনেমার হলের কাছে আরেকটা দোকানকে জিজ্ঞেস করতে হলো। তারাও মুচকি হাসলে। বললে, 'শরাব চাই নাকি বাবু? ভাল জিনিস পাবেন।'

দাঁতে দাঁত চেপে হরকিংকর গলিতে ঢুকে পড়লেন। কয়েকটা দরজার কাছে কারা যেন সেজেগুজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরকিংকর একবার থমকে দাঁড়ালেন। গ্যাসপোস্টের আলোয় মেয়েগুলোও তাঁকে ভাল করে দেখে নিলে। এমন নামাবলী গায়ে সদ্‌ব্রাহ্মণ অতিথি তারা বড় একটা পায় না। তাই আহ্বান জানালে, 'আসবেন নাকি, ঠাকুর?'

হরকিংকর ওদের দরজার দিকে তাকালেন। লাল সিঁদুরে কী যেন লেখা—শ্রীশ্রীদুর্গা-মাতা সহায়। পাশের দরজাতেও তাই লেখা। ব্যাপার কী? এগিয়ে গেলেন হরকিংকর। এখানে লেখা—'ভদ্রলোকের বাড়ি।' হরকিংকরের দেহটা যেন ঘুলিয়ে উঠছে। তাড়াতাড়ি মৃত্তিকা সংগ্রহ করে ফিরে যেতে হবে।

এইখানটা একটু অন্ধকার মনে হচ্ছে। দরজার মাথায় মায়ের নামও রয়েছে। এ-বাড়ির মেয়েরা এখনও বেরিয়ে আসেনি। হয়তো এখনও সাজপোশাক করছে, কিংবা ওদের হয়তো বাইরে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন হয় না। এইখানকার মৃত্তিকাতেই কাজ চলে যাবে। উবু হয়ে বসে মাটি সংগ্রহ করতে বসলেন হরকিংকর। এমন সময়, কে যেন নারীকণ্ঠে বললে, 'ও-মাগো, লোকটা ওখানে বসে কী করছে?'

হৈ হৈ করে ভিতর থেকে আরও দুটো-তিনটে মেয়ে এসে হরকিংকরের হাত চেপে ধরলো। 'এই মিনসে, এখানে কী করছিস?'

হরকিংকর ঘাবড়ে গিয়েছেন। 'না মা, কিছু করছি না।'

'মুয়ে আগুন, মিনসের, ঢঙ দেখলে মরে যাই। উনি ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!'

'সত্যি বলছি মা,' হরকিংকর কাতর আবেদন করলেন।

'ওর হাতে কী রয়েছে, দেখ তো?' একজন বললে, আর একজন জোর করে হরকিংকরের মুঠোটা খুলে ফেললো। 'এক মুঠো ধুলো নিয়ে বুড়ো কী করছিল গা?'

আর একজন মেয়ে প্রসাধন অর্ধসমাপ্ত রেখেই বোধ হয় ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। গা দিয়ে তার সস্তা স্নো-এর গন্ধ বেরোচ্ছে। সে এবার ভয়ে শিউরে উঠলো। 'সর্বনাশ

করেছে, কাপালিক নিশ্চয় তুক করছিল।'

'না না, আমি পুরুত মানুষ, তুক করবো কেন?' হরকিঙ্কর একটু ভয় পেয়েই বললেন।

মেয়েদের গলার স্বরে একটা মোটকা লোকও কোথা থেকে হাজির হয়েছে। 'ঘেঁটুবাবু, দেখুন না, লোকটা এখানে বসে মাটি তুলছিল। কি তুক তাক করে গেল কে জানে।'

ঘেঁটুবাবু এবার হরকিঙ্করের গলার চাদরটাকে টেনে ধরলো। অশ্লীল গালি দিয়ে বললে, 'তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো।'

'বিশ্বাস করুন, আমি কেবল এখানকার মৃত্তিকা নিতে এসেছি দুর্গাপুজোর জন্যে।'

ঘেঁটুবাবু হরকিঙ্করের হাতে আচমকা একটা থাপ্পড় দিলে। সমস্ত মাটিটা ঝরে পড়ে গেল। মেয়েরা বললে, 'কী সর্বনাশ গো, এত বাড়ি থাকতে আমাদের দরজা থেকে মাটি তোলা। মরণ আর কি, গতর বেচে করে খাচ্ছি, তাও সহ্য হচ্ছে না মিনসের।'

ঘেঁটুবাবু বললে, 'যা, শালা! আর খবরদার মাটি নিতে আসিস না এখানে। তাহলে জান নিয়ে লেবো।'

ঘেমে নেয়ে উঠেছেন হরকিঙ্কর। উত্তেজনায় দেহটা কাঁপছে। সামান্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করতে এসে এ কি বিপত্তি। কেন বাপু, সামান্য একটু মাটি নিলে কি তোমাদের ক্ষতি হতো।

হরকিঙ্করের দেহটা ঘিনঘিন করছে। যেন কয়েকটা নর্দমার ধেড়ে ইঁদুর তার গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে গেল। স্নান করতে হবে তাঁকে। গঙ্গাজলে নিজেকে পবিত্র করতে হবে।

কিন্তু মাকে কী দিয়ে স্নান করাবেন তিনি? মহাস্নানের সময় এই মৃত্তিকা আসবে কোথা থেকে? পাগল নাকি তিনি? এত ভাববার কী আছে? হাজার পুজো তো দশকর্মাভাণ্ডারের ভেজাল মাটি দিয়েই হচ্ছে। আরেকটা হবে।

একটা রিকশা ডাকবেন নাকি হরকিঙ্কর? কিন্তু এই অবস্থায় রিকশায় চড়লে লোকে মাতাল ভাববে। হাঁটছেন হরকিঙ্কর।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছেন হরকিঙ্কর। ক্যাঁচ করে একটা মোটর এসে প্রায় ঘাড়ের কাছে থামল। গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবিপরা এক ভদ্রলোক নামলেন। পেটটা বেশ মোটা, গলায় হার ঝুলছে। "সুব্রতা দেবীর বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? ক্লাবে ক্লাবে থিয়েটার করে বেড়ায়।"

হরকিঙ্কর বিরক্তভাবে লোকটার মুখের দিকে তাকালেন। "সুব্রতা দেবীর বাড়িতে এত রাতে দেখা হয় না।"

লোকটা এবার নেশার ঘোরে খিলখিল করে হাসতে লাগল। "মাইরি আর কি? গোঁসাই বাড়ির মেয়ে বুঝি।"

"যা বলছি, তাই শুনুন। সুব্রতা এমন সময় কারুর সঙ্গে দেখা করে না।"

"আহা-হা, চু চু! তাহলে সব বলবো নাকি? কিন্তু কে হে তুমি বাবার ঠাকুর?"

"মুখ সামলে কথা বলুন বলছি।"

"ওরে বাপ্‌রে, মানে মানে কেটে পড় বাছাধন, নইলে স্রেফ ট্রেনে কাটা পড়বে।"

"এটা ভদ্দরলোকের পাড়া, যদি বেশী কিছু করেন।"—হরকিঙ্করের দেহে শক্তি থাকলে লোকটার গালে একটা থাপ্পড় মারতেন।

"ও বাবা! সুব্রতাকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো, কবে থেকে উনি ভদ্দরলোকদের পাড়ায় উঠে এসেছেন!"

দুজনেই এবার বাড়ির দরজার সামনে হাজির হয়েছেন।

আর চুপ করে থাকতে পারলেন না হরকিঙ্কর। হাতবাড়িয়ে ভদ্দরলোকের পাঞ্জাবির উপরের দিকটা ধরবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু লোকটার সঙ্গে তিনি পারবেন কী করে? এক ঝটকায় সে হরকিঙ্করকে মাটিতে ফেলে দিলে। "শালা, আমি ভেবছিলাম, আমিই শুধু মাতাল হয়েছি। দেখছি, তুমিও মাল টেনেছো।"

লোকটা হয়তো এবার হরকিঙ্করের বুকের উপর চেপে বসতো। হরকিঙ্করও গড়াতে গড়াতে লোকটার পা ধরে ফেলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। হয়তো সর্বনাশা কিছু একটা ঘটতো। কিন্তু গোলমাল শুনে সুব্রতা এসে দরজা খুলে দিয়ে থমকে দাঁড়াল। "এই যে সুব্রতা দেবী। একটু আগে আপনি বাড়িতে আসতে বারণ করে দিলেন। কিন্তু আপনি চলে আসবার পর দেখলাম, হাতে কাজ নেই। আপনাকে দেখবার জন্যে মনটাও কেমন হুহু করতে লাগল।"

হরকিঙ্কর মাটি থেকে উঠে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "মা তুই ভিতরে চলে যা। কোথাকার মাতাল এসে পাড়ায় ঢুকেছে। কোত্থেকে তোর নাম জেনেছে। আমি ওর দেখাচ্ছি মজা।"

কিন্তু এ কি হলো? মেয়েটা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন?

লোকটা বললে, "কোথাকার এই বুড়োটাকে আপনার বাড়ির খোঁজ জিজ্ঞেস করে ফ্যাসাদে পড়েছি। আপনি তৈরি হয়ে নিন। গাড়ি নিয়ে এসেছি"

সুব্রতা তখনও পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আস্তে আস্তে বললে, "আপনি এখন যান। আমি যাবো না।"

"কেন কী হলো আপনার? এই তো কিছুক্ষণ আগে হোটেল থেকে এলেন। ডার্করুমে টেস্ট দিলেন। এর মধ্যেই ক্যারাকটার পাল্টিয়ে গেল? বইতে নাবার ইচ্ছে নেই বুঝি!"

"কী?" হরকিঙ্কর আবার লোকটার দিকে তেড়ে গেলেন।

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, যা-বলছি ঠিক তাই" —লোকটা দাঁত বার করে বললে।

সুব্রতা এবার চিৎকার করে উঠলো, "যান বলছি। না হলে এখনই লোক ডাকবো। চাই না আপনার বইতে পার্ট নিতে।" সুব্রতা এবার ঠক ঠক করে কাঁপছে।

লোকটা বুঝলে কোথাও আজ একটা মস্ত গোলমাল হয়ে গিয়েছে। বললে, "ঠিক হ্যায় যাচ্ছি।" তারপর হরকিঙ্করকে শুনিয়েই যেন বললে, "অন্য কারুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে নিশ্চয়।"

দরজা বন্ধ করে দিলেন হরকিঙ্কর। ঘামে নেয়ে উঠেছে তাঁর দেহটা। সুব্রতা হাঁপাচ্ছে আর কাঁপছে। কাঁপছে আর হাঁপাচ্ছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন হরকিঙ্কর। মেয়ে বললে, "বাবা"।

বাবা চুপ করে রইলেন।

মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে, "বাবা, লোকটা সপ্তমীর দিনে আমার সঙ্গে ফিল্মের কন্ট্রাক্ট সই করবে বলেছিল। এই একবারই— ঢোকবার সময় কেবল ওদের কাছে ছোট হতে হয়। তারপর নাম হয়—সব ঠিক হয়ে যায়।"

বাবা পাথরের মতো চুপ করে রইলেন।

মেয়ে ডাকল "বাবা!"

বাবা কোনো উত্তর দিলেন না।

এখন রাত অনেক। ওরা শুয়ে পড়েছে। হঠাৎ সুব্রতার ঘুম ভেঙে গেল। দরজাটা যেন খোলা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ তাই তো খোলাই রয়েছে। বাবার বিছানাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সুব্রতা। বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো, বিছানায় তো কেউ নেই।

তড়াং করে সভয়ে উঠে দাঁড়াল সুব্রতা। "বাবা, বাবা তুমি কোথায় গেলে?"

বাবা দরজার বাইরেই রয়েছেন। "বাবা, এখনও জেগে রয়েছো তুমি? কাল ভোরবেলাতেই না তোমার পুজো।"

দরজার সামনে উবু হয়ে বসে হরকিঙ্কর কি যেন করছিলেন। হরকিঙ্কর এবার মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটো রাত্রের অন্ধকারে কাপালিকের চোখের মতো জ্বলছে।

"ওখান থেকে কী কুড়োচ্ছিলে বাবা?"

হরকিঙ্করের চোখ দুটো থেকে এবার যেন সত্যিই আগুন বেরিয়ে আসতে শুরু করলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "মাটি।"

সুব্রতা বাবার মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছে। তবু কাছে গিয়ে পরম স্নেহে বাবার হাতটা জড়িয়ে ধরে বললে, "মাটি কী করবে বাবা?"

বাবা প্রথমে নির্বাক হয়ে রইলেন। মেয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁর ঠোঁট দুটো এবার কাঁপতে শুরু করলো। "পুজোয় লাগবে।" এই বলে রাতের অন্ধকারে পুরোহিত হরকিঙ্কর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে

সত্যজিৎ রায়

আজ সাধারণত যেসব ছবি দেখি তার অধিকাংশই বাস্তবধর্মী, সংলাপসম্বলিত ছবি। সবাক চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও সংলাপ-বিহীন ছবির দৃষ্টান্ত যে নেই তা নয়; কিন্তু তার সংখ্যা এতই কম যে, তাকে প্রচলিত রীতির মধ্যে আদৌ গণ্য করা যায় না। কিছু ছবি আছে—যেমন কার্টুন ছবি, বা গীতিনাট্যমূলক ছবি, বা রূপকথাসুলভ কল্পনাশ্রয়ী ছবি—যাতে বাস্তবধর্মী সংলাপের কোন শিল্পগত প্রয়োজন নেই। কিন্তু বেশির ভাগ ছবিতেই আমরা বাস্তবধর্মী সংলাপ শুনি, বা শোনার আশা করি।

চলচ্চিত্রে সংলাপ প্রধানত দুটি কাজ করে। এক, কাহিনীকে ব্যক্ত করা; দুই, পাত্রপাত্রীর চরিত্র প্রকাশ করা। সাহিত্যের কাহিনীতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে-কাজ হয়। পরিবেশ বর্ণনার জন্য কথার প্রয়োজন নেই, ছবিই সে-কাজ করে। চরিত্রবর্ণনার আকৃতিগত দিকটা ছবিতেই প্রকাশ পায়। প্রকৃতির দিকটা কিছুটা অভিনেতার ভাবভঙ্গী ও বাকিটা তার সংলাপে প্রকাশিত হয়। ছবি দিয়ে যা বলা সম্ভব হল না, সংলাপে কেবল সেইটুকু বলার চেষ্টা করা উচিত চিত্রনাট্যকারের। নতুন চিত্রনাট্যকার সব সময় এ কথাটি মনে রাখেন না, তাই তার কাজে প্রায়ই অতিকথনের দোষ লক্ষ্য করা যায়। সংলাপের মাত্রা নির্ণয় করা রীতিমত কঠিন কাজ। এই মাত্রাবোধ একবার আয়ত্ত হলে চিত্রনাট্য রচনার পথ অনেকটা সহজ হয়ে যায়।

বাংলা ছবিতে চটকদারি সংলাপের একটা রেওয়াজ অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এ ধরনের সংলাপ ছবির চেয়ে নাটকেই মানায় বেশি। নাটকে কথাই সব, ছবিতে তা নয়। নাটকের পরিবেশের সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের মিল এতই সামান্য যে, নাটকের দর্শক পাত্র-পাত্রীর মুখে বাস্তবজীবনের স্বাভাবিক কথোপকথন আশাই করে না। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংলাপও এখানে একটা সরলীকৃত, নাটকসর্বস্ব রূপ নেয়। আমাদের দেশের চিত্রনাট্যকার অনেক সময়ই এই পার্থক্যটি মনে রাখেন না। বিশেষত নায়ক-নায়িকার মুখে যেসব কথা প্রয়োগ করা হয়, তাতে বাক্‌চাতুর্য তাদের সকলেরই একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। যদি বা নাটকের তাগিদে এইসব নায়ক-নায়িকার পদস্খলন ঘটে, তবুও তাদের বাক্‌স্ফূর্তির লাঘব হয় না।

সংলাপ যদি স্বাভাবিক না হয় তাহলে অভিনয় স্বাভাবিক হওয়া মুশকিল। বাস্তবজীবনে মানুষ একই বক্তব্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করে। একই কথা অলসমুহূর্তে একভাবে, কর্মরত অবস্থায় আরেকভাবে; আনন্দে একভাবে, দুঃখে আরেকভাবে; এমনকি গ্রীষ্মে ঘর্মাক্ত অবস্থায় একভাবে এবং শীতে কম্পমান অবস্থায় আরেকভাবে ব্যক্ত হয়। নিরুদ্বিগ্ন অবস্থায় মানুষের কথার লয় হয় বিলম্বিত, উত্তেজিত অবস্থায় মানুষের কথা কেটে যায়। বাক্য উত্থিত হয় নিঃশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে।

মানুষে মানুষে শ্রেণীগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গেও ভাষার পার্থক্য এসে পড়ে। সাধারণ শিক্ষিত বাঙালি বাংলা ভাষায় ইংরিজি মিশিয়ে কথা বলেন। দেশ স্বাধীন হবার পরে কেউ কেউ ইংরিজি শব্দ বর্জন করার অভ্যাস করেছেন, কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য। শিক্ষিত বাঙালির সংলাপে ইংরিজি কথার ব্যবহার তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক।

চিত্রনাট্য রচনার সবচেয়ে বড় কথা বোধ হয় এই যে, চিত্রনাট্যকার তার নিজস্ব সত্তাকে সম্পূর্ণ বিলীন করে, তার চরিত্রের অন্তরে প্রবেশ করে সেই চরিত্রের সত্তাটিকে সংলাপের দ্বারা ফুটিয়ে তুলবেন। আরেকটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার যে, চলচ্চিত্রে সময়ের দাম বড় বেশি। যত অল্প কথায় যত বেশি বলা যায়, ততই ভালো; আর কথার পরিবর্তে যদি ইঙ্গিত ব্যবহার করা যায়, তবে ত কথাই নেই।

বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে বাস্তবধর্মী সংলাপ রচনায় অনেকেই দক্ষ, যদিও সে-সংলাপ যে সব সময় অপরিবর্তিত রূপে চলচ্চিত্রে ব্যবহার করা যায় তা নয়। কিন্তু কোন চিত্রনাট্যকার যদি সাহিত্যের সংলাপ থেকে তালিম নেবার প্রয়োজন বোধ করেন, তবে আমি একজন সাহিত্যিকের নাম নির্দ্বিধায় করতে পারি। তিনি হলেন স্বর্গত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যের সংলাপ রচনার এত বড় গুরু আর কেউ নেই। বিভূতিভূষণের সংলাপ পড়লে মনে হয়, যেন সরাসরি লোকের মুখ থেকে কথা তুলে এনে কাগজে বসিয়ে দিয়েছেন। এ-সংলাপ এতই চরিত্রোপযোগী, এতই revealing যে, লেখক নিজে চরিত্রের আকৃতির কোন বর্ণনা না দিলেও, কেবলমাত্র সংলাপের গুণেই চরিত্রের চেহারাটি যেন আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও স্মরণ-শক্তি না থাকলে এ ধরনের সংলাপ সম্ভবপর নয়। বলা বাহুল্য, চিত্রনাট্য রচয়িতার পক্ষেও এ দুটি গুণ অপরিহার্য।

সংলাপ-সমৃদ্ধ ছবি কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি দৃশ্য

আমোদ-প্রমোদের সকাল ও একাল

শুধুমাত্র কর্তব্যের দায়কে স্বীকার করে নিয়েই সমাজবদ্ধ মানুষ বেঁচে থাকতে পারে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মানুষের মন বিবিধ উপাদানের সাহায্যে আনন্দের মধ্যে মুক্তিলাভ করতে চায়।

যদিও সর্বত্রই মানবমনের একই প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল, তথাপি দেশভেদে, কালভেদে এই আনন্দের উপকরণের মধ্যেও প্রভূত রূপান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সমাজে প্রচলিত বহুবিধ প্রমোদ-ব্যবস্থার মধ্যে কতকগুলি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, কতকগুলির আবার রূপে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে কালগত বিবর্তনের ফলে, কিছু আবার একেবারেই হয়ে গিয়েছে বিলুপ্ত।

প্রাচীনযুগের বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত নিদর্শন থেকে দেখা যায়, তখন শিকার বা মৃগয়া করা, মল্লযুদ্ধ করা, দাবা এবং পাশাখেলা প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরেই সাধারণ প্রমোদ-ব্যবস্থারূপে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া অভিজাতসমাজে আর রাজপুরুষদের মধ্যে হস্তী ও অশ্বক্রীড়া সুপ্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যায়। সেই অতীতযুগে মেয়েরা প্রধানত গৃহাঙ্গনের সীমাতেই আবদ্ধ থাকতো তাই তাদের মধ্যে 'জলক্রীড়া, উদ্যান-রচনা, কড়ির সাহায্যে বাঘবন্দী, দশপঁচিশ, বোলঘর' প্রভৃতি খেলাই ছিল বিশেষভাবে প্রচলিত।

বাজি রেখে জুয়াখেলা, ভেড়া বা মুরগীর লড়াই-এর উপর বাজি রাখা প্রভৃতিও তখন আমোদ-প্রমোদের অঙ্গরূপেই প্রচলিত ছিল। এছাড়া তৎকালীন বিভিন্ন লিপিতে, সাহিত্যে আর একটি যে অনুষ্ঠানের বহু উল্লেখ সমাজে তার বিশেষ প্রসার নির্দেশ করে তা হল নৃত্য-গীত-বাদ্য। সমাজের সর্বত্র, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, ধর্মসাধনায়, নানা ক্রিয়া-কর্মে নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হতো। বাঙালীর আদিমযুগের সাহিত্যসাধনার একমাত্র প্রাপ্ত নিদর্শন 'চর্যাগীতিকায়' এবং মধ্যযুগের বিভিন্ন রচনায় প্রাচীনযুগের এসব প্রমোদ-ব্যবস্থার কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। 'চর্যাগীতিকার' একটি পদে 'বুদ্ধনাটক'এর উল্লেখ থাকায় এমন অনুমান হয়তো বা অসঙ্গত হয় না যে, নৃত্য ও গীতের সাহায্যে এক ধরনের নাটকের অভিনয়ও প্রাচীন বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীনযুগের এইসব আমোদ-প্রমোদই মোটামুটি ভাবে কিছুটা রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত সমাজে প্রচলিত ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার সঙ্গে গুরুতর-সংস্কৃতিগত সংঘর্ষের ফলে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে বাংলার সমাজব্যবস্থায় প্রভূত পরিবর্তন দেখা দিল, আমোদ-প্রমোদের রূপেও ঘটলো বিশেষ পরিবর্তন।

দুর্গাপুজো এবং তদুপলক্ষে নাচ-তামাসা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল। এই নাচ এবং তামাসা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আমোদ-ব্যবস্থার উপকরণ হিসেবেই প্রচলিত ছিল না, "তদ্দর্শনে এতদ্দেশীয় এবং নানা দিগ্‌-দেশীয় এবং উচ্চপদাভিষিক্ত সাহেবলোক-গণও গমন" করতেন। সেই সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে "এই সময়ে কএকদিবস আহ্লাদপূর্ব্বক আহারাদির ধুমেই" কেটে যেত। তিনদিন পুজোর পর বিসর্জনের সময় আজকাল যেমন দেবীপ্রতিমার সম্মুখে যুবকদলের নৃত্য বিশেষ প্রমোদের উপকরণ হিসেবে প্রচলিত হয়েছে, ঊনবিংশ শতকেও তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে নৃত্যটা তখন রাস্তার উপরে অনুষ্ঠিত না হয়ে হতো নৌকার উপরে দলবদ্ধভাবে। নৃত্যের মধ্যেও অবশ্য রকমফের ছিল, কখনও বাইনাচ, কখনও ভাঁড়ের নৃত্য, কখনও বা অন্যকিছু। এই বাইনাচ যে শুধুমাত্র দুর্গাপুজোর সময় অনুষ্ঠিত হতো তা নয়, ধনীগৃহের যে-কোন উৎসব অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই বাইজীর নৃত্য এবং গীত। আর অপেক্ষাকৃত কম পয়সাওয়ালাদের বিলাস ছিল প্রধানত যাত্রা এবং 'চণ্ডীর গান'।

এই সময়ে আর একটি যে আমোদ-ব্যবস্থায় ধনীসমাজের পয়সা ব্যয়িত হতো তা হল "বুলবুলির লড়াই" আর "মনিয়ার লড়াই"। শীতকালে একদিন কি দুদিন এই লড়াই হতো, কিন্তু তার প্রস্তুতি চলতো সারাবছর ধরে। অশেষ অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের সঙ্গে এই সব পাখিকে যুদ্ধশিক্ষা দেওয়া হতো। এর পিছনে প্রচুর অর্থব্যয়ও হতো। এ ছাড়া "আখড়াই সঙ্গীতের সংগ্রাম" বা কবিগানও ছিল এই যুগের অন্যতম প্রধান আনন্দের উপকরণ।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় একশত বৎসরকাল ধরে বাঙালীসমাজের সর্বস্তরে এই কবির লড়াই অত্যন্ত উপভোগ্য এবং আদরণীয় বস্তু হয়ে উঠেছিল। কারণ উন্নত সাহিত্যভাবনা না থাকলেও কবিগানে ছিল এমন একটি বস্তু যা সহজেই জনমনকে আকর্ষণ করতো, তা হল আনন্দের উত্তেজনা।

রাসযাত্রা, রথযাত্রা, হোলী-উৎসব, চড়কপুজো প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও এই আনন্দের উত্তেজনা এবং আড়ম্বর বর্তমান ছিল। সেইসঙ্গে আনন্দের আতিশয্যে প্রচুর দুর্ঘটনাও ঘটতো। এই সকল অনুষ্ঠানে এবং বিবাহাদি উৎসবে বাজি পোড়ানো একটি বিশেষ প্রচলিত প্রমোদ ছিল। বর্তমানযুগেও বাজি পোড়ানো আমাদের অন্যতম প্রধান আমোদ বলেই পরিগণিত হয়। জুয়াখেলা প্রচলনও তখন ছিল, বিশেষত মেলা প্রভৃতি উপলক্ষে।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের এই সকল প্রমোদব্যবস্থার মধ্যে অধিকাংশই বর্তমান-যুগে অনেকটা অপ্রচলিত হয়ে এসেছে। কিন্তু সেইযুগে যার আরম্ভ, সেই থিয়েটার এবং তারই অন্যতর সংস্করণ সিনেমার প্রচলন বর্তমানযুগে বহুলভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে আমোদব্যবস্থার সর্বপ্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুলভ এবং সর্বাধিক প্রচলিত এই প্রমোদটির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যে প্রধান আনন্দোপকরণ বর্তমান-সমাজে প্রচলিত তা হল খেলাধুলো।

অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আলোচনা করলেও দেখা যাবে সামাজিক আমোদ-প্রমোদের ধারাটি এইভাবেই কালগত পরিবর্তন পরিবর্জনের পথ বেয়ে বেয়ে বর্তমানযুগে এসে পৌঁছেছে। আরণ্যক জীবনে মানুষের মধ্যে যে সকল সরল এবং স্বাভাবিক প্রমোদ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, ক্রমশই বহুবিধ নূতন উপকরণের সংযোগে সেগুলি আরও বিস্তারিত, আরও উন্নততর হয়ে সভ্যসমাজেরও অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমোদ-প্রমোদব্যবস্থা এখন আর শুধুমাত্র আনন্দের উপকরণ, বাইরের সামগ্রীমাত্র নয়, জীবনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় বস্তু।

দুরন্ত বাধা—দিগন্ত জয়

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বহরমপুরের কাছে ভাগীরথীর উপর নির্মীয়মাণ সেতুর এক অংশ ধসে পড়েছে। এ নিয়ে সংবাদপত্রে প্রচার এবং বিধান-সভায় আন্দোলন শুরু হয়েছে। ফরাক্কা পরিকল্পনার মুখ্য নির্মাণবিদকে পাঠানো হয়েছে অকুস্থলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাতে না অপরাংশ ও নদীর ধারের গ্রামাঞ্চলের ক্ষতি হয়। বিরাট হৈ-চৈ! এমনি ধসে পড়েছিল তখনকার দিনের এক বৃহত্তম প্রসারণী সেতু—শুধু একবার নয়, দু-দুবার, সে হলো কুইবেক সেতু। এক সভায় যখন আহূত হয়ে কুইবেক গিয়েছিলাম তখন অন্তরে আমার দারুণ দিদৃক্ষা ছিল কুইবেক সেতু দর্শনের। বহু বিপর্যয়ের মধ্যে এর অস্তিত্ব। তাই এর প্রতি বিশেষ মমত্ব ছিল অন্তরে। দীর্ঘতম প্রসারণী সেতু বলে এর প্রতিষ্ঠাও। বিচিত্র বিপর্যয় ও বিপদের, অসাফল্য এবং অকৃতকার্যতার ভিত্তিতেই মানুষের জ্ঞান আহরিত হয়। নবীন দিশার পায় সন্ধান। ভুলের কারণ বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলেই আবিষ্কৃত হয়। তখন লাভ হয় এক নবীন অভিজ্ঞতা, সাফল্যের পথ হয় প্রশস্ত। আগামীকালের মানুষদের জন্য সঞ্চিত থাকে সেই জ্ঞান।

ডাক্তারের ভুলের ইতি হয় রোগীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। উকিলের ভুল থাকে বড় জোর মোটা ল' রিপোর্টের পাতায়, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারদের ভুল সর্বজনসমক্ষে এক কিম্ভূত-কিমাকার লজ্জাকর প্রদর্শনী সৃষ্টি করে অক্ষমতার সাক্ষরূপে বিদ্যমান থাকে। সেতু-নির্মাণের সাফল্যের পথে কত ভুলের মাশুল দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। যদিও সেতু-নির্মাণে সে রকম মারাত্মক বিপর্যয় কমই ঘটে তা সত্য, তবুও তার সংখ্যা একেবারে বিরল নয়।

ঐতিহাসিক বিপর্যয়

ঝুলনসেতুর ব্যবহার আগেকার দিনে খুব নিরাপদ ছিল না। এই ঝুলনসেতু নিয়ে সেতুনির্মাণবিদদের উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না, বিশেষ করে যখন হাওয়ার দোলনে ঝুলন-সেতুর ডেক মরণদোলা দুলতো বা বেঁকে-চুরে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান বায়ু-সুড়ঙ্গের (wind tunnel) কৃত্রিম ঝটিকার পরীক্ষায় সে ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে এবং এরূপ বিপদের সম্ভাবনাও কমেছে। কারণ দীর্ঘতম সেতুর সম্ভাবনা ঝুলনসেতুর শ্রেণীর গর্ভেই নিহিত ছিল এবং আছে।

ফ্রান্সের প্রাচীন এনজার্স (ANGERS) শহরের অধিবাসীদের হঠাৎ নবীনের হাওয়া লাগে। তাঁরা ১৮৩৮ সালে ৩৪৪ ফুট দীর্ঘ এক ঝুলন সেতু নির্মাণ করান। তখন এ রকম সেতুর শৈশব বললেও চলে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পাঁচ শো সৈন্য সেতুর উপর দিয়ে মার্চ করতে করতে চলেছে। পা ফেলার তালে তালে সেতুর ডেকেও দোলন শুরু হলো। দোলনের মাত্রা বেড়ে যেতে লাগলো এবং সেই দোলনের দমক সইতে না পেরে জলে ছিঁড়ে পড়লো সেতু, আর গেল ২২৬টি প্রাণ।

স্কটল্যাণ্ডে ডাণ্ডির কাছে ফার্থ অব টে-র (FIRTH OF TAY) উপর একটি রেলের সেতু ধসে পড়ে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চুরাশীটি (৮৪) ছ শো ফুট উত্তারের সেতু নির্মাণ শেষ হয় এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর রাত্রে তার সব শেষ। শীতের রাতে দারুণ বরফ ঝড়—তারই মধ্যে একটি ট্রেন যাচ্ছিল সেতুর উপর দিয়ে। হঠাৎ ভেঙে নব্বই (৯০) ফুট নীচে গভীর জলে। তিয়াত্তর জন মানুষের হল সলিলসমাধি। সেতুনির্মাণবিদ স্যার টমাস বাউচ (Sir Thomas Bouch) শোকে এমনিই মুহ্যমান হয়ে পড়লেন যে, তিনি একবার যে শয্যা নিলেন তা থেকে আর উঠলেন না। অবশেষে মৃত্যু এসে তাঁকে চিরশান্তি দান করল, অনুশোচনার হল চিরাবসান। তুষারের আক্রমণে ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে নায়েগ্রার হনিমুন (HONEYMOON) সেতুর সলিলসমাধি ঘটে, তবে এতে একটিও লোক মরেনি, কারণ বিপদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল বহু পূর্বেই। দেখা গেল, সেবার বেজায় শীতে নায়েগ্রা নদীর জল বরফে পরিণত হওয়ায় সেতুর ভিত্তি-কীলক আক্রান্ত হয় এবং সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওহিও (OHIO) প্রদেশের অস্টাবুলা সেতুর উপর দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ট্রেন যাচ্ছিল। হঠাৎ ভেঙে পড়লো সেই সেতু। রেলের মুখ্য ইঞ্জিনীয়ার চার্লস কলিন্স পদত্যাগপত্র দিলেন এই বলে :—

I have worked for thirty years, with what fidelity God knows, for the protection and safety of the public, and now the public forgetting all these years of service, has turned against me.

পরিচালকমণ্ডলী সে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেননি, উপরন্তু তাঁর প্রতি আস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করলেন; কিন্তু জনগণ ও সংবাদ-পত্রেরা তাঁর প্রতি বিষোদ্গার করতে থাকে। কয়েকদিন বাদে কলিন্স আত্মহত্যা করে জীবনের অবসান ঘটান। সেতুটি কিন্তু নির্মাণ করেছিলেন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমাসা স্টোন (AMASA STONE) মূল হাওয়াই-সেতু পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করে।

ঢালাই লোহা এবং রট আয়রনে বা পেটা লোহায় প্রস্তুত বলে ১৮৭০—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আমেরিকায় বছরে ২৫টি করে সেতু নষ্ট হত। অর্থাৎ বার্ষিক প্রতি ৫০০ মাইল রেল লাইনে একটি করে সেতু। ১৮৮০ সাল থেকে নব আবিষ্কৃত ইস্পাতের ব্যবহার শুরু হওয়ায় এই ধ্বংসের মাত্রা একেবারে কমে যায়। সেতু নির্মাণে ছোটখাট বিপর্যয় লেগেই আছে, তার বহু কারণের মধ্যে যথোপযুক্ত সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে পরাঙ্মুখতা, ভুয়ো সস্তায় কার্য-সিদ্ধির চেষ্টা, কাজে যত্ন ও নিষ্ঠার অভাব, নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কার্পণ্য, মোটা লাভের জন্য অকারণ ব্যক্তিগত দায়িত্বের ঝুঁকি নেওয়া প্রভৃতি।

কুইবেক সেতু

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কানাডা সরকার ট্রান্স-কন্টিনেন্টাল রেলের জন্য একটি সেতু নির্মাণের নির্দেশ দেন। স্থান মনোনয়নে দেখা যায় যে কুইবেকের অনতিদূরে যেখানে সেন্ট লরেন্স নদী প্রস্থে ২০০০ ফুট, জলের গভীরতা ২০০ ফুট ও পাড়ের উচ্চতা ২০০ ফুট—সেই স্থানটিই সেতুর পক্ষে উপযোগী। সারা শীতকালে সেন্ট লরেন্সের জল এখানে গভীর বরফের স্তরে পরিণত হয়। কুইবেক সেতু সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে—তখন ফার্থ অব ফোর সেতু নির্মাণ কার্য চলছে। নির্মাণবিদেরা প্রসারণী সেতুর উপযোগিতা সম্বন্ধে উচ্চ আশা ও অভিলাষ পোষণ করছেন। অতএব কুইবেকে সেতুর আকৃতি প্রসারণীর অনুকূল হওয়া খুবই স্বাভাবিক—কেননা ক্যানেডিয়ানরা ইংরেজের অনুগ ও তাদের এক নম্বর চেলা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সেতু নির্মাণে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নির্মাণের আনুমানিক ব্যয় ২০০০,০০০ পাউন্ড। মুখ্য উত্তার ১৮০০ ফুট কেন্দ্রের ৬৭৫ ফুট ঝুলনাংশ সমেত। সেতুর মোট উত্তার ৩২৫০ ফুট দুই তীরস্থ বিস্তার সমেত। প্রস্থে ৬৫০ ফুট দুটি পাদপথ, রাস্তা, দুটি বিজলী ট্রামলাইন এবং দুটি রেললাইন থাকবে। ১৯০২ সালে দক্ষিণ অঞ্চলের মুখ্য তীরস্তম্ভটি শেষ হয়েছে এবং দুই প্রসারণী অংশের নির্মাণ সুরু হয়েছে। অতি মন্থর গতিতে বিরাট ইস্পাতের রচনা এগিয়ে চলেছে। নদীর বুকে একের পর এক অংশ সংযুক্ত ক'রে এগোচ্ছে সুউচ্চ ইস্পাতের কাঠামো। তেমনি চলেছে তীরের দিকের

প্রস্তাব। ছাপাখানা ভাগ হয়ে যাক দুজনের মধ্যে। অথবা, যা ন্যায্য প্রাপ্য হয় বিদ্যাসাগরকে তা দিয়ে মদনমোহন ছাপাখানা নিয়ে নিক। কিংবা, যা ন্যায্য প্রাপ্য হয় মদনমোহন তা নিয়ে বিদ্যাসাগরকে ছাপাখানা ছেড়ে দিক। —অর্থাৎ, মদনমোহনের সঙ্গে অংশীদার হয়ে বিদ্যাসাগর আর ছাপাখানায় থাকবেন না।

নিজের প্রাপ্য বুঝে নিয়ে মদনমোহন ছাপাখানা ছেড়ে দিতে চাইলেন বিদ্যাসাগরকে।

খাতাপত্র দেখে-শুনে হিসেব-নিকেশ দেনা-পাওনার মীমাংসা করে দিলেন শ্যামাচরণ দে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ব্যাপারে এ'রাই সালিসী হয়েছেন।

মদনমোহন তর্কালংকার 'শিশুশিক্ষা' নামে একখানা বই তিন ভাগে লিখেছেন। 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বেরিয়েছে ১৮৪৯ সালে, তৃতীয় ভাগ বেরিয়েছে ১৮৫০ সালে। প্রথম ভাগ 'শিশুশিক্ষা'র একটি কবিতার সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর নিঃসন্দেহে শৈশবকাল থেকে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। মদনমোহনের সেই কবিতাটির প্রথম পংক্তি: "পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল"।

মদনমোহনের ইচ্ছামতো সেই তিনভাগ 'শিশুশিক্ষা' ছাপাখানার সম্পত্তি হয়ে গেছে। সালিসীতে ছাপাখানার ষোলো আনা স্বত্ব পেলেন বিদ্যাসাগর। অতএব, না বললেও চলে নিশ্চয়ই, ওই তিনভাগ 'শিশুশিক্ষার' স্বত্বও বিদ্যাসাগরের।

মদনমোহন একখানা চিঠি লিখে শ্যামাচরণকে জানালেন: "আমি এক্ষণে যাইতে পারিব না; আদালত বন্ধ হইলে, কলিকাতায় গিয়া, আপন প্রাপ্য বুঝিয়া লইব।"

কিন্তু মদনমোহনের আর কলকাতায় এসে আপন প্রাপ্য বুঝে নেওয়া হল না।

কান্দীতে কলেরা হল মদনমোহনের। বাঁচার তিলমাত্র আশা রইল না। অন্তিমকালেও মদনমোহন বিদ্যাসাগরের কথা ভুলতে পারেন নি, মর্মে-মর্মে বুঝেছেন বিদ্যাসাগরের উপর চিরকাল নির্ভর করা চলে।

স্বামীর শেষশয্যার ধারে মদনমোহনের স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদছেন। মদনমোহন স্ত্রীকে বললেন—তুমি কেঁদো না। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি কিছুতেই নিরাশ্রয় হবে না। আমার প্রাণের বন্ধু ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে আশ্রয় দেবে। ঈশ্বর বেঁচে থাকতে তুমি আর আমার মেয়েরা কোনো কষ্ট পাবে না। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

১৮৫৮ সালের ৯ মার্চ মদনমোহনের মৃত্যু হল।

বিদ্যাসাগর লিখেছেন: "তাঁহার (মদনমোহনের) পত্নী, কলিকাতায় আসিয়া, ছাপাখানা সংক্রান্ত স্বীয় পতির প্রাপ্য বুঝিয়া লয়েন।"

মদনমোহন যখন কলকাতায়, মুর্শিদাবাদে, কান্দীতে কাজ করতেন, তাঁর পরিবার তাঁর কাছে থাকতেন; আর তাঁর মা থাকতেন বাড়িতে, বিল্বগ্রামে। তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবার, কোথায় আর যাবেন, বিল্বগ্রামের বাড়িতে গিয়ে রইলেন।

কুন্দমালাকে নিয়ে মদনমোহনের স্ত্রী একবার কলকাতায় এলেন। কুন্দমালা মদনমোহনের মেজো মেয়ে। কুন্দমালা বিধবা।

সেবার মায়ের সামনেই কুন্দমালা একদিন বিদ্যাসাগরকে বলল—দ্যাখো, কাকা! বাবা অনেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন; মা বুঝে শুনে চললে আমাদের সচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু মা সবই উড়িয়ে দিচ্ছেন। আর কিছুদিন পরে আমাদের ভাত-কাপড়ের কষ্ট পেতে হবে। ওঁর অদৃষ্টে যা আছে হোক। কিন্তু আমার বয়স অল্প, আমি অনাথা, আমার অদৃষ্টে কত কষ্ট আছে বলতে পারি না।

বলতে বলতে কুন্দমালা কেঁদে ফেলল।

কুন্দমালার কান্না দেখে বিদ্যাসাগরের মন দুঃখে ভরে গেল। তিনি বললেন—বাছা! কেঁদো না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, তুমি ভাত-কাপড়ের কষ্ট পাবে না। আমি তোমাকে মাসে মাসে দশ টাকা দেব। তাহলেই তোমার অনায়াসে চলে যাবে।

মাসে মাসে কুন্দমালাকে দশ টাকা দিয়ে যেতে লাগলেন বিদ্যাসাগর।

এখানে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নামে দু-চার কথা না বললে নয়।

১৮৬৩ সালের কথা। যোগেন্দ্রনাথ তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সেই সময় তাঁর বিয়ে হয়ে গেল। বৌয়ের নাম কৈলাসকামিনী। কয়েক বছর বাদে কৈলাসকামিনীর মৃত্যু হল।

কৈলাসকামিনীর মৃত্যুর দশ-বারো দিনের মধ্যেই যোগেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন তাঁকে আবার বিয়ে করার জন্য অস্থির করে তুললেন। শিবনাথ শাস্ত্রী তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। যোগেন্দ্রনাথ সবকথা শিবনাথকে জানালেন, শিবনাথের পরামর্শ চাইলেন।

শিবনাথ বললেন—যাও, যাও, আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করো না। দশ-বারো দিন হল তোমার স্ত্রী মরেছে, এর মধ্যেই বিয়ের কথা। আর বিয়েই যদি করো, একটি আট-ন বছরের মেয়ে বিয়ে করবে তো, তাতে আমার মত নেই। তোমার যা ইচ্ছে করো।

ক্ষুন্নমনে যোগেন্দ্রনাথ চলে গেলেন। দুদিন পরে আবার এসে শিবনাথকে ধরলেন।
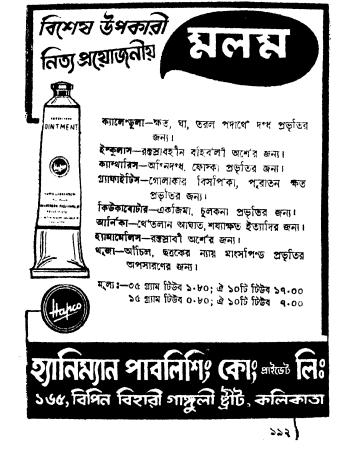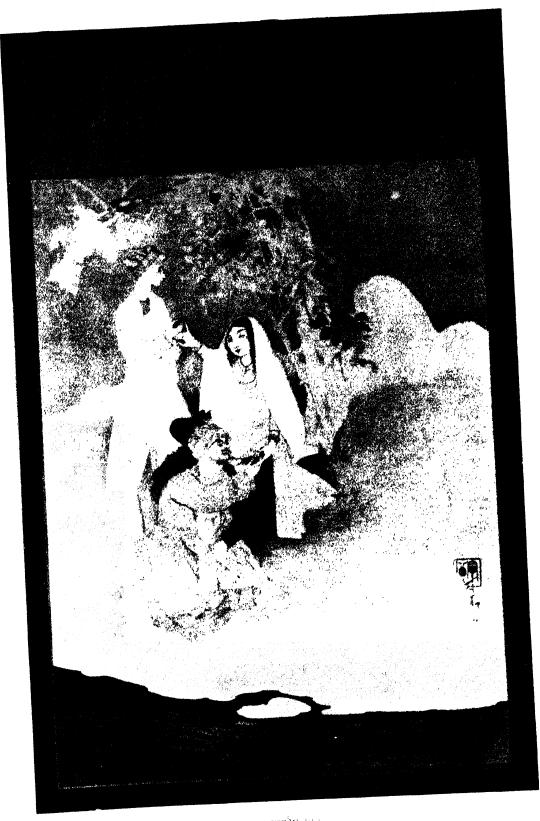
অঙ্গুরীয় দান

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রভারতী সোসাইটির সৌজন্যে

শিশুশিক্ষায় আর অধিকার নেই।

তারপর বিদ্যাসাগর যোগেন্দ্রনাথকে পটলডাঙগায় শ্যামাচরণ দে'র বাড়িতে উপস্থিত হতে বলে পাঠালেন। উপস্থিত হবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে দিলেন।

সেদিন যথাসময়ে বিদ্যাসাগর শ্যামাচরণের বাড়িতে এলেন। দেখলেন, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ উপস্থিত আছেন। এবং রামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন। ইনি যোগেন্দ্রনাথের মামাশ্বশুর।

বিদ্যাসাগর তাঁদের মদনমোহনের চিঠিখানা দেখালেন। কিছু আর বলার উপায় নেই, চিঠিখানা পড়ে যোগেন্দ্রনাথ ম্লানমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর বিদ্যাসাগরকে বললেন—তবে আপনি দয়া করে যেমন দিতে চেয়েছিলেন, তেমনি দিন।

না, তা আর হয় না। বিদ্যাসাগর এবার আর দয়া করতে রাজী হলেন না। বললেন—কুন্দমালার নাম করে, তুমি যখন প্রার্থনা করেছিলে, আমি দ্বিরুক্তি না করে বই তিনখানি দিতে রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর তোমরা যে-ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছ, তাতে আর আমার দয়া করার ইচ্ছা নেই, দরকারও নেই। তোমরা উকিলের চিঠি দিয়েছ, নালিশের ভয় দেখিয়েছ। এবং আমি ফাঁকি দিয়ে পরের সম্পত্তি ভোগ করছি বলে নানা জায়গায় আমার কুৎসা করেছ। আমাদের দেশের লোক কুৎসা খুব ভালবাসেন; তোমার মুখে কুৎসা শুনে যথেষ্ট খুশী হয়েছেন। এবং এ-বিষয়ে কোনো খোঁজখবর না নিয়ে আমার কুৎসা করে ভারি আমোদ করছেন। এ অবস্থায় আর আমার দয়া করতে ইচ্ছা হবে কেন? কুন্দমালাকে আমি মাসে-মাসে দশ টাকা দিচ্ছি। কুন্দমালাকে বলবে, তোমাদের চালচলন দেখে অনেকে অসন্তুষ্ট হয়ে আমাকে সেটা বন্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু কুন্দমালা নিতান্ত অনাথা। আর, আমি যতদূর বুঝতে পারছি, এ-ব্যাপারে তার কোনো অপরাধ নেই। তাই, আমি তাকে মাসে-মাসে যে দশ টাকা দিচ্ছি, তা দেব, কখনো তা বন্ধ করব না।

বিদ্যাসাগর চলে গেলেন।

মদনমোহন তর্কালংকারের মায়ের প্রসঙ্গে যাওয়া দরকার এবার। মদনমোহনের যখন মৃত্যু হয়, মদনমোহনের মা তখনও বেঁচে আছেন। তিনি বিল্বগ্রামে থাকেন। মদনমোহনের মৃত্যুর কিছুকাল পর বিল্বগ্রাম থেকে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এলেন তিনি। উপযুক্ত ছেলে মারা গেছে, তিনি শোকে-দুঃখে কাতর।

দু-তিন দিন পর বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন—তর্কালংকার আপনার কী রকম ব্যবস্থা করে গিয়েছেন?

তিনি বললেন—মদন আমার কোনো ব্যবস্থা করে যায়নি। আমার দিন চলার কোনো উপায় নেই। তাই তোমার কাছে এসেছি। যদি তুমি দয়া করে খেতে-পরতে দাও, তবেই আমার রক্ষা। নইলে আমাকে না খেয়ে মরতে হবে।

মদনমোহনের মা কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। বিশ্বস্তসূত্রে বিদ্যাসাগর শুনেছেন, তর্কালংকার বিস্তর টাকাকড়ি রেখে গিয়েছেন। অথচ, তাঁর মাকে কিনা ভাত-কাপড়ের জন্য অন্যের কাছে ভিক্ষে করতে হচ্ছে!

যা হোক কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর মদনমোহনের মা বললেন—মাস-মাস দশ টাকা পেলে আমার চলে যায়।

খাওয়া-পরার অভাবে রোগে-শোকে মদনমোহনের মায়ের শরীর অত্যন্ত কাহিল হয়েছে। যেন কয়েকখানা শুকনো হাড়! তারপর, আবার চোখের অসুখ। চোখে ভাল দেখতে পান না।

মদনমোহনের মা বললেন—শরীর যদি আমার সুস্থ থাকত, চোখে যদি আমার অসুখ না থাকত, তাহলে পাঁচ টাকাতেই আমার চলে যেত। কিন্তু শরীর আর চোখের যা দশা, একটি বামুনের মেয়ে না রাখলে কিছুতেই আমার চলবে না। আমার এখন যে রকম অবস্থা, বেশী দিন আমি বাঁচব না। বেশী দিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।

বিদ্যাসাগর মাসে-মাসে দশ টাকা দিতে রাজী হলেন। মাসে-মাসে দশ টাকা পাঠাতে লাগলেন মদনমোহনের মাকে। বিল্বগ্রামের ঠিকানায়।

কিছুদিন পর মদনমোহনের মা আবার কলকাতায় এলেন। বিদ্যাসাগরকে বললেন—বাবা! তুমি আমার ভাত-কাপড়ের কষ্ট দূর করেছ। আরেক বিপদে পড়ে আবার তোমায় জ্বালাতন করতে এসেছি।

কিন্তু এ-বিপদে বিদ্যাসাগর কিছু করতে পারেন না। কেননা, এ-বিপদ ঘটছে একেবারে তাঁদের আপন সংসারে। নিতান্ত আপনা-আপনির মধ্যে। সংসারে বসে তাঁকে নানারকম গঞ্জনা সইতে হচ্ছে, অপমান সইতে হচ্ছে।

বিদ্যাসাগর বললেন—মা! এ ব্যাপারে তো আমার কিছু করার সাধ্য নেই। আপনার মুখে যা শুনলাম, আপনার আর সংসারে থাকার দরকার কি। আমার বিবেচনায়, কাশীতে গিয়ে বাস করাই আপনার পক্ষে সবচেয়ে ভালো। আমার বাবা কাশীতে আছেন। আপনি যদি মত করেন তো আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিই, আমার বাবা আপনার বাসা ঠিক করে দেবেন, সব সময় দেখাশোনা করবেন। তাঁর কাছে মাসে-মাসে আপনি দশ টাকা পাবেন। যা শুনি, মাসে দশ টাকায় সেখানে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে।

তিনি রাজী হলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে কাশীতে পাঠিয়ে দিলেন।

কাশীতে গিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর শরীর ভালো হয়ে গেল। চেহারা এমন বদলে গেল, এমন হৃষ্টপুষ্ট হলেন যে, বছর খানেক বাদে কাশীতে গিয়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে চিনতে পারলেন না। সত্যি-সত্যি চিনতে পারলেন না।

তিনি নিজেই তখন বিদ্যাসাগরকে বললেন—বাবা! তুমি আমাকে চিনতে পারলে না, আমি মদনের মা।

খানিকক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন বিদ্যাসাগর। চিনতে পারলেন। তারপর বললেন—আপনি জুয়োচুরি করে আমাকে বিলক্ষণ ঠকিয়েছেন!

জুয়াচুরি! শুনে মদনমোহনের মা একটু ভয় পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—বাবা! আমি কী জুয়াচুরি করেছি?

বিদ্যাসাগর বললেন—শুকনো হাড় আর কানা চোখ দেখিয়ে আপনি বলেছিলেন, 'আমার যা অবস্থা, তাতে আমি বেশী দিন বাঁচব না, বেশী দিন তোমাকে আমার ভার বইতে হবে না।' কিন্তু এখন যা দেখছি, তাতে অন্তত আরো বিশ বছর আপনি বাঁচবেন। আগে যদি বুঝতে পারতাম, আমি আপনাকে মাসে-মাসে দশ টাকা দিতে রাজী হতাম না।

না, ভয় পাবার মত কথা নয়, হেসে ওঠার মত কথা। মদনমোহনের মা হাসতে লাগলেন।

এই ঘটনার পরেও মদনমোহনের মা দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

লক্ষণীয়, যে-বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল, বাক্যালাপ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মা-বোন-মেয়েকে বিদ্যাসাগর উপেক্ষা করেন নি। এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরেও যাতে ওঁরা আর্থিক সাহায্য পান আপন উইলে সেই ব্যবস্থাও করে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। আপন উইলে বিদ্যাসাগর স্বীয় বিষয়ের উপস্বত্ব থেকে "মদনমোহন তর্কালংকারের মাতা"কে আট টাকা, "মদনমোহন তর্কালংকারের কন্যা শ্রীমতী কুন্দমালা দেবী"কে দশ টাকা এবং "মদনমোহন তর্কালংকারের ভগিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবী"কে তিন টাকা, মাসিক বৃত্তিদানের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

সুনীল বলল, "ঠাণ্ডা কাকে বলে এবারে লদ্দাখে গিয়ে তা টের পেয়েছি. চুশুলে এয়ার স্ট্রীপে নামা মাত্র হাত পা জমে—"

"চুশুলে ?" সুনীত বলল, "তার মানে আপনি লাডকের কথা বলছেন ?"

সুনীল গোটা কতক রিং ছুঁড়ে নির্বিকার মনে সিগারেটটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর সেইদিকে চোখ রেখেই শান্তভাবে টেনে টেনে সুনীতের কথার জবাব দিল, "লদ্দাখ। দিল্লিতে আমরা লদ্দাখই বলি। ওইটেই কারেক্‌ট্‌ উচ্চারণ। আপনাদের কলকাতায় আপনারা কি বলেন, জানিনে।" বলেই যদুদার দিকে চেয়ে টেবিলে আঙুলে ঠুকে টুইস্ট নাচের তাল বাজাতে লাগল।

আগেকার আমল হলে সুনীত এসব গ্রাহ্যই করত না। তবে কি না কিছুদিন হল ও টের পেয়েছে যে ওর মধ্যে পার্সন্যালিটি গজিয়ে উঠেছে। তাই এখন ও আর কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। বিশেষ করে যেখানে পার্সন্যালিটির প্রশ্ন জড়িত।

"থামুন মশাই, দিল্লি আবার একটা জায়গা, তার আবার নজির। কালচারের বিন্দুবিসর্গও যেখানে নেই। কতকগুলো আপস্টার্ট আর স্নবের আড্ডা।"

সুনীল বিচলিত হল না। টকাটক টকা-টক আঙুলে ঠুকতে ঠুকতে পার্লামেণ্টারি কায়দায় জবাব দিল, "মাননীয় সহকর্মী বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন যে আমাদের সংবিধানে দিল্লিকে ভারতের রাজধানী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এখন দিল্লিকে অবমাননা করা সংবিধানকেই অব-মাননা করা। সম্ভবত মাননীয় সহকর্মী মহোদয়কে এটাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না যে ভারত রক্ষা আইন বলবৎ থাকা কালে সংবিধানের মর্যাদা হানিকর কোন মন্তব্য বা বক্তব্যাদির প্রকাশ কী ঘোরতর পরিণাম ডেকে আনতে পারে।"

সুনীত বেজায় ঘাবড়ে গেল। বিপন্নভাবে একবার যদুদার মুখের দিকে চাইল। তিনি নন্‌-এলাইনড দৃষ্টিতে নিজকাজে মন দিলেন। কাজেই সুনীত আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে ওর পার্সন্যালিটিটাকে কিঞ্চিৎ খাদে নামিয়ে এনে বলল, "বাঃ, হচ্ছে লাডকের কথা, এর মধ্যে সংবিধানের অবমাননার কথা এল কি করে ?"

"লদ্দাখের কথায় এ প্রশ্ন ওঠেনি, আপনি কথা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন স্যার, দিল্লি সম্পর্কে আপনি যে কটূক্তি করেছেন, সেই সম্পর্কেই উঠেছে এবং অতি সঙ্গত কারণেই। এমার্জেন্সির মধ্যে এই জাতীয় অ্যান্টি ন্যাশনাল ফিলিং কোন সরকারই বরদাস্ত করতে পারেন না। সুপ্রীম কোর্টের রায় দেখেছেন তো, ডি আই রুলে একবার ধরলেই শ্রীঘর। নো আপীল স্যার।" সুনীলের আঙুলে সমানে টুইস্ট নেচে চলল।

সুনীত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কথাটা ওভাবে পুট করাটা আমার হয়ত ভুল হয়েছে। দিল্লিতে ভাল জিনিষ কিছুই নেই, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ইন্‌ ফ্যাক্‌ট আমি সব সময় নেহরুকে সাপোর্ট করি। আমি বলতে চেয়েছিলাম, কতকগুলো মানে এক শ্রেণীর আপ স্টার্ট আর স্নব মিলে যে সো-কল্‌ড্‌ কালচার দিল্লিতে সৃষ্টি করেছে সেটা ভাল না, মানে হয়ত ভাল, তবে আমার সেটা ভাল লাগে না, এই আর কি। আই থিংক আই অ্যাম ক্লিয়ার ?"

সুনীল বলল, "হ্যাঁ এইভাবে বললে ক্ষতি নেই। আইন আপনাকে ছুঁতে পারবে না। যদিও আপনার এই ট্রাইবাল দৃষ্টি-ভঙ্গীর সঙ্গে আমি একমত নই। দিল্লির কালচার কস্‌মোপলিটান, আর্বান, মডার্ন। ফুল্‌ অফ্‌ লাইফ্‌। মডার্ন ইণ্ডিয়া, ডেভেলাপিং ইণ্ডিয়ার হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে চান তো দিল্লি চলুন। সোসাইটিতে পার্টিতে মিশুন। দেখবেন প্রাণচঞ্চল হৃদ্‌-পিণ্ডগুলো কেমন ডুপ্‌ লপ্‌ ডুপ্‌ লপ্‌ করছে। কলকাতা তো মশাই ড্যাম্প লাগা চ্যাব চ্যাবে ডুগি। চার্ম এখানে আছে কি ?"

"যা বলেছিস মাইরি !" ক্যামেরার ব্যাগটা টপ করে টেবিলের উপর রেখে ফটোগ্রাফার বিশু সুনীলের প্যাকেট থেকে খপ করে একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে বললে, "আর দিল্লির মেয়েগুলো ! ওক্‌, এক একটা যেন গঁদের লাড্ডু ! দ্যাখ সুনীল, এবারে তুই দিল্লিতেই ঝুলে পড়, বুঝলিস্‌।"

"ইচ্ছে তো আছে, মানে কিছুটা এগিয়েওছি কিন্তু আর আগে বাড়তে সাহস পাচ্ছি নে।"

"সাহস পাচ্ছেন না!" সুনীত লাফিয়ে উঠল, "হোয়াই ?"

বিশু বলল, "সুনীলটা চিরকালই এক রকম থেকে গেল। টাক গজিয়ে গেল কিন্তু বয়েস আর বাড়ল না। রিহার্সেলে বাবু আমার খুবই দড়, কিন্তু স্টেজে উঠলেই সব গড়বড়।"

"দেখুন মশাই," সুনীত বলল, "কিছু মনে করবেন না, আমার মনে হয় আপনার পার্সন্যালিটি গ্রো করা দরকার। আপনি কয়েকটা কোর্স ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিন তো। ওতে আপনার

জেনারেল হেল্থ্ ইম্প্রুভ করবে। কিম্বা ভাল একজন ডেন্টিস্ট—"

"ডেন্টিস্ট? ডেন্টিস্ট কেন? আমার দাঁতে তো কোনও ট্রাব্ল্ নেই।"

বিশ্ব বলল, "তোর আক্কেল-দাঁত গজিয়েছে?"

"না।"

"তাই বল। হয়ত সেই জন্যই নিতুবাবু ডেন্টিস্টের—"

সুনীত বলল, "দেখুন সব বিষয়ে ঠাট্টা করবেন না। প্রেম হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়, মাচ্ মোর দ্যান দ্যাট্। পার্সন্যালিটি না হলে প্রেম হয় না। আর পার্সন্যালিটি দাঁতেরই মত। পেট থেকে পড়ার সময় ওগুলো কেউ সঙ্গে নিয়ে আসে না, পরে গজায়। সুনীলবাবুর পার্সন্যালিটির গ্রোথ্ কেন স্টান্টেড্ হয়ে আছে সেটা পরীক্ষার জন্যই ডেন্টিস্টের কথা বলেছি। প্রেম ট্রেম করার আগে একটা মেডিক্যাল চেক-আপ্ করিয়ে ফেলা ভাল বলেই আমি মনে করি। বেশ তো ডেন্টিস্ট যদি পছন্দ না হয়, অন্য কারও কথা সাজেস্ট করুন, বিশুবাবু আপনিই বলুন না, কে এই বিষয়ে সৎ পরামর্শ দিতে পারবেন। সুনীলবাবু তাঁর কাছেই যাবেন।"

বিশু কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, "ওর উচিত বেলগেছেয় গিয়ে ভেটিনারি সার্জেনের সঙ্গে কনসাল্ট করা, কারণ অ্যানিমাল হাজ্ব্যান্ড্রি সম্পর্কে ওঁরা বিশেষজ্ঞ।"

"ডাক্তার ফাক্তারে আমার কিছু করতে পারবে না মশাই।" সুনীল সাহেবি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল। "আই ওয়ান্ট মানি। মানি মানি মানি। টাকা চাই মশাই। নিছিমে প্রেম করা নিরু নিন্দাজোড় ব্যাপার। কোর্টশিপ আর হোটেল রেস্তোরাঁর বিল মেটাতে তিন দিনের মধ্যেই মাসের মাইনে ফতুর হয়ে যায়। তখন খালি পকেট নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াই। টেলিফোনে ডাকলেও আর সাড়া দিতে পারিনে। হাতছাড়া হয়ে যাবে মশাই। ও মাই ডার্লিং।" ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুনীল টাই দিয়ে বাতাস খেতে লাগল।

"আই বাপ্।" বিশুর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। "যে ফোঁসো হাওয়া ছাড়লি তাতে খুব ডীপ ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।"

"বাঙ্গালীর কপালে কি ভাল জিনিস সয়? যা কনস্পিরেসি চলছে চারিদিকে কি বলব।" সুনীলের সকাতর উক্তি। "সবে ব্যাপারটা ঘন করে আনছিলাম, বলব কি, অমনি নন-বেঙ্গলিদের চোখ টাটিয়ে উঠল। বাঙ্গালী এমন একটা মেয়েকে গেঁথে ফেলবে! আর কি মেয়ে মশাই, কাশ্মীরের বন্য আপেল বটে! টকটকে করছে রঙ! কুকুরের গাগলস্ চোখে পরে চাইতে হয়, নইলে জেল্লায় ব্লাইন্ড হয়ে যেতে হবে। বাপের অগাধ পয়সা। ভেজিটেব্ল প্রডাক্টের ফলাও কারবার। উত্তর ভারত ওদের ফ্যাক্টরিতে ছেয়ে গেল। ভেজিটেব্ল্ ঘি, ভেজিটেব্ল্ মাংস, ভেজিটেব্ল্ মাছ ওদের প্রায় একচেটে। আজকাল ভারতে তো ভেজিটেরিয়ানদেরই রাজত্ব। মাছ মাংস ছোঁয় না, অথচ সাহেবসুবোর সঙ্গে অনবরত দহরম মহরম। লাঞ্চ ডিনার দিতে হয় ঘন ঘন। রিনি রায়নার বাপ ভেজিটেব্ল্ মাছ মাংস আবিষ্কার করে তাঁদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে এখন কথাবার্তা চলছে। দরে পোষালে ভেজিটেব্ল্ মাছ চালান দিয়ে বাংলা দেশ ফ্লাড্ করে দেবে। রিনি রায়না এমনই একটা লোকের মেয়ে। রিনি রায়না, আহা কি নাম! সেতারের তরফের তারে যেন রবিশঙ্করের আঙ্গুলের আলতো আলতো ব্যঞ্জনা। যেন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কালিদাসের কাব্যের নিক্কণ। যেন কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে তাজমহলের গালে চাঁদের চুম্বন। যেন বিশ্বের ছন্দময় রমণীয় অনুরণনের সঙ্গে পেলব অনুভবের ফুলশয্যা। যেন—যেন—যেন—"বোঝা গেল সে আর থই পাচ্ছে না।

বিশু তাড়াতাড়ি সুনীলের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "যেন চার মাসের পুজো বোনাস পাবার উৎফুল্ল উদ্গার। যেন বাধ্যতামূলক সঞ্চয় স্কীম থেকে অব্যাহতি।"

এই অপ্রত্যাশিত উপমায় সুনীল হকচকিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সুনীত বলল, "পরিস্থিতি জটিল সন্দেহ নেই। আচ্ছা আপনার রাইভাল কারা কি? মানে কোন্ ক্লাসের লোক?"

"রাইভাল কি এক আধজন যে এ কথার উত্তর দেব। অসংখ্য আর ওজনদার। আর একা আমাকে ওদের মহড়া নিতে হচ্ছে। তাদের বাড়ি আছে গাড়ি আছে, ফ্যাক্টরী আছে। আর আমার তরফে থাকবার মধ্যে আছে শুধু ঐ শান্তিনিকেতন।" সুনীল ভাবাবেশে কপালে হাত তুলে বলে উঠল, "ঠাকুর, ঠাকুর, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ! এখন তুমিই আমার ভরসা প্রভু।" আবেগটা খানিক থিতুলে সুনীল বলল, "রিনি রায়নার মাসতুতো দিদি শান্তিনিকেতনে পড়েছে। সেই হচ্ছে ওদের পরিবারের মেয়েদের আদর্শ। আমি বাইচান্স একদিন বলে ফেলেছি আমি শান্তিনিকেতনের ছেলে। বাস—সেই থেকেই রিনি আমার দিকে ঢলেছে। কিন্তু শেষরক্ষা বুঝি আর হয় না।"

"খুবই কঠিন অবস্থা।" সুনীতকে বেশ ভাবিত দেখা গেল। "আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন না—কোন টনিক খেতে সুরু করুন।"

"টনিক খাব! কেন?" সুনীল অবাক।

"ওতে খুব কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, বুঝলেন।" সুনীত সিরিয়াস। "আসলে সকল বিফলতার মূলে হচ্ছে মানসিক দুর্বলতা। এই দুর্বলতা দূর করার জন্য চাই এক্সট্রা এনার্জি। শরীরটা তাজা রাখতে হবে। গায়ে জোর না থাকলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মহড়া নেবেন কি করে?"

"এখানে গায়ের জোরে কুলোবে না মশাই, ট্যাঁকের জোর চাই। সিলভার টনিক, বুঝলেন। খুব তো তখন থেকে লেকচার ঝাড়ছেন, পারবেন হাজার কুড়ি টাকা জোগাড় করে দিতে? ট্যাঁকের জোর থাকলে আপনাদের এই বোগাস লেকচার শোনার জন্য এখানে পড়ে থাকতুম না বুঝলেন। প্রেম করা কাকে বলে ব্যাটাচ্ছেলেদের বুঝিয়ে দিতুম।"

"বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে তুই গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রেম করতে চাস সুনীল? ছি ছি ছি!" ব্রজদা ধিক্কার দিতে দিতে প্রবেশ করলেন। একটি সিগারেট ধীরে সুস্থে ধরালেন। বার কতক লম্বা লম্বা ধোঁয়া ছাড়লেন। তারপর বসলেন।

"বাঙ্গালীর ছেলে হয়ে," ব্রজদা সুনীলের দিকে মর্মভেদী দৃষ্টি হেনে হুংকার দিলেন, "মালদার রাইভালদের সঙ্গে ট্যাঁক খসিয়ে টক্কর দিতে চাস! তোদের বাড়িতে হর্তুকির কল আছে, তা জানতাম না তো! তোকে কি আর বলব? তোকে যদি উজবুক বলি তো দুনিয়ার উজবুক আমার নামে মানহানির মামলা করবে, বুঝলি।"

"ব্রজদা আপনি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারেন নি, তাই আমার প্রতি—"

"থাম থাম। ব্রজাকে ব্যাখ্যা করে কিছু বোঝাতে হয় না।" ব্রজদা বার কতক ছোট ছোট টান মেরে মুখ থেকে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন। "তোরা, এই জেনারেশনের ছেলেরা কী, বলতো? জাতীয় চরিত্রটাকে একেবারে শিকেয় তুলে দিলি?" একটু থেমে বললেন, "ট্যাঁকের জোর দেখায় মাড়োয়ারি, তলোয়ারের জোর দেখায় রাজপুত, কলমের জোর দেখায় মাদ্রাজী। বাঙ্গালীর জোরটা কোথায় আছে শুনি?"

সুনীত ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের মত তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "কেন ব্রেনে। বাঙ্গালীর ব্রেন—"

ব্রজদা সস্নেহে সুনীতের দিকে চেয়ে বললেন, "সে তো সত্যযুগের কথা রে! এই কলিতে বাঙ্গালীর ব্রেন আর কলকাতার ড্রেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মত শুধু নামেই টিঁকে আছে, বুঝলি। বাঙ্গালীর জোর এখন মুখে। মুখের জোরে বাঙ্গালীকে মারবে, এমন জাত ওয়ার্ল্ডে নেই।"

"টেক্কা যদি মারতে চাস সুনীল (ব্রজদা সুরু করলেন) তবে মুখটাকে শানিয়ে রাখ, অন্য পথে পা বাড়াস নি। মুখেন মারিতং জগত। আর এ তো একটা পুঁচকে ভেজি-

টেব্‌ল্‌ মেয়ে! হ্যাঃ। বলে কত সব তা বড় বড় মাল্টি মিলিওনেয়ারের বাড়ির আই-বুড়ো মেয়েরা বেড়ালের মত ম্যাও ম্যাও করে আমার চার পাশে দিনরাত ঘুর ঘুর করেছে। আমি পাত্তাই দিইনি।"

সুনীত ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "মিলিওনেয়ারদের মেয়েরা বুঝি ম্যাও ম্যাও করে প্রেম করে?"

"তারা কি তোমার দিশি মেয়ে যে প্রাণ-নাথ প্রাণনাথ বলে হাঁক পাড়বে!" ব্রজদা খিঁচিয়ে উঠলেন। "মিলিওনেয়ার বিলিও-নেয়ার সব ফ্যামিলির মেয়েদের আমি মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা আমার কানের কাছে দিনরাত মাইডিয়ার মাই ডার্লিং করে কুক ছাড়ত। বুঝলি।"

সুনীত জিজ্ঞেস করল, "ওদের সঙ্গে কোথায় দেখা হল ব্রজদা?"

সুনীল নিজের ব্যথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বলে উঠল, "কোথায় আবার, লেকের ধারে।"

ব্রজদা অমায়িক হেসে সুনীতকে বললেন, "সুনীলটা প্রায় ঠিকই বলেছে। তা সেটা লেক ছাড়া কি, তবে সে লেকে জল নেই, শুধু জমাট বরফ। বারমাসই বরফ। যতদূর চাও, ধু ধু বরফ।"

"এভারেস্টের কথা বলছেন বুঝি?"

"তোমার মাথা। দুনিয়ার বরফ কি শুধু এক এভারেস্টেই আছে। আমি রস দ্বীপের কথা বলছি। নামে দ্বীপ, আসলে জমাট একটা লেক।"

সুনীতের মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ব্রজদা বললেন, "কি রস দ্বীপ কোথায়, সেটাও আবার বলে দিতে হবে নাকি? দক্ষিণ মেরুতে।"

সুনীল চোখ গোল গোল করে বলল, "দক্ষিণ মেরু মানে সাউথ পোল! গড়!"

সুনীত একটা হেঁচকি তুলে চুপ করে গেল।

ব্রজদা সুনীলের দিকে ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে বললেন, "তোমার যদি ওতে বোঝবার সুবিধে হয়, তবে তাই। লে-ম্যানরা তাই বলে। আমরা এক্সপ্লোরাররা ওকে অ্যাণ্টা-র্টিক বলি।"

"আচ্ছা ব্রজদা," সুনীত দুম্ করে বলে বসল, "কথাটা লাডক না লম্দাথ?"

এই আচমকা প্রশ্নে ব্রজদার মত লোকও হকচকিয়ে গেলেন। তিনি সুনীতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার মানে?"

সুনীল কটমট করে সুনীতের দিকে চাইতেই সে মিইয়ে গেল। "না ওটা কিছু না। হঠাৎ কেমন বেরিয়ে গেল আর কি। সরি!"

"ব্রজদা বুঝি ওখানে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন?"

"পিকনিক ছাড়া জীবনে তো আর কিছু বুঝলিনে সুনীল।" ব্রজদা মৃদু এক ধমক মারলেন। "১৯১২ সালের ২৫শে

যেন বিশ্বের ছন্দময় রমণীয় অনুরণনের সঙ্গে পেলব অনুভবের ফুলশয্যা

ডিসেম্বরের মাঝরাতে দক্ষিণ মেরুতে পিকনিক করতে ব্রজরাজ কারফর্মা যায় নি। আর ৭৪০ মাইল দম না ফেলে ঘুরে এসে সে মেজাজও ছিল না। তবে মেয়েগুলো তাই গিয়েছিল বটে। বড়লোকের মেয়ে সব, খেয়ালের অন্ত নেই। অ্যাণ্টার্টিকে খ্রীষ্ট-মাসের উৎসব করতে ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল।"

আমি তো প্রথমে বুঝতেই পারি নি (ব্রজদা নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে সুরু করলেন) টিলার ওপিঠ থেকে যে চেঁচামেচি ভেসে আসছে, সেগুলো মেয়ে মানুষের কলরব। আমি ভেবেছি ওধারে বুঝি এম্পারার পেঙ্গুইনের কলোনি। এ সব তারই চেঁচামেচি। তাই আর তাঁবুর বাইরে বের হই নি। বাইরে তখন ভয়ঙ্কর ব্লিজার্ড।

তা ছাড়া আমি দু মাস একটানা ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কি কাজে ওখানে পা দিয়েছিলাম, আর শেষ পর্যন্ত কোন কাজ ঘাড়ে চাপল! ভাগ্যের ফের, আর কাকে বলে! দক্ষিণ মেরুতে গিয়েছিলাম শ্বেত ভাল্লুকের শাদা হবার রহস্যটা কি তা জানবার জন্য। এর পিছনে আবার একটা স্যাড্ হিস্ট্রি আছে, বুঝলি। আমরা যখন পটল-ডাঙ্গায় থাকতুম, তখন আমাদের পাশের বাড়ির এক মেয়ের সঙ্গে আমার দারুণ লভ্ হয়েছিল। আমাদেরই পালটি ঘর। ওরা আঠারশের পর্যায়, আমরা ছাব্বিশের। মেয়েটি পরমাসুন্দরী। ঐ আমার ফার্স্ট লভ্। কাজেই শকটা বেশি করে বেজেছিল। আমার রং ময়লা বলে আমার সঙ্গে সেই মেয়ের মা তো তার বিয়ে দিলে না। জোর করে কন্দর্পকান্তি এক লোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হল। বিয়ের আগের দিন গায়ে কেরোসিন ঢেলে সে পুড়ে মরল। খুব চোট পেলুম মনে। কালো রং কি মানুষের এত বড় শত্রু। এর কিছুদিন পরে আমার এক মাসতুতো বোন আত্মঘাতি হল। সে কালো। তার বর জোটেনি। এই তো তোদের বাঙ্গালী যুবকদের ক্যারেক্টার। বুঝলি, আমরা সাহেবদের চাইতে কম বর্ণবিদ্বেষী নই।

যা হোক, এই সব ঘটনা থেকে একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞা আমার মনে দানা বেঁধে উঠল। কালো রং যদি এত অনর্থের মূল, তবে তা নির্মূল করে দিতে হবে। এমন ওষুধ আবিষ্কার করতে হবে, যা দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্র কালো রং সাদায় পরিণত হয়। তারপর থেকে হাজার হাজার শ্বেত-ভল্লুক স্টাডি করে ফেললাম। উত্তর মেরুর

কাজ শেষ করে দক্ষিণ মের্তে এলাম। বিখ্যাত মের্ আবিষ্কারক ননী সেন আমার সঙ্গে উত্তর মের্তে ঘুরে ঘুরে বই লিখে বিরাট নাম আর নরওয়েতে সেটল্ করল। আজ তাকে সবাই ন্যানসেন বলেই জানে। কিন্তু আসলে ও ননী। ননীগোপাল সেন। দক্ষিণ মের্তে এসে আমি প্রথম যে পাহাড়টায় চড়ি তার নাম আমি রেখেছিলাম ননী সেন গিরি। সাহেবরা আমার কৃতিত্ব অস্বীকার করতে পারে নি। ভূগোল খুলে দেখিস, মাউন্ট ন্যানসেনের হদিশ পাবি।

রস দ্বীপে ঘাঁটি গেড়ে বছরখানেক ধরে শ্বেত ভল্লুক স্টাডি করে, এক্সপেরিমেণ্ট করে সাদা হবার ফর্মুলা প্রায় কমপ্লিট করে এনেছি, এমন সময় শুনলাম ক্যাপ্টেন স্কট সাউথ পোলে যাবার জন্যে এসেছে। মাইল কতক দূরেই ওদের বেস। ছোকরাকে আমি ভালই বাসতাম। ছেলে বয়েস থেকেই দাদা দাদা করত। এসেই খবর পাঠালে দেখা করতে চায়। গেলুম। বহু লটবহর এনেছে। গোটাকয়েক ট্রাক্টার, এই কাজের জন্যই বিশেষভাবে তৈরি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, স্কট, কুকুর এত কম কেন? শ্লেজই বা কই? ট্রাক্টারের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সে বললো, ব্রজদা, এই আমার কুকুর। এই আমার শ্লেজ। এই ভুলটুকুর জন্যই বেচারা আর ফিরতে পারল না। অ্যান্টার্টিকের বরফেই চিরকালের মত থেকে গেল।

যা হোক, স্কট নিজের লক্ষ্যে রওনা হয়ে গেল। আমিও নিবিষ্ট চিত্তে শ্বেত ভল্লুকের প্ল্যান্ড থেকে সাদা হবার ওষুধ বের করার সাধনায় মগ্ন হলাম। ঠাকুরের কৃপায় সাদা হবার ওষুধ আবিষ্কার করে ফেললাম। নাম দিলাম "ব্রজলীণ"। দারুণ ওষুধ বের করেছিলাম, বুঝলি। একটা বাচ্চা তিমি ধরে তার প্ল্যান্ডে এক ডোজ "ব্রজলীণ"—টেন সি সি—পুশ্ করা মাত্র তার গায়ের রং ফুটফুটে ফর্সা হয়ে গেল। দেখে আমিই অবাক। সেই সাদা তিমিটাকে নিয়েই তো মবি ডিকের গল্প লেখা হয়েছে। পড়ে দেখিস। মন্দ লেখেনি, তবে সাহেবরা যা করে, "ব্রজলীণের" কথাটা স্রেফ চেপে গিয়েছে।

আজ যদি "ব্রজলীণের" ফর্মুলাটা থাকত! (ব্রজদা ফোঁ-স্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।) দুনিয়ার সুরংই বদলে যেত। সেদিন—আমেরিকা থেকে লোক পাঠিয়েছিল। ফর্মুলাটার রাফ্ কপিটাও অন্তত যদি দিতে পারি। তাহলে ওরাই নিজের খরচে "ব্রজলীণ" ম্যানুফ্যাকচার করে তাবৎ নিগ্রোকে শাদা করে ফেলে শাদা-কালোর বখেড়া মিটিয়েই ফেলবে। তা খুঁজেই পেলুম না।

সুনীত—কিন্তু অরিজিন্যালটার কি হল?

ব্রজদা—পোড়া কপালের কথা তবে আর বলছি কি। গুপ্তচর লেগেছিল পিছনে। সাহেবরাই লাগিয়েছিল। সবাই শাদা হয়ে গেলে ও ব্যাটাদের পুঁছবে কে, শুনি! সেই একদিন চুরি করল। পিছু পিছু তাড়াও করেছিলাম, ধরেও ফেলতাম, কিন্তু গ্রহের কি ফের, কি আর বলব।

সুনীত—শেষপর্যন্ত হলটা কি?

ব্রজদা—সর্বনাশ! সুন্দরবন দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল, গোঁওখালি থেকে সাবমেরিনে উঠে সটকান দেবে বলে। এমন সময় ইয়া এক কেঁদো বাঘ লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে পড়ে কোট প্যাণ্ট সমেত তাকে কোঁৎ করে গিলে ফেললে। আমি হায় হায় করে সঙ্গে সঙ্গে বাঘের টুঁটি টিপে ধরলুম। তারপর বাঘটাকে চেন দিয়ে বেঁধে ক্যানিং-এ নিয়ে এসে তাড়াতাড়ি কড়া জোলাপ খাইয়ে দিলুম একসঙ্গে চার ডোজ। কিন্তু বাঘের কী হজম শক্তি। বাপ্সা! জোলাপ দিয়ে কাগজখানাই শুধু বার করতে পারলুম, ফর্মুলাটা বেমালুম হজম করে ফেলেছে। আর যা হবার তাই হল। আধঘণ্টার মধ্যেই শুধু "ব্রজলীণের" ফর্মুলা খেয়েই। দরকার্যটা কি ছিল, তাতেই বুঝে দ্যাখ, সেই বাঘটা শাদা হয়ে গেল। ঐ হচ্ছে পৃথিবীর আদি এবং অকৃত্রিম শাদা বাঘ। রেওয়ার রাজাকে বাঘটা আমিই প্রেজেন্ট করে দিই। অনেকদিনের ফ্রেণ্ডশিপ কিনা।

সুনীল (টাকের ঘাম মুছতে মুছতে শুকনো গলায়)—এতটা আমি জানতুম না।

ব্রজদা—দেয়ার আর মোর থিঙ্স্ ইন হেভেন অ্যাণ্ড আর্থ সুনীল, তুই তো কালকের ছেলে, এই ব্রজই কি সব জানে? এই ক্যাপ্টেন স্কটের কথাই ধর না। ওর মত ঘাঘু এক্সপ্লোরার, ও যদি জানতই এমন বেঘোরে মারা পড়বে, তাহলে কি ঐ ট্রাক্টারের ভরসা করে সাউথপোলে যায়, না যে ব্রজ ওর গুরুর মত, তার পরামর্শ অগ্রাহ্য করে?

ব্রজলীণের এক্সপেরিমেন্ট তিমির উপর সফল হতেই (ব্রজদা দুটো সুখ টান মেরে) অর্থাৎ কালো রাত্রির মত তিমির গায়ের রঙ কেটে যেতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলাম। "তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে" এটা তো আসলে কবিতায় ব্রজলীণেরই বিজ্ঞাপন, তোরা কি সে-খবর রাখিস্। আহা কি সাজেশান! তিমি-র বিভাবরী অর্থাৎ রাত-কালো রং কি করে কাটবে? কবি প্রশ্ন করছেন। "তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে?" এরই জবাব হিসাবে এই লাইনটা জুড়ে দেব ভেবেছিলাম, "নিয়মিত 'ব্রজলীণ' সেবনে।" অ্যাঁ, লাইনটা কেমন?

সুনীত—বেশ অর্থপূর্ণ।

বিশু—এক লাইন কবিতার জন্য যদি নোবেল প্রাইজ থাকত, তাহলে নির্ঘাৎ আপনি সেটা পেতেন। মাইরি, আপনার গা ছুঁয়ে বলতে পারি।

ব্রজদা—(হুংকার ছাড়লেন) কি বললি বিশে, নোবেল প্রাইজ—

সুনীল—(বিশুকে) দ্যাখ বিশু, ফ্যাশ মেরে মেরে তোর এমন বদভ্যেস হয়ে গিয়েছে! চুপচাপ বসে থাক। আলটু ফালটু কথা বলিস নি। নোবেল প্রাইজটাই যে ব্রজদার দেওয়া তা জানিস।

টাকাটা নোবেলের প্ল্যানটা আমার। (ব্রজদাকে খুশিই দেখা গেল) যাক গে যাক, এসব মাইনর জিনিস নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া না করাই ভাল। ওতে নজরটা ছোট হয়ে যায়। তার চেয়ে যা বলছিলাম, শোন। "ব্রজলীণ" আবিষ্কারের পর তাঁবু গুটিয়ে রস দ্বীপ থেকে দেশে ফিরব। তোড়জোড় করছি এমন সময় লণ্ডন থেকে খবর এল, স্বয়ং রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্টই জানালে, "ব্রজদা, স্কট্ ইন্ ট্রেস্, বিপদের আশঙ্কা করছি, তুমিই ভরসা, সার্চ কর।" তাঁবু গুটোনো আর হল না। তক্ষুনি শ্লেজ্ জুতে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর দু' মাস ধরে সার্চ করে খৃস্টমাসের সন্ধ্যায় রস দ্বীপে আমার তাঁবুতে ফিরে এলাম। মনে বিষাদ, দেহে ক্লান্তি, স্কটের ডায়েরিখানা নিয়েই ফিরে এসেছি। একেবারে শেষ মুহূর্তের কথাও লিখে রেখে গিয়েছে। শেষের পাতাটার আঁকিবুঁকির পাঠ উদ্ধার করে দেখি, লেখা আছে: "খালি ব্রজদার কথা মনে পড়ছে। তিনি আমাকে ঠিক সময়ে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন। আমি তা মানিনি। এ আমার চরম শিক্ষা।" বেচারি! (ব্রজদা মাথা নিচু করে এক মিনিট নীরবতা পালন করলেন। ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে এল।)

সামান্য কিছু (গলাটা ধরে গিয়েছিল তাঁর, তাই ভাল আওয়াজ বের হল না। দুবার কেসে গলাটা ছাড়িয়ে নিলেন) সামান্য কিছু খেয়েই শুয়ে পড়লাম। আমার তাঁবুটো আর বেলাভূমির মাঝখানে ছোট্ট একটা টিলা। বরফ ঢাকা। ব্লিজার্ডের গুঁতো থেকে বাঁচব বলেই তাঁবুটো টিলার আড়ালে খাটিয়েছিলাম। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম টিলার ওধারে থেকে নানা রকম আওয়াজ আসছে। ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি, ওগুলো মানুষের কলরব। ভেবেছিলাম এম্পারার পেঙ্গুইনদেরই বুঝি কাকলি। একবার মনে হল, তালি বাজাতে বাজাতে কারা যেন নাচছে। উদ্দাম নৃত্য। ভাবলাম এ-সব পেঙ্গুইনদেরই পাখা ঝাপটানির শব্দ। একবার মনে হল পেঙ্গুইনরা ফকুস্ ট্রট্

নাচছে বুঝি। তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম খেয়াল নেই। অকস্মাৎ প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই আবার ঝাঁকি, আবার ঝাঁকি। একবার মনে হলো, অ্যাভালান্স নাকি? পরক্ষণেই মন বলল, দূর তা কি করে হবে? তবে কি ভূমিকম্প? ঝাঁকুনির জোর দেখে মনে হচ্ছিল, হ্যাঁচকা টানে কেউ বুঝি পৃথিবীটাকে গোড়া শুদ্ধ উপড়ে নিতে চাইছে। এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি। না আমি ভয় পাইনি। তবে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম।

এমন সময় টিলার ওপিঠ থেকে এক আর্ত চীৎকার ভেসে এল। না, এতো এম্পারার পেঙ্গুইনের চীৎকার নয়। এ যে রমণীর কণ্ঠ! তবে কি এখনও স্বপ্ন দেখছি? "হেল্প্! হেল্প্!" অবলা নারীর আর্তস্বর সেই প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করে আবার বেজে উঠতেই আমার জড়তা কেটে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু প্রচণ্ড এক ধাক্কায় একেবারে ধরাশায়ী হলাম। পড়ে গিয়েই টের পেলাম, এ কী! দ্বীপটা যে চলছে! একেবারে যে ভৌতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল!

"হে—ল্প্ হে—ল্—প্!" আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলাম না। এক লাফে টিলা টপকে ওধারে পৌঁছালাম। হঠাৎ মধ্য-রাত্রির সূর্য সেই ঘন কুয়াশা ভেদ করে পিচু করে খানিকটা এনিমিক আলো ছিটিয়ে দিল। সেই ঝাপসা আলোর আবছায়াতে দেখি একটা চাঁদোয়ার তলায় একটা খ্রীস্টমাস ট্রী, বিস্তর বেলুন, মদের বোতল, পোর্টেবল গ্রামোফোন, রেকর্ড, অজস্র খাবার দাবার আর অনেকগুলো পায়ের চিহ্ন পড়ে আছে। কিন্তু জনমানিষ্যি কোথাও নেই। আমাকে নিয়ে দ্বীপের বেশ খানিকটা অংশ সমুদ্রের জলে ভেসে চলেছে। রস দ্বীপের মেন ল্যান্ডের সঙ্গে এর মধ্যেই আমার ভাল রকম এক ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে।

"দ্বীপ ভেসে চলল!" সুনীত আর থাকতে পারল না। "তাও আবার হয় নাকি?"

"কেন, কেন ভাসবে না শুনি। বংশ দিয়েই ভাসানো যেতে পারে। দ্বীপটাকে যদি বাঁশের চাপের উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেই চলে। না ব্রজদা?"

"দ্যাখ সুনীল", ব্রজদা ক্ষেপে গেলেন। "তুই বড্ড আজগুবি কথা বলিস। অ্যান্টার্টিকে ঘাসই বলে জন্মাতে চায় না। বাঁশ তুই পাবি কোথায়?"

এবার সুনীলও ঘাবড়ে গেল। "তাহলে?"

"লেখাপড়া জীবনে যদি করতিস তো বোকার মত কথায় কথায় মূর্চ্ছা যেতিস না, বুঝলি। আইসবার্গ জলে ভাসে, কথাটা কখনও শুনিস নি না কি? নয় ভাগের আট ভাগ নিচে আর মাত্র একভাগ জলের উপরে ভেসে থাকে।"

"আইসবার্গ!" সুনীত বলে উঠল, "তাই তো। ইস্স্!" তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল।

প্রায় আট হাজার স্কোয়ার ফুটের একটা চাঙড় খসে বেরিয়ে এসেছিল, ব্রজদা খেসারত স্বরূপ একটা নতুন সিগারেটে আগুন দিলেন। তাই বাঁচোয়া। নইলে আমাদের ভর সইতো না।

নে, এখন শোন। কিন্তু হেল্প্ হেল্প্ করে কে চেঁচালে? এদিক ওদিক চেয়ে কাউকেই দেখতে পেলাম না। দূর থেকে একটা ইঞ্জিনের শব্দ কানে এসে বাজতে লাগল। ঠাহর করে বুঝতে পারলাম বরফ ভাঙ্গা জাহাজের শব্দ। ভালই হল। বাঁচবার পথ পাওয়া গেল। প্রাণভরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য চেঁচিয়ে উঠলাম আ—হোই। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে গেল। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

হঠাৎ খ্রীস্টমাস ট্রীটা একটু দুলে উঠতেই সেদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা পরমা-সুন্দরী মেয়ে বরফের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রং এত ফর্সা যে বরফের সঙ্গে বেমালুম মিশে গিয়েছে। তাই এতক্ষণ দেখতে পাইনি। আমি ছুটে গিয়ে তাকে তুলে আনলাম। তারপর পাঁজাকোলা করে তুলে আমার তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। আমার বলিষ্ঠ দেহের মধ্যে ভয় পাওয়া কবুতরির মত তার মহাপ্রাণীটা ধুকপুক করতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সেবা শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলাম। ক্রমশ ঠাণ্ডা বেড়ে চলল। তাপমাত্রা সাংঘাতিক রকম নেমে গেল। সে যে কী ঠাণ্ডা কল্পনাও করতে পারবি নে তোরা।

ওর পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে গেলাম, পারলাম না। পারব কি করে? কথা ঠোঁট ছেড়ে বেরুতে না বেরুতেই জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। ওর কান পর্যন্ত পৌঁছুচ্ছেই না। ভেবে দ্যাখ কী রকম শীত। দক্ষিণ মেরুর শীত কি না। যাহোক করে শেষপর্যন্ত ওর পরিচয়টা বের করেই ফেললাম।

"ইশারা করে বুঝি?"

"না", ব্রজদা সুনীতের দিকে কিছুক্ষণ থমকে চেয়ে থেকে বললেন, "দেশলাই জেলে জেলে। কথাগুলো ঠোঁট থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে যেই জমে যেতে লাগল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই-এর কাঠি জেলে জেলে ধরতে লাগলাম। অমনি জমাট কথা সাউন্ড এনার্জিতে পুনরায় রূপান্তরিত হয়ে তার কানের ডায়াফ্রেমে স্বাভাবিক নিয়মেই গিয়ে আঘাত করতে লাগল। এসব হাই সায়েন্সের ব্যাপার। ব্রজদাজ্ ফ্রিজিং সিস্টেম্ অব্ সাউন্ড নামে লেটেস্ট যা একখানা থিয়োরি দিয়েছি না, তাই নিয়ে বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকরাও খাবি খেতে সুরু করেছে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন গ্রামোফোনের ব্যবসা এবারে লাটে উঠবে। একটি মাত্র শব্দযন্ত্র থাকবে তার নাম 'ব্রজদাজ্ ফ্রিজো-ফোন।' মুখেন মারিতং জগৎ, বাঙ্গালী তা প্রমাণ করে ছাড়বে।"

যাকগে, ও নিয়ে আর গাবিয়ে বেড়িও না, ছোটখাট কাজ এখনও কিছু বাকি আছে! (ব্রজদা সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন) তারপর ধীরে ধীরে তো মেয়েটার সব হিস্ট্রি জেনে নিলাম। খুব হাই ফ্যামিলির মেয়ে। মাপ করো, এর বেশি কিছু আর বলতে পারব না। নাম বা পরিচয় কিছু না। মা কালির নামে দিব্যি খেয়েছি।

বাপ মায়ের একমাত্র মেয়ে। অগাধ সম্পত্তির মালিক। বাপ মা নেই। ঠাকুর্দা আছে। ওদেরই একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ষড়যন্ত্র করে সম্পত্তি হাতাবার মতলবে দক্ষিণ মেরুতে খ্রীস্টমাস উৎসবের ফুর্তি করবে বলে মেয়েটাকে একটা বরফ-ভাঙা জাহাজে করে এখানে নিয়ে আসে। তারপর এই দ্বীপে ফেলে রেখে চম্পট দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের লীলা, পালাবার সময় তাড়া-হুড়ো করে এমন ভাবেই বরফ ভেঙে গিয়েছে যে ওদের পিছু পিছু আমরাও দিন চারেক পরে ক্লিয়ার ওয়াটারে গিয়ে পড়েছি। কিন্তু বাহিরসমুদ্রে পড়ার পর আমাদের তো গতি নেই, তাই আমরা ভাসতে লাগলুম, আর আমাদের এই কাহিনীর খল নায়ক আমার অসহায় চোখের সামনে দিয়ে ফুল স্টীমে জাহাজ চালিয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। আমি রাগে অন্ধ হয়ে নিজের হাত কামড়াতে লাগলাম। যদি একবার জাহাজটায় উঠতে পারতাম তো ব্যাটাচ্ছেলের ছাল্লা বদলে দিতাম।

এদিকে এক নতুন বিপদ দেখা গেল। যতই আমরা উষ্ণ থেকে উষ্ণতর জলে এসে পড়ছি, ততই আমাদের বরফের আশ্রয় দ্রুততর বেগে গলতে সুরু করেছে। মেয়েটা এত সরল যে, এই বিপদের বিন্দুমাত্র আঁচও পায়নি। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে আছে। আমি এই সব কথা ভাবছি, মাঝে মাঝে মেপে দেখছি, আইস্‌বার্গটা কতটা গলল। এরই মধ্যে সিকি ভাগ গলে গিয়েছে। জলের যা টেম্পারেচার তাতে দিন দুয়েকের মধ্যেই সবটা গলে জল হয়ে যাবে। তারপর এয়ার ম্যাট্রেসের ভেলায় দুটি প্রাণী এই ভয়ানক সমুদ্রে আর কতক্ষণই বা টিঁকে থাকতে পারব?

হঠাৎ ও চীৎকার করে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে দুহাতে চেপে ধরল। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সামনে আঙুল তুলে বললে, "ঐ দ্যাখ ঐ দ্যাখ, দুটো সামুদ্রিক রাক্ষস। মনুসুরো। আর রক্ষা নেই।" বলেই কাঁদতে লাগল।

চেয়ে দেখি একশ গজ দূরে দুটো পূর্ণ-বয়স্ক তিমি, নীল তিমি, নিশ্চিন্ত মনে গা ভাসিয়ে পিচকিরি করে জলের ফোয়ারা ছাড়ছে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে ওকে বললাম, আর ভয় নেই। ওরা আমাদের মুক্তির দূত। বলেই মনে মনে প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। ওকে বললাম, দ্যাখ, এখনই একটা ভয়ানক কান্ড ঘটবে। আমি সিগন্যাল দেবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি পিছন থেকে আমার কোমরটা শুধু শক্ত করে, গায়ে যত জোর আছে, চেপে ধরবে। কিছুতে ছাড়বে না। বুঝেছ। তারপর যা করবার আমি করব।

তাঁবু থেকে বেশ ভারি দুটো হারপুন বের করে আনলাম। ছয় শ গজ করে এক একটার দড়ি। চোখের পলক পড়তে না পড়তে সেই ভীষণ হারপুন দুটো তিমি দুটোর গলার ঠিক উপরে গেঁথে গেল। ওরা এই আক্রমণের জন্য আদৌ তৈরি ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে ওরা ভুস্ করে ডুবে গেল। দুই হারপুনের দড়ি আমি লাগামের মত দুই হাতে ধরে থাকলাম। দড়িতে ভীষণ টান পড়ল। আমরা উল্কার গতিতে উত্তর মুখে বেয়ে চললাম।

সারারাত ধরে নক্ষত্র দেখে পথের নিশানা বের করে তিমি দুটোকে লাগামের টানে টানে ঠিক পথে পরিচালিত করলাম। ভোর রাত নাগাত বরফভাঙা জাহাজটার লেজের আলো আমার দৃষ্টিগোচর হল। আধ মাইল থাকতেই নিশানা ঠিক করে হারপুনের দড়ি ছেড়ে দিলাম। তিমি দুটো ছাড়া পেয়ে ভুস্ করে ডুবে গেল। আমি বললাম, ওয়েল ডান্ বয়েজ্, মেনি থ্যাংক্‌স্। ধীরে ধীরে আইসবার্গটা জাহাজের গায়ে ঠেকতেই রেলিং-এ দড়ি ছুঁড়ে আমি লাফ দিয়ে দড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। তারপর দড়ি নামিয়ে মেয়েটাকে তুললাম। সেই মুহূর্তে আইসবার্গটাও তলিয়ে গেল। এত বেগে আসার ফলে জলের ঘসায় একেবারে ক্ষয়ে গিয়েছিল।

জাহাজটা ছিল এই মেয়েটারই। ওকে তাই চুপি চুপি নাবিকদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর খল নায়কের কেবিনে ঢুকে তাকে এই প্যাঁদান আর সেই প্যাঁদান। পাশের কেবিনে আরেকটি মেয়ে ছিল। একেবারে মুনির মন-টলা খাই খাই চেহারা। বুঝতেই পারছিস সে খলনায়িকা। ভ্যাম্প্। গোলমাল শুনে একটা কিরীচ নিয়ে এই ঘরে ঢুকতে এসেছিল। কিন্তু সেই সময় খলনায়কের পিস্তলের ভাক-ফস্কা গুলি তার বুকে লাগতেই সে রেলিং ডিঙিয়ে জলে পড়ে গেল। সেই মুহূর্তেই আমি খল নায়কের মুখে একখানা আপার কাট্ ঝাড়তেই সে-ও গোঁত্তা খেয়ে খল নায়িকার অনুগমন করল। ঝপাৎ করে একটা শব্দ আর তার কিছুক্ষণ পরেই মর্মভেদী চিৎকার শুনে বুঝলাম হাঙরে ধরেছে। দি এন্ড।

ব্রজদা উঠতে যাচ্ছিলেন। বিশু বলল, "কিন্তু ব্রজদা, মানে, একেবারে শেষটুকু বুঝলেন না, হেঁ হেঁ হেঁ—"

"তবে শোন", ব্রজদা আবার বসলেন। "সেদিন সারাদিন সে আমাকে আর চোখের আড়াল করল না। রাতে খাবার টেবিলে বসে বললে, হানি, তোমার জন্য এসব আমি নিজের হাতে রেঁধেছি। বললাম, থ্যাংক্যু। তারপর আমার কেবিনের বিছানাটা নিজে হাতে ঝেড়ে ঝুড়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। তারপর মশারি টাঙিয়ে দিয়ে আমার চুলে বিলি কাটতে কাটতে এক সময় দেখি (ব্রজদা খুক খুক করে কেসে নিলেন) ও ঠোঁট ক্রমশই নামিয়ে আনছে। যখন প্রায় ছুঁই ছুঁই তখন আমি বললাম, বোনটি এবার তোমার ঘরে যাও। ঢুলে পড়ছ। ঘুম এসে গেছে বোধ হয়।"

সে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। (ব্রজদা একটা সিগারেট ধরালেন) তারপর বলল, বাট্ আই লাভ ইউ হানি। বললাম, জানি। সে বলল, তবে? তবে হানি, তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

আমি বললাম, উপায় নেই। আমাদের দেশের সিস্টেম বড় কড়া। নায়িকা মশারি গুঁজে দেবার পর আমাদের দেশের নায়করা যে আর পাশ্চাত্যের নায়কদের মত দেহবাদী থাকে না ভাই। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে তাদের সম্পর্ক তখন ভাইবোনে পরিণত হয়। বিশ্বাস না হয় বাংলাদেশের সাহিত্য সম্রাট, উজির, নাজিরদের লেখা মোটা মোটা সব নভেল পড়ে দেখতে পার।

ব্রজদা আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না।

বাতায়নবর্তিনী : প্রতাপেশ্বর মন্দির ॥ কালনা, বর্ধমান

টেরাকোটা

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে গৌরবের আসন পেতে পারে এমন পুরাতন কীর্তি পশ্চিম বাংলায় অধুনা অল্পই আছে। পাহাড়পুরের পুরাকীর্তিগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেগুলি এখন পূর্ব পাকিস্তানে। মালদহ জেলার গৌড় বা পাণ্ডুয়াতে পাঠান আমলের যে সকল ইমারতের এখনও দেখা মেলে সেগুলির বর্তমান অবস্থা এতই জীর্ণ যে, তাদের আর গৌরবের সঙ্গে উল্লেখ করা যায় কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত পাল বা সেন রাজাদের সময়ের অজস্র উৎকৃষ্ট কষ্টিপাথরের মূর্তিগুলি থেকে তৎকালীন ভাস্কর্যের মনোহারিত্ব প্রমাণিত হলেও, সে-সময়ের স্থাপত্য কীর্তিগুলির বিশেষ কিছুই বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি। ফলে, পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য পুরাতন স্থাপত্য-নিদর্শন হিসেবে—সুন্দরবনের জটার দেউল বা বরাকরের নিকটবর্তী বেগুনিয়া মন্দির প্রভৃতি আঙুলে গোনা যায় এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত ছাড়া বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মল্লরাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলির কথাই বলতে হয় যদিও, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের রচনা
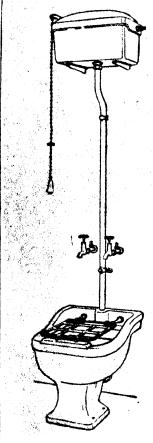
হিসেবে, এগুলিকে ঠিক পুরাকীর্তির পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা সন্দেহ। মুর্শিদাবাদের নবাবী আমলের ইমারতগুলি তো আরও আধুনিক কালের।

—অতি সংক্ষেপে বিবৃত এই বিবরণী থেকে যে দুটি প্রধান তথ্যে উপনীত হওয়া যায়, তা হ'ল এই যে, তাজমহল বা কোণারকের মত বিরাট অথবা মহাবলীপুরম কি সাঁচির মত প্রাচীন কোনও স্থাপত্যসম্পদ পশ্চিম বাংলায় নেই। কেন নেই? ভারতবর্ষের বহু অঞ্চলে যা আছে পশ্চিমবঙ্গে তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি যে একটা দৈব দুর্ঘটনা নয়, এই অভিনব অভাবের যে সঙ্গত ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যরীতিমূলক কারণ আছে তা সংক্ষেপে বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যাক। ঐতিহাসিক কারণ এই যে পাল ও সেন রাজাদের পরে কোনো সময়েই এ অঞ্চলে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী কোনো রাজবংশ রাজত্ব করেননি, যাঁদের অমিত অর্থানুকুল্যে তাজমহল বা কোণারকের মত বহুমূল্য ইমারত তৈরির কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হত। পাঠান-মুঘল আমলে বাংলা দেশ বিদেশীর রাজত্বের প্রত্যন্তসীমায় এক সুবা হিসাবে শাসিত হয়েছে; দিল্লী আগ্রার রাজকীয় বৈভব এত দূরে এসে পৌঁছয়নি। তা ছাড়া, বাদশাহী স্বার্থে সুবাদারেরাও এত ঘন ঘন বদলি হয়েছেন যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো উল্লেখযোগ্য কাজে হাত দেবার তাঁরা অবকাশ পাননি। অন্য দিকে, স্থানীয় নৃপতিকুলেরও কারও এমন সামর্থ্য কখনই হয়নি যে, নিজ রাজ্যে যার বছরের রাজস্ব একটি মন্দিরের পিছনেই ব্যয় করতে পারেন, যেমন নাকি কোণারকের সূর্য-মন্দিরের বেলায় করা হয়েছিল। ভারতীয় প্রথায় স্থাপত্যকীর্তিগুলি সম্বন্ধে সম্ভবত সাধারণভাবে একথা বলা চলে যে, সেগুলির বিশালত্ব বা সৌকর্য সর্বদা নির্ভর করেছে পৃষ্ঠপোষক রাজন্যবর্গের আর্থিক ক্ষমতার উপর। খাজুরাহোতে যে সত্তর আশিটি অপরূপ মন্দির একদা নির্মিত হয়েছিল তার প্রধান কারণ চান্দেল নরপতিদের সীমাহীন বিত্ত ও বংশপরম্পরায় অকুণ্ঠ সহযোগিতা। আবার কাঞ্চিপুরের এককালীন সহস্র মন্দিরের মূলেও কাঞ্চিরাজকুলের অমিত বৈভব। বস্তুত, চিরকালের দরিদ্র এই দেশে শুধু প্রভূত বিত্তশালী রাজবংশগুলিই মহৎ

নবনারীকুঞ্জর : গণপুর, বীরভূম
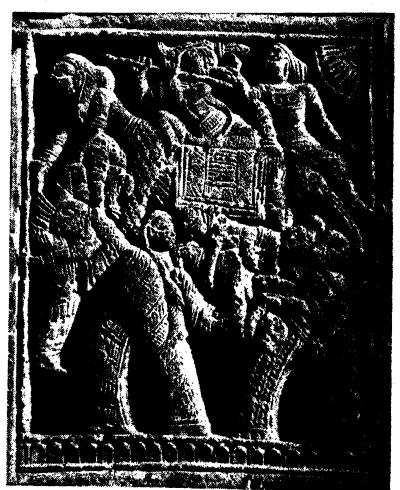
স্থাপত্যকীর্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। বাংলা দেশ এই সুযোগ থেকে ঐতিহাসিক কারণে বঞ্চিত হয়েছে গত বহু শত বৎসর।

তাছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব স্থাপত্য-রীতিও এই অপ্রতুলতার কম সহায়ক হয়নি। ভারতবর্ষের অন্যত্র দীর্ঘস্থায়ী ইমারত নির্মাণের জন্য গ্রানিট, বালিপাথর, কষ্টিপাথর, শ্বেতপাথর প্রভৃতি শক্ত উপাদান প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পলিমাটির দেশ বাংলায় যে-কোন রকম পাথরই দুষ্প্রাপ্য। পাথর সংগ্রহের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থান রাজমহল অথবা চুনার। কিন্তু এ-স্থানগুলি বাংলার বিভিন্ন সময়ের রাজধানীগুলি থেকে এত দূরে যে পশ্চিম-বঙ্গের স্থাপত্যের ক্ষেত্রে পাথরের ব্যবহার অল্পই হয়েছে। বাঙালী স্থপতিদের সেজন্য নির্ভর করতে হয়েছে ইঁটের উপর, পাথরের তুলনায় যার দীর্ঘস্থায়িত্ব নগণ্য। একথায় সেজন্য কোনো ভুল নেই যে, বাংলা দেশের সর্বত্র, কি গ্রামে কি শহরে কি রাজধানীতে, এই স্বল্পায়ু উপাদানে নির্মিত শত শত মন্দির প্রাসাদ অট্টালিকা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দু'তিন শো বছরের বেশী সময় লাগেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের প্রাসাদের উল্লেখ করা যেতে পারে। মাত্র পৌনে তিন শো বছর আগে, ঐ-রাজবংশের বাড়বাড়ন্ত অবস্থায় যখন ভাঁটা পড়তে শুরু করেনি, তখনও বিষ্ণু-পুরের সুবিশাল রাজপ্রাসাদ যে দর্শককে স্তম্ভিত করত তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। আর আজ সেই প্রাসাদ-এলাকায় নিরাভরণ বন্ধ্যা ভূমি শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে। সেখানে যে কোনো কালে কোনো ইমারত ছিল তা ধারণা করাও শক্ত। এত অল্প সময়ে এরকম মহতী বিনষ্টি প্রায় ভোজবাজির মত মনে হয়। কিন্তু এ জাতীয় ভোজবাজি বাংলাদেশের স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বারংবার ঘটেছে। অথচ —এবং এ কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —বিষ্ণুপুর প্রাসাদের পাথরে-তৈরি দুটি প্রবেশদ্বার এখনও সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। ব্যবহৃত উপাদানের উপরে যে ইমারতের আয়ু একান্ত নির্ভরশীল একথা, বহু মনস্তাপ ও ক্ষতির বিনিময়ে বাংলাদেশে বিশদভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

ইমারতের স্থায়িত্বের বেলাতে যে কথা: তার অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত স্বল্পায়ু উপাদানের বেলাতেও সেই একই কথা। রাজপুতানার ডিগ বা ভরতপুরের প্রাসাদ-গুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন বালি-পাথরের উপর কী নিপুণ ভাস্কর্য সম্ভব। জয়শলমীরের হলুদ মর্মর বা দিল্লী-আগ্রার শ্বেতপাথরের অলংকরণ বাংলাদেশের প্রায় যাবতীয় স্থাপত্যকীর্তি থেকে বেশী প্রাচীন, কিন্তু এগুলির সৌকর্য এতদিনেও কিছুমাত্র

সজ্জাপুত্তলিকা : শ্রীধর মন্দির ॥ সোনামুখী, বাঁকুড়া

ক্ষুণ্ণ হয়নি। দূরের উদাহরণ না দিয়ে বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়েই বলা যেতে পারে যে, পাল-ভাস্কর্যের যেসব অপূর্ব নিদর্শন বহুদিনের অবহেলায় মৃৎপ্রোথিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে বিভিন্ন সংগ্রহ-শালায় রক্ষিত আছে তাদের কারুকার্য বহু ক্ষেত্রে এখনও সজীব এই কারণে যে সেগুলি সাধারণত কষ্টিপাথরে নির্মিত। এই দীর্ঘ স্থায়ী উপকরণটি বাংলাদেশের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একদা বহুল-ব্যবহৃত হলেও যথেষ্ট পরিমাণে সুলভ না হওয়ার দরুন মন্দির বা ইমারত অলংকরণের জন্য কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে। দেবালয়ের বিগ্রহ নির্মাণের জন্য এক খণ্ড কষ্টিপাথরের সংগ্রহ হলেই কাজ চলেছে কিন্তু সেই দেবগৃহের বহির্ভাগ অলংকরণের জন্য সহস্র গুণ বেশী পরিমাণ কষ্টিপাথর আহরণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে সৌধের ভিতর বা বাহিরের কারুকার্যের জন্য বাঙালী স্থপতি ও ভাস্করদের বাধ্য হয়ে স্বল্পায়ু পোড়ামাটির উপাদানের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে। সৌধ-অলকংরণের জন্য ব্যবহৃত পোড়া-মাটির নকাশী টালির বিদেশী নামই "টেরা-কোটা"। (পোড়ামাটির পুতুল ইত্যাদি সামগ্রী এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়।) এই "টেরাকোটা"শিল্প, ভৌগোলিক কারণে, বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ; ভারতবর্ষের অনাত্র এর বিশেষ জুড়ি নেই।

বাংলাদেশে মন্দির-অলংকরণের জন্যই "টেরাকোটা"র প্রায় একচেটিয়া ব্যবহার হয়েছে; অন্যাবিধ সৌধে এই পদ্ধতির প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। প্রধানত রাঢ় অঞ্চলে, বিশেষ করে বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হুগলি জেলার প্রায় সর্বত্র, যাবতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির কিছু না কিছু "টেরাকোটা" অলংকরণে ভূষিত। নদীয়া জেলার কয়েকটি মন্দিরও এই সম্পদে সমৃদ্ধ। সংলগ্ন অন্যান্য জেলায়ও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অল্পবিস্তর চোখে পড়ে।

এই বিশেষ এলাকাটিতে "টেরাকোটা"-শিল্পের সমৃদ্ধির কারণ যে, বিষ্ণুপুরের গুণগ্রাহী মল্লরাজাদের এককালীন পৃষ্ঠপোষকতা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের মন্দিরগুলিতে "টেরাকোটা"র অজস্র সজ্জা দেখলে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে রাজ-উৎসাহে একদা শত শত শিল্পী এই বিশেষ শিল্পকর্মটিতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের অনেকে যে পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের নৈপুণ্যের পরিচয় দেবেন এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু দু'শো আড়াইশো বছর আগেও যে শিল্পিগোষ্ঠী সংখ্যায় ছিলেন অগণিত, দক্ষতায় অননুকরণীয়, ভাবলে অবাক হতে হয় যে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁদের বংশে বাতি দিতে আজ আর কেউ অবশিষ্ট নেই। একদা ভুবন-বিখ্যাত আমাদের মসলিন শিল্পের মত "টেরাকোটা"-শিল্পও অধুনা বঙ্গ-ইতিহাসের অঙ্গীভূত।

বলা বাহুল্য, অন্য যে কোনো মধ্যযুগীয় শিল্পরীতির ন্যায় "টেরাকোটা"-শৈলীতেও বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ছিল, ভাস্কর্যের বিষয়বস্তুগুলির নির্বাচনের ব্যাপারে নির্ধারিত প্রথা প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণলীলা বা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলিই অলংকরণের প্রধান উপজীব্য বলে গৃহীত হলেও সেগুলিকে পোড়ামাটির উপাদানে উপস্থিত করবার মধ্যে সর্বত্রই মোটামুটি একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা এই বহুল-ব্যবহৃত "মোটিফ"টির উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাস্কর্যের কেন্দ্রে একটি বৃত্তের মধ্যে কৃষ্ণ রাধিকা ও গোপিনীমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করে আর একটি বা দু'টি সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে কৃষ্ণ ও গোপিনীদের নৃত্যরত মূর্তি পর্যায়ক্রমে থাকবার রীতি প্রথাগতভাবে সুনির্দিষ্ট ছিল। প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত রাসলীলার অলংকরণটি হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরে উৎকীর্ণ আছে কিন্তু এটির হুবহু অনুকৃতি বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান বা নদীয়া জেলায় অজস্র চোখে পড়বে। আর একটি জনপ্রিয় "মোটিফের" প্রচলিত নাম "নবনারীকুঞ্জর"। এটিতে নয়টি যুবতী নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় পরস্পরের দেহ-সংলগ্ন হয়ে একটি হাতির আকার ধারণ করে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে সুখভ্রমণে বহন করছেন। প্রবন্ধে ব্যবহৃত "নবনারীকুঞ্জর"-এর ছবিটি বীরভূম জেলার গণপুর গ্রাম থেকে সংগৃহীত কিন্তু যুবতীদের পারস্পরিক সংস্থান সমেত অবিকল এই একই চিত্রকল্প অন্য জেলাগুলিতে কিছুমাত্র অপ্রতুল নয়।

ধর্মীয় ভাস্কর্যগুলিতে সাধারণত যে সুদৃঢ় নিগড় আরোপিত হত, সুখের বিষয়, শিল্পের সজীবতারক্ষা ও স্রষ্টার ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রকাশের সুবিধার জন্য সামাজিক বা অন্যবিধ ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে তা বহুল পরিমাণে হ্রাস করাই বিধি ছিল। এই ইচ্ছাকৃত স্বাধীনতার প্রসাদে ভূরিপরিমাণ সামাজিক "মোটিফ" উদ্ভূত ও ব্যবহৃত হবার অবকাশ পেয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তৎকালীন নারীমূর্তির কথাই ধরা যাক। সর্বত্রই তাদের উপস্থিত করা হয়েছে সামজিক সজ্জায়, সামজিক পরিবেশে কিন্তু শিল্পীদের উপর এ বিষয়ে কোনো পূর্বকল্পিত প্রথা আরোপ করা হয়নি। সমাজচিত্রগুলি প্রতিভাত করবার জন্য ভাস্করেরা প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা পেয়েছেন বলে এই শ্রেণীর মূর্তিগুলিতে "টেরাকোটা"-শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শনের অভাব নেই। নিছক নির্মাণ-পটুত্ব ছাড়াও এগুলি নানাবিধ বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। একক নারীমূর্তিগুলির কেউ সজ্জাপুলকিতা, কেউ বাতায়নবর্তিনী, কেউ প্রসাধননিরতা, কেউ বীনাবাদিনী। এ ছাড়াও অন্দর মহলের বিভিন্ন দৃশ্য, যেমন চুলবাঁধা, পাশা খেলা, কন্যা সম্প্রদান ইত্যাদি নানারকম সামাজিক "মোটিফের" অজস্র ব্যবহার হয়েছে। পুরুষদের বেলায় শিবিকা-ভ্রমণ, ফরসি-সেবন ইত্যাদি "মোটিফ"ও বহুল-ব্যবহৃত। দুই একশো থেকে প্রায় চারশো বছর আগেকার বাঙালী সমাজজীবনের এগুলি মূল্যবান দলিল। সমাজতত্ত্বের দিক থেকেও এই পোড়ামাটির অলকংরণগুলির সেজন্য যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

একথা সর্বজনবিদিত কিনা জানি না, এই পোড়ামাটির অলংকরণগুলি ছাঁচে ফেলে তৈরী করা হত—ভাস্কর্যপদ্ধতিতে নয়। উপযুক্ত প্রকারের আগুনে পুড়িয়ে এগুলিকে শক্ত করবার পর, মন্দির গাত্রে চুন-সুরকির আস্তরণের উপর ধরিয়ে দেওয়া হত। মন্দিরের সামগ্রিক সজ্জা কি প্রকারের হবে তার একটা খসড়া আগে থেকেই প্রস্তুত রাখা হত মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত রাঢ় অঞ্চলের, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মন্দির গাত্রে এই পোড়ামাটির অলংকরণগুলি বঙ্গসংস্কৃতির এক অমূল্য উপাদান। স্বল্পায়ু উপাদানে তৈরী বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলির জীর্ণ দশা। এগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অবিলম্বে যে সুবন্দোবস্ত হওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই।

(আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত)

রাসলীলা : বাসুদেবমন্দির ॥ বাঁশবেড়িয়া, হুগলী

সীতাগড়ের মানুষখেকো

বুদ্ধদেব গুহ

হাজারীবাগ আসার পর থেকেই নাজিম সাহেবের কাছে সীতাগড়ার মানুষখেকোটার গল্প শুনেছি। তাছাড়া শুনেছি হাটে, শুনেছি রিক্সাওয়ালার কাছে, শুনেছি জলৌনের কুমার সাহেবের কাছে। কিন্তু কোলকাতা থেকে গাড়ী নিয়ে আসিনি, তাই এদিক ওদিক ঢু মারি, কৌসম্বা কি ছাড়োয়া, কিন্তু সীতাগড়ার বাঘ গল্পই থেকে যায়। ভুরকুন্ডাতে, মিস্টার উইলি হাউস্‌কে ট্রাঙ্ককল করেও যখন আমরা পেলাম না, তখন রীতিমত হতাশ হয়ে পড়লাম জীপ সম্বন্ধে। আর একটা কথা অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে সত্যি যে সীতাগড়া-বহরনপুরের রাস্তায়, আপনার দামী দামী ফ্যাশানেবল্ গাড়ী একেবারেই অচল। ওখানে যা দরকার তা কুল্লে আড়াই হাজারে কেনা একখানি লজঝড়ে জীপ।

মনের দুঃখ মনে রেখে ইউক্যালিপ্‌টাস গাছের গোড়ায় টার্গেট বানিয়ে আমরা ·২২ রাইফেল দিয়ে টার্গেট প্র্যাক্‌টিস করছিলাম সেদিন সকালে—এমন সময় লাদিগড়ের (পালামৌ) কুমার অমরেশ্বর সিং আর মেহেওয়ার (লখিমপুরে খিরি), কুমার সুরেন্দ্র বাহাদুর সিং রাঁচী-মুখো পথে আমাদের অতিথি হলেন এক রাতের। জলৌনের কুমারবাহাদুর এঁদের অত্যন্ত নিকটাত্মীয়, সেই সূত্রে আমাদের আতিথেয়তা। বাঘটার কথা শুনে তাঁরা ত লাফিয়ে উঠলেন। বিস্তারিত বিবরণ তাঁদের দিতে পারলাম না, কারণ আমরা নিজেরাই সেটা জোগাড় করে উঠতে পারিনি। তবু যা শুনেছিলাম সব বললাম। যথেচ্ছ গরু মোষ মারা, যেখানে সেখানে, অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে। আজ এখানে মানুষ ধরছে, কাল ওখানে রাখালদের তাড়া করছে, পরশু গোয়ালাদের খামোকা তাড়া করে দুধ ভর্তি বালতি শুদ্ধু সাইকেল উল্টে পড়তে দেখে গোঁফে চুমকুড়ি লাগিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঘের মতিগতি দেখে, আমরা এবং নাজিম সাহেব যেমন করেছিলেন তেমনি এঁরাও অনুমান করলেন যে, এটা বাঘ নয় চিতা। কারণ এই যে শেষোক্ত বেয়াদপীগুলো, এ কেবল চিতাকেই মানায়। নাজিম সাহেব কিন্তু আরো একটা সন্দেহ করেছিলেন, সেটা বাঘের বাচ্চার। ওঁর ভাষায় 'ই সমঝো হরতক বাচ্চোকা হ্যায়, ই লড়পনকাই কাম হ্যায় জরুর'। কিন্তু নিজেরা গিয়ে দিনের বেলায় পায়ে হেঁটে ভাল করে জঙ্গল ঘুরে না দেখলে এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে নিজেরা কথা না বললে ঠিক কিছুই বোঝা যাবে না।

কুমার সাহেবরা জানতে চাইলেন, তাঁরা যদি রাতে জীপ নিয়ে সীতাগড়া যান, তবে আমরা তাঁদের সঙ্গী হবো কিনা? সানন্দে মত দিলাম। কুমার অমরেশ্বর বড় শিকারী—জলৌনের রাজাসাহেবের কাছে এঁর গল্প শুনেছি বহুবার। এবার পরিচয় হল। সন্ধ্যের পর পরই আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম, যাবার পথে আমাদের 'ডিরেক্টর অফ অপারেশান' নাজিম সাহেবকে তুলে নেওয়া হলো। রাত আটটা নাগাদ সীতাগড় যখন পৌঁছলাম আমরা, তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে, পাহাড়টার উপরের একটা ঝুঁকে-পড়া পাথরের পাশ দিয়ে। সেই পাথরটা এবং উপরের অনেকগুলো বিরাট বিরাট পাথরে গুহা আছে অনেকগুলো। পরে অনুমান করেছিলাম, এ গুহাগুলোতেই মানুষ-খেকোর আস্তানা এবং যে মেয়েটাকে বহরনপুর থেকে নিয়ে গিয়েছিলো শয়তান, তাকে নাকি ঐ গুহার থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। তাকে নয় তার বড় বড় চুল-সমেত ডাগর-ডাগর দুটি ঘুমন্ত চোখের

মুখটিকে আর ডান হাতের তর্জনীটি। পরে আমরা প্রস্তাব করেছিলাম যে, দিনের বেলা সেই গুহাতে বাঘের চলাচলের রাস্তা অনুসরণ করে গিয়ে ওটাকে মারার ব্যবস্থা করা। নাজিম সাহেব তাতে তীব্রতম আপত্তি করেছিলেন। অতএব হাজারীবাগে আমাদের মাল-জীপের জিম্মাদারের কথা মানা না করে উপায় ছিল না।

সীতাগড় পাহাড়টা যেখান থেকে সুরু তার একটু আগে একটি বিরাট পিঁজরাপোল আছে। কয়েক শ গরু মোষ তাতে থাকে। সীতাগড়ের পিঁজরাপোল থেকে চান্দোয়া গ্রামের দূরত্ব হবে প্রায় আড়াই মাইল। চাঁদোয়া থেকে সীতাগড় পাহাড়ের উল্টোদিকের গ্রাম বহরনপুর আধ মাইলটাক দূরে। আর পিঁজরাপোল থেকে পাহাড় ঘুরে বহরনপুর গেলে ঐ আড়াই মাইলের মতই পড়ে। পিঁজরাপোলের সমকোণে একটা ছোট গ্রাম আছে, তার নাম "পওতা"। পওতা থেকে চাঁদোয়ার দূরত্ব হবে প্রায় মাইল দূয়েক। পিঁজরাপোলের গেটে জীপ থামিয়ে যখন আমরা দ্বারোয়ান এবং বন বিভাগের রক্ষীর সংগে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় বাঘটা পাহাড়ের ওপাশে, বহরনপুরের দিক থেকে ডেকে উঠল। একটা গোঙানির আওয়াজের মত। পিঁজরাপোল থেকে চাঁদোয়া অবধি রাস্তা ভাল—এমনি গাড়ীও যেতে পারে। কিন্তু পাহাড়টাকে যে রাস্তাটা বহরনপুরের দিক দিয়ে ঘিরেছে সেটা একটা রাস্তাই নয়। এবং তাতে জীপেরও বাপ ঠাকুর্দার শরনাপন্ন হতে হয়। আমরা তক্ষুনি সেই রাস্তায় রওয়ানা হয়ে গেলাম। দুধারে পিটাস ফলের ঝোপ। প্রায় কোমর সমান উঁচু, পাহাড়ের গা থেকে গড়াতে গড়াতে নেমে এসেছে সবুজ আঁচলের মতো। খুব আস্তে আস্তে স্পট লাইট ফেলে ফেলে আমরা ঘুরতে লাগলাম পাহাড়ের চারপাশ। বহরনপুর এবং চান্দোয়া অবধি। প্রায় রাত একটা পর্যন্ত ঘুরলাম। মজা হল, আমরা যেই বহরনপুরের দিকে যাই, বাঘটা অমনি চাঁদোয়ার দিকে পাহাড়ের ওপর থেকে গোঙার, আবার চাঁদোয়ার দিকে গেলে বহরনপুরের দিক থেকে। সীতাগড়া পাহাড়টি রীতিমত উঁচু পাহাড় আর অত্যন্ত জঙ্গলে ঘেরা। আমাদের ইচ্ছে ছিল আরো কিছুক্ষণ ঘোরা, কিন্তু কুমার সাহেবরা কাল প্রায় সারারাত গাড়ী চালিয়ে এসেছেন, তাই অত্যন্ত ক্লান্ত। অতএব খুঁতখুঁতে মন নিয়ে হাজারীবাগ ফিরলাম সে রাতে। পরে জানতে পারি যে, আমরা যাওয়ার আধ-ঘন্টা বাদে, বাঘ পাহাড় থেকে নেমে এসে পিঁজরাপোলের সামনে চাঁন্দোয়ার রাস্তায় নাকি খুব হাঁক ডাক আর রাগারাগি করেছে।

কুমার সাহেবদের দেখলাম, রোখ চেপে গেছে। বললেন, কাল রাঁচী না ফিরলেই নয়, তবে তাঁরা অল্প কদিনের মধ্যেই ফিরে আসছেন। ও'রা ভোর থাকতেই রওয়ানা হবেন রাঁচীর দিকে। তাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া গেল সেদিন।

কুমারসাহেবেরা চলে যাবার পরদিনই আবার ফোন করা হল মিস্টার হাউসের কাছে ভুরকুণ্ডাতে; উনি সেদিনও ফেরেননি কোলকাতা থেকে। যা হয় একটা বিধি-ব্যবস্থা তাড়াতাড়িতে করতে হবে, এদিকে আর দুদিনের বেশী থাকতে পারবো না কিছুতেই। কি করা যায় না যায়, আলোচনা শেষ হতে না হতেই দেখি থ্রি-কমরেডস-এর 'কার্লে'র' মতো বরুণবাবুদের তিনজনকে নিয়ে সাইলেন্সারের শালীনতা-বর্জিত মোটর গাড়ীখানা কোলকাতা থেকে হাজির। বাস প্রোগ্রাম পাকা। বিকেল তিনটের সময় আমরা রওয়ানা হচ্ছি—চাঁদোয়া গ্রামে আমাদের প্রথম অনুসন্ধানী পর্যায়ে।

সীতাগড় পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় বিকেল চারটে হয়ে গেল। পিঁজরাপোল থেকে চাঁদোয়া অবধি রাস্তাটা ভারী সুন্দর। জংগলের মধ্যে দিয়ে উঁচু নিচু দোল খেতে খেতে চলে গেছে ঠিক কুমোর-তিলায়া থেকে ডোমচাঁচের রাস্তার মত। চাঁদোয়ার রাস্তার প্রায় আধাআধি এসেছি, এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল বটেরের একটা বড় ঝাঁক দল বেঁধে ঘুর ঘুর করছে। গাড়ীটা থামাতে বললাম। এখানে গুলী করতে ভয় ছিল না, কারণ এ অঞ্চলে প্রচুর লাইসেন্স-বিহীন বন্দুকের শব্দ হয় যখন বাঘ মানুষখেকো ছিল না তখনো কোনো কোনো লোক মনের সুখে কোটরা কিংবা চিতল হরিণ মেরেছে চুরি করে, যখন মানুষখেকো হয়েছে তখনো তাই। কাজেই গুলীর শব্দে বাঘ যে এলাকা ছেড়ে পালাবে এমন আশংকা করার কোনো কারণ ছিল না। বন্দুকে একটা ছ' নম্বর পুরে মারলো গোপাল। গোটা বারো পড়ল বটের। নাজিম সাহেব দেখলেন বললেন, "আরে ইসে মাস নেহি হ্যায়, মছলি হ্যায়, খানেসে কলিজাকা ময়লা সাফ হো যায়গা।" আমি আর গোপাল বটেরগুলোর কাছে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। সামনের নালায় চোখ পড়াতে। বৃষ্টির পর নরম মাটিতে নালার ভেতর বাঘের পাঞ্জা। নাজিম সাহেবও নামলেন। অত বড় পাঞ্জা আমরা আগে দেখিনি। আজকের দাগ নয়, দু' একদিন আগের পায়ের দাগ। এবং বাঘটা যে এই নালা দিয়েই সীতাগড়া পাহাড় থেকে নামার পর রাস্তা পেরোয় সেটা বোঝা গেল, পুরোনো, স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট আরো অনেকগুলো দাগ দেখে। এদিক ওদিক ভাল করে আমরা খুঁজলাম। তাতে আরো এক জোড়া বাঘের পায়ের পাঞ্জা চোখে পড়ল—চাঁদোয়ার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই, যে পরিষ্কার জায়গায় রাস্তাটা দুদিকে ঢালু হয়ে এসে একটা ঢেউ খেলছে—সেই জায়গায় রাস্তা পার হবার। কিন্তু আশ্চর্য! এখানে সংগে আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট পাঞ্জা দেখা গেল পাশে পাশে।

তখনকার মতো ওখানে গোলমাল না করে আরো খবরাখবরের জন্যে আমরা চাঁদোয়ার দিকে রওয়ানা হলাম। চাঁদোয়ার গাঁও-বুড়ো পণ্ডিতজী তেঁতুলতলায় খাটিয়া পেতে দিল, বন্দুক, রাইফেল, গাড়ী, এতজন লোক দেখে এদিক ওদিকের লোকরা এগিয়ে এল। পণ্ডিতজী কিন্তু বললে, বাঘিনী কি না তারা বলতে পারছে না, বাচ্চা আছে কিনা তাও না, কিন্তু যা বদমাইসী করছে, তা একটা বিরাট জানোয়ার, বাঘ কি বাঘিনী অত খেয়াল করেনি ওরা ভয়ে। পণ্ডিতজী বললে,—টৌনে টৌনে—'হাঁ সাহাব ই বাঘোয়া বা—বাঘোয়া দেখকে দিমাগ্ খারাপ হো জায়গা।'

এখন প্রশ্ন হলো, বাঘিনী আর বাচ্চা, বাঘ আর বাঘিনী, না বাঘ বাঘিনী এবং বাচ্চা—পুরো পরিবার এক সংগে? ছোটটা যদি বাচ্চা হয়, তবে বাঘেদের স্বাভাবিক মিলনের সময়ের মে মাস এবং নভেম্বর। পরও বাঘের সংগে বাঘিনীর থাকার কথা নয়। তার উপর বাচ্চা যত বড় হয়েছে, তাতে বাঘের পক্ষে তাকে সহ্য করাও উচিত নয়। এও হতে পারে যে বাঘ এক রড-হার্টেড জেন্টেল-ম্যান এবং বাঘিনী সে ভদ্রলোকের নিতান্ত অনাত্মীয়া। সে যাই হোক। নাজিম সাহেব বললেন, এ রাস্তা পার হবার জায়গাতে কাল আমরা বসব। দেখা যাক একটা সুযোগ নিয়ে। পণ্ডিতজীকে বলে দিলেন নাজিম সাহেব, যে দু জায়গায় রাস্তা পার হবার চিহ্ন আছে সে দু জায়গায় দুটো ভাল মাচা বানিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে আর দুটো কাঁড়া (পুরুষ মোষ) বেঁধে দেবার বন্দোবস্ত করতে। মোষের টাকা দিতে চাইলাম। পণ্ডিত বললে, টাকা লাগবে না। বাঘে মোষ যদি মারে তবে দেবেন এখন টাকা। পণ্ডিতজীর কাছে বাঘের শেষ-বলি সেই মেয়েটার কথা শুনলাম। মেয়েটার বয়স হবে দশ এগারো। বহরনপুরে ঘরের মধ্যে মেয়ে বুড়ী মা আর ছোট ভাই শুয়ে ছিল। বাঘ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে, মা আর ভাইয়ের মধ্যে থেকে মেয়েটাকে তুলে নিয়ে যায়।

নিয়ে যাবার সময়, কেন জানি, মার মনে হঠাৎ কি ডেকেছিল, মা চোখ চাইতেই দেখে, চাঁদের আলোয় ভেজা পথটা ফুটফুট কচ্ছে আর একটা ঘোড়ার সমান উঁচু বাঘ মেয়েকে মুখে করে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া আগেকার আর তিনটি হতভাগ্য মানুষের

কথাও শোনা গেল পণ্ডিতজীর কাছ থেকে। দুটি লোককে ধরে তারা যখন বহরনপুর থেকে সেই পিটাস ঝোপে ঘেরা সুঁড়িপথে বাজারে যাচ্ছিল তখন। দুদিনই তাদের আগে পিছনে অনেক লোক ছিল। লোক-জন হৈ হল্লা, চেঁচামেচি করাতে তারপরই ছেড়ে পালায়। তারপরও আর একটি লোক যখন বাজার থেকে ফিরছিল সন্ধ্যের সময় তখন তাকে এ রাস্তাতেই ধরে প্রায় একশ লোকের সামনে। কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা প্রতিবারই সংগে সংগে সোরগোল তুলেছিল বলে বাঘ তাদের খেতে পারেনি। খেতে পেরেছিল কেবল সেই ছোট মেয়েটিকে। কারণ তাকে ধরেছিল রাতে, আর গাঁয়ের লোকের সাহসে কুলোয়নি সাক্ষাৎ যমের পিছনে তাড়া করতে।

সে রাতেও আমরা রাত এগারোটা অবধি গাড়ীতে চাঁদোয়ার রাস্তাটা এপাশ-ওপাশ করলাম পিঁজরাপোল থেকে চাঁদোয়া অবধি। এক জোড়া লুমরীর চোখ দেখলাম আর বাদামী রঙের যে পাখীগুলো রাত হলেই ঝিঁঝিঁদের ডাকের সংগে ডাক মিলিয়ে বুকে-হাতুড়ী-পেটা শব্দ করতে থাকে, হুপ হুপ করে তার ডাক শুনলাম। আর বাঘের কোনো গন্ধ পাওয়া গেল না।

গোটা তিনেকের সময় কফি-পর্ব সারছি আমরা, রওয়ানা হব-হব, এমন সময় সুব্রতর কালো গাড়ীখানা ইউকালিপটাস গাছের ছায়ায় দাঁড়াল এসে। আমার সংগে এবং বরুণবাবুদের সংগে সুব্রতর আলাপ করিয়ে দিল গোপাল। তারপর বাঘের ব্যাপার কফি গিলতে গিলতে আদ্যোপান্ত বললাম ওকে। ও ত নেচে উঠল শুনে; তবে, বলল, আজ আমাদের সংগে যেতে পারবে না কারণ আগে থেকেই ওর একটা বিশেষ জরুরী কাজ আছে রাতে। মোটরের এঞ্জিনটা যখন ধুকধুক করে উঠল, তখন সুব্রতর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম; মনে হলো, ও ভারী ভয় পেয়েছে, পাছে বাঘটা আমাদের হাতেই মারা পড়ে আজ? মুখে যদিও আমাদের সবাইকে ও বার বার শুভেচ্ছা জানাল। সীতাগড়া গিয়ে মনে মনে যা ভয় করেছিলাম, তাই হয়েছে দেখলাম। মাচাও বাঁধা নেই আর সেই গাছ দুটোর কাছাকাছি কাঁড়াও নেই। এদিকে প্রায় চারটে বাজে। যদিও সাতটার পরই সন্ধ্যে হচ্ছে এখানে। তাড়াতাড়ি চাঁদোয়া গ্রামে পোঁছলাম। গিয়ে শুনি পণ্ডিতজীর সারাদিন নাকি জরীপ বিভাগের কোন্ কর্মচারীর সংগে জমিজমার কাজেই কেটেছে—অতএব। কিন্তু আমাদের সেদিন জেদ চেপে গেছে। একটা সুযোগ নেবই। তাড়াতাড়িতে লোক জোগাড় করে গাড়ীতে ওদের পাঠালাম—যেখানে দুটো বাঘের পাঞ্জা দেখেছিলাম সেখানে। একটার বেশী মাচা করবার সময় কোথায়? আমগাছের ডালে

একটা ঘোড়ার সমান বাঘ মেয়েকে মুখে করে চলে যাচ্ছে

মাটি থেকে হাত দশেক উপরে মাচাটা বেঁধে দিল ওরা। যে কাঁড়াটা গ্রামের লোকেরা দিতে চাইল—সেটিকে দেখে মনে হলো মাচার তলা অবধি হেঁটে আসতেই তার প্রাণান্ত হবে—তাই বাঘের কোনো দুর্বলতা থাকবে না এ কখানা হাড়ের উপর। এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কাঁড়া জোগাড়ে সময় কাটালে ওদিকে মুস্কিল হবে। নাজিম সাহেব রেগে মেগে দুটো কাঁড়ার গলার ঘণ্টা আর লম্বা দড়ি জোগাড় করলেন অনেক-খানি। তারপর আমরা গিয়ে ছ'টা নাগাদ মাচায় বসলাম। রাস্তার ধারে। পেতলের ঘণ্টা দুটোকে গাছের ডাল থেকে দড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের দিকে মাচা থেকে হাত কুড়ি দূরে একটা পিটাসের ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হল। আমি, গোপাল, নাজিম সাহেব আর গ্রামের একজন লোক উঠে বসলাম মাচাতে। বরুণবাবুরা গাড়ী নিয়ে হাজারীবাগ চলে গেলেন, কথা হল রাত নটা নাগাদ ওঁরা ফিরে আসবেন আমাদের নিতে। কারণ নটার পরে দড়িতে ঘণ্টা বেঁধে বসে বসে মশার কামড় খাবার মানে হয় না কোনো। সত্যি কথা বলতে কি, নাজিম সাহেবের এই বিদ্ঘুটে পরিকল্পনায় মন থেকে কিছুতেই সাড়া দিতে পারছিলাম না।

আমরা আশা করেছিলাম, নটা অবধি চাঁদের সুযোগটা আমরা পাব। আমি বসলাম রাস্তার দিকে মুখ করে, রাস্তা আর সীতাগড়ার পাহাড়ের উল্টোদিকে নজর রেখে। গোপাল বসল পাহাড়ের দিকে মুখ করে বহরণপুরে আর চাঁদোয়ার দিকে এবং পাহাড়ের দিকেও চোখ রেখে। নাজিম সাহেবও পাহাড়ের দিকে মুখ করে পিঁজরা-পোলের দিকে নজর রেখে। আমরা সবাই জানতাম, বাঘের আশা এভাবে দুরাশা। এত দেরীতে মাচা বেঁধে এভাবে ঘণ্টা বেঁধে বসা। তাই যদি সুযোগ আসেই তবে তা মুহূর্তের। বাঘ হয়তো রাস্তা পার হবে কিংবা এক ঝোপ থেকে আর এক ঝোপে যাবে তখন। কিন্তু মানুষখেকো বাঘ, অই অসাবধানে গুলী করা চলবে না। পুরো-পুরি বিশ্বাস না থাকলে। তার মানে বাঘকে কায়দা মত এবং প্রয়োজনমত কাছে পাওয়া চাই। সেটা না ঘটবারই সম্ভাবনা বেশী।

দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এলো। পাথর আর গাছের ছায়াগুলো দীর্ঘতর হলো। এতক্ষণ পাহাড়ের মাথার উপরে চার-দিন আগেকার মারা গরুটার অবশিষ্টাংশের উপর যে শকুনগুলো উড়ছিল, সেগুলোও হঠাৎ ভোজবাজীর মত কোথায় যেন উবে গেল। রাস্তায় লোক চলাচল প্রায় এক ঘণ্টা হল বন্ধ। নাজিম সাহেব মিনিট পাঁচেক পরপর দড়িটা একটু একটু টান দিয়ে ঘণ্টা বাজাতে আরম্ভ করলেন—যেন কোনো কাঁড়া কি গরু, দল থেকে ছিটকে পড়ে এখনো একা একা চরে বেড়াচ্ছে। অন্ধকার হতে না হতে আমরা যে চাঁদের আশা করেছিলাম, তা বিনাশ করে, একদল কালো মেঘ সীতাগড় পাহাড়ের পেছন থেকে এসে সারা আকাশ ঢেকে ফেললে। তারারাও যতটুকু দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছিল, সেটুকুও বন্ধ হলো। এখন গাঢ় অন্ধকার। গাঢ় বললে ঠিক বলা হয় না। চার-দিক এমন অন্ধকার যে, তাকালে মনে হয়, অন্ধকারের একশ দুশ হাত এই নিওন—ফ্লুরোসেণ্ট অভ্যস্ত চোখদুটোকে থাবড়া মারছে। সংগে সংগে হৈ হৈ করে একটা হাওয়া ছাড়ল। হাওয়াটা রৈ রৈ করতে থাকল গাছে গাছে, পাতায় পাতায়, ঘাসে ঘাসে, তার মধ্যে অন্ধকারের চেয়েও নিস্তব্ধ বাঘের পদসঞ্চার ঠাহর করে কার সাধ্য। চোখ-দুটোকে চোখের পাতার আড়ালে লুকিয়ে রেখে, কান দুটো খুলে বসে আছি। পেছন থেকে পওতা গ্রামে ঝুমুর গানের আওয়াজ মাদলের সংগে ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক অপার্থিবতাকে মথিত করে অপ্রাকৃতিক ঘণ্টাটা বেজে উঠছে টুঙ টুঙ করে। রাত প্রায় আটটা নাগাদ গোপাল বলল ফিসফিসিয়ে, ঠিক মাচার নীচে
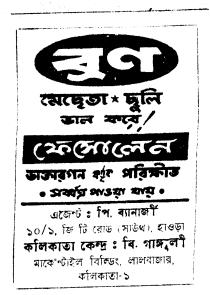
ডানদিক থেকে বাঁদিকে কি একটা ছায়ার মত, অন্ধকারের চেয়েও অন্ধকারতর কোনো জিনিস সরে যেতে দেখেছে ও, পলকের মধ্যে। বাঘ কিনা ও বলতে পারল না, কারণ সে-অন্ধকারে, অন্ধকারকেই দেখা যায় না।

তারপর নটা বাজল, দশটা বাজল, এগারোটা বাজল, কিছু শোনাও গেল না, দেখাও না। এদিকে গাড়ীরও পাত্তা নেই। ওরা রাস্তা হারিয়ে ফেলল কিনা কে জানে। গোপাল বুদ্ধি দিল—মাচা থেকে নেমে পিঁজরাপোলের দিকে এগোনো যাক। কিন্তু নাজিম সাহেব মানা করলেন, বললেন, 'ই বাঘ বহুত খতরনাগ হ্যায়'। তার উপর রাস্তার দুপাশে ঘন জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়, কাজেই এই অন্ধকারে ও পথে মাইল দুই হেঁটে যাওয়া আত্মঘাতী হবে। তার উপর আমরা না হয় ওদিকে গেলাম, গাঁয়ের লোকটি ত আর একা ফিরতে পারবে না। তাকে বাড়ী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমাদের। তাই গাড়ীর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আমরা টর্চ দিয়ে দেখতে লাগলাম এদিক ওদিক। হঠাৎ গোপাল আমার গায়ে হাত দিল, ওর টর্চের আলো অনুসরণ করে চোখে পড়ল, দুটি আগুনের মতো চোখ কিন্তু অনেক দূরে, প্রায় সীতাগড়া পাহাড়ের নীচেই—দেড়শ গজ হবে। ও জায়গাটাতে একটা বড় কালো পাথর আছে মাটির সমান্তরাল, উঁচু নিচু জায়গাটা। বেলা থাকতে দেখেছিলাম। পুরো চোখটা পাওয়া যাচ্ছে না। মানে গুঁড়ি মেরে বসে আছে আত্মগোপন করে, মাঝে মাঝে আগুনের মতো চোখদুটো মিটমিট করছে। ওখানে বসে কি কচ্ছে বাঘ? হয়তো ঘণ্টার রহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করছে। গোপাল হয়তো ঠিকই অনুমান করেছিল। বাঘ আমাদের মাচার নীচে এসে, গরু মোষ কিছু না দেখে, অবাক হয়ে বসে আছে ওখানে। কিংবা মোষ নিয়ে এবার হয়তো সে মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। আমাদের দেখে গেছে ভাল করে। সুযোগ খুঁজছে ওখান থেকে এবং অপেক্ষা করছে আমরা কখন গাছ থেকে নামি। এ অবস্থায় এবং জমি যেরকম উঁচু নিচু এবং জঙ্গলময় তাতে মাচা থেকে নেমে গিয়ে ভালভাবে দেখে মারার কথা বিবেচনারই নয়। কিন্তু মাচা থেকেও গুলী করা যাচ্ছে না। কারণ শরীরের কিছু তো দেখা যাচ্ছেই না, তার উপর চোখও পুরো পাওয়া যাচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে না মোটে, কি অবস্থায় আছে বাঘ। অথচ মাটিও ছাড়ছে না। মানুষখেকো না হয়ে, অন্য বাঘ হলে, আলো একবার চোখে পড়ার পর খুব সম্ভবত সেখানে থাকত না। জায়গা বদলাত নিশ্চয়ই, সরেও যেতে পারত। এর রকম দেখে মনে হচ্ছে, ভয়ডরের মাথা একেবারে খেয়ে বসে আছে। এ অবস্থায় মানুষখেকোর উপর অসাবধানে এবং আন্দাজে গুলী করা শিকারের আইন-বহির্ভূত। কি করব ভাবছি, ঠিক এমনি সময়ে জঙ্গলকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে গাঁক গাঁক করতে করতে গাড়ি এসে হাজির। আমরা নিঃশব্দে তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠলাম গিয়ে। নামবার সময় রীতিমত ভয়ই করছিল, কারণ গাছটার তিনদিকেই প্রায় হাত পনেরো ঝোপঝাড়।

গাড়ীতে চড়ে আমরা সোজা গেলাম চাঁদোয়া। ওখানে সোরগোল করা হলো না এ জন্যে যে, আমরা আশা করছিলাম, গাঁয়ের লোকটিকে নামিয়ে সংগে সংগে ফিরে এলে আমরা হয়তো ভদ্রলোককে রাস্তা পার হতেও দেখতে পারি। কিংবা রাস্তা বরাবর হাঁটতেও দেখতে পারি। সেই আশায় আমরা বার দুই রাস্তাটা এধার ওধার করলাম। কিন্তু তখন রাত প্রায় একটা বাজে। ক্ষিদেও পেয়েছে অসম্ভব। তাই পরের দিনের নতুন প্রোগ্রাম কি হবে না হবে আলোচনা করতে করতে আমরা হাজারীবাগ পৌঁছলাম প্রায় রাত দেড়টায়।

পরদিন অভাবনীয়ভাবে মিস্টার হাউস এলেন জীপ নিয়ে ভুরকুণ্ডা থেকে। কিন্তু মিস্টার হাউসের মাচান-শিকারে একেবারে ইচ্ছে নয়। কারণ ঐ নিষ্প্রাণ জড়ের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা, সে 'হঠযোগ' ওঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে টুটিলাওয়া থেকে ইজারুল হকও খবর পেয়ে এসে হাজির। ইজারুল হক, টুটিলাওয়ার শিকারী জমিদার। প্রসংগত বলা অন্যায় হবে না যে, ও ইতিপূর্বে অনেক বড় বাঘ মেরেছে। কাজেই আমাদের থেকে অভিজ্ঞতা ওর বেশী ছিল এ বাবদে। শিকারী অনেক হয়ে গেল দলে এবং সে কারণে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টর ভয়ও ছিল। সে যাই হোক, ঠিক হল, আমি, সুব্রত, গোপাল আর নাজিম সাহেব বসব মাচাতে নীচে মোষ বেঁধে, ইজারুল আর হাউস জীপে চক্কর মারবে পাহাড়টাকে। সেদিন বেশ বেলা থাকতেই উইলি হাউসের জীপে আমরা পৌঁছলাম সীতাগড়া। এ অঞ্চলের জঙ্গলে বেশীর ভাগই শাকুয়া, আসন, কেঁদ, পিয়ার, পাইসার, পাষন, গামহার, করম, মহুয়া ইত্যাদির গাছ। আর ছোট ঝোপ বলতে পিটাস কেলাউন্দা ইত্যাদি। সীতাগড়ের এলাকাতে জঙ্গল যে খুব একটা ঘন এমন নয়, তবে ঝোপঝাড় বেশী, সে কারণে পায়ে হেঁটে শিকার অপেক্ষাকৃত অসুবিধা। যাই হোক, আমরা ত মাচাতেই বসছি—সেই আগের মাচাতেই। ডাল একটা নধরকান্তি কাঁড়া, নীচে সেই পিটাস ঝোপের পাশে শক্ত খোঁটাতে বেঁধে আমরা পাঁচটার আগে মাচায় বসে পড়লাম। হাউস সাহেব হাজারীবাগ ফিরে গেলেন। সন্ধ্যের পর ফিরে এসে চক্কর মারতে শুরু করবেন।

চারদিকে ঝকঝকে রোদ্দুর। বৃষ্টিতে ধোওয়া জঙ্গলে জঙ্গলে সোনালী আলো

নরম ম্যাপেলের মতো গলে গলে পড়ছে। মাচায় সেভাবেই বসেছি, লালার জায়গায় আমরা লালা থাকতে যেভাবে বসেছিলাম, সুব্রত বসেছে। আমার দিকে সামনে কিছু-দূরে পওতা গ্রামের বাঁদিকে যে কিছুটা ফাঁকা জমি রোদ্দুরে সবুজ গালচের মতো চকচক করছে, সেই জমিটা দেখিয়েই পণ্ডিতজী বলেছিল সেদিন "ঈ টাঁড়োয়া টাঁড়োয়া সে বাঘোয়া যাতা- সুবা ওর সাম।" এদিকে তাকিয়ে বসে আছি, হঠাৎ সুব্রত গায়ে হাত ছোঁয়াল। সুব্রতর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকিয়ে দেখি, এক কালো-কোলো ভদ্রমহিলা, মোটা-সোটা দুটি বাচ্চা নিয়ে সীতাগড়ার নীচ-বরাবর চলেছেন চাঁদোয়ার দিকে। নাজিম সাহেবও দেখে-ছিলেন ভাল্লুকগুলোকে। কিন্তু সেদিন আমরা ভাল্লুক সম্বন্ধে মোটেই উৎসুক ছিলাম না। তাই চুপ করে দেখতে লাগলাম। বাচ্চা দুটো মাঝে মাঝে কালো কুমড়োর মতো ডিগবাজী খেয়ে নিচ্ছে আবার উঠে চলছে মার পাশে পাশে। দেখতে দেখতে ওরা অদৃশ্য হয় গেল।

সন্ধ্যে সবে হয়েছে। একটা বিদঘুটে প্যাঁচা দুরগুম দুরগুম শব্দ করে পাশের গাছ থেকে সোজা পিঁজরাপোলের দিকে উড়ে গেল। কাঁড়ার মাথা নাড়ানতে গলার ঘণ্টা বাজতে থাকল টুঙ টুঙ করে। সেদিন আকাশ মেঘলা ছিল না। তাই নীচে মোষটাকে গাছের ছায়ার আলো-আঁধারিতে একটা অন্ধকারের ঢিপির মতো মনে হচ্ছিল। অন্ধকার হবার পর বোধ হয় পনেরো মিনিটও হয়নি, হঠাৎ 'আঁক, আঁ-আরর' এরকম একটা শব্দ শুনলাম। তারপরই ধপ করে একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ। নাজিম সাহেব সঙ্গে সঙ্গে কেন যে টর্চ জ্বাললেন বুঝলাম না, উনি বোধহয় ভেবে-ছিলেন, বাঘটা কাঁড়াটাকে মেরেই সরে যাবে —যেমন ইদানীং করছে। টর্চটা ফেলতেই দেখলাম, মোষটা চার পা উপরে তুলে মাটিতে লুটোচ্ছে- ঘাড়ের কাছে সবে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে—প্রাণ বেরিয়ে গেছে, কিন্তু পেশীগুলো তখনো নড়ছে। আর বাঘটা মাচার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোণাকুণি, মোষটার মাথার কাছে। বাঘ তো নয়, মনে হল, একটা উট বসে আছে। কিন্তু সে এক মুহূর্ত। তারপরেই বাঘটা এক লাফে আলোর এক্তিয়ার থেকে বেরিয়ে গেল। গুলীটা করা উচিত ছিল সুব্রতর। কিন্তু আমরা সবাই এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, চোখের পলকে কি হয়ে গেল, টেরও পেলাম না। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাজিম সাহেব আলো ফেললেন এদিক ওদিক। ফেলতেই মোটে পঁচিশ গজ দূরে একটা পিটাসের ঝোপের আড়ালে বাঘের গায়ের মোটা মোটা ডোরাগুলো দেখা গেল। সুব্রত কিন্তু ভাল করে দেখতে পাচ্ছিল না—সামনে

সবশেষে ঐ 'জেণ্টলম্যানে'র মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বের হলো

একটা ডাল পড়েছিল এমনভাবে—ভাল করে দেখবার জন্যে ও উঁচু হতেই মাচাটার নীচের কাঠগুলো সরে গেল, আর ও পড়তে পড়তে একটুর জন্যে বেঁচে গেল, কিন্তু ঐ নড়া-চড়াতে আমার পাঁচ ব্যাটারীর টর্চটা ঠাস করে নীচে পড়ে গেল। এদিকে সুব্রত নিচু হবার সময় তাড়াতাড়িতে বসে পড়ল নাজিম সাহেবের বন্দুকের উপর। তারপর নট নড়ন-চড়ন, নট-কিচ্ছু। এদিকে তখনো কিন্তু বাঘের শরীরের সেই ডোরাকাটা অংশটা দেখা যাচ্ছে। অনুমান করলাম, ওটা বাঘের বুকই হবে। আমার জায়গা থেকে বাঘকে মারা যায় না—কারণ সামনে সুব্রত আর নাজিম সাহেব। নাজিম সাহেব মারতে পারছেন না—বন্দুক সুব্রতর নীচে। নাজিম সাহেব প্রায় জোর করেই গোপালের হাত ধরে টানলেন—অত্যন্ত অসুবিধাতে সেই ভাঙা মাচায় ঘুরে বসে গোপাল গুলী করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হল। বুঁইই করে গুলীটা হাওয়া কেটে রওয়ানা হয়েছে সীতাগড়া পাহাড়ের দিকে, বাঘের কেশাগ্র স্পর্শ না করে। সে দুঃখ আর আমাদের রাখবার জায়গা ছিল না। সমস্ত ভণ্ডুল করল ঐ মাচাটা। পরে জানতে পারি ওরকম হবার কি কারণ। মাঝে আমরা যে আসিনি কদিন, সে সময়ে গ্রামের লোকেরা কষ্ট করে কাঠ না কেটে মাচা থেকে আরামে 'লকড়ি' করবে বলে কখানা কাঠ খুলে নিয়ে চলে গেছে। আমরা বসেছিলাম ডানলোপিলো পেতে, তাই ফাঁক আছে কি নেই নীচে ভাল করে লক্ষ্য করিনি। সেটা খুব অন্যায় হয়েছে। বাঘ তো মারা গেলই না; তার উপর সুব্রত যদি নীচে পড়ত, তবে কি একটা ভীষণ দুর্ঘটনা যে হত, তা ভাবতেই পারছিলাম না আমরা। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে সে রাতে হাজারীবাগ ফিরলাম। এমন সুযোগ আর আসবে না। গোপালের নিশানাও ঠিকই নেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঘের ঘাড়ের ঠিক উপরে গোপালের বন্দুকের নল বরাবর একটা তিন-চার ইঞ্চি ব্যাসের ডালে বুলেটটা লেগে যাওয়াতে, বাঘের গায়ে লাগেনি গুলী। অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকার পর হঠাৎ আলোতে এরকম সামান্য ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বেচারা কাঁড়া। প্রাণ দিল, কিন্তু কোন উপকারে লাগল না। মোষটার জন্যে নিজেদের ভারী অপরাধী মনে হতে লাগল। মিস্টার হাউস রাতে বৃথা ঘোরাঘুরি করে সে রাতেই আবার ফিরে গেলেন ভুরকুণ্ডা। পরদিন সকলেই আবার আমরা গেলাম। গিয়ে দেখি মোষটা যেমন ছিল, তেমনি আছে, বাঘ ছোঁয়নি এক ফোঁটা। ঐ পিটাস ঝোপের পাশ থেকে বাঘ কোনদিকে গেছে, তার হদিস পাওয়া গেল না। কারণ হাজারীবাগের পাথুরে মাটিতে দু একদিনের মধ্যে বৃষ্টি না হলে পাঞ্জার কোনো হদিশ মেলা মুস্কিল। বাঘটা যে একেবারে বেপরোয়া, সেটা আমরা একবাক্যে স্বীকার করলাম। আজ ভোর পাঁচটায় বহরনগপুরের এক গোয়ালা যখন তার দুধের বালতি নিয়ে চাঁদোয়ার দিকে আসছিল, তখন হঠাৎ বরাতক্রমে রাস্তার মোড়ের পিটাস ঝোপের আড়ালে কি একটা লাল মত নড়াচড়া করতে দেখে। দেখেই সে দুধের বালতি ফেলে দিয়ে উল্টোমুখে দৌড়য়। বালতি পড়ার শব্দে বাঘ হয়তো একটু ভড়কে গিয়েছিল—নইলে আজকের সকালই লোকটার শেষ সকাল হতো। মাচাটাকে ঠিক ঠাক করা হলো সকালে, কারণ মাচাটা বাদ না সাধলে সুব্রতই নির্বিঘ্নে গুলীটা করতে পারত কাল। তারপর মোষটাকে ভাল করে পাতাটাতা চাপা দিয়ে হাজারীবাগ ফিরে এলাম।

সেদিন সন্ধ্যের অনেক আগে আমরা গিয়ে বসলাম। কিন্তু সারা রাত কাটলো মশার কামড়, আর বৃষ্টিতে। বাঘের কোনো পাত্তাই

পেলাম না। তার পরদিনও, আমরা পুরোনো মাচাটা থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা নতুন মাচা বেঁধে, নতুন মোষ নিয়ে পর পর বসলাম তিনদিন, কিন্তু আশ্চর্য, বাঘের কোনো সাড়াশব্দও পেলাম না।

তারপরও দু তিন রাত আমরা পাহাড়ের আরো কোল ঘেঁষে চাঁদোয়ার কাছাকাছি, বাঘের চলাচলের পথ খুঁজে তার কাছে মাচা করে বসেছিলাম, কাঁড়া বেধে। হয়রানিই সার হলো। লাভ হলো না কিছু।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, যে প্রায় প্রতি রাতেই আমরা মাচা থেকে একটি দুটি করে ভালুক দেখতে পেতাম। তাতে মনে হলো সীতাগড়া পাহাড়ে কম করে তিন চার জোড়া ভালুক আছেই।

ইতিমধ্যে একদিন বিকেলে কোলকাতা থেকে টেলিগ্রাম পেলাম—মার অসুখ। গোপালেরও অনেকদিন হল। তাই আমাকে গোপালকে সমস্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাজারীবাগ ছেড়ে যেতে হলো তার পরদিন ভোরে। মার অসুখের উদ্বেগ আর সীতাগড়ের মানুষখেকো এই দুইয়ে মাথাটা দপ দপ করতে লাগল সারা রাস্তা আসবার সময়।

তার একদিন পর আমরা যেদিন রওয়ানা হয়ে এলাম অর্থাৎ পনেরো তারিখেই বেলা দেড়টা নাগাদ সীতাগড়ের পণ্ডিতজীর লোক এসে সুব্রতকে খবর দিল বাঘ আবার মোষ মেরেছে। তাড়াতাড়িতে জীপ জোগাড় করে ইজারুলকে নিয়ে সুব্রত রওয়ানা হলো সীতাগড়ার দিকে। চোদ্দ তারিখে সুব্রত কি করা যায় না যায় ভেবেছে, কিন্তু বৃষ্টির জন্যে যেতে পারেনি সীতাগড়া।

ওরা ওখানে পৌছতে পৌছতে চারটে হল। পৌছে দেখে, মাঁড় তুলে গাঁয়ের লোকরা মুচিকে চামড়া বিক্রী করে দিয়েছে। ওদের মনের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। তবু সুব্রত দমবার পাত্র মোটেই নয়। বহরনপুরের দিকে, গাঁয়ের লোকদের কথামত বাঘের চলাচলের রাস্তায় একটা মাচা বেঁধে লোক পাঠাল গাঁয়ে একটা মোষ আনতে ভাল দেখে। তখন গাঁয়ের লোকের যা অবস্থা, ওরা চাইলে সারা গাঁয়ের মোষ বেঁধে দেয়। কারণ স্নায়ুযুদ্ধে ওরা একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে। কিন্তু আশ্চর্য। একটু পরেই জীপটা প্রায় গাঁ শুদ্ধু লোক নিয়ে হাজির। সবাই রীতিমত উত্তেজিত। সুব্রত ভাবলো এবার বোধ হয় কোনো মানুষই কবলিত হলো আবার। কিন্তু শুনলো বাঘ একটু আগেই একটা নতুন-কেনা তিনশ টাকা দামের মোষ মেরেছে—আর বাঘটা নাকি কাছাকাছিই আছে। তক্ষুনি নিজে স্টীয়ারিং নিল সুব্রত। আধ ঘন্টার মধ্যে পৌছে গেল জায়গাতে। তারপর জীপ ছেড়ে হাঁটতে সুরু করল। চাঁদোয়া গ্রাম আর পওতা গ্রামের মধ্যে একটা ক্ষীণ নদী—একেবারে শুদ্ধু শালবনের মধ্যে। চারাদিকে খালি শালগাছ। সেই নদীর মধ্যে মধ্যে মোষটাকে মারার পর, প্রায় আধ মাইল টেনে নিয়ে গেছে বাঘ মোষটাকে। যেখানে মোষটাকে রেখেছে, তার কাছাকাছি বসবার মত কোনো ভাল গাছই নেই। একেই ত কাঁচ শালগাছে মাচা বানানো ভারী অসুবিধা। তাই মোষটাকে কিছুটা ডানদিকে নদীর কোল বরাবর টেনে আনাল ওরা একটু ফাঁকা জায়গায়—কারণ যেখানে ছিল, সেখানে নদীর কোলে বড় বড় পাথর—। তারপর কাছেই একটা গাছে তাড়াতাড়ি মাচা বাঁধালো সুব্রত। মোষটার ঘাড়ের কাছ থেকে সের পাঁচেক মাংস খেয়েছে বাঘটা। নদীর পাড়টা দশ ফুট উঁচু দু পাশে, বাঁদিকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে নদীতে বেশ জল আছে। নদীর পাশের নরম মাটিতে বাঘের পালানোর চিহ্নও দেখল—পালিয়েছে ডানদিকে। যাই হোক, লোকজন সবাইকে ফেরৎ পাঠিয়ে ঠিক হয়ে মাচায় বসতে বসতে সুব্রত আর ইজারুলের প্রায় ৬টা বেজে গেল। সঙ্গে থাকল গ্রামের এক বুড়ো আলো দেখাবার জন্যে। বুড়ো বহরনপুরের লোক. নাম চওথা। কারণ স্বাভাবিকই এবার ওরা ঠিক করেছিল আর সুযোগ নষ্ট করা চলবে না। সুব্রতর হাতে ·৪০৫ উইনচেস্টার, বাঘের পক্ষে যোগ্য হাতিয়ার এবং হাত এবং হাতিয়ারের উপর বিশ্বাসও ওর ছিল। ইজারুলের হাতে ·৩৭৫ ম্যানলিকার স্কুনার। কাজেই বাঘ যদি চেহারাটা ভাল করে একবার দেখায়, তবে আজ একটা হেস্ত-নেস্ত হয়ে যাবে, মনে মনে ভাবল সুব্রত।

মাচায় বসার একটু পরেই আকাশটা মেঘলা করে এলো। বৃষ্টিও পড়ল বড় বড় ফোঁটায় বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু আবার দেখতে দেখতে দমকা হাওয়া এসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল। পিটাস ঝোপের উগ্র গন্ধ, কাঁচ শালপাতার গন্ধ আর সোঁদা মাটির গন্ধ বৃষ্টিশেষের হাওয়ায় মিশে কেমন আমেজ লাগায়। সাতটা বাজে প্রায়, সন্ধ্যে হবো হবো। ঝিঁঝিঁগুলো ডাকতে আরম্ভ করেছে একটানা। পওতা গ্রাম থেকে শেষ-সাঁঝের মোরগ ডেকে ডেকে থেমে গেছে। ইজারুল বাঁয়ে দেখছে, সুব্রত ডাইনে। হঠাৎ সুব্রতর চোখে পড়ল ডানদিকে মাচা থেকে তিরিশ গজ দূরে, বাঘ যে পথে পালিয়েছিল সেদিকে, ঝোপের আড়ালে একটা প্রকাণ্ড বড় হলদে-রঙা দাড়িওয়ালা রামছাগল এদিক ওদিক দেখছে। মুহূর্তের জন্যে সুব্রতর হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে গেল। এই সেই সীতাগড়ার কুখ্যাত মানুষখেকো ? যে বহরনপুরের সেই কাঁচ মেয়েটিকে মার কোল থেকে নিয়ে গেছে, যে নিষ্ঠুরের মতো এতদিন এবেলা ওবেলা নিরীহ গরু মোষ মেরেছে, সেই বাঘ। সুব্রত নিঃশব্দে যেই আঙুল ছুঁইয়েছে ইজারুলের গায়ে, অমনি বাঘটা

মুখ তুলে সুব্রতর মুখে তাকাল। আর সংগে সংগে নিশানা নিল সুব্রত। ওর ভারী ভয় হয়েছিল সেদিনকার মতো যদি পালিয়ে যায়? তাই ভাল করে নিশানা না নিয়েই ও ট্রিগার টিপে দিল। ভারী রাইফেলের বজ্র-নির্ঘোষের সংগে সংগে বাঘটা পিছন ফিরে যে পথে এসেছিল, সে পথে রওয়ানা হয়ে গেল ও কিংবা ইজারুল আর গুলী করার আগেই। বাঘটা কিন্তু কোনো শব্দই করল না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর মুহূর্ত, জীবনে এরকম মুহূর্ত বেশী আসে না। গুলী কি লাগেনি তবে? মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সুব্রতর। প্রায় সংগেই সংগেই দু তিন সেকেণ্ডের মধ্যে দুবার ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ করল বাঘটা, ইংরিজীতে যাকে বলে কাফিং সাউণ্ড আর প্রায় সংগে সংগে মাচা থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে নদীর কোলে এক বিরাট গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল বাঘটা। তারপর দৌড়ে এসে বাঘটা লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল মাচার দিকে ওদের ধরবার জন্যে। এক একবারে প্রায় দশ ফুট। কিন্তু ঐ পাহাড় বন এবং বুক কাঁপানো গর্জনে সুব্রত আর ইজারুলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। খুনে পেয়েছিল ওদের। সেই শূন্যে লম্ফমান অবস্থায় বাঘটাকে ওরা পর পর গুলী করে চলল যতক্ষণ না গর্জন থামে। আসল বাহাদুরী হচ্ছে সুব্রতর প্রথম গুলীটার—·৪০৫এর গুলী ঠিক লেগেছিল বুকের বাঁ দিকে।

অতগুলো গুলীর শব্দ আর বাঘের গর্জন শুনে বহরনপুর, পওতা, চাঁদোয়া আর সীতাগড় এই চার গ্রামের লোকেরা পিল পিল করে ছুটে এলো। কিন্তু আশ্চর্য বাঘ পাওয়া গেল না। বাঘটা পালাবার চেষ্টায় শেষ দৌড় লাগিয়েছিল নদীর রেখা ধরে। সুব্রত আর ইজারুল দেখেছিল, জলে গিয়ে পড়তে। রাতে খোঁজাখুঁজি করাটা, বিশেষ করে এতগুলো লোক জমার পর বুদ্ধিমানের কাজ হবে না বলে ওরা বিবেচনা করল।

হাজারীবাগে রাতটা প্রায় বসেই কাটিয়ে ভোর চারটের সময় লোকজন ও রাইফেল নিয়ে ওরা জায়গায় পৌঁছল। মানুষখেকোটা নদীতেই পড়েছিল।

চামড়া ছাড়াবার সময় দেখা গেল, বাঘটার সামনের ডান পায়ে, কপালে ও ল্যাজে এল জির দাগ ছিল পুরোনো। সেটাও ওর মানুষ-খেকো হবার একটা কারণ। তাছাড়া খুব বুড়োও হয়ে গেছিল বাঘটা। লম্বায় দশ ফুট ছিল (লেজ বাদে) যা সচরাচর দেখা যায় না।

সুব্রত বাঘ মারার সংগে সংগে টেলিগ্রাম করল কোলকাতায়। আমি আর গোপাল ওকে অভিনন্দন জানালাম। যারা জানেন, তাঁরা বুঝবেন এ অভিনন্দন পরীক্ষা পাশের অভিনন্দন থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। শিকারে বরাত অনেকখানি। সুব্রতর বরাতেই ছিল বরমাল্য আর ইজারুলেরও, কিন্তু তা বলে শুধু—বরাতই নয়। কারণ শিকারে বরাত থাকলেও শিকার জুয়াখেলা নয়। এখানে বরাত অর্জন করতে হয়। বিশে জুলাই খবরের কাগজে মানুষখেকো মারার খবর বেরুলো সুব্রত আর ইজারুলের ছবি সমেত।

কি আনন্দ যে হলো, সে আমরাই জানি, কিন্তু মনে মনে একটু হিংসাও যে হলো না, সে কথা বললে মিথ্যা বলা হয়।
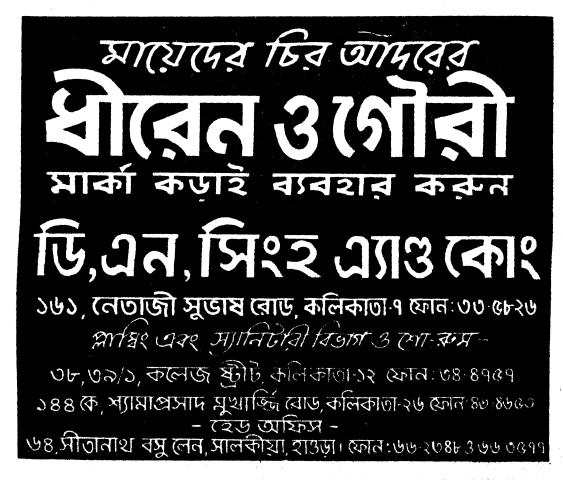
ছুরির আড়াই পোঁচে জবাই হয় মুরগী, শাড়ির আড়াই প্যাঁচে পুরুষ। শাড়ি যত প্যাঁচালো, তত রহস্যময়। যত রহস্যময়, তত প্রাণঘাতী।

মন হরণের যত অস্ত্র আছে মেয়েদের, সব-চেয়ে ধারালো ওই শাড়ি। বাঁকা ভুরুর টংকারও ঘোরানো-সিঁড়ি শাড়ির কাছে ভোঁতা। এমনিতে সামান্য কাপড়ের টুকরো, কিন্তু অঙ্গে অঙ্গে বাঁশি বাজানোমাত্র অন্য জিনিস। ঝাঁপির আড়াল থেকে বেরিয়ে সে আঁচলের ফণা তোলে, চোখের সীমায় ফোঁস করে, নেশার বিষে পাগল করায়। আবার যদি অঞ্চলেতে বেঁধে রাখার শপথ কখনও নেয়, কোন্ পুরুষের সাধ্য আছে ফাঁস খোলে। শাড়ির কাছাকাছি তৎক্ষণাৎ সে ডুবতেও রাজী।

পুরুষের মন শাড়ি কীভাবে হরণ করে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আমাদের কাব্যে। বিশেষ করে রমণীটি যদি নীলবসনা সুন্দরী হন, তাহলে তো কথাই নেই, দেড় গজী প্রশস্তি চলবে পাতার পর পাতা। কী সংস্কৃত, কী বাংলা—দুটোতেই তার জয়জয়কার।

শাড়ির মধ্যে আবার কবিদের নেকনজর আঁচলে। তা' সে সুতীরই হোক, আর বাকলেরই হোক। সেকালের রমণী চেলাঞ্চলে ঢেউ তুলে বেচারা পুরুষদের কীভাবে হতচেতন করতেন, তার দৃষ্টান্ত গণ্ডায় গণ্ডায়। কালিদাসের নাটকে কুরুবকের ডালে বাকল আঁচল জড়িয়ে যাওয়ার ছলে শকুন্তলার দুষ্মন্ত-দর্শনের দৃশ্য, কিংবা কণ্বমুনির আশ্রম থেকে বিদায় নেবার কালে হরিণশিশুর শকুন্তলার আঁচল টানার চিত্র নয়নাভিরাম তো বটেই, আর দশটার সঙ্গে তুলনা করলে লাখে না মিলয়ে এক। বৈষ্ণব-কাব্যের শ্রীরাধাও তিমিরাভিসারে বেরোন আঁচলের আড়ালে প্রদীপ ঢেকে। একালে আমাদের রবীন্দ্রনাথও কম যান না। বুকের খসা গন্ধ-আঁচল তাঁর অনেক কবিতা-গানে পাতা আর, কে না জানে, এই আঁচল হচ্ছে শাড়িরই সারাৎসার।

আসল কথা, রূপ লাগি যদি কারও আঁখি ঝুরে, তবে তা' শাড়ির জন্যে। পূর্ব-রাগের আগে গৌরচন্দ্রিকাও গায় শাড়ি। কেননা, পহেলা দর্শনধারী, দোসরা গুণ-বিচারি। সব ঢেকেঢুকেও একখানা শাড়ি দেহরেখা এমন আহা মরি ফুটিয়ে তোলে, 'কিছু তার বুঝি না বা, কিছু পাই অনুমানে।' এবং এই অনুমান-ভরসাহি—কেবলম যুগে যুগে রচা হয়েছে সেরা সেরা রোমাণ্টিক কবিতা। যমুনা-পুলিনে গোপীদের নিয়ে কৌতুক না হয় চলে, কবিতা বানাতে হলে চাই সেই বিনোদিনী রাধা—যে 'নীলবসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা।' দুঃশাসন বেরসিক, সে দ্রৌপদীর শাড়ি খুলতে চেয়েছিল।

মেয়েদের মন ভোলাতেও আবার শাড়ি নির্দোসর। হাজার মিষ্ট কথায় যে-পাষাণ নড়ে না, মনের মত একখানা শাড়ি পেলে শুধু নড়া নয়, সে পাষাণ গলে। গ্রাম্য রাখাল বালকও নোলক-পরা প্রেয়সীর মন জোগাতে বলে—'আইন্যা দিমু, তোমায় আমি বাবুরহাটের শাড়ি।' সে জেনেছে, ছলা-কলায় ভবী ভুলবে না, মন দেয়ানেয়ার প্রথম পাঠ আদতে শাড়ির দোকানে।

শহুরে মেয়েরা এ ব্যাপারে আর এক কাঠি বাড়া। বাবুরহাটের শাড়িতে না হোক, কাঞ্জিভোরম, বেনারসীর অসাধ্য কিছু নেই। দাম্পত্য-কলহের নিষ্পত্তিতেও দামী এক-খানা শাড়ি যথেষ্ট। জীবন-রসিক জানেন, সুখ ও শাড়ি এক সুতোতেই গাঁথা।

তবে হাঁ, শাড়ির গুণাগুণ তার পরার ধরনে। শাড়ি, তুমি কেমন, যার অঙ্গে যেমন। মালকোচা মারা মারাঠীনী যদি হাঁটুর সমান কাপড় তুলে নথ নাড়ায়, মনে হবে খাণ্ডারনী। গাছ-কোমরে শাড়ি পরে সদর রাস্তায় যদি চীৎকার পাড়েন পাদি-পিসি, কাবা নির্ঘাৎ পালাবে। কিন্তু রেশমী শাড়ির পাড় যদি ঢেউ তোলে কোন অষ্টাদশীর পায়ে, চোখ দাঁড়াবে থমকে।

আবার তুলসীতলায় অবনতা বর্ষীয়সীর লালপেড়ে শাড়ি সম্ভ্রম ডেকে আনবে আপনি।

নারীসুলভ কমনীয়তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এই শাড়িই হচ্ছে অদ্বিতীয়া। লাবণ্য আর ব্রীড়া খোলতাই করতে সে ওস্তাদ। তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনার দেহ ঘিরে যে-বস্ত্রখণ্ড পৃষ্ঠদেশে উত্তাল, তার তুলনা কোথায়?

নামের বাহারও তার তেমনি। মেঘডম্বর, জলডুরির, নীলাম্বরী, বালুচরী। শাড়ির নামেই বিখ্যাত ধনেখালি, শান্তিপুর, টাঙ্গাইল, কাঞ্জিপুরম্। বেনারসী, মুর্শিদাবাদী বলতেও বোঝায় ওই শাড়ি।

বাহার যেমন নামে, তেমনি পরার ধরনে। ধরন আবার রকম রকম। রাজস্থানী আর মহীশূরীর পরার ধরনে যত তফাৎ, ততই তফাৎ ভোজপুরিয়া দেহাতিনী আর বঙ্গ-ললনার মধ্যে। গুজরাটের পাটোলা, রাজস্থানের বাঁধনি, শান্তিনিকেতনের বাটিক স্থানে কালে পাত্রীভেদে ধরনধারণ পাল্টায়।

শাড়িকে তাই ভাগ করা যায় অঞ্চল অঞ্চল ভিত্তিতে। যেমন (১) মধ্য ও পশ্চিম ভারতী গ্রুপ: চল সুতী, রেশম, রেয়ন, নাইলন। ডিজাইন, প্যাটার্ন বহুরঙ্গী। পাড় চওড়া। (২) রাজস্থান ও সৌরাষ্ট্র গ্রুপ: মুখ্য শাড়ি বাঁধনি এবং চান্দেরি। বাঞ্জরা, ভীল, কাথিওয়াড়ী, রাজস্থানীরাই পরে বেশী। পাড় সাধারণত রঙীন। জমিতে ডিজাইন ফুলের। আঁচলে ডোরা গোটা তিনেক। (৩) দাক্ষিণাত্য গ্রুপ: মোটামুটি মধ্যভারতী ধরন। তফাৎ শুধু ডিজাইনে। রঙ গাঢ়। পাড় চওড়া। আঁচল চওড়া। তৈরী হয় ধারওয়ার, বিজাপুর, বেলগাঁওয়ে। (৪) দক্ষিণ ভারতী গ্রুপ: তাঁতের শাড়িই প্রধান। সবুজ, নীল, লাল রঙেরই প্রাধান্য। কোয়েম্বাটোর, সালেম, মাদুরাই, মাঙ্গালোর, কাঞ্জিপুরম্ প্রধান কেন্দ্র। (৫) বেংকটগিরি ও ত্রিবাংকুর গ্রুপ: জমিতে ফুল, লতাপাতা, পাখির ডিজাইন। পাড়ে জরি। (৬) উত্তর-পূর্ব ভারত ও বঙ্গীয় গ্রুপ: জমি সাধারণত সাদা। দু' থেকে চার ইঞ্চি চওড়া পাড়। আঁচলে কাজ হরেক রকম। বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, শান্তিপুর, ধনেখালি, কটক—শাড়ি তৈরীর আড্ডা।

এতো গেল অঞ্চলের হিসেব, শাড়ির নামও অজস্র। বেনারসী, খাম্বাবতী, বালুচরী, নীলাম্বরী, ইন্দোরী, মাহেশ্বরী, উপ্পাড়া, কাতান, করগ্নী, পাটোলা, পৈথান, মহীশূরী, আরনি, কাল্লাগাল, ধর্মভরম, বাঙ্গালোরী, ইরকাল। ইক্কাৎ, শাহাপুরী ইত্যাদি ইত্যাদি। আওরঙ্গাবাদে বিখ্যাত হিমরু, কাশ্মীরের নাম রেশমে। আর বাংলাদেশের মসলিন?—'বোগদাদ রোম চীন, কাঞ্চনতৌলে কিনতেন একদিন।'

শাড়ি পরার ধরন আবার মোটামুটি তিনরকম। কোথাও নীবি স্টাইল,—শাড়ি পাঁচ থেকে ছ' গজ লম্বা, আড়াই পাঁচী ঘুরপাকের পর আঁচল পেছনে। কোথাও আদিকালের 'সাকাচা' স্টাইল—শাড়ি লম্বায় ন' গজ। বহর বাহান্ন ইঞ্চি। পরার সময় মালকোঁচা। কোথাও আবার শাড়ি গৌন, ঘাগরা চোলি ওড়নি দিয়েই অন্য ধরন: এক খণ্ডে আদিবাসীর পরার ধরন অবশ্য আলাদা। তবে গরিষ্ঠসাধারণ গুণিতক যদি ধরি, হাল বাংলার চলতি রীতিই আদর্শ' শাড়ি-সায়া-ব্লাউজ—অন্তর্বাসে এই রাজ্যের ধরনধারণ মোটামুটি সারা ভারতে চালু।

তারপরেই কিন্তু প্রশ্ন, আজ-চলতি বাংলা রীতির কবে শুরু? কেমন করে তার বিবর্তন?

এ প্রশ্নের জবাব নিতে মুখ ফেরাতে হয় আশী বছর আগে। 'বঙ্গলক্ষ্মী' প্যাটার্নে শুধু লালপেড়ে সুতীর শাড়ি—দেশী ধরনে

সনাতন। হঠাৎ একদিন মোড় ফেরাল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। আর দশটা অবাক কাণ্ডের মত শাড়ি পরায় এই বাড়িই আনল নতুন রীতি।

গত শতকের শেষার্ধে সত্যেন ঠাকুর মশায়ের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী গেলেন বোম্বাই। দেখে এলেন পার্শী পরিবারের 'পাহেরওয়া' স্টাইল। ঠিক করলেন, এটা চালাতে হবে। বাংলা দেশের অন্তঃপুরে। শুধু আঁচলটি বাংলাই দস্তুরমাফিক টেনে আনলেন ডান কাঁধ থেকে বাঁয়ে। সঙ্গে রাখলেন জামার ব্যবস্থা। নাম হল তার 'বোম্বাই-দস্তুর।'

তার সঙ্গে পরে মিশল 'ব্রাহ্ম-দস্তুর'। শাড়ির সঙ্গে টুপি। এই দস্তুরে পাড়টি শুধু কাঁধের ওপর উঠত, বাকি অংশ ঝুলত হাতে। বছর দশেক পর সেই ঝোলানো অংশ হাতে কুঁচিয়ে তুলে সবশুদ্ধ এক লম্বা ব্রোচ দিয়ে আটকে দেওয়া হল কাঁধে। শোনা যায়, আশুতোষ চৌধুরী এই রীতির উদ্ভাবক। তাঁর স্ত্রী প্রতিভা দেবী, ঠাকুরবাড়ির মেয়ে অন্তত তাই পরতেন। সে সময় আবার স্পেনের লেস 'ম্যান্টিলা'র নকলে ছোট ত্রিকোণ চাদর থাকত মাথায়। প্রথম লাগান কোচবিহারের মহারানী সুনীতি দেবী।

বিশ শতকের গোড়ায় লাগল স্বদেশী হাওয়া। তখন থেকেই প্রথম সুতীর শাড়ি পরে বাইরে যাওয়ার চল। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীই এক চায়ের নেমন্তন্নে শান্তিপুরী সুতী পরে পথ দেখান।

ময়ূরভঞ্জের মহারানী সুচারু দেবী এক চায়ের আসরে নতুন কায়দায় শাড়ি পরে আসেন। শাড়ির সামনে কোঁচা দিয়ে এক-ফেরা পেছনদিক থেকে ঘুরিয়ে এনে বাঁ কাঁধে তিনি ফেলেন আঁচল। সেই আঁচলের খুঁটটা আবার ঝুলতে থাকে পিঠে।

তারপরে বছর যায়, ফ্যাশন পাল্টায়। একদিকে চলল মেমিয়ানা—হাইহিল, হোবল্-স্কার্ট। অন্যদিকে স্বদেশীয়ানা—তাঁতে বোনা সুতী, হাতে বোনা খদ্দর। সঙ্গে সঙ্গে ব্লাউজের ছাঁটেও বিবর্তন। লম্বা হাত ছোট হয়ে হয়ে ১৯৩০ সালের পর থেকে হাতকাটা। এবং এই সময় থেকেই কাঁধের ব্রোচ বেপাত্তা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুখটায় আবার চলল ব্লাউজের ফুলো হাতা। যুদ্ধের পর দ্রুত পরিবর্তন। ফ্রক আর শাড়ির মাঝখানে এল ব্লাউজে-কামিজ। শাড়ি পিঠ না ঢেকে ঝুলল বাঁ কাঁধের কিনারে। কাঁচুলির নকলে এল খাটো ব্লাউজ—পেট কাটা। ১৯৬০ সালের পরে আবার সেই ব্লাউজই হাত কাটা, পেট কাটা, পিঠ খোলা (একেই কি বলে ক্লিওপেট্রা-রীতি কাট?')। এবং এখনও চলছে

পূজারিণী আর শহরিণী : দুই-ই বাংলা দেশের স্টাইল

নিত্যনতুন ফ্যাশান।

তবে এখনও এই বাংলা দেশেই শাড়ি পরা রকম রকম। শহরে একরকম, গাঁয়ে অন্য রকম। মা-মেয়ে-দিদিমা—তিনজনের তিন পরার ধরন। নববধূর বেনারসী, আর কলেজ-মেয়ের তাঁতের শাড়ি—দুটোই ঠিক চোখ জুড়োয়, কিন্তু দুইজনারই রীতি আলাদা। এক রবীন্দ্রনাথের নায়িকারাই শাড়ি পরেছেন কতরকম। গিরিবালার ঘরভাঙানো বাসন্তী, মণিমালিকার খড়কে ডুরে ঢাকাই, কুমুদিনীর কালো ডোরার সুতী। বঙ্কিম, শরতের নায়িকারাও শাড়ি পরায় আলাদা আলাদা।

ফ্যাশানের বদল না হয় মালুম হল, আবার কিন্তু প্রশ্ন আসে, মনহরণের সুধাক্ষরণের এই শাড়ি সব কবেকার? বেণী দুলিয়ে চলা আধুনিক বিনোদিনী যে-শাড়ি পরেন, এমনটি কি দেখা যেত কালিদাসের কালে? কিংবা তারও আগে?

তার উত্তরে নানা মুনির নানা মত। একদল বলেন, শাড়ি নামে পদার্থই ছিল না অষ্টাদশ শতকের আগে। যা ছিল, (ছোটি শাড়ি?) আকারে অনেক ছোট, কোনক্রমে অর্ধাঙ্গখানা ঢাকত। মহাভারত? দ্রৌপদীর শাড়ী? উঁহু, সেও আসলে কোমরে জড়ানো ছোট্ট এক ফালি। দুঃশাসনের নজর ছিল সেই ফালিতেই।

যুক্তি কথা বলতে গেলে, প্রাচীন ভারতে

উধর্ববাস নাকি কিছু ছিলই না। প্রমাণ আছে মূর্তিতে, প্রমাণ আছে গুহাচিত্রে। জনপদবধূ বা সাধারণ মেয়ে নয়, ত্রয়োদশ শতকে চোল-রানীর পোষাকেও উধর্ববাস বলে কিছুই নেই। রাজা মহেন্দ্রবর্মণের দুই রানী তো অভিজাত, তাঁরাও দুজন তদ্রূপ।

গুজরাটের প্রাক-মোগল মিনিয়েচারে, দশম শতকের গোড়ার দিকের, প্রথম প্রকাশ চোলির। আজকে চালু এই শাড়ির সূত্রপাত ১৭৮০ সালে। তা'ও আগেকার আচ্ছাদনীর বিবর্তনে নয়, দোপাট্টা বা ওড়নি বেড়েই শাড়ি। সেকেলে সেই নিম্নবাস রূপ নিয়েছে পেটিকোটে।

এতো গেল এক পক্ষের সওয়াল। প্রতি-পক্ষ পাল্টা বলেন, প্রাচীনকালে উধর্ববাস ছিল, ছিল, নিশ্চয় ছিল। মূর্তি আর গুহা-চিত্রে চোলি রয়েছে সূক্ষ্ম, আর রয়েছে আভরণ।

তাছাড়া সেযুগের সব মূর্তি এবং ছবি শিল্পীদেরই গড়া। গ্রীস রোমের মূর্তিতেও নগ্ন-নারীর ভিড়। তাই বলে কি সেই দেশে সব নিরাবরণ ছিলেন। শিল্পে আজও আছে সেই জিনিস, তাই বলে কি ধরে নেব, সেটাই সামাজিক রীতি।

শুধু মূর্তি আর ছবি কেন, শাড়ির উদাহরণ রয়েছে আমাদের সাহিত্যে। কাদম্বরীতে উল্লেখ আছে হংসলক্ষণা শাড়ির। রাজস্থানী ছবিতেও রয়েছে সূক্ষ্ম কাজের চোলি আর হিল্লোলিত শাড়ি। ষোড়শ শতকের অনেক বিজাপুরী ছবিতেও আজকের শাড়ির ধরন। কালিদাসের কাব্যে, রাজশেখরের কর্পূরমঞ্জরীতেও চোলি—শাড়ির অজস্র উদাহরণ।

বসন, ভূষণ, প্রসাধন—সেযুগের সেই রূপচর্চায় ছিল তিন ধারা। শাড়িও ছিল অনেক রকম।—"দুকূল-পট্ট-কৌষের-বাল্ক-ক্ষৌম-কার্পাসকাদি।" পোষাকের ছিল দু' ভাগ। উধর্ববাস ও অধোবাস। দুটোরই আবার আলাদা আলাদা বহির্বাস ও অন্তর্বাস। ঋতুভেদে, অবস্থাভেদে শাড়ির হত রঙ বদল। বিয়ের সময় রুক্মিণীর পরনে ছিল পাণ্ডুর ক্ষৌমবসন। রক্তচেলিও পরতেন কেউ কেউ।

খৃষ্টপূর্ব ৩২০ পর্যন্ত ভারতে চালু তিন পোষাক (১) লুঙ্গির মত অধোবাস, উধর্বে আঁটো চোলি, (২) অনেকটা আজকের শাড়ির মত পোষাক, বাড়তি শুধু পল্লব এবং (৩) আদিবাসীদের মত নিম্নাঙ্গে একফালির পোষাক।

দ্বিতীয় যুগ ৩২০ খৃষ্টাব্দ তক্। ভাস্কর্যে, টেরাকোটায় পোষাকের নানা

সহযাত্রীরা জর্মন ভাষায় গান জুড়ে দেবে।

নিদর্শন। উধর্ববাসের চল কম, উর্ধাঙ্গে তখন সূক্ষ্ম চোলি এবং তখন থেকেই শুরু মাল-কোচামারা 'সাকাচা' স্টাইলের পোষাক।

সুঙ্গ আর সাতবাহনের যুগে মেয়েদের মাথার পাগড়ি গেল উড়ে। শুরু হল কেশ-বিন্যাস। পাগড়ির বদলে উড়নি এল মাথায়। ১১০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে পাগড়ি বিলকুল বরবাদ এবং গুপ্তযুগে চালু নানারকম ফ্যাশান। মধ্যযুগে মুসলিম প্রভাবে পোষাক হল তিনখণ্ডী—নীবি, ওড়না, চোলি এবং শাড়ির আকার বাড়তে বাড়তে আজকের এই ছয়গজী।

প্রতিপক্ষের এই বক্তব্যের পাল্টা-জবাব হয়ত আছে, কিন্তু তা নিয়ে বিবাদ করুন পণ্ডিত, আমরা শুধু শাড়ির গুণে নয়ন সংগে বাকি জীবন কাটাব।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, খাঁটি ভারতীয় জিনিস বলতে বোঝায় একমাত্র ওই শাড়ি। শাড়ি আমাদের 'সিমবল'—সংস্কৃতির প্রতীক।

বিদেশীরা শাড়ি বলতে পাগল। এত লম্বা আস্ত একখানা কাপড় কী করে যে দেহ জড়ায়, ছন্দ ছড়ায় স্কার্টধারিনী রূপসীদের এক বিস্ময়। সেই তুলনায় ধুতি-পাঞ্জাবী, চোগা-চাপকান ওদের কাছে কিছুই না। ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আপনি মস্কো, হামবুর্গ বা প্যারিসের রাস্তায় হাটুন, পথচারী ভাববে, আপনি হতে পারেন উগান্ডার লোক, কিংবা ইন্দোনেশিয়ার, হয়ত বা ভারতের। কিন্তু শাড়ি পরে বেরোনোমাত্র মুখে সবাই বলবে—ইণ্ডিয়ান, ইণ্ডিশে, ইণ্ডিস্কি—নির্ঘাৎ ভারতীয়। শাড়িপরিহিতা কোন মেয়ে নিয়ে যদি বিদেশের রাস্তায় বের হন, আপনার পথ-চলা দায় হবে, হাজার কৌতূহলী দৃষ্টি সঙ্গিনীকে বিঁধে মারবে।

সুইজারল্যাণ্ডের ট্রেনে আপনার সঙ্গে যদি থাকেন এক শাড়ি-ধারিনী দেখামাত্র সহযাত্রী একপাল ছেলেমেয়ে জর্মন ভাষায় গান ধরে দেবে—'কালকুট্টা লীগ্ট্ আম্ গাঙ্গেজ, পারী আম্ সেইন।'—অর্থাৎ কিনা 'গঙ্গার তীরে শহর কলকাত্তা, সেইনের পারে প্যারিস।' বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সংগীত-স্পৃহার মূলে শাড়ি এবং শাড়ি মানেই কলকাতা।

মার্কিনদেশে বেস্টসেলার একখানি রেকর্ড-সংগীতের প্রথম লাইন হচ্ছে 'কীস্‌ড্ দি গার্লস অব নেপলস্, কীস্‌ড্ দেম ইন পারী, বাট দি গার্লস্ অব ক্যালকাটা আর্ সাম্থিং টু মি'।

অনুমান করতে পারি, গঙ্গার গায়ে ঢলে পড়া সূর্যের শেষ আলোয় ময়দানের সবুজ পটভূমিকায় সংগীতরচয়িতা বিদেশীটি কোন নীলবাসনা বঙ্গবালাকে হয়ত দেখেছিলেন। এবং তাঁর গানের সেই 'সাম্থিং'-এর কারণ নিশ্চয়ই শাড়ি। বিদেশে শাড়ি আমাদের কালচারাল অ্যাম্বাসাডার।

কবিদের নেকনজর আঁচলে

"বিশ্বে যা কিছু মহৎ সৃষ্টি, যা কিছু সুন্দর, অর্ধেক তার সৃজিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"
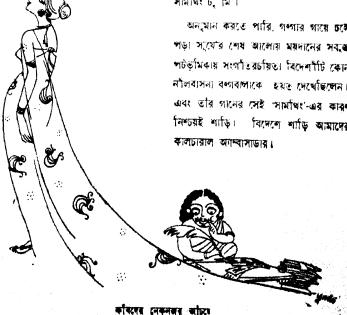
কথাটা আক্ষরিকভাবে সত্য না হলেও আলঙ্কারিকভাবে সত্য। কিন্তু ভারতের খেলাধুলোর ক্ষেত্রে কতটুকু সত্য? খেলাধুলোয় পুরুষের ভূমিকার তুলনায় সোনার হাতে সোনার কাঁকন পরা ভারতীয় নারীর ভূমিকা কতটুকু?

আন্তর্জাতিক খেলাধুলোয় ভারতকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,—স্মৃতির সমুদ্রে সাঁতার কেটে এমন পুরুষের নাম অনেক সংগ্রহ করা যায়। ক্রিকেটের রণজি, দলীপ, পাতৌদি, অমরনাথ, মার্চেণ্ট, মুস্তাক, মানকদ; হকির ধ্যানচাঁদ, রূপসিং, জাফর, দারা; টেনিসের কৃষ্ণন, গউস মহম্মদ; বিলিয়ার্ডের বিশ্বজয়ী উইলসন জোনস; পোলোর রাও রাজা হনুৎ সিং, মহারাজা প্রেম সিং; অ্যাথলেটিকসের মিলখা সিং—এঁরা সবাই ক্রীড়াদক্ষতার নানা দিকে প্রতিভার মহৈশ্বর্যে মহীয়ান। বিশ্ব-ক্রীড়া সভায় সম্মানের পাত্র।

আরও কিছু নাম করা যেতে পারে যাঁরা আন্তর্জাতিক ক্রীড়াকীর্তির কুতুবে ওঠেননি, কিন্তু সীমিত সীমানায় সৃষ্টিশীল শিল্পী। যেমন গোষ্ঠ পাল, সামাদ, কুমার, বাবু, বলবীর প্রভৃতি।

কিন্তু ভারতীয় নারীর এ সম্মান কোথায়? একমাত্র চ্যানেল সাঁতারে ছাড়া আন্তর্জাতিক খেলাধুলোর ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, এমন মেয়ে খুঁজে পাওয়া ভার। আর দু'চারজন না আছেন, এমন নয়। এই বিশাল দেশে প্রয়োজনের তুলনায় সেটা নিতান্তই অল্প। তাই খেলাধুলোয় আমাদের যা কিছু মহৎ সৃষ্টি সেখানে নারীর দান অর্ধেকের অনেক নিচুতে। তাদের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষাকৃত স্বল্পপরিসর সীমানার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় ক্রীড়া-কাননের বিশাল পুষ্পগুচ্ছের মধ্যে তাঁরা শুধু শ্বেত-কৃশ রজনীগন্ধাটি যোগ করে দিয়েছেন। তবু স্নিগ্ধ বিষাদের উপর তাদের কীর্তির স্মৃতিটুকু শরতের শিশির-ঝলমল আলোর মতই মধুর। হাজার ক্যান্ডেল পাওয়ারের রোশনাইয়ের কাছে মাটির প্রদীপের স্তিমিত আলো।

মেয়েদের খেলাধুলো

ভারতের মেয়েদের খেলাধুলো বলতে প্রধানত অ্যাথলেটিক স্পোর্টস, সাঁতার, ভলিবল, বাস্কেটবল, টেবল টেনিস, ব্যাডমিণ্টন আর জিমন্যাস্টিক্স। কবাটি বা খোকো খেলায় সাধারণত মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের মেয়েদের আগ্রহ বেশী। দেশ স্বাধীন হবার পর আগ্নেয় অস্ত্রের খেলায় সারা ভারতের মেয়েদের মধ্যে অপরিসীম আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে। রাইফেল রিভলবার হাতে তুলে নিয়ে অনেকেই অবলার অপবাদ কাটিয়ে উঠেছেন। লক্ষ্যভেদে কেউ-বা অভিশপ্ত চম্বলের মত দস্যুরানী পুতলী বাই-এর চেয়েও পোক্ত। টেনিস ইংগ-বংগ এবং ইংগ-ভারতীয় ভাবাপন্ন অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের খেলা, সাধারণ ঘরের মেয়েদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। হকিস্টিক প্রধানত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের খেলার হাতিয়ার। অবশ্য মহীশূরে, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মেয়েদের মধ্যেও হকি জনপ্রিয়।
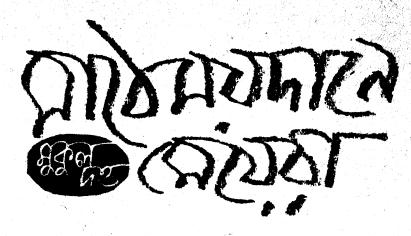
অপ্রচলিত স্পোর্টস, যেমন গলফ, পোলো, ফেন্সিং এবং নৌকা-বাইচ-এও মেয়েদের আগ্রহ বাড়ছে। অন্তত কলকাতার কথা বলতে পারি, রেসকোর্সের উত্তরদিকে লেডিস গলফ ক্লাবে গেলে আঁটসাট পোশাক-পরা কিছু কিছু বাঙালী মেয়ের সাক্ষাৎ মিলবে, যাঁরা গলফ খেলেন। তবে এরা রমা, বীণা, কমলা, নীলিমার দল নয়—আইভি ব্যানার্জী, শেলী ডাটা বা কেটি মিটারের দল—সবুজ অংগনে সমাজের উপর তলার সব শ্যামলী-কন্যা। কিংবা শীতের দিনে সকালের সোনালী আলোয় রেস কোর্সের বিস্তৃত প্রান্তরে দেখা যাবে অশ্বারূঢ়া মিসেস কেটেলের উড্ডীন অংগবাস—পোলো খেলায় একমাত্র মহিলা, যিনি কম্পিটিশনে পুরুষের সংগেও সমান তালে পাল্লা দেন। অসি-চালনার অলীক ক্রীড়া ফেন্সিং ফয়েলেও মেয়েদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তাদের মুখে মুখোস, হাতে অসি, অংগে অংগে অসি চালনার কতই রংগ। আলপনা আঁকা হাতে লেকের কাকচক্ষু জলের বুকে কলতান তুলে দাঁড়ের আলিম্পন আঁকতে অনেকে এগিয়ে এসেছেন। তবে মেয়েদের নৌ-চালনাকে নৌকা-বাইচ না বলে নৌকা-বিহার বা নৌকা-বিলাস বলাই ভাল। যেমন একটি সাঁতার ক্লাবের ওয়াটার ব্যালে। আলোঝলমল সুইমিং পুলের জলতরংগে জল-নটীদের রংগ-ভংগ। পায়ের নূপুর নিক্কণের বদলে হস্তপদ সঞ্চালিত জলকলতান।

আবার আরও উপর তলার খেলা বিলিয়ার্ড। ধনাঢ্য সুখী পরিবারের মেয়েদের নন্দন-ক্রীড়া। অভিজাত হোটেল এবং মিশ্র ক্লাবের 'নিওন' আলোয় শাড়ি-গাড়ির কত ভিড়। বার্নিস করা বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে রামধনুর কত রঙ-বাহার! কোমল হাতের কিউ-এর খোঁচায় সবুজ ভেলভেটের উপর লাল-সাদা বলের কত ছোটাছুটি! তবে দিল্লি বোম্বাইয়ের মত কলকাতায় মেয়েদের বিলিয়ার্ডের আসর এখনো সরগরম হয়ে ওঠেনি। হতে কতক্ষণ?

টেবল-টেনিসের শিল্পী ঊষা সুন্দররাজ

কিন্তু এ সবই তো জীবনের ছন্দে খেলার বীণ—ধনীর দুলালীদের অবসর সময়ের চিত্ত বিনোদন আর দেহ মনের আনন্দ লাভের উপকরণ। যাঁরা দিনগুলি সোনার খাঁচায় বেঁধে রাখতে চান না, রূপ-রস-বর্ণ-ছন্দের সঙ্গে জীবনের ঐক্যতান মেশাতে চান নানা-রঙের দিনের সঙ্গে, তাদেরই খেলা।

এ খেলাধূলোয় হয়তো মনের খোরাক আছে, দেহেরও খোরাক আছে অল্প-স্বল্প; কিন্তু শরীরকে সুপটু করে গড়ে তোলবার আয়াস নেই। এ খেলাধূলোয় মুখের হাসি আছে কিন্তু মনের আশা আর বুকের বল নেই; আর নেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধুর্য, জয়-পরাজয়ের ওঠাপড়ার অধীর আবেগ।

যাঁরা 'ধূলি মাখি অঙ্গে' ব্যাপকতর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাঁদের সঙ্গে এ'দের অনেক পার্থক্য। যেখানে শক্তির পরীক্ষা, গতির তেজ, কঠিন প্রতি-যোগিতা, সেখানকার সাফল্যেই জীবনের জয়গান, সেখানেই অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং অনলস সাধনার সিদ্ধি।

কৃতিত্বের কথা

এখন দেখা যাক ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে খেলাধূলোর সাধনায় কার কতটুকু সিদ্ধি।

প্রথমে সাঁতারের কথাই বলা যাক। কারণ সাগর বিজয়িনী আরতি সাহাই (এখন আরতি গুপ্তা) একমাত্র মেয়ে, দুর্জয়ের অভিযানে এশিয়ার মধ্যে যাঁর কৃতিত্ব ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। বহু সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল, তরঙ্গক্ষুব্ধ হিম-শীতল সাগরের লক্ষ-ফণার ভয়াল গর্জনের মধ্যে দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার কেটে পার হয়ে আরতি বাঙালী মেয়ের ঘরকুনোর অপবাদ সমুদ্রের লোনা জলে ধুয়ে মুছে দিয়েছেন। প্রাচ্য নারীর গর্বিত অভিযানে পশ্চিমের সমুদ্র আর কোনদিনই এভাবে অবলুণ্ঠিত হয় নি।

অবশ্য গত দু' বছরে মহিলা হকি খেলোয়াড় অ্যান লামসডেন আর ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় মীনা শাহ-ও 'অর্জুন' পুরস্কার পেয়েছেন। সেটাও খেলাধূলোর সরকারী সম্মান।

এই প্রসঙ্গে সাঁতারে সাবলীলা আরও কত মেয়ের কথা মনে পড়ছে। আরতির অনেক আগে নদীমাতৃক এই বাঙলা দেশেরই আর একটি মেয়ে ইংলিশ চ্যানেল জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। বোলো বছরের মেয়ে বাণী ঘোষ—আসামের উমানন্দ পাহাড়ের পাদদেশে খল-জল-ছল-ভরা খর-স্রোত ব্রহ্মপুত্র সাঁতরে পার হবার পর দুর্জয়ের অভিযানে যাত্রাও করেছিল। কিন্তু নানা কারণে বাণীর অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় বাঙলার 'সপ্ত কোটি সুসন্তানের' হাতের বরণ-মালাই শুকিয়ে গিয়েছিল। তারপর সুনামের সোপান বেয়ে সাঁতারের অনেক মেয়েই যশের মুকুট পরেছেন। বোম্বাইয়ের জল-রানী ডলী নাজিরের সাময়িক প্রাধান্য ছাড়া ভারতীয় সাঁতারে বাঙলার মেয়েরাই চিরদিন শীর্ষদেশে। জলের বুকে কত কলতান। লীলা চ্যাটার্জির লীলা-চপলতা, সুখলতা পাল, সাবিত্রী খাণ্ডেলওয়াল-এর ছলা-কলা, দীর্ঘদেহী কালো মেয়ে কল্যাণী বসু ও ছিপছিপে লম্বা গড়নের পাতলা মেয়ে অনুরাধা গুহঠাকুরতার ছিপের মত গতিবেগ, ভারতীয় সাঁতারের সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যা-চন্দের সাবলীলতা। আরও কত

টেনিস-লনের একদাখ্যাত ঊর্মিলা থাপর

মেয়ের কত নৈপুণ্য! এর মধ্যে দেহ-দণ্ডের সুগম গতি আর সাবলীলতায় সন্ধ্যার সঙ্গে কারোরই তুলনা চলে না।

প্রতি খেলাধূলোর একটা পৃথক সৌন্দর্য আছে। যেমন আছে চলন্ত মানুষে, ছুটন্ত অশ্ব এবং উড়ন্ত বিহঙ্গের চলার ছন্দে। পাখি শূন্যের বুকে ডানা মেলে ভেসে চলে। কেমন সুন্দর তার গতির ছন্দ। হাত পা মেলে মানুষ যখন জলের বুকে ভেসে চলে সারসের চলার ছন্দে, তখন ফুটে ওঠে সাঁতারের সৌন্দর্য। রমণীর ক্ষেত্রে সেটা আরও রমণীয়, লীলার পেশমবিলাস।

আন্তর্জাতিক সাঁতারে যে দেশের ছেলেদের মান মেয়েদের মানের নীচে, সে দেশের মেয়েদের কাছে আমরা কতটুকু আশা করতে পারি? আমাদের সুইমিং পুল নেই, অনুশীলন ও শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই, সংস্কারমুক্ত মন নেই। তবু এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মেয়েরা সাঁতারে যেটুকু কৃতিত্ব দেখিয়েছে, সেটুকু তাদের সাধনা ও বাসনারই যৌথ সৃষ্টি।

অ্যাথলেটিক্স

ভারতে মেয়েদের মধ্যে দৌড়-ঝাঁপের সূচনা প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে থেকে, যদিও জাতীয় অ্যাথলেটিকসে সর্ব-প্রথম মেয়েদের অংশগ্রহণ ১৯৩৪ সালে। প্রথম যুগের মেয়েদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বাঙলা দেশই ছিল অগ্রণী। ক্রমে কৃষ্ণাঙ্গী ভারতীয় ও বাঙালী মেয়েরা শ্বেতাঙ্গিনী-দের মধ্যে নিজেদের যায়গা করে নিতে আরম্ভ করলেন। অ্যাথলেটিক্স অঙ্গনে আরম্ভ হল শ্বেতধারা ও নীলধারার সমপ্রবাহ।

গত ৩০ বছর ধরে যে-সব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় মেয়ে অ্যাথলেটিক্স-অঙ্গন থেকে দু'হাত ভরে পুরস্কার তুলেছেন, রেকর্ড ভাঙা-গড়ায় খেলার ক্রীড়াঙ্গনকে সৌন্দর্যের প্রান্তরে পরিণত করেছেন তাদের কত নাম স্মৃতিপটে ভেসে আসছে। আইরিশ জেনিংস, বেটি এডওয়ার্ড, ডরোথী প্রিচার্ড, পুরুষালী চেহারার কোঁকড়া চুলের নিগ্রো মেয়ে লোলা সিভিল, উনা লায়ন্স, ভায়োলেট পিটার্স, ক্রিস্টিন ব্রাউন, এলিজাবেথ ডেভেন পোর্ট। ভারতীয়দের মধ্যে বানু গঙ্গদার, রোশন মিস্ত্রি, রোশিতা কামাথ, ভাগী আডানী, বসন্ত কুমারী, মেরী ডিসুজা, স্টিফি ডিসুজা, লীলা রাও, মনমোহিনী উবেরয়, নীলিমা ঘোষ, নমিতা ঘোষ। আজকের উঠতি মেয়ে ক্রিশ্চিনি ফোরেজ। আরও কত নাম। তালিকা অত্যন্ত দীর্ঘ।

কিন্তু আন্তর্জাতিক অ্যাথলেটিকসে এ'দের কৃতিত্বের খতিয়ান মোটেই দীর্ঘ নয়। লক্ষ্ণৌ, লুধিয়ানা, বোম্বাই, বাঙলা, দিল্লি, পাতিয়ালা, মাদ্রাজ বা ব্যাঙ্গালোরে এদের দেহের গতি, শক্তির জ্যোতি, দর্প-বিক্রম কিংবা উচ্চ লম্ফন দর্শক মনে উল্লাস জাগালেও অলিম্পিকে বা এশিয়াডে কৃতিত্বের স্বাক্ষর অস্পষ্ট।

বোম্বের মূর্তিমতী দৌড় প্যাটারসী মেরী ডিসুজা এবং গ্রীক ভাস্করের হাতে গড়া কালো পাথরের অ্যাথলীট প্রতিমূর্তির মত বাঙলার অনন্যা কালো কন্যা নীলিমা যখন ভারতের প্রথম মেয়ে প্রতিনিধি হিসাবে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে গিয়েছিলেন, কিংবা নীলবসনা সুন্দরী লীলা রাওয়ের দৌড়ের ছন্দ যখন মেলবোর্ণ অলিম্পিক অঙ্গনে মোহ সৃষ্টি করেছিল, তখন আমরা সুখ-স্বপ্নের আবিলতায় বিভোর হয়েছিলাম। কিন্তু অলিম্পিকের অ-ঠাঁই পাথারে কেউই ঠাঁই পান নি।

দিল্লি, ম্যানিলা, টোকিও এবং জাকার্তা—চারটি এশিয়ান ক্রীড়াঙ্গন থেকেও আমাদের মেয়েদের সংগ্রহ পর্যাপ্ত নয়। মাত্র একটি সোনার, চারটি রূপোর এবং আটটি ব্রোঞ্জের মেডেল। আন্তর্জাতিক অ্যাথ-লেটিক্স ক্ষেত্রে আমাদের মেয়েদের ধূসরতায় মলিন কৃতিত্বের পশ্চাৎপটে এইটুকুই শুধু আলোর আভা।

সাঁতারের মত অ্যাথলেটিক্সের বিশ্বমানের তুলনায় ভারত অনেক পিছনে পড়ে আছে।

অ্যাথলেটিক বিশ্বে আজ রকেটের অগ্রগতি। ভারতের মেয়েদের বেলায় স্লো-মোশন ক্রীড়াচ্ছবি। তবু ভাবতে ভাল লাগে এর মধ্যেও ক'টি মেয়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

টেবল্ টেনিস

টেবল টেনিসে ভারতের পুরোবর্তিনীদের মধ্যে যাঁদের প্রতিষ্ঠা বেশী তাঁদের নামগুলিই আগে লেখা যাক। অর্পিতা দাস, রমলা নাগ, মিসেস রাজা গোপালন, গুলে নাসিক-ওয়ালা, মিসেস রুক্মিণী, সৈয়দ সুলতানা, মীনা পরাণ্ডে, রাসেল জন, ঊষা সুন্দররাজ, ইন্দিরা আয়েঙ্গার, ঊষা আয়েঙ্গার, তপতী মিত্র, রবিনা রায়, শকুন্তলা দত্ত। সবারই আছে বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীর খেলার বাহার। অনুসন্ধানে জানা গেছে স্কুল কলেজের কমনরুমের কাঠের টেবিল আর হাতের বই হয়েছে অনেক মেয়ের খেলার হাতে-খড়ির প্রথম উপকরণ। টেবিলের উপর হাতের ব্যাট দিয়ে সেলুলয়েডের সাদা ছোট্ট ফাঁপা বলকে চালনা করতে বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না। কব্জির কারিকুরি আর ব্যাট চালানোর কায়দাকলমই টেবল টেনিসের সুন্দর মারের শেষ কথা। অবশ্যই চোখের দৃষ্টি, গভীর মনঃসংযোগ, চটুল পদক্ষেপ এবং খেলার স্ট্রাটেজী টেবল টেনিসের নিপুণ শিল্পীর সঙ্গের সাথী। মেয়েদের যে কোমল হাতে নানা কলা-শিল্প গড়ে ওঠে সেই হাতেরই অপূর্ব মারই 'আপনাতে আপনি বিকশি' টেবিলের উপর অপরূপ রূপ সৃষ্টি করে।

অর্পিতা দাসের হাতে ছিল চমৎকার ব্যাক হ্যান্ড ফ্লিক আর চপ ডিফেন্সিভ মার। ঊষা সুন্দররাজের হাতে দেখেছি মার ফেরানোর দুর্ভেদ্য অস্ত্র, মীনা পরাণ্ডের দেখেছি ব্যাট চালানোর বাড়তি বাহার, ঊষা আয়েঙ্গারের অচঞ্চল ক্রীড়াভঙ্গী, অতুলনীয় ডিফেন্স। টেবিলের আক্রমণমুখী মেয়ে

অব্যর্থ লক্ষ্যের রাইফেল-চালিকা কণা বসু

হচ্ছে শকুন্তলা দত্ত। কিন্তু সব জড়িয়ে এবং ভারতের সব মেয়ের মধ্যে হায়দরাবাদের সৈয়দ সুলতানা ছিলেন টেবল টেনিসের সৃষ্টিশীল শিল্পী। বোম্বের গুলে নাসিক-ওয়ালার অবশ্য এশিয়ান টেবল টেনিসে জয়ের কৃতিত্ব আছে, সৈয়দ সুলতানার আছে বিশ্ববিজয়িনী জাপানী মেয়ের বিরুদ্ধে বিজয়ের গৌরব। যে জাপ-মেয়ের মারের বন্যায় টেবিলের উপর তুফান উঠেছিল।

ব্যাডমিণ্টন

অ্যাথলেটিক্সের মত মেয়েদের ব্যাড-মিণ্টনেও ছিল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রাধান্য এবং বাঙলার পার্ল গস ও ফিলিস কুক ছিলেন ভারতীয় ব্যাডমিণ্টনের পুরোভাগের দুই পটিয়সী। ক্রমে মহারাষ্ট্রের মেয়েরাই ব্যাডমিণ্টনে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে আরম্ভ করেন। বিখ্যাত খেলোয়াড় জর্জ লুইসের সহধর্মিনী নবীনা লুইস, মমতাজ চিনয় এবং ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধরের তিন কন্যা তারা, সুমন ও সুন্দর দেওধরের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এখনকার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মীনা শাহ, সরোজিনী আপ্তে, সুনীলা আপ্তে, যশবীর কাউর, প্রেম পরাশর, মমতাজ লোটাওয়ালা, অচলা কার্নিক প্রভৃতি প্রথম সারির সবাই প্রায় উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের অধিবাসিনী। এ'দের মধ্যে বাঙলার প্রীতি, পুরবী, করবী, কণা বসুরা কোন পাত্তা পাননি। আবার এক 'উবের কাপের' এশিয়ান জোনের খেলা ছাড়া ভারত প্রধানারাও পাত্তা পান নি—আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনে।

বল ও ব্যাটের খেলাতেই বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মের প্রকাশ-লাবণ্য। সাটল ও র‍্যাকেটের খেলা ব্যাডমিণ্টনেও আছে অধীর সৌন্দর্যের উচ্ছলতা। সিমুল ফুলের আকারে পাখির পালকে তৈরী সাটল কক র‍্যাকেটের আঘাতে একবার কোর্টের ওদিকে যাচ্ছে, একবার এদিকে আসছে। সেই র‍্যালির মাঝে এক-জনের কব্জির কারিকুরি কিংবা মারের রকম ফেরের কার্যকরণে সাটল ঝড়ের পাখির মত মাটিতে গিয়ে পড়ছে আর একজনের নাগালের বাইরে। এর মধ্যে খেলোয়াড়ের বুদ্ধির বিকাশ আছে, আছে হাতের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, লঘু পায়ের ছন্দ-সুখ।

ব্যাডমিণ্টন কোর্টে যে-সব মেয়ে এই সুখের হিল্লোল তুলেছেন তাঁদের মধ্যে তারা দেওধর ও নবীনা লুইসের খেলায় দেখা গেছে একটা খুসীর আমেজ। মারগুলি নিজের খুশিতে কোর্টের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, তাঁদের খেলায় ছিল এমন আয়েসী উদাসীনতা। তুলনায় গত তিন বছরের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন মীনা শাহর খেলায় আছে ঋজু শক্তির বহির্বিকাশ। শক্ত হাতে সাহস-

রাশিয়ায় কিশ্ ভলিবল আসরে ভারতীয় টীমের মীনাক্ষী চৌধুরী

সুন্দর মারের অতিবিস্তার। ব্যাডমিণ্টনের রসিক-জনের মতে মারের লাবণ্যে তারা দেওধর এখনো অনতিক্রান্ত।

টেনিস

আগেই বলেছি টেনিস অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েদের খেলা। আন্তর্জাতিক টেনিসে ভারতীয় কন্যাদের কোন অবদান নেই। এবং ক্রীড়া-মানও নিম্নমুখী।

বিশ-পঁচিশ বছর আগে দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে লীলা রাও টেনিস কোর্টে যেটুকু আলোড়ন তুলেছিলেন পরবর্তীকালের টেনিস পটিয়সীরা সেটুকু আলোড়ন তুলতে পারেন নি। শুধু টেনিসেই নয়, মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কন্যা লীলা রাওয়ের ইংরেজী, সংস্কৃত এবং ফরাসী ভাষায় ভাল দখল ছিল, দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যেও ছিলেন পটিয়সী, এক-আধখানা বইও না লিখেছেন, এমন নয়। নাচের ছন্দ এবং ভাষার মাধুর্যের মতই খেলার ছন্দে টেনিস লনকে সজীব করে তুলেছিলেন লীলা রাও। টেনিস অঙ্গন থেকে অবসর নিয়েছেন বহুদিন। কিন্তু

অ্যাথলেট নীলিমা ঘোষ

আমেদাবাদের ওপেন বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশীপ বিজয়িনী পূর্ণিমা রবীন্দ্র
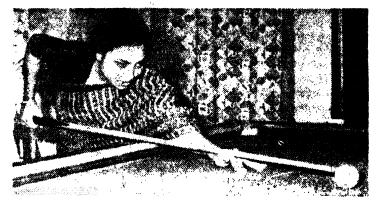
লীলা রাও (এখন লীলা দয়াল) এখনো সংবাদ। টেনিস র‍্যাকেটের মারের ছটায় ঘাসের মলমলে যার প্রথম জীবনের জয়গান, প্রৌঢ়ে পাষাণ ফলকে তাঁর পায়ের চিহ্ন। অজানাকে জানবার আগ্রহ, অ্যাডভেঞ্চার স্পৃহা এবং পর্বত আরোহণের দুর্জয় অভিযান। প্রায় পঞ্চাশ বছরের এই বর্ষীয়সী মহিলা এই সেদিনও পোর্টারের সঙ্গে হিমালয়ের এক পর্বতশৃঙ্গ জয় করে ফিরে এসেছেন।

লীলা রাওয়ের পর খান্নম সিং এবং প্রমীলা খান্নাকে নিয়েই টেনিস-রসিকদের যা কিছু আবেগ-উচ্ছ্বাস। দুজনের পর্যায়ক্রমে বিজয়িনীর সম্মান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্ল্যাক আউটের মধ্যে দুজনই হারিয়ে গেলেন। বছর দশেক পরে মধু-গন্ধে-ভরা স্মৃতি নিয়ে দুজনই বেরিয়ে এলেন বিস্মৃতির আড়াল থেকে। আবার টেনিস অঙ্গনে অভিসার। ইতিমধ্যে প্রমীলা খান্না হয়েছেন প্রমীলা সিং, তিন সন্তানের জননী। খান্নম সিং-এর তিনবার হয়েছে পদবী বদল। ১৯৫৬-র জাতীয় ফাইন্যালে ওরাই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

মাঝে মাঝে টেনিস লনে কিছু কিছু নতুন মুখ রমণীয় হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু রীতা ডেভার, উর্মিলা থাপর বা আজকের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন মহীশূরের মেয়ে চৌত্র চিত্তায়ানা কিংবা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দিল্লির আর আডার্নি টেনিসে নবযুগের সূচনা করতে পারেন নি। নিতান্ত মাঝারিয়ানার মধ্যে বাঁধা রয়েছে ভারতে মেয়েদের টেনিস খেলা।

ভলিবল, বাস্কেটবল ও জিমন্যাস্টিক্স

ভারতে ক্লাব চত্বরের চেয়ে কলেজ প্রাঙ্গণেই ভলিবল বাস্কেটবলের বেশী আসর। বেথুন, ভিক্টোরিয়া, লরেটো, লেডি ব্রাবোর্ণ, শান্তি-নিকেতন বা লেডি আরউইন প্রভৃতি কলেজের মেয়েরাই ভলি ও বাস্কেটবলকে রূপে-রসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তবে মেয়েদের ভলিবল খেলায় উত্তর প্রদেশের স্থান সবার উপরে। মাত্র একবারই ভারতের মহিলা ভলিবল টীম বিদেশ সফর করেছে। কিন্তু ১৯৫২ সালের বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় সারা ভারত থেকে বেছে যাদের মস্কো পাঠান হয়েছিল তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন উত্তর প্রদেশের অধিবাসিনী এবং গর্ব করে বলবার কথা বারোজনের মধ্যে সাতজনই ছিলেন প্রবাসী বাঙালী। এতে অবশ্য বাঙলার সম্মান বাড়েনি কিন্তু ভারতের চোখে, বিশ্বের চোখে বড় হয়ে উঠেছে বাঙালী কন্যার কৃতিত্ব।

শরীরকে খেলাধুলার উপযোগী এবং সুপটু করে গড়ে তোলবার ক্ষেত্রে জিমন্যাস্টিকসের চর্চা অপরিহার্য। তাছাড়া দর্শক-চোখের তৃপ্তিদায়ক ভঙ্গিমা এবং শিল্পীর জীবন্ত মডেলের অপরূপ রূপ সৃষ্টি জিমন্যাস্টিকসেই সম্ভব। কিন্তু ভারতে জিমন্যাস্টিকসের সমাদর কম। মেয়েদের মোমের পুতুল করে গড়ে তোলবার জন্য বোনলেস অ্যাক্টিভিটির কিছু কিছু চর্চা হয়েছে, বীম ব্যালান্সের খেলাতেও কেউ কেউ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু বারানসীর বাঙালী কন্যা একমাত্র অরুণা দাসগুপ্তা ছাড়া কেউই একটা স্ট্যাণ্ডার্ডে পৌঁছুতে পারেন নি।

রাইফেল্স সুটিং

ভারতের মেয়েদের রাইফেল চালনার আগ্রহের পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে।

"দেশ স্বাধীন হয়েছে—দেশরক্ষায় পুরুষ-নারীর সমান দায়িত্ব, সমান অধিকার। নারীকেও এসে দাঁড়াতে হবে পুরুষের পাশে, জোগাতে হবে সাহস ও প্রেরণা, প্রয়োজনের সময় হাতে তুলে নিতে হবে হাতিয়ার, কাঁধে বন্দুক।" রাষ্ট্রনায়কদের এই উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েই মেয়েরা ছুটে এসেছেন সুটিং রেঞ্জে।

লক্ষ্যভেদের জন্য চাই গভীর মনঃসংযোগ ও স্থির লক্ষ্য। গুরু দ্রোনাচার্য শিষ্যদের ধনুর্বিদ্যা শেখাবার সময় গাছের ডালে বসা একটি পাখির দিকে আঙুল তুলে প্রশ্ন করেছিলেন।

'গাছে কি দেখছ?'

'একটা পাখি।'

'তুমি কি দেখছ ?'
'একটা পাখির মাথা।'

'অর্জুন, তুমি কি দেখছ ?
'শুধু চোখ।'

এবার শিক্ষাগুরুর মনের মত উত্তর। পাখিও না, পাখির মাথাও না। শুধু চোখ। এমন দৃষ্টি, এমন একাগ্রতাই তো লক্ষ্যভেদের মূলমন্ত্র।

এই মূলমন্ত্রের সঙ্গে যারা রাইফেল রিভলবার নিয়ে গুলী বারুদের খেলা আরম্ভ করেছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই

উঠতি অ্যাথলেট ক্রিস্টিন ফোরেজের বর্শা নিক্ষেপ

লক্ষ্যভেদে লব্ধ প্রতিষ্ঠ। মঞ্জুলা সেন, সবিতা চ্যাটার্জী, গীতা রায়, শোভিতা চ্যাটার্জী, ওয়ানকেয়ারের রাজরানী কুমুদ মঞ্জুরী দেবী, গুজরাটের মিসেস ভি কে ভিষণজী, মহারাজা কার্ণী সিংয়ের কন্যা জয়শ্রী, অব্যর্থ-লক্ষ্যের বাঙালী কন্যা কুমারী কণা বসু—কত নাম। কারো কারো স্কোর আন্তর্জাতিক কৃতিত্বের সমকক্ষ। কিন্তু অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ঘটেনি।

গীতা রায়ের কথাই বলতে পারি। মেলবোর্ণ অলিম্পিকের ট্রায়াল সুটিংয়ে 'প্রোণে' ৫০ মিটার দূর থেকে ৬০ রাউণ্ড গুলী ছোড়ার প্রতিযোগিতায় তিনি পেয়েছিলেন ৬০০-র মধ্যে ৫৯৮। গীতা রায়কে মেলবোর্নে পাঠান হয়নি। কিন্তু মেলবোর্নে এই বিষয়ে যিনি ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন তাঁর স্কোর গীতা রায়ের স্কোরের চেয়েও কম।

গীতা রায়ের আর একটু কৃতিত্বের কথাও উল্লেখের দাবী রাখে। হাঙ্গেরীর মেজর ক্যারোল টাকাস দুটি অলিম্পিকের স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত রাইফেল সুটার। লণ্ডন অলিম্পিকের বেশ কিছু আগে এক সামরিক মহড়ায় বোমা ফেটে তাঁর ডান হাতখানা উড়ে যায়। মেজর ট্যাকাস বাঁ হাতেই গুলী ছুঁড়ে লণ্ডন ও হেলসিংকি অলিম্পিকে বিজয়ী হন।

গীতা রায়ের ডান চোখে দৃষ্টি কম। তিনি গুলী ছোড়েন বাঁ হাতে, বাঁ চোখের স্থির লক্ষ্যে। ভারতের একমাত্র লেফট্ হ্যাণ্ড সুটার। সবিতা চ্যাটার্জী প্রোনের স্কোরও নাকি একবার বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে গেছে।

রাইফেল চালনাও সঙ্গতিসম্পন্ন বড় ঘরের মেয়েদের স্পোর্টস। বিগার স্পোর্টস। এর সঙ্গে যদি আরও বিগার স্পোর্টস, দুর্বা ব্যানার্জী এবং প্রেম মাথুরের বিমান চালনার পটুতা কিংবা গীতা চন্দ্রের প্যারাসুট জাম্পের দুঃসাহসিক কৃতিত্বকে যোগ করি তবে মুক্ত অঙ্গনের খেলাধুলো এবং জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষের অভিযানে ভারতীয় মেয়েদের অবদান নিয়ে আপশোষ করার কারণ থাকে না।

অবশ্য খেলাধুলোয় অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে চলতে বহু সময়ের প্রয়োজন, সাধনার প্রয়োজন—প্রয়োজন উপকরণ ও উন্নত শিক্ষার।

খেলাধুলো এখন জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যে দেশের ছেলেমেয়ে বিশ্ব ক্রীড়াসভা থেকে যশের ডালি বয়ে নিয়ে আসে সে দেশ বিশ্বের চোখেও বড় হয়ে দেখা দেয়। খেলাধুলোর চর্চা বিদ্যাভ্যাসকেও বিঘ্নিত করে না। একসঙ্গেই খেলাধুলো, লেখাপড়া এবং সঙ্গীতের সাধনায় জীবনকে মধুময় করে তোলা যায়। করেছেনও অনেকে। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। এক হাতে কলেজের মোটা মোটা বই, আর এক হাতে টেবল টেনিস বা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট নিয়ে, পায়ে রানিংসু এবং নাচের নূপুর পরে, কণ্ঠে সুর তুলে অনেক মেয়েই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েছেন। তাঁদের সংসার-জীবনেও স্বভাব হাসির ফুলঝুরি।

খেলাধুলো নারীত্বের কমনীয়তাকেও ক্ষুণ্ণ করে না। বরং খেলাধুলো ও শরীর চর্চার মধ্য দিয়ে নারীর দেহশ্রী ও সৌন্দর্য একটি সু-সমঞ্জস ছন্দ খুঁজে পায়।

ঠিক হোটেল একে বলা যাবে না। কিন্তু এর নাম হোটেল। খুব বড়-একটা রঙ-চটা সাইন বোর্ড একটু কাৎ হয়ে ঝুলছে, তার উপর বড় বড় হরফে লেখা—

সী ভিউ হিন্দু হোটেল

নামটা দেখে খুব ভালো লাগল। সেইজন্যে কিছু চিন্তাভাবনা না ক'রে কোনো খোঁজ-খবর না নিয়ে এখানেই উঠলাম।

সমুদ্র এখান থেকে অনেক দূর। বিশ বা বাইশ মাইল দূর তো হবেই। এখান থেকে সমুদ্রের কোনো ভিউ পাব—সে আশা অবশ্য করিনি এখানে উঠবার সময়।

কিন্তু হোটেলটির নাম এরকম রাখার কারণ এমন হতে পারে যে, এই পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে সমুদ্রের দৃশ্য দেখা যাবে। এই যুক্তিতে অবশ্য পৃথিবীর যাবতীয় হোটেলই সী ভিউ।

হোটেলটা মনোরম না হতে পারে, কিন্তু বেশ মজার। খুব বড় আর খুব পুরনো একটা কাঁচা বাড়ি। পাতার বেড়া ফাঁক-ফাঁক হয়ে গিয়েছে। করোগেট টিনের প্রকাণ্ড চাল ঝুঁকে পড়েছে রাস্তার দিকে। হোটেলে ঢুকতে হলে মাথা নিচু করে সাবধানে ঢুকতে হয়।

বারান্দায় পাতা লম্বা বেঞ্চে প্রথমেই বসে পড়লাম। একটা রাত্রি তো এখানে বাস করব, তার জন্যে আবার এই লটবহর নিয়ে অন্য জায়গার খোঁজ করার ইচ্ছে হল না। মনকে বুঝ দিলাম এই বলে যে, জীবনে একটা বৈচিত্র্য চাই, জীবনে অভিজ্ঞতা চাই। কিন্তু মনে-মনে বুঝলাম যে, একটু আর্থিক সাশ্রয় করারও প্রবল ইচ্ছে মনে-মনে আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে আলস্যও।

শহুরে বাবু এমন-একটা জায়গায় এভাবে বসে আছে দেখে অনেকে বুঝি অবাক হল। অনেকে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখে যেতে লাগল।

তখন বিকাল। সূর্যটাও যেমন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, আমিও তেমনি ক্লান্ত।

প্রায় সত্তর মাইল রাস্তা বাস্-এর ঝাঁকি খেতে খেতে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি—এই কন্‌টাইয়ে।

বাস্ এসে যেখানে থামল তারই গায়েই এই হোটেল—এই সী ভিউ হিন্দু হোটেল। সুতরাং কোনোরকম হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে এর বারান্দায় এসে বসে পড়েছি।

এখানে বসে পড়ে এমন দ্রষ্টব্য যে হয়ে উঠব তা অবশ্য ভাবিনি।

শহরের লোক আমরা। শহরকে মনে করি সঙ্গিনী, এবং প্রকৃতিকে মনে করি

পণ্য। সেইজন্যে শহরকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে ছুটি। এইজন্যেই বুঝি দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে উঠি আমরা।

দীঘা-রোডের উপরেই এই হোটেল। এই রাস্তা দিয়ে বাস্-এ চেপে সমুদ্রের দিকে ছুটেছে কত লোক। আমিও ছুটব। তবে, আজ আর না। কাল।

একে একে খরিদ্দার আসছে হোটেলে। কিন্তু তাদের কেউই এই নতুন আগন্তুকটির মত না। তাদের চেহারা অন্যরকম। তারা বুঝি ধারে-কাছেরই গাঁয়ের বা গঞ্জের লোক। তাদের কথাবার্তাও অন্যরকম।

তাদের সঙ্গে মালপত্রও নেই কিছু। কিন্তু আমার সঙ্গে আছে সুটকেস হোল্ডল ফ্লাস্ক ক্যামেরা রেনকোট। পায়ে মোটা জুতো, গায়ে বুশশার্ট, চোখে কালো চশমা। এমন হোটেলের বারান্দায় এ বস্তুটি দ্রষ্টব্য না হবে কেন।

ক্রমেই সত অন্ধকার হয়ে উঠতে লাগল ততই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম। আর তা হলে অত লোক উঁকিঝুঁকি মারবে না। কিন্তু, এ কি, এরই মধ্যে এসে গেল হারিকেন। কাঠের খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে সেটা ঝুলিয়ে দিয়ে গেল, কে ও।

—কি গো, নাম কি তোমার?

তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার জন্যে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলাম।

লোকটা বলল, আমি কেষ্টমোহন, বাবু।

—এ হোটেলে কতদিন আছ?

—তা, আপনার গিয়ে, দশ বছর হবে। আপনি কদ্দিন আছেন বাবু এখানে?

মনে-মনে একটু হাসলাম, বললাম, এক-দিন—এক রাত্রি।

কেষ্টমোহন আর-কিছু বলল না। হারি-কেনটার পলতে একটু বাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

চোখের উপর আলো পড়ছে, রাস্তা দিয়ে কে যাচ্ছে কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। কিন্তু, বুঝতে পারছি যে, রাস্তার লোকগুলো বেশ স্পষ্টই দেখছে এই জীবটিকে।

একজন মাঝবয়সী লোক মাথা নিচু করে ঢুকে পড়ল। কোনোরকমে ভূমিকা না করে বসে পড়ল বেঞ্চির আর-এক কোণে।

একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল সে, বলল, আমার নাম শ্রীনিবাস সানা। মহাশয়ের নাম?

নাম বললাম।

—নিবাস?

নিবাস বললাম।

একটু চুপ করে থেকে সে বলল, আমাদের এখানে হোটেলের ছড়াছড়ি। বিস্তর হোটেল। এখানে ওঠা ভালো করেননি।

তার কথা শুনে একটু ভয় লাগল। একটু নড়ে বসলাম। মনে হল, পিছনের বাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অজস্র ভয় যেন উঁকি দিচ্ছে।

গলাটা একটু সাফ করে একটা সিগারেট ধরালাম, তারপর বললাম, ভালো-মন্দের আর আছে কি। একটা তো রাত্তির। কোনো রকমে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

বিড়িতে একটা দম দিয়ে লোকটা বলল, তা বটে। কিন্তু আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, সেইজন্যে বললাম। হোটেলওলা শুনলে আবার খাপ্পা হবে। ভাববে, তার খদ্দের ভাগাচ্ছি।

বিড়ির টুকরো ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন্, আপনার একটা সিগারেট চেখে দেখি।

লোকটাকে সিগারেট দিলাম। সে বসে-বসে চাখতে লাগল। আর, মাথা নিচু করে ঝুঁকে ঝুঁকে বলতে লাগল, কে যাও গো? কে গো তুমি।

কেউ বলল, আমি অভিলাস গো।

কেউ বলল, আমি বিনোদিনী গো।

শ্রীনিবাস আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল।

—ও কে গো?

—আমি সুন্দরী।

শ্রীনিবাস আমার দিকে না চেয়েই একটু হাসল। আবার গলা সাফ করে নিলাম, বললাম, আপনাকে তো সবাই বেশ খাতির করে দেখছি।

শ্রীনিবাস বলল, তা করে, আপনার কথায় আপত্তি করব না। ও কে গো?

—আমি হরিদাস গো।

বটে! এই সাঁঝবেলায় কার পিছু নিলে গো।

হরিদাস কোনো উত্তর না দিয়ে চলে গেল। শ্রীনিবাস একটু শব্দ করেই হেসে বলল, যথার্থ কথাই বলেছেন। সব্বাই একটু খাতির করেই চলে এ বান্দাকে।

—কেন বলুন তো!

শ্রীনিবাস বুঝি একটু ভারিক্কে হাসি হাসল, বলল, করবে না! সব্বার সব কেচ্ছা জানা আছে যে।

বললাম, ওঃ!

সিগারেটটা দুই আঙুলের ফাঁকে চেপে ধরে হাত মুঠ করে অদ্ভুত কৌশলে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

—কে গো তুমি! কন্দূরে গো!

দেখতে পেলাম লাল পাড়ের একটা ঘের মাত্র, মল বাজিয়ে চলে গেল। কোনো উত্তর দিল না।

শ্রীনিবাস হাসতে লাগল, বলল, এ বান্দাকে খাতির না করে এমন মানুষ নেই গো বাবু-মশায় এ-তল্লাটে।

বললাম, তাই তো লক্ষ্য করছি।

শ্রীনিবাস উঠে দাঁড়াল, বলল, বিশ্রাম করুন। রাতে আছেন তো? আসব অখন।

আমার গায়ে কাঁটা ঠিক দিচ্ছে না, কিন্তু মনে হচ্ছে, ঠিক কথাই বলেছে শ্রীনিবা[illegible] এখানে না উঠলেই ভালো হত।

একে একে আরও খদ্দের আসছে [illegible] ভিউ হিন্দু হোটেলে। ঐ দরজা দিয়ে [illegible] আগেও আরও অনেকে ঢুকেছে। কি[illegible] এখনও কেউ বেরিয়ে আসছে না দেখে এব[illegible] যেন গায়ে একটু কাঁটাই দিল।

উঠে দাঁড়িয়ে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হ[illegible] তুলতে তুলতে ডাক দিলাম, ওহে কে[illegible] মোহন!

এমনভাবে ডাকলাম, যেন একটুও [illegible] পাইনি, পরম আরামে আর পরম নিশ্চি[illegible] মনেই আছি। কিন্তু কেষ্টমোহনের স[illegible] না পেয়ে দরজার কাছ পর্যন্ত এগিয়ে গি[illegible] জোর গলায় ডাকলাম, কেষ্টমোহন!

ভিতর থেকে সাড়া এল। তার পরেই [illegible] কেষ্টমোহন।

বললাম, মালপত্র তোলো। কোথায় থা[illegible] তার ব্যবস্থা করো।

কেষ্টমোহন বলল, দোতলায় আপন[illegible] থাকার ব্যবস্থা হয়েই আছে বাবু!

দোতলার কথা শুনে চমকাবার কথ[illegible] কিন্তু এখন আর কোনো চমক লাগছে [illegible] কেষ্টমোহনের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম।

আধো অন্ধকারে মাটির কয়েকটা সি[illegible] ভেঙে উঠে এলাম দোতলায়। ঢালা ব্যবস্থ[illegible] প্রকাণ্ড একটা মেঝে। তার এক কোণে [illegible] রাখলাম। হোল্ডল খুললাম। বিছ[illegible] পাতলাম। মেঝের গায়েই ছোট জানল[illegible] জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম অ[illegible] লোক লাইন দিয়ে বসে গিয়েছে নী[illegible] ঘরটায়। তাদের পরিবেশন করে চলে[illegible] তিনটি লোক। কত লোক খেতে বসে[illegible] এখান থেকে তা গুনে বলা যাবে না। কি[illegible] মনে হল—ওটা বুঝি একটা জনসমুদ্রই।

আইন-আদালত করতে আসে যারা, য[illegible] ব্যবসাবাণিজ্য করতে আসে, তারা-সব না[illegible] আসে এই হোটেলখানায়। কেষ্টমোহন জিজ্ঞাসা করায় সে বলল।

কিন্তু ঐখানে ঐ জনসমুদ্রের মধ্যে গি[illegible] খেতে বসতে হবে, একথা ভাবতে ভাল[illegible] লাগছিল না। কেষ্ট আশ্বাস দিতে লাগ[illegible] বলল, কোনো অসুবিধে হবে না। বসব[illegible] জন্যে নাকি পিঁড়ি আছে। তার কথা শু[illegible] যেন খুব আশ্বস্ত হলাম, এইরকম [illegible] দেখালাম।

কিন্তু শ্রীনিবাস, সে নাকি আসবে আম[illegible] খোঁজ নিতে।

বললাম, কেষ্টমোহন, তুমি রাত্রে থাক[illegible] কোথায় ভাই। নীচে? কেন, নীচে কে[illegible] আজ এখানেই থাকবে তুমি।

কেষ্টমোহন হাসল, বলল, কেন বাব[illegible] চিনিবাস আসবে বলে গেল যে।

—কেন রে, সে কে, সে আসবে কেন

—কে জানে।

এদের কথার এত রহস্য কিছুই বুঝতে পারলাম না। মনে-মনে ভয়টা যেন একটু একটু করে বাড়তে লাগল। এত জিনিসপত্র আছে সঙ্গে, সব খোয়া না গেলে হয়। কথাটা বলেই ফেললাম।

শুনে কেষ্ট বলল, মানটা ঠিক রাখবেন, বাবু। মাল আমি সামলাব।

—কেন রে, মান যাবে কেন!

—ও কথা থাক্। আসুন, বাবু, খেতে আসুন।

খাওয়া-দাওয়া করে এসে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। বাতার দেয়ালের সঙ্গে লাগানো সরু পলতের একটা খেলনা-দেয়ালগিরি। ঐ আলোতে ঘরের চার দেয়াল দেখতে লাগলাম।

কেষ্ট হন্তদন্ত হয়ে উপরে এসে বলল, ঐ হারামজাদাটা এসেছিল। ভাগিয়ে দিয়ে এলাম।

উঠে বসতে বসতে বললাম, কা'কে রে, কা'কে?

—চিনিবাসকে।

—ও এসেছিল কেন?

—ওর ওই কাজ। নতুন বাবু দেখলেই ওর নতুন বায়না।

একটু-যেন বুঝলাম। শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে বললাম, তোকে আমি বকশিশ দেব রে, যাবার আগে। তুই থাকবি এখানে, কেমন?

রাতে ঘুম আসতে একটু দেরি হল। সারাটা সময় চারদিকে কিসের সব শব্দ, কিসের গুঞ্জন, কিসের ফিসফিস আওয়াজ। বালিশ থেকে মাথা তুলে তুলে দেখতে লাগলাম কেষ্টমোহন জেগে, না, ঘুমিয়ে।

কখন ঘুমিয়েছি জানিনে। ঘুম যখন ভাঙল তখন রোদ উঠে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম। বারান্দার বেঞ্চে বসলাম। দাড়ি কামাবার জিনিসপত্র জড়িয়ে নিয়ে বসেছি, এমন সময় একজন বুড়ো লোক এলেন হন্তদন্ত হয়ে। বললেন, দেখি স্যার্, একটু জায়গা দিন্, বসি।

চেহারা দেখে মনে হল লোকটার বয়স সত্তর-বাহাত্তর হবে। গায়ের রং ফর্সা, চেহারা চিমড়ে, দেখতে ছোটখাটো। কিন্তু গলার স্বরটা সাফ।

কিছু জিজ্ঞাসা না করতেই তিনি বললেন, ভোরের বাস্-এ এলাম। কি রকম মনে হচ্ছে, টায়ার্ড হয়েছি। মোটেও না। বয়স কত জানেন?

বললাম, বলা কষ্ট।

উত্তরে বললেন, মোটেও না। অতি সোজা, খুবই পষ্ট। চেহারা দেখে ধরা যাচ্ছে না? আমি সেভেন্টি প্লি। তিয়াত্তর কম্প্লিট।

খুব তড়বড়ে ধরনের লোকটা। খুব ছটফটে। বেঞ্চিতে বসার পর তিনবার উঠে পড়েছেন। তিনবার চেঁচিয়ে বলে উঠেছেন,

জাল পাড়ের একটা ঘের মাত্র......

ওহে ম্যানেজার, আমি যে এসে পেঁাছে গেছি তা কি জানা হয়েছে। তা যদি হয়ে থাকে তবে তেল কই?

তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তাকাবার ধরন দেখেই তিনি ধরে ফেলেছেন আমার মনের কথাটা, বললেন, আমি এদের পাকা খদ্দের। তাই ওরা আমাকে একটু অয়েল করে।

বলেই অট্টহাস্য করে উঠলেন তিনি। বললেন, পনেরো বছর ধরে আসছি এখানে, উঠছি এই হোটেলে। লক্ষ গণ্ডা হোটেল আছে এ টাউনে, কিন্তু এইটেই আমার কাছে সবচেয়ে সেরা।

একটু বাদেই একটা কাঁচের শিশিতে করে সরষের তেল সমেত এলেন—কে ইনি?

—এই-যে এসেছ ম্যানেজার? দাও তেল দাও। এক পো আছে তো? সবটা মাখব গায়ে।

বলেই তিনি উঠে চটপট কোমরে গামছা জড়িয়ে পরনের কাপড়টা খুলে রাখলেন। তারপর তেল মাখতে আরম্ভ করলেন সর্বাঙ্গে।

ম্যানেজার বনাম মালিক বংশীধারী খাঁড়া কাল অনেক রাত্রে ফিরেছেন নাকি রামনগর থেকে তাই কাল এ'কে দেখিনি। তফাতে দাঁড়িয়ে একটু আলাপ করে, একটু হাসা-পরিহাস ক'রে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

আমি দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি। টুকিটাকি অনেক রকমের ঝামেলা নিয়ে বসেছি।

আর, ঐ বুড়ো লোকটি এসেছেন একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে, কেবল একটা গামছা সম্বল করে। তাতেই তো বেশ চালিয়ে যাচ্ছেন।

তেল মাখতে-মাখতে তিনি বলে যেতে লাগলেন যে, তিনি একজন ব্যাপারি। এখানে তাঁর আসার হেতু শাড়ি-কাপড়-গামছা কেনা। এখানকার তাঁতের জিনিস। কলকাতায় বড়বাজারে তাঁর দোকান আছে। এইটেই তাঁর ব্যবসা। বাল্যকাল থেকে এই কাজই করছেন।

এই বয়সে এমন এনার্জি আর এমন মেজাজ দেখে বেশ মজা লাগছিল। একটু আশ্চর্যও হচ্ছিলাম।

বললেন, বয়সের কথা বলছেন? আজ আমার বয়স জিজ্ঞাসা করা মাত্র বলে দেব, এমন কি জিজ্ঞাসা না করলেও বলব। কিন্তু গত বছর বয়সটা চেপে যেতাম। কেন জানেন?

—কেন?

নিচু হয়ে পায়ের গোড়ালিতে তেল ঘষতে-ঘষতে হেসে বললেন, তখন বয়স ছিল বাহাত্তর। লোকে বাহাত্তুরে বলবে—এই ভয়ে।

তাঁর হাসিতে আমিও যোগ দিলাম।

তিনি বললেন, আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় হেঁস। বুঝতে পারলেন? হ-এ চন্দ্রবিন্দু ে-কার। আপনি কদ্দিন থাকছেন স্যার্?

বললাম, আজই যাচ্ছি, দশটার বাস্-এ।

—বটে! তবে তো টাইম হয়ে গেল আপনার! আমি স্নানে যাচ্ছি, একটু দূরেই একটা চমৎকার দিঘি আছে। ওখানে একটু সাঁতরে চান করলেই কাল রাত-জাগার ধকলটা দূর হয়ে যাবে। কলকাতা থেকে খড়গপুর পর্যন্ত ট্রেনে ভিড়ও ছিল অসাধারণ।

তিনি স্নানে চললেন, বললেন, চলি তবে। আবার দেখা হবে।

কি করে দেখা হবে কে জানে। আবার কি কখনো আসব এই সী ভিউ হিন্দু হোটেলে!

হেসে বললাম, দেখা হতেও পারে।

তিনি যেন আপত্তি করে উঠলেন, বললেন, হতে পারে মানে কি। হবেই। পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর—এর মধ্যে একবারও কি আসবেন না এখানে? আমার নামটা মনে রাখবেন, এখানে এলে খোঁজ করবেন।

বললাম, মনে আছে নাম—মৃত্যুঞ্জয় হেঁস।

হেসে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়, বাঁধানো দাঁত-গুলো ঝকমক করে উঠল। বললেন, আসি।

রাস্তাটা পার হয়ে তরতর করে চলে গেলেন মৃত্যুঞ্জয়।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর স্নান থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কিন্তু অপেক্ষা আর করিনি। দশটার বাস্ ধরে চলে এসেছি সমুদ্রের কিনারে।

সমুদ্র দেখে ফিরেও এসেছি নিজের ডেরায়। কিন্তু সমুদ্রের কথা না, অনবরতই মনে পড়ে অন্য কথা। সমুদ্রকল্লোল না, অনবরতই কানে বাজে অন্য জিনিস—একটা অট্টহাসির শব্দ।

রানীশহরের কানা গলি

রাজার বাড়ীর আঁস্তাকুড়।
রানীশহরের কানা গলি।
কর্পোরেশনের ভিক্ষামুষ্টি মিটমিটে যে আলোটা জ্বলতো গলিটার শেষ প্রান্তে, সেটা আজ হঠাৎ আর জ্বলছে না। গলির মুখে এসে তাই থমকে দাঁড়াল চিত্রা। এই গলির চিত্রা সরকার।

গলিটার কথা তোলবার ইচ্ছে আমার ছিল না। গলির কথা তুলতে গেলেই ভয় হয়, এক্ষুনি বুঝি বিদ্রুপে নাক কুঁচকে বলে উঠবেন আপনারা, 'হলো শুরু? হতভাগা মানুষদের দুঃখ আর দারিদ্র্য, অপমান আর যন্ত্রণা নিয়ে সৌখিন ন্যাকামির সস্তা প্যাঁচ! এই ভাঙিয়ে আর কতদিন খাবে তোমরা লেখকরা? ওদের ওপর কি সত্যি দরদ আছে তোমাদের? মনে তো হয় না আছে। থাকলে ওদের যন্ত্রণার ইতিহাসকে ঝলমলে ঝকঝকে রঙিন মলাটে মুড়ে ওদের নাগালের উঁচুতে তুলে রেখে দিতে না আরো ঝকঝকে কোনো বিয়ের বাসরে উপহার দেবে বলে।'

জানি না একথা সত্যি বলবেন কিনা। জানি না এ প্রশ্ন আপনাদের মনে উদয় হয় কিনা। তবু গলির গল্প লিখতে গেলেই আমার মনে হয়, একথা আপনারা বলে উঠলেন বুঝি।

তবু আজ এই কানা গলিটার কথা না লিখে উপায় নেই আমার। চিত্রা সরকারের কাহিনী লিখতে হলে, কাশী পাল লেনের কথা লিখতেই হবে আমাকে।

এই গলিটার মধ্যেই তো চিত্রা সরকারের আজন্মের ইতিহাস।

আর শুধু চিত্রা সরকারের কেন, সরকারদের তিন পুরুষের ইতিহাস তো ওই গলিটার মধ্যেই জমাট হয়ে আছে। যে গলিটার সামনে দিয়ে যেতে আসতে বড় রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত নাকে রুমাল চাপা দেয়, সেই গলির ধুলোয় বসে অনায়াসে খেলা করেছে চিত্রা। আর তারও অনেক আগে চিত্রার বাবা অবনী সরকার আর জেঠামশাই অন্নদা সরকার, নির্বিকারচিত্তে ঈশ্বর-দত্ত পোশাক পরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়িয়েছে সেখানে।

পত্তন ফেলেছিল ঠাকুর্দা বরদা সরকার।

বরদা সরকার যখন গলিটার ওই শেষ কোণে তিন বাঁকা এক টুকরো জমি কিনে এতটুকু একটু বাড়ী তুলেছিল, তখন কলকাতা শহরেও গরীবের হাঁড়িতে তোলবার মত চালের মণ পোনে তিন টাকা।

তবু বরদা সরকার বাড়ীর গায়ে বালির পলেস্তারা মারতে পারেনি, ইঁটের পাঁজর বারকরা বাড়ীটুকুতেই নিজের পাঁজরের শেষ নিশ্বাস ফেলেছে।

অন্নদা সরকার আর অবনী সরকার দুই

আশাপূর্ণা দেবী

ভাই আপ্রাণ চেষ্টায় বাড়ীর সেই পাঁজরকে ঢেকেছিল একবার। সস্তা অ্যালামাটির বদলে গোলাপী একটু রংও লাগিয়েছিল, এমনকি ছাতে একখানা ঘর তুলবে বলে আদরা শুরু করেছিল।

সেই সময় চিত্রাকে ওরা রীতিমত 'মাইনে দেওয়া' ভাল ইস্কুলে পাঠিয়েছিল ফর্সা ছিটের ফ্রক পরিয়ে।

চিত্রা বাপ আর জ্যেঠামশাই দুজনের আদরিণী, কারণ জ্যেঠামশাইয়ের না হয়েছিল বিয়ে, না ছিল ঘর সংসার। ছেলেবেলায় পড়ে গিয়ে একটা হাত ভেঙে গিয়ে নামকরণ হয়েছিল তার 'নুলো অন্নদা'। সেই নামের দৌলতে বিয়ে করেনি অন্নদা সরকার। তা' মর্যাদাহীন হলেও রোজগারপাতি করেছে, আর ভাইপো ভাইঝিকে প্রাণতুল্য দেখেছে। ভাইপোর চেয়ে ভাইঝিকে বেশী।

তাই ছেলেবেলায় চিত্রা ছিল আদরিণী, গরবিনী।

কিন্তু সে আর ক'দিনই বা?

দোতলার ঘরের আদরা আদত চেহারা নিয়ে মাথা তুলে ওঠবার আগেই এইসব দুর্ভাগাদের ঘরে যা হয় তাই হল। বাড়ীর জোয়ান পুরুষ দুটো গেল! গেল তো তেমনি গেল! বেদম কলেরায় একই দিনে দু'দুটো মানুষ বেমালুম উবে গেল যেন।

রইল শুধু দশ বছরের চিত্রা, তার সতেরো বছরের দাদা, আর কে জানে কত বছরের যেন মা।

গরীবের ঘরে বয়েস বোঝা শক্ত।

দেখে মনে হতো বত্রিশও হতে পারে, বাহান্ন হওয়াও অসম্ভব নয়।

সে যাক—

পাড়ার লোকে বলাবলি করতে লাগল 'খুব ভাগ্যি যে অন্নদার একটা পরিবার নেই। নইলে একই সংসারে এক রাত্তিরে দু' দুটো বিধবা সৃষ্টি হতো!'

সায় দিল সবাই সে কথায়।

সেই 'খুব ভাগ্যি'র সংসারেই বাল্য কাটল চিত্রার, কাটল কৈশোর, আর এখন যৌবনও 'কেটে পড়বার' ঝোঁক ধরেছে। পড়বেই। যৌবন হচ্ছে সুখী প্রাণী, অভাবের সংসারে বেশীদিন টিঁকতে পারে না। সেখানে এসেই যাই যাই করে।

তবু—

বত্রিশ বছর পার করে আসা চিত্রা সেই 'যাই যাই' করা প্রাণীটাকে কি হঠাৎ একটু ধরে ফেলতে পেরেছে? তাই এক এক সময় ওর উঁচু হয়ে ওঠা গালের হাড় দুটো একটু মোলায়েম দেখায়, বিরস বিশীর্ণ ঠোঁট দুটোয় যেন লাবণ্যের ছোঁয়া লাগে, আর শ্যামবর্ণ মুখটা উজ্জ্বল শ্যাম হয়ে ওঠে।

চিত্রার ভাজ লতিকা অবশ্য অন্যকথা বলে।

বোধ করি যৌবনের প্রশ্ন মাথায় আসে না বলেই বলে, 'বড়লোকের হাঁড়ির ভাতের গুণই আলাদা। সে ভাত একবেলা খেলেও গায়ে গত্তি লাগে। এই ক'মাসেই তোমার চড়ানো গালে মাস লেগেছে ঠাকুরঝি।'

চিত্রার ভাজ চিত্রার চাইতে বোধকরি দু' এক বছরের ছোট হবে, কিন্তু কথায় ভারী ওস্তাদ। কথার জ্বালায় ভালমানুষ শাশুড়ীটাকে নাকানি চোবানি খাওয়াতো। মানুষটা মরে রেহাই পেয়েছে তার হাত থেকে।

আর চিত্রা কিছুটা রেহাই পেয়েছে আদিত্যবাড়ী চাকরী ধরে। নেহাৎ ঝি রাঁধুনীর পোস্ট না হলেও তার চাইতে খুব একটা উঁচু দরেরও কিছু না। তবু দুপুরবেলার ভাতটা তাকে ওখানেই খেতে ধরতে হয়েছে বলে দুঃখের অবধি ছিল না। কিন্তু বাড়ী এসে খেয়ে যাবার সময়-সুবিধে হচ্ছিল না—আর, তাই ওই ব্যবস্থাই পাকা করতে হয়েছিল।

প্রথম প্রথম ওদের ওখানে খেতে বসতে মাথাকাটা যেত চিত্রার, ক্রমশ সয়ে গেছে।

এখন তো মাঝে মাঝে রাতেও—

রাত বেশী হয়ে গেলেই আদিত্য-গিন্নী আদেশ জারি করেন, 'আজ আর তোর না খেয়ে যাওয়া চলবে না চিত্রা! খেয়ে যাবি। শরৎ কি বাহাদুর কেউ পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

চিত্রা প্রথম নির্দেশটা মানে, দ্বিতীয়টা মানে না। বলে, 'পৌঁছে আবার দিয়ে আসবে কি? এইটুকু তো রাস্তা।'

কথাটা ভুল নয়।

রাস্তা সামান্যই।

গলি থেকে বেরিয়ে মোড় পার হয়ে খানকতক বাড়ীর পরেই। আসতে বড়জোর মিনিট তিনেক। না, তার বেশী নয়।

এই তো—আসার সময় দেখে এসেছে

চিত্রা, আদিত্য বাড়ীর চুড়োয় গাঁথা বড় ঘড়িটায় দশটা বাজতে চার মিনিট বাকী, এখন এই গলির মুখে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে করতেই শুনতে পেল ঢং ঢং আওয়াজ শুরু হয়ে গেছে।

আদিত্য বাড়ীটাও কম দিনের নয়, বোধ করি এ পাড়ার বড় বাড়ীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে বড়ও। ওদের চুড়োয় গাঁথা ওই ঘড়িটাই তিন পুরুষ ধরে পাড়াসুদ্ধ লোকের ঘড়ির অভাব পূরণ করে আসছে। ধীর মন্থর গম্ভীর ঢং ঢং আওয়াজটা যেন প্রতিটি ধ্বনিতে মনে পড়িয়ে দিতে চায় 'আমি বনেদী, আমি অভিজাত।'

অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেন কে জানে চিত্রা সব শব্দ কটা গুনে গুনে শুনল। নিশ্চিত জানে দশবার বাজবে, তবু কেন যে হঠাৎ গোনার খেয়াল জাগল। নিজের বাড়ীর গলির মুখে ওকে অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে, লোকে কি বলবে, সেটা বোধহয় মনে পড়ছিল না—চিত্রার। ঘড়ির শব্দটা শেষ হতে যেন মনে পড়ল।

চকিত হল।

আলোটা কেন নিভে রয়েছে আজকে, ভাবল সে কথা। তারপর ভাবল, এখন মাত্র রাত দশটা, অথচ গলিটা কী নিঃসাড় নিঃঝুম! জীবনের কোনও স্পন্দন নেই। মনে হচ্ছে এর পাঁজরের খাঁজে খাঁজে ঢুকে থাকা মানুষগুলো সব মরে ঠান্ডা হয়ে গেছে।

এ গলিতে আবার ভোরের আলোর প্রবেশ ঘটবে, ওই সব মরে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া লোকগুলো আবার চোখ মেলে তাকাবে, বাসন মাজবে, কাপড় কাচবে, উনুনে ধোঁয়া দেবে, থলি হাতে ঝুলিয়ে বাজার যাবে, এ যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না এখন।

আবার মনে হল চিত্রার, চিত্রা সরকার আর যদি এ গলির মধ্যে না ঢোকে! যদি এই রাত দশটা বেজে এক মিনিটের সময় হঠাৎ হারিয়ে যায়! কী হয় তাহলে?

না, পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবার মত সস্তা আর বোকাটে ইচ্ছে নেই চিত্রার। শুধু এই গলিটা থেকে যদি পালানো যেতো! পালানো যেতো এই পাড়া থেকে, এই শহর থেকে, আদিত্য বাড়ীর সেই দোতলার ঘরটা থেকে! যে ঘরে এই দশটা রাত্তিরেও সন্ধ্যার চেহারা। সেই আলো-ঝলমলে ঘরটা আর এই অন্ধকার গলিটা, দুটোই সমান বিতৃষ্ণ করে তুলছে চিত্রাকে। এই দুটোর হাত থেকে একদিন রেহাই পেতে পারে চিত্রা। পেতে পারে সমস্ত পৃথিবীটাকে, সমস্ত আকাশটাকে। যদি এই গলির দিকে পিঠ ফিরিয়ে যেখানে হোক চলে যেতে পারে।

ভাবল এই সব।

আর ভাবতে ভাবতেই আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে ঢুকতে লাগলো গলির গহ্বরে, দু' পাশের ডাঁই করা নোংরা জঞ্জালগুলোকে আন্দাজে এড়িয়ে এড়িয়ে। ঠিক মাঝখানটায় পায়ে চলার মত সরু একটা রেখা একটু পরিষ্কার থাকে, সেটা জানা ব্যাপার, তাই পা ফেলায় ভুল হয় না। আর যদিই দু'খানা মাছের আঁশ কি পচা দু'খানা শালপাতা মাড়িয়ে থাকে, মাড়িয়েছে চটির তলায়। ওতে কিছু এসে যায় না।

ডানদিকের এই কোণটা চেপে ডাস্টবিনটা বসানো আছে।......জানে চিত্রা। তাই আগে থেকেই আঁচলটা তুলে নাকে চাপে। আস্তে আস্তে পৌঁছে যায় নিজের বাড়ীর দরজায়।

দরজায় একটা তালা ঝুলছে।

হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার অবস্থানটা আন্দাজ করে নিল চিত্রা, কাঁধের ঝোলাটা থেকে একটা দড়ি বাঁধা চাবি বার করে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে খুলে ফেলল, একবার ঘুরে দাঁড়াল, তারপর খিল পড়ার শব্দ হল।

এ শব্দে দাদা-বৌদি জাগবে চিত্রার, কিন্তু জানে—সাড়া দেবে না। প্রথম দু'-একদিন যখন দেরী হয়েছিল, শুধু সাড়া কেন বৌদি দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল, আর দাদা আদিত্য বাড়ীর গেটে গিয়ে খোঁজ নিয়েছিল, দেরী কেন।

সে দু'দিন দাদার সঙ্গেই ফিরেছিল চিত্রা। গেটের বাইরে দাঁড়িয়েছিল দাদা।

কিন্তু—নিত্যি নেই দেয় কে?

নিত্যি রুগী দেখে কে?

দেরী তো চিত্রার প্রায়ই হতে শুরু করেছে। কে কত জেগে বসে থাকতে পারে?

সারাদিনের খাটা-খাটুনির শরীর কার নয়?

বৌদি লতিকা কবে বলেছিল, 'তোমার রাতচরা বোনের জন্যে তুমি জেগে বসে থাকতে পারো থেকো, আমি পারবো না।'

দাদা অমিয় বোনকে বলেছিল, 'এভাবে কাজ করলে আদিত্য বাড়ীর কাজ করা চলবে না তোর! কাজ ছাড়তে হবে।'

তবু ছাড়া হয়নি। গরীবের সংসারে এক মুঠো টাকার মায়া চট করে ছাড়া যায় না। কাজ করা চলছিল। মাঝে মাঝে দেরীও চলছিল।

অমিয় রেগে লাল হয়ে একদিন ওদের বাড়ী ছুটেছিল, 'এ রকম চলবে না' বলতে। চিত্রা হাত ধরে থামিয়ে বলেছিল, 'পাগলামি কোর না দাদা! জেঠাইমা কি বলবেন? আজন্ম দেখছেন, আপনার লোকের মত—ওঁর কাছে যদি বা একটু রাত হয়—

অমিয় আর লতিকা তখন একযোগে বলেছিল 'তা রোজ রোজ রাত্তদুপুর পর্যন্ত দরজা খুলতে বসে থাকবে কে শুনি? এটা মেস নয়, গেরস্তর বাড়ী!'

তারপর চিত্রা একটা তালাচাবি এনে দাদার হাতে দিয়েছিল, আর চাবির ডুপ্লিকেটটা রেখেছিল নিজের কাছে। শুধু তালাচাবি নয়, বুদ্ধিটাও দিয়েছিল। সমস্যার সমাধান হয়েছে সেই থেকে।

শোবার আগে সামনের দরজায় তালা লাগিয়ে, ঘুরে খিড়কির দরজাটা দিয়ে ঢুকে খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়ে অমিয়। চিত্রা যখন ফেরে চাবি খুলে ঢোকে। আজও ঢুকল।

কিন্তু অন্যদিন গলিতে মিটমিটিয়ে একটা আলো জ্বলে। আজ নিঃঝুম অন্ধকার। এই পরিবেশের সঙ্গে কিন্তু তাল রাখল না চিত্রা, নিঃশব্দ প্রেতিনী পায়ে ঢুকে এল না। অকারণেই সাড়া শব্দ তুলল। মিছামিছি কাশল, শুধু শুধু গলা থেকে জল গড়িয়ে খেল।

তারপর ঝনাৎ করে দরজার শেকল খুলে ঘরে ঢুকল।

এই শব্দটা একটা প্রতিষেধক। এটা হাতে রইল, সকাল বেলা লতিকা কোনও কথা বলার আগেই চিত্রা বাতাসকে শুনিয়ে বলবে, 'ঘুম বটে সব একখানা! ঘুমের জন্যে যদি কেউ সার্টিফিকেট দিতে চায়, এ বাড়ীকে দিতে পারবে। বাবাঃ, যে শব্দে মরামানুষ বেঁচে ওঠে সে শব্দে ঘুমন্ত মানুষ জাগে না! আশ্চর্য্যি! সন্ধ্যে রাত্তিরে এত ঘুম!'

বাতাসকে শুনিয়ে কথা বলতে শিখেছে চিত্রা লতিকার কাছ থেকেই, এখন গুরু মারতে শুরু করেছে।

মরামানুষের তুলনার পর অবশ্য লতিকা আর চুপ করে থাকে না। বলে ওঠে, 'এ তো আর বড় মানুষের ঘর নয় যে, সারাদিন গা গড়াচ্ছে, তাই রাত দুপুরে সন্ধ্যে! গরীবের ঘরে তো ভোগের মধ্যে ওই ঘুমটুকু! তা-ছাড়া—সবাই তো আর রাতচরা পাখী হতে পারে না।'

চিত্রা মৃদু হেসে বলে, 'তা পারে না বটে! ভগবান যেমন পাখী গড়েছে, তেমনি মোষও গড়েছে! তবে জীবনের আধখানা যারা ঘুমিয়েই কাটাল, তাদের দেখলে দুঃখ লাগে।'

এ মন্তব্য চিত্রার লতিকার ওপর শোধ নেওয়া।

প্রথম যেদিন আদিত্যবাড়ী থেকে ফিরতে একটু বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল চিত্রা..., তার পর দিন সকালে লতিকা ভাল-মানুষের মত মুখ করে বলেছিল, 'রাতে বুঝি আর ফিরতে পারনি ঠাকুরঝি? সকালে ফিরলে?'

চিত্রার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল এই অসভ্য প্রশ্নে, কিন্তু মেজাজ হারায়নি। বরফঠান্ডা গলায় বলেছিল, 'হ্যাঁ এইতো ফিরছি!'

এ উত্তর আশা করেনি লতিকা। তাই লতিকার মুখও লাল হয়ে উঠেছিল, আর সেও চিত্রার মত ঠান্ডা সুর ধরেছিল, 'এটা কিন্তু ওদের অন্যায়! একটা ভদ্রঘরের মেয়েকে এভাবে রাতদিন খাটিয়ে নেওয়া!'

চিত্রা বলেছিল, 'তা খোরপোষের ঝি

রেখেছে, দরকার মত খাটিয়ে নেবে না? ভদ্রঘরের মেয়ে বলে ছেড়ে কথা কইবে? আমি যদি বাড়তি সুবিধা নিতে চাই, নিশ্চয়ই বলবে 'না পোষায় ছেড়ে দাও।' তা তোমরা বল তো ছাড়ি।'

এবার আর লজ্জায় নয়, রাগে মুখ লাল হয়ে ওঠে লতিকার। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, 'কেন, এসপার আর ওসপার ছাড়া মাঝখানে কিছু থাকতে নেই?'

বলেছিল, আর সেই অবধি রাত হলেও সহজে কিছু বলে না।

চিত্রাও আগের মত ওদের ঘুমের বিঘ্ন ঘটাবার ভয়ে চোরের সাবধানে ঢোকে না। জানে জেগে ওরা আছে, ইচ্ছে করে সাড়া দিচ্ছে না। ভাব দেখাচ্ছে—গভীর রাত! তাই চিত্রা যত পারে সাড়াশব্দ করে, আর সকালে লতিকা কথা বলার আগেই বলে, 'বাবাঃ কী ঘুম!'

লতিকা ভুরু কোঁচকায়, কথা বলে না।

কি জানি যদি চিত্রা আবার 'খোরপোষের ঝিয়ের কথা তোলে। ওটায় লতিকার একটু লজ্জার ব্যাপার আছে। আদিত্যবাড়ীর ওই চাকরীটার সন্ধান লতিকাই এনেছিল, আর অমিয়কে তার সুবিধে বোঝাতে বসেছিল কিন্তু শুনেই প্রথমটা দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল অমিয়। বোকে ধিক্কার দিয়ে বলেছিল, 'কোন মুখে বললে এ কথা? ও আবার একটা চাকরী নাকি? ওতো ঝিগিরি।'

চিত্রা তৎক্ষণাৎ মিহি গলায় বলেছিল, 'তা ওতে আর বিচলিত হবার কি আছে দাদা! এখন যা করছি তাই-ই তো। এ না হয় সরকারগিন্নীর কাছে করছি, সে না হয় আদিত্যগিন্নীর কাছে ক'রতে হবে। তফাতের মধ্যে এক জায়গায় মোটা মাইনে আছে, আর এক জায়গায় সে ঘরে শূন্য!'

এ অপমান সহ্য হয়ে যাবার কথা নয়।

অতঃপর লতিকা প্রশ্ন করে উঠেছিল, 'ভাইয়ের ঘরে সংসারের দুটো কাজে এত অপমান জ্ঞান? একেবারে ঝিগিরির সঙ্গে তুলনা? হাত পা কোলে করে বসে বসে শুধু গরীব ভাইটার ঘাড়ে চেপে খাওয়াই বুঝি খুব মর্যাদার?'

বোনের মুখের ওপর এই ভাতের প্রসঙ্গে অমিয় থতমত খেয়েছিল। বলেছিল—'আহা ওসব কথা কেন? ওসব কথা কেন?' কিন্তু ওর বেশী না। দাদার মহিমা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল।

'কেন আর!' লতিকা বেজার মুখে বলেছিল, 'যাকে সংসার চালাতে হয় সেই বুঝবে কেন! তুমি তো ওই চিমটিভোর টাকা কটা ফেলে দিয়ে খালাস, এই বাজারে আমি যে কিভাবে চালাচ্ছি—'

এবার আর কথা কইতে পারেনি অমিয়।

আর চিত্রা হঠাৎ ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠে ঝট করে বেরিয়ে গিয়েছিল ছেঁড়া চটিটা পায়ে গলিয়ে।

অমিয় মাথা হেঁট করে চুপ করে বসেছিল। লতিকাও সামনে বসে থাকতে পারেনি, পালিয়ে বেঁচেছিল।

কিন্তু লতিকারই বা দোষ কি?

আইবুড়ো একটা ননদ চিরকাল গলায় গাঁথা থাকবে, এ আবার কোন মেয়েমানুষটার ভাল লাগে? বড়লোকের ঘরেই অসহ্য হয়, আর এ তো সত্যিই অদাভক্ষ্য ধনুর্গুণের ঘর।

যতদিন 'বিয়ে হয়ে গেলে বাঁচা যাবে' বলে সামান্যতম আশাটুকুও ছিল, ততদিন কি লতিকা ননদকে খাওয়ার খোঁটা দিয়েছে? আশা যখন নিতান্তই নির্মূল হল, তখনই না? তিরিশ পার হয়ে গেল, আর আশা কোথায়?

কাশী পাল লেনের এই গলিতে চিত্রার বয়সী ছেলেগুলোই যে বিয়ে হয়ে তিন-চারটে ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে বসেছে! মেয়েদের কথা বাদই যাক।

কিন্তু চিত্রার বিয়ের চেষ্টাটা কে করবে করল? একদিনে তো তিরিশ পার হয়নি?

না চেষ্টা কেউ করেনি। একে একে তিরিশ পার হতে দিয়েছে।

লতিকা যদি বা প্রসঙ্গ তুলেছে, অমিয় উড়িয়ে দিয়েছে। 'সম্বন্ধ করতে যাবো মানে? কিসের ভরসায় যাবো? টাকা কানাকড়ি আছে?'

'তা বিয়ে তো দিতে হবে' এ যুক্তি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিল লতিকা, অমিয় আরও একটা ঝাপটা দিয়েছিল, 'ওসব 'দিতেই হবে' বলে কোনও কথা নেই আজকাল! বলে কত বড় বড় লোক ধাড়ী ধাড়ী মেয়ে নিয়ে বসে আছে, বিয়ের নাম করে না। মেয়েছেলের বিয়ে দিতেই হবে, এ বাধ্যবাধকতা কেউ আর মানে না এখন! আমি তো কোন ছার!'

'তা হলে হবে না বিয়ে?'

'ভাগ্যে থাকলে হবে। তাড়াতাড়িই বা কী এত?'

দার্শনিকের মত উত্তর দিয়েছিল অমিয়। নিজে যে একসময় 'বিয়ে পাগলা' হয়ে মাকে উত্ত্যক্ত করেছিল, আর মা যখন বলেছিল 'ষোলো বছরের মেয়ে রেখে কে কবে তেইশ বছরের ছেলের বিয়ে দেয়?' তখন মাকে 'স্বার্থপর' বলে গাল দিয়েছিল, সে কথা আর মনে পড়েনি তখন।

কিন্তু অমিয়রই বা দোষ কি?

জীবনে যাদের ভোগ্য বলতে কিছুই জোটে না, তারা একটা অন্তত ভোগাবস্তুর জন্যে লালায়িত হবে বৈ কি, যেটা বৈধ হয়ে হাতের মুঠোয় থাকবে। বিয়েকে পিছিয়ে রাখতে পারে তারাই, যাদের ভোগের উপকরণ অনেক আছে। কাশী পাল লেনের অমিয়রা পারে না। তারা 'বিয়ে পাগলা' হয়।

তবে চিত্রাদের কথা আলাদা।

চিত্রাদের বিয়ে পাগলা হওয়ার উপায় নেই,

মানায় না। তাই অমিয় যখন বলেছিল 'এত তাড়াতাড়ি কি?' তখন ভাইকে মনে করিয়ে দিতে পারেনি চিত্রা, তেইশ বছর বয়েসটাকে অনেকদিন পার করে ফেলেছে সে! মনে করিয়ে দিতে পারেনি। শুধু নিজের মন থেকে স্বপ্ন আর কল্পনা, আশা আর আশ্বাসকে মুছে ফেলেছিল বেহুঁশ অমিয় সরকারের গলায় গাঁথা আইবুড়ো বোন চিত্রা সরকার।

হ্যাঁ, সেদিন লতিকা কোথা থেকে যেন শুনে এসে প্রথমে চিত্রাকেই বলেছিল, 'আদিত্য-বাড়ীর গিন্নীর নাকি খুব প্রেসার, সর্বদা কাছে থাকে এমন একটি ভালঘরের মেয়ে খুঁজছেন। নিজের মেয়ে তো সুন্দরী বিবিটি, তায় আবার ঘরজামাইয়ের বৌ মায়ের দিকও মাড়ায় না। আর নার্সগুলো তো নোংরার একশেষ। ঝিগুলো নাকি—'

চিত্রা ভুরু কুঁচকে বলেছিল, 'তা আমায় এ সব কথা শোনাতে এসেছ কেন?'

লতিকাও উল্টে ভুরু কুঁচকেছিল, 'শোনাতে কিছুই আসিনি। অমনি শুনলাম, তাই বললাম। মানুষে তো এমন চেনা-জানা থাকলে দেখতে যায়। শুনেছি তো পাই ওই বাড়ীতেই খেলার আড্ডা ছিল তোমাদের ছেলেবেলায়।'

কথাটা শুনে হঠাৎ থমকে গিয়েছিল চিত্রা, আর অনেকদিনের পুরনো একটা ছবি চোখের উপর ভেসে উঠেছিল তার।

সত্যিই খেলার জায়গা ছিল ও বাড়ীটা।

নিতান্ত যখন ছোট ছিল আর ফর্সা ফ্রক পরে স্কুলে যেত, যখন অবস্থার তারতম্য বোঝার ক্ষমতা ছিল না, তখন নিঃসংকোচে বড়লোকের গেট ডিঙিয়েছে। একটু বড় হতে আর ডিঙোতে পারেনি। সে সংকোচ সমস্ত সহজের উৎস-মুখে পাথর হয়ে বসেছে।

অবশ্য ছেলেবেলায় একা চিত্রাই যেত না, পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়ের 'আদিত্যদের বাগান' টাই ছিল খেলার জায়গা।

ওদের ওই গম্বুজতোলা, আকাশে ছায়া ফেলা, চুড়োয় ঘড়ি বসানো বাড়ীটা ছিল পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এক অপূর্ব রোমাঞ্চময় আকর্ষণ!

ওই মাঝে মাঝে ঝাউগাছ দেওয়া বাগান, ওই উঁচু লোহার গেট, গেটের ধারে পোশাক-পরা দারোয়ান, সে এক বুক-ছিমকরা ভাল-লাগা।

অবশ্য আসল ভাল লাগার উৎস ছিল ফোয়ারা আর লাল মাছ! একালের টেবিলে বসানো ছোট্ট একটা কাঁচের বাক্সয় ভরা কালো কালো লালমাছ নয়, সে একেবারে অন্য। লোহার রেলিং ঘেরা গোল একটা ফোয়ারার চৌবাচ্চা, তার মাঝখানে এক পরীমূর্তি, যার দু' হাতের অঞ্জলি থেকে উপচে উঠছে ফোয়ারার জল, আর সেই জলে সোনালী ল্যাজওয়ালা স্ফটিক-স্বচ্ছ লালমাছগুলি শিশুচিত্ত বিমোহিত করে দুরন্ত খেলা খেলে বেড়াচ্ছে। অদম্য আকর্ষণ!

তাই পাড়ার ছেলেরা বিকেলে আদিত্য-বাড়ী ছাড়া আর কোথাও নেই।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়।

রাস্তার আলটু বালটু ছেলে, এমনকি কাশী পাল লেনের হাড়হাভাতেদের মেয়ে-ছেলেগুলো পর্যন্ত এ বাগানে প্রবেশাধিকার পেত কি করে?

পাওয়া তো সম্ভব নয়।

নয়। সত্যিই নয়।

তবু পেতো।

তখনকার মালিক প্রমদারঞ্জন আদিত্য ছিল একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের। বয়সে হয়েছিল বিজ্ঞ, চালচলন ছিল যেমন তেমন। লোকে বলতো 'মোদো মাতাল তো! তাই প্রেস্টিজ জ্ঞান নেই। বেশী মদ খেলে, ওই রকমই হয়ে যায় শেষটা।'

তা সেটা যদি সত্যি হয়, পাড়ার শিশুদের পক্ষে প্রমদারঞ্জনের মদের বোতলগুলো আশীর্বাদস্বরূপ ছিল বলতে হয়।

প্রমদারঞ্জন ওদের ডেকে ডেকে বাগানে ঢোকাতেন, বলতেন 'আয় আয় ছোঁড়ারা, মাছের নাচ দেখবি আয়। দেখি কে কটা গুলি তাক্ করতে পারিস।'

না বারুদের গুলি নয়, ময়দার গুলি।

প্রমদারঞ্জনের খাস চাকরের দুপুরবেলার কাজ ছিল একতাল ময়দা মেখে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে রাখা। প্রমদারঞ্জন মুঠো মুঠো বিলোতেন ছেলেদের, মাছকে খাওয়াবার জন্যে।

গোল চৌবাচ্চাটা ঘিরে দাঁড়াত ওরা, ময়দা ছুঁড়তো তাক্ করে, আর মহোল্লাস ধ্বনিতে ভরে উঠতো বিকেলের বাতাস। প্রমদারঞ্জনের উল্লাসই বেশী। কে বলবে এই লোকটাই আর ঘন্টা দুই-তিন পরে গাড়ী হাঁকিয়ে খারাপ বাড়ী যাবে, মদ খাবে, আর অন্য এক-রকম উল্লাস ধ্বনিতে বাহবা দেবে কুৎসিত নাচগানকে।

এ এক রহস্য ছিল।

তবে পাড়ার মহিলারা সহানুভূতির সঙ্গে বলতেন, 'আহা মানুষটার প্রাণে কি কিছু সুখ আছে? মড়ুঞ্চে পোয়াতি পরিবার, সাতবারে একটা জ্যান্ত ছেলের মুখ দেখাতে পারল না। যদি বা একটা জীইয়েছে তো সে একটা পুয়ে' পাওয়া মেয়ে। — বারোমাস বিছানায়। ছেলেপুলেকে তাই অত ভালবাসে। আর পুরুষ বেটাছেলে, পয়সা আছে, কাঁহাতক আর রুগ্ন পরিবারের মুখের সামনে বসে থাকবে।'

মহিলারাই বলতেন স্বজাতি প্রেমের মুখে ছাই দিয়ে।

কিন্তু এই শিশুবাহিনীর মধ্যমণি প্রমদা-রঞ্জনের উৎফুল্ল মূর্তি দেখলে, মনে করবার কারণ হত না, লোকটার মনে সুখ নেই। ময়দার গুলি তাক করতে করতে হঠাৎ হো-হো হাসি হেসে বলে উঠতেন, 'এই ছোঁড়ারা মাছের নাচ দেখবি তো দেখ, খবরদার উলঙ্গ পরীর দিকে দিষ্টি দিবি না। দিলি কি, উচ্ছন্ন গেলি।'

বলা বাহুল্য তৎক্ষণাৎ সব ক' জোড়া চোখই সেই নিষিদ্ধ বস্তুর দিকেই উৎক্ষিপ্ত হতো, আর হেসে গড়িয়ে পড়তো সব কটা!

প্রমদারঞ্জন বলতেন, 'এই চোপ্! তাকালে কেউ ময়দা পাবি না।'

ওরা হৈ হৈ করে উঠত, 'না জ্যেঠামশাই না! আর তাকাব না। ময়দা দিন, ময়দা দিন।'

'জ্যেঠামশাই' ডাকটা প্রমদারঞ্জনেরই সখ।

চিত্রাও ডাকতো! তবে পাকা চোকা বাক্য-বাগীশ মেয়েটা 'আপনি' বলতো না। বলতো 'তুমি'।

তা সেই তুমি দিয়েই বলতো তীব্র ভর্ৎসনার সুর আর চোখ নিয়ে, 'পরী যদি দেখতে মানা, তো লোকের চোখের সামনে রেখেছ কেন দাঁড় করিয়ে? অসভ্য!'

প্রমদা হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। 'আরে আমি কি রেখেছি? রেখেছে আমার বাপ!'

'তুমি ভেঙে দিতে পার না?'

'ভেঙে? আমি ভেঙে দেব? বাবার সখের জিনিস—'

'তোমার বাবা তো মরে গিয়ে স্বর্গে চলে গেছে। সত্যিকার পরী ভগবান সবই দেখছে, ওই পাথরের পরীর কথা মনে আছে বুঝি তার? ভেঙে দিলে কাঁদবে বুঝি?'

প্রমদারঞ্জন কেমন একরকম হেসে উঠে বলতেন, 'স্বর্গে গেছে? তাই মনে হয় তোর?'

'তা মরে গেলে স্বর্গে যাবে না? পৃথিবীতে পড়ে থাকবে?'

প্রমদারঞ্জন যেন এই পাকা-চোকা ঠোঁট-কাটা মেয়েটার কাছে ভাগ্য-গণনা করাতে এসেছেন, আলগা অসহায় সুরে বলতেন, 'ঠিক বলেছিস? ঠিক? আমি কিন্তু ঠিক করতে পারি না—স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কোথায় ঠাঁই হল ওদের! বুঝতে পারি না, তাই ভারী রাগ হয়। এক একদিন ইচ্ছে করে সব ভেঙে দিই। সব। ভেঙে ছাতু করে দিই। এই পরী পুতুল, থাম গেট ঘরবাড়ী—'

'বাড়ী ভাঙবে মানে?' চিত্রা দেখতে পাচ্ছে সেই সেদিনের ফ্রক-পরা মেয়েটা ঝংকার দিয়ে উঠল, 'ঘড়িটা ভেঙে যাবে না তা' হলে?'

'যাক না! যাক। সব যাক!'

'আহারে আমার আহ্লাদ' মেয়েটা আরো ছিটকে উঠেছিল, 'বিচ্ছিরীটা ভাঙবে বলে, ভালটাও ভাঙতে হবে? রাস্তার লোক ওই
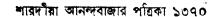
ঘড়ি থেকে দেখে নেয় কটা বাজল, আর উনি ভেঙে দেবেন!'

প্রমদারঞ্জন উদাস হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আচ্ছা থাক, তবে আর ভাঙলাম না। কিন্তু ক' দিন আর দেখবে লোকে ক'টা বাজল? বারোটা যে বেজে এসেছে, তার ঘণ্টা শ্‌নতে পাচ্ছি। সেই ঘণ্টা এসে যাবে, ঘড়ি থেমে যাবে।'

চিত্রা এ সব গোলমেলে কথার মানে ব্‌ঝতে পারেনি, অবাক হয়ে বলেছিল, 'থেমে যাবে কেন? দম দেবে না আর?'

'দম!'

হা হা করে হেসে উঠেছিলেন প্রমদারঞ্জন, 'দম আর দেবে কে? আদিত্য-বংশের দমটাই যে ফ্‌রিয়ে গেছে। শেষ আদিত্য প্রমদা-রঞ্জনের ভেতরে পচ্‌ ধরেছে, গলতে যে কটা দিন! তারপর রইলেন নীলাম্বরী দাসী, আর তাঁর আদরিণী কন্যে!'

চিত্রা তখন জানত না নীলাম্বরী দাসী কার নাম? চিত্রা তখন ওসব কথার মানে ব্‌ঝতে পারেনি। ভেবেছিল, বাবা ঠিকই বলেন, 'প্রমদাবাব্‌ একটা ক্ষ্যাপা!'

এখন আর চিত্রা সে কথা ভাবে না। এখন চিত্রা সেই মরে যাওয়া ক্ষ্যাপাটে মান্‌ষটাকে মনে মনে দার্শনিকের সম্মান দেয়। ভাবে তা' সত্যি, কালের ঘণ্টা ঠিকই শ্‌নতে পেয়ে-ছিলে তুমি। দেখতে পাচ্ছি, সব যেতে বসেছে। তোমাদের চুড়ো গম্ব্‌জ দেউড়ি-দালান সব কিছ্‌তে ঘ্‌ণ ধরেছে।......

ঘড়ির কাঁটাটা শ্‌ধ্‌ যান্ত্রিক নিয়মে নির্ভুল সংকেতের আঙ্‌ল বাড়িয়ে থাকে, নির্ভুল নিয়মে গম্ভীর বনেদী আওয়াজে সমস্ত এলাকাকে অবহিত করিয়ে রাখে। যেন বলে, 'আমি আছি, আমি আছি।'

কিন্তু ক'দিন থাকবে আর?

ক'দিন থাকবে? নীলাম্বরী দাসী—আর তাঁর আদরিণী কন্যা কালের কাজ এগিয়ে

চিত্রা বলেছিল, তা আমায় এসব কথা শোনাতে এসেছ কেন?

দিতে সাহায্য করছেন।

ছেলেবেলাকার সব ছবিটা চোখে জেগে উঠেছিল, তবু চিত্রা ঠাণ্ডাগলাতেই লতিকাকে বলেছিল, 'ছোটবেলায় খেলতে যেতাম এই সুবাদে গায়ে পড়ে আবার ভাব ঝালাতে যাব? এটাই কি তোমার আসল বক্তব্য নাকি? মতলবটা খুলে বল দেখি?'

তা ননদকে মতলব খুলে বলে মান খোয়াতে যায়নি লতিকা, বলতে গিয়েছিল বরকে। তার পরিণামে ছেঁড়া চটিপরা চিত্রাকে একেবারে ছিটকে নিয়ে গিয়ে ফেলল আদিত্যগিন্নীর আসনে।

যে বাড়ীতে ষোলো বছরের মধ্যে আর ঢোকেনি চিত্রা।

ষোলো বছর আগে—শেষ এসেছিল নীলাম্বরী দাসীর আদরিণী কন্যার ঘটার বিয়েতে। কাশী পাল লেন ঝেঁটিয়ে সবাই এসেছিল। উপযুক্ত গয়না কাপড় না থাকলেও এসেছিল। কিছু বা ভয়ে কিছু বা কৌতূহলে, কিছু বা লজ্জায় পড়ার আশঙ্কায়। না গেলে যদি পড়শীরা ভাবে নেমন্তন্ন হয়নি তার।

তা' চিত্রাও এসেছিল মায়ের সঙ্গে। তখন তো—চিত্রার নিজের বিয়ে সম্বন্ধে শেষ রায় লেখা হয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠেনি। তখনো তার মনে অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। তা' ছাড়া কৌতূহল।

বয়সজাত কৌতূহল ছাড়াও, আর একটা উগ্র কৌতূহল ছিল। বর নাকি ঘরজামাই! মানে ঘরজামাই হতে এসেছে। নিরভিভাবক নীলাম্বরী দাসীর অভিভাবক চাই, তাই।

চিত্রার কৌতূহল তাতেই আরো উদগ্র। 'ঘরজামাই' মানেই তো একটা নিঘিন্নে জীব! ওই বরটা অমন রূপ নিয়ে অমন বিদ্যে-সাধ্যি নিয়ে সেই ঘৃণ্য জীব হতে এসেছে? ছি ছি, কেন?

মুখোমুখি কথা কয়ে যদি জিজ্ঞেস করা যেত!

তার উপায় ছিল না।

কাশী পাল লেনের নিমন্ত্রিতরা বাসরে গিয়ে উঠবে, এত প্রশ্রয় নীলাম্বরী দাসীর নেই।

তবু লোক তিনি খারাপ নন।

পরিবেশনের সময় ডাক-হাঁক দিয়ে হুকুম করেছিলেন, 'ওরে, গলির নেমন্তন্নিদের যেন কিছু কসুর না হয়! ভালমন্দ জিনিস ফিরে ফিরতি এনে দেখাবি। ভালঘরের কাজে-কর্মে ওরা আর কবে কোথায় যাচ্ছে!'

গলির সবাই বলাবলি করেছিল, কী উঁচু মন! এতবড় কাণ্ডকারখানার মধ্যেও চুনো-পুঁটিদের দিকে ষোল আনা নজর।

কিন্তু কেন কে জানে, সেদিনের উৎসবে চিত্রার ষোল আনাই লোকসান হয়েছিল। কেন কে জানে, হঠাৎ মনটা তার ভারী খিঁচড়ে গিয়েছিল। নেমন্তন্ন খায়নি, চলে এসে মায়ের কাছে খিঁচুনি খেয়েছিল। মা বিধবা মানুষ নিজের খাবার উপায় ছিল না তার, তবু বড়লোকের বাড়ীর ভোজটা ওরা খেলেও সুখ। অমিয় অবিশ্যি ত্রুটি করেনি, কিন্তু চিত্রার এ কী ঢং।

ঢং ঢং ঢং!

কী হ'ল! আবার এক্ষুনি কী বাজছে?

এগারটা?

তাই হবে। গোড়া থেকে গোনা হয়নি! কিন্তু এক্ষুনি এক ঘণ্টা কেটে গেল? কী ভাবছিল এতক্ষণ চিত্রা? শোয়ওনি তো, এখনো বসেই আছে বিছানাটায়।

যদি অবশ্য চৌকীর ওপরকার এই ছেঁড়া-কাঁথা আর তুলোঝরা বালিশটাকে বিছানার মর্যাদা দেওয়া হয়।

ভ্যাপসা একটা গন্ধ আসছে কোথা থেকে! এই বিছানার? চালিতে তোলা ছেঁড়া কম্বল আর পচা কাঁথার? না কি চৌকীর তলায় বৌদি সদ্য দেওয়া বড়ির টিন আর ছাতাপড়া তেলআমের বোয়েম রেখে গেছে? হয়তো তাই।

তাই রাখে।

এই ঘরেই রাখে।

চিত্রাকে যে আস্ত একখানা ঘরের মালিক করে রেখে দিতে হয়েছে, এই আক্রোশে যাবতীয় জঞ্জাল এই ঘরে এনেই ভরে লতিকা। ঘরখানার ওপর অন্য দখল চলে না। লতিকার বুড়ো ধাড়ী ছেলেটা মায়ের কাছে ছাড়া শোয় না। আর লতিকা শোয় না বরের কাছ ছাড়া। কাজেই অন্নদা সরকারের পরিত্যক্ত ঘরখানার অধিশ্বরী চিত্রা।

তা' এই কি কম লাভ চিত্রার?

কাশী পাল লেনের কটা আইবুড়ো-মেয়ের এ সৌভাগ্য আছে? নেহাৎ নাকি বরদা সরকার গলির শেষ সীমায় তিনবাঁকা এই জমিটুকু কিনেছিল, আর পাঁজরা বার-করা দুখানা ঘর তুলেছিল তাতে, তাই না? তার সেই ঘরই আজ রাজার ঐশ্বর্য?

সেই ঘর দুখানা আছে বলেই আজ তার বংশধর মাথা গুঁজে পড়ে আছে। আর বংশ-ধর না হলেও এখনো পর্যন্ত গোত্র ছাড়া হয়ে যায়নি বলে যে এ ঘরের দাবীদার, সে সময়ের জ্ঞান ভুলে অকারণ ভাবনা ভাবছে। অবনী সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ চিত্রা, সংসারের আরও চারটি সদস্য না বাড়িয়ে যাওয়ার জন্যে।

এ ঘরে যদি আরো দু' চারটে জীব আশ্রয় নিতে আসতো? নিশ্চয় ঘরে ঢুকেই ওই ভ্যাপসা গন্ধ বালিশটায় গাল রেখে শুয়ে পড়তো চিত্রা। আর এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তো যে, দেখে মনে হতো না জগতে চিন্তা আছে, ভাবনা আছে।

কিন্তু এত কিসের ভাবনা চিত্রার?

আদিত্য-গিন্নীর নেক্ নজরে পড়ে, আর তার মেয়ে কৃষ্ণার কৃপাদৃষ্টি লাভের ভাগ্য অর্জন করে দিব্যিই তো আছে সে।

নিয়োগের সময় তো শুধু 'হাতখরচার' কথা উঠেছিল, কিন্তু আদিত্য-গিন্নী সমানেই শাড়ী ব্লাউস সায়া চটি ভাল তেল ভাল সাবান সরবরাহ করছেন। আর সময় সুবিধের অজুহাতে একবেলার অন্ন তো বরাদ্দ করেইছেন, কাজের গতিকে রাত হয়ে গেলে রাতেরটাও দিচ্ছেন। সে খাওয়া কাশী পাল লেনের অমিয় সরকার লতিকা সরকারেরা চক্ষেও দেখেনি।

চিত্রা অবশ্য প্রথম প্রথম বাড়তি কিছু নিতে চাইত না, কিন্তু আদিত্য-গিন্নী স্নেহের দাবী তুলেছেন। বলেছেন, নিজেকে যেন তাহ'লে মাইনে করা লোক বলেই মনে করে চিত্রা। 'জ্যেঠাইমা' বলে যেন না ডাকে তাঁকে। বলেছেন, তাঁকে যেন এত মায়া মমতাও না করে। মাইনেকরা লোকের ব্যবহার তো আদিত্যবাড়ীর গিন্নীর অজানা নয়। তেমনিই করুক চিত্রা।

অগত্যাই নিতে হয়েছে সব।

আর দেখে লতিকা ঈর্ষার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে, 'তখন আমি বড় মন্দ হয়েছিলাম! এখন দেখ? এত সুখ এত আয়েস তুমি ভায়ের ঘরে কখনো পেয়েছ, না বিয়ে হ'লে বরের ঘরে পেতে? বিয়ে হলে তো এই আমার মতনই বিয়ে হতো? আর যে সুখ আমি করছি তাই করতে। এ বাবা একেবারে বড়লোকের গিন্নীর পুষ্যিকন্যে হয়ে বসেছ। মার্বেলের ঘর, ইলেক্‌ট্রিকের হাওয়া, গন্ধ তেল, দামী সাবান, ভাল ভাল শাড়ী জামা - বাকীটা কি? নেহাৎ রাতটুকু আসছ দয়া করে, নইলে পালঙ্কে শোওয়ার সুখটাও জুটতো।'

লতিকার বাক্যবিন্যাসভঙ্গী তীব্র, কিন্তু মিথ্যে তো নয়।

আদিত্য বাড়ীর পুষ্যিকন্যার সামিলই হয়ে উঠছে ক্রমশ চিত্রা সরকার।

তবে?

তবু তার এত ভাবনা কিসের?

কেন রাত জেগে বসে ভাবে, সেদিন যদি মেজাজটা অত গরম না করতাম! যদি রাগের মাথায় তেড়ে গিয়ে না বলতাম। জ্যেঠাইমা, শুনলাম আপনার লোকের দরকার!'

নীলাম্বরী দাসী প্রথমটা চিনতে পারেননি, ভুরু তুলে বলেছিলেন, 'দরকার তো নিশ্চয়। কিন্তু তোমায় তো চিনতে পারছিনা। লোকের দরকার, কে বললে তোমায়?'

কে বললে সে কথা না তুলে চিত্রা বলেছিল 'চিনতে পারছেন না? আমি সরকারদের মেয়ে। জ্যেঠামশাই থাকতে কত এসেছি—'

'অ বুঝেছি! নুলো অন্নদার ভাইঝি! কতদিন আগে দেখেছি! চেহারা পাল্টে গেছে। নামটা যেন কি?'

চিত্রা।'

'হ্যাঁ মনে পড়ছে। তা' এমন দশা কবে হ'ল? বিয়ে শুনলাম না, একেবারে বিধবা দেখছি—'

বিধবা!

অবাক হয়ে গিয়েছিল চিত্রা। পরক্ষণেই নিজের আবরণ আর আভরণের দিকে তাকিয়েছিল। নীলাম্বরী দাসীর দোষ নেই! আর কি মনে হয় চিত্রাকে দেখে? যার থেকে সস্তা হয় না তেমনি একখানা সরু নীল পাড় শাড়ী, গায়ে দাদার ছেঁড়া টুইল শার্টের পিঠ থেকে তৈরি একটা ব্লাউজ নামধারী আবরণ। ব্যস!

আগে হাতে দু'গাছা প্লাস্টিকের চুড়ি থাকতো, ইদানীং ঘেন্নায় দূর করে দিয়েছে। সিঁদুর নেই, লোহা নেই, শুধুহাত, বত্রিশ বছরের একটা রোগা কাঠ মেয়েকে, আর কি ভাবা যায়?

তবু চটকরে উত্তর দিতে পারেনি।

উদ্ধার করেছিল কৃষ্ণা।

হেসে গড়িয়ে পড়ে বলেছিল, 'ওমা, ওর আবার বিয়ে হ'ল কবে?'

'আ কপাল! তবে এ মূর্তি কেন? তা —বিয়ে জোটেনি একটা? ভাই তো আছে? না কি সে ও—'

কৃষ্ণা আবার হেসেছিল, 'না না সে আছে। সে নিজে দিব্যি বিয়ে টিয়ে করে মজায় আছে। আমি তোদের গলির সব্বাইয়ের খবর রাখি, বুঝলি চিত্রা? আমার একটি খবর সাপ্লায়ার আছে—'

আদিত্য গিন্নী পানদোক্তার ডাবর থেকে একটা পান তুলে নিয়ে এগিয়ে ধরেছিলেন 'নে খা'! 'কর্তার আমলে কত চকোলেট লজনচুষ খেয়েছিস, এখন একটা পানই খা।'

'না পান খাইনা।'

'তবে যা! 'বলি লোক চাই এ খবর পেলি কোথায়?

'বলেছে একজন। আপনার শরীর খারাপ, তাই—'

আদিত্য-গিন্নীর শরীর খারাপের কোনও লক্ষণ অবশ্য চিত্রার চোখে পড়েনি সেদিন, এখন পড়ে। দেখছে শরীরের মধ্যে সর্বপ্রধান অঙ্গটাই খারাপ। উত্তমাঙ্গ। কিন্তু নীলাম্বরী নিজে তা বলেননি। মাথার কথা তোলেননি।

বলেছিলেন, 'শরীর খারাপ! সে কথা আবার বলতে। শরীরটি একেবারে রোগের কুঠি হয়ে উঠেছে। পেটে কষ্ট বুকে কষ্ট হাতে-পায়ে কষ্ট। সর্বদা হাতে হাতে একটা লোকের দরকার। তা' দু দুটো ঝি চুরি করে পালাল! রাতে ঘরে থাকতো, আমার ঘুমের অবসরে—নিয়ে-থুয়ে হাওয়া! আর আত্মস্বজন যারা আছে, সব নেমকহারামের ঝাড়! এ সংসারে কত খেয়েছে মেখেছে, এখনো ঘাড়ে বসে কাঁঠাল ভাঙছে, কিন্তু আমায় একটু দেখার বেলায় নেই। তা'হলেই না কি মান মর্যেদা গেল তাঁদের। ঝি হয়ে গেলেন! দেব সব দূর করে। বেইমানের ঝাড় নির্মূল করে উপড়ে ফেলব। তা যাক সে কথা, ভাল লোক সন্ধানে আছে না কি?'

চিত্রা মুখ তুলে একটু হেসে বলেছিল, 'ভাল কি না জানি না, তবে লোক আছে—'

'ওমা তা একেবারে সঙ্গে করে আনলি না কেন?'

'সঙ্গে করেই তো এনেছি!'

নীলাম্বরী দাসী—সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন কোথায় সেই লোক, ততক্ষণে কৃষ্ণা রহস্য ভেদ করে ফেলেছিল। চোখ কপালে তুলে বলেছিল, 'কাজ কি তুই নিজে করবি নাকি?'

'দোষ কি? জ্যেঠাইমা গুরুজন, আপনার লোকের মত। আমারও অগাধ সময়। ও'র সেবা যত্ন কর'বো, ভালই তো। তবে রাতে থাকতে পারব না।'

রাতে থাকতে পারব না।

এই একটি মাত্রই শর্ত ছিল চিত্রার।

রাতে কি করে থাকবে? যতই বত্রিশ বছর বয়েস হোক আর অভাবে পড়ে কাজ করতে আসুক, ভদ্রঘরের কুমারী মেয়ে। অন্যত্র রাত কাটানো চলে না তার। রাতেই ভয়, রাতেই লজ্জা, রাতেই নিন্দে। দিনের বেলা পরের বাড়ীর বাসন মেজে আসতে পারো তুমি, তাতে এত কিছু ধরা পড়বে না। কিন্তু তোমার রাতের গতিবিধির দিকে সবাই চেয়ে আছে শ্যেন দৃষ্টি মেলে। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মানো—অমনি না! মেয়েমানুষের রাতে বাড়ীর বাইরে থাকা মানেই বাড়ী থেকে আউট হয়ে যাওয়া। আর বাড়ীর ওপর অধিকার হারানোও। বাইরে রাত কাটালে, তা' তুমি গুরু আশ্রমেই থাকো, আর পেটের দায়ে কোথাও নাইট ডিউটিতেই থাকো, সংসারে কেউ আর তেমন পুঁছবে না তোমায়। সব পোস্ট হারিয়ে শুধু অতিথির পোস্টটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আর পাড়ার লোক বলবে, 'ওমা! রাতে বাড়ী থাকে না?

তা এত কথা অবিশ্যি ভাবেনি তখন চিত্রা। শুধু চিরাচরিত নিয়মের নীতিতে, সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিতে, সামাজিক মনের স্বাভাবিক সংস্কারে বলেছিল, রাতে থাকতে পারবে না।

কিন্তু সেই একটি মাত্র শর্তের ওপরই আঘাত আসছে চিত্রার।

শাসনের নয়, ভালবাসার।

জবরদস্তির নয়, মিনতির।

রোজ সহস্র অনুরোধ উপরোধ আসছে। মা মেয়ে দুজনেই যেন বদ্ধপরিকর চিত্রাকে পেড়ে ফেলবার জন্যে।

কেন?

কেন এই সাধ্য-সাধনা। এত কী দরকার পড়ে চিত্রাকে নীলাম্বরী দাসীর, ঘুমের ওষুধ খেয়ে অঘোরে পড়ে থাকা রাতটুকুতে? সেই ওষুধটা পর্যন্ত তো খাইয়ে আসে চিত্রা।

এতদিন ধরে এ প্রশ্নের উত্তর চিত্রা খুঁজে পায়নি, খালি হাতড়ে মরেছে, আজ যেন পেয়েছে একটা উত্তর।

বালিশটাকে একবার উল্টে ঠিক করে নিল চিত্রা। মনে হল শুয়ে পড়বে বুঝি। শুল না। ঘরের মেঝের দেড় হাত যে জমিটুকু পা ফেলবার জন্যে বুক পেতে পড়ে আছে, সেইটুকুতেই বারকতক পায়চারি করল, তারপর কলসী থেকে আর এক গ্লাস জল গড়িয়ে খেয়ে জানলায় এসে দাঁড়াল।

জানলা নয়, জানলার প্রহসন।

কাশী পাল লেনের ছ ফুটের দাক্ষিণ্যটুকুও নেই ওর সামনে। এ জানালার নীচে বরদা সরকারের নিজের বাড়ীর উঠোন। যে উঠোনের একধারে রান্নাঘর আর অন্যধারে নাইবার ঘর। দেড় ফুট এই জানলাটা খুললে

"মা বলছে, রাতটুকু মায়ের কাছে থাকতে। আমি বলছি, রাজি হয়ে যা।"

তারই শ্যাওলাপড়া দেওয়ালটা আর তার মাথায় বসানো শতছিদ্র ঘোলা জলের ট্যাঙ্কটা চোখে পড়ে।

তবু এই জানলাটার সামনে এসেই দাঁড়াল চিত্রা। যেন বন্ধ হয়ে আসা দমটা ছাড়তে এল।

নীলাম্বরী দাসীর দোতলার সেই মার্বেল-মোড়া বিরাট ঘরটার এক কোণে চিত্রার একটা বিছানা গোটানো রয়েছে। থাকে সেখানেই। জাপানী ছবি আঁকা মাদুর, সরু একহারা হালকা তুলোর তোষক, ছাপা ছিটের চাদর, পালকের মত বালিশ। দিনের বেলা একটু গা গড়িয়ে নেবার জন্যে এসব দিয়ে রেখেছেন আদিত্য-গিন্নী। ও'দের ঘরের ঝড়তি পড়তি মাল।

দুপুরে চিত্রা একটু হয়তো শোয় নীলাম্বরী দাসীর মনোরঞ্জনের জন্যেই। শোবার আগে দুটো কথা না কইলে ঘুম আসেনা তাঁর। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেই বিছানাটা গুটিয়ে উঠে পড়ে চিত্রা।

জানলার এই প্রহসনটার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সেই বিছানাটার কথা মনে পড়ল চিত্রার। উঁচু উঁচু চওড়া চওড়া জানলা থেকে হাওয়া এসে বয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে, আর মাথার উপর ফুল ফোর্সে পাখা ঘুরছে।

চিত্রা ভাবল আমি ওদের এত সন্দেহই বা করছি কেন? এ আমারই মনের দোষ নয় তো? আজীবন এই কাশী পাল লেনের আঁস্তাকুড়ে বাস করে, মনটা কি আঁস্তাকুড়ের মত হয়ে গেছে আমার? তাই ওদের ভালবাসার মিনতিকে আমি মতলবের ছলনা ভেবে শিউরে উঠছি। তাই হবে! এ আমার মিথ্যে ভয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম।

ভাবল, ভাবতে চেষ্টা করল।

হ'ল না।

কৃষ্ণার সেই কুটিল কুৎসিত হাসিটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'রাতদিনের ঝি বলে লোকে পাছে ঘেন্না দেয়, এই ভয়ে মরছিস তো? লোকের মুখে তিন ঝাড়ু মার। লোকে কি অসময়ে তোকে ভাত দেবে?......মা বলছে রাতটুকু মায়ের কাছে থাকতে, আমি বলছি রাজী হয়ে যা! ভাবিসনে, এক মাইনেতেই তোকে ডবল খাটিয়ে নেব', বিচিত্র কুটিল সেই হাসিটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কৃষ্ণার মুখে, 'রাতের জন্যে আলাদা মজুরি পাবি।'

চিত্রা সেই হাসির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। কৃষ্ণাকে এক প্রখরা যুবতী নারী আর নিজেকে নিতান্ত বালিকা মনে হয়েছিল তার। আর সেই বালিকার মতই বোকাটে গলায় বলেছিল, চল্লিশ টাকা করে তো দিচ্ছেন জ্যেঠিমা, আর কি দরকার?'

'আর কি দরকার? ওগো শুনছো— চিত্রা বলছে আর টাকার কি দরকার? টাকার আর দরকার নেই। এর আগে শুনেছো এমন কথা?

বরকে উদ্দেশ করে কথার ফুলঝুরি ছিটিয়েছিল কৃষ্ণা, লহরে লহরে হেসে উঠেছিল।

সেই হাসির শব্দ এখনো যেন শুনতে পাচ্ছে চিত্রা।

তারপর কখন যেন সে শব্দ মিলিয়ে গেছে, কখন বিছানায় এসে শুয়েছে চিত্রা, আদিত্যবাড়ীর ঘড়ি কখন যেন বারোটা ঘণ্টা মেরে সচেতন করে দিতে চেষ্টা করেছে এ অঞ্চলের নিদ্রাতুরদের। টের পায়নি চিত্রা। সে শুধু একটা আধা ঘুম আধা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করতে করতে সম্পূর্ণ অন্য

PUJA

কথা ভাবছে। ভাবছে, এত রূপ কেন! এত রং পুরুষ মানুষের পক্ষে বড্ড যেন বাড়াবাড়ি!......অত ফর্সা রঙের দিকে কি তাকানো যায়?......মুখে কি একটু আধটু খুঁৎ থাকতে পারত না? থাকলে এমন কিছু এসে যেত?...........

ভাবছে বড়লোকের ঘরে কি মেয়ে পুরুষ কারো বয়েস বাড়ে না? কৃষ্ণা না কি চিত্রার চাইতে দু' বছরের বড়।

আর ওই অদ্ভুত সুন্দর মানুষটা?

এখনো যাকে অবলীলায় বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দেওয়া যায়! সে নাকি চিত্রার দাদা অমিয় সরকারের থেকে পুরো তিনটি বছরের সিনিয়ার।

অমিয়র মুখের পেশী কুঁচকে গেছে, রগের চুলে পাক ধরেছে। অমিয় আর কিছুদিন পরেই বোধকরি ঝুঁকে হাঁটবে।

আর চিত্রার?

এ ঘরে যদি আদিত্যবাড়ীর মতন বড় বড় দাঁড়া আর্শি থাকতো, চিত্রা কি এখন হ্যারিকেনের পলতে বাড়িয়ে দেখতে বসতো চিত্রার মুখে বয়েসের রথ কত গভীর রেখায় চাকা চালিয়ে গেছে।

কিন্তু সবাই আজকাল একটা অদ্ভুত কথা বলছে।

লতিকা, কৃষ্ণা, আদিত্যবাড়ীর দাসীরা কাশী পাল লেনের মেয়ে পুরুষ!

ঘুম আর স্বপ্নের মাঝামাঝি জগতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, ভয়ানক সেই ভয়ের হাসিটা ভুলে গেল চিত্রা, অদ্ভুত সুন্দর সেই কথাটাই গুঞ্জরণ করতে লাগল তার ঘুম আসা মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

'যাই বল বাপু তোর আজকাল চেহারাটা খুব ফিরেছে। দশ বছর বয়েস কমে গেছে যেন'—

কিন্তু চিত্রার দাদা অমিয়কে বয়েসের চাইতে দশ বছর বড় মনে হয়। দাড়িতে বেশ পাক ধরেছে। সেই দাড়িকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে কামাচ্ছিল অমিয়। সেফ্‌টি ব্লেড কিনতে নিত্যি পয়সা লাগে, তাই অমিয় পরিচিত এক নাপিতের কাছ থেকে জলের দরে পুরনো একখানা খোলা ক্ষুর কিনে রেখেছে। মাঝে মাঝে সেই নাপিতটাকেই তুতিয়ে পাতিয়ে ক্ষুরটায় ধার করিয়ে আনে।

বিয়েয় পাওয়া নিকেল ফ্রেমের ছোট্ট গোল আর্শিটা গোলত্ব হারিয়েছে অনেকদিন; কারণ তার কাঁচের একটা অংশ টুকরো হয়ে পড়ে গেছে কবে যেন, বাকীটুকুকে আটকে রেখেছে ওই ফ্রেমটাই। সেই আর্শিটাকে কায়দা করে ঘরের দরজার কড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে অমিয় সরকার খোলা ক্ষুরখানা নিয়ে দাড়ি কামানোর কসরৎ চালাচ্ছিল। গালে 'গৃহলক্ষ্মী সাবানে'র তেলচিটে তেলচিটে ফেনা, মুখে বিশ্বের বিরক্তি।

চিত্রা চান করে এসে দাঁড়াল।

মুচকি হেসে বলল, 'ওই ক্ষুরটা নিয়ে মিছে আর কষ্ট পাও কেন দাদা? বৌদির আঁশবঁটিটা বরং ওর থেকে কার্যক্ষম আছে—'

অমিয় নিজের অকৃতকার্যতায় জ্বলছিল, কারণ ক্ষুরটায় বেশ গোটাকতক দাঁত পড়ে গেছে। জ্বলার ওপর তেলের ছিটে পড়ল। ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'গরীবের ঘরের অস্তরে কি আর ধার থাকেরে চিত্রা? তাদের সবই ভোঁতা। তুই এখন বড়লোকের ঘরের অনেক ধারালো অস্তর দেখছিস, চোখ বদলে গেছে।'

চিত্রা কেমন একরকম হেসে বলে, 'শুধু ধারালো? কড়া শানানো। ভয় হয় কখন গলা কাটে।'

অমিয় এই ঝাপসা কথার রহস্য উদ্‌ঘাটনে মন দিল না, তীব্র কণ্ঠে বলল, 'ক্রমশ যা চালাচ্ছ তাতে আর রাতে বাড়ী ফেরার ফার্সে দরকার কি? ওতে শুধু পাড়ায় আমার মাথা হেঁট করা। কাল মন্মথ বাবু বলে গেল, 'বোনের কাজটা কি তা'একবার খবর নিয়েছ অমিয়? শুধু গিন্নীরই খিদমদগরী, না আর কারো? আদিত্য বাড়ীর তো সুনাম নেই কখনই, বাড়ী ফিরতে তো দেখি দুপুর রাত হয়। লজ্জায় মুখ হেঁট হয়ে গেল আমার।'

হঠাৎ চোখটা জ্বলে ওঠে চিত্রার।

তীক্ষ্ন ছুরির মত গলায় বলে, 'তবু তো সেই মুখই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভোঁতা ক্ষুর ঘষে সৌষ্ঠব সাধন করছ দাদা, সত্যি ঘেন্না লজ্জা থাকলে ওই ক্ষুরে গালে না বুলিয়ে গলায় বসাতে।'

'কী! কী বললি?'

'যা বললাম তার মানেটা খুব শক্ত নয়।'

বলে ঘরে ঢুকে পড়ল চিত্রা, আর মিনিট কয়েক পরেই ভিজে শাড়ী বদলে ফর্সা ধবধবে শাড়ী ব্লাউজ গায়ে চড়িয়ে নতুন চটি পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল তীর বেগে।

অথচ আজ চিত্রা ভাবছিল—যাবে না।

ভাবছিল ওরা ডাকতে পাঠালে বলবে জ্বর হয়েছে রাতে।

রোজ সাড়ে ছটায় বেরিয়ে যায়।

সাতটায় ঘুম থেকে ওঠেন নীলাম্বরী দাসী, তার আগে তাঁর পুজোর গোছ গুছিয়ে রেখে তবে মুখ ধোওয়ানোর সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হতে হয়।

না, করে কিছু দিতে হয় না তাঁকে, পারেন তিনি সবই, শুধু সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই। প্রথম প্রথম বাড়ী থেকে একটু চা খেয়ে যেত চিত্রা, সে পাট চুকে গেছে। লতিকা একদিন হেসে হেসে বলেছিল, 'গিয়েই তো—এক্ষুনি ভাল চা খাবে ঠাকুরঝি, মিথ্যে কেন আর গরীবের পেয়ালাটা খরচা করা। এ চা কি আর তোমার মুখে রুচছে আজকাল?'

চিত্রা সেদিন কিছু বলেনি। পরদিন চা খেতে বসে এক চুমুক খেয়েই পেয়ালাটা বসিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'অখাদ্য! এ আর মানুষের খাবার যোগ্য নয়। একটু যদি যত্ন নিতে না পারো, কাল থেকে আর তুমি মিছে কষ্ট কোর না বৌদি।'

হ্যাঁ এই ভাবেই বলা চলে।

এই ভাবেই লতিকাকে বাড়তি এক পেয়ালা চা খাবার সুযোগ করে দেওয়া যায়। অন্য ভাষা অন্য সুর এক্ষেত্রে অচল।

মোড়ের কাছ পর্যন্ত গিয়ে মনে হয়েছিল চিত্রার, আরো আগেই ওটুকু ত্যাগ করা উচিত ছিল তার, লতিকা যে চা চা বলে মরে যায়, তা তো চিত্রার অজানা নয়। আদিত্য বাড়ীর ভাল চা খেতে খেতে কতদিন লতিকার মুখটা মনে পড়ে মনটা অন্যমনস্ক হয়ে যায়, মনে হয় লতিকা যেন লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার সোনালী চায়ে ভরা পেয়ালাটার দিকে।

আদিত্য বাড়ীর অবস্থা অনেক পড়ে গেছে এখন, তবু মরা হাতী লাখ টাকা। কিন্তু সত্যিকার দাসীগুলোর মত তো আর চিত্রা মনিব বাড়ী থেকে ভালটা মন্দটা আঁচলে ঢেকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারে না? বরং ভাইপোটা যদি 'পিসি পিসি' করে গিয়ে দাঁড়ায়, তাড়াতাড়ি বলে, 'যা বাড়ী যা।'

সেদিন যেতে যেতে ভেবেছিল 'সত্যি ছোটলোকদের বরং অনেক সুখ, ছোটলোক ভদ্দরদেরই যত জ্বালা।

আর তারপরে ভেবেছিল এঃ ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। চাটা উপুড় করে ফেলে দিয়ে আসা উচিত ছিল। নির্ঘাৎ বৌদি এদিক ওদিক তাকিয়ে ওই এঁটো চাটা গলায় ঢেলে নেবে।

আজ আমি যাব না ভেবেছিলাম।

ভাবল চিত্রা। অথচ ছুটতে ছুটতে যেতে হচ্ছে। রাগই আমার 'কাল'। যাব না বলে দেরী করলাম! অথচ—

গলির মোড়ে গতিটা কমাতে হল।

এখানে দ্বিজুদের তেরছা রোয়াকের কোণটা খোঁচা হয়ে ফুটপাথের ওপর এসে পড়েছে, তার ওপর এসে পড়েছে এক চিলতে সাদা রোদ্দুর। ক্ষয়কাশের রোগী দ্বিজু বসে আছে সেই রোদটায়। ডাক্তার ওকে বলেছে সকালের রোদ্দুর গায়ে লাগাতে।

দ্বিজুকে মনে হচ্ছে যেন ষাট বছরের বুড়ো।

অথচ ছেলেবেলায় ওর সঙ্গে 'জল ডাঙা-ডাঙি' খেলেছে চিত্রা। ওই রোয়াকের কোণ থেকে উঠেছে নেমেছে, আর সুর করে করে বলেছে 'ও কুমীর তোর জলকে নামি!'

দ্বিজু কুমীর হতো। কী চঞ্চল ছিল, ছিল কী জোরালো।

অন্যদিন ভোরবেলায় গলি থেকে বেরিয়ে যায় চিত্রা, রাতের অন্ধকারে ফেরে, দ্বিজুর সঙ্গে দেখা হয়নি বহুদিন। দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, 'কী দ্বিজুদা কেমন আছে?'

দ্বিজু বারকতক কেশে নিয়ে বলে, 'ঠাট্টা হচ্ছে?'

'ঠাট্টা!'

তাছাড়া আবার কি? দেখে কি মনে হচ্ছে খুব ভাল আছি? উত্তম আছি?'

চিত্রা বোঝে।

বোঝে, বিশ্ব ওর কাছে বিষ হয়ে গেছে। নরম গলায় বলে, 'তাই কি বলছি? অনেকদিন দেখিনি। তাই—'

'তাই বুঝি ভেবে নিয়েছিলি পাড়ার হাওয়া বিশুদ্ধ করে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে লোকটা? প্রাণ বেরোনো অত সস্তা নয়, বুঝলি? তা তোকে তো খুব খাসা দেখছি। বয়েস ফিরে গেছে মনে হচ্ছে। বড় গাছে নৌকো বেঁধে চেহারাখানা খুব বাগিয়েছিস বটে!'

নরম গলা কঠিন হয়ে ওঠে।

কেটে কেটে বলে চিত্রা, 'তা দুনিয়ায় এসে আর কোনো কিছুই তো বাগাতে পারলাম না, চেহারাখানাই নয় বাগালাম একটু।'

'তাই তো বলছি—' বিষ ফুটে ওঠে দ্বিজুর গলায়, 'তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেও গায়ে মাংস লাগে তাহলে?'

'লাগবে না কেন?' আগুন জ্বলা গলায় বলে ওঠে চিত্রা, 'তোমার মতন কেশো রুগী তো নই।'

ঠিকরে বেরিয়ে যায়, দাঁড়ায় না আর।

আবার বাধা।

আট নম্বর বাড়ীর বসন্ত ফিরছে বাজার নিয়ে। ছেঁড়া ময়লা, কোণে গিঁঠবাঁধা চটের থলিতে একগাছা কুমড়োর ডাঁটা, আর এক-ফালি কুমড়ো। ওর নীচে হয়তো আলু আছে, হয়তো বা আলুর বিকল্প মুখী কচু আছে।

বসন্ত একবার থতমত খেল।

বোধহয় এত ফর্সা শাড়ীজামাপরা মহিলাটিকে এ গলির লোক বলে বিশ্বাস করতে দেরী হল। তারপর বলে উঠল, 'চিত্রাদি যে! একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছ বাবা! উঃ কী মোটাই মুটিয়েছ, হঠাৎ চিনতেই পারিনি। বড়লোকের বাড়ীর দুধ-ঘি, আছ বেশ!'

চিত্রা কটু গলায় বলে, 'ওরা বুঝি আমায় দুধ-ঘি খাবার চাকরীতে বাহাল করেছে।'

'গড্ জানে! বপুখানি দেখে তো মনে হচ্ছে তাই। ছিলে হাড়গিলে, হয়েছ টিয়া পাখীটি! আঃ আমাদের এরকম একটা চাকরী জোটে না বাবা!'

সরে এল চিত্রা।

চলে গেল বসন্ত।

কিন্তু আজ বুঝি, চিত্রার বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর ষড়যন্ত্র! অথবা একটু বেলা হয়ে যাওয়ার সুযোগে ডুমুরের ফুল চিত্রাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সবাই এক হাত নিতে চাইছে। সকালবেলা সবাই বেরিয়েছে নানান ধান্ধায়; তাই এইটুকুতেই তিনটে ধাক্কা।

"গড্ জানে! বপুখানি দেখে তো মনে হচ্ছে তাই। ছিলে হাড়গিলে, হয়েছ টিয়া পাখীটি। আঃ আমাদের এরকম চাকরী জোটে না বাবা!"

পাঁচ নম্বরের সুধীর দত্তর বিধবা ভাজ দাতবার গুঁড়ো দুধ নিয়ে ফিরছিল, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তেতো গলায় বলে উঠল, 'বাবাঃ সক্কালবেলাই যে বিবিটি সেজে চলেছিস! বড়মানুষের বাড়ী চাকরী নিয়ে মানুষ গৎরে গেলি।'

চিত্রা ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'আপনার আর কিছু বলবার আছে দত্তবৌদি?'

'কথা শোন একবার! বলবার আবার কি থাকবে? ফর্সা কাপড় পরে ধরাকে যে সরা দেখছিস লো?'

হন হন করে চলে যায় দত্তবৌদি।

বিশ্বের বিরক্তিমাখা মন নিয়ে এগোয় চিত্রা।

আর সহসা সেই বিরক্তির ওপর এসে পড়ে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস, এক মুঠো সোনালী রোদ!

সেই রোদ আলোর চোখে চায়, সেই বাতাস গানের সুরে কথা কয়ে ওঠে, 'আসছেন? বাঁচা গেল! ভয় হচ্ছিল বুঝি

আজ আর—'

চিত্রা চোখ নামাল। এখন আবার একবার ভাবল, পুরুষ মানুষের পক্ষে রংটা বড্ড বাড়াবাড়ি। তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আপনার ভয় কিসের? ভয় হতে পারে বরং আপনার শাশুড়ী ঠাকরুণের।'

পরিমলও মৃদু হাসল, 'ভয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে।'

গেট ঠেলে দিল পরিমল।

জামাইবাবুকে দেখে দূর থেকে চাকরটা ছুটে এল। অকারণেই গেটটা ধরে একপাশে দাঁড়াল।

বাগান পার হয়ে দ্রুত পায়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়ল চিত্রা; বাগানে বেড়াতে লাগল পরিমল। অবিশ্যি প্রমদারঞ্জনের আমলের সেই বাগানের চেহারা আর নেই। ঝাউগাছগুলো কবে পঞ্চত্ব পেয়েছে, ফুলগাছ বলতে কিছু নেই, এখানে সেখানে কতকগুলো নেহাৎ বাজে গাছ রুক্ষু রুক্ষু পাতার জঞ্জাল নিয়ে বসে আছে। মালি বলে কিছু নেই, চাকররাই একটু জল দেওয়ার ভান করে।

বাগানের মাঝে মাঝে যে সিমেন্টে বাঁধানো চেয়ারগুলো তখন আয়নার মত চকচক করতো, এখন সেগুলো ধূলিধূসর, কাক আর পাখীদের লীলাভূমি, মাঝে মাঝে ফাটলে বিদীর্ণ হিয়া।

ফোয়ারায় আর জল ওঠে না, পরীর সেই অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুখানাই খসে গেছে, ডানা দুটোও আধভাঙা। শুকনো চৌবাচ্চাটা শ্যাওলার কলঙ্করেখা বুকে নিয়ে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা প্রমদারঞ্জনের ভবিষ্যৎ গণনার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

এত তাড়াতাড়ি এমনভাবে যায়?

প্রথম দিন এসে ভেবেছিল চিত্রা।

হাহা করা একটা নিশ্বাস পড়েছিল ওর। তারপর ভেবেছিল, যায় বৈকি! যত্ন না করলে সবই যায়।

পরিমল আদিত্যবাড়ীর বংশধর নয়, ঘরজামাই, এ বাড়ীর কোন কিছুর প্রতিই ওর আঁতের টান নেই।

'নেই মা নেই, আঁতের টান নেই—' নীলাম্বরী দাসী কাঁদো কাঁদো মুখে ফিসফিস করে বলছেন চিত্রাকে, 'জামাই তো দূরস্থান পেটের মেয়েরই নেই। এই ঘরবাড়ী বাগান কিছুতে টান নেই, টান শুধু নগদ টাকায়। তাই সব যেতে বসেছে। ঘরবাড়ী চুলোয় যাক, 'মা' বলে এতটুকু যদি দরদ আছে। তুই যাই এসেছিলি, তাই একটু দরদ ছেদ্দা পাচ্ছি। তুই ছেড়ে দিলে—'

চিত্রা হাতটা আস্তে ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, 'পয়সা ফেললে লোকের অভাব কি?'

'শোন কথা! তবে এতক্ষণ বললাম কি?' চিরদিনের দজ্জাল আদিত্যগিন্নীর রূপ পাল্টেছে, মেয়ের দাপটে আর বয়সের কামড়ে নিরীহ হয়ে গেছেন। তাই চিত্রার ছাড়িয়ে নেওয়া হাতটা আবার চেপে ধরেন। আবার ফিসফিস করেন, 'যেমন তেমন লোক নিয়ে কী করব মা? তাতে ঘেন্না ধরে গেছে। আর যে আসবে, সেই ঘরের কলঙ্ক ছড়াবে। তুই ভাল ঘরের মেয়ে, মুখে কুলুপ আঁটা, তাই না তোকে এত খোসামোদ করছি?' 'মা হয়ে আর ঘেন্নার কথা কি বলবো মা, তুই পেটের মেয়ের বাড়া তাই বলছি, কাল রাত্তিরে ওই ছাইভস্ম গিলে কী কাণ্ডটাই না করল!'

স্তম্ভিত চিত্রা রুদ্ধশ্বাস প্রশ্ন করে, 'কী গিলে?'

'কোন মুখে আর উচ্চারণ করি বাছা, বুঝেনে। ওই বদভ্যাসটি তো মেয়ের আমার সেই সোমত্ত বয়েস থেকে! তোদেরই ওই গলির সুধীরবাবু, হচ্ছে নাটের গুরু। ওর নাকি চোরাই মদের কারবার। এনে এনে জোগান রাখে। আর তার বৌ বেড়াতে আসার ছল করে পৌঁছে দিয়ে যায়—'

নীলাম্বরী যেন আর কার গল্প করছেন। যেন এ তাঁর নিজের পেটের মেয়ের গ্লানির কাহিনী নয়। তাই কথার ভঙ্গীতে কৌতুকের আভাস। 'তা' ছল আর কদিন টেঁকে? হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। বলেছিলাম মাগীকে, 'আর এসো না।'......কে শুনেছে? শোনে না! শুনবে কোথা থেকে? নিজের মেয়ে শোনে? এদের গুষ্ঠিই যে অবাধ্যর ঝাড়। সেই আদিত্য গুষ্ঠিরই মেয়ে তো।'

চিত্রা স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'মেয়ে হয়ে ওই সব খায় কৃষ্ণাদি, আপনি সহ্য করেন?'

নীলাম্বরী দাসী কপালে করাঘাত করে বলেন, 'কী করবো মা, কেলেঙ্কারীর ভয়ে সহ্য করি। বারণ করতে গেলে বলে, 'এসব আমার সাতপুরুষের ধারা, তুমি বললেই হল? চামড়াটা ছাড়িয়ে ডাক্তার দিয়ে রক্ত পরীক্ষা করে দেখাও, দেখবে রক্ত নেই, আছে—মদের আরক।'

চিত্রার চোখ জ্বলে ওঠে।

বলে, 'আপনার জামাই কিছু বলেন না?'

'জামাই? জামাই যদি আমার তেমন হবে তাহলে আর ভাবনা কি ছিল? মেনিমুখো, মা, একেবারে মেনিমুখো। রূপ দেখে গরীবের ছেলেকে ঘরজামাই করে নিয়ে এলাম, একটি দিনের তরে রোজগারের ধান্ধায় কোনখানে নড়তে দিইনি। বলি যে, না, দরকার নেই টাকায়! আমার যা আছে, মরা হাতী। রাতদিন জামাই আমার কৃষ্ণার চোখের সামনে বসে তার মন জুড়োক। ওমা তা বলবো কি অত রূপ নিয়েও কিছু করতে পারল না, পরিবার মুখে কলা ঠেকিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি করছে—'

সহসা চিত্রা প্রায় চীৎকার করে ওঠে, 'ছিঃ জেঠাইমা! আপনি না মা?'

নীলাম্বরী এ ধিক্কারে বিচলিত হন না। মাথা নেড়ে বলেন, 'মা বলেই তো এত জ্বালা মা, নইলে ভাবতেই তো পারতাম, মরুকগে যা খুশি করুকগে। তা' কই পারছি? এই যে এই ষোলো বছর ঘর করা বরের সঙ্গে এখন ডাইভোর্স না কি করতে চাইছে, এতে আমি ছটফটিয়ে মরছি কেন? মা বলেই না।'

নীলাম্বরী দাসীর কথা শেষ হবার আগেই চিত্রা বসে পড়েছে।

দুই চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে তার।

নীলাম্বরী দাসী কি সহসা পাগল হয়ে গেলেন? অবশ্য বাতিকগ্রস্তই মানুষ, কিন্তু এ ধরনের পাগল? এক রাত্রে এতটা হয়? আর তা যদি না হয়, তাহলে ধরতে হবে চিত্রারই শ্রবণযন্ত্রের কোথাও কোনও গোলমাল হয়েছে, এক শুনতে আর শুনেছে।

না হলে এতদিন কাজ করছে, কই এসব তো কোনদিন বোঝেনি।

না, সত্যিই বোঝেনি।

কিন্তু কেন বোঝেনি? চিত্রা বোকা বলেই বোঝেনি তাহলে।

আস্তে আস্তে যেন একটা কুয়াশার চাদর ছিঁড়ে যায়, চৈতন্যের দরজা খুলে পড়ে। কৃষ্ণার ব্যবহারের অনেক কিছু অসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতার অর্থ খুঁজে পায় চিত্রা, যেগুলোর অর্থ খুঁজে না পেয়ে, বড়লোকের মেয়ের খেয়াল বলে উড়িয়ে দিয়েছে সে এতদিন।

নীলাম্বরী দাসী বলেন, 'দেখ তবে! তুই শুনেই হাঁ হয়ে গেলি। আর আমি সেই হাঁ বুজে পাথর হয়ে বসে আছি। আজ মনের ঘেন্নায় বলে ফেললাম। কাল রাত্তিরে যে কাণ্ড! কথায় বলে মত্তহস্তী। চেঁচামেচি, গালাগালি, জামাইটাকে আমার ছিঁড়ে খাচ্ছে, 'তুমি দেবে কি না বল! তুমি দেবে কি না বল?'

চিত্রার হাঁ করা মুখ আরো হাঁ হয়ে যায়। অবাক হয়ে বলে, 'কী দেবে?'

'ওই যে মা, ওই ছাইয়ের ডাইভোর্স। স্বামীতে না দিলে না কি পাওয়া যায় না তাই আইন! অমন আইনের মুখে মারো সাত ঘা খ্যাংরা! এত কুচ্ছিৎ কাণ্ড করে তবে ছাড়াছাড়ি—'

চিত্রা বুঝি এবার ফিরে পেয়েছে নিজের কণ্ঠস্বর, ফিরে পেয়েছে আত্মস্থতা। তাই কটুগলায় বলে, 'তা' যে স্ত্রী বিচ্ছেদ চাইছে, স্বামীকে ত্যাগ করতে পারলে বাঁচে, তাকে আপনার জামাই সেটা দিচ্ছেন নাই বা কেন?'

নীলাম্বরীর কণ্ঠস্বর করুণ হয়ে আসে, বলেন, 'ভাল ঘরের মেয়ে হয়ে তুইও একথা বললি চিত্রা? তাই কখনো দিতে পারে? লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটারই না হয় বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে, ওর তো আর তা হয়নি?'

বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি।

চিত্রা ভাবে, হয়নিই বা বলা যায় কি করে? তা ছাড়াই বা কি আর?

পরপুরুষে আর নেশায় আসক্ত স্ত্রীকে যে পুরুষ প্রাণ ধরে ত্যাগ করতে পারে না, কী সে? ওই কন্দর্পকান্তি চেহারা, ওই মার্জিত ভদ্র কথাবার্তা, ওই রুচিসম্পন্ন আচার আচরণ, তার ভিতরে কী তবে একটা খড়ের পুতুল বাস করছে? যাকে ধরে আছাড় দিলেও ভাঙে না, ফাটে না, মচকায় না।'

ছি ছি!

নীলাম্বরী দাসী—গলার স্বর আরো খাটো করে বলেন, 'সেই জন্যেই তো তোকে এত খোসামোদ করছি বাছা, যাতে একটু কৌশল খেলে ছুঁড়ির মন ঘোরাতে পারিস।'

চিত্রা রুষ্ট হয়।

চিত্রা বিস্মিত হয়।

তার মানে? আমার সঙ্গে এর সম্পর্ক?'

না না, সম্পর্ক নেই কিছু, শুধু একটু চালাকি খেলা। শুধু একটু ভান করা। একটু থিয়েটার করা—বুঝলি না?'

নীলাম্বরী দাসীর বলীরেখাঙ্কিত মুখে কৃষ্ণার মুখের মতই একটা কুটিল হাসি ফুটে ওঠে, 'বিনা তপস্যায় ওই রকম রূপের কান্তি মাটির মানুষ বর পেয়েছে, তাই মর্ম বোঝে না। বরং ঘরজামাই বলে হেনস্থা করে, ওর মতন নেশাভাঙ্ করতে পারে না বলে দুয়ো দেয়, ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে উকিলবাবুর ছেলেটাকে নিয়ে মাতামাতি করে। মনে ভাবে, ছেঁচি কুটি আমারই দাসানুদাস। তা একবার যদি সন্দেহ জন্মায়, যা ভেবেছি তা' নয়, ওরও মন বদলাতে পারে, আর কারুর প্রতি নজর পড়তে পারে তা হলেই দেখবি মন ঘুরে যাবে। তুই যদি ষড়যন্ত্রে সহায় হোস, তোকে উপলক্ষ্য করে সে সন্দেহ আমি ওর অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারবো।'

চিত্রা স্থিরদৃষ্টিতে মিনিট খানেক তাকিয়ে থেকে বলে, 'আপনার কথার মানে বুঝতে পারলাম না জ্যেঠাইমা।'

নীলাম্বরী দাসী একটু অপ্রস্তুত হন।

ভাবেন, আরও একটু গৌরচন্দ্রিকার দরকার ছিল বোধহয়। ভাবেন থাক, পরে আর এক সময় আস্তে আস্তে বোঝাব। মেয়েটা বয়সের পক্ষে ধূর্ত কম।

কিন্তু বুঝতে কি সত্যিই পারেনি চিত্রা? বুঝতে পারেনি, নীলাম্বরী দাসীর মধ্যে কোন ধূর্তামির খেলা খেলছে।

অবিশ্বাস্য হলেও তাই।

যা বুঝতে দেরী হয়নি চিত্রার। সর্পিল এক পন্থা ধরে নীলাম্বরী দাবায় জিততে চাইছেন। ভাবছেন এ বুঝি ঘোড়ার আড়াই চাল। তেরছা ঘরে ডিঙিয়ে মাৎ করে দেবেন মেয়েকে।

কিন্তু সেই আড়াই চালের চাল, সেই একই ধূর্তামির খেলা চলছে নীলাম্বরী দাসীর মেয়ের মধ্যেও। আর লাজলজ্জার মাথা খেয়ে সে কথা স্পষ্টই ব্যক্ত করে বসেছে সে।

বলে উঠেছে। 'তা' শুনে একেবারে মূর্ছা যাচ্ছিস কেন বাবা? আমি তো আর তোকে সত্যি মন্দ হতে বলছি না? শুধু আমার একটু উপকারে লাগা! ও আমার নামে নালিশ তুলছে না, আমিই ওর নামে নালিশ তুলব। তা তুই যদি এ বাড়ীতে রাত কাটাস, কাজটা অনেক সোজা হয়, কোর্টে গিয়ে বলতে পারি ও আমার মায়ের নার্সের সঙ্গে মন্দ—'

'সাবধান হয়ে কথা বলবেন কৃষ্ণাদি', চিত্রা প্রায় চীৎকার করে ওঠে, 'আপনারা বুঝি মনে করেন, পয়সা থাকলেই যাকে যা খুশি অপমান করা যায়?'

কৃষ্ণা অবিচলিত।

কৃষ্ণা যেটুকু বিচলিত হয় সেটা হাসির বাড়াবাড়িতে।

'শোনো কথা! অপমান! বলি অপমানটা কিসের? বরং মান বাড়ানো বল! আমার অমন রূপবান গুণবান বিদ্যোবান বর, তার সঙ্গে যদি তোর অপবাদ ঘটে, তা হলে তো স্বর্গে যাবি।'

'স্বর্গটর্গ জায়গাগুলো কৃষ্ণাদি—' চিত্রা তীক্ষ্ণগলায় বলে, 'বড় বেশী উঁচু, ওখানে আপনাদেরই ম্যানায়। আমাদের মতন হাড়-হাবাতে লক্ষ্মীছাড়াদের কি আর স্বর্গে ওঠার সিঁড়ি আছে?'

'হুঁ'! কথা তো খুব জানিস দেখছি। তা' আমি তো আর তোর সত্যি স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটাচ্ছি না? বলছি শুধু লোকের সামনে একটু ছলনা করবি। ওই দাসী চাকর-গুলোকে দেখিয়ে দেখিয়ে জামাইবাবুর সঙ্গে একটু হাসি গল্প করবি, আর—' কৃষ্ণা বিকৃত হাসিতে মুখটা কুৎসিত করে বলে, 'আর এ বাড়ীতে কিছুদিন রাত্রিবাস করবি। করলে অপবাদ দিতে ভাবতে হবে না। স্রেফ্ বলবো, 'ধর্মাবতার' হাসিতে গড়িয়ে পড়ে কৃষ্ণা, বলবো 'ধর্মাবতার', এই দেখুন অঙ্ক সোজা, একেবারে দুই আর দুইয়ে চার।'

'এসব নোংরামির মধ্যে আমি নেই। আশ্চর্য, বলতে লজ্জা করল না আপনার?' চিত্রা দৃঢ়গলায় বলে, 'আমি কাল থেকে আর আসবো না।'

'এই দেখ!' কৃষ্ণা আবার হেসে গড়ায়। 'আমি এত উদারতা করছি, তুই আমার এটুকু উপকার করতে পারবি না? দেড়-কুড়ির ওপর বয়েস হলো, এখনো পর্যন্ত বর তো দূরের কথা, একটা লাভারও জুটল না। দু'দিন না হয় একটু ভালবাসার খেলাই খেলে দেখলি: দেখবি কত সুখ, কত রস!'

এমনি আগল খোলা কথাবার্তা কৃষ্ণার। একদা দেড়খানা পাস করেছিল, তার দৌলতে মাঝে মাঝে ইংরিজি বুকনি কাটে, আর শালীনতার ধারমাত্র না ধেরে মুখ চালায়। এ প্রকৃতি ছিল ওর বালবিধবা পিসি অনঙ্গ-মঞ্জরীর। অনঙ্গমঞ্জরী বাড়ীর ঝি চাকর-গুলোর সঙ্গে পর্যন্ত ইয়ার্কি করতো। ঠাকুমা মানে অনঙ্গ প্রমদার মা বলত, 'চুপ কর অনঙ্গ চুপ কর ক্ষ্যামা দে। তোর রংতামাসার ভাষা শুনলে গঙ্গাচ্ছান করতে হয়। কপাল তো পোড়া, লোকে শুনলে বলবে কি?'

অনঙ্গ বলতো 'বলবে আবার কি? বুদ্ধি থাকলে বুঝবে। দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর কাহিনী তো আর কারুর অবিদিত নেই?'

মা বলত, 'তা হোক। বিধবার অত হাসি মস্করা রঙ্গরস ভাল নয়। নিন্দে হবে।'

অনঙ্গ অপমানে খানখান হতো না, খানখান হতো হেসে। 'নিন্দে? নিন্দে হবে কি বল মা? নিন্দে হয় গরীব গুরবো লক্ষ্মীছাড়াদের ঘরের মেয়ের, বড়মানুষের ঝির নিন্দে রটাবে এত আসপদ্দা কার আছে শুনি?'

কিন্তু সত্যিই একদিনের তরে নিন্দে কেউ রটায়নি অনঙ্গমঞ্জরীর। বড়মানুষের ঝি বলে নয়, নিপাট নিষ্কলঙ্ক খাঁটি মেয়ে বলেই। ওই বাক্যবিস্তার ছিল তার ওপরের ছাউনি। ভেতরটা ছিল একেবারে কাটোয়া সেপাই। ওদের ঘরে বিধবাদের একাদশী ছিল ক্ষীর-ছানা-মাখন-মিছরীর, অনঙ্গমঞ্জরীকে একাদশীতে কেউ কখনো এককোটা জল গেলাতে পারেনি। পেড়ে শাড়ী ছেড়েছিল বোধহয় আঠারো বছর না হতেই। চুড়ির বালাই ঘুচিয়েছিল তার সঙ্গে সঙ্গেই। নীলাম্বরী দাসীর অঙ্গে এখনো হার-তাগা-আংটির মাধ্যমে কোন না ভরি পনেরো-ষোল সোনা বিদ্যমান, কিন্তু অনঙ্গর গায়ে রাংরত্তি ছিল না। মা বলত, আঙুলে অন্তত একটু আংটি রাখ অনঙ্গ, হাতে সোনা না থাকলে হাতের জল শুদ্ধ হয় না।'

অনঙ্গ চটপট বলতো 'আমার হাতে কারুর জল খেয়ে কাজ নেই মা! কাজ কমবে আপদ যাবে।'

বলতো, আর সেই নিরলঙ্কার হাত দুখানা নেড়ে নেড়ে খালি বোল্ ছুটিয়ে বেড়াতো। নিজের কাকীকে পর্যন্ত বলে বসতো, 'হ্যাঁ গা ওই ঢেঁশকুমড়ো গতর নিয়ে বসে বসে খালি মণ্ডামেঠাই গিলতেই জানো? বর আগলাতে পারো না? শূন্য ঘরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল আর আইঢাই করো।'

কাকী বলতো, 'মরণ তোমার, মরণ! বাপ খুড়ো সমান তা জানো?'

'তা আবার জানি না?' হেসে গড়াতো অনঙ্গমঞ্জরী, 'জানি বলেই তো বুড়োধাড়ি ছেলে উচ্ছন্ন যাচ্ছে দেখে বুক ফেটে মরি, আর তোমায় গাল পাড়ি।'

তা' কৃষ্ণা সেই পিসির মতনই হেসে গড়াতে শিখেছে। বেপরোয়া কথা শিখেছে।

কিন্তু আর সব?

না সবটা কি আর হয়? পিতৃকুল মাতৃকুল মিশিয়ে দেহ গঠিত। দু' পক্ষের আকৃতি প্রকৃতি রুচি অরুচি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির গুণাগুণ তো ধরবে? এদের বংশের না কি দেহের শিরায় শোণিতে যা প্রবাহিত হচ্ছে তা রক্ত নয়, মদের আরক। অন্তত কৃষ্ণার তাই যুক্তি, তাই আত্মসমর্থন। কিন্তু নীলাম্বরী দাসীর পিতৃবংশ বৈষ্ণব বংশ। ওরা মালসা ভোগ দেয়, তরকারি 'বানিয়ে' খায়, মাছ দেখলে মূর্ছা যায়, নব প্রকার বৈষ্ণব লক্ষণ মিলিয়ে তবে সেবাদাসী রাখে!

কৃষ্ণা সংমিশ্রণ। কৃষ্ণা নীতিহীন।

কৃষ্ণার উন্দামতা আছে, বিশালতা নেই। কৃষ্ণার মধ্যে ভোগের লোলুপতা আছে, ত্যাগের পবিত্রতা নেই।

তাই কৃষ্ণা অনায়াসে চিত্রার কাছে বলে, 'না দোষ ওর নেই কিছু, ববং দোষ খুঁজে পাই না বলেই জ্বলে পুড়ে মরি। আসলে কি জানিস? আর ভাল লাগে না। অরুচি হয়ে গেছে, একঘেয়ে হয়ে গেছে। বাবা, এই ষোল বছর ধরে শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে সদাসর্বদা চোখের সামনে ওই এক মুখচন্দ্র! ভাল লাগে? শাড়ী জামা ব্যাগ চটি সব আমি না ছিঁড়তেই বাতিল করি, পুরনো হয়ে গেলেই ঝিদের দিয়ে দিই—'

চিত্রা সরকারের মুখটা লাল হয়ে ওঠে। বলে, 'যারা আপনার প্রসাদের আশায় লালায়িত, তাদের সঙ্গে আমাকে নাই বা এক করলেন? পুরনো শাড়ী যাদেরকে বিলোন, পুরনো স্বামীও তাদেরই বিলোবেন!'

আর যাই হোক দ্রব্য গুণে ক্ষেপে না উঠলে কৃষ্ণার মেজাজ খুব শরীফ! রেগে ওঠে না সহজে, হেসে গড়ায়। তাই চিত্রার ওই লাল মুখের কড়া কথাটা অবলীলায় পরিপাক করে নিয়ে বলে, 'দেখ একবার! যতই হোক এতদিনের পতিপরম গুরু তাকে কি আমি বাসনমাজা ঝিকে বিলিয়ে দেব? এ তবু—'

'আমাকে মাপ করবেন কৃষ্ণাদি। আপনার এসব ঠাট্টা তামাসা আমার ভাল লাগে না।' চিত্রা উঠে দাঁড়ায়, বলে, 'আমি জেঠাইমাকে বলে যাচ্ছি, কাল থেকে আর আসবো না।'

চলে যাচ্ছিল, যাওয়া হয় না।

দরজার কাছে পরিমল।

অগত্যাই চিত্রাকে সরে আসতে হয় একটু। আর সেই মুহূর্তে এই অপদার্থ পুরুষটার ওপর রাগে সর্বশরীর রি রি করে ওঠে ওর। ছি ছি! যে স্ত্রী তাকে ছেঁড়া চটির মত শুধু পুরণো হয়ে যাবার অপরাধে ত্যাগ করতে চাইছে, তার দরজায় ধর্ণা দিতে প্রবৃত্তিও হয়!

পরিমল ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণাকে উদ্দেশ করে বলে, 'তোমাদের কি সব মামলার কাগজপত্র নিয়ে উকিলবাবু এসে বসে আছেন—'

উকিলবাবুর ছেলে নয়, স্বয়ং উকিলবাবু।

কৃষ্ণা মুখ সিঁটকে বলে, 'আঃ এই মামলা মামলা করেই আমার জীবন মহানিশা হল। কবে যে শেষ হবে! বোধহয় আমার জীবদ্দশায় নয়।'

চিত্রা মনে মনে ভাবে, 'না হলেই তো মঙ্গল তোমার! ওই মামলার ছুতোতেই তো উকিলবাবুর ছেলের আনাগোনা।

পরিমলের মুখ দেখে মনের কথা বোঝা যায় না।

শুধু এক নির্লিপ্ত প্রসন্নতার দীপ্তি মুখে মেখে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

বিছানায় গড়ানো অঙ্গভার টেনে তুলে কৃষ্ণা বলে, 'যাই, আবার এখন বুড়োর বকবকানি শুনিগে।' সঙ্গে সঙ্গে চিত্রাও বেরিয়ে আসে, কিন্তু অসভ্য কৃষ্ণা হঠাৎ চিত্রাকে ঘরের দিকে ঠেলে দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'আহা তুই চলে যাচ্ছিস কেন? তোর তো আর খুড়ির সঙ্গে মামলা বাধেনি? তুই তোর জামাইবাবুর সঙ্গে দু'দণ্ড গল্প কর না বাবা!'

হাসতে হাসতে ভাঙতে ভাঙতে নীচে নেমে যায় কৃষ্ণা।

এ ব্যবহার আকস্মিক'

এই কূট চাল নতুন।

চিত্রার বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড়!

কিন্তু চিত্রার তো ছিটকে চলে যাবারই কথা। দাঁড়িয়ে কেন থাকল তবে? পেরেক দিয়ে ওর পা দুটো কি পুঁতে দিয়ে গেল কৃষ্ণা?

শান্ত গলায় পরিমল বলে, 'আপনি বসুন আমি যাচ্ছি।'

হঠাৎ কি যে হয় কানাগলি কালী পাল লেনের চিত্রা সরকারের, তাই আদিত্য বাড়ীর জামাইয়ের মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি হেনে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, 'আমার সঙ্গে অত সৌজন্য করবার কোনও দরকার নেই, মনে রাখবেন আমি আপনাদের মাইনে করা ঝি মাত্র!'

এ তীব্রতা হয়তো কৃষ্ণার ওই নির্লজ্জ হাসির প্রতিক্রিয়া! পাখীকে ফাঁদে ফেলতে পারলে ব্যাধের যে উল্লাস, সেই উল্লাসের আভাস যেন কৃষ্ণার কুটিল হাসির উজ্জ্বলতায়। আর ধরা পড়া পাখীর কাছে ধরা পড়েছে—সেই উল্লাস।

কিন্তু পরিমল এর কারণ জানে না।

পরিমল কোনদিন চিত্রার এই তীব্রতা দেখেনি। বড়লোকের বাড়ী কাজ করতে আসা নম্র বিনীত শান্ত চিত্রার মধ্যে যে আবার আগুন আছে, দাহ আছে, তা' বোধ-করি তার ধারণাও ছিল না' তাই একটু থতমত খায়।

তারপর ঈষৎ হেসে বলে, 'আমাদের' নয়, এদের!'

'ওটা আপনার কথার খেলা! আমি যে আপনাদের চাকরানী, তা' আপনিও জানেন আমিও জানি। আমাকে 'আপনি' 'আজ্ঞে' করবার কোন দরকার নেই। মঙ্গলা, সরধু বিধুর মার মত 'তুই' তুমিই বলবেন!'

পরিমল আবার হাসে।

বলে, 'আপনি সত্যিই একটু ভুল করছেন। আমার অবস্থা আপনার থেকে এমন কিছু উচ্চস্তরের নয়। আমিও এদের মাইনেকরা চাকর! আপনাকে আদিত্য বাড়ীর গিন্নীর সেবার জন্যে, মাইনে দেয়, আমাকে তার মেয়ের সেবার জন্যে। এইটুকু তফাৎ। এদের চিরদিনের ব্যবস্থায় 'ঘরজামাইয়ের' একটা হাত খরচার বরাদ্দ আছে, সেটা আমার ভাগ্যেও জুটে আসছে।

আদিত্যবাড়ীর ঘরজামাইয়ের এই হীন-মন্যতায় হতভাগা অমিয় সরকারের বোন চিত্রা সরকারের এমন গাত্রদাহ কেন? এত দাহ যে, নিজের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না?

তা' ওর কণ্ঠস্বর অন্তত সে জ্ঞান থাকার

লজ্জা করে না আপনার? লজ্জা করে না এইভাবে পড়ে থাকতে? আপনি না বি এ পাস!

সাক্ষ্য দেয় না। যেন অনেক দিনের জমানো আগুনের তাপ এসে ধাক্কা দেয় সেখানে।

'লজ্জা করে না আপনার? লজ্জা করে না এইভাবে পড়ে থাকতে? আপনি না বি-এ পাশ!'

লজ্জা দেবার আর কোনও তীব্র ভাষা খুঁজে না পেয়েই বোধকরি চিত্রা ওই বি-এ পাশের খোঁটাটা দেয়!

কিন্তু ঘরজামাইয়ের গণ্ডারচামড়ায় সে খোঁটার ঘাটা লাগে না। পরিমল তেমনি হাসিমুখেই চিত্রার দিকে চেয়ে বলে,

'হ্যাঁ একদা ছিলাম বটে তাই। মনে পড়ছে যেন বেশ সোরগোল করা একটা রেজাল্টও করেছিলাম। কিন্তু সে সব অনেকদিন তামাদি হয়ে গেছে।'

এইমাত্র চিত্রা নিজেকে 'ঝি' বলেছে।

এইমাত্র বলেছে মঙ্গলা বিধুর মার মত তাকেও তুই তোকারি করাই পরিমলের পক্ষে বিধেয়। অথচ এখন ধিক্কার দিয়ে উঠছে তাকে। দ্বিধা করছে না মনিববাড়ীর পুরুষকে ধিক্কার দিতে।

এ সাহস কিসের?

এ কি পুরুষের কাছে যুবতী মেয়েদের চিরন্তন প্রশ্রয়ের যে একটা অলিখিত চুক্তি আছে, সেই চুক্তির সাহস? না আদিত্যবাড়ীর জামাইয়ের চোখের চাহনিতে আদিত্যবাড়ীর দাসী অন্য এক প্রশ্রয়ের আলো দেখতে পেয়েছে? সাহস তারই!

কে জানে কি!

হয়তো চিত্রাও জানে না কোন সাহসে সে অমন ধিক্কার দিয়ে উঠতে পারল। জানে না তবু পারল। বলল, 'লজ্জা হওয়া উচিত আপনার। যথেষ্ট লজ্জা।'

কিন্তু পরিমলের লজ্জার অভাবে চিত্রা অত উত্তেজিত হচ্ছে কেন?

সেই কথাই বলে পরিমল, 'তা আপনি হঠাৎ এত ইয়ে হচ্ছেন কেন? আর লজ্জা হওয়াই বা উচিত ছিল কেন? এদের সঙ্গে তো আমার এই চুক্তিই ছিল। সভাউজ্জ্বল জামাই হয়ে এসে, আমি এদের কৃতার্থ করবো আর এরা জীবনভোর সেই কৃত কৃতার্থতার ট্যাক্স জোগাবে। এই প্রস্তাব নিয়েই গিয়েছিল এরা।

'তিনকুলে কেউ ছিল না, পড়ে থাকতাম দূর সম্পর্কের পিসির বাড়ী, প্রস্তাব শুনে ভাবলাম, একেই বোধহয় হাতে চাঁদ পাওয়া বলে। খাওয়া পরার চিন্তা থাকবে না, দিন দুবেলা কেউ বলবে না 'পথ দেখ'। আর—'

পরিমল একটু হাসল, 'আর ভেবেছিলাম শুনেছি এরা এককালে খুব বড়লোক ছিল, সেই বড়লোকি ফ্যাসানের খাতিরে পুরনো কর্তারা নিশ্চয় বাড়ীতে দিব্যি একখানা লাইব্রেরী বানিয়ে রেখে গেছেন! মানে, ভেবেছিলাম—বড়লোকেরা তো রাখে এমন? বুককেসও কেনে, পায়রার কেসও কেনে। তা—'

হেসে চুপ করে গেল পরিমল।

চিত্রাও হঠাৎ তীব্রতা ভুলে কৌতুকের হাসি হেসে বলে, 'তা, কী? সে আশায় ছাই পড়ল?'

'তা পড়ল, বইটা যে আবার একটা কেনবার জিনিস তা' এদের ধারণার বাইরে।'

'নিজেও তো কিনতে পারতেন?'

'হ্যাঁ, সহজ বুদ্ধিতে সেই সমাধানই মনে এসেছিল—প্রথম প্রথম কিনতাম, হাত খরচার টাকাটা মনে করতাম সদ্ব্যয় করছি। একদিন শাশুড়ী ঠাকরুণের চোখে পড়ল।' আবার একটু হেসে উঠল পরিমল, প্রায় শব্দ করেই হেসে উঠল, 'বললেন, আদরের জামাইকে টাকা তিনি দিচ্ছেন বটে, কিন্তু সেটা অপচয়ের জন্যে নয়। মাস মাস কতকগুলো শুকনো কাগজের বোঝা কিনে পয়সা নষ্ট

করলে আমার হাত খরচের টাকা তিনি তাঁর নিজের হাতে রাখবেন।'

'সেই থেকে আর কিনলেন না?'

'কী মনে হয় আপনার?'

বলে রহস্যময় একটু হাসে পরিমল!

চিত্রা সেই রহস্যভরা মুখের দিকে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ যেন।

বুঝি অবাক হয়ে ভাবে এই মুখে অরুচি এসে গেছে কৃষ্ণার! দেখে দেখে বিরক্তি ধরে গেছে!

জগতে কত অসম্ভব ঘটনাই ঘটে!

কিন্তু সাবধানী আর সচেতন চিত্রা হঠাৎ এত অসাবধানী হয়ে পড়ছে কেমন করে? অচেতনের মত সময়ের জ্ঞান হারিয়ে মনিব-বাড়ীর পুরুষের সঙ্গে গল্প করছে কেন?

কৃষ্ণা যে ফাঁদ পেতে রেখে গেল, তা' বুঝতে পেরেও ভুলে গেল কি বলে?

তা' ভুলেই গেল বৈকি!

না হলে আবারও কথার জের টেনে কথা বাড়ায়?

ভুলে যাওয়া একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে সেও রহস্য হাসো বলে ওঠে, 'কি যেন বলছিলেন না তখন, এরা জীবনভোর আপনাকে টাকা জোগাবে বলে চুক্তিবন্ধ আছে?'

'বলছিলাম তো! অবশ্য অলিখিত চুক্তি। ইচ্ছে করলে—না দিতেও পারে। ইচ্ছে করলে আমাকে গদিচ্যুত করতে পারে, চাকরী খেতে পারে—'

চিত্রা উত্তেজিতভাবে বলে, 'হ্যাঁ! আর সে ইচ্ছের অভাবও নেই। অথচ আপনি দিব্যি নিশ্চিন্তে—'

সহসাই কথা থামাতে হয় চিত্রাকে।

পিছনে কৃষ্ণার হাসি উছলে উছলে ভেঙে ভেঙে খান্‌খান হচ্ছে।

'যাই বল বাপু, চিত্রা আমাদের খুব বাধ্য মেয়ে! হ্যাঁ গো তাই না? যা বলে গেছি, তাই করছে। আমি তো ভাবলাম হুড়মুড়িয়ে পালাবে।'

পরিমলের সঙ্গে কৃষ্ণার এই অন্তরঙ্গ সম্বোধনের ভাষা বরফ করে দেয় চিত্রাকে। কী এ? চিত্রাকে নিয়ে কি তবে বিশ্রী বিদঘুটে একটা রঙ্গ করছে এরা? কৃষ্ণা, কৃষ্ণার মা!

আর ওই লোকটা! ওরও কি সবই ছল।

কই ও তো ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে নিল না, ও তো বিরক্তি দেখিয়ে চলে গেল না। যেমন দরজার ধারটা ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি দাঁড়িয়েই রইল!

নিজেকে ভারী অপমানিত বোধ হল চিত্রার। আর মনে হল সে অপমানটা কৃষ্ণা করেনি, করেছে তার বর। অকারণে কেন এই 'অপমান', কৃষ্ণাতো কাউকে কোনদিন—না কিছুতেই আর এ বাড়ীতে নয়।

বৃষ্টিটা আকস্মিক এল।

এই তিন মিনিটের রাস্তাটুকুর মেয়াদের মধ্যেই বৃষ্টি এল, চিত্রাকে নাইয়ে দিল। বাড়ী ঢুকে পায়ের দিকে কাপড়টা টেনে মুচড়ে মুচড়ে জল নিংড়ে নিচ্ছিল চিত্রা, লতিকা রান্নাঘর থেকে কি কাজে এদিকে এসে থমকে দাঁড়াল। বলে উঠল, 'কি হল? ঠাকুরঝি এমন অসময়ে এলে যে?'

চিত্রা গম্ভীর গলায় বলে, পাঁজিপুঁথি, শুভ সময়, এই সব দেখে তবে বাড়ী আসতে হবে, এমন শর্ত করা ছিল বলে তো মনে পড়ছে না।'

লতিকা মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'ব্যাঁকা করে ভিন্ন সোজা করে কথা বলতে নেই যেন! আমারই ধাষ্টমো যে কথা বলতে আসি।'

লতিকার মান ভাঙাবার চেষ্টা করতে গেল না চিত্রা, নিজের সেই কোটরে ঢুকে ভিজে শাড়ী বদলে নিয়ে শুয়ে পড়ল। আর শুয়েই প্রথম মনে পড়ল ওর, এখন ও শাড়ী ভিজে গেলে বদলাতে পারে। বদলাতে পায়। আগে পেত না। কিছুদিন পরেও আর পাবে না! আবার তখন বর্ষাকালে রান্নাঘরের দেয়ালে দড়ি টাঙিয়ে শাড়ীজামা মেলতে হবে, আর স্যাঁৎসেঁতে ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ সেই জিনিস-গুলো গায়ে জড়িয়ে থাকতে হবে। বাড়ীতে সোডায় সেদ্ধ করে কাচার জন্যে কোনও দিনই সেগুলো শাদা ফর্সা হবে না।

চিত্রা ভাবল—

দৈনন্দিন জীবনের যত কিছু কষ্টর মধ্যে পরার কষ্টই সবচেয়ে কষ্ট! সে কষ্ট শুধু দেহটাকেই নয়, মনকেও কুৎসিত বিবর্ণ করে রাখে।

যাক, আজ চিত্রা ভিজে শাড়ী বদলে ফর্সা শাড়ী একখানা পরতে পেয়েছে, আজ পর্যন্ত অসময়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অলস কল্পনায় সময় কাটাতে পারছে সংসারের রোজগারী সদস্যর দাবীতে। আজও জানে না লতিকা, ধরতে পারবে না অমিয়, চিত্রা বেকার হয়ে গেছে, চিত্রার পুনর্মূষিকের অবস্থা ঘটেছে।

ওরাও জানে না।

চিত্রা ভাবে, চিত্রার বেকারত্ব এখনো চিত্রার সংকল্পের মধ্যেই আবদ্ধ। 'জ্যেঠাইমাকে বলে যাব' বলেছিল বটে, কিন্তু বলেনি। শুধু বলেছিল, 'জ্যেঠাইমা আমি একটু বাড়ী যাচ্ছি।'

নীলাম্বরী দাসী অবশ্য চমকে উঠে-ছিলেন। বলেছিলেন, 'ওমা কেন? এখন কি জন্যে?'

'এমনি।'

'বাড়ীতে কি?'

'কিছু না!'

'ওমা! তুই যে হেঁয়ালি হয়ে উঠছিস! তা' যাবি যে, আকাশ তো ভেঙে আসছে—।

'এই ছুটে চলে যাব।'

ছুটেই এসেছিল, তবু রক্ষা পায়নি। আকাশটা মাথার ওপর নেমে এসেছিল চিত্রার।

আর কাল নীলাম্বরী দাসীর মাথায়—ভাবল চিত্রা, আজ নয়, আজ এই অবিশ্রান্ত ধারার মধ্যে চিত্রাকে আর আশা করবেন না নীলাম্বরী দাসী, কিন্তু কাল লোক পাঠাবেন। আর তখন আকাশটা তাঁর মাথায় ভেঙে পড়বে।

চোখে সর্ষেফুল দেখবেন নীলাম্বরী।

চিত্রা কল্পনা করল, কাল নীলাম্বরীর প্রেরিত লোক এখান থেকে ফিরে গিয়ে যখন খবরটা দেবে, নীলাম্বরী কী করবেন?

সন্দেহ নেই, লোকটাকেই গাল পাড়বেন-প্রথমে। তারপর চিত্রার মৃত বাপের আদ্য-শ্রাদ্ধ করবেন। রাগ হলে যে নীলাম্বরী কতটা মুখ ছোটাতে পারেন, দেখেছে তা চিত্রা। দাসীদের ওপর আশ্রিতদের উদ্দেশে চালান এক-একদিন।

চিত্রা কল্পনা করল, সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি-উদ্গার হচ্ছে চিত্রার উদ্দেশে। যার মধ্যে 'বেইমান' শব্দটা অন্তত বিশবার থাকবে।

তারপর?

আর কি ডাকবেন তিনি চিত্রাকে? হয়তো ডাকবেন না। হয়তো ভাববেন, দিন প্রায় দু' টাকা 'রোজে'র হিসেবে মাইনে দিয়ে, আর বাড়তি পঞ্চাশ রকম ঘুষ দিয়ে, লোক কি আর সত্যিই পাবেন না?

কিন্তু!

চিত্রা সরকার হাঁপিয়ে বিছানায় উঠে বসল!

নীলাম্বরী দাসীর পরিকল্পনা?

নীলাম্বরী দাসীর আদরের কন্যার পরি-কল্পনা? সেই কুটিল চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ার আক্রোশে যদি চিত্রাকে কোনও বিপদে ফেলতে চেষ্টা করে ওরা?

আশ্চর্য!

একেবারে সহজ সাধারণ বলে যে কাজটা নিতে দ্বিধা করেনি চিত্রা, দাসীবৃত্তির অসম্মান সত্ত্বেও নিয়েছিল, কে জানত তার মধ্যে এমন অদ্ভুত অসহজ একটা ব্যাপার তোলা ছিল।

কে জানত, নীলাম্বরী দাসী আর তাঁর কন্যার মধ্যে যে অদৃশ্য যুদ্ধ চলছে, চিত্রাকে তার হাতিয়ার বলে ধরতে চাইবে দু-জনেই।

কৃষ্ণার শেষ কথাটা মনে পড়ল।

'এখন তো ঠিক্‌য়ে চলে যাচ্ছিস, বাড়ি গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবিস। টাকাটা তো নেহাত কম দিতে চাইছি না বাপু।'

না, কম নয়!

অন্তত কাশী পাল লেনের অমিয় সরকারের বোন চিত্রা সরকারের কাছে নয়। পুরো দু' হাজার টাকা কবে চোখে দেখেছে চিত্রা? কবে দেখবে? সেই টাকা দিতে চাইছে কৃষ্ণা।

সেই রাজার ঐশ্বর্য এখনি আহরণ করে আনতে পারে চিত্রা। শুধু যদি—

না, কলঙ্কের কাজ করতে হবে না। শুধু অকারণ খানিকটা কলঙ্কের কালি মুখে

মাখতে হবে। শুধু আদালতে আদিত্যবাড়ীর জামাইয়ের নামের সঙ্গে জড়িয়ে চিত্রা সরকারের নামটা উঠবে। শুধু অমিয় সরকার বলবে, 'আমার বাড়িতে তোমার জায়গা হবে না।' শুধু কাশী পাল লেনের সবাই আঙুল বাড়িয়ে বলবে, 'ওই দেখ। ওই যাচ্ছে অমিয় সরকারের বোন, অবনী সরকারের মেয়ে আর নুলো অন্নদার ভাইঝি চিত্রা সরকার। আদিত্যবাড়ীতে দাসীবৃত্তি করতে ঢুকে, ওদের সংসারটাকে ছারখার করে দিয়ে এসে দিব্যি লোকসমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

চিত্রা বলতে পারবে না ওদের ছার সংসার পুড়ে ক্ষার হয়েই ছিল। চিত্রা শুধু—হ্যাঁ, চিত্রা শুধু একটা মোটা অঙ্কের টাকার লোভে তার 'নিমিত্তের' ভান করেছে।

বলতে পারবে না—'ওগো না গো, আমি আমার চরিত্রকে বিকোইনি, বিকিয়েছি কেবল মাত্র সুনামটুকু।' চিত্রাকে চুপ করে থাকতে হবে, সেই টাকার পুঁটলীটা বুকে করে।

কাশী পাল লেনের এই কানা কোণে এমনিতেই বেলা চারটে না বাজতে বাজতে সন্ধ্যা নামে, আজ তো আকাশভাঙা বৃষ্টি। কাজেই দিন আর রাত্রির মধ্যে কোনও ব্যবধান ধরা পড়ল না। শুয়ে শুয়েই শুনতে পেল চিত্রা, অমিয় বলছে, 'যা বিষ্টি। আজ তো আর আসবে বলে মনে হয় না।'

তার উত্তরে লতিকা বলল, 'এসেছে তো কোন কালে।'

'তাই নাকি? তবু ভাল। বিষ্টির আগে?'

'নাঃ, ভিজতে ভিজতে।'

'ভিজতে ভিজতে?'

'তাই তো। বললাম, 'এখন যে? তা আমায় মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল।' উঠবে নাই বা কেন? লতিকার কণ্ঠস্বর ভারী শোনালো—'আমার মতন তো ঘরের বাঁদী নয়? দস্তুরমত পরের চাকরে! মোটা মাইনের চাকরে! অহঙ্কার তো হবেই।'

চিত্রা ভাবল, আজ পর্যন্ত ত গলার স্বর ভারী হচ্ছে লতিকার, কাল থেকে আর হবে না। কাল থেকে চাঁচাছোলা পাতলা গলায় বলবে, 'তোমার তো আর ও-বাড়ি যেতে হচ্ছে না, দয়া করে ভাতটা চড়ালেও পারো।'

বলবে।

কিন্তু অমিয়?

যে একদিন বোনের চাকরী করার কথা শুনে দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, আর এখন মাস পড়বার আগেই জিজ্ঞেস করতে শুরু করে, 'কিরে, বড়লোকের গিন্নী টাকাটা দিল না এখনো?' সেই অমিয় কী বলবে? বলবে না কি, 'কারণ নেই কিছু নেই—ফট করে কাজটা ছেড়ে দিয়ে এলি মানে?' বলবে না '—আদিত্যবাড়ীর ওই টাকাটা একটু ভরসা ছিল, সেটুকুও ঘুচল! প্রাণে মমতা থাকলে কি আর কেউ এমন ব্যবহার করতে পারে?'

ছেলেটাকে ওই কর্পোরেশনের ইস্কুলে না দিয়ে একটু ভাল ইস্কুলে দেব ভেবেছিলাম তা আর হল না।'

শুনিয়ে শুনিয়ে এই সমস্ত কথাই বলবে অমিয়। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করবে, হলোটা কি?

উত্তর দিতে পারবে না চিত্রা।

কাশী পাল লেনের ওই ডাস্টবিন উল্টে পড়ে থাকা নোংরা জঞ্জাল ছড়ানো পথটুকু দিয়ে হাঁটা-চলা করবার উপায়ও আর রইল না। সকলেই তো উৎসুক কৌতূহলে জিজ্ঞেস করবে, 'কী গো, তোমার চাকরীর কি হল?'

প্রথম যখন চাকরী করতে বেরিয়েছিল, তখন যাওয়াটা লজ্জার ছিল। এখন না-যাওয়াটার।

তবু যাওয়াও হবে না।

চিত্রাকে এর পর সকাল থেকে রাত, আর রাত থেকে সকাল—এই শ্যাওলাপড়া দেয়ালে ঘেরা দুর্গন্ধে বিষাক্ত বাড়িটার মধ্যেই—

হঠাৎ চমকে উঠতে হল চিত্রাকে।

কান্নার শব্দ এল কোথা থেকে?

ছোট ছেলের কান্না নয়, নারীকণ্ঠের। তীব্র তীক্ষ্ম।

মর্মবিদারী এই সুর চির পরিচিত।

এ কান্নার একটাই মানে।

ধড়মড় করে উঠে বেরিয়ে এল চিত্রা।

আর দেখল লতিকা রান্নাঘরের দরজায় শেকল তুলে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

চিত্রা না বলে পারল না, 'কী হল?'

এখন তো ঠিকরে চলে যাচ্ছিস, বাড়ি গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবিস। টাকাটা তো দেয়ার জন্য দিতে চাচ্ছি না বাপু।

লতিকা বলে বাঁচল 'আর কি হ'ল, দ্বিজু ঠাকুরপো হয়ে গেল বোধহয়। ওদের বাড়ি থেকেই কান্না উঠছে মনে হচ্ছে।'

দ্বিজু।

এই আজই যার সংগে কথা হয়েছে চিত্রার। কবরেজের নির্দেশে যে প্রাতঃরৌদ্র সেবন করছিল তিন কোনা রকের কোণ-টুকুতে বসে।

চিত্রা হাঁ হয়ে গিয়ে বলল, 'কী বলছ? আজ সকালেও তো—'

লতিকা কি যেন একটা বলে ছুটে বেরিয়ে গেল, বড় রাস্তায় কোনও বরযাত্রীর বাজনা শুনলে, অথবা কোনও স্লোগান শুনলে যে উগ্র কৌতূহলের ভঙ্গীতে ছুটে যায়।

পাড়ার একটা মৃত্যুও তো এদের কাছে একটা বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের মদটুকুই বা তারিয়ে তারিয়ে পান করবে না কেন স্তিমিত বিবর্ণ একঘেয়ে দিনগুলোর একটা দিনেরও রংটা একটু ঘোরালো করে নিতে।

চিত্রার মনে পড়ল, আজ সকালেই ও দ্বিজুকে একটা কটু কথা বলেছিল। মনে পড়ল, দ্বিজুর সংগে ছেলেবেলায় চোর পুলিশ খেলেছে চিত্রা, খেলেছে কুমীর কুমীর।

কিন্তু কই খুব ভয়ানক একটা কষ্ট তো হচ্ছে না চিত্রার। কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না তো? চোখে জলও তো এল না? শুধু মনে হচ্ছে সকালবেলা ওই কথাটা যদি—

কিন্তু চিত্রার কি উচিত নয় ওখানে ছুটে যাওয়া? যেমন করে লতিকা গেল।

ছুটে নয়, আস্তে বেরিয়ে গেল চিত্রা বাড়ির বাইরের দরজাটা চেপে ভেজিয়ে দিয়ে।

দ্বিজুদের দরজায় পাড়াসুদ্ধু লোক জমে গেছে এক মুহূর্তে।

মেয়ে পুরুষ কেউ বুঝি বাকী নেই।

একদিনের জন্যে রাজা হয়েছে আজ দ্বিজু। রাজা হওয়াটাকে দ্বিজু নিজেই ত্বরান্বিত করে এনেছে, ওর কবরেজী মালিশের ওষুধটার সবখানি গলায় ঢেলে।

সকালের রোদ গায়ে লাগিয়ে অসুখ সারিয়ে তোলবার ইচ্ছেটা তবে ফুরিয়ে গেল দ্বিজুর? কিন্তু কেন গেল? চিত্রার কটু কথায়? চিত্রার কথার এত দাম দেবে কি জন্যে দ্বিজু?

ভিড় করেছিল অনেকে, শ্মশানযাত্রার সংগী হবার বেলায় ভিড় ফর্সা হয়ে গেল। ক'জন সংগে গেল কে জানে।

অমিয় সরকার পালিয়ে এসে সদর দরজার খিলটা লাগাতে লাগাতে বলে, 'ছাড়ান হচ্ছিল না, খুব জোর তোমার কথাটা মনে পড়ে গেল।'

লতিকা মুখ কুঁচকে বলে, 'কেন ওদের গিন্নী জানে না না কি? দ্বিজু ঠাকুরপোর ভাজ? আদর করে আমায় তো সেদিন একটু ছড়া তেঁতুল দিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আমি বাবা রোগীর বাড়ির জিনিস বলে সাহস করে খেলাম না।'

চিত্রা অবাক হয়ে বৌদির আপাদমস্তককে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল একবার। অবাক হল। পাড়ার লোক যে খবরটা জানে, চিত্রা বাড়ির লোক হয়েও তা জানে না?

না, চিত্রা লক্ষ্য করেনি।

লতিকাও জানাবার চেষ্টা করেনি।

করেনি হয়তো লজ্জায়, হয়তো চিত্রার প্রতি বিতৃষ্ণায়। দাদার দিকেও একবার তাকাল চিত্রা। কালিপড়া হ্যারিকেনের আলোয় অমিয়র হাড়সার বুকটাকে ঠিক দ্বিজুর বুকের মত দেখতে লাগল।

চিত্রার মনে হল যে, কোন দিন দাদাও দ্বিজুর মত অসুখে পড়তে পারে। চিত্রার মনে পড়ল, সংসারে আর একটা মুখ বাড়ছে।

তবু চিত্রা পরদিন বেলা আটটা অবধি বিছানায় শুয়ে থাকল।

লতিকা অকারণ ক'বার ঘরের দরজায় ঘুরে গেল। আর খানিক পরে অমিয় এসে বলল, 'চিত্রা শুয়ে আছিস যে? যাবি না?'

ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে এমন নয়, তবু চিত্রা চোখের ওপর হাত চাপা দিয়ে পড়ে ছিল, হাত না সরিয়েই বলল, 'না ভাল লাগছে না।'

অমিয় একবার ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'বুড়ি আবার কিছু বলবে না তো?'

চিত্রা উত্তর দিল না।

চিত্রা শুনতে পেল অমিয় ওদিকে গিয়ে লতিকাকে বলছে, 'যতই হোক ছেলেবেলার খেলুড়ি!'

চিত্রার মনে পড়ল, দ্বিজু মারা গেছে কাল। কিন্তু এতক্ষণ কি সেই কথাই ভাবছিল চিত্রা? সেই শোকেই শুয়ে আছে?

তারপর ভাবল, দাদাকে জিজ্ঞেস করলে হতো: দ্বিজুদের বাড়িতে পুলিশ আসেনি? আত্মহত্যা করলে তো শুনেছি—

উঠে জিজ্ঞেস করতে উৎসাহ এল না।

আর হঠাৎ একটা দার্শনিক কথা ভেবে প্রায় হেসে উঠল ক্লাশ সিক্স পর্যন্ত পড়া চিত্রা সরকার। আত্মহত্যা আমরা কে না করছি? অহরহই তো করে চলেছি আত্মহত্যা।

আর একটু বেলায় অদিতাবাড়ী থেকে বিধুর মা এল খোঁজ নিতে।

চিত্রা ঘরে শুয়েই শুনতে পেল, লতিকা স্বভাববহির্ভূত নরম গলায় বলছে, 'হাঁ সেই জোর বিষ্টিতে ভিজে এসে এই জ্বরটা বাধল! রাত্তিরে বেশ জ্বর। তা আজকের দিনটা যাহক করে তোমরা চালিয়ে দাওগে বাছা, কাল নিশ্চয় যাবে।'

লতিকার এই নম্রতায় হঠাৎ লতিকার ওপর ভারী করুণা হল চিত্রার। নিশ্বাস পড়ল একটা। একটা নতুন সিদ্ধান্ত নেবে কিনা ভাবল, আর তখুনি শুনতে পেল বিধুর মা বলছে, 'তা এতো আর আমাদের মতন হাড়-পেষা খাটুনি নয় বৌদিদি, এ হল গে সখের চাকরী। গিন্নীর কাছে গিয়ে ওখেনে শুয়ে থাকলেও হতো। যায়নি বলে গিন্নী যা দাপাদাপি করছে। যাই হোক কাল সকালে যেন নিয্যস যায়।

বিধুর মা হয়তো চলেই যেত।

কিছুই হত না তাহলে।

কিন্তু লতিকার বোধকরি মনে হল বাঁধের মাটি আরও একটু শক্ত করলে ভাল হতো। তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, যাবে, নিশ্চয় যাবে! আমি নিজে পাঠিয়ে দেব। আরও কি হয়েছে জানো? কাল রাত্তিরে এই গলিতে ওর ছেলেকালের একজন বন্ধু—

করুণার বাষ্প শুকিয়ে কঠিন হয়ে উঠল।

• চিত্রা উঠে পড়ল।

চিত্রা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লতিকার দিকে না তাকিয়ে বিধুর মাকে বলল, 'ইনি জানেন না বিধুর মা, কাজ আমি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছ?'

দুটো মুখ থেকে একই কথা উচ্চারিত হয়, একই সংগে।

'হ্যাঁ! কৃষ্ণাদিকে তো বলে এসেছিলাম।' চিত্রা যেন লতিকার মুখটা কিছুতেই দেখবে না প্রতিজ্ঞা করে অন্য দিকেই চেয়ে বলে, 'জেঠাইমাকে সে কথা বলেনি কৃষ্ণাদি? যাক তুমি বলে দিও।'

চিত্রার কথার কি প্রতিক্রিয়া হল তাকিয়ে দেখে না চিত্রা, কথা শেষ করেই ঘরে ঢুকে যায়।

একটি পান ফোঁপরা, মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া।

ফোঁপরা পানটা নিয়ে কোঁদল বেধেছে কৃষ্ণা আর নীলাম্বরী দাসীতে।

দুজনেরই বিশ্বাস, তার চাল বানচাল করতেই অপর পক্ষ তার হাতের ঘুঁটিটাকে সরিয়ে ফেলেছে।

নইলে কাজ ছাড়বে কেন চিত্রা? কৃষ্ণা ভাবছে, তাছাড়া অতগুলো টাকার 'চার' ফেললাম!—নিশ্চয় মা।

তাই হিংস্র হয়ে উঠেছে দুজনেই।

নীলাম্বরী রাগ করে বলেন, দিয়েই যদি থাকি ছাড়িয়ে তো, বেশ করেছি। হতচ্ছাড়া বংশের, হতচ্ছাড়া মেয়ে, লজ্জা করে না তোর? আমার সংগে ঝগড়া করতে আসতে? লজ্জা করে না তোর থেকে বয়সে দশ বছরের ছোট ওই কচি ছেলেটার মাথা

খেতে? অমন কার্ত্তিকের মতন স্বামীকে ত্যাগ দিয়ে—।

কৃষ্ণা বলে, "লজ্জার ব্যাখ্যানা আর তুমি কোরো না মা, তোমার মুখে ওটা বড্ড বেমানান।'

'কী বললি লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে?'

'যা বললাম তার মানে তুমি খুবই বুঝতে পেরেছ মা। কিন্তু আমি এই কথা ভাবি, আমি না হয় হতচ্ছাড়া বংশের হতচ্ছাড়া মেয়ে, কিন্তু তুমি তো গোঁসাই বংশের মেয়ে ছিলে?'

নীলাম্বরী গুম হয়ে গিয়ে বলেন, 'তোর মতন মেয়ে আমার ছেরাদ্দ করবে, শুধু এই আক্ষেপে মরছিনে কৃষ্ণা, নইলে কবে মরে তোর হাত এড়াতাম। কিন্তু আমি তো চিত্রাকে ছাড়াইনি। ছাড়িয়েছিস তুই। বল্, কী শয়তানী খেলেছিস তুই সেই ছুঁড়ির সঙ্গে, যে সে দুম করে কাজ ছেড়ে দিল?'

কৃষ্ণা গম্ভীরভাবে বলে, 'ঠিক সেই কথা আমিওতো তোমায় জিজ্ঞেস করছিলাম, মা। বলছিলাম কী শয়তানী খেলেছিলে তুমি তাকে নিয়ে।'

কলহ উদ্দাম হয়ে ওঠে।

তার অবসরে কখন যে আর একজন আদিত্যবাড়ির গেট ঠেলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে, কেউ লক্ষ্য করে না।

কিন্তু বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে পা দিতেই, অনেকগুলো লোকের লক্ষ্য পড়ে যায়। হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে তারা। কাশী পাল লেনের ইতিহাসে এ ঘটনা একেবারে অপ্রত্যাশিত নতুন।

সরকারবাড়িটা সকলেই দেখিয়ে দেয় সসম্ভ্রমে।

আর দরজা খুলে দিয়ে অমিয় সরকারের বৌ লতিকা সরকার থতমত খেয়ে মাথায় কাপড় দিতে ভুলে যায়।

তারপর চেতনা ফিরলে পাশের দিকে সরে গিয়ে আস্তে বলে, 'হ্যাঁ ভাল আছে। ডেকে দিচ্ছি।'

চিত্রা যায়। চিত্রা থতমত খায় না।

চিত্রা শুধু নিষ্পলকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর বলে, 'আপনি কি পাগল?'

পরিমল মৃদু স্বরে বলে, 'বাঃ' কারো অসুখ করলে খবর নেওয়াটা বুঝি পাগলের কাজ?'

'দাসী-চাকরদের অসুখ করলে, মনিবের পক্ষে ছুটে এসে খবর নেওয়া পাগলামী বৈ কি!'

আদিত্যবাড়ির জামাইয়ের কি হঠাৎ আদিত্যবাড়ির হাওয়া গায়ে লাগে? তাই বাড়ির দাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখে বিদ্যুৎ জ্বলে ওঠে? ও কি এবার হাত বাড়িয়ে দাসীর হাত ধরবে? যেমন ধরতো, আদিত্যবাড়ির কর্তারা।

না, তা ধরে না পরিমল।

শুধু সেই বিদ্যুৎ জ্বলা চোখে একটু তাকিয়ে বলে, 'তা' মাঝে মাঝে তো পাগলামীও করে মানুষ।'

'আপনি বাড়ি যান।'

'যাব। কিন্তু তার আগে কথা নিয়ে যাব।'

'কি কথা?'

'আপনি আবার যাবেন।'

'কেন? একটুখানি অপমানে বুঝি আশা মেটেনি আপনাদের? আরো অনেক চান? রাস্তার কাদায় না লুটিয়ে দিতে পারলে—'

কঠিন হয়ে ওঠে চিত্রার মুখ।

কঠিন হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর।

কিন্তু কেন হয়ে ওঠে জানে না।

হঠাৎ যে মুখ দেখে সমস্ত প্রাণ আকুল হয়ে উঠল, কেমন করে অভ্যর্থনা করবে ভেবে উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইল, খুব মধুরে আর খুব সুন্দর করে কথা বলতে ইচ্ছে হল, সেই মুখের অধিকারীর মুখের ওপর অমন কঠিন কথাটা কেন বলল চিত্রা?

পরিমল কিন্তু মুখ নিচু করে না।

তেমনি তাকিয়ে থেকে বলে, 'আমাকেও কি আপনি ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ভাবেন?'

'বড়লোকরা সবাই সমান।'

হ্যাঁ, এই কথা বলছে চিত্রা।

নুলো অন্নদার ভাইঝি চিত্রা সরকার। আদিত্যবাড়ির গিন্নীর খাস ঝিয়ের চাকরী করছে যে।

পরিমল কিন্তু এ ঔদ্ধত্য ক্ষমা করে। রাগ করে না, বরং মৃদু হেসে বলে, 'আপনার ভুল আর গেল না। আমাকেও আপনি বড়লোকের দলে ফেলে অবিচার করতে চান। বললে যদি বিশ্বাস করতেন তো বলতাম, আমারও আপনার মত ও বাড়িতে হাঁপ ধরে। যেদিন আপনি এলেন, মনে হল যেন একজন সমগোত্র পেলাম। আবার আমাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে—'

হঠাৎ থেমে যায় পরিমল।

বোধকরি কথাটাকে পূর্ণ পরিণতি দেবার উপযুক্ত ভাষা সহসা খুঁজে পায় না বলেই থেমে যায়।

চিত্রার যে বত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে, সে কথা কি চিত্রার বুক ভুলে গেল? তাই সে কিশোরীর মত কেঁপে উঠল? সত্যিকার কৈশোর কালে তো এমন করে কাঁপেনি কোনদিন।

সত্যিকার কৈশোর কাল?

যে কালে চিত্রা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রান্না করতো, বাটনা বাটতো, কুটনো কুটতো, বাসন মাজতো, গুল দিতো, সাবান কাচতো? যে কালে একটা ভিন্ন দুটো জামা ছিল না বলে বাড়িতে খালি গায়ে থাকতো আর দাদার অনুপস্থিতিতে সদর দরজায় কেউ কড়া নাড়লে, রুগ্ন মাকে ঠেলে পাঠাতো দরজা খুলে দেবার জন্যে?

সেকালে কি কেঁপে ওঠবার মত একখানা বুক ছিল চিত্রার?

না সেকালের কোনও স্মৃতি নেই চিত্রার? যাতে লক্ষণ মিলিয়ে দেখতে পারে।

মাথা নিচু করে চিত্রা।

তারপর বলে, 'কৃষ্ণাদি এমন হয়ে করেন, যেতে ভাল লাগে না।'

'জানি। মানছি সেকথা। কিন্তু জীবে দয়া বলে একটা কথাও তো আছে জগতে—'

এই দৈন্য, এই কাঙালপনা, কেন কে জানে একেবারে সহ্য করতে পারে না চিত্রা। দপ করে জ্বলে ওঠে। চড়া গলায় বলে, 'দেখুন আপনার এই কথাগুলো •

আমার কাছে ধাঁধার মত। আপনি পুরুষ মানুষ, শিক্ষিত, আপনার নিরুপায়-তার অর্থ কি? ইচ্ছে করলে কি আপনি আদিত্যবাড়ির বাইরে গিয়ে নিজের জীবিকার সংস্থান নিজে করতে পারেন না? পারেন না, আপনাকে যে পুরনো শাড়ী জামার মত ত্যাগ করতে চাইছে তাকে ছেড়ে থাকতে? কৃষ্ণাদি আপনার সঙ্গে যে ব্যবহার করছেন, আমি তো ভাবতেই পারি না তার পরেও—'

পরিমল কি উত্তর দিত কে জানে, হঠাৎ চিত্রার পিছন থেকে লতিকার মৃদু অথচ তীক্ষ্ম কণ্ঠস্বর ঝলসে ওঠে, 'ওনাকে অমন পথে দাঁড় করিয়ে রেখে গল্প করছ কেন ঠাকুরঝি, কথা যখন কইছেন দয়া করে, গরীবের কুঁড়েতেই একটু—'

'না না আমি যাই'—পরিমল কুণ্ঠিত গলায় বলে, 'আপনার শরীর খারাপ, ব্যস্ত করলাম, মানে উনি বড্ড অস্থির হয়ে উঠেছেন দেখে নিজেই—কাল যাবেন তো?'

চলে যায় পরিমল।

চিত্রা সরে আসে।

এর পরও একটি বাঁকা কথা বলবে না, এতটা সংযম আশা করা যায় না লতিকার কাছে। শুধু বাঁকা নয়, প্রখর হয়ে ওঠে লতিকার জিভ। চিত্রার ও বাড়ির আকর্ষণের অর্থ বোঝা, এবং কাজ সারাতে রাত্ত দুপুর হয়ে যাওয়ার কারণটা যে আর অস্পষ্ট রইল না সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বলে লতিকা।

আর বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে অনেক কথা বলার পর যখন একটু চুপ করে, চিত্রা শান্ত গলায় বলে, 'সব কথা বলা হয়েছে তোমার?'

লতিকা ঠিকরে সরে যায়।

বিকেলবেলা আবার দূত আসে।

নীলাম্বরী দাসীর প্রেরিত নয়, কৃষ্ণার। মঙ্গলা এসেছে।

'কই গো চিত্রা দিদিমণি? আমাদের দিদিমণি এই কমলালেবু, মিশ্রী আর বিস্কুট পাঠিয়ে দিল। বলেছে'—মোক্ষদা হেসে ওঠে, 'বলেছে খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর করে যেও কাল। আর শোন, দিদিমণি বলে দিয়েছে, লোকজনের এই স্বভাব, এ হচ্ছে মাইনে বাড়ানোর ফন্দী। তাই বলে দিস, দু' টাকা হিসেবে ও তোমার গিয়ে পুরোপুরি ষাট টাকাই দেবো, মাথা ঠান্ডা করে আসে যেন।'

চিত্রার ভুরু কুঁচকে ওঠে।

বলে, "দাসীচাকরের রীতিনীতি সব কিছুতো জানোই। কিন্তু এটুকু জানো কি, তোমাদের মায়ের আর দিদিমণির আমার জন্যেই এত আকুলতা কেন? ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?"

মঙ্গলা হেসে ওঠে।

ফেটের কাপড় আর চওড়া বিছেহার পরা বড়মানুষের বাড়ির ঝি মঙ্গলা। বলে 'তা বলেছ ঠিক। আমরাও ওই কথা বলাবলি করি। আসলে বড়মানুষের মর্জি। মা বেটি দুজনার নেক নজরে পড়ে গেছ তুমি। ইহকাল পরকাল দু কাল বাঁধানো হয়ে গেছে তোমার। দিদিমণির নেক নজরে যে পড়েছে, তার তো যাবজ্জীবনের দিন কেনা হয়ে গেছে। তার সাক্ষী ওই উকিল বাবুর ছেলেটি!'

মঙ্গলা গলা খাটো করে বলে, 'বলে না কি নতুন আইনে বে করবে ওকে! কালে কালে কতই হবে! বিধবার বিয়ের ছিষ্টি হয়েছিল, এখন আবার সধবার—'

চিত্রা ওকে থামিয়ে দিয়ে রুক্ষ গলায় বলে, 'ওসব কথা রাখো। বল গে আমার শরীর ভাল নেই, আমি আর কাজ করতে পারবো না।'

'হ্যাঁ গা তা হঠাৎ শরীরে এমন কি হল? দুদিন নয় জিরিয়ে নিয়ে—'

'তোমায় যা বলছি তাই বল গে মঙ্গলা। আর না হয় বোলো আমার দাদা বারণ করেছে!'

'তা সেটা বাপু তুমি নিজে মুখেই বলে এসো।' মঙ্গলা বলে, নইলে আমায় পাঁশ পেড়ে কাটবে। বলবে তুই ভাল করে বলিসনি।'

নাকে কাপড় দিয়ে ডিঙি মারতে মারতে চলে যায় মঙ্গলা।

চিত্রা চুপ করে চেয়ে থাকে পথটার দিকে। যেখানে ডাস্টবিনের চারধারে নোংরা এঁটো ছাই শালপাতা ছড়ানো, আর অনেকখানি জায়গা আচ্ছন্ন করে এক-রাশ মাছি উড়ছে ভনভন করে।

ডাস্টবিনটার মধ্যে জঞ্জাল ফেলবার উপায় নেই, কারণ সেটা কাৎ হয়ে পড়ে আছে অনেকদিন যাবৎ। কে সোজা করে দেবে ফের? ঝি চাকর তো নেই কারুর এ পাড়ায়, সবই করে বাড়ির মেয়েরা। তারা ছুঁৎমার্গ বাঁচিয়ে অনেকখানি তফাৎ থেকে জঞ্জাল-গুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায়।

চিত্রা ভাবল, আদিত্যবাড়ির ঝি—এখান থেকে নাকে কাপড় দিয়ে ডিঙি দিতে দিতে চলে গেল। ওর মনিববাড়িতে কখনো নাকে কাপড় দিতে ইচ্ছে হয় না ওর, ইচ্ছে হয় না ডিঙি মেরে হাটতে। দিব্যি গা এলিয়ে পড়ে আছে সেখানে।

আর একবার ভাবল চিত্রা, মন নিরবয়ব। তার নাক নেই হাত পা নেই। আছে শুধু দুটো বড় বড় চোখ। দারুময় জগন্নাথের মত মন সেই চোখ মেলে শুধু চেয়ে দেখতেই জানে।

তবু চিত্রা পরদিন গেল। কিন্তু সে কি মঙ্গলা আর বিধুর মার ডাকের মর্যাদা দিতে?

কৃষ্ণা বলে, 'তোর বাড়ি থেকে এসে মঙ্গলা বিধুর মা এরা তো নাকে কাপড় দিয়ে ঘেন্নায় বাঁচে না। বাবা, চিত্রা ওই আস্তাকুড়ের গর্তেয় পড়ে থাকিস, তবু এখানে থাকবার জন্যে খোসামোদ কম্ম হার মানছি। ধন্যি বটে!'

চিত্রা খুব ঠান্ডা গলায় বলে, 'আমি যে আস্তাকুড়ের মানুষ, শুধু এই কথাটুকু বলবার জন্যেই কি লোক পাঠিয়ে ডেকে আনালেন কৃষ্ণাদি?'

'ও বাবা! এ যে একেবারে আগুন। একেই বলে চিত্রা, কারে পড়ে পায়ে পড়লে কাছিম গিয়ে পর্বতে ওঠে। তা যা দুনিয়ার রীতি। বলি সেদিন না হয় একটু ঠাট্টাই করেছিলাম। তাতেই এত রাগ হল যে—'

'ঠাট্টাই বা করবেন কেন কৃষ্ণাদি? আমি কি আপনাদের ঠাট্টার যুগ্যি?'

'যুগ্যি?'

কৃষ্ণা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, 'প্রেম প্রণয় ভালবাসা, কৃপা করুণা দয়া এসব কি আর যুগ্যি অযুগ্যি বিচার করে জন্মায় রে চিত্রা? তা জন্মায় না। মনের গতি বিচিত্র। নইলে আমিই বা কেন আমার অমন রূপের কার্তিক বর ছেড়ে ওই হাটুরে বইসী ছেলেটাকে, হি হি হি, বল কেন? আর আমার ওই কার্তিক বরই বা কেন তোর মতন কেলে কাঠকে ভজতে বসেছে?'

'কৃষ্ণাদি!'

তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে চিত্রা!

আর কৃষ্ণা আরও হেসে ওঠে।

"বাবা একেই ব[illegible] ফুলের ঘায়ে মূর্ছা। গরীব দুঃখীর পেটে গুরুপাক খাদ্য সহ্য হয় না তাই জানি, কানে যে দুটো গুরুপাক ঠাট্টাও সহ্য হয় না তা জানতাম না। তা যাকগে মরুকগে, আমার প্রস্তাবটার কি করলি তা বল? না হয় বাবা আর পাঁচশো ধরে দেব, রাজী হয়ে যা। আমার ভাবী উকিল শ্বশুর বলছে, এ না হলে নালিশ আনতে ঠিক জুৎ হবে না।'

চিত্রা নিজের অপমান বিস্মৃত হয়ে চমকে বলে ওঠে, 'তার মানে? উনিও এর মধ্যে আছেন?'

'হি হি হি, তবে আর বলছি কি? আদিত্যদের যা বিষয় আশয় এদিক ওদিক ছড়ানো আছে এখনো, তাও কুড়িয়ে বাড়িয়ে মরাহাতী বুঝলি? বুড়ো গোড়া থেকে তার ওপর শনির দিষ্টি দিয়ে বসে আছে। কি করবে, আমি বড় শক্ত ঘুঘু, তাই সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলতে পারেনি। তবু তলে তলে কি আর করছে না কিছু? করছে। ওই যে কাকীমার সঙ্গে মামলা, সবই তো সাজানো মামলা। এত চেষ্টা করে বুড়ো যে সেই অসহায় বিধবাটাকে পথে বসালো, সে কী মাত্তর আমার সুসার করতে? তা যদি ভেবে থাকিস তা হলে

আর আমার ওই কার্তিক বরই বা কেন তোর মতন কেলে কাঠকে ভজতে বলেছে?

দুনিয়াটাকে চিনতে তোর এখানো অনেক বাকী আছে।'

চিত্রা মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে বলে, 'আপনাদের দুনিয়াকে যেন, কোনও দিনই আমায় চিনতে না হয় কৃষ্ণাদি।'

'আরে বাবা, আমাদের তোমাদের বলে কিছু নেই। সব দুনিয়াই সমান। তোদের দুনিয়াই বুঝি খুব ভালো? তোদের গলির সুধীরবাবুর সব খবর রাখিস? কি উপায়ে টাকা উপায় করে সে, জানিস সে সব? জানিস পাকপাড়ায় জমি কিনে মস্ত বাড়ী ফেঁদেছে, ভাড়া খাটাবে বলে? চোখ-কান খোলা রাখলে সবই জানা যায়। তা নয়, চোখ বুজে বসে থেকে জপ করবো, পৃথিবী ভাল, পৃথিবী চমৎকার, পৃথিবী সুন্দর! দূর দূর। আমি তোকে অনেক জ্ঞান দিতে পারি, কিন্তু তুই বা, ফুলের ঘায়ে মূর্ছো যাস! ঠিক আমার উনিটির মতন। সাধে কি আর তোর সঙ্গে—হি হি হি, অমন আলুভাতের মতন বুদ্ধি নিয়ে কি আর বিষয় রক্ষে হয়? মা ঘরজামাই রেখেছিল সব দেখাশোনা করবে বলে। রাবিশ! রাবিশ! এইবার তাই এমন একখানি চাল চেলেছি! যে ভক্ষক তাকেই রক্ষক করে বসাবো ঠিক করেছি—'

কৃষ্ণার ওই হাস্যোৎফুল্ল মুখ থেকে নিতান্ত সহজে বেরিয়ে আসা কথাগুলো শুনতে শুনতে চিত্রা সরকারের গা ঘিনঘিন করছিল, মাথা ঝিমঝিম করে উঠছিল। তবু তো কই দু কানে হাত চাপা দিয়ে শুনব না বলে বিদ্রোহ করে উঠতে পারছে না সে? এ প্রসঙ্গ যেন তাকে এখানে শেকল দিয়ে আটকে রেখেছে। তাই প্রশ্ন করবো না ভেবেও প্রশ্ন করে ফেলে, 'এই জন্যেই তা হলে আপনি ওই উকিলবাবুর ছেলেকে—'

কথা শেষ করতে দেয় না কৃষ্ণা।

একটি বিলোল কটাক্ষের সঙ্গে একটু মদির হাসি হেসে বলে, 'তা ঠিক নয়! ছেলেটাকে দেখে একটু কেমন 'ইয়ে'তে পড়ে গেছি। তা তাকে লোভই বল আর যাই বল। ছেলেটাও আমাতে সত্যিকার মজেছে। বুড়ো ওইটি টের পেয়েই তো ছেলেটাকে আরও এগিয়ে দিচ্ছে।'

এতক্ষণে চিত্রা উঠে দাঁড়ায়। তীব্রস্বরে বলে, 'আপনার এই সব কথা শুনতে আমার ঘেন্না করছে কৃষ্ণাদি।'

কৃষ্ণা রেগে ওঠে না।

কৃষ্ণা হঠাৎ নিজের স্বভাব ত্যাগ করে নিভে যায়। মিইয়ে যায়।

একেবারে দুঃখী গলায় বলে, 'সাধে কি আর বলি, ওকে আর তোকে বিধাতা এক মাটিতে গড়েছে। ও-ও ঠিক এমনি করে ঘেন্না করে আমায়! আমার দাসানুদাস হয়ে থাকবার কথা, তা নয় আমায় ঘেন্না! তবে বল? আমার বাবার বাড়িগাড়ি, আমার বাবার টাকা, একমাত্তর উত্তরাধিকারী আমি আদিত্য বংশের, আমি কেন চিরটা কাল দুঃখী হয়ে থাকবো? ঘৃণিত হয়ে থাকবো? এতদিন ধরে তো চেষ্টা করলাম, পেলাম ওকে? এদিকে বয়েস মাঝ-আকাশে এসে পৌঁছে

যাচ্ছে, পশ্চিমে চলতে আর ক' দিন লাগবে?'

চিত্রা এই দুঃখী-দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবে, কৃষ্ণা কি এই অসময়েই নেশার আশ্রয় নিয়েছে? কি জানি। তবু ঠিক যেন ঘেন্নাও আসে না আর কৃষ্ণার ওপর। শান্ত ভাবে বলে, 'আপনি যদি ভাল হবার চেষ্টা করতেন, ভাল হয়ে চলতেন, নিশ্চয়ই ও'র মন পেতেন কৃষ্ণাদি।'

কৃষ্ণা হতাশ স্বরে বলে, 'কিন্তু কি করে ভাল হবো তাই বল? রক্ত মাংস হাড় মজ্জা যা দিয়ে তৈরি, তাকে ডিঙিয়ে অন্যরকম হবো এ জোর আমায় দিয়েছে কে? দেখেছি বাপ-কাকাকে, পেয়েছি মায়ের শিক্ষা—'

চিত্রা কথার মাঝখানে বলে ওঠে, 'আপনার বাবা উঁচুদরের মানুষ ছিলেন।'

কৃষ্ণা বলে, 'হ্যাঁ ছিলেন। স্বীকার করছি তা ছিলেন। কিন্তু তিনিই কি কখনো আমায় 'মেয়ে' বলে ছেন্দা করেছেন? নীলাম্বরী দাসীর আদুরে কন্যে বলে ব্যঙ্গই করে এসেছেন চিরদিন। ধারণা ছিল আমি ও'র মেয়ে নই। আমিই বা তবে ভাল হতে যাবো কেন রে? ভাল হবার আমার কী দায়?'

না, কৃষ্ণার তা হলে ভাল হবার দায় নেই। অন্তত কৃষ্ণার যুক্তি মানলে স্বীকার করতে হবে নেই সে দায় তার।

কিন্তু চিত্রা সরকারের?

তার বাবা-জ্যেঠার দৃষ্টান্ত?

তার মায়ের শিক্ষা?

সে কি মুঠো কয়েক টাকার বিনিময়ে নিজেকে বিকিয়ে দেবার মত?

চিত্রা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবার পা বাড়ায়। বাড়িয়ে বলে, 'আপনার কথা আমি হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছি কৃষ্ণাদি। কিন্তু আপনার কোনও সাহায্যে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমায় মাপ করবেন। আপনার হয়তো নেই, কিন্তু আমার দায় আছে ভাল হবার, ভাল থাকবার।'

চিত্রার ভাল থাকবার দায় আছে। তাই চিত্রা চলে যায়, আর সেই দিকে জ্বালাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে পরিমল রক্ষিতের স্ত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত। ওর চোখ দুটো যেন ঠিক করতে পারছে না জল ঝরাবে, না আগুন ঝরাবে।

তারপর সিদ্ধান্তে পৌঁছয় সে।

আগুনই ঝরায়।

কাশীপাল লেনের নুলো অন্নদার ভাইঝি যদি হঠাৎ ঘোষণা করে, তার ভাল থাকবার দায় আছে, তাহলে আদিত্যবাড়ির নির্দায় মেয়ের চোখে আগুন ঝরবে বৈ কি! প্রতিজ্ঞা তাকে করতে হবে বৈ কি, নুলো অন্নদার ভাইঝির তেজ ভাঙবার।

কিন্তু তেজ কি চিত্রার সত্যিই আছে?

নাঃ, শুধু তেজের ভঙ্গিমাটুকুই আছে?

তেজ থাকলে ঠিক এই মুহূর্তেই কৃষ্ণা রক্ষিতের বরের সঙ্গে কথা কয় কেমন করে সে, পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে!

তা কথা না কয়েই বা পারবে কি করে?

মানুষটা যে তাকেই উদ্দেশ করে বলছে, 'ফিরেছেন? আমি আপনার বাড়ি থেকেই আসছি—'

চিত্রা এক মুহূর্ত অপলকে তাকিয়ে থেকে বলে, 'কেন?'

'সে তো এখানে দাঁড়িয়ে বলা মুশকিল, কয়েকটা কথা ছিল—'

চিত্রা বলল, 'না আমার সং . আপনার .ক কথা?' বলল না, দাসী-বাঁদির সঙ্গে কথা কইবার আপনার দরকার কি?

এই রকমই তো বলা উচিত ছিল? কিন্তু উচিত কাজ করল না চিত্রা। শুধু বলল, 'কি কথা?'

গলি থেকে কে একজন বেরিয়ে গেল আড়চোখে তাকাতে তাকাতে। বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকল কে একজন মোড়ের মাথায়, ঈষৎ থমকে, তারপর ধীর-মন্থর গতিতে।

পরিমল বলল, 'সময় লাগবে একটু। এখানে ঠিক—ইয়ে আপনার বাড়িতে গিয়ে বসা যাবে না একবার?'

'বাড়ি?'

চিত্রা সরকার ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠল, 'গোয়াল বলুন। সেটা বললেও বেশী বলা হবে।'

'তাতে কি?'

'না!'

'না?'

'হ্যাঁ', আমার বাড়ীতে আপনার আসা, একটা অদ্ভুত রকমের বেমানান! ওখানের এক এক জোড়া চোখ একশো জোড়া হয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবে। আপনি অনুগ্রহ করে আর আসবেন না আমার বাড়ী। আর সত্যি এ গলি কি আপনাদের পা ফেলার যোগ্য?'

না, কথাটা অত্যুক্তি নয়।

আদিত্যবাড়ীর জামাই বলেই শুধু নয়। বিধাতা-প্রদত্ত চেহারাই পরিমল রক্ষিতের কাশী পাল লেনের মত গলিতে পা ফেলবার বাধা।

সামনে সত্যিকার আর্শি একটা থাকলে এই দণ্ডে কথাটা প্রমাণিত হতো।

কিন্তু সত্যিকার আর্শি তো নেই।

তা'হলে?

পরিমল উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলে, 'কথাটা বলার যে সত্যিই দরকার রয়েছে। একটু নিরিবিলি জায়গা না হলে—'

নুলো অন্নদার ভাইঝি চোখ তুলে চায়।

যে চোখ এই পরিমল রক্ষিত ছাড়া কেউ কখনো চোখে দেখেনি। সেই চোখ কি বলে কে জানে, চোখের অধিকারিণী শুধু বলে, 'সে জায়গা পৃথিবীতে কোথায়?'

চিত্রা সরকার না হয় ভুলে গেছে, কিন্তু পরিমল রক্ষিতও কি ভুলে গেল তার একচল্লিশ বছর বয়েস! পুরো ষোলো বছর বিবাহিত জীবন পার হয়ে এসেছে সে? তাই হঠাৎ কুড়ি বছর আগের চোখে চেয়ে বলে উঠল, 'সে জায়গা কি পৃথিবীর কোথাও আবিষ্কার করা যায় না চিত্রা?'

যায় বৈ কি।

পৃথিবীটা বড় বেশী ছোট সন্দেহ নেই, তবু দুঃসাহসিকদের জন্যে কিছুটা জায়গা আছে বৈকি তার।

জায়গা আছে নির্বোধ অন্ধদের জন্যে। সেই জায়গার ঠিকানা নিয়ে এল চিত্রা।

গলিতে ঢুকতেই থমকাতে হ'ল।

আবার কান্না!

কোথা থেকে আসছে এ কান্না? কে মারা গেল আবার?

না, নতুন নয়।

দ্বিজুদের বাড়ী থেকেই উঠছে। দ্বিজুর বুড়িমা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে কোলের ছেলের জন্যে।

চিত্রা একটু দাঁড়াল। ভাবল, শোকও দরকারি। শোকও সুখ। শোক চক্ষু-লজ্জার মুক্তি। পুরোণো একটা শোক হাতে থাকলে, হৃদয়বেদনাকে একান্ত সহজে মুক্তি দেওয়া যায়। হয়তো দ্বিজুর মার বড়ছেলের বৌ শাশুড়ীকে মুখঝামটা দিয়েছে, হয়তো উচিতমত খেতে দেয়নি, হয়তো বলেছে 'যম তোমায় নেয় না কেন?'

বুড়ি তাই দ্বিজুকে ডেকে ডেকে কাঁদছে।

চিত্রার যদি কোনো পুরনো শোক থাকতো!

কিন্তু আনন্দকে বেদনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে কেন চিত্রা? আনন্দে অধীর হলে কে কবে কাঁদতে বসে?

অমিয় সরকার তেলচিরকুট লুঙিগটার ওপর ছেঁড়া গেঞ্জিটা চাপাতে চাপাতে বিকৃত মুখে বলে, 'সোনার কাতিক্‌কাট নিত্য এই পচা নর্দমায় আসছে কেন রে চিত্রা?'

চিত্রা ভুরু কুঁচকে বলে, 'সেটা বরং সরকার-গিন্নীকে জিগ্যেস করলেই ভাল হতো দাদা! যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

সরকারগিন্নী অবশ্য এর পর আর নেপথ্যে থাকেন না। বেরিয়ে আসেন অন্তরাল থেকে। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আর তোমার সঙ্গে হয়নি? শাক দিয়ে আর মাছ ঢেকো না ঠাকুরঝি! তবু যদি না মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা ধরে গালগল্প করা দেখতো পাড়াসুদ্ধু সবাই।'

অমিয় সরকার ময়লা লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরে, অমিয় সরকার বাজারে গিয়ে বেছে বেছে শুকনো ডাঁটা আর হাজা পটল কিনে আনে, তবু বাড়ীর ইজ্জতের প্রশ্নে চোখে আগুন জ্বলে ওঠে তার। ক্রুদ্ধ-গলায় বলে, 'থাক ওসব নোংরা কথা! আর কোনদিন যেন এ ঘটনা না ঘটে, এই তোকে জানিয়ে রাখলাম চিত্রা। বড়লোকের বাড়ীর

'কি? কি তবু? বলুন, থামলেন কেন?'

ভাত খেয়ে, পরিবের মানসম্ভ্রম ভুলতে বসলি শেষে? ছিঃ!'

কিন্তু চিত্রা কি শুধু বড়লোকের বাড়ীর ভাতই খেয়েছে?

না, শুধু তাই খেলে এমন আত্মহারা হ'ত না সে। ভাতের চেয়ে অনেক তীব্র আর উগ্র জিনিস খেয়ে মরেছে চিত্রা। কৃষ্ণার মত বোতলের মদ না হোক, এও একরকম মদ বৈকি। নইলে কেন বিস্মৃত হবে চিত্রা, তার থেকে সাত সাত বছরের বড় দাদার কটু শাসন? কেন বিস্মৃত হবে নিজে সে, কাশী পাল লেনের নুলো অন্নদার ভাইঝি মাত্র। কেন মনে পড়বে না তার, যাকে নিয়ে 'পৃথিবীতে কোথাও নিরিবিলি জায়গা আছে কি না' খুঁজতে বেরোচ্ছে, তার বাড়ীতেই দাসীবৃত্তি করছে সে। দুদিন আগেও তার শাশুড়ীর পায়ে তেল-মালিশ করে দিয়েছে, গায়ে হাত বুলিয়েছে। ভুলে গেছে, কারণ মদের নেশায় আচ্ছন্ন সে। তাই সেই নিরিবিলি জায়গা আবিষ্কার করছে।

কিন্তু জায়গা থাকবে না কেন?

দেবমন্দিরের অধিকার তো কেউ কারো কেড়ে নেয়নি? কালীঘাটের কালী সদা-জাগ্রত নেই দুঃখী অভাবগ্রস্তের জন্যে? যেখানে ভীড়, সেখানেই তো নিরিবিলি। যেখানে সহস্র চোখ, সেখানেই তো 'চোখের' ভয় কম।

মনপ্রাণ খারাপ হয়েছে চিত্রার। দেবী-দর্শনে যাবে, বিচিত্র কি? রোজই যদি যায় সন্ধ্যারতি দেখতে।

ফেরার সময় তো 'ডালা'র প্রসাদ নিয়ে ফিরবে।

'কি কথা ছিল বলুন?'

বলল চিত্রা, একটু গা বাঁচিয়ে বসে। চিত্রার খোঁপায় ফুল নেই, কিন্তু খোঁপাটাই ফুলে ফেঁপে ঘাড়ে ভেঙে পড়ে তরুণীর রূপ দিয়েছে চিত্রাকে। চিত্রার চোখে কাজল নেই, কিন্তু তার এই দীর্ঘ শুষ্ক জীবনের রহস্য-হীন চোখের দৃষ্টিতেই আজ কাজলের রহস্যমায়া।

চিত্রার সমস্ত অণুপরমাণু যেন আজ বলতে চাইছে, 'আমি ধন্য ধন্য হে!'

আর পরিমল রক্ষিত?

তার চোখেও বুঝি আজ মুক্তির আবেগ। আদিত্যবাড়ীর চোখের সীমানা ছাড়িয়ে এমন একা আর কবে কোথায় এসে বসেছে পরিমল? বড়লোকের বাড়ীর ঘরজামাইয়ের নিয়মবাঁধা জীবনের মাঝখান থেকে সময় চুরি করে নেওয়া বড় শক্ত।

'একটু বেরোচ্ছি' বললেই প্রশ্ন উঠবে 'কোথায়? কোথায়?'......প্রশ্ন উঠবে 'ওমা সে কি! বাসে, ট্রামে? পাগল হয়ে গেলে না কি? ওরে গাড়ী বার কর।'

কর্তাদের আমলের সেই বড় গাড়ীখানা আর নেই অবশ্য, বাড়ীর মেয়েদের ব্যবহারের জন্যে যে ছোট একখানা ছিল, সেইটাই এখন তার ভগ্ন পঞ্জর নিয়ে বিদ্যমান। আর বিধুর মার বিধু ড্রাইভারী শিখেছে তাই ড্রাইভার।

কিন্তু তাতে কি?

গাড়ী তো?

রাস্তার ধুলোয় পা দিতে দেয় না তো?

'আজ পালিয়ে এসেছি—' বলল পরিমল। বলেছি 'বাগানে আছি।'

'কী কান্ড! যদি খোঁজে?'

'খুঁজে পাবে না। এমনি করেই একদিন নিখোঁজ হবো।'

'নিখোঁজ!'

কেঁপে ওঠে চিত্রা।

পরিমলের মুখে ফুটে ওঠে একটা শান্ত স্বচ্ছ স্থির আবেগের দ্যুতি।

'ভয় পাচ্ছেন?'

'বাঃ ওই সব নিখোঁজ-টিখোঁজ বললে ভয় লাগে না বুঝি? এ তো তবু—'

'কি? কি তবু? বলুন থামলেন কেন?'

'কী আবার? বাঃ! চেনাচেনা হল আপনার সঙ্গে, এখন হঠাৎ নিখোঁজ—'

'চেনা-জানা হল বলেই তো—!' পরিমল

একটা মিষ্টি হাসি হেসে বলে, 'মনে হচ্ছে কত কত জন্ম আগে থেকেই যেন চিনি আপনাকে। প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল আপনি আর আমি সমগোত্র!'

'কিন্তু কী যেন বলবেন?'

'এই তো কত কথা বলছি।'

'না না বাঃ! বলেছিলেন না একটা দরকারি কথা আছে, যা বলবার জন্যে—'

'বলেছিলাম! মনে পড়ছে—বলেছিলাম। কিন্তু এখন আর সেই তুচ্ছ কথাটাকে দরকারি মনে হচ্ছে না।'

'আমার কিন্তু শুনতে ইচ্ছে করছে—'

চিত্রা বলে, দুরন্ত বাঁচাবার সংকল্পটা প্রায় ভুলে গিয়ে। কিন্তু এখানে কেউ তাকিয়ে দেখবে না—সেই দুরন্তহীনতাটা। এখানে অনেক ধরনের মানুষ আসে।

পরিমল মাথা তুলে 'আপনি' ভুলে হঠাৎ তুমি দিয়ে বলে, 'আমি তোমায় সাবধান করতে গিয়েছিলাম চিত্রা।'

'সাবধান! আমাকে?'

'হ্যাঁ। টের পেয়েছিলাম—ওরা তোমায় ফাঁদে ফেলবার ষড়যন্ত্র করছে।'

চিত্রা চোখে অবোধের ভান ফোটায়।

না ফোটাবে কেন?

প্রেমের ক্ষেত্রে ভানই তো প্রধান অস্ত্র। ভান দিয়েই তো রাজ্য জয়।

সে ভান কখনো অবোধের, কখনো সরলের, কখনো আবেগের, কখনো অভিমানের।

তাই অবোধের ভান নিয়ে রণক্ষেত্রে নামে চিত্রা।

'ফাঁদ? কিসের ফাঁদ?'

'সে বড় বিশ্রী! কোনপ্রকারে একবার তোমার সংগে আমার নাম জড়িয়ে বদনাম তুলে—'

চিত্রা আরো অবোধ।

চিত্রা কিশোরীর সারল্যে বলে, 'মানে বুঝতে পারছি না। তাতে কার কি লাভ?'

পরিমল চিরদিন প্রখর যৌবনের অগ্নি-দাহ দেখতেই অভ্যস্ত, কিশোরীর সারল্য দেখেনি কোনদিন। দেখেনি অবোধ চোখের বিস্ময়। তাই মুগ্ধ হয়। আবেগমুগ্ধ গলায় বলে, 'লাভ? সে কথা বলতে গেলে আরো বিশ্রী! তবু তোমায় বলবো। লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা, কলঙ্কের কথা, তবু কি মনে হচ্ছে জানো চিত্রা, সব কথা বলবার মত একজন কেউ থাকলে বুঝি সব দুঃখ সওয়া যায়। তোমাদের কৃষ্ণাদি ডাইভোর্সের জন্যে ক্ষেপেছে। আমাকে নিয়ে ওর সুখ নেই। চার্ম নেই। তাই আমাকে প্রতিদিন বলছে, যাতে আমিই আনি নালিশ। আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে যথেচ্ছাচার করছে—'

চিত্রা ধৈর্য হারায়।

চিত্রার চোখের কাজল মায়া-কুটিল হয়ে ওঠে।

চিত্রা বলে, 'এত করছে, তবু প্রাণ ধরে ছাড়তে পারছেন না তাকে?'

'তা নয় চিত্রা,' পরিমল উদাস গাম্ভীর্যে বলে। 'সে বড় কদর্য কুৎসিত নোংরা। আমার তো মনে হয় তার চেয়ে অনেক ভাল পালিয়ে গিয়ে নিজের মত করে এক নতুন জীবন গড়া। মুক্তির জন্যে তো প্রাণ অস্থির। প্রতি মুহূর্তেই তো মনে হয় এই অসুস্থ অবাস্তব প্লানিকর জীবনের হাত এড়িয়ে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিই। কিন্তু সেই আইন আদালত, কুৎসা-কালির কথা যখন ভাবি, তখনই মন গুটিয়ে আসে। কৃষ্ণা পারে, কৃষ্ণার ওতেই উল্লাস। তাই কৃষ্ণা তোমাকে আর আমাকে একই জালে জড়িয়ে ফাঁদ পাততে চায়—'

হঠাৎ আবহাওয়া বদলে যায়।

বদলে যায় আলোচনার সুর।

কাশী পাল লেনের চিত্রা সরকার, যে দুদিন আগে কৃষ্ণা রক্ষিতের মুখের ওপর বলে এসেছে তার ভাল হবার দায় আছে, সে হঠাৎ পরিমল রক্ষিতের গায়ের ওপর মুখ রেখে রুদ্ধস্বরে বলে, 'পাতুক না! ফাঁদে পড়তেই তো চাই।'

ফাঁদে পড়তেই চায়।

আর সেই মরণ-ফাঁদ নিজেই পাততে বসে চিত্রা। তাই আবার আদিত্যবাড়ীর গেট পার হয় সে।

নীলাম্বরী দাসীর কাছে গিয়ে বলে, 'দাদার ওপর রাগ করে কাজটা ছেড়ে দিয়ে-ছিলাম জেঠাইমা, কিন্তু সংসারের মুখ চেয়ে আবার আসতে হ'ল। বৌদির আবার বাচ্চা-টাচ্চা হবে! খরচ তো বাড়ছে। আচ্ছা বলুন তো দাদার এটা অন্যায় নয়? আপনার কাছে থাকি, রাত হোক যাই হোক, তাতে কি? বলে দিয়েছি এবার দাদাকে বেশ, রাত করে বাড়ী ফিরলে তোমাদের জ্বালাতন, এবার থেকে জেঠিমার কাছেই রাতদিন থাকবো।'

আবার কৃষ্ণার কাছে গিয়ে বলে, 'ভেবে দেখলাম কৃষ্ণাদি, গরীবের অহঙ্কার সাজে না।'

'যাক তবু ভাল যে সুমতি হয়েছে। আমার প্রস্তাবে রাজী তাহলে?'

'তাছাড়া আর কি? ঠিক করেছি আপনার দেওয়া টাকাটা নিয়ে গিয়ে দাদার হাতে দিয়ে বলবো, টাকার অভাবে তো এযাবৎ বোনের বিয়ে দিতে পারনি! এই নাও টাকা জোগাড় করে এনে দিয়েছি। এখন—'

'বলিস কি লো?'

হেসে হেসে পেটে খিল ধরায় কৃষ্ণা। বলে, 'এখনো তোর বিয়ের সখ আছে?'

চিত্রার মুখ কালো হয়ে ওঠে, চিত্রার গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, তবু চিত্রা কষ্টে হেসে বলে, 'থাকবে না কেন কৃষ্ণাদি? আমার তো আর আপনার মতন কিছুতে অরুচি ধরে যায়নি?'

'কৃষ্ণা চিত্রার মুখের দিকে তীব্র একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বোধ করি তার ভেতরটা পড়ে নিতে চেষ্টা করে, তারপর বলে, 'তা তুই না হয় মরুভূমির বালি, তোকে চাইবে কোন সমুদ্দুর? বলি দাদা এই তিরিশ পার হওয়া বোনের বর জোটাতে পারবে তো?'

চিত্রার মুখে একটা বিদ্যুতের শিখা দপ্ করে জ্বলে ওঠে। তার পর চিত্রা বোধ করি মনে মনে কৃষ্ণাকে করুণার পাত্র মনে করে ফুলে ওঠে। তাই মুচকি হেসে বলে, 'দাদা না পারে, নিজেই কারুর ফেলে দেওয়া বর কুড়িয়ে নিয়ে ঘর বাঁধবো!'

'কী! কী বললি?' কৃষ্ণা বোধ করি এই ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের সামনে পড়ে চট করে ওর থেকে বেশী কথা বলতে পারে না। আগুনজ্বালা চোখে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর বলে, 'হুঁ! তাই তো বলি এত সুমতি, এ কি শুধু আমার উপকার? না শুধু টাকার লোভ? দেখছি লোভের হাত অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছিস! ভারী চালাক হয়েছিস।'

চিত্রার বুক বাঁধা। তাই চিত্রা অকাঁপা গলায় বলে, 'তা কৃষ্ণাদি, জাত যাবে পেট ভরবে না, এত বোকাই বা হতে যাবো কেন? অপবাদ যদি মাথায় তুলে নেব তো সেই অপবাদের মাটিতেই ঘর বেঁধে বাস করবো।'

হ্যাঁ এই অঙ্কই কষেছে চিত্রা সরকার। এই অঙ্কের জালেই জড়াতে এসেছে নিজেকে।

কিন্তু কৃষ্ণার কি মাথা-ব্যথা কাশী পাল লেনের চিত্রা সরকারের জাতের বদলে পেটটা ভরিয়ে দেবার? বরং ওর এই স্পর্ধায়, রক্তের মধ্যে আগুনের কণা ছিটফিটিয়ে ওঠে তার।

হতে পারে ওই 'ঠাণ্ডারক্ত' বরটার প্রতি আর কোন আকর্ষণ নেই তার, হতে পারে অনেক বিষয়বুদ্ধির মুখ চেয়ে এই সব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে সে, তা' বলে পরি-মলকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখবে নীলাম্বরী দাসীর ঝি?

কৃষ্ণা ঠাট্টা ইয়ার্কি ক'রে দুটো মজাদার কথা বলেছে বলে, সেই কথা লুফে নিয়ে নিজের কাজে লাগাবার বাসনা ওই পচাগলির নুলো অন্নদার ভাইঝির? এই বাসনার খবরে হঠাৎ পরিমলকেও দামী মনে হয় তার। পরিমল সম্পর্কে ভাবতেই তা হয়।

পরিমলকে কি কৃষ্ণা সত্যি ছেড়ে দেবে না কি?

মোটেই না।

সে তো কৃষ্ণা ঠিক ঠাক করে রেখেছে।

এটা ঠিক ওই ঘুঘু উকিলটার ওপর ঘুঘুমি করে তার ছেলেটাকে হাত করে ফেলেছে কৃষ্ণা, এবার কৃষ্ণার সেই কূটবুদ্ধির কাছে পরাজিত হয়ে ছেলেটাকে উৎসর্গ করতে চাইছে বুড়ো একটি বিবাহ বিচ্ছেদের নায়িকার কাছে। করছে অবিশ্যি টাকার

লোভে, আর করছে তার আরও গোটা ছয়েক ছেলে আছে বলেই হয়তো।

কিন্তু কৃষ্ণার পক্ষে কি আর ওই বয়সে দশ বছরের ছোট ছেলেটাকে 'একমাত্র অবলম্বন' করে ঝুলে পড়া সম্ভব?

বিবাহবিচ্ছেদটা চায় কৃষ্ণা।

চায় তেমন রোমাঞ্চময় একটি মামলার নায়িকা হ'তে। এই বৈচিত্র্যহীন জীবনে একটু বৈচিত্র্য না হলে আর বাঁচা যায় না। এই নিস্তেজ জীবনে একটু উন্মাদনার আবশ্যক। কৃষ্ণা যদি আদিত্যবাড়ীর মেয়ে না হয়ে ছেলে হতো, তা' হলে নতুনত্ব খুঁজতে এত কুটিল পন্থা ধরতে হতো না তাকে, একঘেয়েমির হাত এড়াতে এভাবে এত কাঠখড় পোড়াতে হতো না। তার বাপ-ঠাকুর্দা যা করেছে তাই করতো। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলেই কৃষ্ণার এত অসুবিধে। কিন্তু মেয়ের গায়ে কি বংশের ধারা স্পর্শ করে না? তার মধ্যে কি অন্য রক্ত বয়?

বয় না। সেই সহজ সত্যটা মেনে নিয়েছে কৃষ্ণা, তাই বিবেকের দংশনে পীড়িত হবার গ্লানি তার নেই। তার হিসেবে আছে, বিবাহবিচ্ছেদের মজার মামলা শেষ হয়ে যাবার পর, পরিমল তো আইনত কৃষ্ণার কাছে পরপুরুষে পরিণত হবে? তবে আর তখন নতুন করে আসক্ত হতে বাধা কি? তাতেই তো উল্লাস। পুরনো বরটাকে আবার পোষা-কুকুরের মত পদানত করে রেখে দিতে পারার মত মজা আর আছে?

'তখন আবার আমার ওই তরুণ বরটিকে দেখিয়ে দেখিয়ে পরিমলের সঙ্গে মাতামাতি করবো।'

ভাবল কৃষ্ণা।

পরিমল?

ফুঃ!

ওকে কৃষ্ণা ঠিক জিনে নেবে। স্ত্রী হয়ে তেমন পারেনি, পরস্ত্রী হয়ে পারবে। কৃষ্ণা যদি মোহিনী মায়া বিস্তার করে, চিত্রার সাধ্য কি যে—আর তখন তো কৃষ্ণার হাতে আর এক অস্ত্র থাকবে। বলতে তো পারবে, 'হ্যাঁ কত যে তুমি ধার্মিক পুরুষ বোঝা গেছে। ঝিয়ের দিকেও তো চোখ পড়তে বাধেনি।'

হ্যাঁ, পরিমলের চোখের চাহনি দেখেছে কৃষ্ণা। দেখেছে চিত্রার দিকে সেই সপ্রশংস-দৃষ্টি। তাতে তখন ঘাবড়ায়নি কৃষ্ণা। ওটাই বরং নিজের অনুকূলে নিয়েছে। কারণ জানে ওর বেশী কোন ক্ষমতা নেই পরিমলের। খারাপ হবার জন্যেও ক্ষমতা দরকার। সে ক্ষমতা মেরুদণ্ডহীন জীবেদের থাকে না। কিন্তু তাই বলে চিত্রার ওই স্পর্ধার স্বপ্ন সহ্য করবে কৃষ্ণা?

কিন্তু চিত্রার স্পর্ধা সত্যিই বেড়েছে।

আসতে যেতে বাগানে দেখা না করে ছাড়ছে না।

প্রথমদিন পরিমল বলেছিল, 'আবার তুমি এই নরকের মধ্যে ইচ্ছে করে এলে কেন চিত্রা?'

চিত্রা মায়াকাজল টানা চোখ তুলে বলেছিল, 'স্বর্গের দেবতাকে রাতদিন দেখতে পাবো বলে।'

'কিন্তু এখানের নিশ্বাসে যে বিষ চিত্রা।'

'সে বিষকে অমৃত করে নেবার সাধনাতেই তো এলাম।'

'আচ্ছা কি করে এমন হ'ল বল তো? ক'দিনই বা দেখেছি তোমায়, কটাই বা কথা বলেছি?' অথচ—

'সে কথা তো আমিও ভাবি। আর ভাবি, কৃষ্ণাদি কবে মুক্তি দেবে তোমায়!'

'আমি কিন্তু তা' ভাবি না চিত্রা। কৃষ্ণার দেওয়া মুক্তির আশায় বসে থাকতে বাসনা হয় না আমার। আমি ভাবি সমস্ত কুশ্রীতাকে পরিহার করে পৃথিবীর এমন এক কোণে চলে যাওয়া যায় না, যেখানে কেউ চিনবে না আমাদের?'

চিত্রা বলেছে 'ভয় করে! ওসব ভাবতে বড় ভয় করে। তুমি আমাদের ওই কাশী পাল লেনের গলিতে এসে সকলের সামনে দিয়ে আমায় মালা পরিয়ে চন্দন পরিয়ে পাশে বসিয়ে নিয়ে যাবে, আমার সেই স্বপ্ন, আমার সেই গৌরব।'

হ্যাঁ কাশী পাল লেনের চিত্রা সরকার আদিত্য-বাড়ীর বাগানে বসে এমনি কাব্যিক ভাষাতেই কথা বলে। বলতে পারে। যে ভাষা লতিকা সরকারের বোধের বাইরে। লতিকা সরকারকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে আর শ্লেষ দিয়ে দিয়ে কথা বলা ছাড়া আর কোনো রকম কথা যে বলতে পারে চিত্রা, এ খবর কি চিত্রা নিজেই জানতো?

আর চিত্রার যে এত দুঃসাহস আছে তাই কি জানতো চিত্রা?

পরিমল বলে, 'যাও যাও, এক্ষুণি হয়তো খোঁজ পড়বে তোমার।'

চিত্রা আবেশভরা গলায় বলে 'পড়ুক না।'

'না, না সে বড় বিশ্রী হবে।'

'বিশ্রীই তো চাই। তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার—'

'আমি তবে যাই—' চঞ্চল হয়ে ওঠে পরিমল, 'তোমার কৃষ্ণাদি হয়তো এখুনি বাঘিনীর মত এসে পড়ে—'

'পড়বে না। তুমি দেখো। সে তো জানছে তার পাতা ফাঁদে এসে পড়েছি আমি।'

'তাই তো পড়লে!'

'ইস! এ আমার নিজের হাতে গড়া ফাঁদ!'

ওদিকে নীলাম্বরী দাসী আপসান, 'হারামজাদী শয়তানী। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি! আমার মেয়েকে রাশ টানতে আমি একটু গায়ে পড়ার ভান করতে বলেছিলাম বলে, আবাগীর বেটির তখন তেজ দেখিয়ে চলে যাওয়া হয়েছিল, আর এখন কি না আমার জামাইটাকে—! আর পরিমলকেও বলি! ছি ছি যা ভাবতাম তা' তো নয়। হবে কোথা থেকে? এ বাড়ীর অন্ন যার হাড়ে মজ্জায় মিশছে, তার কি আর ভাল থাকবার জো আছে?' আবার বলেন 'কিন্তু এই বেলা ও পাপ উচ্ছেদ কর কৃষ্ণা, নইলে—'

কৃষ্ণা ভুরু কুঁচকে বলে, 'তুমি থামো মা, আমার ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে এসো না। যা' করবার আমিই করবো।'

হ্যাঁ, যা করবার নিজেই করবে কৃষ্ণা।

মগজ তার, কাগজও তার।

সেই কাগজেরই একগোছা চুপি চুপি চিত্রার হাতে তুলে দেয় সে। ঠেলা দিয়ে বলে, 'যা পালা, দেখিস রাস্তায় যেন কেউ কেড়ে নেয় না। বোকামী করে ভাই-ভাজের হাতেও তুলে দিসনি। নিজের আখেরের জন্যে রাখবি—পুরো তিন হাজারই দিলাম।'

চিত্রার বুক কেঁপে ওঠে।

চিত্রার হাত থরথরিয়ে ওঠে। চিত্রা নোটের গোছাটা মুঠোয় চেপে ধরে বলে, 'কৃষ্ণাদি!'

কৃষ্ণা কুটিল হাসি হেসে বলে, 'থাক অতি ভক্তিতে গদগদ হবার কিছু নেই, আমি তো তোকে অমনি দিচ্ছি না। মনে আছে তো? কাল মার সত্যনারায়ণ আছে, সেই ছুতোয় রাতে থেকে যাবি। দুজনকে একঘরে পুরে ছেকল তুলে দেব কিন্তু।'

'ধেৎ!'

'ধেৎ আবার কি? তাই তো চাস। মরছিস তো তার জন্যে—'

'না না কৃষ্ণাদি অত কিছু করতে যাবেন না—'

'আচ্ছা যা করবো, তা' আমি বুঝবো।'

কিন্তু তারপর?

চিত্রা কি হঠাৎ কাঞ্চনত্যাগী সাধু হয়ে গেল?

তাই ব্লাউসের মধ্যে থেকে টাকাগুলো তার বুকের চামড়া পুড়িয়ে পুড়িয়ে ফোস্কার জ্বালা ধরাচ্ছে? চিত্রা কি বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে? রাস্তায় পড়ে যাবে না তো চিত্রা!

চিত্রার বুকের মধ্যে লুকোনো ওই আগুনের ঢেলাটা ছিটকে বেরিয়ে পড়ে লোক জানাজানি হয়ে যাবে না তো?

আর এই টাকার বিনিময়ে আগামী কালকের সেই ভয়ংকর রাত্রির প্রতিশ্রুতি?

চিত্রা কি ছুটে আবার দোতলায় উঠে যাবে? ফেলে দেবে এই আগুনের ঢেলাটা? বলবে, 'কৃষ্ণাদি আমায় মাপ কর!' বলবে 'কৃষ্ণাদি আমি ভুল করেছিলাম, ভাল না হয়ে উপায় নেই আমার! চোখের সামনে আমি আমার মার মুখ দেখতে পাচ্ছি। গালের হাড় ওঠা চোখের কোল বসা, ছোট করে চুল ছাঁটা সেই মুখ! দেখতে পাচ্ছি আমার বাবার—'

'চিত্রা!'

যথানির্দিষ্ট জায়গায় বেজে ওঠে এই

ডাক।

সন্ধ্যার পরের এই সময়টাই সান্ধ্যভ্রমণের সময় করে নিয়েছে পরিমল রক্ষিত। আদিত্যদের বাগানের মধ্যেই।

না এর বেশী হাঁটা অভ্যাস নেই তার। তাই বেশীদিন পারল না এখানে ওখানে নিরিবিলি খুঁজতে।

দীর্ঘদিনের অলসতার অভ্যাস এর বেশী আর এগোতে দেয় না। ওখানেই ঘুরপাক খায়, যতক্ষণ না চিত্রা বেরোয়। ডাক শুনে চিত্রা এগিয়ে আসে। এসে প্রায় আছড়ে পড়ে। না, আদিত্যদের ঘরজামাইয়ের গায়ের ওপর নয়, আছড়ে পড়ে সেই শুকনো ফোয়ারাটার মরচেধরা রেলিঙের ওপর।

'চলো চলো! এখুনি আমরা কোথাও পালাই চলো! নিয়ে চলো তুমি আমায় এখান থেকে।'

'কি হল? এ রকম করছো কেন চিত্রা? কেউ কিছু বলেছে?'

'না না না! কেউ কিছু বলেনি। তুমি চলো। তুমি তো বলো মুক্তির পথ খুঁজছো তুমি! সে মুক্তি তো তোমার হাতের মুঠোয় আছে।'

'কিন্তু তুমি তো তা' চাও না চিত্রা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চাই চাই! এখন চাইছি। যেমন আছি তেমনি বেরিয়ে পড়ি আমরা। পিছনে পড়ে থাক সমাজ সংসার, জীবনের অতীত।'

চিত্রার দৃষ্টিতে উদভ্রান্ত, চিত্রার ভাষায় নাটকীয়তা। কিন্তু নাটক তো আকাশ থেকে পড়া কোনও অবাস্তব বস্তু নয়? জীবনই নাটকের উপাদান, তার মুহূর্তগুলিই নাটকের উপকরণ।

হয়তো সকলের জীবনে নাটক দেখা দেয় না, হয়তো অনেকেই সন্ধান রাখে না তার জীবনের নাট্যরস কোথায়, কিন্তু চিত্রা সরকারের মত যদি কারো চিরদিনের ঝাপসা বিবর্ণ স্তিমিত জীবনের ওপর সহসা এমন উগ্র নাটকের ধাক্কা এসে লাগে, তার ভাষায় নাটকীয়তা দেখা দেবে বৈ কি।

বুদ্ধি চেতনা মস্তিষ্ক সব কিছুর ওপর যখন উত্তেজিত স্নায়ুর ফেনা উথলে ওঠে, তখন কে পারে নিজেকে নিক্তির ওজনের মধ্যে আটকে রাখতে?

চিত্রাও পারছে না রাখতে।

চিত্রাও উথলে উঠেছে।

কিন্তু পরিমল এতক্ষণ খোলা হাওয়ায় বাগানে পায়চারি করছিল। পরিমলের চির-শান্ত স্নায়ুদের উথলে ওঠার কোনো কারণ ঘটেনি। তাই পরিমল স্থির থাকে। পরিমল ধরে নেয় নীলাম্বরী দাসী, কি কৃষ্ণার কোনও অপমানকর ব্যবহারে এত বিচলিত হয়ে উঠেছে চিত্রা।

অকারণেই অপমান করে ওরা, পরিমল তো দেখছে এত বছর! অন্যকে, অধস্তনকে, অপমান করাই ওদের একটা বিলাস। অনেক ছোটছেলে জীবজন্তুকে যন্ত্রণা দিয়ে মজা

নিজের আখেরের জন্যে রাখবি।—পুরো তিন হাজারই দিলাম

পায়, সেই 'মজা' পাওয়ার খেলা আছে ওদের রক্তে। কৃষ্ণার মুখে গল্প শুনেছে, ওর কাকা, যিনি নাকি নিতান্ত তরুণ বয়সে পক্ষাঘাত হয়ে মারা গিয়েছিলেন, আর যাঁর স্ত্রীর সঙ্গে এখন বিষয় নিয়ে মামলা লড়ছে কৃষ্ণা, তিনি চাকর-বাকরদের দাঁড় করিয়ে রেখে তাদের সামনে স্ত্রীকে মারতেন। তুচ্ছ কারণেই এ কাজ করতেন। শুধু নিষ্ঠুরতার হিংস্র উল্লাসে।

কৃষ্ণা যে চিত্রাকে অকারণ অপমান করবে, বিচিত্র নয় সেটা।

তাই কণ্ঠে আরো কোমলতা আনে পরিমল রক্ষিত, অপমানের জ্বালা মুছিয়ে দেওয়া সুরে বলে, 'চিত্রা, একটু শোনো। যে কারণেই হোক, তুমি এখন বড্ড উত্তেজিত হয়ে উঠেছ, এখন বাড়ী যাও। শান্ত-মাথায়—'

'না না না! বাড়ীতে আর যাব না আমি। সেখানে গিয়ে শান্ত হবার উপায় আর নেই আমার। তুমি আমাকে তোমার বাড়ীতে আমার বাড়ীতে, আমাদের বাড়ীতে নিয়ে চল!'

'আমার বাড়ী!' একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসে পরিমল 'আমার কি কোথাও কোনো বাড়ী আছে চিত্রা? ঘরজামাইয়ের কি বাড়ী থাকে? থাকলে কি এই সোনার খাঁচায়—'

'আমরা আমাদের ঘর বেঁধে নেব গো! এই সোনার খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়ে দেখ একবার—'

চিত্রা দুহাতে চেপে চেপে ধরেছে ওর দুটো হাত, চিত্রা সেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, 'এখুনি কেউ এসে পড়বে, আর পালানো হবে না—'

'চিত্রা! অবুঝ হচ্ছ কেন? যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয়? যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতির দরকার। হঠাৎ একবস্ত্রে শূন্যহাতে পালানোর মত কাব্য করবার বয়েস—'

'শূন্যহাতে নয়', নীলাম্বরী দাসীর তেল-মালিশের ঝি, নীলাম্বরী দাসীর আদরের জামাইয়ের মুক্তোর বোতাম বসানো সিল্কের পাঞ্জাবীপরা বুকের ওপর আছড়ে পড়ে, 'টাকা দেব তোমায় আমি, অনেক টাকা!'

হ্যাঁ, চিত্রার কাছে অনেক টাকা!

সেই অনেক টাকা মজুত রয়েছে চিত্রার বুকের উষ্ণতাকে আরো উষ্ণ করে। ওই টাকা দিয়ে নতুন করে সংসার পাতবে চিত্রা, যেখানে পৃথিবীর কারো চোখ পড়বে না।

কিন্তু পরিমল তো পাগল নয়, যে পাগলিনীর এই টাকার আশ্বাসকে বিশ্বাস করবে? তাই সেই বুকে এসে পড়া মাথাটাকে আস্তে আরও একটু চেপে ধরে হেসে বলে, 'টাকা দেবে? হঠাৎ রেঞ্জার্সের ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গেলে না কি? তাহলে তো—

না, পরিমলের কথা শেষ হয়নি।

ঠিক এই মুহূর্তে মোক্ষদা ঝি কোথা থেকে যেন হঠাৎ এসে পড়ে, প্রয়োজনাতিরিক্ত চীৎকার করে ওঠে, 'ওমা এখানে এরা কারা গো? এই অন্ধকার কোণায়' অ বিধুর মা, অ, লালবেহারী, অ তারক, তোরা কোথায় গেলি রে মুখপোড়ারা? দেখ এসে—'

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ গাড়ীবারান্দার ওপর থেকে কৃষ্ণার তীব্র তীক্ষ্ণ শাসানো গলার হুকুম শোনা যায়, 'এই কে আছিস গেট বন্ধ করে দে। ঘর থেকে টাকা চুরি গেছে—'

তারপর, খানিক পর, গলি আর বড় রাস্তা একাকার করে ভয়ঙ্কর একটা ঝড় ওঠে।

কাশী পাল লেনের ক্ষুব্ধ অধিবাসীদের আহত বিক্ষোভ আদিত্যদের গেটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রথম কে যে 'পঞ্চাশটা কুকুর তেড়ে আসা'র পদ্ধতিতে বলেছিল, 'আদিত্যরা সরকারদের চিত্রাকে গেট বন্ধ করে আটকে রেখে চাবুক মেরেছে— ' সে কথা আর কারুর মনে থাকে না, তাকে জেরা করে সত্য মিথ্যা নির্ণয় করবার ধৈর্যও থাকে না কারুর, শোনা মাত্রই যে যেমন ছিল 'তার মানে?' বলে ছুটে এসেছে।

হতে পারে ওদের কারুর পরনেই ময়লা লুঙ্গি আর ছেঁড়া গেঞ্জি ছাড়া কিছু নেই, হতে পারে ওদের রান্নাঘরে রাতের খাবার বলে যা মজুত আছে, আর কেউ কেউ বা নিয়ে খেতে বসেছিল, তা অন্যের সামনে বার করে নিয়ে বসা যায় না। আর হতে পারে রগচটা অমিয় সরকারের সঙ্গে বনিবনাও নেই অনেকেরই, তবু এ হচ্ছে পাড়ার ইজ্জৎ, গরীবের ইজ্জৎ।

তাই ওরা একযোগে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁক দিচ্ছে 'বার করে দাও, বার করে দাও, নইলে গেট আস্ত থাকবে না। টুকরো টুকরো করে ফেলবো'।

হ্যাঁ প্রথম যখন ঝড় উঠেছিল, তখন এই রকমই দেখিয়েছিল আকাশটা। তারপর বাতাসের মোড় মস্ত একটা মোচড় খেয়ে ঘুরে গেল। আকাশের রং বদলে গেল।

গেট খুলে দিল ওরা।

সেই খোলা গেটের সামনে লাঠিধারী দ্বারোয়ান এসে দাঁড়াল না, দাঁড়ালেন আদিত্য বাড়ীর শেষগিন্নী নীলাম্বরী দাসী।

জনতা থতমত খেয়ে একটু চুপ মেরে গেল, আর নীলাম্বরী দাসীর রাশভারী গলা রাশ-ছাড়া স্বরে উচ্চারণ করতে থাকে—

'এই নিয়ে যাও তোমাদের কুলের ধ্বজা মেয়েকে! অন্য বাড়ী হলে, চাবকে পিঠের ছাল তুলে থানায় চালান দিত। আমি তা করিনি, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করি না আমরা। শুধু ঝিদের দিয়ে ওর এক গালে চুন আর এক গালে কালি মাখিয়ে দিয়েছি। ......ছি ছি ছি......উটকো ঝিয়েরা এসে চুরি-চামারি করে মরে বলে, ভদ্দরঘরের মেয়ে এনে ঘরে রেখেছিলাম আমি। ঘরের মেয়ের মতন রেখেছিলাম! কে জানতো দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম......এত বড় বুকের পাটা ওর যে, আমার মেয়ের ঘরের আলমারি খুলে টাকা নিয়ে সরে পড়তে আসে। একটা আধটা নয়, তিন তিন হাজার টাকা!......যাই ভাগ্যিস আমার জামাইয়ের নজরে পড়ে গেছল, তাই না সে জাপটে ধরে আটকে ফেলেছিল! পড়ল তো ধরা বমাল সুদ্ধ। নাও, এখন আমাদের তোমরা মারো কাটো যা ইচ্ছে করো! বড়মানুষ হয়ে যখন জন্মেছি, তোমাদের কাছে তো চির-অপরাধী হয়েই আছি।'

চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ জনতার সামনে, একনাগাড়ে এই কথাগুলি বলে নেন নীলাম্বরী।

ও'র কথা শেষ হ'তে আবার দু' চারটে ছেলেছোকরার ভাঙা ভাঙা কর্কশ গলা প্রতিবাদ করে ওঠে, 'মিথ্যে কথা! সাজানো মামলা—'

কিন্তু সে প্রতিবাদ দানা বাঁধে না, ভেতরের জোরের অভাবে ঝরে পড়ে। আর কোনও গলা ওঠে না।

কারণ নীলাম্বরী দাসী তখন প্রতিবাদের উত্তর দিচ্ছেন, 'বেশ তো, সাজানো মামলা যদি, তো—ওকেই সাক্ষী মানো। বলুক ও নেয়নি টাকা! ওর বেলাউসের ভেতর আমি নোটের গোছা পুরে দিয়েছি। বলুক বড়-গলায়!'

এর পরে বাতাস ঘুরে যেতে দেরী হয় না। কারণ সেই প্রধান সাক্ষীর মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্তই তো চরম সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কিন্তু নীলাম্বরী দাসীকেও পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। টাকার রহস্য সবটাই তাঁর অজানা। চিত্রার ব্লাউসের মধ্যে থেকে মোক্ষদাকে টাকা বার করতে তিনি দেখেছেন, কৃষ্ণার আলমারি থেকে কৃষ্ণাকে টাকা বার করতে তিনি দেখেননি।

মেয়েটার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল, সেই বিশ্বাসভঙ্গে ক্ষেপে ওঠা আশ্চর্য নয়। কৃষ্ণা যখন বলল, 'আলমারিতে চাবিটা লাগিয়ে একবারের জন্যে ও ঘরে গিয়েছি, সেই তক্কে—'

তখনও নীলাম্বরী বিশ্বাস করেননি সে-কথা, কিন্তু প্রমাণ যদি আগুনের ছুরি হয়ে চোখে বেঁধে? আর উপায় কি?

মোক্ষদার উপস্থাপিত ঘটনা এই—চিত্রাকে সন্দেহজনকভাবে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে যেতে দেখে জামাইবাবু ধরে ফেলেছিল, ভাগ্যগুণে সেই মুহূর্তে মোক্ষদা গিয়ে পড়ায়—

সেই ঘটনাই জানিয়েছেন নীলাম্বরী।

উপসংহারে আক্ষেপ প্রকাশ করেন তিনি, 'ভালোমানুষ জামাইটা আমার এই বিতিকিচ্ছির গোলমাল দেখে আধা মূর্চ্ছা হয়ে শুয়েই পড়েছে গিয়ে। দেখি এখন কেমন থাকে। মাথাঘুরে হঠাৎ কোন রোগই না হয়ে পড়ে। সাধে বলছি দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষেছি আমি!'

সমস্ত অভিযোগের সামনে ফোয়ারার ওই ভাঙা পাথরের পরীটার মতই পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রা।

পুতুলটা নিরাবরণ।

কিন্তু চিত্রার অবস্থাই বা তা ছাড়া কি? সমস্ত পৃথিবীর সামনেই তো নিরাবরণ হয়ে গেছে সে আজ। গেছে ভেঙে টুকরো হয়ে।

হেঁট মাথা আসামীর দিকে তাকিয়ে মাথা হেঁট করে ফিরে গেল ওরা। বিধ্বস্তমূর্তি ঝড় এবার কাশী পাল লেনে গিয়ে ঢুকলো। সমস্ত রোষ ক্ষোভ ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা রূপান্তরিত হয়ে গেল একটা তীব্র ছি ছিক্কারে।

কী লজ্জা! কী ঘৃণা! কী ক্লেদাক্ত অনুভূতি!

অনেকের পদতাড়নায় উল্টেপড়া ডাস্টবিনের যে জঞ্জালগুলো সারা গলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলো যেন ওদের গায়ে মাখামাখি হয়ে গেছে।

নাকউঁচু আর রগচটা অমিয় সরকারের 'নাক ঘসটে যাওয়ার' আহ্লাদটা এখনো অনুভবে আসছে না।

মূল আসামী অমিয় সরকারও অনুপস্থিত, তাই তাকে এক হাত দেখে নেবার সুখটাও হচ্ছে না, অতএব একই কথা বার বার উচ্চারিত হচ্ছে......'ছি ছি ছি!'

সেই খোলা গেটের সামনে লাঠিধারী দারোয়ান এসে দাঁড়াল না। দাঁড়ালেন আদিত্য বাড়ীর শেষ গিন্নী নীলাম্বরী দাসী।

শুধু মেয়ে মহলে আগ্রস্থ মন্তব্য চলছে, জানতাম এই রকম একটা কিছু হবেই। হবে না? শুধু চুরি? জাতধর্ম আর কিছু বজায় রেখেছিল নাকি পাড়াজ্বালানি লক্ষ্মীছাড়া! বড়মানুষের বাড়ীর ঝিগিরি করে আর ফর্সা কাপড় পরে ধরাকে যেন সরা দেখছিল। স্বভাব ভাল থাকলে কখনো অত অহঙ্কার হয়?'

কারুর আর মনে পড়ে না সেই এতটুকু বেলা থেকেই চিত্রা ঝাঁজি তেজী অহঙ্কারী।

ঘরের লোক লতিকারও না।

ভয়ে-লজ্জায় অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে থেকে সেও এইবার মুখ খুলেছে। বলছে, 'সে সন্দেহ আমারও হয়েছিল। অহঙ্কারে মানুষের সঙ্গে যেন কথাই বলত না।'

অতএব চিত্রার ওপর আর সহানুভূতি রাখবার দরকার নেই। চিত্রার প্রতি আর কারো কোনো কর্তব্যের দায় নেই। চিত্রার ইজ্জতকে নিজেদের ইজ্জৎ বলে ভাববার দরকার নেই।

চোর আর চরিত্রহীন মেয়েমানুষকে কে মানুষের মূল্য দিতে যাবে?

খড়ের আগুন যেমন মুহূর্তে জ্বলে, তেমনি মুহূর্তেই নেভে।

গলিও ক্রমশ ঠান্ডা মেরে গেল।

রাঁধা ভাত কড়কড়ে হয়ে যাচ্ছে সকলের।

অমিয় এসে পড়লেও বা আর একবার ঝড়টা ঝালানো হতো। কিন্তু অমিয়র এখন লাস্ট শিফটের কাজ চলছে, ফিরতে রাত বারোটা বাজে।

সেই বারোটা রাত্তিরে এল অমিয়।

দেখল স্বিজুদের সেই তেরছা রকটুকুতে জনা তিনেক বসে। সুধীরবাবু তার মুখপাত্র। বসে থাকা দেখে কিছুই ভাবেনি অমিয়, গরমের জ্বালায় অমন অনেকেই এসে বসে এখানে। চমকে উঠল সুধীরবাবুর ডাকে।

বুক কাঁপিয়ে দেওয়া শান্ত সুন্দর কণ্ঠে সুধীরবাবু ডাকছেন, 'অমিয় শোন! কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

ধীরে ধীরে সুরু করেন সুধীরবাবু। বলেন, 'যে অবস্থা তখন—'

শেষ পর্যন্ত সব কথা শোনবার ধৈর্য হয় না অমিয়র। উগ্রস্বরে বলে ওঠে, 'তারপর? ছেড়ে দিল তো শেষ অবধি? না কি—'

'ছেড়ে?'

পরস্পর একবার মুখ চাওয়াচায়ি করে বলেন, 'হ্যাঁ তা গেট খুলে দিল তো। খুলে দিয়ে গিন্নী একেবারে যাচ্ছেতাই! বেচারা জামাইটা তো অজ্ঞান-ফজ্ঞান হয়ে—'

'অত কথা শুনতে চাইনা, বাড়ী এসেছে সে?'

বাড়ী।

বাড়ী এসেছে কি না চিত্রা।

তা তো কই দেখেনি কেউ।

কিন্তু 'দেখিনি' একথা বলা যায় না। তাই বলতে হয়, 'হ্যাঁ তা এসেছে বৈ কি। ওই দলের মধ্যেই চলে এসেছে নিশ্চয়। কোথায় আর যাবে?'

অমিয় আরো উগ্রস্বরে গর্জন করে ওঠে, 'যমের বাড়ীও যেতে পারে। এতগুলো মানুষ আপনারা দেখলেন না, মেয়েটা তারপর বাড়ী এল কি না?'

'অতগুলো মানুষের' প্রতিনিধিটি আর শান্ত সুন্দর ভঙ্গিমাটি বজায় রাখতে পারেন না। বলে ওঠেন, 'আমাদের আর প্রবৃত্তি হয়নি অমিয়, সেই মেয়ের মুখ দেখি। তা তার জন্যে আর তোমায় উদ্বিগ্ন হতে হবে না, সে মেয়ে তোমাকে আমাকে এক হাটে বেচে আর হাটে কিনে আনতে পারে। দেখগে যাও ঘরে, দিব্যি খেয়ে দেয়ে ঘুম দিচ্ছে।'

না, ওঁদের হিসেব মনুষ্য প্রকৃতির ধারে কাছেও যায় না। খেয়ে দেয়ে ঘুম দিতে আজ লতিকাও পারেনি। দাওয়ার খুঁটি হেলান দিয়ে বসেছিল এই রাত অবধি। অমিয়কে দরজা খুলে দিয়ে নিঃশব্দে আবার গিয়ে বসল। অমিয় বোঝে এটা গৌরচন্দ্রিকা। কিন্তু

অমিয়র এখন রসবিস্তারের আশায় অপেক্ষা করবার মত অবস্থা নয়।

বিনা ভূমিকায় বলে, 'চিত্রা ফিরেছে?'

লতিকা ভ্রূকুটি করে বলে 'না।'

'কোথায় গেল খোঁজ করেছিলে?'

'দায় পড়েছে আমার!'

'এই খবরদার!' ক্ষেপে ওঠে অমিয়, 'ছোটলোকের মতন কথা বলবে না, খোঁজ করনি কেন এতক্ষণ?'

অন্য কোনও সময় হলে এহেন একটা কথার উত্তরে হাজারটা কথা শুনিয়ে দিত লতিকা, কিন্তু অমিয়র এ মূর্তি যেন ওর অপরিচিত। তাই ঘাবড়াল। বেজার মুখে বলল, 'আমি মেয়েমানুষ আমি কোথায় খুঁজতে যাব?'

'না তা যাবে কেন?' তুমি কেবল বাড়ী বসে চিপ্‌টেন কেটে কথা বলবে।'

পায়ের চটি পায়েই থাকতে তীরবেগে বেরিয়ে গেল কটুভাষী অমিয় সরকার। আর বেরিয়ে যাবার সময় হঠাৎ এই কথাটা মনে করে শুকনো শুকনো জ্বালা করা চোখ থেকে এক ঝলক জল উপছে পড়ল তার, 'ছোট বোনটাকে একদিনের জন্যে একটা মিষ্টি কথা বলিনি আমি।'

কিন্তু চোখের জলটা নেহাতই বাজে খরচ গেল চিত্রার দাদার।

হার্টফেল করে মরে ফুটপাথে পড়েও নেই চিত্রা, পথ শূন্য করে গঙ্গায় ডুবে মরতেও যায়নি। জলজ্যান্ত বসে আছে হাঁটুতে মুখ রেখে, আদিত্যদের গেটের বাইরে বাহারি 'পিলারটার পিছনের খাঁজে ঘাসের ওপর। সেই ছোটবেলায় আদিত্যদের বাগানে খেলতে এসে 'লুকোচুরি'র সময় গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে বসে থাকতো যেখানে।

অমিয় জানে, তাই অমিয় চট করে দেখতে পেয়েছে। লতিকা যদি খুঁজতে আসতো ননদকে, খুঁজে বেড়াতে হতো খানিকক্ষণ।

মিনিটখানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখল অমিয়, তারপর বিনা ভূমিকায় বলল, 'বাড়ী চল্!'

চিত্রা একবার হাঁটু থেকে মুখ তুলল, আবার নামাল। যেমন বসেছিল বসে রইল। এইমাত্র যার নিজের রূক্ষতার কথা স্মরণ করে চোখে জল আসছিল, তার কণ্ঠস্বরে কিন্তু কোমলতার কোন আভাস খুঁজে পাওয়া গেল না। সেই তার চিররূক্ষ গলায় আবার বলে উঠল, 'দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি সারারাত? ওঠ।'

এবার চিত্রা মুখ তুলল। মুখ খুললও, 'তুমি যাও আমি যাব না।'

'আমি যাবো, তুই যাবি না? গল্পচ্ছির নাটক নভেল পড়ে পড়ে খুব নাটক শিখেছিস সে দেখছি। নাইট শিফট্ সেরে এই মাত্র ফিরেছি চিত্রা, জল ফোঁটাটা মুখে দিইনি এখনো। মেজাজ চড়িয়ে দিসনি, উঠে পড়!'

'দাদা!' উঠে পড়ে চিত্রা, কিন্তু নড়ে না এক পা। পিলারটায় ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বলে, 'তুমি সব কথা জানো না—'

'মেলা কথা জানবার আমার দরকার নেই চিত্রা, তোকে জানি, তা'হলেই চলবে। যত পারিস বাড়ী গিয়ে বকবক করিস। খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে বাবা, দাঁড়াতে পারছি না। জানি না, মহারাণী পিণ্ডির ডেলাটুকু সেদ্ধ করে রেখেছেন, না সন্ধ্যেবেলার রংতামাসার ছুতোয় রান্নাঘরকে ছুটি দিয়ে বসে আছেন। তেমন হলে কিন্তু এই রাত্তিরে তোকে আবার হাঁড়ি নাড়তে হবে চিত্রা তা' বলে রাখছি।'

'দাদা!' তবুও নড়ে না চিত্রা। আগের মতই কেমন একটা শুকনো খটখটে গলায় বলে, 'বাড়ী ফেরবার উপায় আর আমার নেই দাদা।'

উপায় নেই।

বাড়ী ফেরবার উপায় নেই অমিয় সরকারের বোনের!

অমিয় তা'র হাড় জিরজিরে বুকটার ওপর বাখারির মত হাত দু'খানা আড়াআড়ি করে রেখে বলে, 'তা নিরুপায়তাটা কি? বিশ্বাস করতে হবে আদিত্যগিন্নীর সিন্ধুক ভেঙে টাকাটা সত্যিই চুরি করেছিলি তুই।'

'সে কথা যদি বলতে পারতাম দাদা', চিত্রার বোধকরি প্রতিজ্ঞা, গলাকে কাঁপতে দেবে না, তাই একটু থেমে বলে, 'বেঁচে যেতাম। কিন্তু তা' বলতে পারছি না। ও টাকাটা আমি, হ্যাঁ ও টাকাটা আমি আদিত্যগিন্নীর মেয়ের কাছ থেকে আগাম নিয়েছিলাম চোরাই মাল বেচবো বলে।'

'চোরাই মাল! তুই চোরাই মাল বেচবি বলে? বলি তুই পাগল হয়েছিস, না আমি পাগল হয়ে গেছি? বুঝতে পারছি না তো। বলি মালটা কি?'

চিত্রা কেমন এক বিচিত্র হাসি হেসে বলে, 'সরকার বাড়ীর সুনাম, সম্মান, পবিত্রতা! চুরি করে নিয়ে এসে ওর কাছে বেচবো বলেছিলাম।'

অমিয় সরকার কোনোদিন নাটক নভেল পড়েনি, তবু এই নাটুকে কথার মানে বোধকরি বুঝতে পারে। সেই বুঝতে পারার যন্ত্রণায় মিনিট দুই গুম্ হয়ে থেকে আস্তে বলে, 'বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে না গিয়ে তোকে এইখান থেকেই গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল আমার চিত্রা, কেটে টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু সে মুখ নেই রে! বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি তোকে, মরতে পাঠাবো কোন মুখে?'

'দাদা, আমার মরাই উচিত—'

'না', অমিয় সরকারের গলার স্বর স্বাভাবিক রূক্ষতায় ফিরে আসে, 'উচিত নয়। প্রাণ জিনিসটা এত সস্তা নাকি? আমাদেরও যে বাঁচবার কথা ছিল, সেইটা মাঝে মাঝে ভুলে গিয়েই এই সব আপদ এসে জমে। কিন্তু ভুল শোধরাবার কথাও ভুললে চলবে না চিত্রা! নে চল—'

কাঁকড়ার দাড়ার মত সরু সরু কঠিন আঙুলগুলো দিয়ে বোনের একটা হাত চেপে ধরে অমিয়।

তবু চিত্রা থেমে থাকে।

তবু চিত্রা মিনতি করে।

'দাদা, ওই কাশী পালের গলিতে আর মুখ দেখাতে পারবো না আমি!'

অমিয় পা বাড়াচ্ছিল, সে পা থামায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বভাবছাড়া গাঢ় স্বরে বলে, 'মুখ দেখাতে যদি কারো লজ্জা হবার কথা থাকে তো সে তোর নয় চিত্রা, অমিয় সরকারের। কিন্তু তবু অমিয় সরকার মুখ দেখাবে। সেইটাই তার পাওনা শাস্তি।'

'দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—'

'পড়বি তো পড়িস বাবা! বড় ভাইয়ের পায়ে পড়বি সেটা তো বাহুল্য কিছু না। ধীরে সুস্থে বাড়ী গিয়ে পড়িস—'

গাঢ় স্বরকে বেশী আমল দেবে না অমিয় সরকার।

তবু চিত্রা পা বাড়ায় না।

বলে, 'বাড়ী ফেরার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি দাদা, এমন জানলে কখন গঙ্গায় গিয়ে—! শুধু ওর সঙ্গে আর একবার দেখা করবো বলে—'

ওর সঙ্গে।

দপ্ করে জ্বলে ওঠে অমিয়, 'ওর সঙ্গে আবার দেখা করে কী স্বর্গলাভ হবে?'

চিত্রা আস্তে বলে, 'ওর তেমন দোষ ছিল না দাদা! ও আমায় 'চোর' বলে জেনেছে। তাই মাথা ঘুরে—'

কথা শেষ করতে দেয় না অমিয়, কড়া গলায় বলে ওঠে 'চোর বলে জেনেছে! কেন চোর বলে জেনেছে, কেন শুনি? জানলো কী বলে? কই আমি তো তা' জানলাম না? ওখানে কোনো ভরসা রাখতে যাসনি চিত্রা, আবার ঠকবি। আসল কথা আমি বলছি, আরামের গদি ওদের শিরদাঁড়ার জোর মেরে রেখেছে, অন্যায়ের বিপক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাই রাখেনি। তাই অন্যায় হচ্ছে দেখলে মূর্ছা গিয়ে বাঁচে ওরা। কিন্তু আমরা তো আর কোনদিন ইস্প্রীঙের গদিতে পিঠ দিইনি, যে মূর্ছা যাবো, মরতে যাবো!......থাক, মাঝ রাত্তিরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঢের বক্তৃতা হয়েছে, বাড়ী গিয়ে পেটে দুটো না দিলে আর—'

কাঁকড়ার দাঁড়াগুলোর আর একটু চাপ দিয়ে কাশী পাল লেনের দিকে পা বাড়ায় অমিয় সরকার। বকের মত সরু সরু লম্বা লম্বা পা।

অন্ধকার গলির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা। নিঃঝুম নিঃসাড়—অন্ধকার! মনে

হচ্ছে এই অন্ধকারের পাঁজরে লুকিয়ে থাক মানুষগুলো বুঝি মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এ গলিতে আবার সূর্যোদয় ঘটবে, সে কথা এখন যেন আর বিশ্বাস হচ্ছে না।

তবু সেই অবিশ্বাস্য ঘটনাও ঘটে।

কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে না।

তিনকোণা সেই রোয়াকটায় বসে যারা জটলা করছিল, তারাও উঠে গেছে। অমিয় সরকারের ফেরার দেরী দেখে, হয়তো বা ভয় খেয়েই উঠে গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। মনের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করছে, 'আমাদের কী দোষ? তার বোন মনের ঘেন্নায় গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যাবে কি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, তার জন্যে আমরা দায়ী? গিয়েছিলাম তো ন্যায়ের পক্ষ হয়ে লড়তে। তোর বোনই চুনকালি দিয়েছে আমাদের মুখে।'

অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছে ওরা। রাতে আলো জেলে রেখে ঘুমোবে, এত বিলাসিতা কাশীপাল লেনের বাসিন্দাদের নেই।

আলো জেনলে শোয় বড় বাড়ীর লোকেরা।

মৃদু নীল আলো।

স্বপ্নময়, মোহময়।

জানলার কাচ দিয়ে দোতলার ওই ঘরগুলো তাই পরীর দেশের মত দেখতে লাগছে। যে পরীর দেশ শুধু কল্পনায় থেকে ছলনা করে।

অথচ ওই ছলনার ঘরে শুয়ে নীলাম্বরী দাসী ভাবছেন। 'মেয়েটা এত ছলনাময়ী! আমি হেন মানুষ ধরতে পারিনি ওর ছলনা! ভাল ঘরের মেয়ে বলে বিশ্বাস করেছিলাম ওকে। শেষে কিনা চুরি করে মল!'

পরিমল রক্ষিত মূর্ছাভঙ্গের আধতন্দ্রার ঘোর নিয়ে ভাবছে, 'কাচকে আমি কমলহীরে ভেবেছিলাম! ভেবেছিলাম ওর যা অহংকার সে বুঝি সত্যিকার তেজের। ছি ছি, শেষে কি না একটা চোর মেয়েকে আমি—!

ভাবছে, 'আশ্চর্য! চোখে দেখলাম, বিশ্বাস হয় না তবু। কিন্তু—অবিশ্বাসই বা করবো কোন্ পথ ধরে? এ তো ওর ঘরের বালিশের তলা থেকে পাওয়া যায়নি? পাওয়া গেছে ওর দেহের মধ্যে থেকে! কি করে বলবো আর কেউ ষড়যন্ত্র করে রেখে দিয়েছে লুকিয়ে। ঘুমন্ত নয়, জাগন্ত মানুষটা। বুঝতে পারছি লোভই ওকে নষ্ট করেছে। টাকার লোভ নয়, জীবনের লোভ। ওই টাকার আশ্বাস দিয়ে ও আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছিল, সেই ওর জীবন-স্বপ্নের দেশে। মমতা হচ্ছে ওর ওপর। করুণা হচ্ছে। তবু কিছুতেই ভুলতে পারছি না, কৃষ্ণার আলমারী খোলা পেয়ে টাকা চুরি করে পালাচ্ছিল ও।

তারপর আবার ভাবল...'ভাগিস মোক্ষদা ঝিটা ভুল ধারণার বশে ভেবেছিল, চিত্রাকে

যেমন বসেছিল বসে রইল

জড়িয়ে ধরেছিলাম আমি সন্দেহ করে—তা নইলে আর এক কলঙ্কের দায়ে পড়তে হতো ওকে।....ভাবল, 'এটা যদি গল্প উপন্যাস হতো, হয়তো এ গল্পের দুঃসাহসিক নায়ক ওই জনতার সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট গলায় বলতো, 'এ টাকা আমি দিয়েছি ওকে!' সেই মিথ্যা দিয়ে লাঞ্ছনা আর চুরির কলঙ্ক থেকে বাঁচাতো মেয়েটাকে।......কিন্তু জীবনটা তো গল্প উপন্যাস নয়।

আর এক পরীর দেশে বসে আদিত্যদের মেয়ে আদিত্যবংশের রক্তের দেনা শোধ করছিল। চোখে ঘোর, স্বরে জড়তা, হাত পা বেএক্তার, তবু গেলাশ ধরা হাতটা বারবার মুখে তুলছিল, আর বিড়বিড় করে বলছিল, 'পাপ হবে কেন? পাপ কেন হবে? মিথ্যে না কি? সত্যিই তো। গলির বাড়ীর মেয়েটা আমার আলমারী খোলা পেয়ে আসেনি আমার সর্বস্ব চুরি করতে? তার শাস্তি পেতে হবে না?......হ্যাঁ......আমার সর্বস্বই তো। পরিমলকে নইলে আমি বাঁচতে পারি?......পারি না, পারব না। তবু আমার আলমারী খুলে ফেলে রেখে দিই হাট করে। বলি, 'ওতে আমার কিছু নেই, আছে ছাইমাটি খোলামকুচি।' দাম বুঝতে দিই না। অগ্রাহ্য দেখাই। কেন দেখাব না? ও আমাকে ঘেন্না করে কেন? শোধ দেব না তার? নইলে ওর কাছে ওই উকিলের ছেলেটা? ফুঃ!......

হাতটা এলিয়ে আসে——কথা থেমে যায়, দেহটা স্পীডের সোফায় গড়িয়ে পড়ে। দীর্ণ বিদীর্ণ চিত্রা সরকারের ভাঙা চৌকীতে লুটিয়ে পড়া দেহটার মতই।

চলচ্চিত্রে শিল্পরূপ

পার্থপ্রতিম চৌধুরী
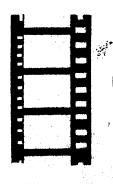
শেষের ঘণ্টাটি বাজবে আর অন্ধকার হবে। রুপোলী পর্দার বুকে প্রক্ষেপিত হবে কতকগুলো জীবন আর জীবনের উত্তাপ; দর্শক অভিজ্ঞ হবেন, অভিনিবিষ্ট হবেন সেই নব অভিজ্ঞানে, যেখানে চলচ্চিত্রস্রষ্টার তুলির টান আর টানের তুলি পট সাজাবে পটুয়ার পটভূমে কিংবা পটভূমিকার অম্বিষ্ট শিল্পরূপে। শিল্পরূপের চেতনা, যে কোনো সৃষ্টির দর্পণেই তার মানসিকতার ছায়া ফেলবেঃ এবং এই মানসিকতার গঠনে চিত্রশব্দ সংগীতস্তব্ধতা প্রায় ক্ষেত্রেই স্রষ্টার অন্তর্দৃষ্টির অঙ্গীভূত হবে কয়েকটি সঙ্গত কারণে। প্রসঙ্গত যেমন চোখে দেখা, মাথায় ভাবা এবং মনে অনুভব করা যে কোনো সৃষ্টির আদিপাঠ, ঠিক তেমনি ছবি আঁকা কিংবা ছবি করার মেজাজেও স্রষ্টার দেখার অতীত দেখা বা মনের চোখে দেখাটাই হলো গোড়ার কথা। অর্থাৎ সেন্স অব পারসেপসন, যার উত্তরপ্রেরণা হলো কনসেপসন, চিত্রসৃষ্টির কৌলিন্যে সেই মেজাজটিকেই রসোত্তীর্ণ করতে হবে স্রষ্টাদের। এবং এইখানেই শিল্প তাকে গৌরবান্বিত করবে ললিতকলা তাকে গর্বিত করবে লালিত্যে।

সাধারণ চোখে শুধু বাইরের সুন্দরের বাস্তবিক সাধনা সহজদৃষ্ট, কিন্তু ফুল থেকে আকাশ অথবা জলপ্রপাত থেকে ধারাপাতঘনিষ্ঠ শিশুটির উদাস চোখের ছবি পরপর সাজিয়ে যদি কোনো তৃতীয় অর্থ সত্যম্-সুন্দরম্ হয়ে ওঠে, তা নিশ্চয়ই বিরলদৃষ্ট। দৃষ্টিগোচর দৃষ্টিগভীর সাধনাই ভালো সৃষ্টি: এবং সেইখানেই স্রষ্টা জাতের, স্রষ্টা জগতের।

প্রথাগত ছেড়ে তথাগত আনন্দের যে শরসন্ধান তাই হলো সৃষ্টির প্রথম এবং প্রধানধর্ম। এবং *"Art demands complete detachment"* অর্থাৎ দর্শনজাত অভিজ্ঞতার দার্শনিক উত্তরণ স্রষ্টার মনে মননে মানসিকতায় চিহ্নিত থাকবে। সার্থক হবে এক নিরাসক্ত নির্বিকল্প কল্পলোকের সাধনাঃ যেখানে পুতুল থেকে প্রতিমা গড়ার মন্ত্রমুগ্ধতায় শিল্পীস্রষ্টা ভাস্বরঃ শিল্পীস্রষ্টা অনশ্বর।

চলচ্চিত্রের নিজস্ব কয়েকটি প্রসাদগুণ আছে। যেমন গতি, সংগীত, স্তব্ধতা, কাব্যরস, বৈচিত্র্য আর বিশ্লেষণ। আর এই মূলগত ধর্মচেতনা বাদেও চলচ্ছবির আধুনিক ধ্যানধারণায় এক বিশিষ্ট শিল্পরূপ প্রতিফলিত থাকে এক ফলিত অর্থে। যুগ ও জীবনের যন্ত্রণায়, অস্তিত্বের বাস্তব বিশ্লেষণে, সমসাময়িক ব্যষ্টি অথবা সমষ্টির সমস্যায়, বক্তব্যের প্রখরতায় এবং পরিণত শিল্পজ্ঞানের নিত্যনতুন প্রসাধন সাধনায় আজকের দিনের চলচ্চিত্র প্রাপ্তবয়স্ক।

বিখ্যাত সুইডিস চলচ্চিত্রবিদ ইংগমার বার্গম্যান বলেনঃ

"Today the individual has become the highest form and the greatest bone of artistic creation. The smallest wound or pain of the ego is examined under a microscope as if it were of eternal importance. The artist considers his isolation, his subjectivity, his individualism almost holy."

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই যে চিরঞ্জীব ভূমিকা স্রষ্টার চেতনায় পরীক্ষিত হবে নতুন নতুন প্রতিজ্ঞায়, এর ভূমিকা বর্তমান দশকে, যে-কোনো শিল্পীস্রষ্টাকেই বিশিষ্ট অর্থে উদ্ভাসিত করবে। সুতরাং চলতি কালের চলতি ছবির ছন্দে স্রষ্টার ব্যক্তিসত্তার উপস্থিতি অনিবার্যভাবেই কি রূপে, কি রসে, কি ইঙ্গিতে বাস্তবিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। বস্তুসত্যের ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে স্রষ্টার নিজস্ব জীবনবোধ, কারুকল্পনা আর দর্শন যদি সান্নিষ্ট হতে পারে, তাহলেই আজকের ছায়াছবি তার বৈশিষ্ট্য দাবি করতে পারবে। উৎস জীবন, যা উৎপন্ন করবে উপন্যাস, যা উপস্থাপনায় হবে শিল্পদীক্ষিত এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিমার্জিত। ছবির ভাষাও বদলে যাচ্ছে, নতুন নতুন পরীক্ষাপ্রগতির সূর্যালোকে সে মূলতঃ বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠছে। চলচ্চিত্র নির্ণীত হচ্ছে আজ আর শুধু নিয়ম থেকে নয়, নীতি থেকে নয়; তার নিঃশ্বাসে প্রতিফলিত রয়েছে আজকের জীবনের উত্তাপ, জীবনায়নের স্পন্দন। ছায়াছবির প্রতিটি চরিত্র আজ সাদাকালোয় বিনীত এবং দুর্বিনীত, তাদের তীক্ষ্ণতা, রুক্ষতা কিংবা নিঃশব্দ উপস্থিতি আজ ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করছে। আধুনিক ছায়াচিত্রের চিত্রনাট্যে সংযম আর চিত্রকল্পতা অনুশীলিত হচ্ছে কাব্যগুণে, বিশ্লেষণী চেতনায়, বক্তব্যের যুক্তি পারম্পর্যে এবং সর্বোপরি মানবতায়—এক অখণ্ড অনশ্বর পরিপূর্ণ মানবতায়। তার সংলাপ সুরধর্মী; তথ্য বা বর্ণনা ধর্মী নয়। যেমন *"Smiles of a Summer night"* ইংগমার ব্যার্গমানের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, ফ্রিড চরিত্রটি পেত্রাকে বলছেঃ

"Now the Summer night smiles its second smile; for the clowns, the fools, the unredeemable."

অথবা অ্যালেন রেনেস-এর *"Last year at Marienbad"* ছবিতে যেখানে ছেলেটি মেয়েটিকে বলছেঃ

"I can no longer stand this role. I can no longer tolerate this silence, these walls, these whisperings worse than silence you're imprisoning me in . . .

Woman : Don't talk so loud, please don't.

Man : These whisperings, worse than silence that you're imprisoning me in. These days, worse than death, that we're living through here side by side, you and I like coffins laid side by side underground in a frozen garden.",

চলচ্চিত্রের সংলাপ রচনার নতুন দিকটিকে উচ্চারণ করেছে আশ্চর্য শিল্পজ্ঞান আর কাব্যগুণপ্রসন্নতায়। সংলাপে চিত্রকল্পও এসে গেছে স্বতঃস্ফূর্ত অনাবিলতায়, কিছু বোঝানোর বোঝা নয়, আজকের ছবির কথারা নিজস্ব ভঙ্গিতেই বোধবুদ্ধিকে জাগ্রত করবে, ইঙ্গিত করবে একদিকে। অর্থাৎ ফলিত সত্যকে অনাড়ম্বর কাব্যগুণে সে প্রতিফলিত করবে নানা রঙে; এবং সেই সঙ্গে চারিত্রিক জ্যামিতির জ্যা-মুক্ত করার আনন্দে সে হবে অনিবার্যভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ছবির সাহিত্য আপনা থেকেই ছবিতে এসে যাবে, কখন আসবে আর কখন যাবে, সে কেউই বুঝবে

না, পরন্তু আংশিকভাবে নয়, সর্বাংশেই এমন একটা মূলগত ছোটকথায় ভাঙ্গো কথা এবং অনেক কথা বলার মেজাজ থাকবে আধুনিক ছবিতে, যা আধুনিক দর্শকদেরও সাময়িক তৃপ্তির অতিরিক্ত এক অনাবিষ্কৃত চিরস্থায়ী আনন্দের সন্ধান দিতে পারবে।

শিল্পরূপের যদি কোনো নিজস্ব আইন থেকে থাকে, তা হচ্ছে চেতনাঃ এক পরিণত বিলম্বিত চেতনা; যার উত্তর দক্ষিণায়নে স্রষ্টার ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা আস্বাদ আনবে ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের, ছবির পর ছবি চিত্রে-বৈচিত্র্যে শব্দেস্তব্ধতায় আমাদের মুহ্যমান করবে, মুক্ত করবে, চমৎকৃত করবে, আনন্দিত করবে—সৃষ্টিসম্ভোগের আনন্দে আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের আলোআঁধারে প্রক্ষেপিত ছবির নায়কনায়িকার মতই প্রসারসংকোচনে পরীক্ষিত হতে থাকবো।

আরও যেমন এই বিরাট এবং বিচিত্র শিল্পমাধ্যমটিকে মূলগতভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আখ্যা দিলে, দর্শন-ইন্দ্রিয়টিই নিঃসন্দেহে এর চারুস্বচয়ন করবে। অর্থাৎ সেন্স অব ভিস্যুয়ালাইজেশন হলো প্রধান প্রতিভা; চলমান জীবনের ঘটনার পটপ্রান্তদেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার যে চোখ সেই দৃষ্টিই চলচ্চিত্রসৃষ্টিকে নতুন অর্থে উদ্‌ভাসিত করতে পারে। শুধুমাত্র সাহিত্যিকের চোখে নয়, সংগীতজ্ঞের চোখে নয়, দার্শনিকের চোখে নয়, এক আশ্চর্য কার্যকারণ সম্পর্কিত নিরূপণ বীক্ষণশক্তি এখানে অনুবীক্ষণের কাজ করবে। চোখের আলোয় চোখের গভীরে যে দেখা আসলে চলচ্চিত্রস্রষ্টার সেই তৃতীয় নয়নটিই এই শিল্পমাধ্যমটির মহৎ সম্ভাবনাকে স্বর্ণোজ্জ্বল করতে পারে। এবং চিত্রকল্পের সুন্দর সাধনায় সেই তৃতীয় নয়ন *"will bless the motion picture of today with real senses of wide angles of human existence and lenses of elementary philosophies that identifies that existence. Spottswood".*

'স্বর্গ হতে বিদায়' চিত্রে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও দিলীপ মুখোপাধ্যায়

দেখলাম সামনের শার্সি জানালাটার ফাঁকে খুকুর মুখ। তখন বিকেল। অতএব কনে দেখা আলো। খুকুর চুল বেঁধে দিচ্ছেন খুকুর মা। দূরে কেউ গলা সাধছে। শুধুমাত্র এইটুকু ইমেজকেই তার নিজস্ব বাস্তবিক মেজাজে ফুটিয়ে তোলা চলচ্চিত্রে খুব সোজা কথা নয়; কারণ যেহেতু চলচ্চিত্রের জনকোচিত গর্ব বিজ্ঞানের এবং সেহেতু বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের যান্ত্রিক অস্তিত্বের নিজস্ব কাঠিন্য থেকে সর্বাংশে একে মুক্ত করা অসম্ভব। শিল্পী যে ছবি আঁকেন ক্যানভাসে রঙ আর তুলির লালিত্যে তার ফটো তুললে কখনো কি সেই আসল ছবির রূপ-লাবণ্য খুঁজে পাওয়া যাবে তার বৈজ্ঞানিক প্রতিচিত্রে? না—যাবে না। ফটোগ্রাফীর নিজস্ব প্রসাদগুণে অর্থাৎ নিজস্ব ভংগীর লাবণ্য তাতে থাকতে পারে, তবে কখনোই সে সেই বিশেষ ছবিটির বিশেষ প্রাণটিকে চেতনাচঞ্চল করতে পারবে না। ঠিক তেমনি শিল্পীর চোখের যে দেখা তাকে সম্পূর্ণভাবে একই চেতনায় এবং মেজাজে শিল্পঘনিষ্ঠ করতে পারা চলচ্চিত্রায়নে প্রায় অসম্ভব; এই অসম্ভবের সম্ভাবনা তখনি মনোজ্ঞ হতে পারে যখন তা পরিবেশ প্রতিমাটি গড়তে পারে বিস্ময়কর শিল্পনৈপুণ্যে। অর্থাৎ মুড; ছবির চলমান সত্তায় যা অনিবার্য প্রাণকোষ, সেই মুড বা পরিবেশ চেতনাটি মেজাজমাফিক হলে চলচ্চিত্রেও ক্যানভাসের ছবিটিকে প্রাণচঞ্চল করা যায়। এই মুড বা পরিবেশ প্রস্তুতির জন্যে স্রষ্টার যে মানসপ্রস্তুতির ঐশ্বর্য প্রয়োজন, তা প্রায়শই বিরলদৃষ্ট। তাই শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবি ছবিই থেকে যায়—সার্থক চলচ্চিত্রের প্রাণপারে স্মর্তব্য হতে পারে না। ক্যামেরা নামক যন্ত্রটি যখন কোনো স্রষ্টার হাতে টানের তুলি হয়ে দাঁড়াবে তখন এবং কেবলমাত্র তখনই তাঁর তুলির টান স্পষ্ট হয়ে উঠবে নিজস্ব প্রসাদগুণে।

'অশান্ত ঘূর্ণি' চিত্রে জ্যোৎস্না বিশ্বাস

চলচ্চিত্রের পুরোভাগে সে ছিল ছবি তোলার যন্ত্র, মধ্যভাগে সিনেম্যাটিক রীতি-নীতির নব্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী, বর্তমান দশকে ছবি নয়, ছবির যন্ত্রও নয়, রীতিনীতি আর টেকনিক সর্বস্বতার স্খলনেও নয়, জীবন ও তার যন্ত্রণার গভীর মূল্যবোধে সে উত্তীর্ণ হতে চাইছে। এক অবিস্মরণীয় স্থিতসত্যের সত্তায় সে এক-

দিকে গভীর, অন্যদিকে পরিমিত হতে চাইছে, প্রমাণিত হতে চাইছে স্বধর্মের অনন্যসাধারণতায়। 'বাইসাইকল থীপ', 'রসোমন', 'অপু ট্রিলজি', 'অপরাজিত', 'দি সার্চ', 'দি মিরাকল অব মিলান', 'কানাল', 'নাইট ট্রেন', 'ব্যাড লাক', 'ফেট অব এ ম্যান', 'সেভেন্থ সীল', 'পাইজা', 'দি স্টারস', 'গুড আর্থ', 'লা দলচা ভিতা', 'এইট অ্যান্ড হাফ', 'সিটি বিনিথ দি নাইট', 'নাজারিন', 'নেকেড অ্যামং দি উলভস', 'লাইমলাইট' 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ' ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত ছবিগুলি সেই একই প্রতিজ্ঞা-প্রণীত: এঁদের অসাধারণত্ব জীবনের কাচের চুড়ির রঙের মেলায় নয়, সেই ভাঙা চুড়ির কাচের তীক্ষ্ণতায়। উন্নত বক্তব্য, শাণিত উপস্থাপনা, এবং সেই সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী শিল্পগুণ যা প্রকাশ করবে কাব্য, চিত্রকল্প, সংযম, পরিবেশ রচনা, সংগীত; আজকের সিনেমার এই হচ্ছে প্রকৃত সত্য তথা প্রাকৃতিক চেতনা। অস্থিমজ্জার মধ্যে যে অতীতসংস্কার রয়েছে আমাদের—কি গল্পে কি চরিত্রচিত্রণে, কি উপস্থাপনায়—বর্তমানে তার নবসংস্করণ চাই—যেখানে প্রতীতি অনেক বড় প্রমাণের চেয়ে, অভিজ্ঞতা অনেক বড় বিজ্ঞতার চেয়ে।

আজকের ছবির আকর্ষণ স্রষ্টার চিন্তা-ধারার ধারাপাতে, তার ট্রিটমেণ্ট লাইনের বিস্ময়কর সততায়—যেখানে বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নত চমকের সুযোগ নেওয়া হবে না, যেখানে কোনো বক্তব্যের বোঝা চাপিয়ে দর্শকদের হোমটাস্ক করানো হবে না; যেখানে বুদ্ধিমার্গের অহেতুক জটিলতার আশ্রয় নেওয়া হবে না। সৃষ্টির আদিসত্য সেই সত্যসুন্দরের আর আনন্দের মহত্তোমহীয়ান রূপটি: কোনো সুযোগসন্ধানী চিত্রস্রষ্টা সেই সত্যসুন্দরের বর্তমান চেতনাটির সঙ্গে অপরিচিত থেকে কখনোই সার্থক হতে পারবেন না—আত্মযোগ সন্ধানের সাধনায় সার্থক হবেন সেই পরিশ্রমী চিত্রস্রষ্টা, যিনি আকাশকে সব সময়েই রঙীন দেখেন না, যিনি মৃত্যুকে সবসময়েই নাটকীয় মনে করেন না, যিনি যে কোনো কবিতাকেই কাব্য আখ্যা দেন না বা যে কোনো নায়িকার অপ্রস্তুত হাসিটিকেই একশো লেন্সের কারাগারে যথানিয়মে বন্দী রাখতে চান না। স্বাতন্ত্র্য আসবে তখনই যখনই স্রষ্টার নিজস্ব চিন্তায়, শিল্পচর্চায় এবং মানসিকতা বা কনসেপসনে ভাঙা শ্লেটের আঁক কষার জীবন আর পিয়ানোর জীবনের তফাৎটা স্পষ্ট এবং প্রখর হবে; ছায়াছবির আলো আঁধারের ধর্ম ও তাদের স্বকীয় ইঙ্গিতকে অবলম্বন করে জীবনের সাদাকালো আঁকবেন তিনি, এমন অনাস্বাদিত মুহূর্তে অভাবিত নাটক উচ্চারিত হবে তাঁর সৃষ্টিতে, মনোনীত হবে এমন নিভৃত নির্লিপ্ততার কাব্য—যে সেই সুমহান স্বমহেই স্বতন্ত্র হতে পারবেন তিনি। ভূমিকার সঙ্গে পটভূমিকার, চিত্র-কল্পের সঙ্গে কল্পনার, শব্দের সঙ্গে নৈঃশব্দের মাহেন্দ্রমিলনেই আজকের স্রষ্টারা নতুন অর্থে পরিচিত হবেন চলচ্চিত্র সৃষ্টির দরবারে। তাঁদের ছবি কথা বলাবে, হাসবে, কাঁদবে এবং যথারীতি কাঁদাবে, হাসাবে কিন্তু এক নতুন নিয়মে। এই নিয়ম শিল্প-রূপের নিজস্ব নিয়ম; অরূপরতন নির্ণয় ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য এখানে অর্থহীন। তাই আজকের ছবিরা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত হবে না, শুধুমাত্র অবসর চিত্ত-বিনোদনের জন্যে তো নয়ই—তার রূপাভি-সার পূর্ণাপ্রণীত হবে শিল্পতন্ময়তায়, রুচি-জ্ঞানে, বোধবুদ্ধির শুদ্ধতায় এবং আনন্দচেতনায়—এক মহৎ আনন্দচেতনায়।

সুতরাং শেষের ঘণ্টাটি বাজবে আর অন্ধকার হবে—কিন্তু সেই অন্ধকারে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আজকের ছায়াছবিরা দর্শকদের অভিনন্দন জানাবে। এবং ছবির শেষে অন্ধকার নয়, সত্যিকারের আলো জ্বলে উঠবে এবার। সেই আলোতে দর্শক আর স্রষ্টার নতুন পরিচয় নিশ্চয়ই এই বিচিত্র শিল্পমাধ্যমটিকে বিচিত্রতর করে তুলবে নতুন প্রতিজ্ঞায়, নতুন প্রসাধনে, নতুন প্রাক-প্রাতে।

ক্রীতদাস

শ্রীপান্থ

"হু আই ইজ, হাউ ওল্ড আই ইজ, অ্যাণ্ড হোয়্যার আই ইজ বর্ন আই ডু নট নো!" বলেছিলেন ভার্জিনিয়ার এক বৃদ্ধ কৃষ্ণাঙ্গ। লিংকনের পায়ে পায়ে সহোদর ভাইয়ের মত ছুটে এসেছিলেন একটি শ্বেতাঙ্গ যুবক। হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন—কে তুমি বল। বুড়ো হেনরী ভাঙা ইংরেজীতে বলেছিল—জানি না। আমরাও তাই বলি।—আমি কে, বয়স আমার কত,—কোথায় আমার জন্ম আমি জানি না। কেউ জানে না। শুধু এটুকুই জানি আমরা যেদিন জন্মেছিলাম, লুম্বিনী উদ্যানে গৌতম সেদিন ভূমিষ্ঠ হননি, আমাদের কৈশোরে জেরুসালেমেও আমরা যিশু নামে কারও নাম শুনিনি, জুলিয়াস সিজার তখনও গলদেশ আক্রমণ করেননি,—সব কটি পিরামিডের কাজ শেষ হয়নি। শুধু তাই নয়, আমাদের যখন যৌবন, বাবর তখনও হিন্দুস্থানের মাটিতে পা দেননি, সেণ্টামারিয়া স্পেনের উপকূল ছেড়ে নতুন পৃথিবীর সন্ধানে বের হয়নি, ফরাসী দেশে বিপ্লব হয়নি, ইংল্যাণ্ডে উইলবারফোর্স নামে কোন ভদ্রসন্তানের নাম শোনা যায়নি। আমাদের যখন চূড়ান্ত যৌবন, সভ্যতার তখন শৈশব মাত্র। তামা আর ব্রোঞ্জের দিন পেরিয়ে সম্ভবত মানুষ তখন সবেমাত্র লোহা হাতে পেয়েছে,—বর্শার সঙ্গে শেকলের কথা ভাবছে।

আমি সেই সূর্যোদয়ের দিন থেকেই আছি। আমরা সভ্যতার এক আশ্চর্য সহযাত্রী। সিন্ধু উপত্যকায় যেদিন নবীন মানুষের পদসঞ্চার, আমরা সেদিন গমের ক্ষেতে কাজ করছি, নীল অববাহিকায় ফারাওদের আবির্ভাবের আগে থেকে আমরা কাপাস বুনেছি। আমাদের হাতে হাতে মহেঞ্জোদরো আমাদের হাতে হাতে পাথেনন, পিরামিড। আমরা নেবুচাঁদনাজারের পানপাত্রে সাকী হয়ে সুরা ঢেলেছি, থিবস্-এ আলেক-জাণ্ডারের লড়াই দেখেছি। হোমারের কালে আমরা উলঙ্গ দেহে খনিতে কাজ করেছি, বাইজেনণ্টাইন সম্রাটদের ক্ষুধার্ত জাগ্রাকে তৃপ্ত করার জন্যে আমরা নিজেদের সিংহের সামনে ছুঁড়ে দিয়েছি, রোমান সেনেটারদের করতালির লোভে আমরা তলোয়ার হাতে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই করেছি,—আপন সঙ্গিনীকে কুমিরের মুখে তুলে দিয়েছি। অ্যাম্ফিথিয়েটারে আমরা ক্রীড়াবস্তু, হারুন-অল-রসিদ-এর প্রাসাদ-অভ্যন্তরে পরিচয় আমাদের হুরী, আবার দিল্লি-লাহোরে হারেমের দরজায় দরজায় আমরাই খোজা প্রহরী। আমরা কখনও পৌরুষহীন পুরুষ, কখনও বাদশাহের ঈর্ষা অপরূপা নারী। পণ্য হয়ে আমরা দেশে দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, উপঢৌকন হয়ে আমরা এক রাজধানীর শহরগুলি থেকে দেশান্তরে সম্রাটের অধীশ্বরী হয়েছি। আমরা কখনও কেবলই খেটে-খাওয়া মানুষ, কখনও নর্তকী, কখনও কবি, আমরাই কখনও হিন্দুস্থানের বাদশা, রোমের যাজক। আমরা যখন কাঁদি অ্যারিস্টটলের মত মানুষ তখন হাসেন, আমরা যখন শেকল ছিঁড়ে উঠে দাঁড়াই তখন হাইতি তো সামান্য কলোনি,—রোমান সাম্রাজ্যেরই ভিত পর্যন্ত থরথর করে কাঁপে। আমাদের কথা শুনে এলিজাবেথ কাঁদেন, প্লেটো ভাবতে বসেন,—তবুও হাজার হাজার বছর পরে জর্জিয়ার গভর্নর সরকারী কাজ ছেড়ে জাহাজ নিয়ে আমাদের খোঁজে আফ্রিকা ধাওয়া করেন।—রাজা চতুর্থ উইলিয়াম কোম্পানি গড়েন, কলকাতার কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে কমদামী আফ্রিকান তরুণী খোঁজে! আমরা এক আশ্চর্য অস্তিত্ব।—সভ্যতার এক বিস্ময়কর সঙ্গী। শেকল সব দিন ছিল কি নেই, মনে পড়ে না, আমাদের উলঙ্গ পিঠ ইতিহাসের শিলা-লিপি; তাকিয়ে দেখ সেখানে নানা রঙে, নানা ভাষায় লেখা আছে বান্দাছাপ,—মানুষের বিস্ময়কর কাহিনী। আমরা ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। সম্ভবত আজও আমরা বেঁচে আছি। আমি এই বিশ শতকের পৃথিবীতে আছি।—হু আই ইজ, হাউ ওল্ড আই ইজ, অ্যাণ্ড হোয়্যার আই ইজ বর্ন আই ডু নট নো!

আমি জানি আমি কে। আমি জানি কেন আমি আজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজে,—এই আখের ক্ষেতে। সে অনেক, অনেককাল আগের কথা। এবং লিংকন তখনও পৃথিবীর আলো দেখেননি। লিভিংস্টোন প্রদীপ হাতে আফ্রিকার অন্তর্লোকে পা বাড়াননি। কিন্তু খ্রীস্টের বয়স হয়েছে, আমরা জানি, বেথেলহামের সন্ন্যাসীর বিদায়লগ্ন এক হাজার সাতশ' ক্রোশটি পেরিয়ে সাতশ্রোতে পড়েছে, তাঁর প্রতাপ প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। আমরা তখন উপকূলে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে পশ্চিমের সেই সূর্যোদয় দেখছি। আনন্দে আতঙ্কে, উত্তেজনায় আশঙ্কায় ঢাক পিটিয়ে বনের মানুষকে ডাকছি, শিশুর কৌতূহল নিয়ে সাগরের দিকে আঙুল তুলে একজন আর একজনকে বলছি—দেখ, দেখ।

পাল-খাটান মস্ত মস্ত জাহাজ ওদের, অদ্ভুত নিশান, অদ্ভুত চালচলন। হাতে হাতে তাদের আগুন-ভরা নল,—পলকে সেখান থেকে মরণ ছুটে বেরিয়ে আসে। খোল বোঝাই পিপে ভর্তি মদ—ওরা বলে 'রাম', অদ্ভুত গন্ধ তার, আশ্চর্য স্বাদ। ওরা আমাদের জাহাজে নিয়ে যায়,—'রাম' খেতে দেয়, রেশমী রুমাল দিয়ে আদর জানায়। মেয়েরা রং বেরংয়ের পুঁতি পায়। সর্দারেরা তলোয়ার, বন্দুক, বাহারি পোশাক। আমরা আপত্তি করতে চাই, কিন্তু ওরা কিছুতেই শোনে না, জাহাজ খালি করে দু' হাতে সব বিলিয়ে দেয়, বলে—ভাবছিস কেন? বিপুল দেশের মানুষ আমরা, ঈশ্বর দু'হাত ভরে আমাদের দিয়েছেন, তোরা নিবি নাকি!

মাঝে মাঝেই ওরা আসত। চলে যাওয়ার পর একবার দেখা গেল জনাকয় মেয়ে-মরদ গাঁয়ে নেই। সর্দার বলল—আমরা হল্লায় মেতেছিলাম, হয়ত বাঘে খেয়েছে, পুরোহিত বলল—হয়ত প্রেতে ধরে নিয়ে গেছে। কেউ কেউ বলল—কে জানে, হয়ত সেই সাদা মানুষগুলোই ওদের খেয়ে ফেলেছে। একজন বলল—অসম্ভব নয়, আমি দেখছিলাম ক্যাপ্টেন বারবার লোভীর মত মেয়েগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।—কে জানে, ওরা হয়ত বা চোখেই খায়! কথাটা বিশ্বাস হল না বটে, কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগল। আমরা পঞ্চায়েত ডেকে স্থির করলাম, আর জাহাজে যাওয়ার দরকার নেই, হতে পারে 'রাম' সরেস জিনিস, কিন্তু তাহলেও একটু সাবধান থাকা দরকার। বিশেষ করে আরও পাঁচ গাঁয়ের ধারণা, মানুষগুলো সুবিধের নয়। আচ্ছা, ঘরে থেকেই দেখা যাক না!

এবার থেকে জাহাজ এলেও আমরা আর ঘর থেকে বের হই না। আমাদের মধ্যে একটু ভীতু যারা তারা আরও সাবধান, সাগরে পাল উঁকি দেওয়ামাত্র বনে পালিয়ে যায়। ওরা আসে, কাউকে দেখতে না পেয়ে মনমরা হয়ে ডেকের ওপরই ঘুরে বেড়ায়, এখনও বা এক রাত্তির নোঙর করে থাকে, তারপর আবার নিজেদের পথে চলে যায়। আমরা মনে মনে ভাবি, আপদ বালাই।

পর পর দু'বার এমন হল। ওরা এল, চলে গেল। তৃতীয়বার এক অদ্ভুত কাণ্ড। ভোরে ঘর থেকে বেরিয়েই দেখি, আমাদের দুয়ারে পর পর পাঁচখানা জাহাজ বাঁধা। এতকাল জাহাজ সাগরেই থাকত, এবার উপকূল ছেড়ে চলে এসেছে নদীর ভেতরে, একেবারে গাঁয়ের ধারে। চোখ বুজে থাকলেও ফাঁকি দেবার উপায় নেই।

গাঁয়ের নাম জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কারণ আমাদের গাঁয়ের সত্যিই কোন নাম ছিল না। ওরা নাম দিয়েছিল কালাবা। ওটা আসলে আমাদের নদীর নাম। বিয়াফ্রা উপসাগরের নাম শুনেছ নিশ্চয়। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল যেখানে হঠাৎ মানুষের চোয়ালের পরে গলার মত বেঁকেছে সেখানটায় শান্ত জলের এই আনন্দিত সাগর। তারই বিশাল বুকে অরণ্যের আদিমতা নিয়ে আছড়ে পড়ছে বিরাট নদী কালাবার। কেউ কেউ বলে- কালাবা। বিরাট নদী। সঙ্গমে চওড়ায় প্রায় তিন মাইল। স্বভাবতই জল এখানে অপেক্ষাকৃত কম, লগি ফেললে তিন থেকে পাঁচ ফেদম্। সুন্দর জায়গা। আফ্রিকা এখানে মধ্যরাত্রির অরণ্য নয়। নদীর দুই তীরে বন ঘন ঝোপ মাত্র। তারই মধ্যে

নির্মল আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি তাল নারকেল। সূর্য তাদের কাছে নাগালের বাইরে নয় বলেই হয়ত গাছগুলো বাড়তে বাড়তে হঠাৎ থেমে গেছে, ছাতার মত পাতাগুলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে অগণিত লেগুন,—জলা; তালের ছায়ায় সেখানে নল-খাগড়া আর হাওয়ার খেলা।

নদীর মুখে এমনি দুটি জলার মধ্যে ছোট ছোট দুটি দ্বীপ। তার পিঠে এলো-মেলো কতকগুলো কুটির, দুটি বসতি। ওরা তার নাম দিয়েছিল ওল্ড কালাবার আর নিউ কালাবার'। কখনও নিউ কালাবারকে বলত ওরা নিউ টাউন। আমরা সেই জনপদের মানুষ। রক্তে দুই দ্বীপ আমরা এক ছিলাম। একই দেবতা, একই ভাগ্য, একই পৃথিবী। সুতরাং পাশাপাশি এই দুই দ্বীপে অশান্তির কোন কারণ ছিল না। চিরকাল আমরা শান্তিপূর্ণ প্রতি-বেশী। কিন্তু সেবার উপকূলে সেদিন এক সঙ্গে পাঁচ জাহাজ, আমরা তখন উত্তেজিত প্রতিবেশী। তুচ্ছ কারণে অবশ্য, কিন্তু আমাদের দুই দ্বীপে সেদিন মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সুতরাং আমরা ওল্ড কালাবার মানুষেরা নিউ টাউনের সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটতে পারলাম না, অসহায়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে জাহাজের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

দিন যায়, কিন্তু জাহাজের নড়বার কোন লক্ষণ নেই। আমরা শুনলাম—শুনতে পেলাম জাহাজগুলো সব এক জায়গার নয়। তাদের এক একটি এক এক নাম এক এক দেশ। নামগুলো সব অদ্ভুত অদ্ভুত; ইণ্ডিয়ান কুইন, ডিউক অব ইয়র্ক, ন্যান্সি, কনকর্ড, ক্যান্টারবেরী। তার কোনটি নাকি এসেছে লিভারপুল থেকে, কোনটি বোস্টন, কোনটি লন্ডন থেকে। তা আসুক, কিন্তু এভাবে মিছিমিছি নদীতে এসে পড়ে থাকা কেন? তবে কি ওরা পথ ভুল করেছে? দূরে থেকে আমরা দেখতাম এক দুজন করে নিউ টাউনের লোকেরা জাহাজে উঠছে, ডেকে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে চারপাশে কি যেন দেখাচ্ছে। বোধ হয় পথ ঘাট বোঝাচ্ছে। ওরা ডেক ছেড়ে নেমে আসছে, দেখামাত্র আমরা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিতাম, যে যার কাজে চলে যেতাম। তখন জুম-এর মরসুম। মাঠেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের এক গল্প—জাহাজ, জাহাজ আর জাহাজ।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরামাত্র হঠাৎ ঢাকের দুম-দুম। চেনা আওয়াজ, ভয়ের কিছু নয়—সর্দারের দাওয়ায় কথাবার্তা আছে—পঞ্চায়েত। ওল্ড টাউনের মেয়ে-মরদ সবাই ঘর ছেড়ে তখুনি সেদিকে ছুটল। সভা বসল। সর্দার বলল,—জাহাজের ক্যাপ্টেনেরা আমাদের নেমন্তন্ন করেছে। তারা এখানে এসে শুনেছে আমরা এক রক্তের মানুষ হয়েও দুই দ্বীপ শত্রু হয়ে আছি, শুনে তারা খুব ব্যথিত হয়েছে। তারা চায় আমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ মিটিয়ে ফেলি। নিউ টাউনের সর্দারকেও তারা জাহাজে নেমন্তন্ন করেছে। আমি গেলে ওরা মধ্যস্থ হয়ে সব ঝামেলার ফয়সলা করে দিতে রাজী। সঙ্গে আমি আমার গাঁয়ের লোকেদেরও নিয়ে যেতে পারি। বিবাদ মিটে গেলে জাহাজে খাওয়া দাওয়া হবে।—কি তোরা রাজী?

আমরা নিজেদের মধ্যে অনেক শলা-পরামর্শ করলাম। তারপর বললাম—গররাজী

প্রত্যেকের সামনে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গ যম

হয়েই লাভ কি? বিবাদটা যদি মিটে যায় তাহলেই ভাল নয় কি? এক ভয়, আগের বারের মত কেউ যদি হারিয়ে যায়। এবার সবং ক'জন যাচ্ছি মাথা গুনতি করে যাব, ফেরার সময়ও মাথা গুনে ফিরব।

সর্দার বলল—হুঁ, তা বুদ্ধি মন্দ নয়। তবে এখনি ঠিক করে ফেলা যাক ক'জন যাবে। আমার শরীর ভাল যাচ্ছে না, আমি তাই নিজে যেতে পারব না। তবে ভয় নেই, বদলে আমার বৌরা যাবে। আর যাবে আমার তিন ভাই। কথাবার্তা যা বলা দরকার তা এই তিনজনের বড় যে সেই এম্বোই বলবে। এবার তোরা নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নে তোরা ক'জন যাবি। এক সঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল—আমি যাব! আমি যাব! সর্দার বলল—বেশ, তাই যাবি।

পরদিন সন্ধ্যার আগেই আমাদের যাত্রার আয়োজন শেষ। সারি সারি ডোঙ্গা জলে ভাসান হল। তার প্রথমটিতে সর্দারের বৌরা, এম্বো এবং তার দুই ভাই,—এবং বাছা বাছা আর সাতাশ জন। পিছনে আরও নয়টি ডোঙ্গা বোঝাই করে আমরা ওল্ড কালাবার বাকি মানুষেরা।

ক্যাপ্টেন নিজে এগিয়ে এসে আঙুল টিপে অভ্যর্থনা জানাল এম্বোকে। প্রথমে 'ইণ্ডিয়ান কুইন'এ আমাদের ভোজ হল। তারপর দেখতে দেখতে আমরা পাঁচ জাহাজে ছড়িয়ে পড়লাম। সর্বত্র অঢেল খাবার। অদ্ভুত অদ্ভুত সওদা,—অফুরন্ত হুইস্কি, রাম্। আমরা খেয়েই চলেছি। কে কোন জাহাজে আছে কারও সেদিকে হুঁস নেই। আমি কেবল লক্ষ্য রাখছি এম্বো এই জাহাজে আছে কিনা। সর্দার নিজে যখন আসেনি, তখন এম্বোই আমাদের সর্দার। তার সঙ্গে থাকলে শুধু যে, সেরা জিনিস পাওয়া যাবে তাই নয়, আপদ বিপদের সম্ভাবনাও কম। আমি এম্বোর পাশে দাঁড়িয়ে আরও একটা রাম্-এর বোতল হাতে তুলে নিয়েছি। ওরা 'হুইস্কি' 'রাম্' সবই লাইমজুস কিংবা চিনি আর জলের সঙ্গে মিশিয়ে খায়, আমরা ঢকঢক করে এমনিতেই গলায় ঢেলে দিই, ওরা অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু হঠাৎ শূন্য বোতলটি রাখতে গিয়ে এবার আমি নিজেই অবাক। ক্যাপ্টেন এম্বোর বুকে নিশান করে সেই, আগুনে-নল উঁচিয়ে ধরেছে। আমাদের ওল্ড কালাবার লোকেদের প্রত্যেকের সামনে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গ যম। যম। তাদের কারও কারও হাতে তলোয়ার, কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে পিস্তল। এ দৃশ্য আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। আমাদের লোকেরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, আমি কোন দিক না ভেবে ক্যাপ্টেনের মাথা লক্ষ্য করে হাতের বোতলটা ছুঁড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বন্দুক গর্জন করে উঠল। বোতলটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি বলেই গুলীটা এম্বোর গায়ে লাগল না, কিন্তু আমাদের সঙ্গী আর একটি মেয়ে গোড়াকাটা গাছের মত উপড়ে হয়ে ডেকের বুকে আছড়ে পড়ল। ভোজসভা চোখের নিমেষে রণক্ষেত্রে পরিণত হল। চারদিকে আর্তনাদ, হৈ হল্লা। গোলা ছুটছে, বর্শা ঝিলিক দিচ্ছে। আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এসবের জন্যে তৈরী ছিলাম না। তাছাড়া খেয়ে খেয়ে আমরা ক্লান্ত। তবুও হাতের কাছে যা পাওয়া গেল তাই নিয়ে ওল্ড কালাবার মেয়ে-মরদেরা লড়াই করে চলল। কেউ কেউ লাফিয়ে জলে পড়ল। কিন্তু বৃথাই। ওল্ড কালাবারের কপালে সেদিন দুর্ভাগ্যের কাহিনীই লেখা। কেননা, চারদিকে আর্তনাদ শুনে বোঝা যাচ্ছে, শুধু আমাদের এই ডিউক অব ইয়র্কের ডেকেই নয়,—সব ক'টি জাহাজে একই ঘটনা ঘটছে। আমরা প্রতারিত হয়েছি, কোন অজ্ঞাত পাপে স্বেচ্ছায় মৃত্যু

ফাঁদে পা দিয়েছি। এ আমন্ত্রণ দস্যু দলের ষড়যন্ত্র মাত্র।

এই ষড়যন্ত্র আরও বীভৎস ঠেকল যখন দেখা গেল, এর পিছনে নিউ টাউনের লোকেরাও রয়েছে। যারা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বর্শা ছুঁড়ে তারা তাদের চিরকালের মত কালাবারের জলে ডুবিয়ে দিচ্ছে। আপনজনদের নৌকো দেখে যারা সাঁতরে ওদের নৌকোয় উঠছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাদের বেঁধে ফেলছে। তারপর নিরস্ত্র ওল্ড কালাবারের লড়াই বৃথা। আমরা তখনও যারা বেঁচে আছি, তারা হাত বাড়িয়ে মাটিতে উবু হয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্যাপ্টেনের লোকেরা এসে আমাদের হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে দিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ষড়যন্ত্র আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। লড়াই থেমে গেছে। জাহাজে জাহাজে আর্তনাদ কমে এসেছে, শুধু দু'একটি মেয়ে নিজের ছেলে অথবা স্বামীর নাম ধরে ডুকরে কাঁদছে। সে কান্নায় অন্ধকার উপকূলে থমথম করছে। জয়ধ্বনিতে তা ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ দুম দাম করে বিজয় গৌরবে ডিউক অব ইয়র্কের ডেক-এ এসে হাজির হল নিউ টাউনের সর্দার। ওরা তার নাম দিয়েছিল—উইলি অনেস্টি। সে বলল—ক্যাপ্টেন, আমার নজরানা দাও। ক্যাপ্টেন আমাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে কি যেন হিসেব করল, তারপর রুমাল, মদ, রুটি এবং কতকগুলো লোহার মুখোস আনিয়ে তার সামনে রাখল। উইলি চিৎকার করে উঠল,—কিন্তু সাহেব আসল জিনিস কোথায়?

সাহেব বলল—সর্দার আসেনি। তার ভাইরা এসেছে। এম্বো এখানেই আছে। যদি চাও তবে তাকে দিতে পারি বটে।

উইলির তখন রক্তের নেশা ধরে গেছে। তার সর্বাঙ্গে রক্ত, বর্শায় রক্ত, সে চেঁচিয়ে উঠল, বেশ তাকেই দাও! আমরা তাকেই চাই!

ক্যাপ্টেন আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এম্বো শেকল বাঁধা হাত দুটি বুকে রেখে কাঁদতে লাগল। সে বলল—সাহেব, তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করে এখানে এনেছ, ফাঁকি দিয়ে আমাদের লোকেদের বুনো শুয়রের মত মেরেছ, নিউটাউনের এই চিতাগুলোকে আমার অসহায় ভাইবোনদের ওপর লেলিয়ে দিয়েছ; সাহেব দোহাই তোমার, এবার তুমি থাম। তোমার যেখানে ইচ্ছা তুমি আমাকে নিয়ে যাও, কিন্তু তবুও তুমি আমাকে এই রাক্ষসদের হাতে তুলে দিও না। সাহেব, তোমার ঈশ্বরের কাছে নিজেকে দোষী করো না, তুমি আমাকে এভাবে নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিও না।

এম্বোর সেই আর্তনাদ শুনে আমার সহ্য হল না, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। একটি লোক সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠে বর্শা দিয়ে খোঁচা মারল। সামনে উদ্যত বর্শা হাতে আরও একটি লোক। ভয়ে আমার গলা থেমে গেল। ওরা এম্বোকে জোর করে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে চলল। এম্বো কিছুতেই যাবে না। সে ধস্তাধস্তি করতে লাগল। হঠাৎ হাতের কাছে একটা রেলিং পেয়ে এম্বো সেটা আঁকড়ে ধরল। জোয়ান মানুষ। গায়ে ওর বরাবরই অসুরের মত শক্তি। তার ওপর মৃত্যু ভয়, সামনে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। চারজন সাদা মানুষ টেনে ওর সেই বজ্রমুষ্টি আলগা করতে পারল না। বিরক্ত ক্যাপ্টেন রেলিং-এর ওপর ওর মাথাটা চেপে ধরল, তারপর হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। কোমর থেকে তলোয়ারটা টেনে নিয়ে সে নিউ টাউনের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে এক ঘায়ে এম্বোর মাথাটা কালাবারে জলে ফেলে দিলো। আমরা এ দৃশ্যের জন্যে তৈরী ছিলাম না। সম্ভবত নিউ টাউনের লোকেরাও না। আমি চিৎকার করে দু'হাতে চোখ ঢাকলাম।

তারপর অবশ্য এক সময় চোখ খুলেছিলাম। কিন্তু তখন অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে এম্বো বা কালাবার কিছুই ছিল না। কালাবার তাল নারকেল, আমার বৌ ছেলে মেয়ে সব সেই অন্ধকারে একাকার। দশ সপ্তাহ পরে আবার যখন দিনের আলোয় এসে দাঁড়ালাম তখন আমার সামনে নতুন দেশ, নতুন বন্দর। শুনেছিলাম—এদেশের নাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, এবং আমি আমার সঙ্গের এই চব্বিশটি নারীপুরুষ, আমরা—ক্রীতদাস!

।

এটা প্রথা নয়। তোমরা কালাবারের মানুষেরা যেভাবে লুঠ হয়েছিলে সেটা রীতি নয়,—দস্যুতা। আমরা কঙ্গোর উপকূলের মানুষেরাও লুণ্ঠিত হয়েছি বটে তবে এভাবে নয়,—আখ কাটতে কাটতে কপালের ঘাম মুছে বলবে আর একজন। কপালে তার বাদ্দাছাপ তখনও স্পষ্ট। সেটিতে আঙুল ঠেকিয়ে মানুষটি বলবে দেখছিস না, আমাকে যারা এনেছিল সে-সাহেবদের নাম অন্য। তাদের রীতিনীতিও ভিন্ন। তারা নগদ কড়িতে ছাড়া কখনও মানুষ কিনবে না। তারা দাস নয়, ক্রীতদাস চায়। হামলা করে মানুষ ধরে জাহাজে তোলা আর নগদ কড়ি ফেলে কেনা এক জিনিস নয়। ওরা ধার্মিক ছিলেন, বলতেন—জবরদস্তি করব কেন; আমরা কি ডাকাত! আফ্রিকায় ডাকাতেরা এসেছে তোদের আমলে, ১৭৫০ সনের পরে। তার আগে উত্তরে কেপ ভার্দে থেকে শুরু করে দক্ষিণে বেঙ্গুয়েলা বা কেপ সেণ্ট মার্থা অবধি গোটা পশ্চিম উপকূলের মানুষগুলোকে জিজ্ঞেস কর, সবাই এক কথা বলবে। গোরি, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া,—বেনিন, বিয়াফ্রা, বনি, কালাবার, অ্যানামোবি, আম্ব্রিজ, কঙ্গো—সব এলাকায় তখন এক নিয়ম।

ওরা মানুষের সন্ধানে জাহাজ নিয়ে আসত। আমাদের সর্দারেরা ওদের অভিনন্দন জানাত। কেননা লোকগুলো সত্যিই ভাল। ওরা তাদের মদ দিত, খাবার দিত, পোশাক দিত। বদলি হিসেবে সর্দার তাল খেজুরের রস, হাতির দাঁত, লোমের পোশাক দিত। সঙ্গে দিত নিজের তহবিল থেকে কিছু দাস-দাসী। অবশ্য দাস নাম ছিল না তাদের, কিন্তু আমাদের মধ্যেও সবল আর দুর্বল মর্যাদায় এক ছিল না। আমরা অন্য কোন দলের সঙ্গে লড়াই করে যাদের ধরে আনতাম, সর্দার তাদের নিজের কাছে আটকে রাখত। অনেক সময় দলের লোকেরা নজরানা মিটিয়ে দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে যেত। অনেক সময় আমাদের হয়ে ওরা বছরের পর বছর খাটত। এ ছাড়াও অনেকে ঋণের কারণে দাস হত, অনেকে অধর্মের কারণে। কেউ হয়ত তোমার দেবতাকে অপমান করল, তাকে তুমি দাস করে রাখতে পার। কারও বৌ হয়ত স্বামীকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে অন্য পুরুষে সোহাগ করে, স্বামী জানতে পারলে সেই মানুষটিকে ধরে এনে দাস করে রাখতে পারে। কিন্তু রীতি থাকলেও আমাদের পৃথিবীতে অনেক দাস ছিল না। বাইরের মানুষের চোখে সে জগত অন্ধকার ঠেকলেও আমাদের দুনিয়ায় ন্যায় ছিল, শান্তি ছিল। আমাদের প্রত্যেকের ঘরে মোটামুটি খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, পরনে কাপড় ছিল। সে-কাপড় হয়ত বাহারী ছিল না, কিন্তু আমরা তা পরেই আনন্দিত ছিলাম। আমাদের সে আনন্দের চিহ্ন আমাদের এই দেহ। আমরা আফ্রিকার উপকূলের মানুষেরা সেদিন আদিম অরণ্যের মতই সুখী অস্তিত্ব।

সেই সুখের জগতে প্রথম চিন্তা-বিন্দু একটি পাল-খাটানো জাহাজ, 'রেইন-বো' রামধনুকের মতই সুন্দর জাহাজ। ক্যাপ্টেনের নাম স্মিথ। ঠিকানা—বোস্টন। মাডিরা থেকে ফেরার পথে কি মনে করে তিনি গিনিতে এসে থমকে দাঁড়ালেন। বন্দরে তখন আরও জাহাজ আছে। কেন না, আফ্রিকা আর অজ্ঞাত পৃথিবী নয়, শ্বেতাঙ্গরা বহুদিন এখানে আনাগোনা করছে। তাছাড়া এখানকার বলিষ্ঠ মানুষগুলোর ওপর সভ্যতার নজর পড়েছে। সুদূর ১৪৪৪ সন থেকে আধুনিক দুনিয়া গোলামের সন্ধানে এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রথম জাহাজখানা পাঠিয়েছিলেন পর্তুগালের উদ্যোগী সম্রাট, প্রিন্স হেনরী, দি নেভিগেটার! তারপর কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার এবং আফ্রিকায় নতুন করে ইউরোপের অভিযান। ১৪৯৪ সনে কলম্বাস পাঁচ শ' রেড-ইণ্ডিয়ানকে দাস করে উপহার পাঠিয়েছিলেন

তাঁর রানীকে। বলেছিলেন—এগুলোর বদলে আমার দেশের মানুষ যদি এখানে শূয়র মোষ পাঠায় তবে উপনিবেশকারীরা উপকৃত হবে। ইসাবেলা কোমল হৃদয়া ছিলেন। তিনি সায় দিতে পারেন নি। ক্যারেবিয়ানরা আবার ফেরত গিয়েছিল তাদের মাতৃভূমিতে। তখন মুস্কিল আসান হয়ে আসরে আবির্ভূত হলেন চিয়াপার মাননীয় বিশপ। তিনি বললেন—রেডইন্ডিয়ানদের বাঁচাতে হলে একমাত্র সৎ উপায় আফ্রিকা থেকে কৃষ্ণাঙ্গ দাস সরবরাহ! শুরু হল পশ্চিমের দাস-অভিযান। ১৭০০ সনে এই গিনিতে বসেই স্পেন আর পর্তুগাল কোম্পানি খুলেছে। আমেরিকা এবং ক্যারেবিয়ানের দ্বীপগুলোতে তারা বছরে দশ হাজার টন দাস সরবরাহ করবে। ইংরেজেরাও আছে। স্যার জন হকিন্স পথ দেখিয়েছেন। তিনি এলিজাবেথকে প্রণাম করে জাহাজ নিয়ে জলে ভেসেছিলেন। সে ১৫৬২ সনের কথা। তার জাহাজের নাম ছিল 'জেসাস'। যীশু সেই থেকে আরও বিশেষভাবে আফ্রিকায় চেনা নাম।

হকিন্স যথাসময়ে তাঁর সাফল্যের বার্তা নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। শুনে এলিজাবেথের মত কঠিনহৃদয়া রানীও নাকি রুমালে চোখ ঢেকেছিলেন। তিনি বলে উঠেছিলেন—ইট উড বি ডিটেস্টেবল্। তাহলেও হকিন্সকে স্যার করতে হয়েছিল তাঁকে। কারণ, ইংল্যান্ডের রানীর পক্ষে অদেখা নারীদের শোকের কান্নার চেয়ে, সামনের পুঞ্জীভূত পাউন্ডের পাহাড়টিই অধিকতর গুরুতর! রাজা দ্বিতীয় চার্লস আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন—এ-ব্যবসা রাজত্বের পক্ষে সমৃদ্ধিসূচক। সুতরাং হে সাহসী নাবিকদল, জাহাজ ভাসাও!

নানা দেশের জাহাজ তখন আফ্রিকার উপকূলে। কিন্তু কোথায় দাস? সর্দারদের তহবিলে যা ছিল বহুদিন তা শেষ হয়ে গেছে। হওয়ারই কথা। কেন না, ১৬৮০ থেকে ১৭০০ সন অবধি কুড়ি বছরে একমাত্র ইংরেজরাই কেড়ে নিয়ে গেছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষকে। তাছাড়া খুচরো ব্যবসায়ীরাও আছে। এ-সময়ে তারাও পেয়েছে কম করে এক লক্ষ ষাট হাজার। ক্যাপ্টেন স্মিথ-এর 'রেন-বো' সে আমলেরই অভিযাত্রী। সুতরাং ভাগ্য তার তত প্রসন্ন না হওয়াই স্বাভাবিক।

ক্যাপ্টেন অন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে পরামর্শে বসলেন। এতদূর এসে এভাবে খালি জাহাজ নিয়ে ফিরে যাওয়ার কোন মানে হয়না, যাহোক একটা কিছু করা দরকার। চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এত এত মানুষ, তাহলেও আমরা খালি হাতে ফিরে যাব কেন?

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। এক বৈঠকও লাগল না। এক সঙ্গে বসামাত্র মাথা খুলে গেল। স্মিথ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—হুর-রা! এইত চাই। পরের দিন সকালেই জাহাজ থেকে একটি 'খুনী' নামান হল। খুনী মানে ছোট্ট একটি কামান। সেকালে তার এটাই ডাকনাম।

সঙ্গে কামান নিয়ে শ্বেতাঙ্গ দল কাছেই একটি গাঁয়ের দিকে এগিয়ে চলল। বন্দরের কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের কান্ড দেখে অবাক। তারা সভয়ে এগিয়ে এসে জানতে চাইল—হঠাৎ হাসিখুশী মানুষগুলোর এমন মেজাজের কারণ কি। স্মিথ চোখ রাঙিয়ে ধমকে উঠল—তা নিয়ে তোদের দরকার?—আমাদের যারা অপমান করে, তাদের আমরা উচিত শিক্ষা দেব বৈকি!

সেদিন রবিবার। আমরা শুনেছি সাদা মানুষদের সেদিন ঈশ্বর ভজনার দিন,—প্রভুর দিন। তারই মধ্যে স্মিথ এবং তার বন্ধুরা কামান বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওরা একটি নিরীহ গাঁয়ের ওপর চড়াও হল। মিথ্যে ঝগড়ার কথা তুলে বাড়িঘর জ্বালিয়ে, মানুষজন মেরে চারদিক ছারখার করে দিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এল। জয়ের চিহ্ন হিসেবে বিজয়ীদের সঙ্গে এল ছটি কৃষ্ণাঙ্গ তরুণ-তরুণী। স্মিথ নিজের ভাগে পেল দুজনকে। তাই নিয়ে সে সগর্বে বোস্টনের পথে পাল তুলে পত পত করে ভেসে চলল।

স্মিথ চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল আমার মাতৃভূমির নতুন ইতিহাস। সে ইতিহাস পরবর্তীকালের পৃথিবী অবশ্য শুনেছে; বৃটিশ পার্লামেণ্ট, মার্কিন কংগ্রেস অনেক লজ্জার কাহিনী উদ্ঘাটিত করেছে। কিন্তু তারা শুধু বাইরের চাপ চাপ রক্তের ছাপগুলোই দেখেছে সেই তরুণীটি, জুমক্ষেতে চাষ করছিল যে বাপ-বেটা, তাদের কলজে দুমড়ে মুচড়ে যে কান্নাটা গলা ঠেলে উঠতে উঠতে হঠাৎ চাবুকগুলো দেখে থেমে গিয়েছিল, শুকনো চোখের তলায় প্রতি মুহূর্তে যে ভিক্টোরিয়া হ্রদের মত বিশাল জলাধারগুলো থৈ থৈ করছিল, তার কথা জানত না। ডেকে সার করে দাঁড় করান প্রতিটি তরুণ-তরুণীর অন্তর সেদিন এক একটি নায়েগ্রা। তাদের ঘৃণা, আতঙ্ক, আর কান্না ছাড়া পেলে দুটো জাহাজ ত ছার, সভ্যতা ভেসে যায়।

স্মিথ সাহেবের পরে যারা এসেছিল, তাদের জাহাজে আলেকজান্ডার নামে ডাক্তার ছিলেন একজন। মেয়েটি তাঁর নজরে পড়েছিল। কৌতূহলী ডাক্তার ব্যবসায়ের রীতি ভুলে ওর পালিশ করা আবলুশ কাঠের মত কালো পিঠটায় সাদা হাতটা রেখে জিজ্ঞেস করেছিল—কি করে এলি?

মেয়েটি উত্তর দিয়েছিল—তোদের জালে পড়ে।

ডাক্তার বলেছিল—সেই জালের ঘটনাটাই ত শুনতে চাইছি আমি।

সে আবার শোনার কি? আমার এক শত্রু ছিল গাঁয়ে। আমি জানতাম—বন্ধু। সকালে বাড়ি এসে বলে গেল, সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি যাবি, ভোজ হবে। উঠোনে পা দিতে না দিতে দুটো মরদ আমাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বেঁধে তোদের এখানে নিয়ে এল। আমার বাপ জানে না, আমি এখন কোথায়।

তোরা কি করে এলি? ডাক্তার সেই বুড়ো বাপ আর তার জোয়ান ছেলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

—আমরা ক্ষেতে কাজ করছিলাম। হঠাৎ ক'টা লোক আমাদের ধরে নিয়ে এল।

—আর তুই?

—আমি সওদা নিয়ে বন্দরে এসেছিলাম। আমার গাঁয়েরই একটা মানুষ বলল—সাহেব তোকে জাহাজে ডাকছে, বোধহয় সওদা কিনবে। আমি জাহাজে আসতেই সাহেব ওর হাতে দুবোতল মদ দিল। আর আমার হাতে এই শিকল পরিয়ে দিল।

আফ্রিকা, অন্ধকারের মহাদেশ সেদিন হঠাৎ রাতারাতি আরও অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে যেন। আপন গাঁয়ের মানুষ নিজের মানুষকে এনে বেচে দিয়ে যাচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে বেচে দিচ্ছে, মদের লোভে পুরোহিত তার শিষ্যকে। এ আফ্রিকা চিরকালের আফ্রিকা নয়। এ লোভ তার আত্মায় বরাবর ছিল না। বিন্দু বিন্দু করে এই বিষ উপকূলের শিরায় শিরায় প্রয়োগ করা হয়েছে। ক্যাপ্টেনদের তীক্ষ্ণ চোখ দুর্বল দলপতিকে বেছে এনে ডেকে বসিয়ে রাজার মত আপ্যায়িত করেছে, যাওয়ার সময় দুটো রেশমী রুমাল আর একটা গাদা বন্দুক হাতে তুলে দিয়ে বলেছে আমরা বন্ধু। এই বন্ধুত্বের ফল হিসেবে দেখা গেছে—দলপতি বন্দুক হাতে মানুষ শিকারে নেমেছে। পুরোহিত মিথ্যে অজুহাতে স্ত্রীকে স্বামীর থেকে কেড়ে আনছে। উদ্যোগী দালালেরা রূপসী তরুণীদের দিয়ে ফাঁদ পাতছে। মোহিনীর হাতে ছেলে-ধরিয়ে জাহাজের খোল বোঝাই করছে। বোনি, অ্যানামাবো, কালাবার—

বন্দরে বন্দরে তখন রাতদিন কেনাবেচা চলেছে। আমি সেকালেরই গোলাম। চোরেরা যখন ডাকাত হয়েছে, ক্যাপ্টেনেরা যখন নিজের দালালদের নিয়ে বন্দুক হাতে ডাঙায় নেমেছে—তার আগের কালের। স্মিথদের আগে আমার জন্ম। আমাকে ধরেছিল যারা তারা নেকড়ে নয়,—শেয়াল!

আমিও শেয়ালের শিকার। আমাকে বেচেছিল যে, সে বুড়ো শেয়াল, ঐ, ঐ যে। মেয়েটি ক্ষেতের আর এক কোণে বসে বসে ঢেলা ভাঙছিল, যে মানুষটি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—উইলিয়াম সাহেব আদর করে নাম দিয়েছিল ওর জনসন। বেন জনসন। কত মেয়ের সর্বনাশ যে করেছে ও তার হিসেব নেই। হাটের পথে গাঁয়ে ফিরছি, জনসন আমাকে কাছে ডাকল। আমি পালিয়ে যেতে চাইতেই ও আমাকে ধরে ফেলল। কাছেই ঝোপের আড়ালে ওর লোকেরা লুকিয়ে ছিল। তারা এসে আমাকে বেঁধে নিয়ে গেল। সে রাত্তির হাটের একটা ঘরেই আমাকে আটকে রাখল। সোহাগ করে জনসন আমাকে খেতে দিয়েছিল। আমি খাইনি। বাপের জন্যে কান্না আসছিল। গাঁয়ের সবাই জানে লেগুয়ার সঙ্গে আমার ভালবাসা, আমাদের বিয়ে হবে। মরদটা হয়ত আমার জন্যে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। সকাল হতেই জনসন বলল—চল, এবার জাহাজে যাবি চল। আমি কিছুতেই যাব না। জনসন বলল—সাহেবরা রাতে কারবার করে না, নয়ত তোকে রাতে বিদেয় করে দিতে পারলেই ভাল ছিল! শুনে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। আমি কাঁদতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু মিছেই কান্না। জনসন টানতে টানতে আমাকে জাহাজঘাটায় এনে হাজির করল। সাহেব আমাকে হাতে শেকল পরিয়ে ওকে দু'বোতল মদ দিল। জনসন আমার দিকে তাকিয়ে দুই বগলে দুটি বোতল নিয়ে সাহেবদের মত শিস দিতে দিতে জাহাজ থেকে নেমে গেল! আমি অবাক হয়ে ওর পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দু'বোতল মদের জন্যে মানুষ মানুষকে বেচে দিতে পারে, এই আমি প্রথম দেখলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই জাহাজে আবার হৈ চৈ। তাকিয়ে দেখি জনসন আবার আসছে। কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য জনসন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না যেন। জনসনের হাত দুটি পিছনের দিকে এক সঙ্গে বাঁধা। তার গলায় আলগা করে বাঁধা একটা দড়ি। কতকগুলো লোক ওকে টানতে টানতে একেবারে ক্যাপ্টেনের সামনে এনে ফেলেছে। আমার কলজেটা আনন্দে লাফাতে লাগল। আমি ডেকের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, যে মানুষটি ওর গলার দড়িটা ধরে রেখেছে, সে লেগুয়া!—আমার লেগুয়া। আমি চিৎকার করে উঠলাম—লেগুয়া, এই যে আমি। চকচকিয়ে গিয়ে লেগুয়া পিছনে তাকাল, কিন্তু আমাকে দেখতে পেল না। আমি আবার চিৎকার করে উঠলাম—লেগুয়া, এই যে আমি! এবার আর লেগুয়ার ভুল হল না। পাটাতনের ফাঁক দিয়ে তার চোখ আমার চোখের ওপর পড়ল। কিন্তু লেগুয়ার তখন কথা বলার সময় নেই। বেন জনসন দড়ি টানছে, গলা ছেড়ে সে চেঁচাচ্ছে—ক্যাপ্টেন আমাকে চিনতে পারছ নিশ্চয়, আমি জনসন। মনে পড়ছে? আমি জনসন, কিছুক্ষণ আগেই যে আমি তোমাকে একটা চমৎকার মেয়ে দিয়ে গেলাম!—

ক্যাপ্টেন বলল—সব মনে পড়ছে। কিন্তু তাহলেও উপায় নেই বাছা, ওরা যখন তোমাকে ধরে এনেছে আমাকে কিনতেই হবে।—কি রে তোরা একে বেচতে চাস?

লেগুয়া বলল—তবে সারারাত দুনিয়াময় ঘুরে বেড়ালাম কেন? সে কি ওকে মদ খাওয়াবার জন্য।—আমার মানুষকে যে শেয়ালের মত চুরি করে এনে বেচেছে তাকে আমরাও বেচব বৈকি। ওর সঙ্গের ছেলে-গুলোও সায় দিল।——ক্যাপ্টেন, তোমাকে কিনতেই হবে। জনসন চেঁচাতে লাগল—দোহাই ক্যাপ্টেন, বন্ধুর মান রাখ, তুমি আমাকে কিনতে চেও না।

ক্যাপ্টেন বলল—তা কি করে হয়? আমি ব্যবসায়ী, আমাকে ব্যবসার রীতি রাখতেই হবে। লেগুয়া এই নাও তোমার হুইস্কি, এবার তুমি যেতে পার। জনসন, এই নাও শেকল, চটপট বাছা 'গালি'তে ঢুকে পড়।

লেগুয়া চলে যাচ্ছে। আমি ওকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ও আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে না। বারবার পিছনে তাকাচ্ছে, —ওর চোখ ভরে জল আসছে। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, লেগুয়া থমকে দাঁড়াল, কাউকে না দেখতে পেয়ে হাওয়ায় বার দুই হাত নাড়ল, তারপর সিঁড়িতে পা দিল। আমি তখনও তাকিয়ে আছি। আর একটা সিঁড়ি নামলেই লেগুয়া আমার চোখ থেকে হারিয়ে যাবে। ওকে আর কোনকালে দেখা যাবে না। লেগুয়া সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মুহূর্ত কি যেন ভাবল, তারপর হাতের বোতল দুটো জলে ছুঁড়ে দিয়ে তরতর করে নেমে গেল। আমি বলে উঠলাম—সাবাস মরদ! সাবাস! পাশের 'গালি' থেকে জনসন তখনও চেঁচামেচি করছে—সাহেব, এর কোন অর্থ হয় না সাহেব!

জীবনে আমার সবচেয়ে বড় শান্তি বুড়ো-শেয়াল সেই থেকে আমার চোখের সামনেই আছে। আফ্রিকায় সেদিন সত্যিকারের বাণিজ্য ছিল। দিনের আলো না ফুটলে কেউ মানুষ কিনত না,—বদলি হিসেবে কিছু না নিয়ে কোন ক্যাপ্টেন কাউকে 'গালি'তে ঠেলে দিত না। তস্করের হাটেও সেদিন নিয়ম ছিল। আর তা ছিল বলেই আমি ভাগ্যবতী। জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক লাঞ্ছনা আমার, কিন্তু সব দুঃখ জুড়িয়ে যায়—যখন ঐ বুড়ো শেয়ালটির দিকে তাকাই। জনসন আর আমি—বাঘ আর হরিণী। আমরা যে একই মনিবের ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী!

—তোমাদের পৃথিবীতে তবুও একদিন নিয়ম ছিল। আমার দুনিয়াতে তা ছিল না। যদি থাকত তাহলে সৈয়দের ঘরের মেয়ে আমি, আমাকে এই সুদূর লিসবনের শহর-গুলিতে রাতের পর রাত চোখ মুছতে হত না। কে আমি সে নাম শুনে লাভ নেই। দিয়াঙ্গার পাদ্রী ম্যানরিক সাহেবকে জিজ্ঞেস করো, সে আমাকে জানে। কি দুর্মতি হয়েছিল হার্মাদের পাদ্রী হঠাৎ করুণাময় হয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। হয়ত দোষটা আসমানের চাঁদের, হয়ত আমার এই রূপের। আজ বুঝতে পারছি, কর্ণফুলীর জলে সেদিন ডুবে মরাই উচিত ছিল। নসিব মন্দ। তাই আমি আজ ঢাকার গাঁ থেকে সুদূর লিসবনের শহরগুলিতে।

সে ১৬২৯ সনের কথা। আগের বছর বাদশাহ জাহাঙ্গীর বেহেস্তে গমন করেছেন। হিন্দুস্থানের তক্তে তখন তরুণ বাদশা শাজাহান। তাঁর প্রতিনিধি হয়ে ঢাকা শাসন করেন সুবাদার কাশিম খাঁ। কাশিম খাঁ খানদানী ঘরের সন্তান। তাঁর বাবা দিল্লিতে বাদশাদের অন্যতম প্রিয় অমাত্য। তাছাড়া কাশিম খাঁর স্ত্রী ছিলেন নূরজাহানের বোন। আমি নূরজাহানের কেউ নই। আমার স্বামী ছিলেন মোগল বাহিনীর সেনাপতি। দুই হাজার ঘোড়া ছিল তাঁর অধীনে। আর ছিল একটি গোলাপ। স্বামী আমাকে তাই বলতেন। কাশিম খাঁ কবি ছিলেন। তিনিই নাকি করে ঢাকায় আমাকে দেখে বন্ধুর কানে কানে নামটি শুনিয়েছিলেন।

সেবার সেনাপতির অন্য এক রাজ্যে বদলি হওয়ার কথা। ঢাকায় তাঁর যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। শহর থেকে মাত্র ক' মাইল দূরে তাঁর আপন বাড়ি। বাড়িতে বুড়ি মা আছেন। আমি স্থির করলাম, শহর ছাড়ার আগে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাওয়া ভাল। বুড়ো মানুষ, মনে শান্তি পাবে। সেদিনই বিকেলে পাল্কী চড়ে আমি গাঁয়ের দিকে যাত্রা করলাম। সঙ্গে আর একটা পাল্কীতে আমার কিশোরী মেয়ে। স্বামী পনেরজন ঘোড়সওয়ার দিলেন আমাদের সঙ্গে। সেটাই নিয়ম। আমরা যেখানেই যেতাম, বেহারা-বরকন্দাজ ছাড়া ঘোড়-সওয়ারেরা সঙ্গে সঙ্গে থাকত।

রাত্তিরে গাঁয়ে হৈ চৈ। একজন ছুটে এসে খবর দিল, গাঁয়ে হার্মাদ পড়েছে। আমি ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলাম।

শাশুড়ি বললেন—গাড়ি বার করতে বলছি, এই বেলা রাতের অন্ধকারে সরে পড়াই ভাল। চোখের নিমেষে গাড়ি তৈরী হল। ঘোড়-সওয়ারেরা তখনও ঘুমোচ্ছে। তাদের ডেকে তোলা হল। দু'জন তৈরী হতে না হতে গরুর গাড়ি আমাদের নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। গাড়ির ভেতরে আমি, আমার শাশুড়ী আর মেয়ে।

কিন্তু নসীব মন্দ। হার্মাদের দল গাঁয়ের চার পাশ ঘিরে ফেলেছে। গাড়ি থামাতে হল। দু'জন ঘোড়-সওয়ার প্রাণপণ বাধা দিল। কিন্তু ওদের হাতে হাতে বন্দুক। আমাদের ঘোড়সওয়ার দু'জনের একজন ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। অন্যজন অন্ধকারে হারিয়ে গেল। ওরা আমাদের টানতে টানতে নৌকোয় নিয়ে তুলল। আমরা নৌকোয় পা দিতে না দিতে নৌকো পুবে মুখে ছুটতে লাগল। অদ্ভুত নৌকো। তার চলন না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

নৌকোয় উঠে আমি কাঁদি, আমার মেয়ে কাঁদে, শাশুড়ী কাঁদে। ওরা খিল খিল করে হাসে। জীবনে এমন বীভৎস রাত আমি স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করিনি। চাঁদের আলোয় সার সার নৌকো জল কেটে চলেছে। ছৈয়ের ওপরে বন্দুক কাঁধে হার্মাদেরা পাহারা দিচ্ছে। নীচে প্রতিটি নৌকোর খোলে মানুষ কাঁদছে। মরদেরা কাঁদছে, মেয়েরা কাঁদছে, শিশুরা কাঁদছে। পিছনে বাংলা দেশের তটভূমি ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

আমি চোখের জল মুছে শক্ত হয়ে বসলাম। নসিবে যা লেখা আছে, সে ত আর খণ্ডান যাবে না। তার আগে ওদের সেই কথাটা জানিয়ে দেওয়া দরকার। সামনেই বন্দুক কাঁধে যে ছোকরাটি দাঁড়িয়ে ছিল, আমি তাকে বললাম—তোমাদের সর্দার কে, তার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।

ছেলেটা প্রথমে এমন ভাব দেখাল যেন, আমার কথাটা শুনতেই পায়নি। সে কি একটা গালগালি করে, পাটাতনে গটমট করে হাঁটতে লাগল। আমি বললাম—সে দস্যু যে-ই হোক, তাকে বল বাদশার সেনাপতি অমুক খাঁর মা আর জেনানা তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ছেলেটার এবার বোধহয় হুঁস হল। সে থমকে দাঁড়াল। আমি আবার আগে যা বলেছিলাম তাই বললাম। সে মুখে হাত রেখে চেঁচিয়ে কি যেন বলল। তারপর কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে তাকাল। আমি ওড়নাটা আরও নীচের দিকে টেনে দিলাম।

কিছুক্ষণ বাদেই কে যেন হঠাৎ নৌকোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। সুন্দর একটা পানসী পাশে এসে ভিড়ল। আমি দেখলাম, একটি জোয়ান ফিরিঙ্গী আমাদের পাটাতনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কি যেন কথাবার্তা বলছে। পোশাক এবং রকমসকম দেখে মনে

আমি চোখের জল মুছে শক্ত হয়ে বসলাম।

হল, এই লোকটিই এই হার্মাদ দলের কাপ্তান।

কাপ্তান আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ভাঙা ভাঙা হিন্দুস্থানীতে বলল,—আমি ক্যাপ্টেন ডিগো ডাসা। এই নৌকো-গুলো আমারই। তোমরা মোগল সেনাপতির ঘরের লোক যারা, তারা বেরিয়ে এস।

আমরা বেরিয়ে এলাম। কাপ্তান ঘাড় হেঁট করে আমাদের সম্মান জানাল। তারপর বলল—আরাকানরাজ থিরি-থু-ধাম্মা ছাড়া আমি কোন রাজা বাদশা মানি না। আমি গোয়া বা লিসবন কারও তোয়াক্কা রাখি না। দিয়াঙ্গায় আমাদের নিজস্ব ফৌজ আছে। ইচ্ছে করলে সেই 'মারুক-উ' তামাম হিন্দুস্থানের সঙ্গে লড়তে পারে। সুতরাং আমাকে ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। সাচ্চা ঘরানার জিনিস যখন হাতে পেয়েছি, আমি তখন আর পিছু হটছি না। তবে তোমাদের যাতে কষ্ট না হয়, পথে বেইজ্জতি না হয়, ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি তা অবশ্যই দেখব।

ওর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। আমরা ভয়ে ভয়ে মাঝ নদীতেই নৌকো বদল করলাম। এই নৌকোটা সুন্দর এবং অপেক্ষাকৃত বড় বটে, কিন্তু এখানেও সেই কান্না। খোল বোঝাই মানুষ গলা ছেড়ে কাঁদছে।

কাপ্তান অবশ্য চেষ্টার কসুর করেনি। কিন্তু তিনদিন তিন রাত্তির আমরা তবুও কিছুই খেলাম না। স্বামীর কথা মনে পড়ছে, ঢাকার কথা মনে পড়ছে। তার চেয়েও ভয় লাগছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ওরা দিয়াঙ্গা পৌঁছাবার আগে মোগল নৌ-বহর কি ওদের ধরতে পারবে না?—আমরা কি আর কোনদিন ঘরে ফিরতে পারব না?

সেদিন ভোরে হঠাৎ দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ শুনে তন্দ্রা ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসে পড়লাম। চারদিকে বাদ্য বাজছে,—গোলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তবে কি আমাদের বাহিনী হার্মাদদের ঘিরে ফেলেছে? বাইরে উঁকি দেওয়া মাত্র আমার ভুল ভেঙে গেল। ভোর হয়েছে। পুবে আকাশে সূর্য উঠছে। সামনে অস্পষ্ট একটি শহর ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মঠ আর গীর্জার মিনারগুলো আকাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় মোগল নৌ-বহর? এ নিশ্চয় দিয়াঙ্গা, হার্মাদদের শহর।

আমার অনুমান ভুল হল না। একটু পরেই ডিগো ডাসা এসে উঁকি দিল। তোমরা বেরিয়ে এস, আমরা আরাকানরাজের শহর দিয়াঙ্গা পৌঁছে গেছি।

আমরা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলাম। এসে যে দৃশ্য দেখলাম, তা জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলতে পারব না। প্রতিটি নৌকোর পাটাতনে একের পিছনে এক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ঢাকার নারী-পুরুষ, আমার শ্বশুরের দেশের মানুষ। কি নারী, কি পুরুষ, তাদের সর্বাঙ্গে কারও একফালি কাপড় নেই। তাছাড়া দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—বেচারাদের কারও পেটে কদিনে এক মুঠি খাবারও পড়েনি। মায়ের শুকনো বুকে বাদুড়ের মত শিশু ঝুলে আছে। হতভাগিনী,

জননী সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে বারবার পড়ে যাচ্ছে। জোয়ান মানুষগুলো হঠাৎ যেন প্রেতলোকের বাসিন্দা। তাদের শরীরে কাঠের মজবুত কাঠামোটা ছাড়া আর কিছু নেই। প্রত্যেকের বাঁ হাতটা শরীরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। যেন কেমন রোগে অবশ হয়ে গেছে। হঠাৎ চোখে পড়ল—ওদের প্রত্যেকের বাঁ হাতটি একটা কিসে যেন অন্যদের হাতের সঙ্গে বাঁধা। তাকিয়ে দেখলাম—বস্তুটি বেত। হাতের চেটো ফুটো করে তাই দিয়ে ওদের বেঁধে রাখা হয়েছে। হার্মাদ লোহার খরচ বাঁচিয়েছে।

তোমরা সাহিব-উদ্দীন-তালিশের লেখায় এ কাহিনী নিশ্চয় পড়েছ। তালিশ এই বেতের কথা লিখেছেন। তিনি বলেছেন—ওরা আসে, হিন্দু মুসলমান যাদেরই সামনে পায়, ধরে নিয়ে হাতের চেটোতে বেত ফুটিয়ে এক সঙ্গে বাঁধে, তারপর নৌকোর খোলে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রতিদিন সকালে ওরা পাটাতনের ওপর থেকেই ভেতরে কমুষ্টি শুকনো চাল ছিটিয়ে দেয়, ঠিক যেমন আমরা মুরগীদের খাওয়াই।......কত ভদ্রঘরের সন্তান যে ওরা এভাবে ধরে নিয়ে গেছে তার হিসেব নেই। কত ভদ্রকন্যা যে ওদের হাতে পড়ে নিগ্রহের জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে—সে কাহিনী কেউ জানে না। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত নদীর দুধারের গ্রামগুলো আজ ওদের দৌরাত্ম্যে জনশূন্য। সর্বত্র হাহাকার।...... বাংলার জেলে-মাঝিরা আজ ওদের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত। একশ' নৌকোও যদি এক সঙ্গে থাকে, তাহলেও হার্মাদদের চারটি নৌকো দেখলে তারা তৎক্ষণাৎ পালাবে।

কেন ওরা পালাতে চাইত, তার কারণ সশরীরী হয়ে আমাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে সে-দৃশ্য চোখ মেলে দেখা যায় না। ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, অসহায় নরনারী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাতে হাতে ক্ষত। তারই মধ্যে বিজয়-বাদ্য বাজছে, নিশান উড়ছে, ডিগো-ডা-সার পল্টনেরা রং বেরংয়ের পোশাক পরে নাচছে, —সমবেত জনতাকে লুঠের মাল দেখাচ্ছে। এবার ওরা আরও গর্বিত। কারণ, এবার ওরা যেখান থেকে সাফল্যের সঙ্গে ফিরে এল সে মোগলদের অন্যতম শাসনকেন্দ্র ঢাকা। ডাসা সগর্বে ঘোষণা করল, জায়গাটা ঢাকা থেকে মাত্র কয়েক মাইল। তাছাড়া খাস ঢাকা শহরে পা না দিলেও আরাকানের জন্যে সে ঢাকার সেরা ঘরের জিনিস নিয়ে এসেছে,—সেটাই কি কম গৌরবের? ডাসা বক্তৃতা করতে করতেই আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল, তার-পর নাটকের কায়দায় হঠাৎ আমার মুখের ওপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে বলল—এই সেই জেনানা! উল্লাসে ডাঙার দর্শকেরা জয়ধ্বনি করে উঠল! পল্টনের একটা ছোকরা দুম দুম করে আকাশ লক্ষ্য করে দুটি গুলী ছুঁড়ল।

তারপর আমার শাশুড়ীকে দেখান হল। এবং তারপর আমার মেয়েকে। আমরা তিন-জনেই কাঁদতে লাগলাম। শত শত লোক আমাদের দেখছে। হাসছে, টিটকারী দিচ্ছে। হারেমের মেয়ে আমরা। এ দৃশ্য আমাদের স্বপ্নের অতীত। মনে মনে বলতে লাগলাম—হা ঈশ্বর, তার চেয়ে আমাদের মাথায় বাজ ফেল!

ঈশ্বর যেন কথা শুনেলেন। জনতার ভীড় থেকে একজন ফিরিঙ্গী এগিয়ে এল। ডাসার সঙ্গে করমর্দন করে সে যেন কি বলল। তারপর আমাকে অভিবাদন করে বলল—তোমরা খানদানী ঘরের মেয়ে। এভাবে তোমরা কষ্ট পাচ্ছ দেখে আমি ব্যথিত হয়েছি। কাছেই আমার এক বন্ধুর বাড়ি আছে। তিনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। যদি তোমাদের অমত না থাকে, তবে তোমরা আমার সঙ্গে সেখানে যেতে পার। ডাসার মত আছে, আশা করি তোমরাও অমত করবে না।

অমত করার আর প্রশ্ন ওঠে না। এখানে এই ঘাটে দাঁড়িয়ে অপমানিত হওয়ার চেয়ে সেটা তবুও মন্দের ভাল। অন্তত লোকটার কথা যদি মিথ্যে না হয়, তবে চারটে দেওয়ালের আবরণ পাওয়া যাবে নিশ্চয়। মানুষ, এমন কি আমাদের মত পতিতের পক্ষেও সেটা কম নয়। আমরা ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু নৌকো থেকে নেমে এলাম।

বাড়িটা ভাল। বাড়ির মালিক যে ফিরিঙ্গীটি তাকেও মন্দ বলে মনে হল না। সে আমাদের অভিবাদন করে একটা ঘরে বসতে দিল। তারপর বলল—আপাতত এইটেই তোমাদের ঘর। এখানটায়ই তোমরা থাকবে। চাকর এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই খাবার দিয়ে যাবে। আমার শাশুড়ী আপত্তি জানালেন। তিনি বললেন—সাহেব তুমি দয়ালু, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। কিন্তু আমরা তোমার ঘরে খেতে পারব না। আমরা সৈয়দের ঘরের মেয়ে—ফিরিঙ্গীর ঘরে আমরা খাই কি করে।

সাহেব কথাগুলো খুব মনযোগ দিয়ে শুনল। তারপর বলল—বেশ, আমি তোমাদের ওপর জবরদস্তি করব না। ফলমূল পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবেলা তাই খাও। রাতে না হয় নিজেরা আপন হাতে কিছু পাকিয়ে খাবে। সাহেব এই বলে তার কাজে চলে গেল। যে কাপ্তান আমাদের নিয়ে এসেছিল, সেও বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল—কোন ভয় নেই তোমাদের, আমিও কাছেই থাকি।

রাত্তিরে সাহেব চাল ডাল, পাঠিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কে তা রান্না করবে! জীবনে কোনদিন হেঁসেলে পা দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া কপালের ফেরে বাড়িঘর ছেড়ে মগের মুলুকে এসে পড়েছি,—যখনই কথাটা ভাবি, তখনই চোখ ছাপিয়ে জল আসে,—খাওয়ার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করে না! শাশুড়ী এক কোণে মড়ার মত পড়ে আছেন, মেয়েটার জ্বর এসেছে,—অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি ঢাকার কথা ভাবছি। কাশিম খাঁর কথা, আমার স্বামীর কথা, অন্যদের কথা। ভাবতে ভাবতে আমারও একটু তন্দ্রা এসেছে। হঠাৎ কার পায়ের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে সকালের সেই ক্যাপ্টেন। তার চোখ দুটি লাল, শরীরটা টলছে। ক্যাপ্টেন হাতছানি দিয়ে ইসারায় আমাকে কাছে ডাকল। আমি এক মুহূর্ত ভাবলাম। তারপর নিঃশব্দে উঠে বসলাম। এখানে মেয়ে আর শাশুড়ীর সামনে মান সম্ভ্রম বিসর্জন দেওয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। ইজ্জত যদি দিতেই হয়,—তাহলে এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল।

ধীরে ধীরে আমি ক্যাপ্টেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্টেন দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি ইঙ্গিতে বললাম—চুপ, দেখছ না ঘরে দুজন মানুষ রয়েছে! ওর যেন হুঁস হল। আমাকে হাতে ধরে টানতে টানতে সে পাশের ঘরে ঢুকল।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। সে ঘটনা জানে সে বাড়ির মালিক, আর দিয়াঙ্গা গীর্জার পাদ্রী ম্যানরিক। আমার শুধু মনে আছে, শয়তানকে নাগালে পেয়ে আমি দাঁতে ওর জিভটা কেটে নিয়েছিলাম, এবং একটা আর্তনাদ করে দস্যু আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল। গোটাঘর রক্তে ভেসে গিয়েছিল। বাড়ির মালিক ছুটে এসে-ছিল, আমার শাশুড়ী, মেয়ে—যে যেখানে ছিল সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। ফিরিঙ্গী মালিক আমার সেই রণরঙ্গিনী মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে কি বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছিল, তার চাকরদের ডেকে হুকুম দিয়েছিল—এই জেনানা দেখতে পরী হলেও আসলে সে খুনী। ওর হাত-পা বেঁধে এক্ষুনি ওকে কর্ণফুলির জলে ফেলে দিয়ে আয়। মেয়েটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিল। আমি চাকরদের বাঁধবার সুবিধের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিতে দিতে বলে-ছিলাম—কাঁদিস না মা, আজ মরতে পারলে জানবি তোর মা বেহেস্তে গেল। এবং গেল তার ইজ্জত এক ফোঁটা না খুইয়ে।

দুজন ভৃত্য আমাকে নিয়ে নদীর দিকে বেরিয়ে পড়ল। আর একজন ছুটল গীর্জার দিকে। কেননা, ক্যাপ্টেনের লালসা তখনও রক্ত হয়ে জিভ থেকে ফিনকী দিয়ে বের হচ্ছে, রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। শয়তান বোধ-হয় বাঁচবে না। মরবার আগে তাকে দুটো ধর্মকথা শোনান দরকার। পাদ্রী ছাড়া এ তল্লাটে আর কারও সে ক্ষমতা নেই।

ওরা আমাকে নিয়ে কর্ণফুলির চড়ায় এসে যখন কি করে ডোবান যায় ভাবছে, তখন দেখা গেল নদীর ধার দিয়ে হনহন করে একটি মানুষ এই দিকেই আসছে। লোকটি

কাছাকাছি হতেই—চাকর দুটি ধীরে ধীরে সরে পড়ল। বোধহয় মাঝরাত্তিরে নদীর ঘাটে তৃতীয় মানুষকে দেখে মনে মনে ভূত দেখছে বলে ভয় পেল। লোকটি কি মনে করে সত্যি সত্যিই আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমি তাকিয়ে দেখলাম—মানুষটি সেই যাজক। সকালেও নদীর ঘাটে তাকে আমি দেখেছি। অভুক্ত উলঙ্গ মানুষগুলোকে সে অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের ধর্মের কথা বোঝাচ্ছিল। বলছিল—এই যে তোমরা ফিরিঙ্গীর হাতে পড়লে, সে আমার ঈশ্বরের অভিলাষ। নয়ত আরও কত মানুষ আছে তোমাদের দেশে, তোমরাই ধরা পড়বে কেন?—সুতরাং বৎসগণ, তোমরা আমার কথা শোন। তোমরা অন্ধকারে থেকো না।

হঠাৎ সেই লোকটিকে সামনে দেখে আমি ঘৃণায় দু'পা পিছিয়ে গেলাম। আশ্চর্য, পাদ্রী কিন্তু ছুটে আমাকে ধরতে এল না। সে শান্ত স্বরে বলল—কে তুমি? তোমার হাত-ই বা বাঁধা কেন? যে লোকগুলি পালিয়ে গিয়েছে তারাই বা এই মধ্যরাত্রে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে কেন?

নির্জন নদীতীরে, চাঁদের আলোয় দণ্ডায়মান সেই বিশাল মানুষটির শান্ত কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন একটা আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল। আমি মুহূর্তে ভেঙে পড়লাম। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, মৃত্যু যেন সেই ভৃত্য দুটির মতই ধীরে ধীরে আমার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে, কর্ণফুলী হঠাৎ শান্ত হয়ে উঠেছে, আমাকে গ্রহণে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। পাদ্রীর কাছে আমি সব খুলে বললাম। সে বলল—বাছা, তোমার আর কোন ভয় নেই। আমি সেই ক্যাপ্টেনকেই শেষ প্রার্থনা শোনাতে চলেছি। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে না। আমি তোমাকে আমার পরিচিত অন্য এক আশ্রয়ে রেখে যাচ্ছি। তুমি সেখানে বিশ্রাম কর,—কিছুক্ষণ বাদেই আমি সেখানে ফিরে আসছি। পাদ্রী নিজের হাতে আমার হাতের বাঁধন আলগা করে দিল। তারপর বলল—ভয় কি? এস, আমিই ত রয়েছি।

এই পাদ্রী সম্পর্কে আমি পরে অনেক কথা শুনেছি। দাসদের সম্পর্কে তার হৃদয়-হীনতার কাহিনীও আমার অজানা ছিল না। শুনেছিলাম দিয়াঙ্গা থেকে কটকের পথে মেদিনীপুরের গাঁয়ের মানুষেরা তাকে হার্মাদ ভেবে ধরে নিয়ে যায়। তাহা অপমান করেছিল। শুনে আমি দুঃখিত হয়েছিলাম, এমন কথা বলতে পারব না। এমনকি এই লিসবনে বসে যেদিন লণ্ডনে দস্যুর হাতে তার হত্যা কাহিনী শুনেছিলাম, সেদিনও আমি মোটেই দুঃখিত হইনি। ওরা বলে-ছিল, রোমের পদস্থ ধর্মীয় ব্যক্তি প্রবীণ ম্যানরিকের মৃতদেহটা একটা কাঠের বাক্সে টেমস নদীতে ভেসে বেড়াচ্ছিল। শুনে আমার মাতৃভূগঙ্গা, শীতলক্ষা আর কর্ণফুলির জলে ভাসমান বাংলা দেশের চাষী গেরস্থ মানুষ-গুলোর বিকৃত শবগুলোর কথা মনে পড়-ছিল, ফিরিঙ্গী পল্টনেরা যা খোল থেকে, বাইরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত। দিয়াঙ্গার যাজক ইচ্ছে করলে হয়ত অনেক প্রাণ বাঁচাতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সেই জ্ঞান ছিল না। দাসদের ধর্মান্তরিত করা ছাড়া সেই যাজক অন্য কোন ধর্ম জানতেন না। তবুও সেদিনের ম্যানরিককে আমি অবহেলা করতে পারিনি। কেননা, সে রাত্তিরে ম্যানরিক সত্যিই অন্য মানুষ। নির্জনতা, চাঁদের আলো, অথবা আমার এই চাঁদ-বদন—হেতু যাই হোক, ম্যানরিক সে রাত্তিরে, সম্ভবত সেই একটি রাত্তিরেই সত্য এবং স্বাভাবিক মানুষ।

নতুন গৃহপতি বয়স্ক, সম্ভ্রান্ত এবং আগের জীবনে পেশা তার যাই থাক, এখন সে পরিপূর্ণ গৃহস্থ। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েরা ছাড়াও বাড়িতে তার অনেক মানুষ। ম্যানরিক আমাকে তার স্ত্রীর হেফাজতে রেখে তার যাজকের কর্তব্য পালন করতে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার সে ফিরে এল। এসে বলল, না, দরকার হল না।—রক্তটা বন্ধ হয়েছে, লোকটা হয়ত বেঁচে যাবে।

খবরটা শুনে আমি মুষড়ে গেলাম। গৃহপতি অভয় দিলেন,—আর তোমার ভয়ের কিছু নেই বোন, একবার এখানে যখন এসে পড়েছ, তখন দিয়াঙ্গার আর কোন ক্যাপ্টেন তোমার নাগাল পাবে না। আমি বললাম—কিন্তু আমার শাশুড়ী?—আমার মেয়ে?

ম্যানরিক জবাব দিল—তাদের জন্যেও আর ভাববার কিছু নেই। আমি ডাসার সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তোমাদের সকলের দায়িত্বই সে আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। কাল সকালেই তারা এখানে এসে তোমার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এবার থেকে তোমরা এখানেই থাকবে।

পরদিন সকালে সত্যি সত্যিই শাশুড়ী আর মেয়ে ফিরে এল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনে সুরু হল নতুন উৎপাত। তবে এবার তা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ অন্য।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় ম্যানরিক আমাদের ঘরে হানা দেয়। আমার মেয়েটিকে আদর করে, শাশুড়ীর সঙ্গে ধর্মকথা আলোচনা করে। তার একমাত্র কথা তোমরা প্রভুকে আশ্রয় কর, বিশ্বাসী হও। আমরা যত বলি—আমরা বিশ্বাসীই আছি, ম্যানরিক ততই বলে, তাহলে আর তার কথায় সায় দিতে দোষ কি! একদিন সে কথাটা ভেঙেই বলল।
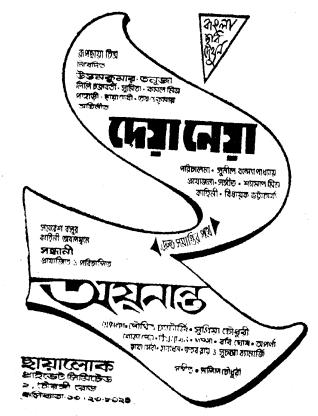
বলল—দেখ, ঈশ্বরের কৃপায় দিয়াঙ্গায় বিশ্বাসীর কোন অভাব নেই। আমি হিসেব রেখেছি, প্রতি বছর তোমাদের বাংলা মুলুক থেকে ওরা গড়ে তিন হাজার চারশ মানুষকে ধরে আনে। অবশ্য অর্ধেক তার আরাকান রাজের প্রাপ্য। কিন্তু রাজা সদাশয় ব্যক্তি। সে দাস পেলেই খুশী। কার কি ধর্ম তা নিয়ে তার কোন ভাবনা নেই। আমি তাই এখানে বছরে গড়ে কমপক্ষে দু'হাজার বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করে থাকি। অধিকাংশ ঘাটেই এসে আমার সামনে দাঁড়ায়। দেখলে না, সেদিন তোমার সামনেই কতজন মাথা পেতে আমার আশীর্বাদ নিল। তবুও যে আমি তোমাদের পীড়াপীড়ি করছি, তার কারণ আমি জানি তোমরা বংশে সৈয়দ। তোমাদের একজনকেও যদি আমি আমাদের পথে আনতে পারি, তবে সে হবে আমার পক্ষে পরম গৌরবের ঘটনা। শুনে আমার শাশুড়ী বলল—আর আমাদের পক্ষে সেটা কি ঘটনা হবে, সেটা একবার ভেবে দেখেছ সাহেব? পাদ্রী চুপ করে রইল।

ইতিমধ্যে আর এক ঘটনা ঘটল। দিয়াঙ্গায় নামার পর থেকেই মেয়েটা আমার অসুস্থ। জ্বরটা ক'দিন কম ছিল। আবার তা বেড়ে উঠল। ম্যানরিক মেয়েটিকে স্নেহ করত। সে গীর্জার কাজের অবসরে এসে তার সেবা করতে লাগল। কিন্তু মেয়ের অসুখ কমবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না, বরং ক্রমেই তা আরও বেড়ে চলল। ম্যানরিক বলল—কোন কিছুতেই যখন রোগ সারবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন তোমরা যদি অনুমতি কর, তবে আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি। কিন্তু সে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা, তার আগে ওকে আমি ঈশু মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারি কি?

কন্যা মৃত্যুশয্যায়। মা হয়ে তার আরোগ্য কামনার পথে বাধা দেওয়া যায় না। আমি মাথা নাড়লাম। ম্যানরিক ওকে দীক্ষা দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল—কি মা, একটু ভাল লাগছে। মেয়ে মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ। আমি চিৎকার করে বললাম—বাছা, তুই কি আরাম পাচ্ছিস? এবারও উত্তর হল—হ্যাঁ। সেই তার শেষ উত্তর। মেয়ে চোখ বুজল। সে চোখ আর কোনদিন খোলেনি।

তারপরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। মেয়ে যার চোখের সামনে খৃস্টান হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে, তার পক্ষে আর সৈয়দ পরিচয় দেওয়ার অর্থ হয় না। আমরা শাশুড়ী-বৌ দুজনেই খৃস্টান হয়ে গেলাম। আমাকে একটা ফিরিঙ্গী নামও দেওয়া হল। কিছুদিন পরে আমার শাশুড়ীও মারা গেলেন। দিয়াঙ্গায় ফিরিঙ্গীদের মুখে আমার খৃস্টান হওয়ার কাহিনী ঘুরে বেড়াতে লাগল। অভিজাত ফিরিঙ্গীরা আমাকে দেখতে ভীড় জমাতে লাগল। নানাজন ফিরিঙ্গী কায়দায় আমাকে প্রেম নিবেদন করতে লাগল। কিন্তু আমি মনে মনে স্থির করে ফেলেছি, নতুন করে ঘর বাঁধতেই যদি হয়, তবে এই মগের মুলুকে নয়—সৈয়দের কন্যা আমি, খৃস্টানদের মধ্যে যারা সৈয়দ তাদের কারও ঘরে ঠাঁই পেলে তবেই আমি রাজী।

অবশেষে সে মানুষও এল। ম্যানরিক বলল—তুমি ওর সঙ্গে যেতে পার। ওরা খাস লিসবনের বনেদী ঘর। এদেশে ব্যবসায়ের কারণে এসেছে, অচিরেই ঘরে ফিরে যাবে।—কি তুমি রাজী?

আবার সেই দেশ, সেই সংসার; ঢাকার কথা মনে পড়ছে, আমার স্বামী, আমার মেয়ে, বুড়িগঙ্গা, ধানক্ষেত—ধানক্ষেতে চখাচখী ডাকছে, বকেরা সার বেঁধে উড়ছে—বাংলা দেশ মেঘ হয়ে আমার মনের আশমান ঘিরে আসছে। আমি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই। লিসবন পারবে আমার সেই স্মৃতি মুছে দিতে? যদি পারে, তবে কোথায় তুমি ভিনদেশী সওদাগর, তুমি এক্ষুনি ডিঙ্গি ভাসাও, যে মাটিতে আমার মেয়ের কবর, আমার শাশুড়ীর কবর, যেখানে আমার জীবনের সব সাধ, সব আকাঙ্ক্ষা মাটি চাপা আছে, সেখান থেকে আমাকে নিয়ে এক্ষুনি তুমি পালিয়ে যাও।

আশ্চর্য, লিসবনও ব্যর্থ হল। পেড্রোর ধারণা, আমি সুখী। আমাকে নিয়ে তার কত গর্ব! অন্ধ জানে না, আমার বুকে কি জ্বালা। জানে না, জীবনে একদিনই আমি খুশী হয়েছিলাম, গোটা লিসবন যেদিন হুগলীর খবর শুনে শুকনো মুখে কাঁদছিল। সেটা ১৬৩২ সনের কথা। অর্থাৎ ঢাকা থেকে আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার তিন বছর পরের ঘটনা।

ওরা বলছিল শাজাহানকে কাশিম খাঁ হুগলী আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিল যে-কারণে, সে নাকি একটি রূপসী মেয়ে। মেয়েটি ছিল সম্রাটের প্রিয় সেনাপতিদের একজনের বিবাহিতা স্ত্রী। পল্টনেরা ঢাকা থেকে তাকে রাতের অন্ধকারে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে কাশিম খাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। কারণ ঘটনাটা শুধু বোম্বেটেদের ক্রমবর্ধমান দুঃসাহসেরই পরিচায়ক নয়,—সেই মেয়েটির স্বামী ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ বান্ধব। বীর কাশিম খাঁ তাই এবার ক্ষমাহীন হয়ে দেখা দিয়েছে, সে হুগলী জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। অসহায় পর্তুগীজরা এখন আশ্রয়ের আশায় গঙ্গায় ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের পিছনে পিছনে মোগলেরা তাড়িয়ে ফিরছে। শুনে সেদিন আমার যে কি আনন্দ, সে আমি বলতে পারব না। ইচ্ছে করছিল লিসবনের সবচেয়ে উঁচু বাড়িটার মাথায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলি—হে লিসবনবাসী, আমিই সেই রূপসী। আমাকে দুঃখী করেছিলে বলেই তোমরা আজ হুগলীতে নিরাশ্রয় বিদেশী। পরের দিন আরও একটি উত্তেজনাপূর্ণ খবর এল। মোগলেরা হুগলীতে ঘরে ঘরে তল্লাসী চালাচ্ছে, তারা অনেক ফিরিঙ্গী রমণীর ইজ্জত নষ্ট করেছে, বহু ক্রীতদাসী তাদের হাতে পড়েছে। তার চেয়েও উত্তেজনাপূর্ণ খবর, বিখ্যাত রূপসী লুক্রেশিয়া টেভারেস মোগলদের হাতে ধরা পড়েছে। তৎকালে সুন্দরী এই ফিরিঙ্গী রূপসীটি প্রথম জীবনে নাকি ছিল সন্দীপের দস্যু নায়ক তিবাও তনয় সেবাস্তিয়ান তিবাও-এর সহচরী! মোগলেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত সে এখন কোন মোগল সেনানায়কের শিবিরে আছে। ওরা জানত না, হুগলী তছনছ করে কাশিম খাঁ কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ওরা জানত না—লুক্রেশিয়া কেন ধরা পড়ল। লিসবন জানে না, তাদের প্রবাদের সুন্দরী আজ কার শিবিরে। আমি তা জানি। অশ্বারোহীদের পুরোভাগে সে মানুষটির চোখ কাকে খুঁজতে খুঁজতে তোমাকে ধরেছে, লুক্রেশিয়া আমি তা জানি। আমার অনুমান যদি ভুল না হয়, সেই মোগল সেনাপতিই আমার স্বামী। আজ আমি সুখী! আজ আমি সুখী!

মিথ্যে কথা। ওরা কেউ সুখী নয়। বিয়াফ্রা আর বঙ্গোপসাগর, বেঙ্গুয়েলা আর বাংলা তোমাদের কথা আমরা জানি। ক্রীতদাস কোন যুগে সুখী নয়। তোমরা ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ আর ঊনবিংশ শতকের পৃথিবীতে যারা জন্মে ছিলে, তারা সম্ভবত সবচেয়ে দুঃখী। এজন্যে নয়, তোমরা দাসদের 'স্বাভাবিক' পথে পায়ে শেকল পরনি, এজন্যে নয়, তোমরা দস্যুতার কবলে পড়ে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী,—আসল কারণ সেদিনের পৃথিবী। প্রথম যেদিন সভ্যতা পৃথিবীতে দাস দেখেছিল, সেদিনের সঙ্গে তোমাদের পৃথিবীর অনেক গরমিল। সেখানে দুঃখের সংজ্ঞা ছিল সংকীর্ণ, মানুষের, এমনকি স্বাধীন মানুষের কামনা ছিল পরিমিত। কিন্তু তোমাদের পৃথিবীতে দুঃখ সুন্দরবনের নালাগুলোর মতই বহু স্রোতা, মানুষের কামনা অতলান্তিকের মতই তলহীন। তোমরা সে পৃথিবীর মানুষ। সুতরাং, তোমরা যখন বল—আমরা সুখী, তখন আমরা, সিন্ধু আর নীল, ইউফ্রেটিস আর জর্ডন তীরে কবরের তলায় পড়ে আছি যারা, সেই নামহীন পরিচয়হীন দাসদাসীরা তা বিশ্বাস করি না। কেননা, আমরা সেই অন্ধকার পৃথিবীতেও সুখী মানুষ ছিলাম না।

কোথায় বুদ্ধ, কোথায় যিশু? আমরা যখন হাতে শেকল পরি—পৃথিবীতে তখনও ব্যবসায়ীরা আবির্ভূত হয়নি। মানুষ তখনও এক গ্রামমাত্র অস্থির অস্তিত্ব। শিকারের

ঘোড়ার খুরে খুরে ধুলো উড়িয়ে ওরা আসত, লক্ষ মানুষ বন্দী করে বিজয়গৌরবে আবার ফিরে যেত।

পর্ব শেষ করে সবে সে পশুপালকের যাযাবর জীবনে দীক্ষা নিয়েছে। সেকালেই সভ্যতার প্রথম স্মারক হয়ে আমাদের জন্ম। এতকাল মানুষ পুরোপুরি বর্বর ছিল। কারণ পরাজিত শত্রুকে সে করুণা করতে জানত না। কিন্তু এবার পরাজিতের বুক লক্ষ্য করে তার উদ্যত তীর জ্যা মুক্ত হওয়ার আগে তার কপালে চিন্তার জ্যা ফুটল। তীরটা পিঠের তূণে রেখে সে প্রসারিত হাতে শত্রুর দিকে এগিয়ে গেল। তার কাছে আজ পরাজিত মানুষ শব মাত্র নয়, তার মূল্য আছে। কেননা, যাযাবরের যৌথ জীবনে বাড়তি মানুষ দরকারী বস্তু। বিশেষ মেয়েরা। তারা সন্তান ধারণ করতে পারে,—তারা গৃহকর্ম জানে, তারা পশু চরাতে পারে। সম্ভবত, তাই এ-পৃথিবীর প্রথম ক্রীতদাস যে, সে মানব নয়, মানবী,—ক্রীতদাস নয়, ক্রীতদাসী! এবং তাকে যারা দলে তুলে নিয়েছিল তারা দস্যু নয়, মানবতার আলোকে উদ্ভাসিত প্রথম মানব গোষ্ঠী।

ক্রমে ভ্রাম্যমাণ যাযাবরেরা কেউ কেউ ঘর পাতল। ক্রীতদাস সেখানে সহচর হল। একালে তারা যতখানি দাস, তার চেয়ে বেশী যেন বান্ধব। প্রাচীন ভারত, প্রাচীন মিশর কোথাও তারা ভয়াবহ অস্তিত্ব নয়। আমাদের আর্তনাদ সেখানেই প্রবল, সমাজ যেখানে বীরবৃন্দের সমষ্টি, মানুষ যেখানে যোদ্ধৃ-দল, বিজয় অভিলাষী।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাচীন ভারতের কথা উল্লেখ করা যায়। আলেকজান্ডারের সঙ্গে যাঁরা ভারতে এসেছিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ অব্দ) তাঁরা সবিস্ময়ে লিখে গেছেন—ভারতে ক্রীতদাস নেই। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। কেননা, গ্রীকরা গোটা ভারত চোখে দেখেনি। স্ট্রাবো, অ্যারিয়ান—ওঁরা যে হিন্দুস্থান দেখেছেন, তা প্রধানত সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম ভারত। বিশাল আর্যাবর্তের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ছিল না। যদি তা থাকত তাহলে আমরা হয়ত তাঁদের চোখ এড়াতে পারতাম না। কেননা, পরবর্তীকালের ভারতের মতই সেদিনের হিন্দুস্থানে অনেক দাস। এমন কি বৈদিক যুগেও (খ্রীঃ পূর্ব ২০০০-১০০০ অব্দ) এদেশে দাসের অভাব ছিল না। ঋগ্বেদের পাতা ওল্টালে, দেখতে পাবে সেখানে কে একজন রাজা পঞ্চাশটি ক্রীতদাসী উপহার পেয়ে মনের খুশীতে বন্ধুর গুণগান করছেন। মনুর বিধান (খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দ) খোলো, সেখানেও আমারা সপ্ত শ্রেণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক যুগেও আমরা ভারতে এক বিশাল সম্প্রদায়। তবুও সেদিন আমরা সহসা বাইরের মানুষের চোখে ধরা পড়তাম না, কারণ আর্যভারত তখন সংসারী মানবগোষ্ঠী,—সিন্ধু আর গঙ্গার উপত্যকায় তারা সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষিজীবী। আদি যুগের যোদ্ধৃ পরিচয়ের দিন চলে গেছে,—যারা দাস হয়েছিল তারা নতুন সমাজ বিন্যাসে অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। সামাজিক অধিকারে আমরা তখন প্রভুকুলের সমান না হলেও, আমরা গ্রীস দেশের ক্রীতদাস নই। আমাদের কারও হাতে পায়ে সেদিন শেকল নেই।

একদিন শিকেন্দর শাহের আপন দেশেও তাই ছিল। হোমারের গ্রীসেও আমরা ছিলাম। কিন্তু সেদিনের গ্রীস সামন্ত-তান্ত্রিক, কৃষিনির্ভর দেশ। আমরা ক্রীতদাসরা সেখানে অনেকটা স্পার্টার ভূমিদাস হিলটদেরই মত। ওরা বিজিত জাতি। আমরাও কেউ কেউ তাই। "ওডেসি"র ইউমাউস ভূতপূর্ব রাজতনয়, ভাগ্য বিভ্রাটে সে ক্রীতদাস। অন্যরা কেউ জন্ম সূত্রে, কেউ সামাজিক প্রথাসূত্রে, কেউবা স্বেচ্ছায়। সামাজিক প্রথার মধ্যে দুটি বিশেষ কারে শোনবার মত। একটি তার দুর্বল এবং অসহায় সন্তানদের পরিত্যাগ, অন্যটি হিন্দুস্থানের মত দেব-মন্দিরে মন্দিরে "হাইরোদুলি" বা দেবদাসীর ব্যবহার। আমরা অনেকে সেই পথে স্বাভাবিক মানুষ থেকে ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। যারা স্বেচ্ছায় দাসত্ব বরণ করত তারা আমাদের চেয়েও দুর্ভাগা। কেননা—তার পিছনে কারণ ছিল ঋণ অথবা দুর্মুষ্টি অন্ন। এই অন্নহীন ঋণভার জর্জরিত মানুষ প্রতিটি সভ্যতায় এক অসহ্য বিভীষিকা। টোলেমিদের মিশরে, মনুর ভারতবর্ষে, ফারাওদের প্রাসাদের বাইরে, গণতন্ত্রী গ্রীসের পথে প্রান্তরে সর্বত্র তারা ছিল। মিশরে সম্পন্ন কৃষিজীবী পুরোহিতদের কাছে তার ভবিষ্যত জানবার বাসনায় যে প্রশ্নপত্রগুলো পাঠাত তাতে—বহু প্রশ্নের মধ্যে প্রশ্ন থাকত—

আমি কি ঋণী হব ? আমাকে কি নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে ? আমাদের গ্রীসেও সেই এক খবর,—মানুষ অভাবের তাড়নায় নিজেদের বিকিয়ে দিচ্ছে

কিন্তু ক্রীতদাস হয়েও সেদিনের গ্রীসে আমরা কেবলই বিলাসের উপকরণ নই। আমরা গ্রীকজীবনের শরিক। আমরা বিশেষ অনুষ্ঠান অন্তে পরিবারে ছাড়পত্র পেতাম, প্রভুর সঙ্গে মানুষের মর্যাদা নিয়ে কথা বলতাম। আমাদের তখন ভিন্ন পোশাক নেই, অর্থ সঞ্চয়ে অসুবিধে নেই, বিয়েতে কোন প্রভুর আপত্তি নেই। যদিও মন্দিরে, জনসভায় বা তরুণ তরুণীরা যেখানে বিবস্ত্র হয়ে দেহচর্চা করে সেখানে আমাদের প্রবেশাধিকার ছিল না তাহলেও বিশেষ বিশেষ পরবের দিনে আমরা মুক্ত মানুষ ছিলাম। আমাদের নিজেদেরও কিছু কিছু পরব ছিল। সমাজে আমাদের তখন অনেক বন্ধন। হোমার আমাদের কথা গেয়েছেন, ইউরিপিডিস আমাদের জীবন বর্ণনা করেছেন, জেনোফেন আমাদের "ফেলো-ওয়ার্কার" বলেছেন। আমরা তখন সভ্য গ্রীকের সহযোগী প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় করতে পারলে আমরা নিজেদের মুক্তি কিনতে পারি, নগরের রেজিস্ট্রারে নাম লিখিয়ে আমরা স্বাধীন হতে পারি। তাছাড়াও কোন কোন প্রভু আমাদের মন্দিরের নামে উৎসর্গ করে, আমাদের মুক্তি দিয়ে দিতেন, কেউ কেউ থিয়েটারে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করতেন। যারা দাস হয়েই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতাম, তাদের জীবনও পরবর্তীকালের মত কান্নাময় ছিল না। হতভাগিনী ক্যাসেন্ড্রা রাজকুমারী ছিল। তার কান্নার শেষ ছিল না। কিন্তু আজাক্স-সহচরী টেকমেসা কি ভাগ্যবতী ছিল না। ক্রীতদাসী হয়েও সে নারীর সবচেয়ে কামনার ধন ভালবাসা পেয়েছিল। ব্রাইসেইস আরও ভাগ্যবতী। সে একিলিসের ভালবাসা পেয়েছিল। তাকে যখন ওরা নিয়ে গেল, একিলিস তখন বলেছিল—আশ্চর্য, সব ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্রজনই আপন সহচরীকে ভালবাসে। হোক না মেয়েটি আমারই বর্শার বন্দিনী, আমি ওকে ভালবেসেছিলাম।

পরবর্তীকালের গ্রীসে এই উদারতার কোন অবশেষ ছিল না এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু সে গ্রীস অন্য। দ্বীপপুঞ্জে তখন লুব্ধ, সম্প্রসারণশীল, গর্বিত, উদ্ধত। সমুদ্রে তার কাজ বেড়েছে, সীমান্তেও। ঘরে বাইরে তার তখন অনেক দায়িত্ব। বিরাট সৈন্য দলের রসদ চাই, অস্ত্র চাই, সেপাইয়েত চাই। তাছাড়া গ্রীস ঐশ্বর্যশালী হয়েছে, তার নাগরিকেরা শুধু সুরা নয়, সাকি চায়, কেবলই—দার্শনিকতা নয়, সৌখিনতা চায়।

সুতরাং, মাননীয় সেনানায়ক এবং সমাজ-পতিদের মনে মনে দাবী উঠল—গোলাম চাই, বাঁদী চাই। স্বভাবতই এত কালের চলতি পথে সে দাবী মেটানো সম্ভব হল না। সুরু হল যুদ্ধ, লুণ্ঠন, দস্যুতা; প্রকাশ্য হাটে কেনা-বেচা। প্রধান সরবরাহ সূত্র দাঁড়াল অবশ্য যুদ্ধ। কেননা পরাজিত দেশে যে হারে আস্ত মানুষ পাওয়া যায়, তেমন আর কোথাও না। আলেকজান্ডার একদিনেই থিবস-এ তিরিশ হাজার নারী আর শিশু হাতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন, সেই রাজকীয় পন্থাই একমাত্র পথ ছিল না। চিরকালের মত দস্যুতা এবং অপহরণ সেদিনও এই ক্লেদাক্ত বাণিজ্যের স্বাভাবিক সূত্র। এমন কি গ্রীকরা গ্রীকদের ধরে এনে পর্যন্ত হাটে হাটে পসরা সাজাতে লাগল। তবে আসল মৃগয়াক্ষেত্র ছিল—এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, লিডিয়া, থেরেস, ইথিওপিয়া এবং মিশর। প্রধান বাজার ছিল—এথেন্স, কিওস, সাইপ্রাস এবং ইফেসাস। সেদিনের এথেন্সে একজন বলবান তরুণ বা তরুণীর দাম আধ মিনাস থেকে দশ মিনাস। আজকের মুদ্রায় পঞ্চাশ থেকে হাজার ডলার ! বাণিজ্য বলেই শুধু আমদানী নয়, রপ্তানীর দিকও ছিল একটি। গ্রীক আর আইওনিয়ান সুন্দরীদের তখন পূবের পৃথিবীতে তেজী বাজার। তাদের বয়ে নিয়ে ব্যবসায়ীর বাণিজ্য তরী সেদিকে ছুটেছে, কোথায় কায়রো, কোথায় বোগদাদ—হারেম সাজাতে হবে। তবে যাচ্ছে যত আসছে তার চেয়ে বেশী। শুধু চাষী আর শ্রমিক নয়, নর্তকীরা আসছে, বংশীবাদকেরা আসছে, নৌবাহিনীর জন্যে দাঁড়ি আসছে, সৈন্য দলের জন্যে কারিগর, তারবাহী আর রাঁধুনীর দল। গ্রীস তখন যেন আমাদেরই দেশ,—দাসদের রাষ্ট্র। আমরা মন্দির গড়ছি, থিয়েটার গড়ছি, পথ তৈরী করছি, নগরে জলধারা বয়ে আনছি। আমরা লাউরিয়নে রূপোর খনিতে কাজ করছি, মাঠে চাষ করছি, আমরাই জিমন্যাসিয়ামে দেহচর্চা শেখাচ্ছি, শহরে শহরে পুলিসের কাজ করছি। ১২০০ সিদিয়ান তীরন্দাজ তখন এথেন্সে পুলিস। ৩০৯ অব্দে অ্যাটিকায় আমাদের সংখ্যা চার লক্ষ। গরীবের ঘরেও তখন কম করে একজন ক্রীতদাস, সম্পন্নের ঘরে পঞ্চাশ—একশ। নিকিয়াসের খনি ছিল—তার ছিল—এক হাজার ! স্বভাবতই খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে এথেন্সে আমাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। এ হিসেব সত্য হলে আমরা ক্রীত-দাসেরা সেদিন এথেন্সে স্বাধীন মানুষের চারগুণ।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই প্রহসনকে আড়াল করা সেদিনের দুনিয়াতেও সহজ ঘটনা ছিল না। বৈপরীত্য সেদিন প্রভুকুলের নিজেদের চোখেও স্পষ্ট। খনিতে আমাদের জীবন তাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। অজ্ঞাত ছিল না আমাদের নগর জীবনও। লাইকার-গাস গ্রীসে সাম্য এনেছিলেন। নাগরিকেরা ধনী গরীব নির্বিশেষে এক টেবিলে ভোজন করতে পারত। কিন্তু সেই টেবিলের চার পাশ ঘিরে যারা পরিচারকের কাজ করত তারা ? অর্ধভুক্ত, উলঙ্গ, সাম্যের সেই সেবায়েত দল আমরা, সেদিনের ক্রীতদাস। আমাদের জন্য ধর্ম সেদিন মানবতা নয়, অন্য; দর্শন বক্র,—প্লেটো অ্যারিস্টটলের মত জ্ঞানীরা ছলনাময়। প্লেটো বলতেন—"ন্যাচারেল স্লেভ।" আমরা নাকি দাস হয়েই জন্মেছি, গ্রীসের সেবা করে সভ্যতাকে এগিয়ে দিতে এসেছি। "যে মানুষ তাড়া-তাড়ি হাঁটে সে সভ্য নয়,"—গ্রীসে আমাদের নাম করে সভ্যতার সংজ্ঞা অন্য। একদল আরাম করবে, রুটি রুজির চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে—অন্য দল তার সেবা করবে, তবেই না এই বর্বর জগৎ আলোর বেগে এগিয়ে যাবে ! অ্যারিস্টটল বলতেন—আমরা প্রাণযুক্ত যন্ত্র, "এনিমেটেড টুলস,"—আমাদের ছেড়ে দিলে সভ্যতার বেগতি। সুতরাং, হে ক্রীতদাস, হে ক্রীতদাসী, তোমরা প্রকৃতিকে অমান্য করো না, তোমরা লালসা মুক্ত থাক,—কান্না কেন, তোমরা আনন্দ কর, —হাসো !

রোমে এই দার্শনিকতাটুকুই ছিল না। কেননা, রোম গ্রীস নয়, রোম হিন্দুস্থান নয়। রোম ইউরোপের ইতিহাসে এক অমাবস্যার রাত্রে জাত রক্তস্নাত নবীন পশ্চিম। তার পৃথিবীতে বর্বরেরাই প্রথম প্রতিবেশী, পরাজিত দাস-দল দ্বিতীয় মানব গোষ্ঠী। ওরা দেখেছে টিউটনরা স্লাভদের দাস করেছে, ওরা বলল স্লাভরা স্লেভ হয়েছে। টিউটন হোক, গ্রীক হোক, মিশরীয়, সুমেরীয় যে রক্তের মানুষই হোক—রোমানের কাছে সবাই স্লেভ। কেননা, গর্বিত রোম বলে—স্লেভ মানে স্লাভ নয়, স্লেভ মানে গৌরব, গ্লোরি।

সুতরাং, আমরা কাছের এবং দূরের প্রতি-বেশীরা দাস হলাম,—ক্রীতদাস। অগাস্টাস অনেক পরের মানুষ। জাস্টিনিয়ান, লিও, ট্রাজান প্রভৃতি যে হৃদয়বান মানুষগুলোর নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় কোথায় তখন তাঁরা ? সিজার গল দেশে পা দিয়েই তেষট্টি হাজার নরনারীকে ক্রীতদাস করলেন। হাতে হাতে তাদের শেকল পড়ল। বিজয়ী বীর তাদের সঙ্গে নিয়ে চললেন। পাউলাস ইপিরাসে এসে পেলেন দেড়লক্ষ। ইহুদি-দের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে পাওয়া গেল সাতাত্তর হাজার ! পারস্য, পার্থিয়া, এশিয়া মাইনর, গ্রীস, মিশর—যেখানেই রোমান সৈন্য সেখানেই হাজার হাজার ক্রীতদাস। কেউ

তাদের নির্বিচারে হত্যা করছে, কেউ সোনার বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে,—কেউ শৃঙ্খলিত লক্ষ ক্রীতদাসে শোভাযাত্রা সাজিয়ে নগরে প্রবেশ করছে। তাদের শৃঙ্খলধ্বনিতে রোমের গৌরব ঘোষিত হচ্ছে।

সাম্রাজ্যের প্রথম জীবনে নিয়ম ছিল—রুগ্ন বা অন্য কোন দৈহিক কারণে পরিত্যক্ত শিশু যদি কেউ উদ্ধার করে বেচে দেয় তবে সে দাস হবে। বুভুক্ষু বা ঋণগ্রস্ত প্রজা যদি স্বেচ্ছায় নিজেকে বেচে দেয় তবে সে দাস হবে। বিচারে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে- তারাও দাস হবে,—দাসের সন্তান দাস হবে। অগস্টাস একজন রোমান নাইটকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তার অপরাধ সে ছেলেদুটির পিতা ছিল। ছেলেদের যুদ্ধে যেতে দিতে হবে ভয়ে সে তাদের পঙ্গু করেছিল। টিটাস—ভেলাটোরিদের হাতে পেলেই বেচে দিত। কারণ ওরা গুপ্তচর ! এদের বাদ দিলেও রোমে ক্রীতদাস ছিল। কারণ, আমরা ক্রীতদাসেরা রোমুলাসের জন্মের আগে থেকেই এ পৃথিবীতে আছি। শুধু প্রতিবেশীদের ঘর থেকে সওদাগরের পিঠে চড়ে আমরা ততদিনে সুদূর হিন্দুস্থান থেকেও সেখানে পৌঁছে গেছি। কিন্তু এবার রোমের বিজয়বার্তার সঙ্গে সঙ্গে যা সুরু হল সে সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

দাস সেকালের নগণ্য মানুষের জীবনমূল্য হিসেবে সস্তা ছিলনা। সিজারের আমলে যে কোন ক্রীতদাসের দাম কমপক্ষে দশ পাউণ্ড ! একটি রূপসী গ্রীক তরুণীর দাম—একশ পাউণ্ড। কিন্তু তাহলেও সেদিনের রোমে অভিজাত ঘরে ঘরে ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী। কারও ঘরে একশ, কারও ঘরে দুশ, কারও বা চারশ। একজন সৌখিন রোমানের ছিল—চার হাজার একশ ষোল জন। রোম যেন সেদিন ক্রীতদাসেরই শহর, রোমান সাম্রাজ্য দাসদের রাজ্য। বিশুদ্ধ লাতিন ভাষার চর্চাকেন্দ্রে সেদিন নানা ভাষার কান্না, কোলাহল। জুলিয়াস সিজারের দেহরক্ষী-বাহিনী স্পেনিয়ার্ডদের নিয়ে তৈরী, অগস্টাসের চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা জার্মান। উৎসবের রাত্রিতে এ নগরের পথে সিডিয়ান সুন্দরী তালি বাজায়, ভারতীয় নর্তকী নাচে, স্পেনিস তরুণ বাদ্য বাজায়। কেউ গ্ল্যাডিয়েটার হয়ে জীবন-মরণ লড়ছে, কেউ সার্কাস দেখাচ্ছে, কেউ রান্না করছে, কোন রূপসী হয়ত স্নানাগারে আপন মাথার চুলে প্রভুর হাত মুছে দিচ্ছে। চারদিকে সেদিন দাস আর দাস। মাঠে, খনিতে, কারখানায়, হাটে—সর্বত্র আমরা। ইতালীতে সেদিন প্রতিটি স্বাধীন মানুষের পিছু পিছু তিনজন দাস। অতি অল্প-জনই তাদের মধ্যে "সোলিউটি",—বন্ধন হীন, অধিকাংশই "ভিংকটি"—হাতে পায়ে তাদের শেকল। ক্লডিয়াসের আমলে স্বাধীন মানুষ উনসত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার, দাস—দুই কোটি তিরাশী হাজার ! অগস্টাসের আমলে রাজধানীতে সংখ্যায় আমরা দুই লক্ষ আশী হাজার। অথচ আশ্চর্য এই, কেউ সেদিন আমাদের নিয়ে ভাবে না। কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিল—আমদের পোশাক ভিন্ন করা দরকার। নয়ত সাচ্চা রোমানেরা গোলমালে পড়ে যাচ্ছেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন না—কারা স্বাধীন মানুষ, কারা দাস। সেনেট শোনা মাত্র প্রস্তাবটা নাকচ করে দিয়েছিল, কারণ—এ প্রস্তাব গ্রহণ করলে দাসরা জেনে যাবে, এ শহরে তারাই প্রধান ! মাননীয় সদস্যরা সে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারেন না। কারণ—ক্রীতদাসরাই তাদের জীবনে সব। তাদের শক্তি, তাদের অর্থ, তাদের আমোদ, তাদের গৌরব। সেনেকা দার্শনিক ছিলেন। ম্যাক্সিমাসও তাই। তাঁরা এই বিলাস থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। যথার্থ জীবনের সন্ধানে সুখশয্যা ছেড়ে মাটিতে শয়ন করতেন। তাতেও তৃপ্তি মিলল না। শান্তির সন্ধানে শহর ছেড়ে ওরা খালি পায়ে গ্রামের পথ ধরে অরণ্যের দিকে এগিয়ে চললেন। সমগ্র রোমান দুনিয়া ধন্য ধন্য করে উঠল। কিন্তু তাকিয়ে দেখ, ওদের পিছনে পিছনে সন্ন্যাসীর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন বয়ে নিয়ে চলেছি আমরা, ক্রীতদাসরা ! এই সেদিনের রোম। সিসেরো সেখানে কজন ? কি রিপাবলিকান রোম, কি রাজকীয় রোম—সাম্রাজ্যে সেদিন ভেডিয়াস পোল্লিও আর নিরোরাই প্রবল। নিরো ভোজের আসরে বসে দুহাতে দাস দাসী বিলোতেন, পোল্লিওর ক্রীড়া ছিল নিজের ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের পোষা হাঙ্গর কুমীরের মুখে ছুঁড়ে দেওয়া ! ক্যাসিয়াস ছ'শ ক্রীতদাসকে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশনামা মঞ্জুর করেছিলেন— কারণ আমরা বাড়িতে থাকাকালেই কে বা কারা জনৈক রোমান গৃহ-পতিকে হত্যা করেছিল। এমন যে মানুষ কনস্টেনটাইন তিনিও খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আগের বছর কয়েক হাজার ক্রীতদাসকে সিংহের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে অবসর যাপন করেছিলেন।—তারপরও কি বলা চলে, আমরা এই বিশ্বের ক্রীতদাস ক্রীতদাসীরা সুখী ছিলাম !

—

আমি দুঃখী ছিলাম। আমি টেরেনস,—ক্রীতদাস হয়েও সেদিনের পৃথিবীতে আমি বিখ্যাত কবি হয়েছিলাম।

আমি এপিকটেটাস, দাস হয়েও আমি দার্শনিকের গৌরব লাভ করেছিলাম।

আমি নামহীন অখ্যাত দাস। ইতি-হাসের বিখ্যাত মানব হোরেস আমার তনয়।

আমি......। আমি রোমের যাজক হয়েছিলাম।

আমি খোজা নারসেস,— দাস হয়েও আমি পারস্যের বিখ্যাত সেনানায়ক হয়েছিলাম।

আমি টৌমিফাস। দাস হয়েও আমি স্বপ্ন দেখতে জানতাম। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম

বিশ্বের আমি ভবিষ্যত অধীশ্বর। অবশ্য সে স্বপ্নের মূল্য হিসেবে আমাকে ক্রুশে প্রাণ দিতে হয়েছিল। তবুও আমি সুখী ছিলাম, কারণ আমি স্বপ্ন দেখতে পারতাম।

আমি পণ্টাসের অখ্যাত দাস ওথো। আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম—রোম আমার। নিরো মারা গেলে আমি রটিয়ে ছিলাম সম্রাট মরেনি। ওরা আমাকে হত্যা করেছিল। তবুও আমি সুখী, আমি নিরোর রোমে স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলাম।

আমি কুতুবুদ্দিন। স্বপ্ন নয়, দাস থেকে আমি হিন্দুস্থানের বাদশা হয়েছিলাম।

আমি ইলতুৎমিস।

আমি নাসির খাঁ হাবসী। আহম্মদ শাহ গণেশীকে হত্যা করে আমি গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলাম।

আমি নামহীন ক্রীতদাসী। অক্টাভিয়া আমাকে ভালবেসেছিল।

আমি এক আরব ক্রীতদাস। আমার বুদ্ধি ছিল। পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি ক্ষণিকের জন্যে নগরের অন্যতম সম্ভ্রান্ত মানুষের অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম। একটি অভিজাত রূপসীকে কাছে পেয়েছিলাম। সেখের পায়ের শব্দ শুনে পালাতে গিয়ে বাঁদীর হাতের পানপাত্রটি ভেঙে দিয়েছিলাম। শেখ বলেছিল—তুমি এখানে কেন? উত্তরে বলেছিলাম—এই বাঁদী রাস্তা দিয়ে সুরা নিয়ে আসছিল, ধাক্কা দিয়ে তার হাতের পাত্রটি ভেঙে দিয়েছি, তাইতেই বেগমসাহেবা আমাকে ধরিয়ে এনে জরিমানা করেছেন। শয্যায় তখনও আমার খুলে রাখা পোশাকটা পড়ে রয়েছে, তাই দেখিয়ে বলেছিলাম—জরিমানা, ঐ আমার পোশাক।

আমি গ্রীক রূপসী। রোমানরা আমাকে উপহার করে পাঠিয়েছিল। ইরানের বাদশা পঞ্চম ফারাটেস ভালবেসে আমাকে রানী করেছিল।

আমি ইলতুমিস-কন্যা রাজিয়া। আমি হিন্দুস্থানের রাজ্ঞী হয়েছিলাম।......

তোমরা ক'জন?

রোমের শহরতলির দিকে এগিয়ে যাও। দেখবে সেখানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের এক কোণে জলপাই গাছের ছায়ায় সারি সারি কবর। ডোরিয়ান থামের বন্ধনে যে উন্নত স্মৃতিসৌধগুলো, সেগুলো পিছনে ফেলে কাঁটাগুল্মের ঝোপে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে যেগুলো তার দিকে একবার তাকাও। দেখবে প্রাচীন পাথরে বিশুদ্ধ লাতিনে সেখানে আজও উৎকীর্ণ রয়েছে আমার কাহিনী।

"এখানে যে শায়িত সে হারমিওস, লুকানিয়া থেকে আগত জনৈক ক্রীতদাস মেষপালক। সে জীবনে মাত্র একবার বেকন দিয়ে ফিল্ডফেয়ার খেতে চেয়েছিল। মাত্র একবার। কিন্তু পারেনি। হে পথিক, মনে রেখো। পৃথিবীতে যতদিন একটি মানুষ বলবে যে, সে ফিল্ডফেয়ার আর বেকনের স্বাদ জানে না ততদিন তা মুখে তুলো না।"

আরও দু'পা এগিয়ে যাও। বাঁয়ের ঐ ছোট্ট কবরটির দিকে তাকাও। আরও একটি জীবনের কথা শুনে যাও।

'রোমানরা আমাকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিল'

"এখানে যে শায়িত নাম তার গ্রিক্সাস। সে একজন কেল্টিক গ্ল্যাডিয়েটার ছিল। সে একটি মেয়েকে তার জীবনসঙ্গিনী করতে চেয়েছিল, মেয়েটি গান গাইতে জানত। কিন্তু পারেনি। এক দিনের জন্যে সে তাকে পাশে বসিয়ে গান শুনতে পারেনি। হে পথিক, মনে রেখো......।"

হারমিওস, তোমার অতৃপ্ত ক্ষুধার কাহিনী তোমার একার নয়। গ্রিক্সাস, তোমার অপূর্ণ কামনার হাহাকার আমাদেরও অন্তরে। কিন্তু সে কাহিনী পরে। তার আগে আমাদের তথাকথিত জীবনের অন্য কাহিনীগুলোও শোনা দরকার। গ্রিক্সাস, তুমি নিশ্চয় মানবে যে, যেসব রূপসী মেয়ে গান গাইত তারাই আমাদের একমাত্র কামনা ছিল না। জীবনে আমাদের আরও অনেক ছোটখাট সাধ আহ্লাদ, প্রার্থনা ছিল। কখনও এক ফোঁটা জল, কখনও একফালি আচ্ছাদন, কখনও বা শুধু পিঠটা টান করে শোওয়া যায় এমন আর তিন আঙুলে নগ্ন কাঠ:—গ্রিক্সাস, যে সুন্দরী মেয়েরা গান গাইত তাদেরও গলায় সেদিন এমনি সব তুচ্ছ বস্তুর জন্যে বিরামহীন কান্না, যে হাল্কা ঠোঁটগুলো প্রতি মুহূর্তে অভিজাত গ্রীক রোমানকে শ্রেণীভেদ ভুলিয়ে দিত, এক বিন্দু জল তখন তার কাছে সাধ। গ্রিক্সাস, ক'জন জানে সেই অসহ্য মাসগুলোর ইতিহাস?

ওল্ড কালাবার থেকে কি করে আমরা অপহৃত হয়েছিলাম সে কাহিনী তোমরা শুনেছ। সিল্কের রুমাল, জিন-এর ভাঁড়, আর পুঁতির মালার বদলে মানুষ কেনার 'সাধু' বাণিজ্য কি করে সভ্যতার চোখের সামনে দস্যুতায় পরিণত হয়েছিল, কিভাবে পর পর চার শতকের হৃদয়হীন লুণ্ঠনে বিশাল আফ্রিকার দীর্ঘ উপকূল বসতি শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছিল, সে ইতিবৃত্ত এখানে অবান্তর। লোভ, লাভ,—আরও চিনি, আরও তুলা, আরও তামাক এবং আরও স্বধর্মী এই সেদিনের ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় একমাত্র ধ্যান। তার বাইরে যেন আর কোন জরুরী সংবাদ নেই। সুতরাং তার চেয়ে জরুরী কয় মানুষের পাউণ্ড-শিলিং আর ডলার-সেণ্টের অঙ্ক বাড়াতে কি করে আমরা শত শত মাইল পেরিয়ে অচেনা জগতে নতুন ঠিকানায় পৌঁছাতাম তাই শোন।

ওরা এজেণ্টদের বলত 'বাকার'। বাকার শিকার ধরে নিয়ে এল। তাকে দাম চুকিয়ে দেওয়া মাত্র সুরু হল ব্যবসায়ীর কাজ। প্রথম কাজ মানুষগুলোকে গুদামজাত করা। হাটের অবস্থা ভাল থাকলেও একদিনে জাহাজ ভরান সম্ভব নয়। কারণ, বন্দরে বন্দরে প্রতিদিন তখন নানা দেশের অনেক জাহাজ। ১৭৭০ সনে একমাত্র রোড আইল্যাণ্ডেই এ-কারবারে নিযুক্ত ছিল দেড়শ জাহাজ। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পরে, অর্থাৎ ব্যবসা যখন সম্পূর্ণ বে-আইনী তখন সেখানে দাস-জাহাজ ছিল একশ বিরাশিখানা! সুতরাং খোল বোঝাই করতে সময় লাগে তখন গড়ে তিন মাস থেকে দশ মাস। ১৮০৮ সনের পরে, অর্থাৎ এ বাণিজ্য বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পরে চোরা-কারবারের বেপরোয়া দিনগুলোতে অবশ্য আর এত সময় লাগত না। কারণ তখন উপকূলের সর্বত্র 'বারাকুন' উঁকি দিয়েছে। 'বারাকুন' মানে—দাস-গুদাম। সম্পন্ন এজেণ্টেরা দুর্গের মত সুরক্ষিত সেই গুদামে হাজার হাজার দাস নিয়ে সম্রাটের মত বাস করে। জাহাজ ডাঙা ছুঁয়েই আবার পসরা নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিজের পথ ধরে। 'বারাকুন' আমাদের জীবনযন্ত্রণাকে লাঘব করেছিল এমন নয়। কারণ সেই কাঠের দুর্গের কোন আয়োজনই মানুষের কথা ভেবে নয়। ডন পেড্রো, ডি সুজা বা চা-চাউর মত দাস-সম্রাটেরা জানত এখানে যারা থাকবে তারা

মানুষ নয়,—ক্রীতদাস। স্বভাবতই 'বার্‌রাকুন'-এর পাশেই চা-চাউয়ের বৈঠকখানায় যখন দামী মদে সন্ধ্যা আরবারজনী হয়ে উঠেছে, গর্বিত দাস সম্রাট যখন জনৈক ক্যাপ্টেন ড্রেককে (১৮৪০) সগর্বে বলছে—কোন্ মেয়ে চাই তোমার বল;—ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিস, গ্রীক, সিরকাসিয়ান, ইংলিশ, ডাচ, ইতালিয়ান, এসিয়াটিক, আফ্রিকান,—আমেরিকান? এ গরীবের ঘরে বন্ধু সবই আছে; তখন আমরা তারই বার্‌রাকুনে ক্ষুধায়-ছেঁড়া রুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি, ওভারসিয়ারের চাবুক তুচ্ছ করে আরও একটু জলের জন্যে 'বর্বরের মত' চেঁচাচ্ছি! তাহলে 'বার্‌কাকুন অনেক ভাল। তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ জাহাজের খোল।

আফ্রিকার উপকূলে দু' ধরনের জাহাজ আসত তখন। বড় আর ছোট। বড় জাহাজগুলোতে দুটো করে ডেক থাকত। নীচের ডেক আর পাটাতনের মাঝামাঝি জায়গাটাকে বলা হত—লোয়ার হোল্ড বা নীচের খোল, আর দুটো ডেকের মাঝামাঝি দ্বিতীয় খোলটাকে বলা হত—আপার ডেক বা ওপরের খোল। 'বার্‌রাকুন' যখন ছিল না তখন এই ওপরের খোলটাই ছিল গুদাম। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে চুরি করা কেড়ে আনা মানুষগুলোকে এখানেই জমা রাখা হত। নরকের প্রথম পর্ব সেখানেই। তারপর সুরু হত দ্বিতীয় পর্ব, ক্যাপ্টেনদের ভাষায় নাম যার—'মিডল প্যাসেজ'। প্রত্যেক দাস-জাহাজের পথ তিন অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রথম অধ্যায় ইউরোপ বা আমেরিকার বন্দর থেকে আফ্রিকার বন্দর। দ্বিতীয় বা মধ্যপথ আফ্রিকা থেকে ইউরোপ বা আমেরিকার কোন হাট, তৃতীয়—সেখান থেকে আবার নিজের বন্দর। এই তিন অধ্যায়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমাদের তথা দাস-ব্যবসায়ীদের নিজেদের জীবনেও সবচেয়ে গুরুতর। কারণ এই সময়েই তার জাহাজের খোলে থাকে সেই বিস্ময়কর সম্পদ, নাম যার ক্রীতদাস! 'মিডল প্যাসেজ' আমাদের জীবনেও এক বীভৎস অভিজ্ঞতা, কারণ এই সময়টুকুতেই আমরা প্রথম চর্মে-মর্মে আবিষ্কার করি ক্রীতদাস কাকে বলে, আর অন্য মানুষের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যই বা কোথায়!

যাত্রার দু'দিন আগে মেয়ে পুরুষ সবাইকে ওপরের খোল থেকে বাইরে আনা হল। চাবুকের মুখে সার করে দাঁড় করিয়ে সবাইকে উলঙ্গ করা হল। ডাক্তার একজন একজন করে সবাইকে পরীক্ষা করল,—একজন একজন করে সকলের মাথা মোড়ান হল। তারপর নুন জলে হাত পা মুখ ধুয়ে সকলকে খেতে দেওয়া হল। নির্দিষ্ট খাবার। এক একটি পাত্রে দশজন করে খাবে। স্বদেশের কোলে সেই আমাদের শেষ ভোজ, খাওয়ার পর আবার শেকল গলায় উঠল, কিংবা পায়ে। এবার দাসদের চিহ্নিত করা হবে। রুপোর অথবা লোহার শিলমোহর গরম করা হচ্ছে। কপালটা ভবিষ্যতের প্রভুর জন্যে ফাঁকা রাখা হচ্ছে। বান্দাছাপ আপাতত বুকেই পড়বে। জাহাজ থেকে নামলেই বোঝা যাবে কারা কোন কোম্পানির পণ্য,—কতখানি নির্ভরযোগ্য। কাঁচা চামড়ায় সে ছাপ পড়তে না পড়তে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠবে—ভিভালা হ্যা-ভা-না! বল,—হ্যাভানা কি জয়! কিংবা—বল লিভারপুল কি জয়! কোথায় হ্যাভানা, কোথায় লিভারপুল সেগুলো কি, কোন মানুষের নাম অথবা কোন দেশের, আমরা তখনও তা জানি না। কিন্তু তবুও হুকুম যখন তখন চেঁচাতেই হবে! সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। বুকে তপ্ত লোহার ছাপ ফুলে উঠেছে, বিদায়ের কথা ভেবে চোখ উপচে জল আসছে, আমরা

তাই নিয়ে অজানা ভাষায় চেঁচাচ্ছি—ভিভেনা হ্যাভানা।

এবার নতুন হুকুম। আদেশ হল—মরদেরা সব নীচের খোলে চল। মেয়েরা থাকবে ওপরের খোলে, আর বাচ্চারা এখানেই, ডেকে! দু'জন করে এক সঙ্গে বাঁধা আমরা দাসরা নীচের খোলে ঢুকলাম। নরকে কপাট পড়ল।

নরক যদি কোথাও থেকে থাকে তবে তা এইখানে, এইখানে! এই দাস জাহাজের খোলে। ইতিহাসে যাকে বর্বর যুগ বলে, সেদিনের দাস ব্যবসায়ীও এমন করে নিপুণ হাতে বোধ হয় নরক গড়তে জানত না। খোলটা লম্বায় জাহাজের প্রায় সমান। চওড়ায় পাঁচ ফুট থেকে সাড়ে পাঁচ ফুট, উচ্চতায় তিন ফুট দশ ইঞ্চি। তারই মধ্যে সার করে একজনের পা আর একজনের সঙ্গে বেঁধে আমরা পড়ে আছি। শেকলগুলো আবার দেওয়ালের সঙ্গে আটকান। উঠে সোজা হয়ে বসব সে সুযোগ নেই। চিৎ হয়ে পিঠটা টান করব সে জায়গা নেই। কাঠের পাটাতন বরাদ্দ করা, সেখানে এক ইঞ্চিও বাড়তি বদানাতার সুযোগ নেই। আমরা ক্রীতদাসেরা সেখানেই পড়ে থাকি। দিনে দু'বার ওরা খাবার দিতে আসে, একবার সকাল দশটায় আর একবার বেলা চারটায়। চব্বিশ ঘণ্টায় জলের বরাদ্দ—আধ পাঁইট। চেঁচালে চাবুক পাবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশী পাবে না! সপ্তাহে একদিন জাহাজের কর্মচারী ভেতরে আসে,—বেড়িগুলো চেঁছে দিয়ে যায়, নখগুলো কেটে ছোট করে দেয়। ওদের ভয়—নখ দিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরব। মাঝে মাঝে ওরা ভিনিগার দেয়। বলে—কুলকুচি করে ফেল, —শরীর ভাল থাকবে। মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন ডেকে পাঠায়। বলে—নাচ, গান কর। অবসন্ন শরীর, ভারাক্রান্ত মন, সে আমন্ত্রণে সাড়া দেয় না। তবুও নাচতে হয়, গাইতে হয়। ওদের হাতে হাতে চাবুক, পা বা গলা থেমে গেলেই তা সপাং করে পিঠে এসে পড়ে। ওরা সতর্ক ব্যবসায়ী, ওরা জানতে চায়—আমরা বিদ্রোহী নই, বাধ্য ; আমরা এখনও আনন্দিত, উৎফুল্ল!

এটা একটা আদর্শ জাহাজের খবর। বলা নিষ্প্রয়োজন, দরিয়ায় এ জাহাজ সেদিন অনেক ছিল না। অধিকাংশ জাহাজের দাস-খোল উচ্চতায় মাত্র দু'ফুট। ১৮৪৭ সনে 'মারিয়া' নামে তিরিশ টনের একটি জাহাজ ধরা পড়েছিল, তার পঞ্চাশ ফুট লম্বা পঁচিশ ফুট চওড়া খোলে দাস ছিল দু'শ' সাঁইত্রিশ জন! লিভারপুলে 'ব্রুকস' নামে একটি জাহাজের খোল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল তিনশ' টনের এই জাহাজটির একশ' ফুট লম্বা আর পঁচিশ ফুট চওড়া খোলে মানুষ আছে ছ'শ ন'জন! 'ব্রুকস'-এর ক্যাপ্টেন এ অবিশ্বাস্য কাণ্ড সম্ভব করেছিল শায়িত দাসদের মাথার ওপরে দু' পাশে দুটি তাক ঝুলিয়ে তাতে আরও কিছু মানুষকে শুইয়ে দিয়ে! ওরা সবাই ডান দিকে পাশ ফিরে চামচের কায়দায় শুয়ে থাকত। কারও পা সোজা করার বা পাশ ফেরার জায়গা ছিল না। দশ সপ্তাহ মানুষগুলো সেখানেই চোখ বুজে পড়েছিল!

ছোট জাহাজের কাহিনী আরও ভয়াবহ। সেগুলোকে বলা হত—'স্লুপ' এবং 'স্কুনার'। তাতে ডেক আর খোলের মাঝামাঝি আর কোন দ্বিতীয় ডেক থাকত না। দশ টন, পনের টন, কুড়ি টনের জাহাজে তার কোন অবকাশ ছিল না। ওরা ডেকের তলায় মালপত্রের ওপরে আর একটি অস্থায়ী ডেক তৈরী করে নিত। অবশ্য জায়গা বেশী পাওয়া যেত না। বড়জোর আঠার ইঞ্চি কি দু' ফুট। তাতেও দালিরা আটকাত না। ওরাও প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ডলার লাভ করত।

সে লাভের অংকটাও বোধ হয় শোনা দরকার। কেননা, নইলে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, স্টীম ইঞ্জিন, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদি যুগান্তকারী ঘটনার মধ্যেও মানুষ এ হৃদয়হীন বাণিজ্য কেন ভুলতে পারেনি তা বোঝা যাবে না। ১৭৫৩ সনে প্রায় বিনামূল্যে কেনা প্রতিটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসের বিক্রয় মূল্য ছিল গড়ে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। ১৭৮৬ সনে লিভারপুলে একটি কোম্পানি বিক্রি করেছিল একত্রিশ হাজার ছ'শ নব্বুই জনকে। এক একবারে তাদের নীট লাভ হয়েছিল দু লক্ষ আটানব্বুই হাজার চারশ' বাষট্টি পাউণ্ড। 'লটারী' নামে একটা জাহাজ এক অভিযানে লাভ করেছিল—চব্বিশ হাজার চারশ' ত্রিশ পাউণ্ড, 'লাইসা'—উনিশ হাজার একশ' তেত্রিশ পাউণ্ড, 'ত্রুস'—আট হাজার একশ' তেইশ পাউণ্ড। পরবর্তীকালে, উনবিংশ এবং এই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে এই লাভের অংক ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ১৮২৭ সনে জনৈক ক্যাপ্টেন ক্যানট এক ক্ষেপেই লাভ করেছিল—একচল্লিশ হাজার চারশ' আটচল্লিশ ডলার চুয়াত্তর সেণ্ট। হিসেব করে দেখা গেছে, সাড়ে তিন হাজারের একটি 'স্কুনার' এবং একুশ হাজার ডলার অন্য খরচ হিসেবে খরচ করতে পারলে—এই ব্যবসায়ে ছ'মাসের মধ্যে নীট লাভ প্রায় পঞ্চাশ হাজার ডলার। কেননা, একদিকে উপনিবেশগুলোয় তুলো এবং তামাক চাষে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দাসের চাহিদা বেড়েছে, অন্যদিকে নানা আইনের কড়াকড়িতে ব্যবসায়ের ঝুঁকি বেড়েছে। তাছাড়া, বিক্ত উপকূলে দাসরাও ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ফলে ১৭৮০ সনে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলে একজন কৃষ্ণাঙ্গের দাম ছিল যেখানে দু'শ' ডলার, ১৮১৮ সনে তা দাঁড়াল হাজার ডলার, ১৮৬০ সনে আরও বেশী—আঠারশ' ডলার!

শুধু দর বৃদ্ধি নয়, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে ক্যাপ্টেনদের জাহাজগুলোও ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ইতিহাস জানে, নৌ-বিজ্ঞানে এই হৃদয়হীন ব্যবসায়ীদের কি দান। তারা জাহাজের চেহারা পাল্টেছে, গতি বাড়িয়েছে, ক্ষিপ্রতা এনেছে, আবহাওয়া জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে এবং আরও অনেক কিছু। জলে রাষ্ট্রীয় প্রহরীদের এড়াবার জন্যে তারা মাস্তুল গোপন করার উপায় বের করেছিল, পালের বদলে দড়ির ব্যবহার বাড়াবার কৌশল বের করেছিল এবং সম্ভবত তারাই জলে বাষ্পীয় পোতকে প্রথম দিন অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু এত পরিবর্তনের মধ্যেও খোলে নির্বাসিত আমাদের দাসদের ভাগ্য অপরিবর্তিতই থেকে গেল। সেই বেড়ি, সেই অপরিসর খোল, সেই খাদ্য, সেই ব্যবহার! সরকারী নৌ-বাহিনীর প্রহরীরা সাক্ষ্য দিয়েছে বাতাস অনুকূল থাকলে তারা চোখ বুজে বলে দিতে পারে কাছে ভিতে কোন চোরা দাস-জাহাজ আছে কি নেই!—দাসবাহী জাহাজের দুর্গন্ধ পাঁচ মাইল দূরে থেকেও নাকে এসে পড়ে! কারণ সুস্পষ্ট। ওদের সর্বাঙ্গে অমানুষিকতার কলঙ্ক মাখা, খোলভরা পাপ।

শুধু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নয়, দাস ব্যবসায়ী কখনও কখনও নির্মমতায় শয়তানকেও পেছনে ফেলত। 'জং' নামে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন কলিংউড সগর্বে নিজ মুখে দুনিয়াকে সে কাহিনী শুনিয়ে গেছে। ১৭৮১ সনের সেপ্টেম্বরে চারশ' সাতচল্লিশ-জন ক্রীতদাস খোলে পুরে সে আফ্রিকার সেণ্ট টমাস দ্বীপ থেকে জ্যামাইকা যাত্রা করেছিল। পথে জাহাজে জলাভাব দেখা দিল। খোলে পতঙ্গের মত মানুষ মরতে লাগল। যারা তখনও বেঁচে ছিল, কলিংউড তাদের ডেকে এনে সমুদ্রে ছুঁড়ে দিতে আদেশ করল। কারণ, হিসেব করে সে দেখেছে—নাবিকদের খুশী রাখতে হলে সকলের পক্ষে এ জল যথেষ্ট নয়!

জীবন্ত মানুষকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার এমনি আরও অনেক কাহিনী ক্যাপ্টেনদের মুখে শোনা গেছে। জাহাজের খোলে মড়ক লেগেছে শুনে ক্যাপ্টেন কখনও জাহাজশুদ্ধ ক্রীতদাস সব দরিয়ায় সঁপে দিয়ে নিজের লোকজন নিয়ে ডাঙায় পালিয়ে গেছে, কখনও রুগ্ন ক্রীতদাসকে সেই 'বৈজ্ঞানিক তরল পদার্থ' দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে যাতে একটি মানুষের প্রাণের সঙ্গে অন্যদের রোগের সম্ভাবনা চিরতরে দূরে হয়।

আমরা কখনও কখনও আত্মঘাতী হতাম। বলতাম—'আমরা খাব না।' ওরা আমাদের ঠোঁট কেটে দাঁত ভেঙ্গে পেটে নল চালিয়ে যন্ত্রে খাওয়াত। প্রত্যেক জাহাজে সে যন্ত্র থাকত। একবার একটি শিশু কি মনে করে বেঁকে বসল। ক্যাপ্টেনের জেদ চেপে গেল। শাস্তি হিসেবে সে শিশুটির গলায় একটি বারো পাউণ্ড ওজনের কাঠ বেঁধে দিল, তারপর চাবুক হাতে নিজে তাকে খাওয়াতে বসল। চতুর্থ দিনে চাবুকের ঘায়ে বেচারা শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। ক্যাপ্টেন ওর মাকে দোষী করল। বলল—এ হত্যার জন্যে তুই-ই দায়ী, এ অবাধ্য দাসকে তোকেই সমুদ্রে ফেলতে হবে। চাবুকের ভয়ে মাকে সে দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে হল। উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বেচারা আপন হাতে নিজের ছেলেকে বিসর্জন দিল। সে জানে খুনী সে, তবুও তার বলার কিছু নেই!

মাঝে মাঝে আমরা বিদ্রোহী হতাম। ওরা তখন পাইপ লাগিয়ে খোলে ফুটন্ত জল ঢেলে দিত। সে সুযোগ না পেলে বিদ্রোহী-দের তিল তিল করে হত্যা করত। ১৮৪৪ সনে 'কেণ্টাকি' নামে একটা জাহাজে পাঁচশ দাস বিদ্রোহী হয়েছিল। কিন্তু কিছু করার আগেই সাতচল্লিশজন নেতাকে ধরে ফেলা হল। তাদের মধ্যে একটি মেয়েও ছিল। ক্যাপ্টেন ডগলাসের আদেশে তাদের হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের একজনের সাক্ষ্য অনুযায়ী সে হত্যার বিবরণ ঃ

দুজন মানুষে একসঙ্গে বাঁধা। যাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে তার গলায় ফাঁস দিয়ে তাকে টানতে টানতে এনে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। একজনের গলায় ফাঁস নেই, সে নীচে পড়ে আছে; সুতরাং লোকটি মারা গেল না,—মৃত্যুর স্মারবর্তী হল মাত্র। তখন তাকে গুলী করে হত্যা করা হল। দ্বিতীয় লোকটিকে বলা হল—তাকে বয়ে রেলিংয়ের কাছে আনতে। সেখানে মৃতের পা কেটে তাকে আলাদা করে জলে ফেলে দেওয়া হল। ক্যাপ্টেনের তীক্ষ্ণ নজর বেড়িটাকেও বাঁচাতে হবে!...মেয়েটিকে গুলী করা হয়েছিল। কিন্তু গুলীতে তেমন কাজ হল না। তারপরেও সে বেঁচেছিল। ক্যাপ্টেন সে অবস্থাতেই তাকে সমুদ্রে ফেলে দিল। হতভাগ্য রমনী যখন ডুবে যাচ্ছে, নাবিকেরা তখন উল্লাসে হাসছে।...ক্রমে নেশা চেপে গেল। ওরা খোল থেকে আরও কুড়িটি পুরুষ এবং ছটি মেয়েকে ধরে নিয়ে এল। তাদের কাউকে কাউকে জীবিত অবস্থায়ই সমুদ্রে ছুঁড়ে দিয়ে ক্রীড়ার ভঙ্গীতে একটি বিশেষ মুহূর্তে গুলী করে হত্যা করা হল!

এর চেয়েও অবিশ্বাস্য ক্যাপ্টেন হোমানস সাহেবের 'ব্রীলান্ত'-এর কাহিনী। দাস-ব্যবসা আর জলদস্যুতা এক অপরাধ ঘোষিত হওয়ার পরের কথা। হোমানস-এর সেটা আফ্রিকা থেকে একাদশ সমুদ্র যাত্রা। ইতিপূর্বে সে হাভানায় কমপক্ষে পাঁচ হাজার কৃষ্ণাঙ্গকে নিরাপদে নামিয়ে দিয়ে এসেছে। এবার মাঝপথে এসে হঠাৎ মনে হল—কে বা কারা যেন পিছনে লেগেছে। কিছুক্ষণ পরেই হোমানস তাকিয়ে দেখল তার চারপাশ ঘিরে এগিয়ে আসছে বৃটিশ নৌবাহিনীর চার চারটি জাহাজ। খোলে দাস পেলে—তার আর ছাড়া নেই। হোমানস জাহাজে বড় বড় যত নোঙর ছিল সব বের করল। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অসহায় ক্রীতদাস-দের নিয়ে সে একটি মানুষের মালা তৈরী করল। তারপর নৌবাহিনীর জাহাজ কাছে আসবার আগেই নোঙরের সঙ্গে সেটি বেঁধে সমুদ্রে নামিয়ে দিল। ওঁরা জাহাজে এলেন, খোল পরীক্ষা করলেন। কিন্তু কোথাও কেউ নেই, চারদিক তকতকে ঝকঝকে। সুতরাং মিছেমিছি ক্যাপ্টেনকে ঘাটাঘাটি করা, ওঁরা আবার নিজেদের কাজে ফিরে গেলেন। হোমানস বিজয়ীর হাসি হাসল।

মিশরের খনিদাসদের মারার চাবুক

ইতিহাস জানে, এ হাসিটুকু অর্জন করতে একজন ব্যবসায়ীকে ছ'শ মানুষকে জীবন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছিল!

একই হৃদয়হীনতা আবিষ্কার করেছিল—নৌবাহিনীর জাহাজ 'মেডিনা'। ওরা একটি দাস-জাহাজ থামিয়ে তল্লাসী করলেন। কিন্তু কোথাও কোন দাস নেই। ওরা ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেদের জাহাজে ফিরে গেলেন। পরে এই ক্যাপ্টেনের মুখেই ওরা শুনেছিলেন—ক্রীতদাস ছিল না সত্য, কিন্তু ক্যাপ্টেনের নিজের কেবিনে একটি রূপসী আফ্রিকান ক্রীতদাসী ছিল।—তোমরা আসছ দেখেই মেয়েটিকে আমি জোর করে নোঙরের সঙ্গে বেঁধে জানালা দিয়ে জলে ফেলে দিয়েছিলাম। সে আরও জানিয়েছিল—মেয়েটির পেটে আরও একটি প্রাণ ছিল। এবং সে অজাত মানব-শিশু তারই আপন সন্তান!

মাঝে মাঝে আমরা আত্মহত্যা করতাম। বন্ধুদের চোখের সামনে লাফিয়ে হাঙ্গরের দঙ্গলে ঝাঁপ দিতাম। ওরা আনন্দে চিৎকার করত, বলত—যে মৃত্যুকে চিনল সেই সুখী, আমরা বেঁচে আছি আমরা চির দুঃখী। ক্যাপ্টেনেরা ওদের মৃত্যু সম্পর্কে ভয় দেখাতে চেষ্টা করত। আত্মঘাতী মৃত দাসকে জল থেকে তুলে এনে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে খোলের সামনে ঝুলিয়ে রাখত। বলত—এই দেখ মৃত্যু মানেই স্বাধীনতা নয়। তোদের যে বন্ধু মরে স্বাধীন হয়েছিল বলে ভেবেছিল এই ত সে, যার হাত পা নানা জায়গায় ছড়ান সে কি কখনও বাঁচে?—সে কি কখনও স্বাধীন মানুষের মত গান গায়, হাঁটে? আমরা মনে মনে হাসতাম। পরদিন ওরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করত, খোলে আরও একটি মানুষের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। সে বেচারার ডেক থেকে ঝাঁপ দেওয়ার সুযোগ ছিল না, হাতের কাছে নিজের আঙ্গুলগুলো ছাড়া নিজেকে হত্যা করার মত কোন হাতিয়ার ছিল না। তাই দিয়ে সে আত্মঘাতী হয়েছে, নিজের আঙ্গুলে নিজের টুঁটি ছিঁড়ে স্বাধীন হয়েছে।

আশ্চর্য, তবুও কিন্তু ওরা একবারও জাহাজ থামিয়ে ভাবে না, মানুষ কেন আত্ম-হত্যা করে!

মাঝে মাঝে অবশ্য প্রকৃতি প্রতিশোধ নিত। নির্মম প্রতিশোধ। খোলে অবহেলার বদলি হিসেবে ডেক-এ কেবিনেও মৃত্যু এসে হানা দিত। ক্রীতদাস আর প্রভুর ব্যবধান ঘুচে যেত,—দু'দল এক সঙ্গে পতঙ্গের মত প্রাণ হারাত। এমন ঘটেছে, পীত জ্বর জাহাজের অধিকাংশ প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। ক্যাপ্টেনের সুস্থ সহচরেরা জাহাজ সমুদ্রে সঁপে দিয়ে ডিঙ্গি নিয়ে জলে ভেসে পড়েছে। কখনও বা দুই দস্যু জাহাজে লড়াই লেগেছে,—দুই দল ব্যবসায়ীই সে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। কখনও কখনও সমুদ্রে তার চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে!

তোমরা নিশ্চয় হুইটিয়ার-এর বিখ্যাত কবিতা 'দি স্লেভ শিপ্স' পড়েছ। সেকালের পশ্চিম দুনিয়ায় এ কবিতা আলোড়ন এনে-ছিল। সাধারণ পাঠক জানত—এ কবিতা কল্পকাহিনী মাত্র, বিবেকবান কবির অন্যদের বিবেক জাগ্রত করার চেষ্টা। কিন্তু ইতিহাস জানে, তার প্রতিটি হরফ ঘটনা।

জাহাজখানার নাম ছিল—'রঁদা'। সে ১৮১৯ সনের কথা। ফরাসী দাস-তরী 'রঁদা' একশ' বাষট্টিজন দাস নিয়ে আফ্রিকার উপকূল ছেড়ে গুয়াদেলুপের পথে পাল উড়িয়ে চলেছে। হঠাৎ মাঝদরিয়ায় আবিষ্কৃত হল—জাহাজে এক ভয়াবহ চোখের রোগ দেখা দিয়েছে। খোলে ক্রীতদাসেরা অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেনের আদেশে ছত্রিশজন দাসকে জীবন্ত জলে ছুঁড়ে দেওয়া হল। কিন্তু ব্যাধির তাতে মীমাংসা হল না। রোগ খোল ছেড়ে ডেকে হানা দিল। দেখতে দেখতে 'রঁদা'র ডেক অন্ধজনে ভরে গেল। ক্যাপ্টেন, মেট—সবাই অন্ধ। একমাত্র একজন নাবিক তখন চক্ষুষ্মান। সে অসহায়ের মত ভাবছে—এবার কি কর্তব্য। হঠাৎ দেবদূতের মত দিগন্তে একটি জাহাজের পাল দেখা দিল। ভয়ার্ত নাবিকের মনে আশার সঞ্চার হল। সে পতাকায় সাহায্যের আবেদন পাঠাতে লাগল, কিন্তু আশ্চর্য, কোন সাড়া নেই; বরং

জাহাজটি যেন হেলে দুলে অন্য পথ ধরছে। 'র'দা'র একমাত্র নাবিক প্রাণপণ চেষ্টায় জাহাজ নিয়ে তার দিকে এগিয়ে চলল, যে করে হোক এই সহায়কে ধরতে হবে—মানুষেগুলোকে না পারা যায়, নিজেকে অন্তত বাঁচাতে হবে।

জাহাজটা এক সময় কাছে এল। 'র'দা'র নাবিক চেঁচাতে লাগল, কে তোমরা, নিশ্চয় শ্বেতাঙ্গ, আমি ফরাসী জাহাজ 'র'দা'র নাবিক—আমার জাহাজের ডেকে খোলে সবাই অন্ধ, একমাত্র আমিই এখনও দেখতে পাচ্ছি, তোমরা আমাকে সাহায্য কর! রেলিংয়ে সার বেঁধে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে ছিল, তারা জবাব দিল আমরা স্প্যানিশ দাস-তরী 'লিওন'-এর নাবিক,—আমরাও সবাই অন্ধ! ডেকে খোলে চোখে দেখতে পারে আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই!

'র'দা' শেষ অবধি অবশ্য একটি নাবিকের চেষ্টায়ই উপকূল সামনে পেয়েছিল। নিজে অন্ধ হওয়ার আগে সে দুনিয়াকে খবরটা জানাতে পেরেছিল। কিন্তু দৃষ্টিহীন ক্রীতদাস আর তাদের প্রভুদের নিয়ে অন্ধ জাহাজ 'লিওন' কোথায় কিভাবে পাতালের কোন হাটে পৌঁছেছিল সে খবর আজও কেউ রাখে না!

তবুও উদ্যোগী ব্যবসায়ীরা অকুতোভয়। শতকের পর শতক তারা জাহাজ নিয়ে আফ্রিকার উপকূলে এসে নোঙর করেছে, আবার জাহাজ ভাসিয়ে নিজেদের বন্দরে ফিরে গেছে। একজন ঐতিহাসিক হিসেব করে দেখেছেন—জাহাজে তোলার আগে আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ সন্তান শিকারী দস্যুদলের হাতে প্রাণ দিয়েছে। তারপর যারা জাহাজে উঠত তাদের মধ্যে কমপক্ষে অন্তত শতকরা সাড়ে বারোজনকে বিসর্জন দেওয়া হত অ্যাটলান্টিকে। জ্যামাইকায় বন্দরে নোঙর করার পর প্রাণ হারাত গড়ে শতকরা সাড়ে চারজন, এবং শতকরা তিনভাগের একজন জীবন দিত নবজীবনে দীক্ষা নিতে গিয়ে শিক্ষক তথা প্রভুদের হাতে। অর্থাৎ একশ ক্রীতদাস জাহাজে চড়লেও শেষ পর্যন্ত মার্কিন খামারগুলোর হাতে আসত গড়ে পঞ্চাশ জন! তবুও সদ্য প্রতিষ্ঠিত কোন ইউরোপীয় কলোনীর জীবনে তারা কম নয়! আর একজন ঐতিহাসিক হিসেব করে দেখিয়েছেন ১৫১৯ থেকে ১৮০৭ সন অবধি আমেরিকার উপনিবেশগুলোর আফ্রিকার দাস এসেছে কম করেও পঞ্চাশ লক্ষ! তারপরেও এসেছে আরও কয়েক লক্ষ। কেননা, আইনে কড়াকড়ি হলেও, ব্যবসায়ী দস্যু বলে ঘোষিত হলেও, আফ্রিকার উপকূল ১৮৬০ সন অবধি পশ্চিমের মৃগয়া-কানন। কলম্বসের আমল থেকে কুইন ভিক্টোরিয়া—অ্যাটলান্টিকের বুকে ভাসমান জাহাজের অন্ধকার খোলে প্রত্যেকের আমাদের এক জীবন! গ্রিক্সাস, অ্যাটলান্টিকের ওপার হয়ত সত্যিই তোমাদের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু সমুদ্র নিশ্চয় নয়। তোমরাও বোধ হয় একদিন ফিনিসীয়, মিশরীয়, পারসিক, আরবী জাহাজে চড়েই রোম পৌঁছেছিলে! এবং তোমাদের যারা মায়ের কোল, প্রিয়তমার বাহুডোর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তারা নিশ্চয় ব্যবসায়ী ছিল। তা হলই বা তাদের অঙ্গে সেনাপতির পোশাক!

যদি ডাঙার পথে তোমরা এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশে পাড়ি দিয়ে থাক, তাহলেও তোমাদের কাহিনী আমাদের ধারণার অতীত নয়। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, শেকলের অভাবে তোমাদের হাতগুলো বাঁশের হাল্কা ফালি দিয়ে বাঁধা। তোমরা সার বেঁধে সাহারার বুক দিয়ে চলেছ। তোমাদের হাত থেকে মরুভূমিতে টপটপ করে রক্ত ঝরছে, চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তোমরা কাঁদছ। টিম্বাকটু থেকে কানো, সেখান থেকে কুকা, সেখান থেকে মরক্কোর সুলতানের প্রাসাদ,—তোমাদের অনেক দূরে যেতে হবে। হয়ত আরও দূরে, তোমরা তুরস্কে কোন আমীরের ঘরে যাবে, ইস্পাহানে কোন সৌখিনের বাগিচায় গোলাপ ফোটাবার জন্যে মাটি তৈরী করবে, জল ঢালবে।

স্থলপথে সেদিন আমরা শুধু মরক্কো আর তুরস্ক নয়,—আমরা সেদিন আরও বহু দূর দূর দেশের যাত্রী। খৃষ্টজন্মের বারোশ' বছর আগে, আসিরিয়ার সিংহাসনে যখন প্রথম সালমানাসার, আমরা তখন থেকেই পসরা হয়ে পথে পথে পথিক। আসিরিয়ার রূপসীদের সঙ্গে তোমরা চীনের রেশম দেখেছ, গলায় দেখেছ আফগানিস্তানের জড়োয়ামালা—কিন্তু উঁচু প্রাসাদ-দেওয়ালের আড়ালে রেশমের মত মসৃণ ভারতীয় মেয়েগুলোকে দেখনি। চুংকিং থেকে ব্রহ্মের বুক দিয়ে দিল্লির পথে রাত কাটিয়ে, তেহরান সমরখন্দ পিছনে ফেলে, কাস্পিয়ান ডিঙিয়ে যে রেশম-পথ টিফলিস থেকে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে গিয়ে ঠেকেছিল, সে কি শুধু প্রাণহীন রেশমেরই পথ ছিল? নিশ্চয় নয়, এই পথেই যেমন মার্কোপলো, ফা হিয়ান, ইবনবতুতার নিঃশব্দ অভিযাত্রা, এই পথেই যেমন—চেঙ্গিস খাঁ, আলেকজান্ডার আর তৈমুরের রক্তাক্ত অভিযান, এই পথেই তেমনি যুগযুগান্ত ধরে আমাদের আনাগোনা। তৈমুর দিল্লি দখল করে তার উন্মত্ত সৈনিকদের বলেছিল—তোমরা মাথা পিছু কুড়ি থেকে দুশ' মানুষকে দাস করে সঙ্গে নিতে পার। হিন্দুস্থানের রাজধানী শূন্য করে আমরা জ্ঞানী, গুণী, গায়ক, নর্তকীর সেই বিরাট বাহিনী এ পথেই এশিয়ার আর এক প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। এই 'মিডল-প্যাসেজ' কি ভারতের তাঁতীদের হাতে বোনা রেশমের মত ফুলে কাটা? বরং অ্যাটলান্টিকের তুলনায় সে সব বাণিজ্যপথ আরও করুণাহীন, দুর্গম। অথচ এ সব পথেই ইংল্যান্ডের টিনের সঙ্গে মোট হয়ে স্যাক্সন তরুণী ইউরোপের হাটে এসেছে, স্পেনের তামায় তুরস্কে স্প্যানিশ তরুণের দাসখত লেখা হয়েছে, মধ্য আফ্রিকার লোহায় ইউরোপে শেকল তৈরী হয়েছে, মোলুক্কাসের মশলায় তার রোমান প্রভুর জন্যে ইরাণী ক্রীতদাসী মিশরের ফারাওদের রুচিমত খাবার রেঁধেছে।

খৃষ্টপূর্ব ২৬৬ অব্দ থেকে ৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমানরা তিন মহাদেশ জুড়ে অনেক পথ গড়েছে। তার কোনটিই শুধু সামরিক পথ নয়। আমরা সব পথেই সভ্যতার নিত্য সঙ্গী, প্রতিক্ষণ তার পায়ে পায়ে আছি! তাকিয়ে দেখ, ওয়াশিংটন যখন মানুষের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছেন, আমরা তখন শেকল পায়ে ভার্জিনিয়ায় নামছি, রামমোহন যখন বিশ্বমানবতার কথা ভাবছেন—কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে আমরা তখন সওদাগরের কোলে চড়ে মাটিতে পা রাখছি। হাতে আমাদের শেকল, অনাহারে আর অত্যাচারে এত দুর্বল যে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। সতর্ক ব্যবসায়ী তাই হঠাৎ মায়ের মত স্নেহময় হয়ে উঠেছে, দেখ ওরা আমাদের অতি সাবধানে কোলে করে নামাচ্ছে।

যাত্রা শেষে হাট।

জাহাজ বন্দরে এল। এথেন্সের হাটে সুরু হল সুখী নগরপিতাদের আনাগোনা। নগরসভার অধিবেশন বসে মাসে চারদিন, কিন্তু গোলামের বাজার বসে প্রায় প্রতিদিন। রোমও তাই। সেখানে গ্রাম থেকে সম্পন্ন রোমান, শহরে বন্ধুকে বার্তা পাঠায়,—গতরে খাটতে পারে এমন বদলী দিতে পারি, তুমি আমাকে একটি সুসংস্কৃত তরুণী পাঠাও! একই খবর পরবর্তীকালের ভারতে, আমেরিকায় এবং পৃথিবীর নানা প্রান্তে। মানুষ কেনাবেচার হাট—শহরে শহরে সেদিন অন্যতম দ্রষ্টব্য, যেন বিনে পয়সার থিয়েটার, সার্কাস।

রুয়া ডাইরিটা নামে যে পথটা, তাই ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাও। ভাইসরয়ের প্রাসাদ থেকে সিকি মাইল আসতে না আসতে তোমার সামনে পড়বে টের্‌রি রো ডি সাবাইও,—এ শহরে এটাই চৌরঙ্গী, এখানেই ক্যাথিড্রেল, সেনেট হাউস, ইনকুইজেশন। ভাল করে তাকিয়ে দেখ, তারই একপাশে কিসের যেন ভীড়। এগিয়ে গেলে দেখতে পাবে, কতকগুলো উলঙ্গ প্রায় তরুণ তরুণী সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। একটি মাঝবয়সী লোক চেঁচাচ্ছে—হিন্দুস্থানের যে কোন রাজ্যের তরুণী চাও পাবে!—যে কোন

রাজ্যের তরুণী!—এই যে মেয়েটি দেখছ, সে বাদ্য বাজাতে জানে, সেলাই জানে, মিষ্টি বানাতে জানে!—আর এই যে মেয়েটি দেখছ, সে নাচতে জানে, গান গাইতে জানে, নানা দেশের খাবার রান্না করতে জানে! এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস কর—ক্যাপ্টেন খুশ ত শোনালে, এই তাম্রবর্ণের তরুণটির জন্যে সঠিক কত দিতে হবে তাই বল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হবে—সস্তা! সস্তা! —মাত্র তিরিশ শিলিং!

এ সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে গোয়ার হাটের খবর। ১৬০৮ সনে ফ্রাঁসোয়া পিরার্দ নিজের চোখে এ হাট দেখে গিয়েছেন। তার আগের দিল্লি এবং পরবর্তীকালের কলকাতা, চন্দননগর এবং হুগলীতেও একই খবর। গিয়েছিল তারাও তাই। ১৭৮৪ সনে টিপু দুর্গ জয় করে ফেরবার পথে সত্তর হাজার বন্দীকে হাঁটিয়ে শ্রীরঙ্গপত্তমে এনেছিলেন। সেই হতভাগারাও 'মামলুক'! সুলতানের ঘরে দানসূত্রে বা উপহার হয়ে যারা আসত—তারা 'মাউহুব'। গুজরাতের শাসনকর্তা ফিরোজ তুঘলককে এমনি চারশ' 'মাউহুব' পাঠিয়েছিলেন। সুলতান এবং মোগল বাদশারা নজরানা হিসেবে প্রতিদিন তা পেতেন! কিন্তু তারা আসত কোথা থেকে? কেউ কেউ উত্তরাধিকারসূত্রে দাস পেত সত্য, কিন্তু সেই 'মাউরু'দের নিয়েই নিশ্চয় সুলতান-বাদশাদের বিশাল 'খানজাদা' বাহিনী গড়ে উঠত না। আইনে না থাক,—তাদেরও হাটে নামতে হত! না হলে কোথায় গাঁয়ে গাঁয়ে হানা দিত,—সেই লুঠের মাল উপকূলে থেকে জাহাজে দেশে দেশান্তরে ফিরি হত! শুধু তাই নয়, প্রতিটি শহরে তখন নবযুগের বিলাস 'জেনানা তোয়াইফা'—বা বাঈজীর ঘর। ভদ্রঘরের সুশ্রী শিশুর সেখানে বিরামহীন চাহিদা! মেদিনীপুর, শ্রীহট্ট, কলকাতা—নানা এলাকার শিশু তখন উত্তর ভারতের হাটে হাটে। শ্রীহট্টের এক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে উনিশ শতকেও (১৮১২) ছেলে-ধরার মামলা ওঠে বছরে গড়ে দেড়শ!

এই চোরা-পথ ছাড়াও সেদিনের ভারতে দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্য ছিল। স্বাধীন মানুষের কাছে দাসত্বের এ দুটি পথ—তখন সত্যি-সত্যিই সড়ক। ১৭৮৫ সনের ঢাকার দুর্ভিক্ষ

মিশরে আমরা বাঁদী হয়ে রূপসী রানাদের সাজাতাম।

গোলামের হাট তখন স্বাভাবিকতার হিন্দুস্থানে হরিহরছত্রের মেলার মতন! কি করে আর্য-ভারতের সেই বিন্দু-প্রতিম দাস-হাট ক্রমে সাগরে পরিণত হল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এখানে তা সবিস্তারে বলার অবকাশ নেই। শুধু সেই ক্লেদাক্ত পথের স্মারক হিসেবে কয়েকটি তথ্য স্মরণীয়।

প্রথম খবর, বৈদিক যুগ, পৌরাণিক যুগ, গুপ্ত সাম্রাজ্য, মৌর্য সাম্রাজ্য—সর্ব যুগে ভারতে ক্রীতদাস ছিল সত্য, কিন্তু আমরা সর্বপ্রথম যে যুগে বাণিজ্য-পণ্য হিসেবে বিশাল নরগোষ্ঠীরূপে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিলাম সে সুলতানী আমল। ইসলামে পণ্য হিসাবে দাম নিষিদ্ধ। ওরা একমাত্র তাদেরই দাস করতে পারে—যারা পবিত্র যুদ্ধে ধৃত। অবশ্য খোলা তলোয়ারের মুখে মাঠেই ধরতে হবে এমন কোন কথা নেই। সৈনিক অনাভাবেও দাস পেতে পারে। যাদের অর্জন করা হল তারা—'মামলুক'। জয়চাঁদের আত্মসমর্পণের ক্ষণে তার গলা থেকে একটি মালা ছিঁড়ে ধুলোয় খসে পড়েছিল। মোহম্মদ ঘুরী তা কুড়িয়ে নেননি। তিনি তার সঙ্গে পাঁচ-লাখ সৈন্যকে নিজের করেছিলেন। ওরা—'মামলুক'। তৈমুরের সৈন্যরা যাদের নিয়ে পাবেন আলাউদ্দিন পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তিগত দাস! ফিরোজ তুঘলকের দিল্লিতে ছিল এক লক্ষ আশী হাজার! ইতিহাস জানে, তাদের অনেকেই গোলামের হাটে কেনা। আলাউদ্দীনের সৈন্যদের মাইনে ছিল—দু'শ চৌত্রিশ টঙ্কা, কিন্তু তাঁর আমলে একজন রূপসী সহচরীর নগদ মূল্য, কুড়ি থেকে চল্লিশ টঙ্কা, একজন দাস-শ্রমিকের দাম—দশ থেকে পনের টঙ্কা এবং সুশিক্ষিত সুদর্শন একটি বালক ভৃত্যের দাম কুড়ি টঙ্কা! উল্লেখযোগ্য, সেদিনের দিল্লিতে চোদ্দ সের গমের দাম—তিন আনার মত, চালের দাম—দু' আনা!

মুসলিম শাসকদের আনুকূল্যে মৃতপ্রায় দাস-প্রথা দেখতে দেখতে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কাজীর সঙ্গে 'কাওলা' প্রথা এল। আমরা মায়ের কোল থেকে হাতে হাতে ফিরি হতে লাগলাম। কারণ, কখনও রাজধানীর রাজনৈতিক অস্থিরতা, কখনও জাতিভেদ প্রথা, কখনও ধর্ম, কখনও দুর্ভিক্ষ, কখনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় কখনও বা দস্যুতা! শেষোক্তটি বিশেষ করে পর্তুগীজদের কৃতিত্ব! অবশ্য, সবটুকু কাজই ওরা সব সময় নিজেদের হাতে করত এমন নয়। দক্ষিণে সশস্ত্র মোপলারা নায়ারদের কত হতভাগাকে যে কলকাতার হাটে ঠেলে দিয়েছে তার হিসেব নেই। ১৮৩৩ সনে দক্ষিণ বাংলার মানুষও কলকাতার হাটে হাটে নিজেদের ফিরি করেছে। বর্ধমানের মা কলকাতার পথে আসতে আসতে ফরাস-ডাঙ্গায় এসে তার 'দ্বাদশ বর্ষীয়া সুন্দরী কন্যাকে' দেড়শ টাকায় রাজা কিষানচাঁদের হাতে তুলে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে আবার নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে (১৮২৫)। আগ্রার জনৈক ভবানী তার যৌবনবতী স্ত্রীকে নিয়ে গোয়ালিয়রে চলেছে। সেখানে সে তাকে বিক্রি করবে। দরিদ্র প্রজা 'দাসখতে' টিপ দিচ্ছে, কারণ হিসেবে প্রকাশ তার কিঞ্চিৎ টঙ্কা ঋণ হয়েছে! সত্য বটে বাইরে থেকেও পণ্য হয়ে মানুষ তখন এদেশে আসত। ১৮২৩ সনে কলকাতার একটা কাগজে আফ্রিকা থেকে দেড়শ গোলামের আগমন-বার্তা ঘোষিত হয়েছিল। ১৮৩০ সনে আর একটা কাগজ জানিয়েছিল—অযোধ্যার নবাব তিনটি আবিসিনিয়ান মেয়ে, সাতটি মরদ এবং দুটি এতদ্দেশীয় রূপসী কিনলেন। তাঁর দাম পড়েছে মোট কুড়ি হাজার টাকা! কিন্তু তবুও বিচক্ষণ সাহেবদের হিসেব উনবিংশ শতকে কলকাতা বন্দরে অন্তত বছরে গড়ে একশ'র বেশী দাস নামে না!

এ দেশের দাসরা প্রধানত এদেশেরই 'সম্পদ'!

সেই সম্পদের পরিমাণ অনুমান করতে হলে—আরও একটি তথ্য শুনতে হবে। সেটি দাসদের সংখ্যা। অবিশ্বাস করার কোন হেতু নেই, এথেন্স, রোম, ভার্জিনিয়ার মতই দাসরা সেদিন এদেশে বিরাট সম্প্রদায়। ১৮৪২ সনে মালাবারে তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ। তারা প্রধানত ভূমিদাস কিংবা অন্ত্যজ। কিন্তু দুঃখ তাদের জীবনেও কম ছিল না। কেননা, নিগ্রহের জাল বহুদূরে বিস্তৃত ছিল। অন্ত্যজদের গাঁয়ের মুখে একজন টায়ার, পথের মাঝামাঝি জায়গায় বসে থাকত। লোকটি এমনভাবে বসত যে, রাস্তা পার হতে হলে হয় তাকে ছুঁতে হবে, না হয় তার ছায়া মাড়াতে হবে! বেচারা দাসরা সে বিভ্রাট থেকে মুক্তির জন্যে দূরে থেকে তাকে পয়সা ছুঁড়ে দিত,—গেট-মানি পেয়ে প্রভু একটু সরে বসত। এই ছিল তার পেশা! মালাবারে নগদে যারা বিক্রি হত, সেকালে তাদের দাম ছিল গড়ে পঞ্চাশ টাকার মত। মেয়ে হলে স্বভাবতই বেশী—একশো।

বাংলা প্রেসিডেন্সির খবর আরও ভয়াবহ। ১৮৬২ সনে বিহার-উড়িষ্যা, আসাম এবং অবশিষ্ট বাংলা মিলিয়ে প্রায় একচল্লিশ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার দাস। তার মধ্যে আসামে সাতাশ হাজার, শ্রীহট্টে তিন লক্ষ একষট্টি হাজার, চট্টগ্রামে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার, ভাগলপুরে চল্লিশ হাজার এবং অন্যত্রও প্রায় একই অনুপাতে! আসামের দুরাং জেলায় একজন বলবান দাসের দাম তখন কুড়ি থেকে আটাশ টাকা, ষোল থেকে পঁচিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ের দাম পঁচিশ টাকা। নওগাঁয় আরও সস্তা—পনের টাকা! উল্লেখ্য, আমার পাতের জায়গায় ততদিনে কাগজ এসেছে এবং কোম্পানির কাছারিতেই সে যুগে চার টাকা চার আনার বদলে দাস খত বিক্রি হচ্ছে। কেননা মোগলের মত ইংরেজও তাদের রাজত্বের সূচনার দিন থেকে এ ব্যবসায়ের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সেজেছে! সনাতন ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের উদ্যোগে আরও দু'একটি নতুন পন্থা যুক্ত হয়েছে। হেস্টিংস দণ্ডিত অপরাধীদের সমাজের দাসে পরিণত করেছিলেন,—কোম্পানি তাদের বাইরে চালান দিয়ে নগদ রোজগারের নতুন পণ্য বানিয়েছিল। সুতরাং সন্দেহ কি, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের কলকাতা কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে গোলাম খুঁজবে, গঙ্গার ঘাটে তপসে মাছ কিনতে গিয়ে টেরিটি বাজারের সাহেব জোড়া গোলাম হাতে নিয়ে কুঠিতে ফিরবে!

গোলাম আর গোলাম। অষ্টাদশ শতক ত বটেই, উনবিংশ শতকের প্রথম দিককার বছরগুলোতেও কলকাতা এক অবিশ্বাস্য গোলামের হাট। অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে (১৭৮৫) সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্স, বেদনামথিত কণ্ঠে বলেছিলেন, আমার ধারণা, আপনারা অনেকেই দেখেছেন কলকাতার হাটে বিক্রির জন্যে বিরাট বিরাট নৌকো বোঝাই করে কিভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নদীপথে এখানে আনা হয়ে থাকে। আপনারা বোধহয় জানেন, এইসব মানবশিশু অধিকাংশই তাদের বাপ-মার কোল থেকে চুরি করে আনা, কিংবা অন্নাভাবের দিনে কয় মুষ্টি চালের বিনিময়ে কেনা! শ্রোতারা নীরবে সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছিলেন। কেননা, তাছাড়া উপায় ছিল না। কারণ সেদিন কাগজে কাগজে নিত্য বিজ্ঞাপন চলেছেঃ

> চাই! চাই! আপাতত কলকাতায় আছেন এমন একজন ভদ্রব্যক্তির জন্য দুইটি তাম্র বর্ণের প্রকৃত সুন্দরী আফ্রিকান রমণী চাই। তাদের বয়স চৌদ্দর নীচে এবং কুড়ি কিংবা পঁচিশের ওপরে হলে চলবে না।......
> (১৭৮০)
>
> **কিংবা**
>
> আবশ্যক! দুইজন কাফ্রী বালক আবশ্যক। তারা ফ্রবাসী বাদ্যে পারংগম হওয়া প্রয়োজন। তদুপরি ঘরের কাজে দক্ষতাও বাঞ্ছনীয়। তবে তাদের মদ্যপানের অভ্যাস না থাকাই সংগত। যদি কারও সন্ধানে বিক্রির জন্যে এরকম বালক থেকে থাকে তবে তিনি এই বিজ্ঞাপনের প্রিন্টারকে জানাতে পারেন।......
>
> **অথবা**
>
> বিক্রয় হইবে। ফরাসী বাদ্যে দক্ষ, কেশ-চর্চা এবং ক্ষৌরকর্মে নিপুণ, দু'জন আফ্রিকান ক্রীতদাস বিক্রয় হইবে!......মূল্য মাথাপিছু চারশ' সিক্কা টাকা!

কে জানে সেদিন যাঁরা বিচারকের আসনে, তাদেরও কেউ কেউ বিজ্ঞাপনদাতাদের এই ভীড়ে ছিলেন কিনা! অসম্ভব নয়। কেননা, উইলিয়াম জোন্স তাঁদের সামনে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেছিলেন—সম্ভবত এই জনবহুল শহরে এমন কোন ঘর নেই যেখানে কমপক্ষে একটি ক্রীতদাস নেই!

উনিশ শতকের প্রথম দিকেও হিন্দুস্থানে কোম্পানির রাজধানী-শহরেও এক-ই সমাচার। বরং খবরের পরিধি বেড়েছে, ইংরেজী কাগজের বিজ্ঞাপনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলা কাগজে খবর ছাপা হচ্ছে—ভার্যা বিক্রয়।......আমরা অবগত হইলাম যে, জিলা বর্ধমানের মধ্যে এক ব্যক্তি কলু......সংপ্রতি বর্তমান বৎসরে তণ্ডুলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া গেল তাহাতে......এক যুবা ব্যক্তি আসিয়া ৫এক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল এ স্ত্রী দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক।......ইত্যাদি ইত্যাদি। (অক্টোবর, ১৮২৮) কিংবা—'আমরা শুনিলাম যে কলিকাতার একজন জমিদার বারাণসী হইতে স্বগৃহে আগমনকালীন ভাগলপুরের বাজারে ৪০ টাকা মূল্যে এক গোলাম ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। এবং তিনি কহিলেন যে তদ্দিবসে সেই বাজারে দাসদাসী প্রায় ২০।২৫ জন বিক্রয় হইয়াছিল। (জানুয়ারি, ১৮৪০)।

খাস কলকাতার বাজার আরও সরগরম। কাগজে শুধু গোলাম কেনাবেচার খবরই বের হয় না, পলাতক গোলামের সন্ধানকারীদের জন্যে পুরস্কার ঘোষিত হয়। সে বিজ্ঞাপনে গর্বিত মালিক নির্দ্বিধায় নিবেদন করেন—পায়ে ওর বেড়ি আছে। যদি তা সে কোনরকমে খুলেও ফেলে দিয়ে থাকে তাহলেও চিনতে অসুবিধে হবে না,—দাগটা নিশ্চয়ই থাকবে। ১৮২৩ সনেও এ শহরে আফ্রিকা থেকে দাস-জাহাজের আগমন সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, ১৮৩৯-এ নগরের বুকে থেকে মানুষ-চুরির বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার মাটিতে ততদিনে আফ্রিকার উপকূলের কৌশলে 'বারাকুন' পর্যন্ত উঁকি দিয়েছে। আডম বলে গেছেন, তিনি স্বচক্ষে আমড়াতলা স্ট্রীটে একটি গোলামখানা দেখেছেন। কাঠে তৈরী সেই গুদামের দরজাটা ছিল অনেকটা পশুর খাঁচার মত,—গরাদ দেওয়া। আমরা ভয়ার্ত মানুষের দল বিমূঢ় পশুর মত সেই গরাদের ফাঁক দিয়ে সামনের আলোয় উদ্ভাসিত পথের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতাম। রাস্তা দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে,—মুক্ত মানুষের স্রোত। আমরা বন্দী। আমাদের সামনে পথ নেই, পায়ের নীচে কাঁচামাটির পৃথিবীটা হঠাৎ যেন এখানেই শেষ হয়ে গেছে,—মাথার ওপরে আকাশ নেই, আকাশ আমড়াতলা থেকে অনেক দূরে—হয়ত এই সাদা-কালো ধনীগরীব মানুষগুলো যেদিকে হাঁটছে সেই দিকে।

হঠাৎ শিকেন্দর শাহের ঘোড়সওয়ারদের পায়ের শব্দ কানে ঠেকত। জোড়া-ঘোড়ার ছিমছাম গাড়িগুলো এসে থামত। কসাইতলার মিঃ পার্কিস আর চীনে বাজারের মিঃ ডানকানেরা এসে সামনে দাঁড়াতেন। ভাঙা হিন্দুস্থানীতে কি যেন ফিসফিস কথা বলতেন। তাঁদের সন্ধানী নীল চোখগুলো ঘুরতে ঘুরতে একসময় বিশেষ দুটি চোখে এসে নিবদ্ধ হত। তারপর ঘটনা অতি সামান্য। শ' দেড়েক সিক্কা টাকা আর শেকলের ঝনৎকারের মধ্যে অসহায় সঙ্গীদের

বোবা বিদায় সম্ভাষণ! তারপরেও অবশ্য মিঃ পার্কাসের একটি কৃত্য অসমাপ্ত রয়ে গেল; সে কোন আদালতে গিয়ে চার টাকা চার আনা ডিউটির বিনিময়ে একটি দলিল সংগ্রহ। কিন্তু তার আগেই তাঁর এই হীন বান্দার জীবনে সুরু হয়ে গেছে অজানা দৈর্ঘ্যের অজ্ঞাত ভাগ্যের নতুন জীবন।

তোমরা সেদিনের হিন্দুস্থানের আমড়াতলার গোলামখানার বাসিন্দারা সুখী পণ্য। অশ্বারোহীরা তোমাদের দুয়ারে এসে কৃতাঞ্জলিপুটে অর্ঘ্যের মত তোমাদের গ্রহণ করে, বিজ্ঞাপন দেখে যারা আসে সেই ভবিষ্যৎ প্রভুরাও প্রিণ্টারের বাড়ী গিয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ে। কিন্তু আমরা, জর্জিয়া, মিসিসিপি, মিসৌরি আর আলাবামার খোলা বাজারে যারা ঝাঁকে ঝাঁকে বিক্রয় হচ্ছি—তাদের চারপাশে জগতের চেহারা সম্পূর্ণ অন্য। আগে থেকেই হাতে হাতে মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিল বিলি হয়েছে। দূর দূরান্তের মানুষ এসে হাটে ভিড় করেছে। কেউ কিনতে এসেছে, কেউ বেচতে এসেছে। কেউ এসেছে শুধু মজা লুটতে। সেদিনের মার্কিন কাগজগুলোতে তাদের কথাও লেখা আছে। হ্যাণ্ডবিলে মেয়েদের কথা উল্লেখ থাকলেই ওরা এসে ঘিরে দাঁড়াত, আমোদ করত, অঙ্গভঙ্গী করত, সিটি দিত; তারপর দিন শেষে আবার শূন্যে হাতে যে যার পথ ধরত।

একদিকে এই দর্শক দল, অন্যদিকে দোকানী আর খদ্দের। সকাল থেকেই টাউনের স্লেভ মার্ট গমগম করছে। আমরা শেকল হাতে বসে আছি। যখন সময় হবে তখন ঐ উঁচু মঞ্চটায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সেই বিশেষ সময়টার জন্যেই সুদূর আফ্রিকা থেকে আমাদের বয়ে আনা হয়েছে। কদিন ধরে আমাদের বিশেষ ভাবে পরিচর্যা করা হয়েছে, গায়ে মাথায় তেল দেওয়া হয়েছে, দাঁত নখ পরিষ্কার করা হয়েছে, জাহাজে যে হাতের কাজই ছিল চাবুক চালান, সেই হাতই সযত্নে বসে বসে ক্ষত শোধন করেছে। হয়ত তোমাদের হরিহরছত্রের ঘোড়ার নকল লেজের মত দিনান্তেই কারও কারও এই সাময়িক সুস্থতার আবরণটি খসে পড়বে, ঠিকানায় পৌঁছবার আগেই প্রতারিত মনিব জেনে যাবে, সে মরা মানুষ কিনে ঘরে ফিরছে। কিন্তু তাহলেও হাট হাটই, —ঠকা জেতা সেখানে ত থাকবেই!

সুতরাং নীলামওয়ালা যখন হাতুড়ি পিটিয়ে চেঁচাচ্ছে—এইট হাণ্ড্রেড! —এইট হাণ্ড্রেড! নিউ ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞ গৃহস্থ তখন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে, মঞ্চে দণ্ডায়মান মানুষটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, —মানুষটা তার হাতের আঙ্গুলগুলো সব কটি ঠিকমত মুঠি করতে পারে কি? তাছাড়া এটাও জানা দরকার লোকটি কি পরিমাণ খায়,—তার কোন লেখা আছে কি?

সদ্য যারা এসেছে, দেখতে দেখতে তারা উবে গেল। এবার পুরোনোদের পালা। কেউ জীবনে দ্বিতীয়বারের মত আবার মঞ্চে উঠছে। কারণ তার দেহে বল কমে এসেছে। মালিক নতুন হাত চায়। কেউ হয়ত দাসের কর্তব্য ভুলে মুহূর্তের জন্যে অবাধ্য হয়েছিল। সেও এসেছে। মেজাজী প্রভু সে আপদ বিদায় করতে চান। কারণ তিনিও বিশ্বাস করেন, দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল! কাঠের কেবিনে আগুনের চেয়ে শূন্য কেবিনই নিরাপদ। তা হলই বা সে আগুনে স্ফুলিঙ্গ!

আমি জর্জিয়ার বাঁদীকন্যা এলিজা (১৮৪৭), দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরে আবার হাটে এসেছিলাম, অবশ্য অন্য কারণে। আমি, আমার বাবা, মা আমরা সবাই সুখ্যাত স্মিথ সাহেবের গোলাম ছিলাম। আমরা কেউ দুর্বিনীত ছিলাম না। স্মিথও আমা-

কার গলার স্বরে যেন সম্বিৎ ফিরে এলো

দের প্রতি অসদয় ছিল না। কিন্তু তবুও আমাদের দল বেঁধে আবার হাটে আসতে হয়েছিল, কারণ আমি এলিজা, বাঁদীর মেয়ে এলিজা কোন্ করুণাহীন ঈশ্বরের চক্রান্তে জানি না, সুন্দরী হয়ে জন্মেছিলাম। আমার মালিকের ঘর, বিলাসীর হারেম নয়,—স্মিথ আমাকে নিয়ে দুর্ভাবনায় পড়ল। সে ভাবনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কারণ আমি এখন আমার মায়ের চেয়েও মাথায় উঁচু মস্ত মেয়ে, তুলো ক্ষেতে সবচেয়ে জোয়ান তরুণটির স্বাস্থ্য আমার দেহে। দূরের যাত্রীরা আমাকে দেখতে পেলে মাঠের কাছে ঘোড়া থামিয়ে ইতিউতি করে, বাড়ীতে নতুন অভ্যাগতরা আমার দিকে আড়ে আড়ে তাকায়। তাছাড়া স্মিথের কেবিনের দাসদের মধ্যে আমাকে উপলক্ষ করে মারামারি লেগেই আছে। নিরীহ, গোবেচারা মানুষ স্মিথ, তাই একদিন বলে উঠল—যাঃ, তোকে বেচেই দিয়ে আসব। খবর শুনে আমার বাবা মা ওর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিল। স্মিথ আশ্বাস দিয়েছিল—ভয় নেই, তিনজনকে একসঙ্গেই পাঠাব।

প্রথমে মঞ্চে তোলা হল বাবাকে। তার অভিজ্ঞতার দীর্ঘ ফিরিস্তি শেষ হতে না হতেই, একটি লোক এগিয়ে এসে হাজার ডলার ঘোষণা করল। বাবা বিক্রি হয়ে গেল। এবার উঠল মা। মাঠ এবং ঘরকন্নার কাজে তারও অনেকদিনের অভিজ্ঞতা। সুতরাং সেও বিকিয়ে গেল। সেই লোকটিই কিনল। এবার আমার পালা। আমি কাঁদতে লাগলাম। মা বিক্রি হয়ে গেছে, বাবা বিক্রি হয়ে গেছে, কে জানে আমাকে কে কিনবে। নিলামওয়ালা হাতুড়ি পেটাতে লাগল। তাপর চেঁচিয়ে উঠল—নাইন হাণ্ড্রেড! —নাইন হাণ্ড্রেড! দুটি লোক সাড়া দিয়ে বলল—থাউজেণ্ড! তাদের পেছনে ফেলে আর একটি মানুষ সামনে এগিয়ে এল, তারপর আমার উলঙ্গ শরীরটার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—টুয়েলভ হাণ্ড্রেড! নীলামওয়ালা চেঁচাচ্ছে টুয়েলভ হানড্রেড! —টুয়েলভ হানড্রেড! কোথাও কোন সাড়া নেই। ভয়ার্তের মত আমি চারদিকে সেই মানুষটিকে খুঁজতে লাগলাম, যে আমার বাবা আর মাকে কিনেছে। আশ্চর্য, লোকটি নিঃশব্দে এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তবে কি সে আমাকে কিনতে চায় না? তবে কি তার ডলার ফুরিয়ে গেছে? —আমাকে আমার মা বাপ ছেড়ে এই অসভ্য মানুষটিরই পিছু পিছু অন্য পথে পা বাড়াতে হবে? ভয়ে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। আমি কাঁদতে লাগলাম। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার বাবা, মা ওরাও কাঁদছে। নীলামওয়ালা শেষবারের মত চেঁচাচ্ছে—টুয়েলভ হাণ্ড্রেড! টুয়েলভ হাণ্ড্রেড! আমার সামনে থেকে আঠার বছরের পরিচিত পৃথিবীর বন্ধনগুলো ধীরে ধীরে খসে পড়ছে, মা, বাবা, স্মিথ, কেবিন, তুলো ক্ষেত, বুড়ো পাদ্রী—সব উধাও হয়ে যাচ্ছে; আমি বাঁদীর মেয়ে এলিজা হাত বাড়িয়ে যা ধরতে চাইছি তা-ই ফসকে যাচ্ছে, আমি তলহীন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছি, আমি বোধহয় অজ্ঞান—ফিফ্‌টিন হাণ্ড্রেড ডলারস!

হঠাৎ কার গলার স্বরে যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। চোখ খুলে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই দেবদূত, আমাকে চাষীর ছদ্মবেশে সেদিন যে হাটে এসেছিল, আমার বাবাকে, আমার মাকে কিনেছিল। বারো শ' ডলারের মানুষখেকো খদ্দেরটি ওর দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেঁট করে একপাশে সরে দাঁড়াল। লোকটি অবিকল দেবতার মত মিষ্টি গলায় আমার নাম ধরে বলল—এলিজা, কাম ডাউন!

কেবলি হৃদয়হীন কেনাবেচা, প্রাণহীন হাতে হাতে মরা ডলারের হাতফিরি নয়, মার্কিন দেশের হাটে হাটে কখনও কখনও এমন অবিশ্বাস্য নাটকও অনুষ্ঠিত হত। স্বর্গ থেকে নেমে এসে স্বয়ং দেবতারা তখন মানুষের মত দরকষাকষি করত, যে মেয়েটি কাঁদছে তাকে বেছে নিয়ে উধাও হয়ে যেত, সকলের চোখের আড়ালে বসে তার চোখের

জল মুছিয়ে দিত। আমি এলিজা বাঁদী হয়েও তাই আমার সুখের কথা গোপন করতে পারিনি। বহুকাল পরে লিঙ্কনের লোকেরা যেদিন বুড়ী এলিজার কাছে তার দুঃখের কাহিনী শুনতে চেয়েছিল, আমি তখন উত্তর দিয়েছিলাম—আমি সুখী এলিজা। জীবনে আমার কোন দুঃখ নেই. একমাত্র দুঃখ—আই নার্সড বেবিস্, অ্যান্ড অল স্লেভ বেবিস্!

তুমি ক'টি সন্তানের জননী হয়েছিলে এলিজা। আমরা সেদিনের মার্কিন দেশের কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েরা তা জানিনা। কিন্তু তুমি জেনে রেখো, তোমার দুঃখ আমাদের অজানা নয়। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের প্রথম পদার্পণের পাঁচশ বছর পরে দুই কোটি কৃষ্ণাঙ্গের অনেকেই জানে না তাদের পিতামহী মাতামহী প্রপিতামহী বৃদ্ধমাতামহীরা কি অসহায় জননী, —তাদের অনেকেই জীবনে জানতে পারেনি মাতৃত্বের আনন্দ কি। জীবনে আমাদের অনেক দুঃখ ছিল.—টম চাচাদের কেবিনে সেদিন অনেক যন্ত্রণার আয়োজন। কাউ-হুইপ, বুল্-হুইপ, চিকেন-হুইপ—রকমারী চাবুক, শেকল, ওভারসীয়ার, 'ক্রুসিফিকশন'। ওরা আমাদের কখনও কখনও মাঠের ধারে গাছের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে কানে পেরেক ঠুকে আটকে রাখত, বলত—রোমনরা ক্রুশে বিদ্ধ করে মারত, তোদের ভাগ্য ভাল, তাই কানের ওপর দিয়ে গেল। হাতের চাবুকটা নাচিয়ে ওভারসীয়ার গর্ব করে বলত—আমি ওভারসীয়ার কেন জানিস? —বিকজ আই ক্যান সী অল ওভার অ্যান্ড হুইপ অল-ওভার। কাঁদতে কাঁদতে আমরা বুড়ো পাদ্রীর পায়ে লুটিয়ে পড়তাম, সে উপদেশ দিত—প্রভুকে অমান্য করা পাপ; এ জীবনে সৎভাবে কাজ করে যা আর জীবনে নির্ঘাৎ স্বর্গের হেঁসেলে কাজ পাবি! পাছে আমরা পালিয়ে যাই সেই ভয়ে মালিকেরা হাতে হাতে এক খণ্ড করে কাগজ গুঁজে দিত, বলত—এগুলো 'পাশ', কোথাও পাহারাদাররা আটকালে এটা দেখাবি, তৎক্ষণাৎ ছাড়া পাবি। ওরা তবুও আমাদের ধরে পেটাতে পেটাতে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসত, চাবুকটা হাতে নিয়ে মালিক হাসতে হাসতে বলত—কাগজটায় কি লেখা ছিল জানিস? লেখা ছিল—গিভ দিস নিগার হেল!

আমাদের নিয়ে সেদিন ওদের অনেক খেলা, অনেক মজা। ওরা আমাদের সিংহের মুখে ছুঁড়ে দিত না, তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত। কেননা, বৃদ্ধ অক্ষম ক্রীতদাস ডলার বানাতে পারে না,—সে লড়াইয়ের মাঠে সৈনিকের হাতে বিকল কামানের মত, সে শক্তি নয়, বোঝা মাত্র। ক্যারিবিয়ানের দ্বীপগুলোর মতই খাস আমেরিকাও তাই নির্দয় হাতে আমাদের মাঠে নামিয়ে দিত, অভাবিত শ্রম ঝাঁক ঝাঁক নেকড়ে হয়ে আমাদের কুরে কুরে খেত, বছর ঘুরে আসতে না আসতে আমরা বিশাল মানুষগুলো কয়েক খণ্ড হাড় হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তাম,—আমাদের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত অ্যারিজোনার মাটিতে ফুটফুটে তুলো হয়ে ফুটত! মাসা আবার ঘোড়ার পিঠে হাটে ছুটত। শুনতে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় বটে, কিন্তু কথাটা সত্য। ওদের নিজেদেরই হিসেব দেখ। ১৮৫০ সনে লুসিয়ানায় আমরা সংখ্যায় ছিলাম—দুই লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ন'শ পঁচাশী জন, ১৮৫৮ সনে মাথা গুনতি করে দেখা গেল, আমাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দুই লক্ষ চৌষট্টি হাজার ন'শ পঁচাশী জন। অর্থাৎ সাত বছরে আমরা বেড়েছি মাত্র কুড়ি হাজার। অথচ এ সময়ের মধ্যে চোরাপথেও বিস্তর দাস সেখানে এসেছে। কিন্তু তাহলেও স্বাভাবিক মানুষের সমস্ত নিয়ম ভঙ্গ করে আমরা আড়াই লক্ষ মানুষ বছরে তিন হাজারের বেশী বাড়তে পারিনি কেন?—আমাদের মধ্যে কি মড়ক লেগেছিল? আমাদের মধ্যে কি মরদের অভাব ছিল? না। সবই ছিল। কিন্তু তবুও আমরা প্রাণীজগতের ব্যতিক্রম হয়েছিলাম, কারণ, ওরা আমাদের মেরে ফেলতেই চেয়েছিল। ওরা পরিশ্রম নামে হিংস্র নেকড়েগুলোকে লেলিয়ে দিয়েছিল। আমোদের জন্যে নয়, আরও সস্তা তুলো, আরও সস্তা তামাকের জন্যে, ওদের কাছে তাই ছিল যুক্তিসম্মত।

সে যুক্তি যেদিন অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে, এলিজা তুমি সেকালেরই কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী। তোমার দেবতার মত প্রভু হয়ত সত্যিই তোমার সুখ হরণ করতে চায়নি। কিন্তু বিশ্বাস কর এলিজা, দাস-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ রাখার বাসনায় ওরা যেদিন 'বেবি-নার্সিংয়ে'র চিন্তা মাথায় নিয়ে আমাদের কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ায় সেদিন থেকে মানুষের সুখে শেষ বিন্দুটিও আমাদের জীবন থেকে উধাও হয়ে গেছে। যৌবন, ভালবাসা,—মা হওয়া, পিঠে নিজের সন্তানের বোঝা নিয়ে মাঠে কাজ করা—তাও যখন গেল, তখন রইল কি? আগে আগে তবুও আমাদের বিয়ে হত। মাসা নিজে সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। আমরা দু'জনে লাফিয়ে একটা ঝাঁটা পার হতাম, মাসা বলত—যা, তোদের বিয়ে হয়ে গেল। সব সময় যে পছন্দের মানুষকে কাছে পেতাম তা নয়,—তবুও একটি মানুষকে-ই পেতাম,—সন্তানেরা জানত কে ওদের বাবা। কিন্তু দাস শিশু যেদিন পণ্য হয়েছে, সেদিন আমরা মানুষের কাহিনীতে সবচেয়ে অসহায় জননী। অন্ধকার কেবিনে কারা চোরের মত আসে, দস্যুর মত সব তছনছ করে চলে যায়, আমরা জানি না। শুধু এটুকুই তামাক ক্ষেত, তুলো ক্ষেত, আখ [illegible] মতই—আমরা রত্নগর্ভা, আমাদের মজবুত দেহে অনেক অনেক [illegible] সম্ভাবনা। আফ্রিকার উপকূল শূন্য গেছে, এক একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসশিশু রাশি রাশি ডলার, হলুদ সোনা। মা[illegible] তাই এখন আর তাদের গোলাম আর বাঁ[illegible] যৌবন নিয়ে ভাবিত নয়। তাদের এখ[illegible] চিন্তা আরও শিশু,—আরও।

সে কি অসহ্য যন্ত্রণা, এলিজা, তুমি ভাবতে পারবে না। আমরা বছরের পর ব[illegible] অজ্ঞাত জনকের সন্তান বহন করে চলে[illegible] শিশু ভূমিষ্ঠ হল। সে মাটিতে পা দি[illegible] না দিতে কোলে এল আর একটি। মা[illegible] বলল,—এবার সেটিকেই দেখাশোনা ক[illegible] এটিকে আমি নিয়ে যাচ্ছি! পরেরটিও তা[illegible] হল, তার পরেরটিও। আমি মিসিসিপি মেয়ে ইস্থার—চৌদ্দ বছর বয়স অবধি আ[illegible] জানতাম—ছোটদের বনে পাওয়া যায়, [illegible] কাম আউট অব হোলার লগ! কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি তাই বনের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াতাম, মা হওয়া আমার অনেকদিনের সখ আর সেই আমিই, আমি মিসিসিপির মেয়ে ইস্থার—আজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে কেবিনের মেঝেয় শুয়ে শুয়ে হিসেব করছি, আমি জন্ম দিয়েছি চৌদ্দটি শিশুকে! কিন্তু কোথায় [illegible]?—কোথায় আমার সন্তানেরা?

তোমরা, এ যুগের আমেরিকান ক্রীতদাসীরা তবুও পেয়েছ, পেয়ে হারিয়েছ। আমরা মধ্যপ্রাচ্যের বাঁদীরা, যাদের নিয়ে সে যুগের ব্যাবিলন, কনস্টান্টিনোপল, কায়রো আর বোগদাদে আরব্য উপন্যাসের আলো ঝলমল নিশি উৎযাপন; আমরা, যাদের গৌরবে ইস্তাম্বুল আর দিল্লির হারেম সকল হুরীদের প্রবাদ পুরীতে পরিণত—তারা আরও দুঃখী। সত্য বটে, পরিচয়ে প্রত্যেকে আমরা বাঁদী নই, কেউ কেউ বেগমও। আমরা অনেক ঐশ্বর্য দেখেছি,—অনেক মসলিন, অনেক কিংখাব, অনেক জড়োয়া অঙ্গে ধারণ করেছি।—কিন্তু সন্তান কদাচিৎ। আমরা অনেক গোলাপ হাতে পেয়েছি, অনেক আতর গায়ে মেখেছি, রাশি রাশি সুগন্ধী তাম্বুলীতে ঠোঁট রাঙিয়েছি।—কিন্তু ভালবাসা? সে বস্তু দৈবাৎ, ক্কচিৎ কখনো।

তোমরা প্রাসাদের পর প্রাসাদ বোঝাই সেই হাহাকারের কাহিনী জান না। কেউ জানে না। বার্নিয়ার নিজে বলেছেন, তার চোখ বাঁধা ছিল। অন্যরা আরও অক্ষম দর্শক। পরীদের কথা শুনে শুনে তারা চিরকাল এক চক্ষু, কিংবা জন্মান্ধ। নয়ত শুধু সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বোনকে ভালবাসার

অপরাধে জনৈক খোজার প্রাণদানের কাহিনী নয়, কেবলই শাহজাদীর প্রণয়ের মূল্য হিসেবে জনৈক তরুণের ফুটন্ত জলে নিঃশব্দে আত্মবলিদানের গল্প নয়,—আরও কিছু কিছু কাহিনী দুনিয়ার কানে আসত। সে কান্নায় কান পাতার আগে হারেম নামে কথিত এই অদ্ভুত দর্শন প্রাসাদটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।

চারপাশে উঁচু দেওয়াল। মাঝখানে বিরাট প্রাসাদ। স্থাপত্যে সেদিনের মুসলিম দুনিয়ার প্রতিভা আজও বিশ্বের বিস্ময়। কিন্তু এই প্রাসাদটির দিকে ভাল করে তাকালে জানা যাবে—নৈপুণ্য এই উঠোনটিতে পা দিয়েই কেমন জানি সন্দেহাতুর, আপন ঐতিহ্য থেকে পলাতক। সামনে কারুকার্যের অন্ত নেই, কিন্তু এক-দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ অন্ধ। সেখানে কোন জানালা নেই। দেওয়ালের মাথায় মরা মানুষের চোখের মত জাফরী কাটা কটা ঘুলঘুলি। সে সূক্ষ্ম পাথরের জাল ভেদ করে ঘরে উঁকি দেবে বেচারা সূর্যের সে সাধ্য নেই। হাওয়া অশরীরী বলেই তবুও মাঝে মাঝে আসে,—দীর্ঘশ্বাস টানা যায়। সামনে কোণের ক'টি ঘর বাদ দিলে অন্য ঘরগুলোতেও কোন জানালা দরজা নেই। যাতায়াতের পথগুলোতে অস্বাভাবিক উদারতা। সেখানে ভারী পর্দা ঝুলছে। পর্দার আড়ালে বেগম নামে খ্যাত আমরা ক্রীতদাসীদের জগৎ।

তুরস্কের সুলতান তাঁর এই প্রাসাদটিকে 'হারেম' বলেন, কারণ তিনি ছাড়া রাজ্যের আর সকলের কাছে এ বাড়িটি নিষিদ্ধ। 'হারাম' মানে নিষেধ, হারেম—নিষিদ্ধ এলাকা। পারস্যে ওরা বলত—অন্দরম। অর্থাৎ—অন্দর মহল। মোগলেরা কেউ কেউ বলত—জেনানা। পারসিকে 'জান' মানে মহিলা। সেই থেকে এল 'জানানখানা', অর্থাৎ মেয়েদের বাসস্থান। জেনানা তারই অপভ্রংশ। তবে যে নামেই পরিচয় দেওয়া হোক তার, তাকিয়ে দেখ আমাদের এ জগৎ 'দেওয়ানখানা' বা দেওয়ালের বাইরেই সুলতানের যে দ্বিতীয় প্রাসাদটি তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

তুর্কী সুলতানের এই হারেমটি কনস্টান্টিনোপলের আদর্শে সাজান। আমরা পৃথিবীর নানা দেশের নানা জাতির কয়েক হাজার মানুষ এখানে থাকি। দু' একটি মেয়েকে বাদ দিলে, সবাই আমরা গোলাম অথবা বাঁদী। কিন্তু তবুও পরিচয় আমাদের এক নয়। এই প্রাসাদের অধীশ্বরী যিনি, তিনি সুলতান জননী—'সুলতানা ভালিদ'। হিন্দুস্থানে নাম ছিল তার—পাদশাহী বেগম। তাঁর পরেই স্তরে স্তরে ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গেছে বেগমদের পরিচয়। সুলতানের জ্যেষ্ঠ তনয়ের জননী যিনি সেই সম্মানিত প্রবীণাকে বলি আমরা 'বাসখাদিন এফেন্দি'.—হার এক্সেলেন্সি দি লেডি চীফ। সম্ভবত হিন্দুস্থানে তাকেই বলা হত—খাস-মহল। তার পরে পর পর তিন জন 'হানুম এফেন্দি'। তারাও হয়ত আমাদেরই মত বাঁদী ছিল,—এখন গর্বিত বেগম। কারণ, তারাও সুলতানের সন্তান গর্ভে ধারণ করতে সক্ষম। এই চারজনকে বাদ দিলে বাকী বেগমেরা সব—সহচরী মাত্র। তাদের একমাত্র গৌরব, সুলতানকে একদিন তারা কয়েকটি আনন্দিত মুহূর্তের জন্যে হলেও কাছে পেয়েছিল, আবার কোনদিন হয়ত পাবে। সর্বশেষ হৃদয়ের মণিটিকে একপাশে ঠেলে দিয়ে খেয়ালী বাদশা এ মহল্লায় ফিরে আসবে। ওরা তারই অপেক্ষায়। ওদের বলা হত—'ওদালিক', শয্যা-সহচরীর দল। হারেমে বিবাহিত বেগমদের কাছে কোন মর্যাদা না পেলেও তাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল অসামান্য। কেননা, ওরা কেউ রক্ত পরিচয়ে এখানে আসেনি। তাদের সকলেরই চোখ ঝলসান রূপ, হাতে, পায়ে, গলায় ঠোঁটে তুলনাহীন গুণ। কেউ ইতিপূর্বে নর্তকী ছিল, কেউ গায়িকা,কেউ কৌতুকী,কেউ বা সুরসিকা। বিশ্বের হাট মন্থন করে তবে সুলতানের প্রাসাদে সে দুর্লভের সমাবেশ। স্বভাবতই তাদের মনোহরণে আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। প্রত্যেকের স্বতন্ত্র এলাকা নির্দিষ্ট ছিল, প্রত্যেকের মাসোহারা ছিল, বাঁদী ছিল, গোলাম ছিল।—কিন্তু সুখ ছিল কি? সে উত্তর পরে।

যারা বিশুদ্ধ বাঁদী তাদের প্রধানকে বলা হত—'কিয়ায়া খাতুন।' হারেমের মেয়ে মহলে সে সুপারিণ্টেডেণ্ট। তারপরে পদাধিকারে দ্বিতীয় যে সে কোষাধ্যক্ষা—'হাসনাদার ওয়াস্তা'। তারপর তৃতীয় দল—'কাল্ফা'। তাদের পরের স্তরে যারা তারা সাধারণ বাঁদী। তারা কেউ বেগম-তনয়কে দুধ খাওয়ায়, কেউ পোশাক তৈরী করে, কেউ দেহরক্ষীর কাজ করে, কেউ সরবৎওয়ালী, কেউ বা সারারাত্রি বসে বসে নিদ্রাহীন বেগমকে ঘুম পাড়ায়। তার কাজ—কিস্সা বলা। সকলের সঙ্গেই একদল শিক্ষানবীশ আছে, তারা 'অলাইক'। তাদের সকলকে নিয়েই সুলতানের বেগম মহল,—বাইরের পৃথিবীর কাছে স্বপ্নের স্বর্গ-হারেম।

এক দেওয়াল বন্ধনীতে হাজার রূপসীর মেলা, বাইরে অজ্ঞাত পৃথিবীতে জীবনের রঙিন শোভাযাত্রা, ভেতরে রাজ্যভারে ক্লিষ্ট বহু আমোদে ক্লান্ত একটি মাত্র পুরুষের এলোমেলো অস্থির পদশব্দ, সামনে জাগ্রত লোভের হাতছানি,—সিংহাসন,—হারেম কি স্বর্গ? খলিফা আল-মুতাওয়াক্কিলের হারেমে রূপসী ছিল চার হাজার। মহম্মদ তুঘলকের সৌখিন পৌত্র মকবুলের ছিল—দু' হাজার। এমন যে মহানুভব বাদশাহ আকবর, আবুল ফজল বলে গেছেন, তারও হারেমে মানুষ ছিল পাঁচ হাজার। পশ্চিমী মেয়ে জুলিয়ানা সেখানে চিকিৎসক ছিলেন। রুশ দেশের ক্রীতদাসীরা সম্রাট জননীর সেবা করত। জাহাঙ্গীর আরও বিলাসী

সম্রাট। হারেমে তার দৈনিক খরচ তিরিশ হাজার টাকা! কিন্তু স্বর্গ কি কেবলি ঘড়া-ঘড়া মোহরে সম্ভব?

বোধহয় নয়। জনৈকা মীর হুসেন আলি সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন—হিন্দুস্থানের হারেম স্বর্গ। এখানে কখনও কখনও শেকল চোখে পড়ে বটে, কিন্তু সে রুপোর শেকল। হুসেন আলি ইংরেজ দুহিতা। ঊনবিংশ শতকে লক্ষ্ণৌর এক অভিজাত মুসলিমকে ভালবেসে তিনি এদেশে এসেছিলেন। বারো বৎসর তার হারেমে কেটেছে, অবশ্য বাদশাহী বা নবাবী হারেমে নয়,—আপন হাতে সৃষ্ট আপন অন্তঃপুরে। তিনি লিখেছেন—লক্ষ্ণৌতে থাকাকালে বাঁদীদের শাস্তি দেওয়ার একটি মাত্রই কাহিনী তিনি শুনেছেন। এক বেগমের রূপসী বাঁদী বেগমতনয়কে আপন রূপে বাঁদায় পরিণত করে ফেলে। বেগম তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না। তিনি করুণা পরবশ হয়ে বাঁদীকে ক্ষমা করলেন। কিন্তু সে গর্বিতা তরুণী আপন পরিচয় বিস্মৃত হল। তার আচরণে বেগম ক্রমাগত ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন তার পবিত্র ক্রোধ উদ্দীপিত হল। বাড়ীর অন্য বাঁদীদের ডাকিয়ে এনে, তিনি সকলের সামনে পুত্রের প্রণয়ীকে পালঙ্কে শয়ন করতে নির্দেশ দিলেন। তারপর একটা রুপোর শেকল এনে তার পা দুখানি তার সঙ্গে বেঁধে রাখলেন। প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে মেয়েটিকে সেভাবে শৃঙ্খলিত করে রাখা হত। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, শুধু তাকে তার আদি পরিচয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া!

মীরহুসেন আলির কানে শোনা এই কাহিনী হয়ত মিথ্যে নয়, কিন্তু আমরাও লক্ষ্ণৌর মেয়ে,—আমাদের কাহিনীগুলো শোন, এগুলোও সত্য।

আমি অযোধ্যার নবাব আমজাদ আলি শাহের বেগম মালিকা কিসওয়ার বাহাদুর ফকরল-উল-জামিনি নবাব তাজ আরা বেগম বা সুখ্যাত জনাব আউলিয়া বেগমের বাঁদী ছিলাম। বেগম আমার ঘুমন্ত মুখ আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ, আমার মুখে রূপ ছিল। এবং কে বা কারা ওকে কানে কানে বলেছিল—নবাব আমাকে ভালবাসে।

আমিও জনাব আউলিয়া বেগমের বাঁদী ছিলাম। বেগম আমাকে অন্ধকার কারা-কক্ষে নির্বাসন দিয়েছিল। কারণ, তাঁর ঘরে বিছানার নীচে একটি সাপ পাওয়া গিয়েছিল। বেগমের সন্দেহ, তার পেছনে তাঁর আপন পুত্রবধূ ওয়াজিদ আলি সাহেবের প্রধানা বেগম খাস মহলের ষড়যন্ত্র রয়েছে। এবং আমি সেই পরিকল্পনায় অন্যতম সাহায্যকারী।

আমরা এই প্রাসাদেই বাঁদী ছিলাম। এক বেগমের আমলেই আমরা তিন তিনজন বাঁদী জ্যান্ত কবরস্থ হয়েছি। নাইটন-এর কাছে ইংরেজের জবানবন্দী পড়, শুনবে বেগম এখনও আমাদের পায়ের শব্দে ঘুমোতে পারে না। দেওয়ালের বন্ধন ভেঙে আমরা নাকি এখনও মাঝে মাঝে হারেমে নেমে আসি। ওরা আমাদের কবর দিয়েছিল কেন জান?—আমরা বাঁদীরা বাঁদী হয়েও তিনটি পুরুষকে ভালবেসেছিলাম।

আমি এক গরীব রাজপুতের কন্যা। এই বেগমেরই দ্বিতীয় পুত্র বিখ্যাত জেনারেল সাহেব নগদ মূল্যে আমাকে সংগ্রহ করেছিল। সে ভালবেসে আমাকে হারেমে ঠাঁই দিয়েছিল। আমি তার সন্তানের জননী হয়েছিলাম। কিন্তু তবু ও সেই আনন্দক্ষণের পরে [illegible] বোঝা বইতে চাইনি। কেন জান? [illegible] আমার মা এসেছিল। আমি জেনারেলের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—তাকে আমি আমার কাছে রাখতে চাই। মাকে দুঃখে রেখে আমার কোন সুখ নেই। জেনারেল মত দেয়নি। কাঁদতে কাঁদতে দশ দিনের মধ্যে আমি চিরবিদায় নিয়েছিলাম।

আমরা ওয়াজিদ আলি সাহেবের বেগম। নবাব তার মায়ের এক প্রিয় বাঁদীকে ভালবেসেছিল। নবাব-মাতা পুত্রের লালসা থেকে বাঁদীকে রক্ষা করতে চাইলেন। তিনি বললেন—ও মেয়ে অলক্ষুণে, ওর মাথায় সাপের চক্র আঁকা। নবাব অনুসন্ধান করলেন। সত্যিই তাই। মেয়েটির তালুতে চুলগুলো যেন সাপের কুণ্ডলীতেই সাজানো আছে। সঙ্গে সঙ্গে হারেমে হুকুম পড়ল। গোটা বেগমমহল খালি করে আমরা বেগমেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেলাম। নবাব একে একে সকলের মাথা পরীক্ষা করল। মোল্লা এল, পণ্ডিত এল, একজনের মাথায় এই 'সাম্পনে' বা সর্পচক্র পাওয়া গেল। পণ্ডিতেরা বিধান দিল—তপ্ত লোহায় সকলের মস্তক শোধন আবশ্যক। যদি কেউ তাতে অসম্মত হয় তবে তাকে পরিত্যাগ করাই সংগত। আমরা ছজন এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলাম। আমরা তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু বাকী দুজন? বেগম হয়েও তপ্ত লোহায় যাদের শোধন করা হয় তারা কি সত্যিই বেগম?

আমি এই লক্ষ্ণৌরই বিখ্যাত নবাব নাসিরউদ্দীনের বেগম আফজলমহল। ১৮২৫ সনে মুন্নাজান নামে আমি একটি পুত্রসন্তানের জননী হয়েছিলাম। আইনত তার নবাব হওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্য, নবাব তাঁর বার্ধক্যের প্রণয়িনী জনৈকা দুলারীর প্রেমে অন্ধ হয়ে ঘোষণা করল, মুন্নাজান তার পুত্র নয়, আমি নাকি ব্যভিচারিণী! শুনে রেসিডেন্সির সাহেবেরা সেদিন হেসেছিলেন। লজ্জায়, অপমানে, ঘৃণায় আমি জীবনে আর কোনদিন হাসতে পারিনি।

আমি দুলারী। সত্য বটে, আমি এই মুন্নাজানের আবির্ভাব উপলক্ষে প্রাসাদে ছাড়পত্র পেয়েছিলাম। আপন বুকের দুধে নবাবজাদাকে লালন করার কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। সেই দাসীকেই নবাব তার বার্ধক্যের পাটরানী করেছিল। আমাকে সে নাম দিয়েছিল—মালিকা জামানি। সত্য বটে, কৈয়ান ঝা নামে আমার যে পুত্রটিকে নবাব তার উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেছিল সে তার পুত্র নয়। প্রাসাদে পা দেওয়ার আগেই আমি কৈয়ানের মা। সুতরাং, বেগম আফজলমহল তোমার দুঃখের দিনগুলোতে আমি অবশ্যই মনে মনে হেসেছিলাম। কিন্তু তার আগে, বছরের পর বছর গোপনে আমি কেঁদেছিও। সত্য বটে, আমি নিষ্কলুষ ফুল ছিলাম না। তাই বলে আমি চকের মেয়েদেরও কেউ নই। তোমরা জান না, রুস্তম নামে এই শহরেরই একটি মানুষ আমাকে ভালবাসত। কৈয়ান তারই সন্তান। কিন্তু তার বাবা রুস্তম কোথায়? আফজলমহল, তুমি না জানলেও আমি জানি, নাসিরুদ্দীন তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। তিল তিল করে সে তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। নাসিরুদ্দীন আমার ভালবাসাকে সওদা করেছে। সে ভয় পেয়েছে, রুস্তম কোনদিন হয়ত আবার তার দুলারীকে ফেরত চাইবে, হয়ত দুনিয়াকে সে বলে দেবে, কৈয়ান তার পুত্র! আফজলমহল, জীবনে যার এত কান্না, সে একদিন একটু হাসবে নাকি! হোক না সে মিথ্যে হাসি।

ছোট রাজ্য। মধ্যযুগের মাপে অত্যন্ত হাস্যাস্পদ ছোট একটি হারেমের কাহিনী। তাও সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়, কয়েকটি ঘটনা মাত্র। তারপরও কি বলা চলে হারেম স্বর্গ! বিশ্বের সবচেয়ে সুখী হারেমবাসিনী যে সম্ভবত সে-ও উত্তর দেওয়ার আগে ইতস্তত করবে। সত্য বটে, সেখানে অন্নাভাব ছিল না, সত্য বটে সেখানে নিরাপদ আশ্রয় ছিল, অঢেল আনন্দের আয়োজন ছিল,—কিন্তু মানুষ যাকে সুখ বলে জানে সে বস্তু কোন কক্ষেই ছিল না। প্রধান বেগম সেখানে আপন ভক্তের চিন্তায় নিদ্রাহীন, অন্যরা নিদ্রাহীন প্রধানের সৌভাগ্য চিন্তা করে ঈর্ষায়। কেউ বিষের আয়োজন করছে, কেউ সংগোপনে আপন বাঁদীর কাছ থেকে কানে কানে বশীকরণের মন্ত্র শিখছে। সে মন্ত্র জানে যখন—তরুণী বাঁদীই বা তখন পিছনে পড়ে থাকবে কেন? সে-ও বেগম হতে চাইছে। চারদিকে কানাকানি, ফিসফাস, ষড়যন্ত্র, দীর্ঘশ্বাস:—তারই মধ্যে ছায়ার মত দৈবাৎ কখনও ক্লান্ত সুলতানকে দেখা যায়, তাঁর চারপাশ ঘিরে

বিকৃত পৌরুষের উড্ডীয়মান নিশান,—সতর্ক খোজার দল।—এ প্রাসাদে প্রাণ কোথায়? ঘরে ঘরে পর্দার আড়ালে সেজে-গুজে সারি সারি বসে আছি আমরা পুতুলের দল। এইমাত্র যিনি এলেন তিনিও পুতুল। তার চারপাশে যারা তারাও। এই আলো ঝলমল প্রাসাদ আসলে একটা বিরাট প্রহসন, পুতুল নাচের আসরমাত্র। এখানে হাহাকার ছাড়া আর কিছুই সত্য নয়।—ঈশ্বর, তুমি চোদ্দটি সন্তানের দুঃখিনী জননী। আমরা দিল্লি-আগ্রা-লক্ষ্ণৌ-লাহোর, কায়রো-বোগদাদের হুরীরা সেই দুর্ভাগ্য থেকেও বঞ্চিত। পাঁচ হাজার নারীর মধ্যে সন্তানের অধিকার ছিল মাত্র চারজনের। তাও উচ্চৈঃস্বরে চাওয়ার অধিকার। পেলেও ওরা কোলে রাখতে পারত একমাত্র তাদেরই, যারা সিংহাসনের ভবিষ্যতের পক্ষে কোনদিক থেকেই বিপদজনক নয়। অপ্রয়োজনীয় সন্তান খোজার কোলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করত। কিংবা পরিচয়হীন মানবসন্তান হয়ে রাজধানীতে নগণ্যের ভীড় জমাত। তাদের জননীরা নিঃশব্দে কাঁদত। আমরা অধিকাংশ ক্রীতদাসী সে কান্নার স্বাদটুকুও জানি না। কারণ—আমরা চিরযৌবনা। কোন দেবতার বরে নয়, আমাদের এই অনন্ত যৌবন সেই একই লালসার চক্রান্তে সযত্নে সাজান। ওরা আপন কামনাকে তৃপ্ত করেই ক্ষান্ত হতেন না,—ওদের দুশ্চিন্তা লাঘবের পক্ষে এই সহস্র খোজার বেষ্টনীই যথেষ্ট ছিল না, ওরা তারপরও নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন,—সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে আমাদের পুতুলে পরিণত করেছিলেন।—ঈশ্বর, আমরা অবিশ্বাস্য অস্তিত্ব নই। মধ্যপ্রাচ্যের হারেমে হারেমে আমরা এই সর্ব কামনাশূন্য রূপসী নারীর দল এখনও আছি। ক'বছর আগে রাষ্ট্রসংঘের অনুসন্ধানীরা আমাদের আবিষ্কার করে শিউরে উঠেছিলেন। ওঁরা মন্তব্য করে-ছিলেন—বিশ্বে সবচেয়ে অসুখী মানুষ যারা তারা গোপন, হারেমের এই চেতনাশূন্য নারীরা নয়, তাদের প্রভু তথা স্বামীরাও!—ঈশ্বর, যে বাদশাদের বিরুদ্ধে আমাদের এই হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার অভিযোগ তারাও তাই ছিল, বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী নারীর প্রভু যারা, তারা কখনও সুখী হতে পারে না।—কখনো না।

হারেমের এই অন্তহীন হাহাকারের আর এক প্রমাণ আমরা খোজারা। প্রবাদ বলে—আমরা বর্বরতার বিকটতম স্মারক হয়ে যেখানে আবির্ভূত হয়েছিলাম সে এই হারেম। ব্যাবিলনের লোভী রানী সেমিরামিস তাঁর বাদীদের কলঙ্কশূন্য রাখতে গিয়ে আমাদের উদ্ভাবন করেছিলেন। তারপর দেখতে দেখতে আমরা সমগ্র প্রাচ্য জুড়ে হারেমের এক অপরিহার্য অলঙ্কার। আমরা হারেমের দৌবারিক, আমরা হারেমের রক্ষক, আমরা বেগমের স্নান সহচর, আমরাই হারেমের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী, বিচারক। আমাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ যারা, তুরস্কে নাম ছিল তাদের কাপু আগাসি। দ্বাররক্ষার চূড়ান্ত দায়িত্ব তার। এমন কি তার অনুমতি না নিয়ে প্রধান উজীরেরও সাধ্য নেই হারেমে পা দেবার। কৃষ্ণাঙ্গ খোজাদের নাম ছিল—কিসলার আগাসি। অর্থাৎ—কুমারী দলের রক্ষক। যে খোজা প্রমোদ কেন্দ্রে সুলতানের সহচর হত তার নাম ছিল 'দারুস সিয়াদেত'। এছাড়াও অনেক কাজ ছিল আমাদের। পঞ্চাশজন আমরা পাদশাহী বেগমের ক্রীতদাস ছিলাম,—খাসমহলের চারপাশ ঘিরে থাকতে হত আরও পঞ্চাশজনকে। তার

রোমে অশিষ্ট দাসদের জন্যে সাজা ছিল কঠোর।

ওপর মসজিদ থেকে নজরানা আদায়, বাদশার হয়ে জল্লাদের কাজ, বাদশাহী দুনিয়ায় আমাদের অনেক কর্তব্য। অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞতায় ওরা জেনেছিল মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত খোজা অনেক বিষয়ে সাধারণ স্বাভাবিক মানুষ অপেক্ষা সমর্থ। খোজার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার হৃদয়হীনতা। শূন্য মানুষ আমরা বিশ্বের সবচেয়ে ক্রুর ষড়যন্ত্র-কারী, সবচেয়ে নিষ্ঠুর সেনাপতি, নির্মম ঘাতক। আবার হারেমে আমরাই সবচেয়ে নিপুণ গায়ক। কারণ,—একমাত্র খোজার গলাই চিরকাল সমান তেজী, খাদহীন, তীব্র!

বলা নিষ্প্রয়োজন, এই তথাকথিত প্রশংসায় খোজার জীবনের রিক্ততাকে আড়াল করা সম্ভব নয়। হারেমে যদি কান্না আর হাহাকারই ইতিহাস হয়, তবে আমরা খোজার দল সেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট, সবচেয়ে তীব্র আর্তনাদ। ১৮৩৬ সনে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল, সেখানে খোজা আছে তেত্রিশজন। ১৮২৭-৩৭ সনে নাসীরউদ্দীনের কালে লক্ষ্ণৌতে ছিল একশ পঞ্চাশজন। সংখ্যাটা আপাতদৃষ্টিতে নগণ্য, কিন্তু তার ভয়াবহতা বোঝা যায় একটি খবর শুনলে। ১৯৫৬ সনে কার্ডিন্যাল লাভিগেরাই মরক্কো থেকে য়ুনোর দপ্তরে জানিয়েছিলেন—সম্প্রতি এখানকার হাসপাতালগুলোতে তিরিশটি শিশুকে মরক্কোর সুলতানের প্রাসাদের জন্যে খোজা করার চেষ্টা হয়েছিল, তারা কেউ বাঁচেনি। ইরাকের একজন চিকিৎসক জানিয়ে-ছিলেন, সৌদি আরবের সরকারী হাসপাতালে যে কুড়িটি শিশুকে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে বেঁচেছে মাত্র দু'জন। এসব এই বিংশ শতকের পৃথিবীর দ্বিতীয়ার্ধের খবর। আমরা যখন প্রথম এই দুনিয়ায় মুখ দেখাই, সৌদি আরবে তখন হাসপাতাল ছিল না, আবিসিনিয়ার পুরোহিত আর যাদুকর ছাড়া চিকিৎসক ছিল না। সুতরাং মুর্শিদাবাদের প্রাসাদে তেত্রিশ খোজা কয় শ' মানবশিশুর প্রাণের মূল্যে অর্জিত সে কাহিনী জানে একমাত্র সেই মানুষগুলোই, মানুষ যাদের কাছে নিছক ক্রীড়াবস্তু, বিলাসপণ্য!

হারেমের লজ্জা তবুও চারটে উঁচু দেওয়ালের আড়ালে গোপন ছিল। আমাদের, গ্রীক আর রোমান দাসদের জীবনের ভয়াবহ শূন্যতা প্রকাশ্য। কপালে তপ্ত লোহার বান্দাছাপ, পায়ে শেকল, সামনে পেছনে যমরাজের প্রতিনিধি সকল,—ওভারসীয়ার। তাদের হাতে হাতে চাবুক। সে চাবুকে লোহার তারে ব্রোঞ্জের বল। আমরা নগ্ন দেহে, পেটে কাঁকর বালি-জল ফেলে উদয়াস্ত খনিতে কাজ করে চলেছি। খনির সুড়ঙ্গগুলো উচ্চতায় তিন ফুট, চওড়ায় দু' ফুট। দিনশেষে এখান থেকে যখন বের হব—আমরা তখন দ্বিতীয় নরকের নাগরিক। হাত-পা শেকলে বাঁধা আমরা পাতালের কারাগারে পড়ে আছি। আমাদের মধ্যে যারা মাঠে কাজ করে তাদেরও একই কাহিনী। ওরা কোন বাণিজ্যতরীর খোল বোঝাই হয়ে আসেনি। ওরা এই মাটিরই সন্তান, ডোরিয়ানদের প্রতিষ্ঠার আগে এই দ্বীপপুঞ্জের আদি নাগরিক। ওরা এখন—'হেলট', রাষ্ট্রের সম্পত্তি। রাষ্ট্র ওদের ভূস্বামীদের হাতে হাতে তুলে দিয়েছে, ওরা নগরের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে মাঠে মাঠে কাজ করছে। আমাদের মত ওদেরও পায়ে পায়ে শেকল,—ওভারসীয়ারের বদলে সামনে দণ্ডায়মান—'ইফর', খুনী স্পার্টানের দল। স্পার্টা ওদের বিশ্বাস করে না। সেবার ওরা প্রভুদের হয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়েছিল। স্পার্টা ওদের পুরস্কৃত করেছিল নির্বিচারে দু' হাজার হেলটকে হত্যা করে। যারা নগরে নগরে ঘরে ঘরে গোলামবাঁদীর কাজ করত, তারা অবশ্য তুলনায় সুখী ছিল। কিন্তু সে সুখ

স্বাধীন মানুষের সুখ নয়,—তাদের জীবনের কাছাকাছি থাকার শূন্যে পানপাত্রের তলানিটুকু আস্বাদন করবার আনন্দ মাত্র। নাগরিক গ্রীকরা মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা দিয়েছিল সত্য, কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনে তারা নিরাসক্ত ছিল। ওরা বলত—ইট ইজ বেটার টু বারি এ ওমেন দ্যান টু ম্যারি হার। জীবন তাদের আনন্দিত, একমাত্র নগরসভায় কিংবা 'সিম্পোসিয়াম' নামে খ্যাত আড্ডাখানাগুলোতে। আমরা নানাদেশের ক্রীতদাসীরা সেখানে তাদের সর্বস্ব। কখনও সেখানে আমাদের পরিচয় 'হেতায়েরা' বা পেশাদার সহচরী, কখনও বা কেবলই বাঁদী। সেখানে আমরা আর ওরা এক পৃথিবীর মানুষ, একে অন্যের আনন্দের শরিক। কিন্তু রাত্রি শেষে পরদিন ভোরে? মানবী আবার এথেন্সের রুক্ষ বাস্তবে ফিরে এসেছে, সে এখন আবার বাঁদী।

রোমের জীবন আরও নগ্ন, আরও রিক্ত, আরও অন্তঃসারশূন্য। খনি আর মাঠে মোটামুটি একই কাহিনী। পার্থক্য শুধু এই পরবর্তীকালের আমেরিকান 'মাসা' বা তুলা-প্রভুদের মত রোমানরাও সভ্যতার সারথি হিসেবে আরও নির্মম, আরও লোভী। ওদের তহবিলে কেটোর মত প্রজ্ঞা ছিল। বিখ্যাত এই রোমাননায়ক পরামর্শ দিয়েছিলেন—হে রোমানগণ, তোমাদের জরাজীর্ণ গৃহপালিত পশু আর বৃদ্ধ, রুগ্ন, অক্ষম দাসগুলোকে বিদায় কর। ওরা তাই করত। টাইবারের একটি দ্বীপে অক্ষমদের জীবন্ত ছুঁড়ে দিয়ে আসত। সভ্যতার কারিগরেরা দূরে রাজধানী রোমের গৌরব পতাকার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলত। রাজধানীর ঘরে ঘরে যারা কাজ করত, তারা অবশ্য মর্ত্যজীবন শেষে প্রভুর কাছাকাছি একটি কবর পেত। কখনও হয়ত বা তার সংগে একটি ফলকও। এ উদারতাটুকু অবিশ্বাস্য হলেও অভাবিত নয়। কারণ—কোন অভিজাত রোমানের পক্ষে দাস ছাড়া সেদিন বলতে গেলে প্রায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও অসম্ভব। দাসদের সংখ্যা যেমন তার সামাজিক মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি, তেমনি ওরাও তার জীবনের জিয়নকাঠি। ওদের ডাকে প্রভু রোমানের ঘুম ভাঙে। দর্শনার্থীরা আসে। গোলাম আর বাঁদীরা প্রভুর প্রাতঃরাশের আয়োজন করে। ভোজন শেষে দাস বাহকের কাঁধে পাল্কী চড়ে তিনি ফোরামে যাবেন। কিংবা জুয়ার আসরে বসবেন। আসর শেষে আবার দাসের পাল্কীতে স্নানার্থে গমন। রোমান সভ্যতার অন্যতম কীর্তি রোমের অগণিত সাধারণ স্নানাগার। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে সেখানে কমপক্ষে এমনি এগারটি স্নানাগার ছিল। এক সংগে সেখানে পনের হাজার মানুষ স্নান করতে পারত। প্রবেশ মূল্য হিসেবে অবশ্য নগদ কিছু দিতে হত, কিন্তু সে সামান্য, ক্ষুদ্রতম তামার মুদ্রাতেও কোথাও কোথাও অবারিত দ্বার। অভিজাত রোমান সাধারণত সেখানে যেত না। তাদের আপন স্নানাগার ছিল। যারা সাধারণ স্নানাগারে যেত তারাও তার মধ্যে যেগুলো অসাধারণ তাতেই। কোন কোনটিতে মেয়ে আর পুরুষেরা এক সঙ্গে স্নান করত। একজন সমাজপতি সে বিধানও দিয়েছিলেন। সে আনন্দ অবশ্য চিরকাল পাওয়া যায়নি। কিন্তু অন্য আনন্দ ছিল। প্রভু পাল্কী অথবা রিক্সা থেকে নামার পর দাসরা তার দেহে তৈল সংবাহন করবে, দাস বালকেরা জলে বল দেবে, ক্রীড়া হবে, মেয়েরা আপন কেশদামে প্রভুর হাত পা মুছিয়ে দেবে। ঠাণ্ডা স্নান, গরম স্নান, রকমারি স্নান শেষে গর্বিত রোমান আবার পাল্কীতে চড়বে, তার আগে পিছে দাসরা, ভেঁপু বাজাবে, পাল্কী দরজায় পৌঁছবে, দ্বাররক্ষী প্রভুকে অভিবাদন জানাবে। তাকিয়ে দেখ, লোকটির পা ফটকের সঙ্গে শেকলে বাঁধা।

স্নানের পর ভোজন। গ্রীসে, বিশেষত স্পার্টায় খাওয়া-দাওয়ায় কোন সমারোহ ছিল না। একজন বিদেশী ওদের সঙ্গে ভোজন করে বলেছিলেন—এখন বুঝতে পারছি, স্পার্টানরা কেন এমন আনন্দের সঙ্গে যুদ্ধে জীবন দিতে চায়। রোম তা নয়। মাননীয় রোমানেরা খাদকও বটেন। বেলা চারটায় খাওয়ার আসর বসবে। বাঁদী গোলামেরা ব্যস্ত। অতিথিরা আসছেন, একজন দাস তাকে দরজা খুলে দিচ্ছে, মনে করিয়ে দিচ্ছে, ঘরে ঢুকতে হলে আগে ডান পা বাড়ানোই এখানে নিয়ম! ভোজসভা বসেছে। মেয়েরাও তাতে যোগ দিচ্ছে। ওভিড মিথ্যে না হলে, টেবিলের এপারে আর ওপারে গোপনে প্রণয় লীলা চলছে। ওরা সবাই খালি পায়ে খেতে বসেছে। হাতও খালি। তখনও রোমানরা ছুরি কাঁটার ব্যবহার শেখেনি। দাসরা ওদের হয়ে খাবার কেটে কেটে দিচ্ছে। এক প্রস্থ শেষ হওয়ামাত্র আর এক দাস জলের ঝারি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। নতুন ডিসে হাত দেওয়ার আগে হাত ধুতে হবে। এত দাসের আনাগোনা, কিন্তু কারও মুখে টু শব্দটি নেই। এই আসরে হাঁচি বা কাশি দুই-ই নিষিদ্ধ। জাহাঙ্গীর অসাবধানতা বশত প্লেট ভাঙার অপরাধে জনৈক গোলামকে কোতল করেছিলেন, রোমান প্রভু কাশির অপরাধে যে কোন দাসকে বেত্রাঘাতের হুকুম দিতে পারেন। রাত আটটা পর্যন্ত এভাবেই চলবে। হয়ত সাকুল্যে কুড়ি কি বাইশ প্রস্থ খাবার খেতে হবে। খাবারের ফাঁকে ফাঁকে ক্রীতদাস, কমেডিয়ান সেজে অতিথিদের আনন্দ দেবে, রূপসীরা নাচবে, সংয়েরা নানা জীবনের অনুকরণ করবে, ক্রীড়াকুশলী খেলা দেখাবে, শিকারী সত্যি সত্যিই একটি বুনো শূকর হত্যা করবে। ওরা সবাই দাস,—প্রভুর নিজস্ব সম্পদ। এমন কি, বামন, কুঁজো খোজা—ইত্যাদি হাস্যাস্পদ যে ক্রীড়াবস্তুগুলোকে একে একে দেখান হল, তারাও নগদ মূল্যে নানা দেশের হাট থেকে কেনা। শুধু তাই নয়, এই বিরাট প্রাসাদে এখানে ওখানে যারা কেরানী মুহুরী শিক্ষক কিংবা সচিবের কাজ করছে, তারাও অধিকাংশ-দাস। রোমান প্রভুর একমাত্র দায়িত্ব শুধু বেঁচে থাকা। স্বাধীন রোমানের মত জীবনকে দেখা। তারই জন্যে তিনি উদয়াস্ত ব্যস্ত, ইতিহাস এই ব্যস্ততার নাম দিয়েছে—'বিজি লীজার!' খাওয়াও তার কাছে এক ধরনের অবসর বিনোদন। রাত গড়িয়ে চলছে, কিন্তু ভোজ তবুও শেষ হচ্ছে না। জুতো আনার হুকুম যখন জারী হবে, অর্থাৎ আসর ভাঙার ইঙ্গিত শোনা যাবে, রাত হয়ত তখন দশটা বারোটা। অতিথিরা বিদায় নেবে, প্রভু এবার শয্যা নেবেন। অভিজাত রোমানের ঘরে সেদিন অনেক আসবাব, কিন্তু রোমান প্রভুর সবচেয়ে প্রিয় যে বস্তুটি, সে এই পালঙ্ক, খাট। এখানে শুয়ে শুয়েই তিনি গ্রীক কাব্য পড়েন, দর্শন চিন্তা করেন, খাবার খান, আমোদ করেন। এবং এই খাটটিকে কেন্দ্র করেই তার বিরাট প্রাসাদে পঁচিশ বাঁদী গোলাম। তাদের কেউ কেউ ঘুমের ওষুধ জানে, কেউ কেউ জেগে থাকার গুপ্তমন্ত্র! এই প্রাসাদও এক ধরনের বিকৃতি, দ্বিতীয় হারেম।

তবে সভ্য রোমানের অন্তঃসারশূন্যতা যেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট, সে তাদের ঐতিহাসিক খেলাঘর তথা প্রমোদাগারগুলো। প্যালাটাইন পাহাড়ের পাদদেশে চলে এস। এখানে রোমানদের গৌরব বিখ্যাত 'সার্কাস ম্যাক্সিমাস'। তাকিয়ে দেখ দেড় লক্ষ মানুষ হাততালি দিচ্ছে, উন্মত্তের মত চেঁচাচ্ছে। আমরা রথ-ক্রীড়া দেখাচ্ছি। এ ক্রীড়া রিপাবলিকান রোমে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু রাজকীয় রোমে তার খ্যাতি বেড়েছে। দেশ বেকার মানুষে ছেয়ে গেছে,—শাসকেরা জেনে গেছে, এ মানুষের দলকে শান্ত রাখার একমাত্র উপায় বিনামূল্যে রুটি আর আমোদ বিতরণ। তাই বছরে একশ' পঁচাত্তর দিন, এখন সরকারীভাবে ঘোষিত আনন্দের দিন। তার ওপর অভিজাতরা আপন জনপ্রিয়তা রাখতে অথবা বাড়াতেও মাঝে মাঝে এই রক্ত-ভোজের আয়োজন করত। তাকিয়ে দেখ, আমরা দাসরা তাদের জন্যে সাত ঘোড়া, দশ ঘোড়ার রথের বল্গা ধরে ছুটছি। সে বল্গা আমাদের কোমর থেকে বুক অবধি জড়ান, রথ উল্টে গেলে কিংবা ঘোড়া জখম হয়ে গেলে, নিজেরা বাঁচতে পারব তার কোন আশা নেই; আমরা ঘোড়ার সংগে মৃত্যু বাঁধনে বাঁধা। মাঝে মাঝে অসহায় রথী কোমরের গোপন পকেট থেকে ছুরি বের করে বাঁধন কাটতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাতেও মুক্তি নেই, —প্রহরীর তলোয়ার সেই আহত পলাতক উঠে দাঁড়াবার আগেই তাকে আবার ধরাশায়ী।

করবে, সার্কাস ম্যাক্সিমাস উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকবে, অভিজাত রমণীদের হাতের রেশমী রুমাল বাতাসে উড়বে, কসাই আর রুটি কারিগরদের চিৎকারে ইতিহাস কিছুক্ষণের জন্যে এখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আজ এখানে যে সভ্য মানুষের জগৎ সমবেত, তাদের কাছে মানুষের কোন প্রাণমূল্য নেই, তাদের একমাত্র দ্রষ্টব্য—জিতছে কারা? 'সাদারা' অথবা 'সবুজেরা', —'লালেরা' অথবা 'নীলেরা'!

এ খেলা সাচ্চা রোমানের কাছে নিরামিষ আনন্দ, তৃণভোজনতুল্য। গানের আসর বা নাটকের মতই উত্তেজনা এখানে সীমাবদ্ধ। সেখানেও আমরাই সর্বস্ব। গায়ক, অভিনেতা, পরিচালক সবাই ক্রীতদাস। কিন্তু রোমান দাসেরা যেখানে তাদের প্রভুদের সত্যিই যথার্থ আনন্দদানে সক্ষম, সে এই অ্যাম্পিথিয়েটার। সম্রাট ভেসপাসিয়ান এবং তস্যপুত্র টিটাস-এর অবদান কলোসিয়ামে চলে এস, রোম এবং তার ক্রীতদাস দুদলকেই এখানে তাদের আসলরূপে দেখা যাবে। তাকিয়ে দেখ, পঞ্চাশ হাজার দর্শক ক্ষুধার্ত চোখে গ্যালারী থেকে নীচে আসরের দিকে উন্মুখ হয়ে ঝুঁকে আছে, আমরা দাসরা গ্ল্যাডিয়েটার তথা তলোয়ারধারী হয়ে লড়াই করছি। তলোয়ারে খেলা নয়, জীবনপণ লড়াই। এই দিনটির জন্যেই আমরা তিল তিল করে নিজেদের তৈরী করেছি, আখড়ায় আখড়ায় দিনের পর দিন কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ঘাতকের বিদ্যাকে সম্পূর্ণ করেছি। আজ আমাদের লড়াইয়ের দিন। ওদের—ক্রীড়ার।

প্রথমে সাধারণ হাতিয়ার। তারপর সে পরীক্ষা শেষে বর্শা, ত্রিশূল জাল; কখনও বা ঢাল-তলোয়ার খেলা কিংবা অভিনব কোন হাতিয়ার। ক্লান্ত যোদ্ধা কখনও নিস্তেজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। ওরা সাঁড়াশীতে তাদের দেহগুলো টেনে টেনে কোণের একটি ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। আহতদের সেখানে হত্যা করা হবে। নিহতদের পোশাকগুলো খুলে রাখা হবে। এদিকে লড়তে লড়তে একটি যোদ্ধা আত্মসমর্পণের ভংগী ধারণ করেছে, বিজয়ী তার বুকে তলোয়ার ঠেকিয়ে দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে।—এ মানুষের জীবন মরণ এখন তাদেরই হাতে। ওরা যদি উল্লাসে চিৎকার করতে করতে বুড়ো আঙুল ঘুরিয়ে নিজেদের বুকের দিকে ইঙ্গিত করেন, তবে তলোয়ারের ওখানেই স্থির হয়ে থাকলে চলবে না, পরাজিতকে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ করতে হবে, দৈবাৎ কোন কারণে যদি ওদের মতিভ্রম হয়, আঙুলটি বুকের বদলে নীচের দিক নির্দেশ করে, পরাজিত যোদ্ধা তবেই সেদিনের মত ছাড়া পাবে! কিন্তু সে সাময়িক মুক্তি মাত্র। গ্ল্যাডিয়েটরদের জীবনে অ্যাম্পিথিয়েটারের রক্তাক্ত মৃত্যুই একমাত্র ভবিষ্যত। সুখী রোমানের জীবনে সেই আনন্দদায়ক মুহূর্তটির জন্যেই তার এই দেহ, এই পেশী, এই তাজা রক্ত। খ্রীষ্ট জন্মের তিনশ' বছর আগে থেকে তাদের এই রক্তের খেলা চলেছে। কখনও কখনও তলোয়ার হাতে বাঁদীরাও আসরে নেমেছে। হাজার হাজার ক্রীতদাস অ্যাম্পিথিয়েটারে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। কখনও নিজেদেরই তলোয়ারের মুখে, কখনও বা আরও কোন নব উদ্ভাবিত আর কোন নৃশংস পথে। একটি তার কুখ্যাত 'হান্ট' বা ক্ষুধার্ত পশুর সঙ্গে মানুষের খেলা। খেলাটা অবশ্য আদিতে পশুর সঙ্গে অন্য পশুর খেলাই ছিল। কিন্তু রক্তের পিপাসা

বেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে, পশুর দঙ্গলে বন্দী এবং দাসেরাও নিক্ষিপ্ত হতে লাগল। সে খেলা ক্রমে এমনই জমে উঠেছিল যে, রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারের রাজকীয় ভোজের আমন্ত্রণে আফ্রিকার বনগুলো পর্যন্ত সেদিন সিংহ, চিতা, গণ্ডার এবং কুমীরশূন্য। মাঝে মাঝে ওরা আরও অভিনব মৃত্যু-আসরের আয়োজন করত। অ্যাম্পিথিয়েটারকে সেদিন সমুদ্রে পরিণত করা হত। আমরা ক্রীতদাসেরা সেখানে নৌযুদ্ধ করতাম। কেউ নকল সমুদ্রে জ্যান্ত কুমীরের মুখে প্রাণ দিতাম, কেউ যোদ্ধা হিসেবে যোদ্ধার তীরের মুখে লুটিয়ে পড়তাম। ৫২ অব্দে সম্রাট ক্লডিয়াস এমনি একটি লড়াইয়ের আয়োজন করে ইতিহাসে অক্ষয় নাম কিনে গেছেন। তাঁর আগে রোমে সবচেয়ে সৌখিন রোমানের সম্মান ছিল ট্রাজানের। তিনি এক আসরে দশ হাজার ক্রীতদাসকে গ্ল্যাডিয়েটার করে তলোয়ার হাতে আসরে নামিয়ে দিয়েছিলেন। একসঙ্গে নয়, জোড়ায় জোড়ায় দু'জন করে। সেই অসংখ্য দাসের আত্মঘাতী খেলায় সময় লেগেছিল—একশ' তেইশ দিন। ক্লডিয়াস খেলার আয়োজন করেছিলেন, রোম থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে ফুসিন লেকে। সেখানে আমরা আত্মদান করেছিলাম উনিশ হাজার। লড়াই চলেছিল দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। অবশেষে লড়াই যখন থামল, সম্রাট এবং তাঁর তৃপ্ত নাগরিকেরা যখন সহাস্য মুখে উঠে দাঁড়াল তখন আমরা উনিশ হাজার যোদ্ধার একজনও বেঁচে নেই, শান্ত জলের হ্রদ ফুসিন আবার শান্ত,—শুধু তার জলের রংটা এখন অন্য,—রক্তাক্ত।

মরে মরে একদিন আমরা বাঁচতে শিখেছিলাম। অবশেষে আমরা বিদ্রোহী হয়েছিলাম। একজন জার্মান গ্ল্যাডিয়েটার বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। সেনেকা বলেছিল—মুক্তি যেখানে এত কাছে, আশ্চর্য, মানুষ তবুও কেন দাস! আমরা দরদীর এই দার্শনিকতায় বিশ্বাসী ছিলাম না। আমরা কাপিউয়ার দুশ' গ্ল্যাডিয়েটার শেকল ছিঁড়ে খোলা তলোয়ার হাতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। সে খ্রীষ্টপূর্ব ৭৪ অব্দের কথা, জেরুসালেমের আকাশে তখনও মানবতা নক্ষত্র হয়ে ফোটেনি; জাস্টিনিয়ান, লিও, কনস্টেনন্টাইন, ডিও ক্রাইসোস্টম, হ্যাড্রিয়ান প্রভৃতি উদারনৈতিকেরা আবির্ভূত হননি, রোম তখনও তথাকথিত রিপাবলিক সেনেটারদের সাম্রাজ্য,—তার জীবনের শেষ শতক চলছে। আমরা সেই শেষকে সম্পূর্ণ করতে চাইলাম। আমরা লোহার পিঞ্জর ভেঙে কাপিউয়ার পথে নেমে এলাম। আমরা বিদ্রোহী হলাম। আমাদের পুরোভাগে থ্রেসের বন্দী রাজকুমার,—ক্রীতদাস স্পার্টাকাস। হাতে রক্তাক্ত তলোয়ারটা আকাশে উঁচিয়ে ধরে দাস স্পার্টাকাস মানুষের অধিকার ঘোষণা করল, কোটি ক্রীতদাসের আর্তনাদ তার কণ্ঠে মানুষের জয়ধ্বনিতে পরিণত হল, ক্রীতদাস গর্বিত রোমান সাম্রাজ্যকে সম্মুখ রণে আহ্বান জানাল।

কাপিউয়ার পর থুরুরি, তারপর নোলা, তারপর আরও। আমরা এখন চলমান ভিসুভিয়াস। মুক্তির আনন্দে দুর্বার, প্রতিহিংসায় আগ্নেয়। আমাদের সেই লাভা স্রোতের সামনে একের পর এক রোমান শহর যেন তাসের ঘর। দাসরা প্রাচীরের দুয়ার খুলে দিচ্ছে, হাজার হাজার দাসের জয়ধ্বনিতে আমাদের অভিষেক হচ্ছে, আমরা গতকাল অবধিও যারা ছিলাম ক্রীতদাস—তারা অভিজাত রোমানের ভংগীতে অ্যাম্পিথিয়েটারে বসে আছি, আমাদের আদেশে সেদিনের প্রভুরা এখন গ্ল্যাডিয়েটার। তারা নিজেরা নিজেদের হত্যা করছে, আমরা উল্লাসে চিৎকার করছি: ঈশ্বর নতুন করে তাঁর অস্তিত্বকে অনুভব করছে, সভ্যতা স্তব্ধ হয়ে ন্যায়ের যথার্থ সংজ্ঞা অনুধাবন করতে চাইছে। স্পার্টাকাস, ক্রীতদাস স্পার্টাকাস খোলা তলোয়ার হাতে রাজধানী রোমের দিকে এগিয়ে চলেছে। হাজার হাজার

শেকল-ছেঁড়া দাস তার সহযাত্রী। এরই মধ্যে মাত্র তিন মাসে আমরা চল্লিশ হাজারে পরিণত হয়েছি।

তিন বছর পরে সেই সংখ্যা তিন লক্ষে পৌঁছেছিল। কপিউয়ার দু'শ গ্ল্যাডিয়েটারের বিন্দু তখন উত্তাল ভূমধ্যসাগর। একের পর এক রোমান বাহিনী আসছে, পরাজিতের অপমান বহন করে আবার রাজধানীতে ফিরে যাচ্ছে। পর পর দশটি বাহিনী পর্যদুস্ত হল, দু দুটি কন্সাল পুড়ে ছাই হয়ে গেল, অসংখ্য 'ইগল' ধুলোয় লুণ্ঠিত হল। রোমান সাম্রাজ্য আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে, আমরা দাসরা বিজয়ের মুখে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমরা রাজধানীর প্রাচীর ডিঙোতে পারিনি। মার্কাস ক্রেসাসের নয় লিজিয়ান সুশিক্ষিত সৈন্যের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের ছিল না। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অস্ত্রহীন, রুগ্ন দাসেরা আমরা তবুও সিংহের মত লড়াই করেছিলাম, ষাট হাজার মানুষে ষাট লক্ষ সিংহের মত লড়াই শেষে মাটিকে আশ্রয় করেছিলাম, মৃত মানুষের সেই শবের পাহাড়ের শীর্ষে ছিল আমাদের নায়ক স্পার্টাকাস। আমরা পরাজিত হয়েছিলাম। কপিউয়া থেকে যে পথটি রোমের দিকে গেছে তার দুধারে ক্রুশবিদ্ধ ছ'হাজার বিদ্রোহীর শবে রোম আবার তার জয়বার্তা ঘোষণা করেছিল। তবুও কোন ক্রুশে একবার কোন কাতরোক্তি শোনা যায়নি। কেননা, আমরা বিদ্রোহী হয়েছিলাম। স্পার্টাকাস আমাদের বিদ্রোহী করেছিল। আমরা জীবন এবং মৃত্যু উভয়কে নতুন করে চিনেছিলাম। আমরা মৃত্যুতেই সুখী হয়েছিলাম।

আমরাও। স্পার্টাকাস একা নয়, আমরাও বিদ্রোহী। বিদ্রোহী দাস। স্পার্টাকাসের অনেক, অনেক আগে আমরা গ্রীসের ক্রীতদাসেরা বিদ্রোহী হয়েছিলাম। সে খ্রীষ্টপূর্ব ১০৫৫ অব্দের কথা।

আমরাও। আমরা পিলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের কালের (খ্রীঃ পূঃ ৪১৩ অব্দ) এথেন্সের দাস-কুল। আমরাও বিদ্রোহী হয়েছিলাম। কুড়ি হাজার এক সঙ্গে প্রাণ দিয়েছিলাম।

আমরাও। আমরা খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৩ অব্দের স্পার্টার দাস।

আমরা খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৪ অব্দে রোমান শহর ল্যাটিয়াম দখল করেছিলাম।

আমরা খ্রীষ্টপূর্ব ১৯৬ অব্দে ইত্রুরিয়া দখল করেছিলাম।

আমরা খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৫ অব্দে অ্যাপুলিয়া দখল করেছিলাম।

আমি ড্রিমাকস। সামান্য ফকির হয়েও আমি কিওস দ্বীপের দাসদের ঘুম ভাঙিয়েছিলাম। ওরা বিদ্রোহী হয়েছিল। আমি ওদের 'রাজা' নির্বাচিত হয়েছিলাম। রোমানরা আমার মাথার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আমি নিজের হাতে নিজের মাথা কেটে দিয়ে রোমকে স্বাধীনতার মূল্য বোঝাতে চেয়েছিলাম।

আমি ইউনাস, সিসিলির দাস। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৩ অব্দে আমিই ছিলাম ইতালীর প্রথম স্পার্টাকাস। দুই লক্ষ দাস নিয়ে আমি দাসদের স্বাধীন সেনাদল গড়েছিলাম। রোম বার বার ঘাড় হেঁট করে আমার দুয়ার থেকে ফিরে গেছে। ছ' বছর আমরাই ছিলাম সিসিলির সম্রাট।

ইউনাস, স্পার্টাকাস....তোমরা লক্ষ লক্ষ বিদ্রোহী ক্রীতদাস রক্তের বিনিময়ে অন্ধকার পৃথিবীতে আলো এনেছিলে।

আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। গ্রানভিল সার্প—উইলবার ফোর্স—লিঙ্কন, জর্জ ফক্স আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা কি সে স্বাধীনতার অংশীদার মাত্র? তার অর্জনের ইতিহাসে আমাদের কি কান্না ছাড়া আর কোন অবদান নেই? অবশ্যই নয়। স্পার্টাকাস, ইউনাস,—আমরা তোমাদের নাম শুনিনি, সত্য বটে স্বাধীনতার ভোরেও ফ্রীডম আমাদের অনেকের কাছে এক অপরিচিত শব্দ, আমরা কেউ জানি সে বোধহয় কোন নতুন খামারের নাম কিংবা নতুন কোন মালিকের; তবুও আমরা মানুষের সন্তান, আমাদের আরণ্যক অনুভূতিতেও আমরা যন্ত্রণাকে অনুভব করতে পারতাম, জীবনকে আমরাও ভালবাসতাম। স্পার্টাকাস, আমাদের কাছেও বিদ্রোহ তাই অপরিচিত অগ্নি নয়। এ আগুনে আমরাও কখনও কখনও জাহাজ পুড়িয়েছি, কখনও কখনও নতুন উপনিবেশগুলোর বুকে মৃত্যু ভয় জাগ্রত করেছি, কখনও বা কেবলি মরে মরে জীবনের প্রতি নিজেদের ভালবাসাকে আবার প্রমাণ করেছি। আমেরিকার ইতিহাসে আমরা কেবলি কান্নার কাহিনী নই। সুদূরে ১৭৯১ সনে বছরের পর বছর লড়াই করে ক্যারিবিয়ানের বুকে হাইতিতে আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম। ১৮৩১ সনে আমাদের নায়ক নাট টার্নার ভার্জিনিয়ায় তামাকের ক্ষেতগুলো শ্বেতাঙ্গের কবরে পরিণত করেছিল। ইতিহাস জানে, গৃহযুদ্ধের আগে আমরা খাস মার্কিন মুলুকেই কম পক্ষে দু'শ' পঞ্চাশবার বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছিলাম! স্পার্টাকাস, তোমরা যদি খ্রীষ্টকে আলোকে পরিণত করে থাক, তবে সম্ভবত আমরাই উইলবার ফোর্সদের বাঙ্ময় করেছিলাম, আমরাই বোস্টনের তরুণ মুদ্রাকর লয়েড গ্যারিসনের হাতে অগ্নিক্ষরা কলমটি তুলে দিয়েছিলাম। আমাদের মুক্তি সম্ভবত সেদিক থেকে আমাদেরই কীর্তি।

আমরা মুক্তি চেয়েছিলাম। আমরা কেঁদে কেঁদে ওঁদের ঘুম ভাঙিয়েছিলাম, আগুন জেলে জেলে ওঁদের হৃদয়কে আলোকিত করেছিলাম। ওঁরা বেরিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, লক্ষ লক্ষ ভাষাহীন মানুষের হৃদয়ের কথাকে নিজেদের গ[...] তুলে নিয়েছিলেন; আমরা স্বাধীন [...] ছিলাম। তাকিয়ে দেখ, আজ আর আম[...] কারও হাতে পায়ে শেকল নেই, ক[...] বান্দাছাপ নেই, পিঠের ওপর উদ্যত চা[...] নেই। কিন্তু তবুও সত্যিই আমরা মুক্ত[...] মুক্তির আনন্দে ভার্জিনিয়ার বুড়ি ক্রীত[...] তামাক ক্ষেতে গড়াগড়ি দিয়েছিল।

দাসরা হেসে বলেছিল—দেখ, দেখ, না[...] সত্যিই মুক্ত, আজ পিঁপড়েগুলো পর্য[...] ওকে কামড়াচ্ছে না! স্বাধীনতা সে[...] আমাদের কাছে তা-ই যন্ত্রণা থেকে ম[...] শেকল থেকে মুক্তি; দিনরাত যে পিঁপড়েগুলো মাঠে মাঠে, পথে পথে, শে[...] ঘরে, খাবারের সময় চাবুক হয়ে কা[...] ফিরছে, তার থেকে মুক্তিই সেদিন আমা[...] কাছে স্বাধীনতা। কিন্তু আজ বুঝতে [...] বন্ধনের সেটাই শেষ কথা নয়। মধ্য[...] অ্যাম্পিথিয়েটার থেকে শেকলহীন দা[...] আমরা মুক্ত মানুষের পোশাকে [...] নিক্ষিপ্ত হয়েছিলাম। পরে জেনেছি[...] আমরা স্বাধীন মানুষ নই, 'সার্ফ',—ভূমিদ[...] আজ আনুষ্ঠানিক মুক্তির শতবর্ষ প[...] পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, আ[...] বোধহয় এখনও তাই, আমরা 'সার্ফ' প্রখ্যাত দাস-তরী 'অ্যামিস্টাড'-ডেকে দণ্ডায়মান মুক্তি অভিলাষী মানুষ ম[...] ১৮৩৯ সনের আগস্টে 'অ্যামিস্টাড'-দাস আমরা বিদ্রোহী হয়েছিল[...] ক্যাপ্টেনকে হত্যা করে আমরা শ্বেত[...] নাবিকদের আদেশ দিয়েছিলাম—জা[...] পূবে ঘোরাতে। আমরা আফ্রিকায় ফি[...] যেতে চাই,—আমাদের মাতৃভূমিতে। আদেশ অমান্য করার সাহস ওদের ছিল[...] রুইজ সুবোধ বালকের মত হালে গি[...] দাঁড়িয়েছিল,—'অ্যামিস্টাড' আবার চল[...] সুরু করেছিল। দিন যায়, রাত [...] অ্যামিস্টাড চলেছে। আফ্রিকার উপকূ[...] কোন চিহ্ন নেই!—কিন্তু কোথায় আফ্রিক[...] অবশেষে সরকারী প্রহরীরা যখন আমা[...] আবিষ্কার করল, আমরা তখনও দরিয়ায়, [...] জানাল—অদূরেই আমেরিকা! সবিস্ম[...] আমরা রুইজ-এর মুখের দিকে তাকি[...] ছিলাম। রুইজ উত্তর দিয়েছিল—[...] তাই। দিনে আমি পূব দিকে জাহা[...] চালাতাম,—রাতে পশ্চিম দিকে!

সভ্যতা, নিজের মুখের দিকে তাকি[...] দেখ, তুমিও সেই রুইজ নও ত! নয়ত [...] এখনও আমি ওয়াশিংটনে লিঙ্কন মেমো[...] রিয়াল-এর দিকে হাঁটি, কেন এখনও সে[...] আরবে শেষ শেকল খোলার শব্দ শুনে কাঁ[...] —আমি ক্রীতদাস, তবে কি আমি ইতিহাসে[...] নিশ্চিত নিয়তি? হু আই ইজ, হাউ ও[...] আই ইজ, অ্যান্ড হোয়্যার আই ইজ বর্ন, [...] ডু নট নো।

আনন্দ মেলা

শুভেচ্ছা

আমার ছোট্ট ও তরুণ বন্ধুরা,

বর্ষা দেয়নি বর্ষণ তার—ভাদ্র ঢেলেছে জলের ধারা
শরতের পথ ছিল যে পিছল, মেঘে ঢাকা ছিল আকাশ তারা
অথচ শুনিনু—শারদ অর্ঘ্য দু'বারই সাজাতে হবে।
শরৎ, হিমের দু'মাসে দু'বার, দুর্গাও পুজো লবে।
বড় গোলমেলে ব্যাপার যে ভাই,—গরীব মোদের তরে,
একটা পুজোর খরচ যখন জোটে না অনেক ঘরে।
যাই হোক ভাই, শেষেরই পুজোটা দেশে বেশি হবে শুনে,
ধড়ে প্রাণ এল, খুশি হলো সবে, আনন্দ এলো মনে।
তবু আনন্দ হবে না তেমন—এবার শরতে ভাই।
অভাব রয়েছে, শিয়রে শত্রু, শান্তি যে কারও নাই।
শারদোৎসবে এবার তাইতো—যে যাহার আছ প্রিয়,
আব্দার-জিদে না করে পীড়ণ— ভালবাসা দিও, নিও।
মায়ের চরণে প্রণাম জানায়ে—বলো—'মা শক্তি চাই'।
জামা-জুতো আর বিলাস আমোদে কোনো প্রয়োজন নাই।

ইতি—মৌমাছি

— লিখেছেন —

শ্রীযামিনীকান্ত সোম, শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দেব, শ্রীহাসিরাশি দেবী, স্বপনবুড়ো, শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীশৈল চক্রবর্তী, শ্রীআশা দেবী, শ্রীবিমল ঘোষ, শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রভাকর মাঝি, শ্রীছবি সেনগুপ্তা, শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবলরাম বসাক, শ্রীশান্তশীল দাশ, শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তি ঠাকুর, শ্রীজীবন ভৌমিক, শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও মৌমাছি।

— ফটো তুলেছেন —

শ্রীরেবন্ত ঘোষ ও শ্রীঅনিল ঘোষ।

— ছবি এঁকেছেন —

শ্রীশৈল চক্রবর্তী, শ্রীবিমল দাস, শ্রীঅহিভূষণ মালিক, শ্রীনারায়ণ দেবনাথ, শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য ও শ্রীঅর্ধেন্দুশেখর দত্ত।

হিন্দুর দিগ্বিজয়

যামিনীকান্ত সোম

হিন্দুদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী, তাঁদের দেশ ভ্রমণ, তাঁদের বিখ্যাত নৌ-যাত্রার কাহিনী আর তাঁদের নানা দেশ আবিষ্কারের বিবরণ অত্যন্ত চমকপ্রদ। সে কথা জানবার ইচ্ছা কার না হয়? ছোটদের তো হয়ই। আজ তারই কথা কিছু শোনাবো, যদিও এসব একেবারেই নূতন নয়।

প্রথমে বলি আমেরিকা আবিষ্কারের কথা। আমেরিকার আদি আবিষ্কর্তা কে? আদিযুগে ভারতবাসীরাই ছিলেন আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তের, অর্থাৎ দক্ষিণ আমেরিকার আবিষ্কর্তা। তখন কোথায় ছিল ইউরোপ আর তার সভ্যতা। সে কোন্ যুগের কথা, কে জানে?

ভারতীয় হিন্দু-বণিকেরা তাঁদের নৌবহর নিয়ে দিগন্তহীন প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে যেতে যেতে আমেরিকার মধ্যভাগে এবং সুবিস্তৃত দক্ষিণভাগে তথা দক্ষিণ আমেরিকায় উপনীত হন এবং সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তার প্রমাণ আছে সেখানকার প্রস্তর ফলকে। সেস্থানের প্রস্তর ফলকে খোদিত আছে—শিব, গণপতি, সূর্য, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি হিন্দু দেবতাদের মূর্তিগুলি। এ নিয়ে বহু পণ্ডিত বহু গবেষণা করেছেন।

সেখানকার আদি বাসিন্দা হল রেড ইণ্ডিয়ান। রেড ইণ্ডিয়ানদের ভাষার মধ্যে প্রায় দেড় হাজার সংস্কৃত কথা আছে, তা একজন ভারতীয় পণ্ডিত আবিষ্কার করেছেন। এছাড়া হিন্দু সভ্যতার আরও কত কি নিদর্শন পাওয়া গেছে। এইসব থেকে প্রমাণ হয় যে, ইউরোপীয়-সভ্যতার বহু আগে হিন্দু-বণিকেরাই সব প্রথমে আমেরিকায় গিয়েছিলেন। কলম্বাসের আমেরিকার উত্তরভাগ আবিষ্কার—সে তুলনায় তো এই সেদিনের কথা।

প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে যবদ্বীপের অতিপ্রসিদ্ধ, সুউচ্চ, অতি প্রকাণ্ড বরবুদর মন্দির। এই মন্দিরে খোদিত আছে পৌরাণিক অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। আর আছে বৌদ্ধ দেবদেবীরও বহু মূর্তি। তখন তো কলের জাহাজ ছিল না, ছিল বড় বড় নৌকা। হিন্দু-বণিকেরা সেই নৌবহর নিয়ে ইচ্ছামত ও খুশিমত বাণিজ্যে বেরুতেন আর বহু অগম্য স্থানেও গমন করতেন এবং সে-সব স্থানে নিজেদের কীর্তি স্থাপন করতেন, উপনিবেশ সৃষ্টি করতেন। তখনকার হিন্দুরা ছিলেন অকুতসাহসী। তাঁদের কীর্তি ও প্রভাব ছিল অসামান্য।

লংকাদ্বীপ আবিষ্কার হল কী করে? রাজপুত্র বিজয় সিংহ সাতশত অনুচর সহ নৌকাযোগে গিয়ে লংকাদ্বীপে অবতরণ করেন ও সে দ্বীপটি জয় করেন এবং নাম দেন সিংহল। তারপর সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে বংশানুক্রমে রাজত্ব করতে থাকেন। এ হল খৃষ্টজন্মের পাঁচশত বৎসর পূর্বের ঘটনা। এ কথা তো সকলেই জানে।

বঙ্গবাসী হিন্দু-বণিকগণ ময়ূরপংখী ভাসিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের নানাদিকে বাণিজ্য করতেন। গুপ্তযুগে গুপ্ত-রাজাদের সহযোগিতায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে শিল্পের ও সংস্কৃতির বহু উন্নতি হয়। সেকালে হিন্দুস্থান থেকে সংস্কৃতভাষী বণিক, সন্ন্যাসী ও ধর্মপ্রচারকগণ—কম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের ধর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, কৃষিবিদ্যা, নৌবিদ্যা, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শাসনতন্ত্র ইত্যাদি শিখিয়েছিলেন আর সেসব স্থানের উন্নতি ও সমৃদ্ধি করেছিলেন।

তার অনেক পরে শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ নরপতি যবদ্বীপ অধিকার করে সেখানে বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সেখানে চণ্ডীকলসন নামক বৌদ্ধ মন্দির এবং আরো কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরে শৈলেন্দ্র রাজ্যের অবসান হয়। তখন সেখানে হিন্দু সম্প্রদায় ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমান অধিকার লাভ করে।

পরে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কীর্তিরাজ জয়বর্ধন এখানে রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মন্ত্রী বীরকেশরী "গজমদ" ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে বলিদ্বীপ, নিউগিনি, সিলিবিস, বোর্নিয়ো, পশ্চিম মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, মালয় ও সুমাত্রা জয় করেন। এর শেষ নরপতি বিজয় ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হন—তারপর যবদ্বীপ মুসলমান অধিকারে এলেও, আজ পর্যন্ত সেখানকার মুসলমান অধিবাসীরা হিন্দুদের আচার-বিচার ও হিন্দুদের বিশ্বাসের অনুসরণ করে আসছেন।

হিন্দুদের রুশ দেশে গমনের কথাও সুপরিচিত। গুপ্ত ও পাল সময়কার বণিক-সম্প্রদায় ভারতবর্ষ থেকে রুশ দেশে গিয়েও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। রুশ দেশের ব্যবসায়ীরা কাস্পিয়ান উপত্যকা দিয়ে এবং পশ্চিম-হিমালয় বাণিজ্যপথে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসতেন এবং ব্যবসা চলতো। রুশ পণ্ডিত মহলে ভারতীয় উপকথা, ভারতীয় সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতি আদর পেয়ে আসছে বহুকাল থেকে।

হিন্দুরা তখন ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী, মহাবীর ও উপনিবেশ-স্থাপনপ্রিয়। এ সকল সেকালের কথা হলেও শোনা দরকার।

বিজয়সিংহ অনুচরসহ লঙ্কা দ্বীপে অবতরণ করেন

অমৃতের ভোজ

শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

...নদীর তীরে শিবালয়গ্রাম। ...এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বাস। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইন্দ্রচূড়। তিনি ছিলেন যেমন বিদ্বান তেমনি ধার্মিক।

ইন্দ্রচূড়ের আটটি পুত্র ছিল। তারপরে আরো একটি পুত্র হলো। তাঁর দিকে চেয়ে সকলের মনে হ'ল—স্বর্গের দেবতা বুঝি মর্ত্যে জন্মে এসেছেন! শিশুটির চেহারা রাজপুত্রের মত, হাতে-পায়ে মহাপুরুষের চিহ্ন, তার সর্বাঙ্গ থেকে যেন পূর্ণিমার জোৎস্না উছলে পড়ছে। ইন্দ্রচূড় ভাবলেন, পূর্বজন্মে এ-শিশু হয়তো কোনো রাজার বংশে জন্মেছিলেন, যোগভ্রষ্ট হয়ে এবারে তাঁর ঘরে জন্মেছেন। কে সেই রাজা?—ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল চন্দ্রবংশের রাজা ভরতের কথা। রাজসিংহাসন ছেড়ে তিনি তপস্যা করতে গিয়েছিলেন; যোগভ্রষ্ট হয়ে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি। এ-শিশুটিরও রাজলক্ষণের সঙ্গে যোগীর লক্ষণও দেখা যাচ্ছে। কে জানে, সেই ভরত-রাজাই এই নাকি? মনের এই সন্দেহে তিনি শিশুটির নাম রাখলেন ভরত।

ইন্দ্রচূড়ের সাধ ছিল ছোট পুত্রটিকে শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত করবেন। কিন্তু তার ভাবগতিক দেখে সে-সাধ পূর্ণ হওয়ার আশা রইলো না। ছোট শিশু ক্রমে কিশোর হলো। তবু তার মুখে কথা নেই; খিদে-তেষ্টার গরজ নেই—খেতে দিলেও যা, না-দিলেও তা-ই; নিজের সুখ-দুঃখের হুঁশবোধ আছে বলে মনে হয় না, অথচ একটা পোকা-মাকড়কেও মাড়িয়ে ফেলবে হয় সেই ভয়ে পথের দিকে চেয়ে চেয়ে আস্তে আস্তে তার পা ফেলে।

তারপর বয়স বাড়লেও মতিগতির তফাৎ দেখা গেল না। তাকে দেখিয়ে পাড়াপড়শীরা প্রায়ই বলাবলি করে—ইন্দ্রচূড় ঠাকুরের ঘরে একটা হাবা ছেলের জন্ম হয়েছে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি বা অন্য কোনো গুণই তার নেই। কি দেখে যে বাপ নাম রেখেছেন ভরত, কে জানে! আসলে ও একটা জড়-পিণ্ডেরই মত, জড়-ভরত নাম হলেই ঠিক হত।

পাড়াপড়শীরা হাবা ছেলেটার নিন্দায় এইরকম পঞ্চমুখ হলেও এক বিষয়ে কিন্তু ছিল তার পক্ষপাতী। কারো কোনো কাজকর্ম করতে হলে ভরতেরই ডাক পড়ত। ভরতও মুখ বুজে তা করে দিতেন। বেগার খাটাবার এ-সুযোগ পেয়ে সেই পাড়াপড়শীরই মুখে অন্য সুরের কথা শোনা যেত।—ভরত হাবা হলে কি হয়, যা বলা যায় তা তক্ষুনি করে, কাজ করানোও যায় বিনা খরচায়।

বাপ-মা এই ছোট ছেলেটিকে তাঁর বড় ভাইদের কাছে রেখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কিছুদিন পরে বড় আট ভাইদের আলাদা আলাদা আট সংসার হলো। তখন ঠিক হলো—পালা করে এক-একদিন এক-এক ভাই ছোট ভাইয়ের খাবার-দাবারের ভার নেবেন। কিন্তু এ-ভাগাভাগি হলো ঠেলা-ঠেলিরই সামিল। সকলের বড় ভাই ছিলেন বাপেরই মত ধার্মিক। ছোট ভাইটির প্রতি তাঁর স্নেহের টানও ছিল খুব। অন্য ভাইদের মনের ভাব বুঝে তিনিই ভরতের সমস্ত ভার নিলেন।

এতে বড় বৌয়ের হলো মুখ ভার। স্বামীর উদ্দেশে তিনি গজর গজর করতে লাগলেন, মানুষটার যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে। অকর্মার ধাড়ি, সংসারের কোনো কাজকর্ম করার যোগ্যতা নেই, এমন ভাইয়ের ভার কেউ সেধে নেয়। কেন, ও-হাবাটার কি আর কোনো ভাই নেই। আরো যে সাতটা দাদা আছে, পারেন না তাঁরা এই রত্নটিকে পুষতে!

ভেবেচিন্তে বড় বৌ শেষে ঠিক করলেন—দায় যখন ঘাড়ে পড়েছেই তখন কাজকর্ম যতটা পারা যায় ওকে দিয়েই করাতে হবে। ব্যবস্থা হলোও তা-ই। রান্নার কাঠ ফাড়াতে হবে, করতে হতো তা ভরতকে; ঘড়া ভরে নদীর জল আনার দরকার, আনতে হতো ভরতকে; জমিজিরেতের ক্ষতি না হয় দেখার জন্য পাহারা দিতে হত তাঁকেই। বড় বৌয়ের দুপুরবেলায় ঘুমোনোর অভ্যাস, কোলের ছেলেপিলে কাছে থাকলে আরাম করে ঘুমানো চলে না, তাই শোবার আগে কোলের ছেলেটিকে ভরতের কাছে রেখে তিনি বলে যান—ঠাকুরপো, একে একটু খেলা দিয়ে রেখো।

একদিন উঠোনে ক্ষেতের ধান শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বড়-বৌ শুয়ে পড়ার আগে ছেলেটিকে ভরতের কাছে রাখতে গিয়ে বললেন,—এর দিকে দৃষ্টি রেখো, আর দেখো পাখি-পাখালি এসে যেন ধানগুলো খেয়ে না যায়।

কতক্ষণ পরে ছেলের কান্নার শব্দে বড় বৌয়ের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দেখেন, ছেলেটা দাওয়া থেকে উঠোনে পড়ে গিয়েছে, আর ধানের উপর বসে যত রাজ্যের কাক-শালিক-চড়ুই পাখির ভোজের ঘটা চলছে! দেওরটির সেদিকে খেয়ালই নেই; আনমনা হয়ে একদিকে চেয়ে তিনি ঠায় বসেই আছেন। ব্যাপার দেখে রাগে বড় বৌয়ের পিত্তি জ্বলে উঠল। হাতের কাছে একখানা চেলা কাঠ পেয়ে তা দিয়ে তিনি দেওরের পিঠে দু-ঘা বসিয়ে দিলেন। তখনও ভরতের মুখে দুঃখ বা বেদনার চিহ্ন না দেখে রাগ তাঁর বেড়েই উঠল। তিনি ঠিক করলেন,—পিঠে মারলে এ অমানুষটার আক্কেল হবে না, একে শিক্ষা দিতে হবে পেটে মেরে। যা খেয়ে প্রাণ বাঁচে তার উপর এত হেলা-ফেলার উপযুক্ত শাস্তি হচ্ছে মানুষের খাদ্য তাকে না দেওয়া।

সেইরকম খাদ্যের মালমশলা যোগাড় হলো—গোয়ালঘর থেকে গরুর জাবের পচা খৈল-ভুষি এনে, তার সঙ্গে পোড়া ধুলো মিশিয়ে। দেওরের খাবার তৈরীর জন্য সেই জিনিস দিয়েই তিনি খিচুড়ি রান্না করতে লাগলেন।

আগুনের তাতে পড়ে সে খিচুড়ি থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বের হলো। বড় বৌ নাকে কাপড় চেপে রান্না শেষ করে তা দেওরকে খেতে দিলেন। ভরত তাই নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে তৃপ্ত হয়ে উঠে গেলেন।

দেওরের এঁটো তুলতে গিয়ে বড় বৌ নাকে

হাতের কাছে একখানা চেলা কাঠ পেয়ে তা দিয়ে......

কি-এক দিব্য গন্ধ পেতে লাগলেন। প্রথম করে তিনি বুঝলেন, সে-গন্ধ আসছে তাঁর দেওরের খাবার পাত্র থেকে। পাত্রে তখনও দু-চার টুকরো খাবার লেগে ছিল। তা চেখে দেখতে তাঁর ইচ্ছা হলো। তখন তা মুখে দিতেই তার যে-আস্বাদ পেলেন তাতে তিনি অবাক হয়ে বলে উঠলেন—আরে, এ যে অমৃত!

কিন্তু অমৃত তো খায় স্বর্গের দেবতারা! শুধু কি দেবতাদের রাজ্যেই তৈরী হয় তা, পৃথিবীতে কি তৈরী হতে পারে না?—ভাবতে ভাবতে বড় বৌয়ের মনে হলো, তাঁর দেওরের খাবার করতে গিয়ে সেই অমৃতই তৈরী হয়েছে, আর তা হয়েছে দ্রব্যগুণের সঙ্গে তাঁর হাতের রান্নার গুণেই। কিন্তু সে-গুণ তাঁর ছাড়া আছেই-বা-আর কার, তার উপর দশজনকে সে-পরিচয়টা না দিতে পারলেই-বা বাহাদুরি কি!

রাত্রে স্বামী খেতে বসলে তিনি তাঁকে বললেন,—কাল সকালেই পাড়ার দশজনকে নেমন্তন্ন করে এসো, দুপুরবেলা এখানে তাঁরা খাবেন।

স্বামী জিজ্ঞেস করলেন—কেন, কাল আমাদের কোন উৎসবের ঘটা হবে?

স্ত্রী বললেন, তুমি করোই-না যা বলছি। আমি অমৃত রাঁধতে শিখেছি।

স্বামী ভাবলেন, তাঁর স্ত্রীটির নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর জেদের কাছে সে-সন্দেহ টিকল না, তাঁর বারবার তাগিদে বড় ভাইকে পাড়ার দশজনকে খাবার নেমন্তন্ন করে আসতে হলো।

পাড়াপড়শীরা এসে খেতে বসেছেন। তাঁদের পাতে গরম গরম অমৃত দিতে হবে বলে বড় বৌ হাঁড়ি-ভরতি ভুষি, পচা খৈল আর পোড়া খদ উনুনে চড়িয়ে রেখেছেন। আগুনের তাতে তা থেকে বিটকেল দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। লোকজনরা খেতে খেতে বলাবলি করছেন,—রামো রামো! এমন বদগন্ধ আসছে কোত্থেকে? সেই সময়ে বড় বৌ তাঁর অমৃতের ভাণ্ড নিয়েও হাজির। তিনি প্রত্যেকের পাতে এক-এক হাতা অমৃত দিয়ে গেলেন। যাঁরা খেতে বসেছিলেন তাঁরা তখন বুঝলেন, দুর্গন্ধটা আসছে কিসের। সেই গন্ধ এড়াতে গিয়ে কেউ নাকে কাপড় দিলেন, কেউ ঘেন্নায় ন্যাকার করে ফেললেন। সকলেই তখন উঠে পড়তে ব্যস্ত।

বড় বৌ কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। বড় বৌ ভাবতে পারেননি—তাঁর রান্নার গুণে আগে যাতে হয়েছিল দিব্যগন্ধ, তাতেই এমন দুর্গন্ধ হতে পারে। তাঁর সন্দেহ হলো—তবে কি ভুল বুঝেই আমি গরিমা করছিলুম—পচা পোড়া জিনিসে সে-দিব্যগন্ধের খাবার তৈরী হয়েছিল, আর খেতেও হয়েছিল যা অমৃত, আমার হাতের রান্নার গুণে তা হয়নি, হয়েছিল ঠাকুরপোর হাতের ছোঁয়া লেগে? মনের মধ্যেও তিনি জবাব পেলেন—তাই ঠিক, তাই ঠিক। বড় বৌ ছুটে ভরতের কাছে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ থেকে কাকুতির স্বর বের হতে লাগল—ঠাকুরপো, আমার জাত-মান বাঁচাও, তুমিই আমার দেওয়া অখাদ্যকে অমৃত করে নিয়ে খেয়েছ; আজ যাঁদের নেমন্তন্ন করে, এনে খেতে দিয়েছি তাঁদের খাদ্যকে তুমি অমৃত করে দিয়ে যাও, তাঁরা যেন না খেয়ে উঠে না যান।

বড় বৌয়ের কথা শুনে ভরত উঠে গিয়ে

"শাবকটিকে কোলে করে আশ্রমে ফিরে এলুম"

দাঁড়ালেন পাড়াপড়শীদের সামনে। তারপর সকলেই দেখলেন এক আশ্চর্য ব্যাপার,—যাঁর মুখে এতদিন কেউ কোনো কথা শোনেননি সেই জড়-ভরতই হাতজোড় করে বলছেন,—আপনারা উঠবেন না। আপনাদের পাতে যা দেওয়া হয়েছে, আপনারা প্রসন্ন মনে তা মুখে দিন। আমাদের যে দোষ-ত্রুটি হয়েছে, আপনারা তা ক্ষমা করলে আপনাদের ঐ খাবারই হবে অমৃত। কেননা, ক্ষমাই অমৃত। এই বলে ভরত প্রত্যেকের খাবারের পাতে তাঁর হাত ছোঁয়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই নাকে আসতে লাগল চমৎকার সুগন্ধ, আর সেই গন্ধ যে-খাবার থেকে আসছিল, তা মুখে দিয়ে তাঁদের মনে হলো—বাঃ! এ যে অমৃত।

খেয়েদেয়ে উঠে সকলে ভরতকে ঘিরে দাঁড়ালেন। সকলেরই মনে হচ্ছিল—এতদিন যাঁকে আমরা জড় ভরত বলেছি, আজ বুঝলুম, তিনি এক মহাপুরুষ। তাঁর আসল পরিচয় পেতে তখন তাঁদের কৌতূহলের অন্ত নেই, প্রত্যেকেই বলতে লাগলেন, আমরা আপনাকে আগে চিনতে না পেরে হেলা করেছি, বলুন, আপনি কে?

ভরত বললেন,—কে আমি, তা জানতেই জন্ম জন্ম ধরে চেষ্টা করছি। তার মধ্যে তিন জন্মের কথা আমার স্মরণ আছে। তা-ই বলছি।

এই তিন জন্মের প্রথম জন্মে আমি ছিলুম চন্দ্রবংশের রাজা ভরত। বৃদ্ধ বয়সে রাজসিংহাসন ছেড়ে পুলহ-মুনির আশ্রমে গিয়ে সাধন-ভজন করছিলুম। কিন্তু সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করতেই একটি হরিণ-শাবকের মায়ায় পড়ে যোগভ্রষ্ট হলুম। সেই শাবকটিকে কুড়িয়ে এনেছিলুম গণ্ডকী নদীর জল থেকে। আমি তখন গণ্ডকী নদীতে স্নান-তর্পণ করতে গিয়েছিলুম। শাবকটির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার মা মারা গিয়েছিল। শাবকটি জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে দেখে তাকে তুলে কোলে করে আশ্রমে নিয়ে এলুম। তারপর জপ-তপ ছেড়ে তাকে নিয়েই আমার দিন কাটতে লাগল। একদিন আশ্রমের নিকটে বনের কতগুলো হরিণ এসেছিল। হরিণ-শিশুটি তাদের সঙ্গে বনে পালিয়ে গেল। তার খোঁজে আমি চারদিকে ছুটোছুটি করতে লাগলুম। এজন্য আমাকে আহার-নিদ্রাও ত্যাগ করতে হলো। আমার প্রাণ-ত্যাগ হলো সেই হরিণ-শিশুর চিন্তা করতে করতে। তার ফলে আমার জন্ম হলো কালাঞ্জর পর্বতে হরিণ হয়ে। কিন্তু পূর্ব-জন্মে যে-সাধন-ভজন করতে পেরেছিলুম, তাতে হতে পারলুম জাতিস্মর। তাতেই পূর্বজন্মের সব কথা মনে করে আমার আক্ষেপ হতে লাগল। খুঁজে খুঁজে আমি পুলহ-মুনির আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সেখানে গিয়ে মুনিঋষিদের চিনতে পেরে আমার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তাঁদের যাগযজ্ঞ দেখে স্তবস্তুতি শুনে আমার দুঃখও হতে লাগল,—একদিন আমারও তো ঐসব করার শক্তি ছিল। আশ্রমের সকলের সেবার পরে সে-উচ্ছিষ্ট বাইরে ফেলে দেওয়া হতো, তাঁদের প্রসাদ মনে করে আমি তা খেয়ে প্রাণ বাঁচাতুম। পুলহ-মুনি হয়তো আমাকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি আমাকে কোলে টেনে নিয়ে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। একদিন তাঁর পায়ের তলায় শুয়ে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে হরিণ-জন্ম থেকে আমি মুক্তি পেলুম।

তারপর এই জন্ম। সাধু-সঙ্গের গুণে আমার মনুষ্যজন্ম পেয়েছি, আর এবারও জাতিস্মর হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তাই পূর্বজন্মের কথা মনে করে সাবধান হয়ে চলছিলুম। মায়া-মোহ, সুখ-দুঃখ, লজ্জা-ভয়, মান-অপমান কিছুই যাতে টলাতে না পারে সেইজন্যই আমি একমনে ইষ্টনাম স্মরণ করতুম। বাক্য-সংযম করে তাতে সাহায্যও হতো। আমার সে-ব্রত আজ ভঙ্গ হয়েছে। আমার এখানে আর থাকা চলবে না, ব্রত সাঙ্গ করার জন্য আমাকে হরিদ্বারে যেতে হবে।

পরদিন থেকে ভরতকে আর শিবালয়-গ্রামে দেখা গেল না।

বাঁটু

নরেন্দ্র দেব

আনলে খুকু কোত্থেকে এক কাকাতুয়া পাখি;
কোথায় খাঁচা? কোথায় বা দাঁড়? ভাবছে কোথা রাখি?
দেখতে সেটি মন্দ তো নয়, রংটি ফিকে লাল,
মাথায় ঝোঁটন মটুক যেন, রাজার মতোই চাল!
খুকুর কাকু আনলে কিনে একটি দামী দাঁড়,
যত্নে যেন, খুকুর চেয়েও কাকার বেশী চাড়।
আদর করে পাখির তারা নামটি রাখে 'বাঁটু',
ডাকলে তাকে ঝাপটে ডানা করতো হাটু-পাটু।
মটর, ছোলা, কড়াই শুঁটি, খায় সে মিঠে ফল,
পাত্র ভরে রাখতো ওরা পাখির দাঁড়ে জল।

যখন তখন নাচছে 'বাঁটু' ওদের কাঁধে, কোলে,
দেখলে রাগে মা'য়ের যেন অঙ্গ ওঠে জ্বলে!
চেঁচায় বাঁটু কান ফাটিয়ে যখন ক্যাঁ-ক্যাঁ কোরে,
বলেন বাবা, মটকে দেবো ঘাড়টা টিপে ধরে।
বেজায় চোটে সেদিন মা'ও বল্লেন, খুকু আজ,
আপদটাকে বিদেয় করাই আমার প্রথম কাজ!
শুনেই খুকু আকুল কেঁদে বললে, মাগো! শোনো—
একটু যদি চেঁচায় 'বাঁটু',—সেটা কি দোষ কোনও?
'শুনবো না কো তোদের কথা!' বলেন বাবা জোরে,
দেখিস আমি উড়িয়ে দেবো 'বাঁটুকে' কাল ভোরে।

মনের দুঃখে সেদিন খুকু কাঁদলে সারা রাত
চোখের জলে ফুঁপিয়ে শেষে ঘুমিয়ে হ'ল কাত।
গভীর রাতে খিদের চোটে ভাঙলো খুকুর ঘুম,
অন্ধকারে হচ্ছে মনে বাড়িটা নিঃঝুম!
কাদের কথা ফিসির্-ফিসির্ ঢুকলো এসে কানে;
হঠাৎ বাঁটু ডুকরে কেন ডাকছে—কেবা জানে!
উঠলো খুকু বিছনা ছেড়ে, চললো পাশের ঘরে,
রাত্রে বাঁটু সেথায় থাকে, বেরাল পাছে ধরে!
ঢুকেই খুকু সুইচ্ টিপে জ্বালিয়ে দিতে আলো,
দেখলে দুটো দাঁড়িয়ে মানুষ মোষের মতো কালো!

হাঁ করে ঠোঁট চেঁচিয়ে বাঁটু করছে ডাকাডাকি,
ঝোঁটন খাড়া, ল্যাজ ছড়ানো লাফায় ডানা ঝাঁকি!
বুদ্ধি করে বেরিয়ে খুকু দোরটা দিলে এঁটে,
ডাকতে গেল বাপকে—মাকে—দুড়দুড়িয়ে হেঁটে।
বাঁটুর ডাকে আগেই তাঁরা উঠে পড়েছেন জেগে,
বিলিয়ে দেবেন কাল পাখিটা বলছিলেনও রেগে।

বুদ্ধির জয়

শান্তশীল দাশ

খেয়ালী সে রাজা, বিষম খেয়ালী, মেজাজ বোঝাই ভার,
কখন তুষ্ট, কখন রুষ্ট, বোঝে সে সাধ্য কার!
এই হাসিখুশি, বকশিস্ দেন একে ওকে যাকে তাকে,
পরক্ষণেই গম্ভীর মুখ, দেখে ভয়ে প্রাণ কাঁপে।

সেদিন সকালে বেশ খুশি মন, পাত্র মিত্র সাথে
হাসি ও গল্প চলে হরদম, এবং দরাজ হাতে
ছুঁড়ে দেন কত মণি ও মুক্তা সামনে যাকেই পান;
সকলেই খুশি, বয়স্য এক গুন গুন ক'রে গান
গেয়ে ওঠে ভারি মনের আনন্দে; শুনেই ক্ষিপ্ত রাজা,
এই কোন্ হ্যয়, দাও একে শূলে—হঠাৎ দিলেন সাজা।

সব হাসিখুশি নিমেষেতে চুপ; বয়স্য কেঁদে ওঠে,
'ক্ষমা চাই, আর কখনো হবে না'—রাজার চরণে লোটে।

কিছুতে রাজার মন টলে না কো, যতই কান্নাকাটি
করে সে রাজার দু'টি পায়ে ধরে, চোখের জলেতে মাটি
ভিজিয়ে,—হঠাৎ কী খেয়াল হ'ল, বললেন রাজা, শোনো,
যা বলেছি সেই হুকুম আমার থাকবেই তার কোনো
রদ হবে নাকো; তবে এইটুকু করতে তোমায় পারি,
অন্য কোনও রকমে মৃত্যু চাও যদি তবে তারই
ব্যবস্থা আমি করবো, তোমায় দিলাম সুযোগ এই;
বল তাড়াতাড়ি, কীভাবে মরতে চাও তুমি, ক্ষমা নেই

ক্ষণকাল ভেবে বলে বয়স্য মাথা নত করে ভয়ে,
মরতেই যদি হয় মহারাজ, মরবো বৃদ্ধ হয়ে।

খুকুর মুখে ব্যাপার শুনে থানায় করেন ফোন,
ছুটলো কাকু ডাকতে পুলিস, এলও দু'চার জন।
চেঁচায় বাঁটু যে-ঘরে তার দোরটা ওরা খুলে
নে'যায় টেনে চোর দু'টোকে পুলিস-ভ্যানে তুলে।

মা বললেন, ভাগ্যে বাঁটু চেঁচিয়ে ছিল জোরে,
নইলে চোরে সব নিয়ে তো পালিয়ে যেতো ভোরে!
গয়না-গাঁটি বাসন-কোসোন পাশের ঘরেই রাখি,
চেঁচিয়ে বাঁটু না-ডাকলে কি থাকতো কিছু বাকি?
চোর-ধরা এ চতুর পাখি রাখবো আদর ক'রে,
মা'য়ের কথায় উঠলো খুকুর খুশীতে মন ভ'রে।

পড়বে বই-সময় কে?

স্বপনবুড়ো

খোদনের কথা ভেবে ভেবে ইস্কুলের সেকেন্ড-মাস্টার সর্বদমন সরখেলের মাথায় টাক পড়বার দাখিল হল।

ছেলেটা একটু দুর্দান্ত বটে...কিন্তু ওর মগজটা ভারী সাফ! ও-যদি একটু পড়াশোনায় মন দিত—তাহলে স্কুল-ফাইনালে বৃত্তি নিয়ে নিশ্চয়ই এই বিদ্যালয়ের মান অনেকটা উঁচু ধাপে তুলে ধরতে পারত।

সর্বদমন সরখেল সব ছেলেকে শায়েস্তা করেছেন, কিন্তু এই খোদনকে নিয়ে তাঁর মাথা-ব্যথার অন্ত নই।

সেদিন ইস্কুল ছুটির পর সর্বদমনবাবু গেটের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, খোদন একদল ছেলে নিয়ে হন্-হন্ করে এগিয়ে চলেছে।

ইস্কুল-বাড়ির বারান্দা থেকেই তিনি হাঁক দিলেন, "খোদন, দল বেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছে শুনি? গুরুতর রাজকার্য আছে বলে মনে হচ্ছে!"

খোদন এতটুকুও ভড়কালো না। একটু-খানি পেছন ফিরে জবাব দিলে, "স্যার, বড্ড তাড়াতাড়ি। গাঙ্গুলীদের বাগানে মস্ত বড় মৌচাক হয়েছে। এক্ষুনি গিয়ে ওর একটা ব্যবস্থা না করলে বাগ্‌দী পাড়ার ছেলেরা এসে ভেঙে নিয়ে যাবে। যা টাট্‌কা মধু পাওয়া যাবে না স্যার,—আপনাকে এক শিশি দিলেই বুঝতে পারবেন।"

পাছে সর্বদমনবাবু আর কিছু প্রশ্ন করে তাকে দেরী করিয়ে দেন, সেইজন্যে বাক্যবাগীশ খোদনচন্দ্র তার দলবল নিয়ে একেবারে হাওয়া!

পরদিন ক্লাশে সর্বদমনবাবু হুঙ্কার দিলেন, "খোদনচন্দ্র, তোমার অনুবাদের খাতা নিয়ে এসো—"

এতক্ষণ খোদন বেঞ্চের তলায় মাথাটা সেঁধিয়ে বসে ছিল। যেন মাস্টারমশাই তাকে দেখতে না পান।

কিন্তু সর্বদমনের হুমকিকে ভয় করে না—এমন ছাত্র গোটা ইস্কুলে নেই।

শ্রীমান ধীরে ধীরে মাস্টারমশায়ের সামনে এসে দাঁড়ালো। সর্বদমনবাবু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। খোদনের গোটা মুখটা ফুলে যেন একেবারে সাঁত্রাগাছির ওল হয়ে গেছে।

সর্বদমনবাবু আঙুলটাকে এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপার কি খোদনচন্দ্র? তোমার মুখ-চোখের এ অবস্থা কেন?"

জবাব যেন খোদনচন্দ্রের মুখের মধ্যেই পোরা ছিল। বললে, "স্যার, সব ম্যানেজ করে এনেছিলাম। এমন সময় নীচে থেকে একটা ছোঁড়া মৌচাকে ঢিল মেরে বসল! তারই জন্যে ত আমার এই অবস্থা! আপনাকে যে একশিশি মধু এনে দিতে পারলাম না—সে দুঃখু আমার মলেও যাবে না। তবে আপনাকে বলে রাখছি স্যার, মধু আমি আপনাকে খাওয়াবোই—।"

শ্রীমানের অবস্থা দেখে,—আর তার মুখের কথা শুনে—সর্বদমনবাবু হাসবেন-না-কাঁদবেন—ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলেন না। শুধু অবাক হয়ে এই বেপরোয়া বিচ্ছুটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এই ঘটনার দিনচারেক পরের কথা। টিফিনের ঘণ্টায় ইস্কুলের ছেলের দল কেউ লাইব্রেরিতে বসে বই পড়ছে, কেউ গাছের ছায়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে আবার এরই মধ্যে খেলাধুলায় মেতে উঠেছে।

হঠাৎ পেছন দিককার পুকুরের ধারে একটা সোরগোল আর চিৎকার উঠল।

মাস্টারমশাইরা তাঁদের বিশ্রাম-কক্ষের জানলা থেকে তাকিয়ে দেখলেন, একদল ছেলে পুকুরের ধারে জমা হয়েছে আর হাত-পা নেড়ে আরো সবাইকে ডাকছে।

পেয়ারা গাছের ডালে বসেছিল খোদন। ওইদিকে তার নজর পড়তে সে একেবারে লাফিয়ে পড়ল সেই পুকুরের জলে।

একটি অল্প বয়সী নিচু ক্লাশের ছেলে ওই পুকুরের ডুবে যাচ্ছিল। সাঁতারের কলা-কৌশল শ্রীমান খোদনের সব জানা। সে অবলীলাক্রমে ছেলেটির চুল ধরে একেবারে ঘাটলার ধারে এনে হাজির করল।

তখন ছেলের দল আবার চিৎকার শুরু করে দিয়েছে,—কোথায় 'ফার্স্ট এড্ বক্স'—কোথায় ডাক্তার?

খোদন তাদের সবাইকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে বললে, "চ্যাঁচামেচি করিস না কেউ। ছেলেটা অনেকখানি জল খেয়েছে। আগে সেটাকে বের করে ফেলতে হবে।"

মাস্টারমশায়ের দল ততক্ষণে সবাই পুকুরের ধারে এসে হাজির হয়েছেন।

সর্বদমনবাবু হেড মাস্টারমশাইকে চুপি চুপি বললেন "ছেলেটা ডানপিটে বটে, কিন্তু কি রকম কাজের লোক—চোখের ওপর দেখলেন ত? এই জন্যে একটু বেপরোয়া হলেও—ওকে আমি ভালোবাসি—"

হেড মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন, "সবই ত বুঝলাম সর্বদমনবাবু, কিন্তু বিচ্ছুটা যদি একটু পড়াশোনার দিকে মন দিত,—তাহলে আমাদের ইস্কুলের সুনাম বাড়াতে পারত!"

সর্বদমনবাবু শুধু মাথা নাড়েন!

খোদনের কিন্তু কাজের অন্ত নেই।

ওদের পাড়ায় সেই বোধকরি সব চাইতে বাক্যবাগীশ মানুষ। কোন্ কাজে আছে—আর কোন্ কাজে নেই।

খোদনের দলটিও তা নেহাত কম নয়!

সেদিন দল বেঁধেই ওরা ইস্কুলে রওনা হয়েছে।

মাঝপথে মালতী বলে একটি ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ওদের পথ আগলে দাঁড়ালো।

দুহাতে চোখের জল মোছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, "আজ তোমরা কেউ ইস্কুলে যেওনা গো,—আজ আমার বড় বিপদ—"

খোদনই এগিয়ে এসে ওকে ধমক দিল। "তোর আবার কি বিপদ শুনি? দাদুর আদরের নাতনী। সব সময় এটা-ওটা কিনে খাচ্ছিস, আর পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিস। তোর আবার কান্না কিসের রে?"

"খোদন, দলবেঁধে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি?"

তারপর একটু থেমে থেকে টিপ্পনী কাটলে, "হুঁ! বুঝতে পেরেছি। খেলুড়েদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস বুঝি?"

মালতী ওর কোঁকড়া চুল দুলিয়ে জবাব দিলে, "না, গো না। ঝগড়া আবার কোথায়? খেতে খতে আমার দাদু যে হঠাৎ চোখ উলটে মারা গেল। তোমরা দেখবে চলো—"

এই কথা শুনে ছেলের দল চিৎকার করে উঠল। "অ্যাঁ! বুড়ো গঙ্গারাম তাহলে মারা গেল?"

মালতী বললে, "হ্যাঁ গো,—দাদু আমার চিড়ে দিয়ে নারকেল-কোরা খাচ্ছিল। হঠাৎ বিষম লেগে তার চোখ উলটে গেল। আমি কত জল খাওয়ালুম—সব জল গাল বেয়ে পড়ে গেল! পাশের বাড়ির নিস্তারিণী ঠাকমা এসে বললে, দাদু নাকি মরে গেছে! তোমরা সবাই দেখবে চলো না—"

হৈ-হল্লা করতে করতে পড়ুয়ার দল ইস্কুলের পথে এগিয়ে গেল।

শুধু খোদনই কেন জানি, থমকে দাঁড়ালো! মেয়েটা অমন করে হাপুস নয়নে কাঁদছে।—তাকে একা ফেলে চলে যেতে ওর মন চাইলে না। মালতীর হাত ধরে খোদন সিধে বুড়ো গঙ্গারামের বাড়িতে ফিরে এলো।

তারপর ওর কাঁধে চাপল হাজার কাজ। খাটিয়া কেনা, শ্মশানের জন্যে সবকিছু কেনাকাটা করা, শ্মশান-বন্ধু যোগাড় করা, মেয়েটার জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করা—সবকিছু চুকিয়ে মড়া পুড়িয়ে শ্রীমান খোদন যখন বাড়ি ফিরল,—তখন একেবারে নিশুতি রাত।

বাড়ি ফিরে শুনলো, সর্বদমনবাবুর কাছ থেকে দু'বার লোক এসে খবর নিয়ে গেছে—!

যেমন করে হোক্‌—খোদনকে তাঁর চাই!

ছেলের দল স্যারের হুকুম পেয়ে বনে-বাদাড়ে নদীর ধারে গাঙ্গুলীদের বাগানে, মাঠের মাঝখানকার ভুতুড়ে বাড়িতে খোদনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে. খোদনকে পাঁজাকোলা করে ধরে নিয়ে যেতেই হবে।

কিন্তু কোথাও খোদন নেই!! গোটা গাঁয়ে তার হদিস পাওয়া গেল না। সে যেন একেবারে কর্পূরের মতো উপে গেছে!

এই ঘটনার চারদিন পর গাঁয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের মাঠ থেকে একটা হট্টগোল শোনা গেল।

তখন পুরোদমে ইস্কুল চলছে।

সর্বদমনবাবুর দাপটে ছেলেদের টুঁ শব্দ করবার যো'টি নেই। নিজ নিজ ক্লাসে সবাই অঙ্ক, ভূগোল, জ্যামিতি আর ব্যাকরণ নিয়ে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছে।

কিন্তু দক্ষিণের দিকের মাঠের কোলাহলটা কেবলি বেড়ে চলতে লাগলো।

ছেলের দল ইতিউতি চায়!

এমন সময়ে কি ওখানে ফুটবল-ম্যাচ্‌ শুরু হল? ওদের বাদ দিয়েই এই যাচ্ছেতাই ব্যাপার কে করলে?

উসখুস করতে লাগলো সবাই। দু-একজন গিয়ে আবার জানালার ধারে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাইরা হুমকি দিয়ে উঠলেন, "যে যার সিটে গিয়ে বোসো—"

এমন সময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে একটি ছেলে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো, ঢুকে পড়ল এই ইস্কুলে। চোখ দুটো তার আবেগে কাঁপছে—ঠোঁট দুটো থর থর করে নড়ছে, কিন্তু সে কোনো কথা বলতে পারছে না!

সর্বদমনবাবু সবাইকার আগে এগিয়ে এসে, তার ডান হাতটা চেপে ধরে জিজ্ঞেস্‌ করলেন, "কী হয়েছে ওদিকে? তুমি অমন করছ কেন?"

ছেলেটি প্রাণপণ চেষ্টায় বললে, "আজ্ঞে স্যার, খোদনকে গরুতে গুঁতিয়ে দিয়েছে—"

সর্বদমনবাবু হুকুম দিলেন, "যাও

ভুতুড়ে বাড়িতে খোদনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে

তোমরা সবাই, ওকে ধরাধরি করে নিয়ে এসো—"

গোটা ইস্কুল ভেঙে ছেলের দল ছুটল দক্ষিণ মাঠের দিকে।

এই দৌড়ের প্রতিযোগিতায় কেউ পেছু হটতে রাজি নয়।

তারপর কোথায় ডাক্তার,—কোথায় ওষুধ-পত্র, কোথায় ব্যান্ডেজ—সে যেন এক এলাহি কাণ্ড!

আসল ব্যাপারটা ইস্কুলে বসেই জানা গেল।

বাগদীদের এক বৌ ছেলে-হতে গিয়ে মারা যায়। অবাক কাণ্ড—ছেলেটা কিন্তু দিব্যি বেঁচে থাকে!

ছেলেটির ভার কিন্তু কেউ নিতে এগিয়ে আসে না! তিন কুলে কেউ নেই ওদের।

খোদনচন্দ্র বাড়ি থেকে পালিয়ে এইখানে গিয়ে শিশুটির ভার নেয়। পলাতে করে দু'দিন ওকে দুধ খাইয়েছে।

কিন্তু দুধই বা যোগাড় করে কি ভাবে? চারদিকে সর্বদমনবাবুর চর ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আজ ইস্কুল বসবার পর দক্ষিণের মাঠে গিয়ে সে একটি দুধোলো গাইকে দুইতে শুরু করে দেয়। এই গাইটার আবার নতুন বাছুর হয়েছে।

সে ত' একেবারে শিং বাগিয়ে এসে খোদনকে আচ্ছা করে গুঁতিয়ে দিয়েছে।

এখন শ্রীমান খোদনের অবস্থা কাহিল। তার প্রাণ নিয়ে একেবারে যমে-মানুষে টানাটানি।

প্রাণের আশা একরকম ছিল না বললেই হয়।

সাতদিন সর্বদমনবাবু তাঁর বেপরোয়া ছাত্রের শিয়র থেকে একেবারে ওঠেননি।

আজ ডাক্তার এসে রায় দিয়েছেন,—প্রাণের ভয় আর নেই! এ যাত্রা ফাঁড়াটা বুঝি কেটেই গেল।

এরপর আরো কটা দিন ভালোয়-ভালোয় কাটল। পনেরোদিন বাদে খোদন বিছানায় উঠে বসে মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে অন্ন-পথ্য করল।

বিকেলের দিকে ইস্কুলের পর সর্বদমনবাবু তাঁর ডানপিটে ছাত্রটিকে দেখতে এলেন। ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, "আচ্ছা খোদন, তোমার আর কি কি জরুরী কাজ বাকি আছে? বিশ্বকর্মা পুজোয় ঘুড়ি ওড়ানো, বটগাছে পাখির ছানা চুরি, নদীর ধার থেকে কচ্ছপের ডিম সরানো, গাঙের জলে নৌকো বাচ?—তুমি বলে যাও, আমি খাতায় টুকে নিচ্ছি—"

খোদন মাথা নিচু করে বাধ্য ছেলের মতো বললে, "না স্যার, খুব শিক্ষা হয়েছে আমার। আর বন-বাদাড়ে ছুটোছুটি করতে যাবো না।"

তারপর সে নিজের ছোটবোন খেঁদিকে ডেকে বললে, "ওরে খেঁদি, আমার বই-পত্তরগুলো সব রদ্দুরে দে ত—একেবারে ছ্যাতলা পড়ে গেছে।"

সর্বদমনবাবু হো-হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, "তাহলে এত কাণ্ডের ভেতরও তোমার বইয়ের কথা মনে আছে?"

খোদন হাত বাড়িয়ে স্যারের পায়ের-ধুলো নিলে। জবাব দিলে, "এইবার আপনি দেখে নেবেন স্যার। সকাল বিকেল আপনার ঘর থেকে আমি এতটুকু নড়ব না।"

সর্বদমনবাবুর মুখে জয়ের মধুর হাসি। ওর মাথায় হাত রেখে বললেন, "তাহলে আদ্দিন বাদে বই পড়ার সময় হল!"

খোদনেরও রোগ-কাতর মুখটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল!

সে বছর ক্লাশের প্রথম পুরস্কার আর ভালো কাজের সেরা পুরস্কার দুটি খোদনের ভাগ্যেই জুটে গেল।

'বারেক নিরাশ হলে'

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা কী হল জান?—যা এতকালে এত মানুষ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখেছে? তা হ'ল—হার মানব না, হাল ছাড়ব না। চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই। আজ যে কাজটা করা গেল না—তা কাল করা যেতে পারে। কোনদিন সহজে হাল ছাড়েনি বলেই মানুষ ক্রমে দুরন্ত সাগর পার হয়েছে, দূরে শূন্যে পাখা মেলেছে, বজ্রবিদ্যুৎকে কাজে লাগাতে পেরেছে, কঠিন 'শিব-অসাধ্য' রোগেরও ওষুধ বার করেছে। আজ রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের বুক চিরে সে সৃষ্টি-রহস্যও অধিগত করছে।

এই শিক্ষা—এই নিরাশ না হবার শিক্ষাটি আমাদের শিশু-কিশোরদের জীবনেই পাওয়া খুব দরকার। বড় হলে এটা অনেকেই বোঝে; কিন্তু যখন বয়স অল্প থাকে—জ্ঞান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবার সুযোগ যখনও দূরগত, তখন তাদের এই অপরাজেয় মন্ত্রটা শিখিয়ে দেওয়া দরকার। যদি একবার বা দুবার ব্যর্থ হয়েই সব ছেলে হাল ছেড়ে দিত, তাহলে আমরা বহু মহান নেতা, বহু শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিজ্ঞানী চিকিৎসককেই পেতাম না।

ধরো—আমাদের দেশের বোপদেবের কথা। তিনি তো এক আধবারে হাল ছাড়েননি। দীর্ঘ বারো বছর ধরে চেষ্টা করার পরও যখন বর্ণমালা অধিগত করতে পারলেন না—তখনই না তাঁর গুরুমশাই তাঁকে বাড়ি পাঠাচ্ছিলেন, "বাপু হে, লেখাপড়াটা তোমার দ্বারা হবে না, ঘরে গিয়ে হাল ধরো গে।" অথচ সেই লোকই বাড়ি ফেরার পথে (তখন হাঁটাপথ ছাড়া গতি ছিল না) এক কুয়াতলায় জল খেতে গিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের এক বিচিত্র প্রকাশ দেখে এক মুহূর্তে এক আশ্চর্য শিক্ষা লাভ করলেন। দেখলেন, অনবরত মাটির কলসী বসিয়ে বসিয়ে কুয়ার পাশের পাথরের চত্বরেই বড় বড় খোঁদল হয়ে গেছে। বোপদেবের মনে হ'ল, 'ঐ নরম মাটির কলসীর ঘষা লেগে লেগে যদি পাথরে গর্ত হয়, আমার মাথা এমন কি নিরেট যে, অবিরাম চেষ্টাতেও তাতে শিক্ষার দাগ লাগবে না?' তিনি আর বাড়ি গেলেন না, ফিরে গিয়ে গুরুমশাইকে বললেন, "আমাকে আর একবার সুযোগ দিন—আমি ঠিক শিখতে পারব।" আর পারলেনও, বারো বছরের চেষ্টাতে যা সম্ভব হয়নি, অল্পদিনেই তাই হল। সেদিনের সেই গবেট বোপদেব ভাবীকালের শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ বা ব্যাকরণ-প্রণেতা হলেন।

এ রকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায়।

এডিসনের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই? টমাস আল্‌ভা এডিসন—পৃথিবীর সর্বজনপূজ্য বিজ্ঞানী যিনি সমস্ত রকম প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় বিজ্ঞান-চর্চা করে জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এই এডিসনই যখন খুব ছোট—তখন ওঁর স্কুলের শিক্ষক ওঁকে বলেছিলেন, 'তোমার কিছু হবে না বাপু—তোমার মাথায় মাথা বলে কিছু নেই, আছে বালি আর কাঁকর, হয়ত একঝুড়ি গোবর।'

খুব দুঃখ হয়েছিল এডিসনের, বিশ্বাসও হয়েছিল কথাটা। মাস্টারমশাই বলছেন; বিশ্বাস না হবেই বা কেন? কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে মাকে বলেছিলেন কথাটা। কিন্তু মা তো বিশ্বাস করেননি। ছেলের ওপর ছিল তাঁর অগাধ আস্থা। তিনি তখনই কোমর বেঁধে গিয়ে ঝগড়া করেছিলেন সেই মাস্টারমশায়ের সঙ্গে—সেইদিন থেকে ইস্কুলে যাওয়াও বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন ছেলের। বলেছিলেন, "ওঁদের কাজ নয়—আজ থেকে আমিই পড়াব তোকে।"

মার এই অতিরিক্ত আস্থাই সেদিন এডিসনের জীবনে নতুন এক শক্তি সঞ্চার করেছিল। এমন বিশ্বাসের না অমর্যাদা করি—সেদিন থেকে সেইটেই হয়েছিল এডিসনের জীবনের মন্ত্র। লেখাপড়ার দিকে মনও গিয়েছিল তাঁর সেইদিন থেকে। নইলে, তেরো বছর বয়সে যাঁকে জীবিকার জন্য খবরের কাগজ বেচা শুরু করতে হয় (ঐ বয়সেই ছোট হাত-ছাপাখানাতে নিজে সংবাদ সংগ্রহ করে কম্পোজ করে ছেপে বিক্রীর ব্যবস্থাও করেছিলেন দিনকতক) —তিনি ভাবীকালের—ভাবীকালের কেন লোককরি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে বিজ্ঞানী রূপে সম্মানিত হতেন না। ঐ বয়সেই ট্রেনের লগেজভ্যানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে গিয়ে অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে এমন কানমলা খেয়েছিলেন কনডাকটরের কাছে যে, চিরজীবনের মতো কালাই হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তবু এই লোকই তাঁর জীবনে মোট দশ হাজারের ওপর নূতন আবিষ্কারের পেটেন্ট নিতে পেরেছিলেন।

যেসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে আমরা আজ নানারকম সুখসুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছি, তার অধিকাংশই ঐ এডিসনের দান।

এমনি এক ঘটনা পোলিশ সংগীতবিদ্ প্রধানমন্ত্রী প্যাডেরভ্‌স্কীর জীবনেও ঘটেছিল,—যিনি পরবর্তী কালে পিয়ানো বাজিয়ে ইউরোপ আমেরিকা এশিয়ার কোটি কোটি শ্রোতাকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। এঁকেই একদিন শিশুকালে তাঁর সংগীত শিক্ষক বলেছিলেন, "আর যাই হোক তোমার দ্বারা পিয়ানো-বাজনা কোন কালে হবে না। যদি একান্তই শখ হয়ে থাকে কোন বাজনা শেখবার তো তম্বুরীন কি ঢোলক—বা ঐ রকম কিছু শেখো গে।"

যিনি বলেছিলেন তিনি খুব নাম-করা শিক্ষক—অন্য যে কোন ছাত্র হলে হাল ছেড়ে দিত এই কথায়। কিন্তু প্যাডেরভস্কী একটুও বিচলিত হননি। শুধু 'রেওয়াজ' বা অভ্যাসের সময়টা আরও অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। এবং তারপর থেকে যখনই কোন নামকরা বাজিয়ের বাজনা শুনতেন, তখনই এক মনে লক্ষ্য করতেন—কী কৌশলে তিনি ঐ বাদ্যযন্ত্রটির ওপর তাঁর দখল বজায় রেখেছেন। ফলে তিনি যে পরবর্তী কালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাজিয়ে হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়—দেশবিদেশ থেকে সম্মানের পর সম্মান বর্ষিত হয়েছিল তাও নয়—তাঁর নিজের খ্যাতির দ্বারা তিনি পরাধীন নির্যাতিত পোল্যাণ্ডেরও অনেক উপকার করতে পেরেছিলেন। আর তার ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন! যদিও ফ্রান্সের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্সো খবরটা শুনে খুশী হতে পারেননি। বলেছিলেন, "ছি ছি, কী অধঃপতন! সংগীত সম্রাট প্যাডেরভ্‌স্কী কিনা সামান্য একটা প্রধানমন্ত্রীর পদ নিলেন!"

বিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক বেনজামিন ডিজরেলী যখন প্রথম দিন বিলেতের লোকসভায় বক্তৃতা দিতে ওঠেন তখন তাঁর বলবার হাস্যকর ভঙ্গী এবং ভাষায় সবাই মিলে ঠাট্টা করে হেসে চেঁচিয়ে তাঁকে বসিয়ে দিয়েছিল, বহু চেষ্টা করেও বক্তব্য তিনি কাউকে শোনাতে পারেননি। শেষে গোলমাল অসহ্য হওয়াতে যখন স্পীকার তাঁকে বসতে ইঙ্গিত করলেন, তখন তিনি দৃঢ় অথচ প্রশান্ত কণ্ঠে এই বলে শেষ করলেন যে, "আজ আমি বসছি। আজ কেউ আমার কথা শুনলেন না বটে কিন্তু একদিন আপনাদের শুনতেই হবে, তা জেনে রাখুন। একদিন শোনাবই আমি!"

আর তা শুনিয়েও ছিলেন। পরবর্তী কালে মন্ত্রমুগ্ধের মতোই বসে শুনত সকলে ডিজরেলীর বক্তৃতা। এই ডিজরেলী একাধিকবার ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। রাজনীতিক ও রাষ্ট্রনায়ক হিসাব তাঁর খ্যাতি আজও অম্লান আছে।

বাণপ্রস্থ

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

প্রাণগোবিন্দে—পড়া শিখেছিস্? চিবোচ্ছিস্ কি আমলকী?
কিরে চক্ষু যে কপালে উঠলো? শ্বাসপ্রশ্বাস থামল কী!
ওরে হতভাগা গজকচ্ছপ—বিচ্ছেদ কর সন্ধিকে—
তুই বল দেখি কাবলাকান্ত—মধ্যস্থল কোনদিকে?
ঘাড় নিচু করে বই দেখছিস্ কেরে তুই ঘাড়ে গন্দানে?
মেরে ফেলে দেবো—অমর ত নোস শিবঠাকুরের বরদানে।
ট্যাংরার মাঠে টেনে নিয়ে যাবো তোকে জীবন্ত গোর দিতে
মাটির তলায় ড্যাম্প লেগে শেষে ভুগবি বাত আর সর্দিতে।
লাস্টবেঞ্চ থেকে ঢিল ছুড়ল কে সকলে চেপে ধর তাকে
প্রসেশন করে যমের বাড়িতে পৌঁছিয়ে দে তো কর্তাকে।

মুখটা লুকিয়ে বাদাম খায় কে? পেট ভরে খাবি ঘাস তা না
গলায় একটা ঘন্টা ঝুলিয়ে গোয়ালে গাড়গে আস্তানা।
অপঘাতে নয় প্রাণটা হারাবি আমার হাতেই পিস্তলে।
নিস্তার নাই পালিয়ে বেড়ালে জঙ্গলে জলে কি স্থলে।
ইতিহাসে তোর নাম লেখা রবে ক্যারেট সোনার অক্ষরে
প্রাণ দিয়েছিস শিক্ষার তরে—কবিতা বেরুবে শোক করে।
হাসছিস কেরে? গণশা নাকি রে? নরম কোরবো শক্তকে
চিরেতার জলে গাম গুলে দিয়ে জোলাপ খাওয়াবো থক্‌থকে।
ওদিকে কে যেন হাইবেঞ্চেতে তাল বাজাচ্ছে কাহারবা
বাবরীটা চেঁছে রাবড়ী ঢালবো নেড়া মাথাটায় তাহার বা
বকের মতন বাঁকা করে কেরে দেখালি হঠাৎ হস্তকে?
মুণ্ডুটা কেটে নিয়ে আয় দেখি, গেণ্ডুয়া খেলি মস্তকে।
মনে করেছিস কিছু দেখছি না মুখ ভ্যাংচালি সংকেতে
শূন্যের চেয়ে কম নম্বর পাস ত এদিকে অংকেতে!
কিরকম করে ফুলমার্ক পায় শেখাবো পরাণ বন্ধুকে
সামনেতে এসে বুক পেতে দাঁড়া, গুলিটা ভরে-নি বন্দুকে।
ফিসফিস্ করে কথা কইছিস্ খুলীটা চাঁচবো খাঁস্‌কাপে
একটা বিশেষ নোংরা দ্রব্য ঢালবো ভরিয়ে ডিসকাপে।
কোণ ঘেঁষে বসে নাটক নভেল পড়ছিস বুঝি ধূর্জটি
বলতে পারিস কেন পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে সূর্যটি?
প্যাক করে তোকে পোস্ট করে দেবো পার্শেল করে পাঞ্জাবে
ডাকবাক্সেতে দুদিন পরেই দম আটকিয়ে প্রাণ যাবে।
মরে গিয়ে তুই হিম হলি নাকি? চোখে পড়ছে না পলক কি?
হাঁ করে আমার মুখের পানে যে চেয়ে রয়েছিস অলক্ষ্মী!
পাকিস্তানেতে পাচার কোরবো পার করে দিয়ে দর্শনা
টইকা পারিয়ে বুঝিয়ে ছাড়বে সেটা যে ভারতবর্ষ না।
ওরে ওই গবা না পারিস যদি করতে এটার তর্জমা
গোবর পালটে তোর মগজেতে ঢোকাবো গাওয়া ঘি সর-জমা।
যাবজ্জীবন ফাঁসি দিয়ে শেষে পাঠাবো বিন্ধ্য পর্বতে
বিনি পয়সাতে বরফ গিলবি মিশিয়ে ঘোলের সরবতে।
মরে ভুত হয়ে আস্তাকুড়েতে বেড়াবি যখন ফ্যান চেটে
ঘাড় ধোরে তোর আত্মাকে এনে কবুল করাবো 'প্ল্যানচেটে'।
এমন কঠিন শাস্তি দিলাম, করছিস তবু ইয়ার্কি?
রাগের মাথায় মারতে মারতে শেষে মেরে ফেলেদি আরকি!
আমার নাকের গর্ত দুটোকে টেনে ধর দেখি অশ্বিনী
বড্ড কেমন করছে প্রাণটা, একটিপ্ কড়া নস্যি নি।
গোটা মাছটাই খেয়েছি আজকে একটু দিইনি ভার্যারে
প্রত্যেকদিন ফাঁকি দিয়ে বলে মাছ খেয়ে গেছে মার্জারে
খাওয়া শেষ করে ওঠার আগেই হাতে এনে দেয় হরতকী
আমি বলে তাই ক্ষমা করি তাকে—আর কেউ হলে করত কী?
খাওয়াটা একটু বেশী হয়ে গেছে ছাতি ফেটে গেলো তেষ্টাতে
পানটা চিবিয়ে একটু জিরোই—ঘুম এসে গেলে শেষটাতে
লক্ষ্য রাখিস্—বিপদ বুঝলে ডেকে তুলে দিস্ মন্মথ
ক্লাশের মধ্যে কেবল তুই যে ছাত্র আমার মন মত।
রাজ্যের পড়া শিখিয়েছি আজ—একটু দুচোখ এক করি
হেডমাস্টার কোন ক্লাশে গেছে—দেখত একটু এককড়ি।
বেজায় খাটুনী গেছে ভোর থেকে—বেদনা ধরেছে পাঁজরাতে
খাটিয়াটাতে যা ছারপোকা বাবাঃ ঘুম ভেঙেছিল মাঝরাতে।
খুঁচিয়ে মেরেছি সব বেটাদের—আমার সাধের শয্যাতে
এত কষ্টের রক্ত আমার শুষতে পারে না রোজ রাতে।
তোরা সকলে মন দিয়ে পড়—যদি বা একটু নাক ডাকে
দূর থেকে সেটা শোনা যাবে নাকো—তাহলে তোদের হাঁকডাকে—
—অ্যা—অ্যা—হুস্—ঘর্ ঘর্ ভুস্, যো না ভাই গবা বৈকুণ্ঠকে
চেয়ারের পিছে টিকিটা ঝুলছে জবাফুলে বাঁধা টুকটুকে
গোড়াটা হাবসে কাঁচিটা চালাবি, প্ল্যানটা কর না কার্যত
খাদ্যদ্রব্য সব তোকে দেবো, পকেটেতে আছে যার যত।
এতদিন ধরে আমাদের শুধু দিয়েছিস মিছে পাট্টি কি?
—খুব সাবধান, পাটিপে চল না—তাড়াতাড়ি করে কাট টিকি
পালাতে পারলে পালা হতভাগা—না হলে মন দে পুস্তকে
এক্ষুনি নয়, ঘণ্টা পড়লে সকলে দেবো ঘুষ তোকে—)।
—আঃ—উহ্—ওঃ—পড়ছিস্ তোরা—অটল আছিস্ আদর্শে?
গবাটা কোথায় ক্লাশে দেখছি না? কোথায় পালালো বাঁদর সে?
এ্যাঁ একি কই? আমার টিকিটা? খুঁজে পাচ্ছি না মস্তকে
গোব্রাহ্মণের ব্রহ্মতালুতে করেছে নাস্ত হস্ত কে?

টেবিলে এটা কি? এ যে সেই টিকি! পিতৃনের টিকি সম্মুখে!
সকলের চোখ এড়িয়ে এখন বেরিয়ে পালাবো কোন মুখে
রটে গেলে লোকে বলবে কি? ছিঃ ছিঃ! ছেড়ে দিতে হবে মাস্টারী
মুদির দোকানে একগলা দেনা—মাইনে পাবো না মাসটারই।
আমাকে এমন জব্দ করল গবা হতভাগা বজ্জাতে
দেশ ছেড়ে আজি চলে যেতে হবে—মুখ দেখাবো না লজ্জাতে।
গৃহত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসী হবো—সাধনা করবো নির্জনে
"পঞ্চাশোর্ধে বনং ব্রজেৎ" বলেছেন সুধী বীরজনে—॥

সন্দেশ রসগোল্লা পান্তুয়া কোনটাই লাগে না। কোনটাতেই আমার তত তৃপ্তি নেই যেমন ছিল কুল্পিতে। কুল্পি বরফ পেলে আমি আর কিছু চাই না। ছোট ছোট পিরামিডের মতন গড়ন—কোনোটা সফেদ সাদা, কোনোটার ক্ষীরের রঙ কোনোটা ঈষৎ সবুজ, আহা, ভাবতে ভাবতে তেষ্টা পেয়ে যেত। কী ভালই যে লাগতো কুল্পি বরফটিকে পিরামিডের মত দাঁড় করিয়ে ছুঁচোলো দিকটি ঠোঁটের মধ্যে নিতে!

কানের পাশে জুল্পি
ভালবাসে কুল্পি

দাদু ছড়া বেঁধে দিলে। আমার নাকি কানের পাশে বড় জুল্পি ছিল। জুল্পি কাকে বলে তাও তখন জানতুম না। তবে কপালের দুপাশ দিয়ে লম্বা দুগোছা চুল ঝুলতো আমার মুখে। হরি চুল কাটার সময় কাঁচি চালাতো তার ওপর দিয়ে। তারপর আবার বড় হতো—কম করে হলেও আবার তিন মাস। তিন মাসের আগে কাটতুমই না চুল।

আমি ত ছড়ায় উত্তর দিতে পারতুম না। মা তাই শিখিয়ে দিলেন, বল না;

যার আছে জুল্পি
তাকে দাও কুল্পি।

দাদু শুনেই ত হো হো করে এমন হাসলো যে, মুখের মধ্যে যে তিনটি মাত্র দাঁত, তাও দেখা গেল। একপাশে দুটি আর একপাশে একটি।

দাঁড়াও, আসুক বংকা, কত খেতে পারিস দেখা যাবে, বললে দাদু। বংকা হচ্ছে বিখ্যাত কুল্পি-শিল্পী, মানে কুল্পি কারিগর, মানে কুল্পিওলা। আইঢাই গরমে তার হামেশা যাতায়াত আমাদের পাড়ায়। বংকা নামটা খারাপ হলে কি হবে, আর নামটা ত আসলে বংকা নয়, হয়ত বংকু-বিহারী কিংবা বঙ্কিম হবে, আমরাই তার আটপৌরে নাম দিয়েছি বংকা। তা হোক, বংকার হাতের গুণ আছে। তার একটা কুল্পি মালাই খেলেই বাস, ঠান্ডা! পয়সা হাতে পেলেই বংকার অপেক্ষায় বসে থাকি। তবে পয়সা পাওয়া শস্তা নয় যে, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। হাত পাতলেও পাওয়া শক্ত। দাদুর কাছে, মার কাছে, বাবার কাছে তিরিশবার হাত পেতে হয়ত পেলুম তিনটি পয়সা।

সেবার খুব আইঢাই গরম, আদুড় গায়ে ঘুরে বেড়ানো আর শুধু ঢক ঢক-জল খাবার সময়। ঘরে টেকা দায়, তাই হাতে বাংলা "রবিনসন ক্রুশো"খানা নিয়ে বাতাবি-লেবু তলায় পা ছড়িয়ে বসেছি। বই-এর একটা পাতা খুলে আছি আর মনে দেখছি কোন ঢেউ-জাগা অচিন সাগরের বুকে নির্জন একটা দ্বীপে পাতা-ছাওয়া একটি কুঁড়ে-ঘরের ছবি। এমন সময় বংকার পরিচিত গলার আওয়াজ—মালাই বরো-ও-প......।

তড়াক করে কখন লাফিয়ে উঠেছি জানি না। দেব নাকি বাবু—বললে বংকা। শার্টের পকেটগুলো এক নিশ্বাসে হাতড়ে ফেললুম, কিন্তু কিছুই বেরুলো না হাতে। মুখটা আমার বাংলা পাঁচের মত হয়ে গেল। বংকা বললে—আজ ভাল কুল্পি ছিল বাবু, কিন্তু পয়সা চাই, ধারে আজ দিতে পারব না। বংকা চলে গেল, তার মাথার লাল কাপড় জড়ানো হাঁড়িটা আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনে মনে ভাবছি, পয়সা পকেট-ভর্তি থাকে না কেন? পয়সা যদি পাই, তাহলে আর কিছু না, বংকার মত কুল্পির ব্যবসা করবো, বেশ ইচ্ছামত খাওয়া যাবে। আর নয়তো আইসক্রীম আপিসের কেরানী হবো।

মাথায় কত কি খেলছে—কিন্তু ও কে? রাস্তা দিয়ে যায় কে? থপথপে বুড়ো মনে

দাদু খোকা এক পেল্লায় জীবন্ত কুল্পি

হচ্ছে—নাকি, বুড়িও হতে পারে। মাথায় কাপড় জড়ানো, গায়ে চাদর লেপটানো। কাপড়টা লুঙ্গির মত পরা। হাতে একটা বড় পোঁটলা, এত ভারি যে, সইতে পারছে না। আহা, ওকে একটু সাহায্য করলে হয়।

গেলাম এগিয়ে। বললুম—ও মশাই, আমি এটা বয়ে দিচ্ছি চলুন। কোন্ দিকে যাবেন?

লোকটি তাকালো আমার দিকে। দাড়ি-গোঁফ নেই, বেশ চাঁচাছোলা মুখটি, অথচ একটিও দাঁত নেই বলে মনে হলো। আমার দিকে তাকিয়ে বললে—বাঃ, বেশ ছেলেটি। লোকের কষ্ট দেখলে মন কেমন করে। তা তুমি কি ভাবছিলে বাবা?

আমি? আমি ভাবছিলুম, কুল্পি তৈরি করবো—কিনে খাবার ত পয়সা নেই। লোকটি বললে—ভালবাস বুঝি খুব? বললুম—তা আর বলতে! পেস্তা-বাদাম দিয়ে মালাই বরফ—এর তুল্য আর কিছু আছে নাকি?

তা এর জন্যে এত ভাবনা কি? সহজেই ত পেতে পার। লোকটি বললে—আচ্ছা দেখি তোমার হাত দুটো—এই পাথরটা দুহাতে ধরো দিকি।

একটা তেলা চকচকে পাথর দুহাত দিয়ে ধরলুম। কী ঠান্ডা! লোকটি বিড় বিড় করে কি যেন বললে। একটু পরে বললে—যাও, হয়ে গেছে। আমি বললুম—কি হয়ে গেছে? সে বললে—এবার যা হাত দিয়ে ছোঁবে, তাই কুল্পি হয়ে যাবে।

তাই নাকি? মনে ভাবলুম, লোকটা নির্ঘাৎ কোনো ঠগ হবে। কথার ভড়াক দিয়ে কিছু আদায় করার মতলব। কিন্তু, কই, কিছু চাইলে না ত! ঐ ত পোঁটলা নিয়ে গুটি গুটি পায়ে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখি তা পরীক্ষা করে লোকটার কথা সত্যি কিনা।

ধরলুম একটা ইঁটের ঢেলা, বেশ চেপে ধরেছি। ওমা—আ......হুই করে একটা শব্দ হলো, আর দেখি হাতে একটা সত্যি কুল্পি, টিনের ঠোঙাসুদ্ধু, ঠান্ডা কনকন করছে। খেয়ে দেখলুম, চমৎকার স্বাদ, কোথায় লাগে বংকা। তারপর পর পর গোটা পাঁচেক ইঁটের ঢেলাকে কুল্পি বানালুম আর খেলুম।

মনটা বেলুনের মত ফুলে উঠেছে তখন। আমিই বা কে, আর—কার নাম করবো—আকবর বা আলেকজান্ডার? মোট কথা আমি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্রাট—সবই আমার করায়ত্ত। এই বলে একটা বাঁশের টুকরোকে করায়ত্ত করলুম। আশ্চর্য, সেটাও হুই শব্দ করে একটা লম্বা কুল্পি হয়ে পড়লো।

গাঙ্গুলীদের বাগানে সাঁরি সাঁরি শালের খুঁটি দিয়ে বেড়া দেওয়া। কি খেয়াল হলো খুঁটিগুলো একটা-একটা করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেলুম। ওমা, সেই হুই শব্দ আর সংগে সংগে খুঁটিগুলো কুল্পি হয়ে—যেমন ছিল—খাড়া হয়ে রইলো। গুনে দেখি, মোট তেরটি—আনন্দের সংগে ভয়ও হলো। গাঙ্গুলীমশাই যদি দেখে ফেলে, তাহলে আর আমায় আস্ত রাখবে না। কেটে পড়লুম সেখান থেকে।

কিছুদূর যেতেই দেখি দাদু আসছে। আমায় দেখে দাদু বললে—শোন, শোন বিজু, আজ বংকাকে অর্ডার দিয়েছি—

ছ্যাঁচড়া

জীবন ভৌমিক

টিকিট খ‍ুঁজে না পেয়ে পিকল‍ু বাড়িটাকে একেবারে এসেম্‌ব্‌লী বানিয়ে দিলে। সে এক হৈ-হৈ কান্ড, জগঝম্প ব্যাপার! সত্যিই ত, করবে না-ই বা কেন! দাদার মেম্বারশিপ কার্ডে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখবার আশায় সারা বছর সে দাদার ফাই-ফরমাশ খেটেছে, আর সেই দাদা-ই কিনা চীনের মত বিশ্বাসঘাতকতা করল!

অফিসে যাবার আগে পিকল‍ুর দাদা বলে গিয়েছিল যে, ডান দিকের ড্রয়ারে টিকিট রেখে যাবে। অথচ রেখে যায়নি। পিকল‍ু পাগলের মত হাউ মাউ করে চিৎকার করছে,—"ইচ্ছে করেই রাখেনি, নির্ঘাৎ নিজে গিয়ে মাঠে বসেছে এতক্ষণে—ইস্‌।" পিকল‍ু আপশোষে হাত কামড়াচ্ছে। বই-পত্তর, বিছানা-টিছানা সব তছ্‌নছ্‌ করে খ‍ুঁজছে। যদি অন্য কোথাও রেখে গিয়ে থাকে—এই আশায়। এদিকে হাতে আর মাত্র আধ ঘন্টা সময়।

বিলে এসে বললে—"চল্‌ তার চেয়ে রিলে শ‍ুনিগে।"

কোনও কথা না বলে পিকল‍ু রিলে-রেসের মত দৌড়ে বেরিয়ে গেল। সোজা একেবারে ঘেণ্টুদার দোকানের টেলিফোন তুলে বললে—"ডবল ফোর ডবল টু ডবল জিরো : হ্যালো—দাদা, আমি পিকল‍ু—খেলার টিকিট পাচ্ছি না,...কোনও মানে হয়—এ্যাঁ—তোমার হাওয়াই শার্টের পকেটে—ওঃ—ইস্‌।" বলেই দৌড়।

"এই টেলিফোন করার পয়সা দিয়ে গেলি না?—এই—এই—" বলে ঘেণ্টুদাও পিছ‍ু পিছ‍ু কিছ‍ু ছ‍ুটল।

বাড়িতে এসে দাদার হাওয়াই শার্টের পকেটে হাত ঢ‍ুকিয়ে সব‍ুজ রঙের বড় টিকিটটা নিয়েই দৌড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল পিকল‍ু। ঠিক এমন সময় 'হ্যাঁচ্চো'।

ঘেণ্টুদাও পিছ‍ু পিছ‍ু ছ‍ুটল

বিলেটার কান্ড। ঠাকুমা পিকল‍ুর হাত ধরে বললে,—"হাঁচি পড়েছে ভাই, দ‍ু' মিনিট বসে যা মানিক আমার।"

"দ‍ু' সেকেন্ড বসা চলবে না আমার—দ‍ুপ‍ুর বেলায় তেঁত‍ুল জল দিয়ে ফ‍ুচকা গিলে বিলেটা ফ্যাচ-ফ্যাচোনি হাঁচবে আর তার জন্যে আমার খেলা দেখাটা বন্ধ হবে!"—বলেই পিকল‍ু স্প‍ুটনিকের মত বেরিয়ে গেল এবং একটা চলন্ত বাসের দরজায় যে লোকটা ঝ‍ুলছিল তার গলা ধরে পিকল‍ু ঝ‍ুলে পড়ল। "এই কর কি—কর কি! আমার গলায় যে লাগছে", বলে লোকটা কেঁউ কেঁউ করে চেঁচিয়ে উঠল।

"তা একট‍ু লাগবে বৈ-কি দাদা—আপনি ভাল করে রড ধরে রাখ‍ুন, তা না হলে দ‍ুজনেই"—বলে পিকল‍ু সেই লোকটার পিঠে লেপটে রইল।

বাস থেকে নেমে খেলার টিকিটটা হাতের ম‍ুঠোয় নিয়ে পিকল‍ু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছ‍ুটতে লাগল। বাদামওয়ালার ঝ‍ুড়ি ফেলে বরফ-ওয়ালাকে ধাক্কা মেরে, তিনটে নর্দমা ডিঙিয়ে, মাঠের গেটের কাছে পেঁৗছিয়ে, সে জিভ বের করে হাঁপাতে লাগল। গেটের কাছে যে ছিল সে বললে,—"কই, টিকিট দেখি খোকা, তাড়াতাড়ি ঢ‍ুকে যাও, সময় হয়ে গেছে।"

হাতের ম‍ুঠো খ‍ুলে পিকল‍ু টিকিটটা লোকটাকে দেখাতেই সে বললে,—"এ-কী খোকা, এ-ত নেতাজীর টিকিট, কাল সকালে নিউ এম্পায়ারে হবে।—ভাল করে দেখেটেখে আসবে ত!" পিকল‍ু ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললে।

বাড়িতে ফিরতেই দাদা বললেন,—"হতচ্ছাড়া, ডান পকেটে খেলার টিকিট ছিল দেখতে পাওনি?"

বিলে বললে—"আমার হাঁচি মানল না, ঠাক‍ুমার কথা শ‍ুনল না—এমনটা ত হবেই।"

পিকল‍ু বিলের দিকে কটমট করে তাকাল—যেন বিলেকে সে গিলে খাবে।

ওকি? কি ভাবছিস অমন করে? দেখি, এদিকে ফের, দেখি তোর হাত দ‍ুটো, পেছনে হাত রেখেছিস কেন?

দাদ‍ু জোর করে হাত দ‍ুটো এমন টানলে যে, আর-একট‍ু হলে যেত‍ুম পড়ে। টাল সামলাতে গিয়ে ধরে ফেলল‍ুম দাদ‍ুকে। কিন্তু সেই ম‍ুহূর্তে ঘটে গেল এক কান্ড। হ‍ুস্‌ করে সেই মিষ্টি শব্দ আর দাদ‍ুকে দাদ‍ু—সোজা এক পেল্লায় সাইজের জীবন্ত কুলপি। চোঙার মাথা ছাপিয়ে মালাই উপচে পড়ছে—যেন গলা পাকা চুল। হাত-পা ঠিকই আছে, চোখ-ম‍ুখ-কান সবই আছে, তবে আবছা আবছা। ভয়ে বলে ফেলল‍ুম—আঁ, একি হলো? দাদ‍ু বললে—বড্ড ঠান্ডা লাগছে রে।

তখন মনের দ‍ুঃখে চেঁচিয়ে বলি—ও দাদ‍ু, তুমি যে কুলপি হয়ে গেছ গো!

দাদ‍ু বললে—অ্যাঁ, তাই নাকি? ও বিজ‍ু, কি করলি আমায়! আমায় খেয়ে ফেলবি নাকি? ওরে আমি যে গড়গড়ায় তামাক সেজে রেখে এলাম রে। ওরে আমার যে এখনও আফিং খাওয়া হয়নি—ও বিজ‍ু, বাঁচা আমায়, গরমে আমি ব‍ুঝি গলে জল হয়ে যাবো—

সত্যিই ত, কুলপি কতক্ষণ আর থাকতে পারে গরমে? দাদ‍ুর মাথা ইতিমধ্যে টস্‌ টস্‌ করে খসে পড়তে আরম্ভ করেছে।

মাথায় একটা ব‍ুদ্ধি এলো, দাদ‍ুর হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে আনল‍ুম বাড়িতে। সেখানে চালাঘরে একটা কাঠের সিন্দ‍ুক পড়েছিল, তার ডালা খ‍ুলে দাদ‍ুকে ভরে দিল‍ুম তার মধ্যে। এবার চাই বরফ, প্রচুর বরফ—বঙ্কার হাঁড়িতে যেমন থাকে। কিন্তু বিভ্রাট হলো দাদ‍ুকে নিয়ে। কিছ‍ুতেই সিন্দ‍ুকে বন্ধ থাকবে না দাদ‍ু। আমাকে ধরে টানাটানি—দাদ‍ু বেরিয়ে আসবে, আমিও আসতে দেব না।

টানাটানির ফলে আমারই চোখ খ‍ুলে গেল। চেয়ে দেখি দাদ‍ু আমায় টানছে।—ওঠরে বিজ‍ু, তোর জন্যে কি এনেছি দ্যাখ, জ‍ুলপির সঙ্গে কুলপি মিলবে এবার। চেয়ে দেখি, বঙ্কা কুলপি নিয়ে আমার দিকে হাত বাড়াচ্ছে—ওরে বাপস্‌, আবার কুলপি! তড়াক করে উঠে টেনে ছ‍ুট দিলাম লেব‍ুতলা থেকে। একেবারে ঘরে এসে খিল দিয়ে এক লাফে বিছানায়।

জানতে হবে

হাসিরাশি দেবী

রাম-রাবণে যখন হ'ল য‍ুদ্ধ—
দেখতে কি তাই এসেছিল মান‍ুষ পাড়াস‍ুদ্ধ?
সম‍ুদ্র কি হেদোর মতই বড়,
চার পাশে তার সবাই হ'ত জড়
সকাল-বিকেল-সন্ধেবেলা,—রোজ,
চলতো কি সব হন‍ুমান
আর জাম্ব‍ুমানের ভোজ?
রাবণরাজার কোন্‌টা মাথার ক্যাপ—?
অশোকবনের কোথায় আছে ম্যাপ?
সীতা ছিলেন বন্দিনী কোনখানে?
সেই কাহিনী ঠিক্‌ বল কে জানে?
আজ শ‍ুধ‍ু তার ঠিকানাটা ট‍ুকে,
রেখে দেব আমার এ নোটব‍ুকে॥

দেবী দুর্গা

শ্রীশান্তি ঠাকুর

দেবী ভাগবত' নামে পুরাণ এবং 'দুর্গা-সপ্তশতী'তে দেবী ভগবতীর নাম এবং গল্পের অন্ত নেই। মহামায়া, পার্বতী, অপর্ণা, উমা, হৈমবতী, গিরিজা, দুর্গা—সবই ভগবতীর নাম। দুর্গানাম কেমন করে হলো সেই গল্পই বলবো।

দুর্গম নামে এক অসুর ছিল। ভীষণ তার প্রতাপ। দুর্গমের শক্তি ও সাহস দেখে দেবতারা তো ভয়ে অস্থির। দুর্গমকে জয় করবার শক্তি কোন দেবতারই নেই। ব্রহ্মার তপস্যা করে দুর্গম ব্রহ্মাকে বলেছিল, 'ঠাকুর আমায় বেদের অধিকার দাও।' ব্রহ্মা বললেন, 'তথাস্তু',—মানে তাই হবে। সেই থেকে বেদের অধিকারী হয়ে প্রবল প্রতাপশালী হয়ে উঠলো দুর্গম।

সম্পূর্ণ বেদে তার অধিকার। কাউকে সে ভয় করে না। অসুরের হাতে পড়ে বৈদিক ক্রিয়া অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, পূজো, আর্চা সব নষ্ট হতে লাগলো। যজ্ঞে আহুতি দিলে সেই ধোঁয়া উপরে উঠে সূর্যকে সন্তুষ্ট করে। সূর্য খুশী হয়ে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে মেঘের সৃষ্টি করেন। মেঘ আবার বৃষ্টিরূপে নেমে এসে পৃথিবীতে শস্য ফলিয়ে লোকের প্রাণ বাঁচায়। সুতরাং যজ্ঞ নষ্ট হওয়াতে শস্যও নষ্ট হতে আরম্ভ করলো। সারা পৃথিবীতে হাহাকার পড়ে গেল। বৃষ্টিহীন পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হলো। পশু-পক্ষীও জল না পেয়ে, খাবার না পেয়ে শুকিয়ে মরতে লাগলো। ঘরে ঘরে লোকও মরতে লাগলো।

ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে অবশেষে ব্রাহ্মণেরা ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করলেন। দেবী ভগবতী প্রসন্ন হয়ে দেখা দিলেন। ভগবতীর রূপ কিন্তু ঠিক মানুষের মত নয়। সে রূপ যেন একটা আলোর ঝলক। হাজারটা তাঁর চোখ। দেবীর হাতে ছিল ধনুক, স্বর্গীয় ফল ও ফুল। মানুষের দুঃখ দেখে করুণাময়ী মায়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ন'দিন পর্যন্ত এই চোখের জল থামেনি। মহালয়ার দিন মা দেখা দিলেন। মহালয়া থেকে নবমী পর্যন্ত, ন'দিনকে বলে নবরাত্র। শতশত চোখ থেকে অশ্রুর ধারা বৃষ্টিরূপে ন'দিন ধরে ঝরে পড়লো পৃথিবীর বুকে। সবাই সতেজ হয়ে উঠলো। নদী আর সমুদ্র হলো জলে পরিপূর্ণ। দুর্ভিক্ষের হাহাকার আর রইলো না। শত শত চোখ থেকে মায়ের জল পড়েছিল বলে দেবীর এক নাম শতাক্ষী। ফলমূল এবং শাক খাইয়ে প্রাণীদের প্রাণ বাঁচালেন বলে তাঁর আর এক নাম হলো শাকম্ভরী। হিমালয়ের কোলে গাড়োয়াল রাজ্যে ত্রিযুগীনারায়ণ তীর্থের পথে আজও শাকম্ভরীর মন্দির রয়েছে।

দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই?' সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং দেবতা একসঙ্গে প্রার্থনা জানালেন,—'দুর্গমের কাছ থেকে বেদকে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

ব্রহ্মার তপস্যা করে বহু কষ্টে বেদের অধিকার পেয়েছে দুর্গম। সে কি আর সহজে ছাড়বে। সুতরাং যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। দেবীও তৈরী হলেন যুদ্ধের জন্য। সঙ্গে রইলো দেবগণ। দুর্গম ব্রহ্মার বরে বলীয়ান। সেও কম নয়। দু দিক থেকে বাণ-বৃষ্টি হতে লাগলো। আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। গোটা পৃথিবী যেন কাঁপতে আরম্ভ করলো।

দেবী ক্রোধে আরও লাল হয়ে উঠলেন। দেবীর শরীরের সেই জ্যোতি থেকে বেরিয়ে এলো কালিকা, তারিণী, বালা, ত্রিপুরো-ভৈরবী, রমা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, গুহ্যকালী, সহস্রবাহুকা, আরও অনেক উগ্রশক্তি। এই শক্তিদের সঙ্গে নিয়ে শক্তিময়ী মা দুর্গমকে পরাজিত করে বেদ উদ্ধার করলেন। মায়ের হাতে দুর্গমের মৃত্যু হলো। দুর্গমকে বধ করেই মা হলেন দেবী দুর্গা।

কে 'ও'?

বলরাম বসাক

তখন বৃষ্টি পড়ছিল একটু একটু। রিক্সাওয়ালা খালি রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। ঠুনঠুন শব্দ করছিল। আর গুন গুন গাইছিল। কাঠের পোলটার পাশ কাটিয়ে পেয়ারা গাছটার কাছে যেই এসেছে—ওমনি সে শুনতে পেল কে যেন তাকে ডাকছে, 'এই রিক্সাওয়ালা, ইধার আও।'

পেছন ফিরতেই রিক্সাওয়ালার গায়ের রক্ত একেবারে হিম। হাত-পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। বুকে শব্দ হচ্ছে ধুকুস ধুকুস। যে তাকে ডাকছে তার চোখ দুটো ইয়া বড় আর রক্তের মত লাল—ঠিক আগুনের মত জ্বলছিল। বেশ মোটা মোটা দুটো ঠোঁটের ফাঁকে ইয়া বড় বড় দাঁত। দাঁতের

"......রিক্সাওয়ালা, ইধার আও।"

রঙ লালচে। মুখের রঙ কালো কুচকুচে। প্রায় হাতির মত কান। নাকের নীচে নারকোলের ছোবড়ার মতো গোঁফও, লম্বায় প্রায় একহাত। কপালের মাঝখানে একটা এত্তো বড় সিঁদুরের ছোপ। গালে আর থুতনিতেও সিঁদুরের টানাটানা দাগ। মাথায় ঝাঁকড়া চুলের ঝুঁটি বাঁধা। গলা থেকে পা অবধি লাল টুকটুকে কাপড়ে বেশ করে মোড়ানো। মোটা নাকটা বার বার ফুলছে। আর শব্দ হচ্ছে—ফোঁস ফোঁস—ফোঁস ফোঁস।

রিক্সাওয়ালার কাছে এগিয়ে এসে বাজখাঁই গলায় বলল, 'আমাকে ভুরভুট্টির মাঠে নিয়ে চল।' বলতে বলতে রিক্সার ওপর এসে বসে পড়ল জাঁকিয়ে।

রিক্সাওয়ালা ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'দোহাই আপনার, আমি গরিব মানুষ—ছেলেপুলে নিয়ে কষ্টেছিষ্টে দিন কাটাই—।'

'চোপ্'—উত্তর এলো। 'পাঁচ টাকা বকশিস্ পেতে চাও তো ভুরভুট্টির মাঠে আমাকে নিয়ে চল।'

রিক্সাওয়ালার তক্ষুনি মনে পড়ল—ভুরভুট্টির মাঠে তো তেনারা থাকেন।—সেই যাদের নাম করলে ঘাড় মটকে দেন—রামনাম বললে পালিয়ে যান। তারপরেই মনে পড়ল, সামনের পেয়ারা গাছটাও তো তেনাদের আস্তানা।—ও-রে বাপ-রে রাম-রাম-রাম। রিক্সাওয়ালা কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'দোহাই আপনার, আপনি আমার ঘাড়ে চাপবেন না। আমি কিচ্ছু করিনি। আমার মত গরিব রোগাপটকা মানুষের ঘাড় মটকে আপনার কি লাভ?—কটা পিণ্ডি দিতে হবে বলুন, কালই আমি গয়ায় গিয়ে দিয়ে আসব। রাম-রা-ম রা-রা-ম।'

'চোপ্।' রিক্সার ভেতর থেকে উত্তর এলো। 'আমি ভূত নই। আমাকে ভুরভুট্টির মাঠে নিয়ে চলো।'

রিক্সাওয়ালা কি আর করে। 'ও'কে রিক্সায় করে নিয়ে চলল ভুরভুট্টির মাঠের দিকে। যেতে যেতে ভাবল, ভূত নয়, তবে কী? কিছুতো বোঝা যাচ্ছে না। এ কি বিপদে পড়া গেল।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। রাস্তাটা বেঁকে মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে। তখন একটিও লোক ছিল না। দুপুর বেলা বলে হঠাৎ রোদ উঠল ঝাঁ ঝাঁ করে। ভুরভুট্টির মাঠ অনেক দূরে। সন্ধের আগে পৌঁছতে পারলে হয়।

এমন সময় রিক্সাওয়ালা মুখ ফিরিয়ে চোখ গোল গোল করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি সেই বিখ্যাত জুজু?'

'না।'

'তবে কি গ'গ' ?'

'না।'

'তবে ?'

'আমাকে ভুরভুট্টির মাঠে নিয়ে চল। পরে বুঝবে।'

রিক্সাওয়ালা আবার চলতে শুরু করল। গা দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল। পরিশ্রমের জন্যে নয়,—ভয়ে। কপালের শিরা দপ্ দপ্ করছে। ঠোঁট দুটো, দাঁত দুপাটি তখনো বেশ কাঁপছে। আর ভাবছে, তাইতো, কি আপদে পড়া গেল। ভূত নয়, জুজু নয়, গ'গ'ও নয়—তবে কী ?

ধীরে ধীরে রাস্তাটা মাঠ পেরিয়ে একটা বনের পাশ দিয়ে চলল। পথে দুলছে গাছের ছায়া। দৌড়ে পালাচ্ছে কাঠবেড়ালী। কালো-জাম আর বুনো জামরুল মাটিতে ছড়িয়ে আছে। তার গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

রিক্সাওয়ালা ভাবছে, কাজটা মোটেই ভালো করিনি। এই ভরদুপুরে এদিকের রাস্তায় একা একা না আসাই ঠিক হতো। প্রাণ নিয়ে বোধ হয় আর ফেরা যাবে না। দেখা যাক কপালে কী আছে!

তারপরে যেতে যেতে রিক্সাওয়ালা থমকে দাঁড়াল। পেছন ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি মঙ্গলগ্রহের লোক ?'

'না।'

'তবে কি শুক্রগ্রহের ?'

'না। আমি কোন গ্রহের লোক নই। আমাকে ভুরভুট্টির মাঠে নিয়ে চল।'

রিক্সাওয়ালা পড়ল মহাফাঁপরে। ও যে মানুষ নয়, এ তো ঠিকই। কারণ, মানুষের দাঁত এত বড় হয় না। কানও অতো বড় হয় না। ঠোঁট দুটো আর নাকটাও অতো মোটা হয় না। তারপর গায়ের রঙ কখনো অতো কালো হয় ? একেবারে গল্পের দত্যিদানার মত দেখাচ্ছে। তবে কি ওটা একটা দৈত্য-টৈত্য ? দৈত্য বলতে শুধুমাত্র আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের কথাই জানে রিক্সা-ওয়ালা। তবে কি 'ও' সেই দৈত্য ? তাহলে তো খুব ভাল। এক্ষুনি,—এই মুহূর্তে একটা রাজপ্রাসাদ চেয়ে বসবে আর ঘড়া ঘড়া মোহর।—কিন্তু আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের পিঠে তো পাখা ছিল। হয়ত ওরও আছে পিঠের দিকে। লাল কাপড়ে ঢাকা আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। আচ্ছা, জিজ্ঞেস করে দেখি।

'আপনি কি আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্য।'

'না।'

তাও নয় ? কি মুস্কিল। এযে দেখছি আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। ভাবতে ভাবতে চলল রিক্সাওয়ালা। বনের পাশ কাটিয়ে আবার একটা মাঠ। মাঠের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলছে পথ। রোদ বেড়েছে। ঘাম পড়ছে। দু-একটা গাছ। অল্প অল্প ছায়া। একটা লোকও নেই কোথাও। গা করছে ছম্ ছম্, ছম্ ছম্—। তাই তো—। ভূত নয়, জুজু নয়, গ'গ' নয়, দৈত্য নয়, মঙ্গলগ্রহের লোক পর্যন্ত নয়—তবে কি ওটা ?

তবে কি—?—তবে কি—? ভেবেই রিক্সাওয়ালা জিব দিয়ে ঠোঁটের একপাশটা একটু চেটে নিল—। তবে কি—? ঠোঁট কাঁপতে শুরু করল সঙ্গে সঙ্গে—। বলা যায় না কিছু—ভর দুপুরে ওদের খিদে পায় —আর খোলা মাঠের তালগাছে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে মানুষের মাথা খায়।—বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মধ্যে নাকি ওদের প্রাণ লুকিয়ে থাকে—আবার সেটা পাওয়াও এক হাঙ্গামা। রিক্সাওয়ালা বেশ একটু চিন্তিত হয়ে বারকয়েক মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি রাক্ষস ?'

এবারে ও আমতা আমতা করে বলল, 'না.—হ্যাঁ রাক্ষস, তবে ঠিক বলতে গেলে...... মানে এই ধর......।'

শুনেতো রিক্সাওয়ালার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। ভিরমি খাবার মত অবস্থা। কোন রকমে রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে রিক্সাওয়ালা একবার ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে—আর ভাবছে—আর উপায় নেই। ঐ যে দূরে তালগাছ। দেখা যাচ্ছে। ওখানে গেলে আর দেখতে হয় না।

তারপর ঠিক তালগাছের কাছে যখন এসেছে তখন রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে পড়ল। রিক্সা থেমে গেল। রিক্সার ভেতর থেকে ও বলল, 'থামলে কেন ?'

'পেট কামড়াচ্ছে।' কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিল রিক্সাওয়ালা।

'এই সেরেছে। এখন আবার পেট কামড়ানি শুরু হল।' বলতে বলতে ও নামল রিক্সা থেকে। তারপর বলল, 'পেট যখন কামড়াচ্ছে তখন তোমার ভুরভুট্টির মাঠে গিয়ে কাজ নেই। আমি হেঁটেই চলে যাই।'

রিক্সাওয়ালার ধড়ে যেন প্রাণ এলো একটু একটু। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। রিক্সা নিয়ে চলে যাবার জন্যে যেই পা বাড়িয়েছে, ওমনি 'ও' খপ করে ধরল রিক্সাওয়ালার হাত। গম্ভীর স্বরে বলল, 'দাঁড়াও'।

বাস্—আবার রিক্সাওয়ালার দাঁত কপাটি লাগে লাগে অবস্থা। রাক্ষসেরা খাবার আগে যা করে থাকে—অর্থাৎ একটু খেলিয়ে নেয়, বোধ হয় এ-ও তাই। তারপর 'ও' লাল কাপড়ের ভেতর থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে বলল, 'এটা না নিয়েই যে চলে যাচ্ছিলে বড়।'
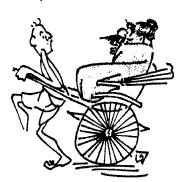
রিক্সাওয়ালা টাকাটা হাতপেতে নিয়ে চলে যেতেই আবার 'ও' খপ করে হাত চেপে ধরে বলল, 'দাঁড়াও—।'

আবার কি হল ? ফের থতমত খেলো রিক্সাওয়ালা। মাথা ঘুরতে লাগল—ভোঁ—ভোঁ। এমন সময় সে দেখল,—একটা মুখোস খুলে ফেলল 'ও' মুখের ওপর থেকে। আর বেরিয়ে এলো একটা মানুষের মুখ। মানুষটা আর কেউই নয়, আমাদের পাগলা গণ্শা। হাসতে হাসতে রিক্সাওয়ালাকে বলল, 'ভুর-ভুট্টির মাঠে যাত্রা হবে। আমি রাক্ষস-রাজ রাবণের পার্ট নিয়েছি। কিহে, আমাকে রাবণ ভালো মানাচ্ছে তো ?'

রিক্সাওয়ালা প্রথম 'থ' মেরে গিয়েছিল, পরে বলল, 'হ্যাঁ, খুব-খুব।' তারপর সে রিক্সা নিয়ে ফিরে চলল। চলতে চলতে ঠুন-ঠুন শব্দ করল। গুন গুন গান গাইল।

"আপনি কি রাক্ষস?"

মিঠুরাম মাম্মা

শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি শ্রীশ্রীমিঠুরাম মাম্মা।
ইস্তাম্বুলে গিয়ে জাপান-কাবুলে গিয়ে
শিখেছি সহজ এই রান্না!
চ্যাং ব্যাং থলসে
রোদ্দুরে ঝলসে,
খুন্তিটা বাজিয়ে দিই যেই সাজিয়ে—
ওমনি যে হয়ে যায় সাগরের ঝোল সে।
মনুকাকা চেখেই তা আর খেতে চান না!
আমি শ্রীশ্রীমিঠুরাম মাম্মা।
খাইবার-পাস দিয়ে রোম-সাইপ্রাস গিয়ে
শিখেছি সহজ এই রান্না!
হাতে নিয়ে 'ডেচ্‌কি'
যেই তুলি হেঁচ্‌কি
বিরিয়ানী-কোর্মা পটলের দোর্‌মা
মিলে মিশে হয়ে যায় উচ্ছের ছেঁচ্‌কি!
ছোড়্‌দিদি মুখে দিয়ে জুড়ে দেন কান্না!
আমি শ্রীশ্রীমিঠুরাম মাম্মা।
সুইজারল্যান্ড দিয়ে ইজিপ্ট-হল্যান্ড গিয়ে
শিখেছি সহজ এই রান্না!
হরে কর কম্‌বা
রাঙালুরে দম্ বা
কাট্‌লেট্‌-কচুরি হালুয়া কি খিচুড়ি
মোটা খেলে রোগা হবে বেঁটে হবে লম্বা।
ককিয়ে বল্‌তে হবে, "কোব্‌রেজ আন্ না!"
আমি শ্রীশ্রীমিঠুরাম মাম্মা।
ম্যারিকা-এডেন হয়ে কোপেনহেগেন গিয়ে
শিখেছি সহজ এই রান্না!!

আলোঝরা আশ্বিনে
প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আশ্বিনে আকাশটা যেন নীল গালচে!
ঝকঝকে সাদা রোদ এ কি অনবদ্য
হীরের প্রদীপ বুঝি দিকে দিকে জ্বালছে!
দিঘিতে পাপড়ি মেলে ফুটে আছে পদ্ম।

ঠাকুমার রুপো-চুল মেঘ হয়ে ভাসছে
ছুঁতে তাই শাঁখ-মাজা বকগুলো উড়ল।
ফুলের গন্ধ বয়ে হাওয়া ছুটে আসছে,
খুশী মনে দোয়েলেরা ঠোঁটে শিস জুড়ল।

পৃথিবীর বুক-ভরা শিশিরের অর্ঘ্য
ঘাসে টুপটাপ ঝরে শিউলির ছন্দ
কাশ ফুলে ছেয়ে আছে নদীটার চর গো
শীষ-দোলা ধান ক্ষেতে অমল আনন্দ!

আশ্বিনে সকলকে কি যে ভাল লাগছে
এই আলো, এই ছায়া, রোদ্দুর মিষ্টি
সবে ঘুম ভেঙে যেন পৃথিবীটা জাগছে।
চলে যায় যতদূর দুচোখের দৃষ্টি
শুধু লাগে অপরূপ, ভরে ওঠে মন তো
রূপের আরতি করে সারাটা দিগন্ত।

শারদ-হাসি

ফটো : শ্রীঅনিল ঘোষ

চিঠি
আশা দেবী

রোদ হলো সোনা রং—শিউলিরা ফুটল
মাঠভরা ধান শীষে কী যে খুশি উঠল।
ঝিম-ঝিম রাত ভরে
শিশিরের ফোঁটা ঝরে
জ্যোছনায় ডানা মেলে হাঁস কোথা ছুটল।
দুলল যে কাশ ফুল, শিউলিরা ফুটল।

ইস্কুলে বাজে তবু ঢং ঢং ঘণ্টা—
তবু পড়া—রোজ পড়া। ছটফট মনটা!
দিন রাত বুকে বাজে
পুজো কই? আসে না যে—
ডাক দেয় ঝিল নদী—ডাক দেয় বনটা—,
তবু বাজে ইস্কুলে ঢং ঢং ঘণ্টা!

দুর্গা মা, তাই তোমা লিখছি এ চিঠিটাই—
চলে এসো চটপট, কেন কর দেরী ছাই।
ভূগোলে হারায় থেই,
অঙ্কের থই নেই
কাটে না যে দিন আর, তাড়াতাড়ি এসো তাই
দুর্গা মা, বড় দুখে লিখছি এ চিঠিটাই।

কী করে পাঠাই চিঠি? লিখেছি তো ঘুড়িটায়—
সুতো কেটে দিই ছেড়ে— সোজা যেন চলে যায়।
আকাশের ঘন নীলে
নীল ঘুড়ি যায় মিলে
হিমালয়-পারে যেন পৌঁছোয় রাঙা পায়—
পড়ে দেখো দুর্গা মা, লেখা আছে ঘুড়িটায়!

দাদুর দাদু
প্রভাকর মাঝি

খোকন : দাদু, তুমি লক্ষ্মী ভারী, সত্যি সোনামণি,
একটুও না রাগতে দেখি, ভালবাসার খনি।
কত রকম মজার মজার গল্প বলে যাও,
নিত্যি নতুন খেলনা এবং টফি কিনে দাও।
বাপির কেবল দিন-রাত্তির পড়া-পড়া-পড়া,
নামতাতে ভুল একটু হলে ভীষণ মেজাজ কড়া।
দেখন-হাসি মিঠুর যদি ঝুঁটিটা দিই নেড়ে,
না, ভালো না—মা-মণিও মারতে আসে তেড়ে।
পেন নিয়েছি, চুনু-কাকা বাঘের মতো হাঁকে—
লক্ষ্মী দাদু, আচ্ছা করে ধমকে দিলে তাকে।
মন করে তাই আঁকুপাঁকু একটা জবাব পেতে,
তোমার দাদু কেমন? কে দেয় কাজু বাদাম খেতে?
কিংবা ধরো, দিদিমণির নিকট ছুটি চাই,
তোমার হয়ে কে বলে দেয় তখন, দাদু-ভাই?

দাদু : আমার দাদু কেমন?—খোকন, জানবে তুমি যেই
তোমার দাদুর বড়াই করা ভাঙবে পলকেই।
তোমার দাদুর মতো সে নয় থুথুড়ে এক বুড়ো,
তোবড়ানো গাল, চুলগুলো সব সাদা শনের নুড়ো।
আমার দাদুর ফুলকো দুগাল, কোঁকড়া চুলের রাশি,
হীরের কুচি দাঁতের ফাঁকে মন-ভোলানো হাসি।
এমন কারো উঁচু নজর দেখি না তার থেকে,
মুড়ির নাড়ু খাবে না সে রসগোল্লা রেখে।
শুনবে কি নাম আমার দাদুর? খোকনমণি রায়।

'ধোৎ, তুমি কি?'—খোকন হেসে ছুটে চলে যায়।

হাকিম-সাহেবের জন্যে

ছবি সেনগুপ্তা

গুপির পিসের সেবার হল ভারী অসুখ। সেবার শীতের সময়।

পিসের ছিল হাঁপানির ধাত। বছরে দু' তিনবার কাঁধে তুলতে হয়—এমনি করে টিকে যাচ্ছিল বুড়ো। সেবার শীতের সময় মনে হ'ল, পিসে বুঝি আর বাঁচে না।

গলার মধ্যে ঘড়ঘড়ানি, যেন নাকাড়া বাজছে। সেই সঙ্গে ঘন ঘন চোখ কপালে তুলে শিবনেত্র হয়ে পিসে মর মর হ'ল।

হাকিম এলো, বদ্যি এলো। সবাই তারা পিসের জিভ টেনে, পেট বাজিয়ে, বুকে নল লাগিয়ে—দূর থেকে, কাছ থেকে, পাশ থেকে—ডান পাশ, বাঁ পাশ, রোগীর বিছানার চারদিক—পূবে পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সবদিক থেকে সব ভাবে পরীক্ষা করে দেখল।

হাকিমের ছিল মস্ত দাড়ি। দাড়ির চুল অর্ধেক পাকা, অর্ধেক কাঁচা। মাথা-জোড়া টাক। নাকের ডগায় সুতো জড়ান চশমা। তার একদিকের কাচ সাদা, একদিকের ঘোলাটে। হাকিমের পরনে ছিল মস্ত এক জোব্বা। তার পকেট থেকে হুঁকোর খোলের মত দেখতে এক নস্যির ডিবে বার করে সুরুং সুরুং নস্যি টেনে হাত ঝেড়ে, হেঁচে হাকিম বলল, 'রোগটি বড় সহজ নয় মনে হচ্ছে। সারতে অনেক সময় লাগবে।'

সবাই বলল, 'যত সময় লাগুক, যত টাকা খরচ হ'ক, বুড়োকে ভাল করে দিতেই হবে।'

হাকিম বলল, 'সেজন্য ভাবনা নেই। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন কার সাধ্য রোগীকে ছোঁয়।'—বলে হাকিম জোব্বার পকেট থেকে নানারকম ওষুধ বার করে দিল।

নানারকম ওষুধ বার করে দিল

হাকিম থাকে দশ মাইল দূরের এক গ্রামে। ওষুধ দিয়ে সে টাকা নিয়ে যাবার উদ্যোগ করতে, সবাই ধরে পড়ল। না, এখন কিছুতেই হাকিম-সাহেবের যাওয়া হতে পারে না। বুড়ো ভাল না হওয়া পর্যন্ত হাকিম-সাহেবকে এবাড়িতেই থাকতে হবে, তা সে যতদিন লাগুক।

হাকিম-সাহেবের যাওয়া হ'ল না দেখে সে খুব অসন্তুষ্ট হল এমন মনে হল না। একখানা আলাদা ঘরে হাকিম-সাহেবের থাকার ব্যবস্থা হ'ল।

হাকিম-সাহেবের থাকা খাওয়ার কোন অসুবিধে না হয়—সবাই তার দিকে কড়া নজর রাখল। হাকিম-সাহেব কখন ঘুম থেকে উঠবে একজন চাকরের ওপর তার হাতমুখ ধোবার জল, গাড়ু গামছা এগিয়ে দেবার ভার পড়ল। তারপর সকালের খাওয়া, দুপুরের খাওয়া, দিনের বেলা ঘুমনো এ-সবের পরিপাটি ব্যবস্থা হ'ল। হাকিম-সাহেব খেয়ে উঠে ছেঁচা পান খেতে খেতে ঘুমোয়, ঘুমের সময় চাকর পা না টিপলে ঘুম পাকে না, আরেকজন চাকর তার পা টিপে টিপে হাতের গুলি পাকিয়ে ফেলল। হাকিম-সাহেব খাবেন তাও তো যা তা হতে পারে না। হাকিম-সাহেবের মন মেজাজ ভাল থাকলে রোগীর জন্য ভাল ওষুধ বাতলাতে পারবে—সবাই এই কথা ভেবে রোগীর চেয়ে হাকিম-সাহেবের মনমেজাজ খুশ রাখবার দিকে প্রাণপণ ঝুঁকে পড়ল।

হাট থেকে মুর্গি কেনা হ'ল গোটা আষ্টেক। দিনে দুটো করে মুর্গি হাকিম-সাহেবের খাদ্য আর গণ্ডা দুয়েক ডিম। হপ্তায় একটা করে মোটে হাট। সবাই পরামর্শ করে ঠিক করল, বাড়িতে মুর্গি পুষলে ডিম পাওয়া যাবে। সেই ডিম ফুটিয়ে ছা বার করে খাওয়ালে হাকিম-সাহেব ঘরের তরতাজা জিনিস পেয়ে খুশী হবে। তাতে হাটের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে না। সেই-ভাবেই ব্যবস্থা ঠিক হ'ল।

মুর্গি এলো আরও দু'গণ্ডা। তারা রোজ দু গণ্ডা করে ডিম দিতে লাগল খোঁয়াড়ে বসে। হাকিম-সাহেব রোগীর ঘরে ঢোকার আগে সেদ্ধ ডিম খায়। নাড়ি টিপে ধরে ডিমের পোচে চামচ খোঁচায়। ওষুধ খাওয়াতে খাওয়াতে মামলেট ওমলেটের গন্ধে পেটে সুড়সুড়ি বাড়ে। আনন্দে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে ওগুলো শেষ করে বার কতক মাথা নাড়ে, নাক ঝাড়ে; তবে ওষুধ ঠিক হয়।

খেয়েদেয়ে এদিকে হাকিম-সাহেবের চেহারাটি যতই ফেরে, সবাই ভাবে, এইবার বুড়োর কপাল ফিরল।

তা ওষুধে ফল ফলল ঠিকই। একদিন তখন ভোর হয়েছে সবে। সারা রাত ধরে পিসের খুব বাড়াবাড়ি গেছে। হাকিম-সাহেব হুঁকোপানা ডিবের নস্যি নাকে ঠুসে মোক্ষম ওষুধ খাইয়ে চলে গেছে শেষ রাত্রে। সকালে দেখা গেল, ধক আছে বটে হাকিমের ওষুধের। গণ্ডা গণ্ডা মুর্গি আর মুর্গির ডিমের গুণে সাহেবের মেজাজ একেবারে সাফ হয়ে গেছে। কখন কি ওষুধ দিলে রোগ টিট হয় তা একেবারে জলের মত মগজে ঢুকে গেছে।

পিসে চোখ মেলে তাকাতে বাড়িসুদ্ধ সকলের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

এই সময় হঠাৎ বাইরে ডাক শোনা গেল—কোঁক্কর ক কোঁক্কর ক' ক ক' ক—

পিসে আবার চোখ উল্টে ফেলল।

মুর্গির ডাক পিসের কাল হল ভেবে সবাই রৈ রৈ করে পিসের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

পিসে প্রাণপণ চিৎকার করে বললে,

পিসে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল—'মরে গেলুম, মরে গেলুম।'

"ও কি রে, কিসের ডাক রে হরে, ফটকে, নিধে—"

পিসের তিন চাকর হরে-ফটকে-নিধে একসঙ্গে থতিয়ে থতিয়ে বলল, "আজ্ঞে ও কিছু নয়, ও কিছু নয়—ওগুলো রামপাখি, হাকিম-সাহেবের জন্য—"

পিসে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, মরে গেলুম, মরে গেলুম। হরে তুলো আন, আমরা কানে এক মণ তুলো তোরা গুঁজে দে। নয়ত হাকিম তাড়া, আপদগুলো বিদেয় কর্।" বলে মূর্ছা গেল।

তাই হ'ল। গরুর গাড়ি আসতে হাকিম গুটি গুটি গাড়িতে গিয়ে উঠল। পথে যেতে যেতে হাকিম-সাহেব ভেটের বস্তা খুলে দেখল, পাঁচটা জ্যান্ত মুর্গি বস্তাবন্দী হয়ে কুঁত কুঁত করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। হাকিম-সাহেব মনের দুঃখে বস্তার মুখ বেঁধে ফেলল।

গুপির পিসে সেই যে বেঁচে গেল—এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

ম্যাও-মিকচার ঃ

ছড়া ঃ বিমল ঘোষ   ফটো ঃ রেবন্ত ঘোষ

দাম বেড়েছে মাছের, কাজেই ডাক্তার! মাছ খেতে না পেয়ে
রোগা হচ্ছি আমি, আর পুষি ফুলছে কাঁটা পোঁটাই খেয়ে,
কাজেই এমন ওষুধ দিতে হবে, যাতে কাঁটাই খেতে পারি
শাক-মুলো মা ধমকে খাওয়ায়, আর যে খেতে নারি।

শুনে ডাক্তার নল বসালেন পুষির পিঠে, খোকার বুকে
পুষির, খোকার নাড়ি গুণে—ম্যাও-মিকচার দিলেন ঠুকে।
ম্যাও-মিকচার পেয়ে খোকা, খুশি মনে বাড়ি ফিরে যায়
তিনের বদল একটিবারেই চক্ চক্ চক্ সব ওষুধটাই খায়।

ম্যাও-মিকচার খেয়েই খোকার শিহর জাগে গায়
মনে হলো—লেজ গজাচ্ছে, লোম গজাচ্ছে! পুষির মতোই হায়!
আয়না দেখে ভয়-না পেয়ে খোকা ডাক্তারখানায় ছোটে—
বলে বাঁচাও ডাক্তার! কাঁটা পোঁটা মাছ মছলি—চাই না খেতে মোটে।

বিলকুল সাফ

পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

যশোর রোডের ধারে বোধ হয় ঘুঘুডাঙার কাছে
এদিক-ওদিক দেখে বুড়ো উঠলো গিয়ে গাছে।
দূর থেকে এক কাপড়ওলা দেখতে পেয়ে তাকে
গাছতলাতে মোট নামিয়ে চেয়ে ভাবতে থাকে—
বুড়োর মাথার নাটবল্টু হয়তো আছে ঢিলে
হড়বড়িয়ে উঠছে—যদি পড়ে, ফাটবে পিলে!
কেরানী এক কপি-ভেটকি কিনে বাজার থেকে
ফিরছিল সেই পথে, সে-ও দাঁড়ায় ব্যাপার দেখে।
ভেবে বললে—হয়তো বুড়ো ঝগড়া ক'রে ঘরে
পালিয়ে এসে উঠছে গাছে লুকিয়ে থাকার তরে!
স্কুটার চ'ড়ে যাচ্ছিল এক ছোকরা সে-পথ দিয়ে
কী খুঁজছে গাছে ওরা? সে-ও দাঁড়ালো গিয়ে।
শুনে বললে পরীক্ষাতে বোধ হয় মেরে ফেল
গাছ থেকে লাফ দিয়ে লোকটা দেখিয়ে দেবে খেল!
কী যে দেখছে লোক তিনটে গাছ তলাতে জুটে!
কোত্থেকে এক কনেস্টবল হাজির হ'লো ছুটে।
বললে শুনে পাগড়ী নেড়ে—পাক্কা চোরই হোবে;
দেখে লিবেন, বলছি হামি রাম খিলওয়ান চোবে।
জটলা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বোধ হয় ধড়িবাজ
ঝোলা কাঁধে ফ্রেঞ্চ দাড়ি অতি ফিটফাট সাজ।
সব শুনে সে ঘামিয়ে মাথা হলফ করে কয়—
গুপ্তধনই রাখতে গেছে কোটরে নিশ্চয়।
কাপড়ওলা ভেবে চিন্তে বলে—হতেও পারে;
থলি একটা ঝুলছিল তার কোমরের বাঁ ধারে।
সেই পথেতেই আসছিল এক তরুণ অফিসার
ভিড় দেখে চট থামিয়ে ফ্যালে মোটরখানা তার।
ব্যাপার শুনেই নেমে এসে চড়তে থাকে গাছে।
দেখাদেখি কাপড়ওলাও উঠলো পাছে পাছে।
তার পিছনে কেরানী ওঠে কপি-ভেটকি রেখে।
স্কুটার ছেড়ে ছোকরাটিও উঠলো তাদের দেখে।
বুট পট্টি খুলে চড়লো কনেস্টবল চোবে—
চোর ধরতে কিংবা গুপ্তধন পাবারই লোভে।
গাছের ডগায় বুড়ো তখন থলেটা বার করে
পালিয়ে যাওয়া ময়ালটা তার পুরেছে ঘাড়ে ধরে।
অফিসার তা দেখেই লাফায়—'সাপরে বাপরে বাপ'
যেমনি বলা অমনি সবাই হাত ছেড়ে দেয় লাফ।
গাছের পাশে ছিল ডোবা, পড়লো সবাই জলে;
উঠে দ্যাখে—বিলকুল সাফ, নাই কিছু গাছতলে।

আজব ডাক্তার

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কী হয়েছে, ভীষণ অসুখ, ভয়টা কিসের শুনি
ভেবেছো কি নেইকো আমার জ্বর-তাড়ানোর গুণ-ই?
মিষ্টি খাবে হোমিওপ্যাথি, এলোপ্যাথিক তেতো,
কবরেজীও অনেক ভাল, অর্জুন-ছাল খে'তো
ওদের মামা, নাকি বলে জল-পড়াটাই খাবে,
বলো যদি ফুস-মন্তর ঝাড়ফুঁকে তাও পাবে,
তেলে-জলে মালিশ করো, মাটির প্রলেপ নিলে
সারতে পারে, কিংবা তোমায় ঠিক ঠিকানা দিলে
হাওয়া বদল করতে পারো অনেক অনেক দূর,
আমার দাদুর বাড়ি আছে নীলকণ্ঠপুর......।
আপাতত বলছি তোমায় শোনো,
খবরদার, মাকে যেন বোলো না কক্ষনো—
আমার গলার মস্ত বড় এই মাদুলি নিলে
দুটি পাখি মরবে জেনো একটি মাত্র ঢিলে,
নামবে আমার গলার বোঝা হাল্কা হবো আমি
তোমরা অসুখ সারাবে ও-ই, সোনার চেয়ে দামী।

সাহেব হলে শনিবার সকালে বাগান তৈরির কাজে লেগে যেতাম, আর বিকেল হলে মোটরগাড়ির তলায় চলে যেতাম। না, গাড়ি চাপা ঠিক পড়তাম না, কিন্তু গাড়ির তলায় ঠিকই যেতাম। অবশ্য যদি সত্যিকারের সাহেব হতাম। শনিবারেই দেখা যেত তাদের—যে সাহেবদের গাড়ি আছে তারা সব গাড়ির তলায় ঢুকে পড়ে কি যেন খুটখাট করছে।

আমি সাহেব নই, আমার গাড়িও নেই, তাই গাড়ির তলায় না গিয়ে ঘরে বসে বসে ভাবছিলাম জীবনটার কথা। বত জীবনের কথা। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের কথা। কেউ জন্মাচ্ছে, কেউ মরছে ইত্যাদি বিষয়ের দার্শনিক চিন্তাও দু'একবার করে ফেলছিলাম। দর্শন আমার অধিকার বহির্ভূত হলেও মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় পৃথিবীর কথা। না মনে করে পারি না। না ভেবে থাকব বহুবার ভেবেছি। ভেবেছি, কি হবে ভেবে, পৃথিবীর কথা, মৃত্যুর কথা, জীবনের কথা? না ভেবে পারিনি আমার নিজের কথা—কোথায় ছিলাম দু বছর আগে, আর আজ আমি কোথায়?

এটুকু ভেবেছি। আরো পাঁচ ছ পাতা ভাবব বলে মনে মনে পরিকল্পনা করেছি—কিন্তু হঠাৎ আমার ব্যক্তিগত দর্শন টেলিফোনের ঝনঝনানি এসে সমস্ত এলোমেলো করে দিল। আমি আশ্চর্য হয়ে রিসিভার ধরতেই আওয়াজ এল, "শ্রীজয় নাকি?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, তুমি কে?"

রহস্য করে কে বলল, "কে বলত?"

বললাম, "কে দিলীপ, শুভচারী, অবতার, গোডবোলে?"

"হল না।"

"তুমি কে?"

"আমি জীবন।"

চমকে উঠলাম। জীবন! আমি জীবন-দর্শন সম্পর্কে ভাবছিলাম—তাই হঠাৎ জীবনের আওয়াজ শুনে সেটা একটি বিধাতার বিচিত্র রসিকতা মনে করে চমকে উঠিনি। জীবন বছর দুই আগে দু সপ্তাহের মধ্যে পাঠিয়ে দেব বলে আমার কাছ থেকে সেই যে সাড়ে এগারো পাউন্ড ধার নিয়ে গেছে আর সে আসেনি এ মুখো। এসে থাকলেও দেখা করেনি। অতএব ধরেই নিয়েছিলাম, যা গেছে তা আর আসবে না। কিন্তু ধরে নিলেও কষ্ট কম হয়নি তথাপি।

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। দেখি নানারকম শো-কেস। তাতে ডামি মডেল সব স্যুট পরে দাঁড়িয়ে হাসছে। তাদের গায়ে স্যুট—তাতে দাম লেখা এগারো পাউন্ড। আমার মনে হয়েছে তৎক্ষণাৎ জীবনের কথা। ও যদি আমার কাছ থেকে সাড়ে এগারো পাউন্ড না নিত, তাহলে ঐ স্যুটটা আমিও কিনে অমনভাবে হাসতে পারতাম। কখনো দেখেছি চার পাউন্ডের সুন্দর চকচকে জুতো। কিনতে ইচ্ছে হয়েছে। আশ্চর্য হয়েছি এই ভেবে যে, মডেলের পায়ের জুতো অমন সুন্দর হয় কেমন করে? কিনে পরতেও ইচ্ছে হয়েছে। পারিনি। সেও ঐ জীবনের জন্যই।

সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে এলেন এক ভদ্রমহিলা। তার উপর বাঙাল। ওর যে কোনো একটি কারণেই পাঁচ শিলিং বার করে দেওয়া যে কোনো বাঙালির পবিত্র কর্তব্য। অথচ পারিনি। জীবনের কথা তখন মনে হয়েছে। ঐ টাকাগুলি থাকলে নিশ্চয়ই দিতাম।

ঐ সাড়ে এগারো পাউন্ড ফেরত না পাওয়ায় আমি যে কত জিনিস কিনতে পারিনি তার সীমাসংখ্যা নেই। একটা গ্রামোফোন পাওয়া যাচ্ছিল দশ পাউন্ডে, সেটা কিনতে পারতাম, কিন্তু কিনতে পারিনি। ভাল ফাউন্টেন পেন একজন বিক্রী করতে এল—অ্যামেরিকা থেকে এনেছে কাস্টমস অফিসারের চোখে ধুলো দিয়ে, দাম মাত্র দু পাউন্ড, কেনা হল না। বৃষ্টিতে একটা ছাতা প্রয়োজন—অথচ জীবন আমার পয়সা নিয়ে সরে পড়েছে—কিনতে পারলাম না। গত দু বছর ধরে কত কি আমার হাতছাড়া হয়ে গেল—তার সীমাসংখ্যা নেই।

এমন কি অমন বন্ধু যে জীবন—সেই আমার হাতছাড়া হয়ে গেল ঐ সাড়ে এগারো পাউন্ডের জন্য! সে যে আমার জীবনে আবার উপস্থিত হবে আমি ভাবিনি।

আমি বললাম, "জীবন?"

"জীবন ঘোষ।"

আমি বললাম, "ওয়েলকাম টু লণ্ডন।"

জীবন বলল, "করোনেশন দেখতে এলাম।"

বললাম, "বেশ।"

"তোর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"চলে আয়।"

বলে টেলিফোন রিসিভার রেখে দিলাম। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে খুচরো-টুচরো যা ছিল সব বিছানার তলায় ঢোকালাম। জীবন করোনেশন দেখতে এসেছে দেখুক। আমার কাছ থেকে এবারে সে একটি পয়সা পাবে না। না, মরে গেলেও না।

খানিকপর জীবন এল। আমি বললাম, "বোস।"

জীবন বসল। বসে পকেট থেকে এক-তাড়া নোট বার করল। বলল, "ফেরত দিতে দেরি হয়ে গেল—কিছু মনে করিস না। কত যেন নিয়েছিলাম?"

"সাড়ে এগারো।" বলেই তৎক্ষণাৎ সংশোধন করলাম, "কিন্তু থাক, ও আর তোকে দিতে হবে না।"

"কেন?" জীবন একটু আশ্চর্য হল।

আমি বললাম, "সত্যি কথাটা এই যে গত

দেড় বছর ধরে আমি ভাবছি তুই ঐ ধার শোধ করবি না।"

"ভুল ধারণা।" বলল জীবন।

আমি বললাম, "সে তো এখন বুঝছি। কিন্তু ইতিমধ্যে যে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় লোককে বলেছি তুই ধার নিয়ে শোধ দিসনি! তোর চরিত্র সম্পর্কেও সন্দেহ প্রকাশ করেছি অন্তত তেইশজনের কাছে!"

জীবন বলল, "এ টাকা তুই নে। পরে না হয় সবাইকে বলিস আমি শোধ দিয়ে দিয়েছি!"

আমি বললাম, "বেশ।"

জীবন টাকা দিয়ে বলল, "ভাই শ্রীজর!"

আমি টাকা গুণে নিয়ে পকেটে রাখলাম। তারপর বললাম, "কী?"

জীবন বলল, "এসব কথা সব ভুলে যা।"

আমি চেষ্টা করলাম ভুলতে। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে যে চিন্তা আমার মাথায় ঢুকে বাসা বেঁধেছে তাকে ঠেলে ফেলা তো হুট বললেই হয় না। একটু দেরি হল। মিনিট দুই লাগল ভুলতে। প্রাণপণ চেষ্টা করে ভুলতে হল। যাঁরা ভুলতে চেষ্টা করেন গুরুতর কোনো কিছু, তাঁরাই বুঝবেন আমার কষ্ট কতখানি হয়েছিল। দেড় বছরের ধারণা, দু মিনিটে ভোলা—ভারি শক্ত কাজ।

দু মিনিট চেষ্টা করার পর বললাম, "ভুলেছি।"

"একেবারে?"

আমি ভেবে বললাম, "তুই যে আমাকে সাড়ে এগারো পাউণ্ড ধার শোধ করিসনি এতদিন —এটা একেবারে ভুলে গিয়েছি।"

জীবন বলল, "তোর কাছে আসবার জন্য হোটেলে নেমেই ছুটে এসেছি।"

আমি তখন দেখলাম, যখন পুরনো কথাগুলো ভুলেই গিয়েছি তাহলে আর ওকে হোটেলে থাকতে দিই কেন? আমার খাটটাই যথেষ্ট বড়, ওকে এখানেই আসতে বলি না কেন?

বললাম, "জীবন?"

"কী?"

"তুই হোটেলে থাকিসনে।"

"কোথায় থাকব?"

আমি বললাম, "কেন, এখানে চলে আয়!" আমার গলার স্বর আন্তরিকতায় পূর্ণ।

জীবন বলল, "এখানে?"

আমি বললাম, "চলে আয়।"

জীবন বলল, "চলে আসব?"

আমি বললাম, "এক্ষুনি।"

জীবন বলল, "এক্ষুনি?"

আমি বললাম, "আলবত।"

জীবন বলল, "তোর খানিক সময় হবে এখন?"

বললাম, "আমার সময় হবে না? তোর জন্য? আমার পুরনো বন্ধুর জন্য সময় হবে না? বলিস কি? ভুলে গিয়েছিস সেই সব দিনের কথা?"

জীবন বলল, "কোন সব দিনের কথা?"

আমি বললাম, "সেই সব। সেই যে আমাদের নানা রঙের দিনগুলি?"

জীবন বলল, "হুঁ।"

আমি বললাম, "কেবল হুঁ মানে? সেসব কথা মনে পড়লে হৃদয় লাফায় না?"

জীবন বলল, "লাফায়। খুব জোর হয়ত সে লাফে থাকে না—কিন্তু স্বীকার করছি —লাফায়।"

আমি জিজ্ঞেস না করে পারলাম না, "কতখানি লাফায়?" আমার মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা প্রবল। ছেলেবেলা থেকেই।

জীবন বলল, "ফুট চারেক—।"

আমি তার হাত আমার হাতের মুঠোয় নিলাম। বললাম, "আমারও চার ফুট লাফায়।"

জীবনকে একটু গম্ভীর দেখালো। যতক্ষণ তাকে গম্ভীর দেখালো ততক্ষণ আমি ব্রাউন রঙের সুটটা পরে ফেললাম। তারপর যখন আরো বেশি গম্ভীর তাকে দেখালো তখন আমি হলুদ রঙের নতুন নাইলনের মোজা পরলাম। এ মোজা আমি বিশেষ কোনো উপলক্ষ ছাড়া পরি না। ঝকঝকে এর রঙ।

তারপর টাই পরতে গিয়ে দেখি জীবন মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে। বুঝলাম তার হৃদয় চার ফুট কেন, দু ইঞি হয়ত লাফাচ্ছে না। তার মুখ দেখলাম, মনে হল নির্বাচনের আগে প্রার্থীর মত অনিশ্চিত, বিশেষ করে যে সব অঞ্চলের রাজনৈতিক চরিত্র প্রায়ই বদল হয়।

বললাম, "অত গম্ভীর হয়ে গেলি কেন। আমার কাছে থাকবি। আমরা দুজনে একসঙ্গে থাকব। আমরা সেই সব পুরনো দিনের গল্প করব। তারপর হাসব।"

জীবন বলল, "হাসতে পারব না ভাই, মাপ করো। একটা জিনিস মনে করবার চেষ্টা করছি।"

আমি বললাম, "আমি মনে পড়িয়ে দেব। পুরনো আমলের কথা অমন একটু ভুল হয়ে যায়।"

জীবন বলল, "পুরনো কথা নয়। একটা নতুন কথা ভাবছি।"

বললাম, "যদি আমার এতে কৌতূহল হয় তাহলে করিও ক্ষমা, কিন্তু কথাটা কি জানতে পারি কি?"

জীবন বলল, "বলছি। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি পেয়েছিলাম। আগে থেকে হোটেল ঠিক করিনি। ট্যাক্সিওয়ালাকে বললাম, "যে কোনো মাঝারি হোটেলে নিয়ে যাও।"

আমি বললাম, "এর মধ্যে চিন্তার কি আছে?"

জীবন বলল, "সে একটা মাঝারি হোটেলে নিয়ে গেল। সেখানে জায়গা নেই! তারপর আর একটা হোটেলে নিয়ে গেল, সেখানে জায়গা নেই। তারপর আর একটা হোটেলে নিয়ে গেল সেখানেও জায়গা নেই। তারপর আর একটা হোটেলে নিয়ে গেল—জায়গা ছিল—কিন্তু হোটেলটা মাঝারি নয়—প্রচুর দামী। এই রকম পর পর বারোটা হোটেল যাবার পর একটিতে মনের মত জায়গা পাওয়া গেল। তারা বলে কি করোনেশনের সময় কি কেউ হোটেলের ঘর নিয়ে আমার জন্য বসে আছে? সবাই দেড় বছর এক বছর আগে থেকে ঘর রিজার্ভ করে রাখে। যেটিতে জায়গা পাওয়া গেল, সেটিতেও জায়গা পাওয়া যেত না, তবে যিনি ঘর রিজার্ভ করেছিলেন তিনি জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, শেষ মুহূর্তে জানিয়েছেন যে তাঁর জায়গার প্রয়োজন নেই কারণ তাঁর কুকুরটা মরে গিয়েছে।"

"কুকুরটা মরে গিয়েছে?" আমি অবাক হলাম।

জীবন বলল, "কুকুরটাকে করোনেশন দেখানোই ভদ্রলোকের ইচ্ছে ছিল। সে মরে যাওয়াতে আর করোনেশন দেখবার কি অর্থ থাকে?"

"তা বটে।" আমি বললাম, "কোনো অর্থ থাকে না বটে।"

জীবন চুপ করে রইল।

আমিই আবার সুরু করলাম, "তা চিন্তার কি আছে? আমরা এখন গিয়ে তোর জিনিসপত্র নিয়ে চলে আসব, নাকি সাত-দিনের চার্জ দিয়ে দিয়েছিস?"

জীবন বলল, "চার্জ ফার্জ কিছু দিইনি। ঐ হোটেলে মোটকথা এখন যাবার আর উপায় নেই।"

"কেন? কিছু খারাপ কাজ করেছিস তাই মুখ দেখাতে পারছিস না? হোটেলওয়ালির মেয়ের সঙ্গে কি রসিকতা করবার চেষ্টা করেছিস? যাবার উপায় নেই কেন?"

জীবন বলল, "হোটেলের নামও মনে নেই, ঠিকানাও নয়।"

আমি স্তম্ভিত হলাম।

"হোটেলের নামও মনে নেই, ঠিকানাও গুলিয়ে গেছে?"

"একেবারে।"

কিচ্ছু মনে পড়ে না?"

"না।"

"কেন?"

"কারণ হোটেলের নামটা আমি দেখিনি বলে। আমাকে একটা ছাপানো কাগজ দিয়েছিল—তাতে হোটেলের নাম আর ঠিকানা দুই-ই ছিল, সেটা ভুল করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছি বাজে কাগজের ঝুড়িতে।"

আমি বললাম "কেন ফেলে দিয়েছিস?"

জীবন বলল "আমি কি আর জেনে ফেলেছি? পকেটের থেকে বেরুলো একটা সিগারেটের প্যাকেট। তাতে শেষ সিগারেট।

সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা ফেলে দোব, এমন সময় দেখলাম আজে বাজে অন্য সব কাগজও পকেটে রয়েছে অনেক কিছু। সিনেমার টিকিটের খানিক, এ দোকানের ক্যাশ-মেমো, ও দোকানের বিল। সব ফেলে দিয়েছি আর সেই সঙ্গেই গেছে হোটেলের ঠিকানাটা।"

"টাকা আছে তো?"

"তা আছে।"

আমি বললাম, "তবে আর ভাবনা কি?"

জীবন বলল, "দুটো স্যুট আছে আমার স্যুটকেসের মধ্যে। তা ছাড়া আমার ঠিকানার বই। তাতে যাবতীয় ঠিকানা রয়েছে। আরো কত কি রয়েছে।"

আমি বললাম, "অর্থাৎ হোটেল বার করতেই হবে।"

জীবন বলল, "বার করতেই হবে। স্যুট-কেসের মধ্যে করোনেশন দেখবার টিকিটও রয়েছে।"

আমরা বেরুলাম। শনিবার। সেই পুরোতন দৃশ্য। রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি থেমে রয়েছে—আর তার তলা থেকে সাহেবদের পদযুগল বেরিয়ে রয়েছে। আশ্চর্য দৃশ্য।

জীবনকে দেখালাম। জীবন দেখল, কেবল বলল, "এই কি রসিকতার সময়?"

আমি বললাম, "না।" তারপর বললাম, "কোন পাড়ায় হোটেল মনে আছে?"

জীবন বলল, "সেণ্ট প্যানক্রাস স্টেশন থেকে মিনিট তিনেক ট্যাক্সিতে যাওয়া যায়। বেশি দূর নয়।"

বললাম, "সেণ্ট প্যানক্রাস স্টেশনে গেলে দিক চিনতে পারবি?"

"জানি না।"

বললাম, "এই চেষ্টাই করতে হবে।"

সেণ্ট প্যানক্রাস স্টেশনে গিয়ে নামলাম বাস থেকে। বললাম, "কোন দিকে?"

জীবন বলল, "ঐ দিকে।" বলে একটা দিক দেখিয়ে দিল। তারপরেই বলল, "না—না—অন্যদিকে।" বলে আর একদিক দেখিয়ে দিল। যাই হক—ঠিক করলাম রাসেল স্কয়ারের দিকেই যাব। সম্ভবত হোটেল ঐ দিকেই হবে।

রাসেল স্কয়ারের দিকে যাচ্ছি—হাঁটিতে হাঁটিতে। সেখানে ক্রমাগত হোটেল চোখে পড়তে লাগল। সে কি একটা হোটেল! হোটেলের পর হোটেল—ছোট বড় মাঝারি। যেদিকে যাই সেদিকে হোটেল। হোটেল যেখানে একটা, সেখানে একটা হোটেল হাজার বাড়ির মধ্যে বার করা যায়, কিন্তু যেখানে হোটেল অগণিত সেখানে? হোটেলের অরণ্য থেকে বিশেষ হোটেল বার করবার কায়দা কি?

জীবন বলল, যদি আমরা প্রত্যেক হোটেলে গিয়ে জিজ্ঞেস করি যে, আমি সেই হোটেলে বুক্ করেছি কিনা, তাহলে হয়ত একটা

একটি ছোকরা গোছের লোক ক্যামেরা হাতে এগিয়ে এলো

সুরাহা হতে পারে। প্রথমে তাই করব স্থির করলাম। একটা হোটেলে যাই—জিজ্ঞেস করি, মিস্টার ঘোষ এ হোটেলে আছেন কি? ভাড়া নিয়েছেন কি? তারা খাতা খোলে। খুলে জিজ্ঞেস করে—

"গোশ?"

"গোশ নয়—ঘোষ।"

"গোশ?"

"ঘোষ।"

"ওঃ গশ!"

"গশ নয়, ঘোষ!"

হোটেলের কেরানীর তবু বিশ্বাস হয় না। বলে, "বানান বলো।" কি আর করি—বানান বলি, বানিয়ে নয়, সত্যিকারের বানান। বলি, "জি এইচ ও এস এইচ—ঘোষ।"

কেরানীটি বলে "তাই বলো গোশ—তা এতক্ষণ অদ্ভুত উচ্চারণ করছিলে কেন?"

জীবন আমার কানে কানে বলল, "যেতে দে ভাই যেতে দে—সায়েবরা ঘোষ বলতেই পারে না। দু বচ্ছর ধরে দেখছি তো। ওরা হয় বলে গশ, নয় গোশ।"

তখন একটা কাগজে লিখে দিই নামটা। "না, ইনি এখানে আসেননি।" কেরানী তা দেখে চট করে বলে দেয়।

অবশ্য সব হোটেলেই যে ঢুকি তা নয়। এক একটা হোটেল দেখে জীবন নিজেই বলে, "না—এটায় আমি ঢুকিনি। এর দরজাটা লাল।" অথচ ও বলতে পারে না ও যে হোটেলে ভাড়া নিয়েছে সে হোটেলের দরজায় কি রঙ। একটা হোটেল দেখি, তার দরজার রঙ নীল। জীবন বলে, "না এটা নয়—এ দরজার রঙ নীল।" আমি বলি—"এ এক অতি অদ্ভুত কথা—হোটেলের দরজার রঙ নীল বলে তাতে ক্ষতি তো নেই। ঢুকে একবার দেখতে ক্ষতি কি?"

মাঝে মাঝে তাও দেখি। কিন্তু কোনো হোটেলেই আর জীবনের নাম পাই না। প্রায় ষাটটা হোটেল দেখে নিরাশ হয়ে প্রশ্ন করি—"কোনো হোটেলে এসেছিলি ত, নাকি মনে হচ্ছে কেবল এসেছিলি? এরকম হয়—মাঝে মাঝে এমন ভুল হয়ে যায়......।"

জীবন বলল, "আমি কি ইয়ার্কি মারবার জন্য এত পথ ঘুরছি—হাঁটছি আর হাঁফাচ্ছি?"

সত্যিই দেখলাম, জীবন হাঁফাচ্ছে। আমিও যে হাঁফাচ্ছি তাও তখুনি লক্ষ্য করলাম।

"আমিও যে হাঁফাচ্ছি।" আমি বললাম।

জীবন বলল, "তবেই বোঝ—আমি যদি একদম কোনো হোটেলে না এসে মিছিমিছি নিজেকে খাটিয়ে মারতাম এমন করে, তাহলে নিজের কাছেই আমি বোকা হতাম না?"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, এটাই যেন খুব চালাকির ব্যাপার হচ্ছে! কিন্তু বললাম না।

জীবন বলল, "চল কোথাও চা খাই।"

কাছেই একটা স্ন্যাকবার ছিল, সেখানে বসে বসে চা খেতে লাগলাম। সমস্যার

কথাটাও ভাবতে লাগলাম—কিন্তু কোনো সমাধান অদূরে হবে বলে মনে হল না। জীবন স্ন্যাকবারটি দেখে বলল, "এই জায়গাটা আমার একটি পুরনো দিনের কথা মনে পাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কত পুরনো দিন তাও মনে পড়ছে না—কি ব্যাপারে মনে পড়ছে তাও মাথায় আসছে না!"

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। বললাম, "পুলিসের কাছে গেলে হয় না?"

"পুলিস?" জীবন একটু চঞ্চল হল। সন্দেহও প্রকাশ করল তার কথার মধ্যে, "পুলিস কি করবে?"

আমি বললাম, "কি করবে কি করে জানব? দেখা যাক কি করে।"

জীবন বলল, "না বাবা, কি থেকে কি হয় কে জানে। পুলিসের পাল্লায় পড়লে বড় বিপদ!"

আমি বললাম, "এরা তো সায়েব পুলিস। এদের কত প্রশংসা শুনতে পাই। দেখা যাক তারা কি বলে?"

জীবন তাতে রাজি হল।

আমরা স্ন্যাকবার থেকে থানা খুজতে যাব, হঠাৎ কি দেখে জীবন আর্তনাদ করে উঠল, "পেয়েছি—পেয়েছি!"

আমি বললাম, "কি পেয়েছিস?"

জীবন বলল, "সেই পোস্টটা—যাতে বাজে কাগজ ফেলবার ঝুড়ি আছে—যাতে আমি আমার হোটেলের ঠিকানা ফেলেছি!"

"কোথায়?"

জীবন দেখিয়ে দিল। দেখলাম। দূরে একটা পোস্ট, তার গায়ে একটা লোহার খাঁচা রয়েছে—তার উপর লেখা রয়েছে, 'বৃটেনকে পরিষ্কার রাখো।'

সেখানে গিয়ে জীবন প্রাণপণে কাগজ ঘাঁটতে লাগল। সিগারেটের বাক্স, চকোলেটের মোড়ক, অ্যাসপিরিনের কাগজ, কত কি বেরুল। কিন্তু পাওয়া গেল না ঠিকানা।

একটা সাহেব সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। লম্বা চেহারা—হাতে লম্বা ছাতা, কালো তার পোশাক। সে এগিয়ে এল—"এই, কি হচ্ছে এখানে? নোংরা ঘাঁটছ কেন?"

জীবন বলল, "এ কি নোংরা নাকি? এই জিনিসকে তোমরা নোংরা বল? সুন্দর সুন্দর কাগজ ভরা রয়েছে—এ নোংরাই নয়!"

সাহেব বলল, "নোংরাতে হাত দিলে পুলিস ধরবে।"

জীবন চেঁচিয়েই বলল, "আমি নোংরায় হাত দেব। এতে আমার অধিকার আছে।" বলে কাগজ বার করতে লাগল আর দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে চারদিকে লোক জমে গেল। তার মধ্যে শতকরা নব্বুইজনই সাহেব-মেম, বাকি কিছু নিগ্রো, কিছু চীনে, কিছু জাপানী। লণ্ডনেও সামান্য কারণে ভীড় জমে দেখে আমরা আনন্দই পেলাম। আনন্দের আরো একটা কারণ ছিল, তা হল এই যে, এতদিন আমাদের এত সাহেব-মেম দেখেনি। এমন তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করেনি।

একটি বুড়ি মেম কথা বলছিল বেশ জোরে জোরে—"দিনে দিনে কত দেখব। কোথাকার লোক এরা? এরা বোধ হয় নোংরা ঘাঁটতে ভালবাসে!

আর একটি লোক বলল, না, না, এটা ওদের কোনো ধর্মের অঙ্গটঙ্গ হবে।

একটি ছোকরা গোছের লোক ক্যামেরা হাতে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। সে এসে খুব কাছ থেকে তিন চারটে ছবি তুলল। আমরা হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়ালাম—কিন্তু ছোকরাটি বলল, স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে নোংরা ঘাঁটতে। ছোকরাটি বলল, সে এক কাগজের রিপোর্টার। একটি লোক এক্ষুনি ফোন করে জানিয়েছে—তোমরা নাকি কি সব ধর্মানুষ্ঠান করছ?

—'ধর্মানুষ্ঠান?' জীবন বলল।

ছোকরাটি বলল, ধর্মানুষ্ঠান শুনেই তো আমাদের খবরের কাগজের কর্তা আমাকে পাঠালেন! কি ধর্ম দয়া করে বলবে কি? কোথাকার লোক তোমরা?

আমরা চুপ করে রইলাম। কোনো উত্তর দিলাম না। হঠাৎ জীবন বলল, "এই জায়গায় আমরা যে হোটেলের ঠিকানা পাইনি, তার কারণ আছে!"

আমি বললাম, "কি সে কারণ?"

জীবন বলল, "তার কারণ স্পষ্ট মনে পড়ছে আমি এই ঝুড়িতে কাগজ ফেলিনি!"

এ কথায় রাগ হল। রাগ হওয়াই স্বাভাবিক।

বললাম, "তবে কোথায় ফেলেছ?"

জীবন বলল, "তা জানি না—তবে আমি যে ঝুড়িতে কাগজ ফেলেছি, সে ঝুড়ির রঙ ছিল লাল। এটার রঙ হলুদ।"

বললাম, "এতক্ষণে মনে পড়ল?"

জীবন বলল, "হ্যাঁ। কি করব—যদি দেরিতে মনে পড়ে?"

বললাম, "এদিকে যে আমাদের ঘিরে দু পাঁচশো লোক দাঁড়িয়ে আমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখছে!"

"দেখুক।"

ছোকরা ফোটোগ্রাফার ভীড়েরও একটা দুটো ছবি নিল।

আমরা এগিয়ে চললাম। বাজে কাগজের লাল রঙা ঝুড়ি দেখে আমরা তার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। খুজে খুজে কাগজ দেখতে লাগলাম, কিন্তু মিলল না।

ছোকরা ফোটোগ্রাফার বলল, "তোমরা এই-ভাবে কি খুঁজছো?"

জীবন আস্তে আস্তে বলল, "আমরা একটা হোটেল খুঁজছি!"

"ঝুড়ির মধ্যে হোটেল?" ছোকরাটি আশ্চর্য হল।

"হোটেলের ঠিকানা।" তারপর সমস্ত কথা তাকে বললাম। ছোকরাটি বলল, "তাই বলো! চলো আমিও তোমাদের সঙ্গে ঠিকানা খুজি!"

ঝুড়িতে হাত ঢুকিয়ে ছোকরাটিও ঠিকানা খুঁজতে লাগল।

বুড়ির গলার আওয়াজ শোনা গেল: "সম্মোহন বিদ্যা! ঐ ছেলেটিকে ওরা সম্মোহিত করেছে! কেউ পুলিস ডাকুক, নইলে সবাইকে সম্মোহন ক'রে ওরা প্রত্যেককে দিয়ে ময়লা ঘাঁটাবে!"

একটি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক হাতা গুটিয়ে আমাদের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্তই করতে এল বোধহয়।

জীবন আস্তে আস্তে লোকটিকে কি বলল। লোকটির বিদ্রোহ ভাব মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। দেখা গেল সেও কাগজ বার করছে ময়লার ঝুড়ি থেকে!

এই সময় একটি ছ ফুট দু ইঞ্চি লম্বা পুলিসের আবির্ভাব ঘটল।

"কি হচ্ছে এখানে?"

আমি সমস্ত ব্যাপারটা বললাম। এবারে পুলিসও কাগজ বার করতে সুরু করল। বুড়ি সবাইকে তখন জানাচ্ছে, দুজন কোন্ দেশী ছোকরা পুলিসকে পর্যন্ত সম্মোহিত করে তাকে দিয়ে ময়লা ঘাটাচ্ছে।

ভীড় বাড়ছে দেখে পুলিস বলল, "ব্রেক আপ ব্রেক আপ......কেটে পড় সব!"

পুলিস বুড়িকেও হটিয়ে দিল তার নিজের চরকায় তেল দেবার উপদেশ দিয়ে! তারপর আমাদের বলল, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে ফল হতে পারে! কাছেই কাগজের অফিস সব আছে—আজ বিজ্ঞাপন দিলে কালই সব হোটেলওলা পড়বে সে বিজ্ঞাপন। তাতে কাজ হবে।'

আমরা স্থির করলাম, তাই করব। কাগজেই বিজ্ঞাপন দেব।

আমরা গিয়ে সেই স্ন্যাকবারটিতে দুটো আইসক্রিমের অর্ডার দিয়ে বসলাম। পুলিস চলে গেল।

স্ন্যাকবারে বসে কি ভাষায় বিজ্ঞাপন দেব ঠিক করছি, এমন সময় জীবন বলল, "পেয়েছি!"

"কি পেয়েছিস?"

"হোটেলের ঠিকানা।"

"কেমন করে?"

জীবন বলল, "এখানে যখন আগে আসি, তখন বলেছিলাম না যে, জায়গাটা কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে? চেনা চেনা তো মনে হবেই! এইটেই সেই হোটেল। এর উপরই আমার ঘর! আর এই স্ন্যাকবারের ভেতর দিয়েই যেতে হয়! তাই, জায়গাটা কেমন পরিচিত পরিচিত লাগছিল!"

আমি কঠিনভাবে জীবনের দিকে তাকালাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। আইসক্রিম গলে যাচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি আইসক্রিমের দিকে নজর দিলাম।

স্মৃতিমন্থন

ক্রিকেটের স্বর্ণযুগ

বেরী সর্বাধিকারী
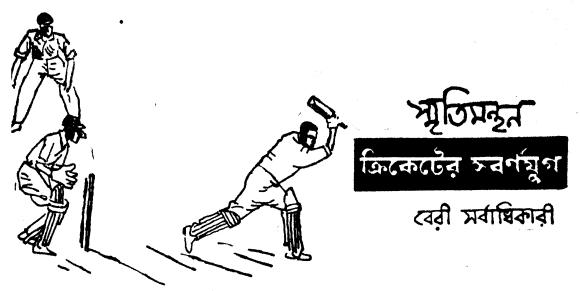
মা কাশচুম্বী ঝাউ গাছের সারি। রঙ-বেরঙের পতাকা, যার মধ্যে ইউনিয়ন জ্যাক'-এর প্রাচুর্য। প্রকাটি সুপরিচিত, স্কুলে। আমি বোধ করি 'ইনফ্যাণ্ট '-এর দু-তিন ধাপ উর্ধে। । স্কুল বিল্ডিং-এ বড় বড় 'ইউনিয়ন ক', তার ছোট সংস্করণও একটা করে য়েছিলাম স্বয়ং হেড মাস্টার, 'স্কটসম্যান' লয়াম অ্যালেকজাণ্ডারের করকমল থেকে, া ছেলেদের মন-ভোলানো টফি-চুশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ, তথাকথিত র্ষ কাইজার পদানত প্রবল পরাক্রান্ত শ সিংহের দাপটে।

াই Peace Celebrations: ওং তর উপলক্ষে উৎসব। সন ১৯১৯। ন্দধারা স্কুলে সীমাবদ্ধ নয়, সর্বত্র, ঐ ট ঝাউগাছ ঘেরা মাঠের মধ্যেও। ক্রীস্ট-তখন। 'বড়দিন'। দাদু (স্বর্গত ডঃ স্যার রনাথ দাস) আমাদের নিয়ে বেড়াতে য়েছেন, গঙ্গার ধার দিয়ে ফেরার পথে ন গার্ডেন্স থেকে উঠল তুমুল হর্ষধ্বনি। ারী লোক, সংক্ষেপে বললেন, 'রের ও কোচবিহারের মহারাজার দলের খেলা, এখন খেলছে কে জানিস— ঙ সিংহ'।

ড় নেড়ে সায় দিলেও কিছুই বুঝিনি। র্থ বোধগম্য হ'ল, সেকালে আমাদের প্রিয় 'সন্দেশ' পত্রিকার একটি ছবি । মস্ত বড় একটা সিংহ, ইয়া বিরাট , 'হাতে' অর্থাৎ সামনের দুটি থাবা ধরে আছে একটা ক্রিকেট ব্যাট। াচ্ছে তো দৌড়োচ্ছেই (অর্থাৎ 'রান') হবার নাম নেই। ছবির তলায় স্ত পরিচয়, 'প্রিন্স রাঞ্জিৎসিনঝী, রেণ্য ক্রিকেট খেলোয়াড়, ভারতের র।' কথাগুলি ঠিক এই না হলেও, ভাবার্থ অনুরূপ।

সেই মুহূর্তেই বোধ করি, সে-ছবি, ছবির পরিচিতির সংজ্ঞা, ঝাউ গাছের সারি, তার মাঝ থেকে 'অবোধ্য' সেই হর্ষধ্বনি মনের মণিকোঠায় আবদ্ধ হয়েছিল। ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যময় ইডেন গার্ডেন্স: অনির্বচনীয়, অনবদ্য, একমেবাদ্বিতীয়ম খেলা—যার নাম ক্রিকেট। দেখলাম, চিনলাম প্রখ্যাত অভিজাত খেলোয়াড়দের। সে-যুগে অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ, সকলে বিশ্ববরেণ্য না হ'লেও দেশ-বরেণ্য: ভারতীয়দের মধ্যে রাজা-মহারাজা-নবাব। দিল্লির রোশানারা ক্লাবে বালকসুলভ স্বপ্নও সত্য হয়েছিল ১৯৩২ সনে; রঞ্জিত সিংহকেও চেনা-জানার অসীম সৌভাগ্য হয়েছিল। তবে সিংহ-নাদ কর্ণে প্রবেশ করে মূর্ছা যাইনি। সদালাপী, মিষ্টভাষী, সৌম্যকান্তি এক 'মহাপুরুষের' সন্ধান মাত্র পেয়েছিলাম।

মার্কাস স্কোয়ার, শ্যাম পার্ক (কিছু পরেই দেশবন্ধু পার্ক), ময়দান, ইডেন গার্ডেন্স, বালীগঞ্জ গ্রাউন্ড ইত্যাদিতে সে-যুগের বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় ক্রিকেটারদের দর্শন পেয়েছিলাম। কিন্তু মানসপটে সর্বপ্রথম যে-দৃশ্য আজও শুধু অম্লান নয়, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, তা স্বনাম-ধন্য ফ্র্যাঙ্ক ট্যারাণ্টকে ঘিরে। ডিসেম্বর মাস, বোধ করি, 'বড়দিন', সন-তারিখ ঠিক মনে নেই, মনে আছে শ্যামবাজার থেকে হাইকোর্ট, ট্রামে সাত পয়সা (নয়া নয়) ভাড়া ধার্য হওয়ায় ধর্মঘট, হেঁটে পাড়ি দিতে হয়েছিল ইডেনে।

সার্থক সেই পদব্রজ। ডালহাউসি এবং অভিজাত শক্তিশালী ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের মধ্যে খেলা, একদিনের। ক্যালকাটার পক্ষে সব মহারথী, যথা হোসি, ল্যাগডেন, ক্যাম্পবেল, জনস্টোন (সি পি), গারনেট (এফ এম—'টম' লংফিল্ডের শ্বশুর), লী (এস সি বি), টুইগ (সি এইচ) ইত্যাদি; ডালহাউসির তরফে ট্যারাণ্ট, প্রায় সবেধন নীলমণি, প্রৌঢ় 'আর্নি' হেজ (সারে কাউণ্টির), উচ্চাঙ্গের উইকেটকীপার হ্যানে—তাছাড়া ওয়েব ভ্রাতৃদ্বয় (জি এম এবং এইচ এফ), মেদবহুল সিম্পসন (যাঁর নাম-করণ হয়েছিল 'মিচেলিন টায়ার', এই টায়ার-এর বিজ্ঞাপনের দৈত্যময় এক আকৃতির অনুকরণে), সকলেই চলনসই।

ট্যারাণ্ট একাই একশ'। বাঁ হাতে স্লো স্পিন বোলার, তবে হোরাইজণ্টাল স্পিন-এ নতুন বলে 'সোয়ার্ভ'-ও করাতেন। পরমাশ্চর্য তাঁর 'ফ্লাইট' এবং 'কণ্ট্রোল'। মেপে-মেপে ছ ইঞ্চি এদিক-ওদিক করে ফিল্ড সাজাতেন, বাতিকের জন্য নয়, বিজ্ঞানসম্মতভাবে। হেজ ফাস্ট বোলার, ফার্স্ট স্লিপে ট্যারাণ্ট উঁচু ক্যাচ ধরলেন, যেটা ক্যালকাটার প্রথম উইকেট। তার পরের দৃশ্য অনির্বচনীয়, ট্যারাণ্ট পর পর বাকি ন'টি উইকেট বাজেয়াপ্ত করলেন।

ক্রিকেট খেলায় ন'টি উইকেট নেওয়া অসাধারণ নয়। 'অনির্বচনীয়' বলেছি একটি কারণে। সেই শীতের দিনে ক্যালকাটা ক্লাবের প্রখ্যাত ব্যাটসম্যানদের মধ্যে যেন 'মড়ক' লেগেছিল। ট্যারাণ্ট-ভীতি, সকলের যেন একটা 'পালাই-পালাই' ভাব। প্রাণ-ভয়ে? প্রাণ অর্থে অবশ্য ইজ্জত। একজন লেগের বাইরে বল্ ও ভয়ে ছেড়ে দিয়ে হ'লেন 'বোল্ড'—round the legs; আর একজন অফের বাইরের বল বুঝে-সুঝে (?), ব্যাট আকাশের দিকে তুলে উইকেট 'কভার' করে দাঁড়িয়ে রইলেন, বল armer, তীব্র গতিতে ভিতরে ঢুকে—সেই নট নড়নচড়ন ব্যাটস-ম্যান হলেন 'লেগ বিফোর উইকেট'।

আর সবচেয়ে 'অপমান'জনক ব্যাপারটা হামেশা দেখতাম; সরল বিশ্বাসে ব্যাটসম্যান খেললেন ফরোয়ার্ড, আধুনিক ভাষায়

স্লাইটে'র মধ্যে বল 'ডিপ' করল, ব্যাটসম্যান পপাতধরণীতলে, হাবুডুবু খাচ্ছেন, আপ্রাণ চেষ্টা করছেন 'মাটি কামড়ে' পিছনের পা পপিং ক্রীজে ফেরাবার, ইতিমধ্যে উইকেট-কীপার হ্যানে করেছেন 'কিল্লা ফতে', সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসধ্বনি 'HOWZZAT'। আউট তো নয়, বেইজ্জত। মাঠের বাইরে স্বর্গত দুখীরামবাবুর 'দরবার' বসত, রসিক লোক, বলেছিলেন—একেই বলে Down and Out! এ-'দরবার' এত উপভোগ্য ছিল, জ্ঞানে রসে যে, চিনাবাদামের চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যেত। সে-যুগে 'কালোবাজার' ছিল না, তাই রক্ষা।

মনে আছে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের মহারথীরা মুখ কালো করে ঘরে ফিরেছিলেন সেদিন। তবে দু' এক বছর পরে, সেই 'বড়দিনেই' ট্যারান্টের উপর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন তাঁরা। হোসি তখন বোম্বাই-এর বাসিন্দা, ক্রীস্টমাসের ছুটিতে কলকাতায় এসেছেন। ক্যালকাটার প্রথম ব্যাটিং, হোসি করলেন সেঞ্চুরী, বেশির ভাগ লেগের মার, বিশেষ করে হাঁটু গেড়ে 'লেগ-সুইপ', পরের পর ট্যারান্টের লেগ-ব্রেকের বিরুদ্ধে, ক্রিকেটের টেকনিকে যেটা বিজ্ঞানসম্মত নয়। তবু, চোখে লেগেছিল, আই পি এফ্ ('চৌনি') ক্যাম্পবেলের ব্যাটিং। ট্যারান্ট বল্ স্লাইট করার সঙ্গে সঙ্গে, ক্রীজ ছেড়ে 'নৃত্যের ভঙ্গীতে' এগিয়ে এসে পিচ্-এর মাথায় ড্রাইভ সত্যই মনোরম। (তদানীন্তন ভারতীয় তথা বাঙালী ব্যাটসম্যান, কার্তিক-গণেশ বোসের অগ্রজ অধুনা প্রখ্যাত ফিল্ম-পরিচালক নীতিন বোসই রপ্ত করেছিলেন এই সুন্দর ভঙ্গী। পরে দেখেছিলাম, ঐ ধারা আরও অনেকের মধ্যে, স্বর্গত পতৌদির নবাবের)।

কভার-পয়েন্টে ক্যাম্পবেলের ফিল্ডিং শ্রেষ্ঠাঙ্গের ছিল। সারে কাউন্টি দলে খেলার সময় বিশ্ববিখ্যাত কভার-পয়েন্ট জ্যাক হব্স্-ও এই 'পোজিশন' ক্যাম্পবেলকে ছেড়ে দিতেন! সে-সময়ের উল্লেখযোগ্য, সমপর্যায়ের কভার পয়েন্ট এবং এক্সট্রাকভার পয়েন্ট দেখেছি 'এলেক' হোসি, (রেঙ্গুন থেকে আগত হিউবার্ট অ্যাশটন, পরে স্যার হিউবার্ট অ্যাশটন্, যিনি সম্প্রতি এম সি সি-র প্রেসিডেন্ট ছিলেন), এবং জ্যাভেরিয়ান দলের এল ডি কারবেরীর।

কিন্তু ক্রিকেটের 'প্রথম আলোর চরণধ্বনি' শুনেছিলাম ট্যারেন্টের কৃতিত্ব দর্শনে। সে-আলো আজও অম্লান, সে-চরণধ্বনির ঝঙ্কার আজও কানে ভাসে। বোলার নন তিনি, শিল্পী; সনাতন সত্যম্ সুন্দরম্'। অপর পক্ষে মনে পড়ে, ক্যাপ্টেন হাউলেটের ফাস্ট বোলিং—যদিও ক্রিকেট-প্রতিভার বিচারে ট্যারান্টের সমগোত্র তিনি ছিলেন না। [illegible]

ট্যারান্টের 'কৌলিন্যের' কাছে ঘেঁষতে পারতেন। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্টেটের খেলোয়াড়, ইংলণ্ডের অভিজাত মিডল্সেক্স কাউন্টি বেছে নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, ডান হাতে ব্যাটিং বাঁ হাতে বোলিং, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার। কিন্তু দোটানায় পড়ে, টেস্ট খেলার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন নি। টেস্ট ক্রিকেটের দুর্ভাগ্য। শীতের সময় ভারতে আসতেন, প্রশিক্ষক হিসাবে, নবনগর, পাতিয়ালা, কোচবিহারের রাজন্যবর্গের আমন্ত্রণে। 'বড় মাঠের'—ঘোড়দৌড়ের ঝোঁক ছিল ট্যারান্টের অসামান্য, 'রেস'-এর মরসুমে কলকাতায় আগমন ছিল তাঁর অবধারিত।

বোলিং-এ ক্যাপ্টেন হাউলেট ছিলেন দৈহিক শক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্যের প্রতীক। সমসাময়িক ব্যাটসম্যানদের মধ্যেও এই শক্তির ইঙ্গিত পাওয়া যেত—আর বি ল্যাগডেন্, সি এম্ কেডী, আর সি কাম্বারলেজের মধ্যে। বিশেষ করে শনিবারের খেলায়। 'ঝাউ গাছ পার' করতে এ'রা ছিলেন বিশেষজ্ঞ। ল্যাগডেন্ অবশ্য সত্যই কুলীন, উচ্চাঙ্গের ব্যাটসম্যান, ব্যক্তিত্বে অসামান্য, 'নীল-রক্তে' ছোট-খাটো উইনস্টন্-চার্চিল বিশেষ! ইংলণ্ডে থাকাকালীন অল্প বয়সেই 'জেনটেলম্যানের' দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার পরই ভারতে না এলে, ইংলণ্ডের ক্যাপ্টেন হবার সম্ভাবনা তাঁর ছিল যথেষ্ট, লর্ডসের ওয়াকিবহাল মণ্ডলীর মতে। এ-কথা প্রথম শুনেছিলাম ইংলণ্ডের প্রাক্তন, প্রখ্যাত ক্যাপ্টেন, পরে এম সি সি-র প্রেসিডেন্ট এবং নির্বাচক মণ্ডলীর সভাপতি, স্যার স্টানলী জ্যাকসনের মুখে, তখন তিনি বাংলার গভর্নর। সন, বোধ করি, ১৯৩০।

কিন্তু স্মৃতিমন্থনের সময়ানুক্রমিক ধারা বজায় রাখতে গেলে ফিরে যেতে হয় কয়েক বছর। ক্যালকাটার ও বালীগঞ্জ ক্লাবের ল্যাগডেন - হোসি - ক্যাম্পবেল - জনস্টোন - ক্যাপ্টেন আর এস্ এম্ হোয়াইট - অ্যালেক লেসলী - জর্জ ক্রেক - পল্ হার্ডার - জে এল্ গিস্ (গাইস্) - কাম্বারলেজ্ - কেডী - 'জনী' ম্যাকডুগাল - এ পি মুইর (বাঁ হাতে মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার) - টি আর এফ্ ব্রুক্ - এ এফ্ হোয়ার্টন্ এবং আরও অনেক খেলোয়াড় যার মধ্যে কয়েকজনের নাম ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। এ'দের অনেকেই কাশীপুর, ব্যারাকপুর ক্লাবেও খেলতেন, সকলেই কিছু 'বাঘা' খেলোয়াড় ছিলেন না, বীর-সংসর্গেই হয়তো তাঁদের শৌর্যবীর্য, যার অনুরণন রেখাপাত করেছিল আমার তরুণ মনে।

সে-যুগ মাত্র শ্বেতাঙ্গ ক্রিকেটারের 'একচেটিয়া' ছিল বললে ভুল হবে; প্রাধান্য তাঁদেরই ছিল, কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং বাঙালী তথা ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে অনেকেই গুণী ছিলেন। 'ক্লাসিক' বলতে ছিল তখন ব্রিটিশ স্কুল্স্, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলস্, বেঙ্গলী (পরে ইণ্ডিয়ান) স্কুলস্-এর বাছাই করা দলের মধ্যে খেলা, সবই মাত্র একদিনব্যাপী।

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলসের ম্যাক্রেডি, সি এস মুর, সি এম্ বারলো, ম্যাকডুগাল (পরে বালীগঞ্জ ক্লাব), গাই ফোর্ড, হ্যারী ফিসার, ব্রুস্ পীক্, পেরেরা (আসানসোল), এনস্লী ভ্রাতৃগণ, এমেট্ ভ্রাতৃগণ (যে পরিবারের জর্জ এমেট্ পরে গ্লস্টারশায়ারের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন), ইত্যাদি। এ'দের মধ্যে অধিকাংশ খেলতেন রেঞ্জার্স ক্লাব, জ্যাভেরিয়ান্স, বি-এন-আর, পোর্ট কমিশনার্স ইত্যাদির পক্ষে। অনেকে চা-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ছিলেন সংযুক্ত, দার্জিলিং, ডুয়ার্সের বাগানে সময় কাটলেও, 'বড়দিন' করতে কলকাতায় আসতেন। ম্যাক্রেডী ছিলেন স্বনামধন্য; মুর-বারলো-এন্স্লী ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের ব্যাটসম্যান; ম্যাকডুগাল-গাই-ফোর্ড ফিসার ইত্যাদি উচ্চস্তরের বোলার।

বেঙ্গলী স্কুলস্ও কম যেত না। বাঙালীর ক্রিকেটের 'জনক' প্রিন্সিপ্যাল সারদারঞ্জন রায়, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রোফেসর শৈলজারঞ্জন রায় ছিলেন উচ্চাঙ্গের ডান-হাতের স্লো স্পিন বোলার। আমার দেখা সে-যুগের প্রখ্যাত ক্রিকেটার মণি দাস (কোচবিহার, অবশ্যই মোহনবাগান এবং হাওড়া স্পোর্টিং-এরও), যোগেন ভট্টাচার্য (টাউন), শৈলজা রায় এবং ভ্রাতা নীরজা রায়, সুশান্ত ঘোষ (এরিয়ান্স), শৈলেশ বোস, হেমাংশু বোস, দেবেন বোস (স্পোর্টিং ইউনিয়নের সুইং বোলার), নরেন ('কঙ্কো') দাস, স্বনামধন্য ও মজুমদার (দুখীরামবাবু) এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র 'ছনে' মজুমদার, আর ('ফকির') মুখার্জি, এম্ ('টগর') মুখার্জি, এন্ ('হাবুল') মিত্র (কুমারটুলী), কে বি ঘোষ, বি এন ঘোষ (বোধকরি, যথাক্রমে পোর্ট কমিশনার্স এবং কুমারটুলী ক্লাবের), ফুটবলের স্বনামধন্য গোষ্ঠ পাল, 'পাটু' মুখার্জি (এরিয়ান্স), 'পাঁচু' চ্যাটার্জি (ই বি আর), বি বি ঘোষ (হাওড়া স্পোর্টিং), কালাধন মুখার্জি (এরিয়ান্স), জে দত্তরায় এবং এম্ দত্তরায় (স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ভ্রাতৃদ্বয় কভারপয়েন্টে ফিল্ডিং-এ সুনিপুণ)—আরও অনেকে—যাঁদের নাম আজ ঠিক মনে পড়ে না)।

বেঙ্গলী স্কুলস্ ১৯৩০-৩১ সন নাগাদ ইণ্ডিয়ান স্কুলসে পরিণত হয়, শুরুর দিকেই ইণ্ডিয়ান স্কুলসের তরফে খেলার আমার সৌভাগ্য হয়। কিন্তু, যে-যুগের কথা বলছি, সে-সময়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ক্রিকেটার, যাঁদের খেলা আমার মনে রেখা-

ত করে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন জে এস্ ার্ডেন (১৯১১ সনে ইংলণ্ড সফরে যিনি শেষ সাফল্যমণ্ডিত হন), আর একজন রসী, খর্বকায় হলেও বেশ ফাস্ট বোলার, । হাতেওয়ালা; মুসলমান খেলোয়াড়দের া আসাদ আলি (একি খেলায় অনন্য), সি মুরাদ, মুরাদ বেগ, এফ এম খান ইত্যাদি। এ-ধরনের 'ক্ল্যাসিকে' কয়েকটি দৃশ্য ও চোখের সামনে ভাসে। সরস্বতী দার দিন ব্রিটিশ স্কুলস্ ও বেঙ্গলী লসের মধ্যে খেলা। বেঙ্গলী ুস্ করেছিল ১৬০ রানের কিছু ী। অল্প সময়ে ব্রিটিশ স্কুলস্ ঐ রান তে বদ্ধপরিকর। শেষাঙ্ক হয়েছিল কীয়। জয়লাভের মাত্র কয়েক রান বাকী। টা উঁচু থ্রো উইকেটকীপার 'ছুনে' মেদার একহাতে যাদুকরের মতো ধরে আউট করলেন।

ুটা উইকেট বোধকরি পড়েছে তখন, কী কী হয়, ন্যাটা ব্যাটসম্যান, সি পি জন- ন তখনও ব্যাট করছেন ফাস্ট বোলার া-পরিচিত প্রিয়কান্তি সেনের বিরুদ্ধে। টু বাইরে-বাইরে বল দিচ্ছিলেন প্রিয়- ন্তবাবু। লেগের বাইরে বল সপাটে চু' ফস্কে গিয়ে, ছ' ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা স্‌ম্যান 'ব্যালান্স' হারিয়ে উইকেটে ল আর কী, 'হিট উইকেট' অনিবার্য। ু বিপদ হৃদয়ঙ্গম নিশ্চয়ই হয়েছিল, কটের সামনে দু' তিনবার 'হপ্' করে, র দু'পা ফাঁক করে, পাক্কা 'জীমন্যাস্ট'-এর । উইকেটের উপর লাফ দিয়ে 'সি পি' যাত্রা রক্ষা পেলেন। বেশ লম্বা ছিলেন রেহাই পেলেন, উপস্থিত বন্দিদেরও াফ করতে হয়। খেলা হয়েছিল ড্র।

ার একবার, ঐ ইডেনেই। দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ সের ব্যাটিং 'সাইডাকে' প্রফেসর জা রায় মাত্র দু'শ রানে নামিয়ে দিয়ে- ন, মারাত্মক স্পিন বোলিং-এর ফলে ই প্রায় সারা সকাল বল করে ৭ উই- নিয়েছিলেন প্রায় ৮০ রান দিয়ে। নে ফাস্ট বল করতেন, ভাল ব্যাটসম্যানও ান, সাইকেল দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা ্যা ছোট হয়ে যায়। কিন্তু 'মাথা' তাঁর নেবে; সেই মাথা, বুদ্ধির জন্য তিনি ঙ্গর স্লো বোলার হ'ন। ঐদিনে নিজেই ব্যাটিং ওপেন করেন, মারের খেলা । আশা জেগেছিল বেঙ্গলী স্কুলসের ুজের। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলাতে নি বেঙ্গলী স্কুলস্ দল। সে-খেলা ীয় হয়ে রয়েছে 'পাঁচু' চ্যাটার্জির এক ব্যাটিং করে বেশ কিছু রান করার

ুক্তির বাঁধ ভঙ্গুর, সময়-কাল-পাত্রে . মানে না। সেই ঝাউ-ঘেরা দর ইডেন। সেই 'ঝড় দিনে'। সর্বপ্রথম সরকারী এম সি সি দল ভারতে সফর-রত, কিন্তু সরকারী টেস্ট-এর প্রশ্ন ওঠে না সেদিনে। সফর ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবের উদ্যোগে, ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড তখনও দূরে অস্ত। আর্থার গিলিগ্যান্ ক্যাপ্টেন, দলে মরিস্ টেট, জর্জ গীয়ারী, আর ই এস্ ('বব্') ওয়্যাট্, 'অ্যাণ্ডি' স্যাণ্ডহ্যাম্, মার্সার (বোলার), অতিকায় উইকেটকীপার জর্জ ব্রাউন, ইত্যাদি।

একদিনের করে খেলা ব্রিটিশ এবং সম্মিলিত অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও বেঙ্গলী স্কুলসের দলের বিরুদ্ধে।

মনে পড়ে কার্তিক বোসের টেট্‌কে-'হুক' করার চেষ্টা, শর্ট লেগে মার্সারের হাতে 'লোপ্পা' ক্যাচ; মণি দাসের অভ্যাস মতো উইকেটের কাছে মাটিতে হাত ঘষে স্টান্স নেওয়া, টেট্-এর প্রথম বলেই বোল্ড (কোনও 'রসিক' বলেছিলেন : 'দেখলে হে, সিঙ্গল বল ডাবল জার্নী, কাকে বলে?'); ওপনিং ব্যাটসম্যান 'ঢাকার ভোলা'-র প্রায় অনুরূপ শোচনীয় অবস্থা; 'হাবুল' মিত্রের বেপরোয়া ব্যাট চালানো, বোধ করি, দু' একটি ওভার-বাউণ্ডারী সমেত; নীরজা রায়ের একজনকে রান-আউট করে পরে নিজে রান-আউট হওয়া, অন্তবর্তী সময়ে মনোহর ব্যাটিং, বিশেষ করে টেট্-এর ইনসুইং বলে পর পর দু'টি লেগ-গ্লান্সে বাউণ্ডারী। পরাজয় অনিবার্য, কিন্তু হারজিতের খবর কে রাখে, লাভই বা কী? 'নীবা-হাবুলের' স্মৃতি হয়ে থাক অম্লান!

ব্রিটিশ স্কুলসের বিরুদ্ধে খেলায় মনে পড়ে ট্যারান্টের ব্যাটিং, বোধ করি, ৪০-৪৫ রান, কিন্তু 'লেট্-কাট'-এর কী বহর! আর মনে পড়ে দিনের শেষ বল স্যাণ্ডহ্যাম খেলেই, যেন স্ট্রোকের সঙ্গেই তাঁর প্যাভিলিয়নের দিকে পা বাড়ানো। পরের তিনদিনব্যাপী 'ইওরোপীয়ন্স ইন্ দী ইস্ট' দলের বিরুদ্ধে খেলায় স্যাণ্ডহ্যামের, বোধ করি, সেঞ্চুরী; বৃষ্টিপাতের পর ট্যারান্টের ৭৫ রানে ৬টি উইকেট নেওয়া আজও চোখে ভাসে।

বিশেষ করে ট্যারান্টের শেষ উইকেট— কট্ অ্যাণ্ড বোল্ড—ক্যাচ ধরার পর দেখা গেল হাতে রক্ত, ফেটে গেছে বিশ্রীভাবে, যার জন্য 'ইণ্ডিয়ান ইলেভেন'-এর হয়ে খেলতে পারেন নি, কিন্তু আম্পায়ারিং করলেন স্বনামধন্য ইয়র্কশায়ার এবং ইংলণ্ডের অলরাউণ্ডার উইলফ্রেড রোডসের সঙ্গে।

'ইউরোপীয়ান্স ইন দী ইস্ট'-এর ক্যাপ্টেন ল্যাগডেন্-দলে ক্যাম্পবেল-হোসি-জনস্টোন-গাইস ইত্যাদি ছাড়াও ছিলেন তখন কলম্বোতে স্থায়ী উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যান এফ আর আর ব্রুক, রেঙ্গুনের হিউবার্ট অ্যাশটন্, জামনগরের রাজপরিবারের শিক্ষক আর এফ জি মায়ার (ব্যাটসম্যান এবং মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার), তাছাড়া ট্যারান্ট। তবু এমন শক্তিশালী দল হল কাবু অসহায় ভাবে, তৃতীয় দিনের সকালেই। বৃষ্টির পর হাড়-কাঁপানো শীত, আজও মনে পড়ে।

'ইণ্ডিয়ান ইলেভেন'-এ সবই 'ইয়ো- রোপীয়ান্স ইন দী ইস্ট'-এর খেলোয়াড়, ল্যাগডেন্ ক্যাপ্টেন, ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র সি কে নাইডু ও ফাস্টবোলার নাজীর আলি। সাময়িকভাবে, কোনও রাজনৈতিক কারণে, ল্যাগডেন তখন বেশ আন্‌পপুলার, দর্শক- বৃন্দ বল ধরলেই তাঁকে barrack করে, আগের ম্যাচে ব্যক্তিগত অসাফল্য, ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দিলেন ক্যাম্বেল্‌কে। ট্যারান্টেরও চোট্ লেগেছিল, দু'জনের স্থান পূরণ করলেন ওপনিং ব্যাটসম্যান ওয়াজীর আলী এবং বোম্বাই-এর প্রখ্যাত ন্যাটা স্লো স্পিন বোলার পারসী দলের জামশেডজী।

মানসপটে ভেসে ওঠে সি কে নাইডুর চকিতে স্যাণ্ডহ্যাম্‌কে রান-আউট করা, স্লিপ থেকে; মোটাসোটা বেঁটে জামশেডজীর দু'টি পর পর এল-বি-ডব্লিউ নেওয়া, উভয়ক্ষেত্রেই আম্পায়ার ট্যারান্টের আকাশমুখী তর্জনী; দ্বিতীয় ইনিংসে জে এল গাইস্ এবং এফ আর আর ব্রুকের প্রায় ১৬০ রানের ওপনিং পার্টনারশিপের পর শর্ট-লেগে মার্সার-এর অভাবনীয় ক্যাচ্ ও বিরসবদনে গাইসের (বোধ করি, সেঞ্চুরী না হওয়ায়) প্যাভি- লিয়নে প্রত্যাবর্তন। এক অশুভ প্রভাতে মরিস্ টেট্ তাড়াঘাড়ি ৫।৬ রানের মাথায় (দ্বিতীয় ইনিংসে) নাইডুকে এল-বি-ডব্লিউ নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু দর্শকের 'ভগ্নহৃদয়ে' ইডেন ত্যাগ (হয়তো আপিসে হাজিরা দেবার জন্য!)। 'ইণ্ডিয়ান ইলেভেন'- এর যখন জয়লাভের সূচনা, তখনই সকল আশা ধূলিসাৎ হল উইকেটকীপার ব্রুক্, ক্যাপ্টেন হাউলেটের বলে বব্ ওয়্যাট-এর ক্যাচ্ ফেলার ফলে; সেই ওয়্যাট্ই যখন অপরাজিত থেকে ৯৭, তখনই হল ৩।৪ উইকেটে এম সি সি-র জয়লাভ, ক্রিকেটের আইনের অনেকেই করলেন 'আদ্যশ্রাদ্ধ'—এ কেমন আইন, বেচারা ওয়্যাট্, সেঞ্চুরী তাঁর হল না। ইংরেজের খেলা তো, তৈরী করবে স্কচ্ হুইস্কি কড়া করে, খাবার সময় জল মেশাবে!

দু'এক বছর পরে, ছাত্রাবস্থায়ই, খেলার মাঠে ও বাইরে ল্যাগডেন্-হোসি-ক্যাম্পবেল্- লেসলী-লংফিল্ড (তরুণ ও কেম্ব্রিজ থেকে সদ্যাগত)—'মারে' রবার্টসন ইত্যাদির সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা। ঠিক তার পরই কোনও শুভক্ষণে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার স্টানলী জ্যাকসনের পরিচয়; শুভই, কারণ জ্যাকসনই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর নিজের দল গড়তেন শক্তিশালী ক্লাব বা সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে বার্ষিক খেলার জন্য, যার ভিতরে পেয়েছিলাম আংশিকভাবে 'ইউনিভার্সিটী অকেসনালস্' ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রেরণা।

ইতিমধ্যে একবার দিল্লির রোশানারা ক্লাবে ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সনে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ঘুরে আসা যাক। স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের ওপনিং ব্যাটসম্যান তখন আমি; প্রথমবার পরাজয় ভূপালের নবাবের, দ্বিতীয়বার ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজকুমারের দলের হাতে, দু'টিই সর্বভারতীয় দল বলা যেতে পারে। কিন্তু এ-সবই প্রসঙ্গত। সেই সময়েই প্রথম আলাপ হয়েছিল তরুণ অ্যান্টনী ডি মেলোর সঙ্গে, সবে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের গোড়াপত্তন করেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত, 'চোখে-মুখে কথা', মনে হল কিছুটা 'স্বপ্ন-বিলাসী'। আমার সে ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়ই, স্বপ্নকে সত্য করে, কল্পনার রূপ দিয়ে। আদবকায়দায় 'সাহেব', অন্তরে ভারতবাসী। মূল্যবান পুরু গালিচা-'মোড়া' রোশানারা ক্লাবের এক ঘরে আলাপ করিয়ে দিলেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট আর ই গ্রান্ট-গোভনের সঙ্গে।

দিল্লির রোশানারা ক্লাবের অল ইণ্ডিয়া টুর্নামেন্টে দর্শন পেয়েছিলেন বহু মহারথীদের, দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার দৈত্যসম রামজী; স্বনামধন্য ব্যাটসম্যান পি ভিট্টল, সি কে নাইডু, এল পি জয়, 'ন্যাটা' এ ইউ বোটাওয়ালা, ওয়াজীর আলী, ফিরোজ খাঁ, মাহালে, ইফতিখার-উদ্-দীন, দিলওয়ার হোসেন ইত্যাদি; বোলারদের মধ্যে (অবশ্য প্রথমোক্ত ব্যাটসম্যানের তালিকায় অল-রাউণ্ডারদের বাদ দিয়ে) প্রখ্যাত ওয়াজীর আমেদ (আলিগড়), আবদুস্ সালাম, সালামুদ্দিন খাঁ (জাস্টিস্, ১৯১১ সনের ইংলণ্ড সফরের ফাস্ট বোলার), প্রোফেসর এস্ এস্ জোশী (বাঁহাতে মিডিয়াম-স্লো ইনস্ইং ও লেগব্রেক বোলার), ফাস্ট মিডিয়াম আজিম খাঁ (আজমীঢ়), ইত্যাদি।

অনেক কথাই মনে পড়ে, তার মধ্যে চোখে ভাসে সি কে নাইডুর ৯২।৯৩ রান করার পর প্রোফেসর শৈলজা রায়ের তড়িৎ-গতি অফ্‌ব্রেকে অসহায় ভাবে লেগ-বিফোর-উইকেট হওয়া (১৯২৩ সনে নাগপুরে বোম্বাই - বেঙ্গল - সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস ট্রায়াঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় ভিট্টল প্রোফেসর রায়ের বোলিং দেখেছিলেন, মন্তব্য করলেন প্রোফেসরের বোলিং-এর 'ধার' কমেনি, বরং বেড়েছে; সি পি-র সি কে নাইডু সমেত—বিরুদ্ধে হেমাঙ্গ বোস দুর্দান্ত অফ্‌ব্রেক বোলিং ম্যাটিং উইকেটে করে ১৫ রানে ৭টি উইকেট নেন, বোম্বাই-এর বিরুদ্ধে প্রোফেসর রায় নিয়েছিলেন ৬৮ রানে ৪টি, তাঁর কথাও উল্লেখ করেন ভিট্টল)।

মানসচক্ষে আজও স্পষ্ট রামজীর মারাত্মক বোলিং, তা সত্ত্বেও অসুস্থ কার্তিক বোসের ৪০।৪৫ রান চমৎকার ভাবে; নাইডু-রামজীর মধ্যে 'দ্বন্দ্ব', পর পর বাম্পারে মার খেয়েও ঝড়ের মতো নাইডুর ২৫।৩০ মিনিটে ৮০।৯০ রান; জয়-ওয়াজীরের ব্যাটিং; ভোজবাজির মতো নাইডুর আমার ক্যাচ্ ধরা; আবদুস্ সালামের বোলিং-এর নিপুণতা, আরও কত কী।

পট পরিবর্তন হয়, 'ইউনিভার্সিটী অকেসনল্‌স্' দল গড়ে, সিংহদ্বার প্রবেশ মাত্র নয়, ভারতীয় ও 'আন্তর্জাতিক' ক্রিকেটের অন্দরমহলে দৃষ্টিপাত, কখনও স্বচ্ছ কখন বা কিছুটা ঝাপসা। ঐ রোশানারা ক্লাবেই অনবদ্য দলীপ সিনঝীর ব্যাটিং, তাঁর জুটি (স্বর্গত) পতৌদির নবাবের সঙ্গে—'দলীপ' ১৩০।১৪০, 'প্যাট' ৯১ করে রান আউট! সন ১৯৩২, ট্যারান্ট তখনও বেশ ভাল খেলেন, স্টোক করেই তাঁর: 'Come one, Come two', অভ্রান্ত পার্টনারকে ডাকা আজও আশ্চর্য মনে হয়।

নয়াদিল্লির নতুন 'ফিরোজশাহ্ কোট্‌লা' মাঠে, যার প্যাভিলিয়ন লর্ড উইলিংডনের নামে (তদানীন্তন 'ভাইসরয়', যিনি ছিলেন 'অকেসনল্‌স্'-এর 'প্রেট্রন্-ইন-চীফ্', যাঁর দলের সঙ্গে আমাদের বাৎসরিক খেলা হত)। সেই কোট্‌লা মাঠে মহম্মদ নিসারের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তথা সারা পৃথিবীর প্রখ্যাত কনস্টানটাইন ও নাইডুর জুটিতে মারের বহর; অমর সিং-এর অবর্ণনীয় বোলিং; জার্ডিনের এম সি সি দলের বিরুদ্ধে অমরনাথের অমৃতসরে, পরে বোম্বাই টেস্টে 'চোখ-ঝলসানো' সেঞ্চুরী; অকেসনল্‌সের (১৯৩৫) সিংহল সফরে ডঃ গুণশেখরের ব্যাটিং, এডওয়ার্ড কেলার্টের অফ-ব্রেক বোলিং, আমাদের মার্চেন্ট, ওয়াজীর, পালিয়া, কার্তিক বোসের ব্যাটিং; সুটে ব্যানার্জির ভারতীয় ক্রিকেটের উঁচুমহলে স্বীকৃতি; এম সি সি-র (১৯৩৩—৩৪) ভেরিটী - ক্লার্ক - নিকোল্‌স্ - ল্যাংগ্রিজের বোলিং, ওয়ালটার্স-ভ্যালেন্‌টাইন্-জার্ডিন-মিচেল্ ইত্যাদির ব্যাটিং: এম সি সি-র বিরুদ্ধে পাঞ্জাব গভর্নরের দলের পক্ষে নাইডুর 'ধুমেপট্‌কা'র (নাইডুর নিজস্ব ভাষা!) মতো সেঞ্চুরী—কতো দৃশ্যই আজও চোখের সামনে ভাসে, মনে হয় যেন এই সেদিন।

১৯৩৫ সনে আসে স্বর্গত পাতিয়ালার মহারাজার প্রচেষ্টায় জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে শক্তিশালী একটি দল। ভারতের বহুস্থানে তাঁদের খেলা দেখেছি, কিন্তু দুটি স্মৃতি আজও রয়েছে মনের মণিকোঠায়। ইডেনে বাঁহাতে বল করে ম্যাকার্টনী, বোধ করি, ৬টি উইকেট বাজেয়াপ্ত করলেন, 'ইণ্ডিয়ান ইলেভেন' আউট হল মাত্র ৪৯ রানে; নিসার এবং 'লেগ-কাটার' বাকা জীলানী পাল্টা জবাব দিলেন অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ইনিংসে মাত্র ৯৯ রানে আউট করে।

আর দ্বিতীয় ইনিংসে অক্সেনহ্যামের দুর্দান্ত বোলিং; 'ডিনারে' ল্যাগডেন্ 'সাহেব' পর্যন্ত যার তারিফ করলেন: 'damn good bowler' বলে, পরেরদিন কাগজে অবশ্য 'damn' বাদ দেওয়া হয়েছিল। যার জন্য বক্তা হয়েছিলেন আশ্চর্য এমন 'রুচির' পরিচয় পেয়ে! সেকেন্দ্রাবাদে (হায়দরাবাদ) আবার মুগ্ধ হয়েছিলাম অমরনাথের সেঞ্চুরী অমর সিং-এর দুর্দান্ত বোলিং দেখে; অপর পক্ষে রাইডার ও ম্যাকার্টনীর মারের বহর দেখে, যার ফলে সুটে ব্যানার্জি ছাব, মহম্মদ নিসারকেও 'সাইট-স্ক্রীনের' পাশে 'লং অন' এবং 'লং অফ' রাখতে হয়েছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে লর্ড উইলিংডন যাই হোন, ক্রিকেটে অনুরাগ তাঁর ছিল অসীম বর্ণনির্বিশেষে তাঁর কাছে সব ক্রিকেটারই ছিলেন সমগোত্র। 'ইউনিভার্সিটী অকেসনল্‌স্' দলের সভাপতি হিসাবে স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ক্যালকাটা ক্লাবে পার্টি দেন, সম্পাদক হিসাবে সকল দায়িত্বই আমার ওপর।

পার্টির দিন সকালে সিকিউরিটী ডিপার্টমেন্ট থেকে জনৈক ইন্সপেক্টর আমাদের গৃহে পদার্পণ করে দাবী জানালেন দুটি। নিমন্ত্রিত অতিথির তালিকার 'কপি', এবং পরমাশ্চর্য বিশেষ ৫।৬ জন সভ্যকে পার্টিতে প্রবেশের পূর্বে 'নিভৃতে' সার্চ করার অধিকার। 'কপি' দিলাম, অন্য ব্যাপারটি বললাম, অসম্ভব।

কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই 'বেলভেডিয়ার'-এর ইন্সপেক্টরের সামনেই টেলিফোন করে 'কম্পট্রোলার অব ভাইসরয়স্ হাউস-হোল্ড' মেজর ব্রিটেন জোন্স-কে সংক্ষেপে ব্যাপার বুঝিয়ে জানালাম সম্ভাব পার্টি বাতিল। দশ মিনিটের মধ্যেই "বেলভেডিয়ার" থেকে টেলিফোন, প্রথম ব্রিটেন-জোন্স পরে স্বয়ং উইলিংডন জানালেন, পার্টি ঠিকই আছে, করণীয় যা-কিছু তাঁরাই করেছেন।

তখন আমি 'ছোকরা', বয়স্থ ইন্সপেক্টরের মুখ ফ্যাকাশে, আমতা-আমতা করে বললেন: 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আমরা মাত্র ডিউটী করি!'

অনেকদিনের অনেক কথা বলেছি, অনেক কিছু বলার রয়ে গেল। স্মৃতির ভাণ্ডার অশেষ, নিঃশেষে স্মৃতিমন্থন অসম্ভব, তাই পূর্ণচ্ছেদ টানতে হয় আমার স্মৃতির প্রথম দু' যুগের পরেই। মনে যেন কি দ্বিধা রয়ে গেল, পুরানো সেই দিনের কথার শেষ কথা না বলার কারণে। সান্ত্বনা মাত্র পাই কবিগুরুর অমর বাণীতে: 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে'।

নিরাপদ আশ্রয়

মতি নন্দী

স᠎ঁড়িতে দ্‌জন উঠছে। শব্দের প্রকারে বোঝা যায় প্রতি-যোগিতা হচ্ছে আগে ওঠার। তিন তলার ল্যান্ডিং-এ একজন খিলখিল হেসে চার তলার সিঁড়ি। পিছনে তাকিয়ে উঠছেন, দু হাতে নটাকে বুকে চেপে। তবু বাম বাহু ঃ আঁচল লুটোচ্ছে। উত্তেজনার ঝাপটে রক্তিম। চার তলায় পেঁছবার মুখে ন তাকিয়েই দেখলেন, পাশের ফ্ল্যাটের লবাবু, সঙ্গে একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোক দিকেই তাকিয়ে, চোখে কৌতূহল। সেই সিঁড়ি থেকে অপর প্রতিযোগী হাঁস-করে বলল, "রাণু আস্তে, তোমার হার্ট প কিন্তু!" উনি পিছনে তাকিয়ে শেষ অতিক্রম করে পা রাখতেই আঁচলে র হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

র্মল এগিয়ে যাচ্ছিল। তার আগেই া চটপট উঠে লজ্জায় মুখ নামিয়ে দের ফ্ল্যাটের দরজায় দুমদুম কিল নন।

াণু, কোথায় লাগল?" বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে ওর স্বামী উঠে এলেন। প্রথমেই নজরে আসে মাথাজোড়া টাক ও দেহের হৃষ্টপুষ্ট আয়তন। দৌড়িয়ে ফিরছেন তাই পরনে হাফ প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জী ও কেডস।

"ডাক্তারের বারণ, তবুও তুমি," উবু হয়ে তিনি স্ত্রীর গোড়ালিতে হাত রাখলেন।

"কিছু হয়নি, কিছু হয়নি।" আরো কয়েকটা অধৈর্য কিল দরজায় পড়ল। এর মধ্যেই চাপা গলায় একবার বললেন, "পা ছাড়ো।"

ওরা দরজা বন্ধ করার পর নির্মল বলল, "আমার প্রতিবেশী। বেশ সুখেই আছে।"

অনন্তর স্ত্রী বলল, "দুজনের মধ্যে কিন্তু বয়সের তফাত অনেক।"

নির্মল জানাল, "প্রায় আঠারো বছরের। মিস্টার গুহ নিজেই বলেছেন, উনি এখন পঞ্চান্ন, স্ত্রী আটত্রিশ। বিয়ে হয়েছে প্রায় ষোল বছর।"

স্বামীকে লক্ষ্য করে অনন্তর স্ত্রী বলল, "কি রকম ভাই-বোনের মত ভালবাসা না?"

অনন্ত এতক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে ছিল। স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত না করে নির্মলকে বলল, "ওকে কিন্তু চেনা-চেনা লাগল, নাম কি রে?"

"কার?"

"মহিলাটির।"

"মালতী গুহ।"

অনন্ত যে রকম মুখভঙ্গী করল, তাতে যেন একটা রহস্য ঢুকে গেল। "সুখে থাকলেই ভালো। এবার তাহলে চলি, তুই কিন্তু বুধবার অবশ্যই যাবি, কেমন।"

নির্মল ঘাড় নাড়ল। স্ত্রীকে নিয়ে অনন্ত সিঁড়ি ধরল। কয়েক ধাপ নেমেই হঠাৎ ফিরল। নির্মল তখনো দাঁড়িয়ে। বাল্‌বটা কম পাওয়ারের। দেয়াল বিবর্ণ। জানলা দিয়ে রাস্তার গাছ-গুলো দেখা যায়, মরা পাতার সঙ্গে কিছু সবুজ মিশে রয়েছে। এতবড় ফ্ল্যাট-বাড়িটায় কোন সাড়াশব্দ নেই। অনন্ত ছমছম করে উঠল।

"তোর ভয় করে না একা থাকতে?" হেসে নির্মল মাথা নাড়ল। অনন্ত নেমে গেল।

ঘরে আলো জ্বলছে। নির্বিঘ্নে দুটো টেবল

ল্যাম্পই নির্মল জ্বালল। লম্বা টেবিল। অভিধানগুলো সার দিয়ে হেলিয়ে রাখা। পাতাগুলো মৃতের চোখের মত খোলা। ল্যাম্প দুটো বইগুলোর মাঝে ঘাড় নুইয়ে। ঘরের অধিকাংশই চাপা অন্ধকারে ছাওয়া। দেয়াল-ঘড়িটা টকটক শব্দ করে চলেছে। অতি ধীরে মাথার উপর পাখা ঘুরছে। জানলা দিয়ে হাওয়া এলে পর্দাটা ফুলে উঠে থরথর করে কাঁপে। নির্মল তখন সন্তর্পণে তাকায়। স্টীলের আলমারিটা অন্ধকার কোণায় ঠায় যেন অপেক্ষা করছে। দেয়ালজোড়া বইয়ের শেলফ্। তখন সে কলম রেখে বইগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাইরের দরজায় খুট্-খুট্ শব্দ হল। গয়ারাম দরজা খুলে দিল।

"নির্মলবাবু কি কাজে বসে গেছেন", বলতে বলতে পাঞ্জাবী-পাতলুন পরা গুহ ঘরে ঢুকলেন। নির্মল কুঁজো হয়ে বসেছিল, ঘাড় ফিরিয়ে হাসল।

"তখন দেখলেন তো কি জোরে পড়ল," চেয়ার টেনে গুহ শুরু করলেন, "এই নিয়ে একচোট হয়ে গেল।"

"আপনাদের তো রোজই একচোট হয়।"

"কথা তো শুনবে না। ডক্টর সেনগুপ্ত তো বলেই দিয়েছেন, পরিশ্রম একদম চলবে না, কমপ্লিট রেস্ট। অথচ দেখলেন তো কিভাবে দৌড়ে উঠল।"

গুহ সুগন্ধি রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন। নির্মল কলমটা টেবিলে ঠুকল।

"আপনার এই ঘরটা কি রকম স্যাঁতসেঁতে লাগে, বোধ হয় অন্ধকার-অন্ধকার বলেই, না?"

"আপনি প্রত্যেক দিনই একথা বলেন।"

"প্রত্যেক দিনই যে এই রকম মনে হয়, এক রকম।" হঠাৎ টেবিলের দিকে ঝুঁকে গুহ বললেন, "কদ্দুর এগোলেন।" একটুখানি উঠে টেবিলে রাখা পাণ্ডুলিপি দেখতে দেখতে, "ওরে বাবা, ডেথ-এ পৌঁছে গেছেন। অ্যাঁ, এখুনি ডেথ, মৃত্যু? নাউন, বিশেষ্য। মরণ, জীবনাবসান, হত, ধ্বংসকারী শক্তি, অধ্যাত্ম জীবনের অভাব...এটার মানে কী?"

"কিসের?"

"এই অধ্যাত্মজীবনের অভাব?"

চেয়ারে মাথা এলিয়ে নির্মল বলল, "মানে আর কি, এমনই।"

"বাঃ, অভিধানে কি এমনি এমনি কোন কথা থাকে!"

"থাকে না? সব কথাই কি আমরা ব্যবহার করি!"

নির্মলের মনে হল, কথা বলতে শুরু করলে এ লোকটা জমিয়ে বসবে। এমনিতেই ক্লান্ত লাগে, তার উপর বোকার মত প্রশ্ন করে যাবে! কাল বলেছিল, আপনি বিয়ে করেন নি কেন?

"শব্দ গুনে গুনেই তো পাবলিশার টাকা দেয়, তাই একটু বাড়িয়ে দিলাম।"

গুহ দুই হাঁটু নাড়তে শুরু করলেন। ব্যাপারটা যেন এখন বুঝে ফেলেছেন। "ফাঁকি দিয়ে লাভ করছেন, তাই অধ্যাত্ম-জীবনের অভাব!" কপালে মুখে পর পর কতকগুলো রেখা ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গেল।

"আচ্ছা মিস্টার গুহ," নির্মল কলম দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে শুরু করল। গুহ হাঁটু নাড়ান বন্ধ করলেন।

"কি বলছিলেন, বলুন।"

"আচ্ছা আপনার কখনো কি মৃত্যু-ইচ্ছা হয়েছে?"

সঙ্গে সঙ্গে গুহ সিধে হয়ে বসলেন। ব্যগ্র হয়ে বললেন, "কেন, কেন, একথা বলার অর্থ?"

"অভিধানে কথাটা আছে তো তাই বললাম।" নির্মল সন্তর্পণে কলমে ঢাকনা পরালো। ধীরে ধীরে ঘুরে বসল। টেবিল-ল্যাম্প ঘুরিয়ে দিল গুহ-র দিকে। অস্বস্তিতে চোখ পিট পিট করল গুহ।

"দেয়ালের আলোটা জ্বাললে হয় না?"

নির্মল যেন শুনতেই পেল না। বারান্দার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে বলল, "একদিন তো মরতেই হবে, আমাকে, আপনাকে, আপনার স্ত্রীকে সবাইকেই। সেকথাটা কি ভেবে দেখেছেন? নিশ্চয় ভেবেছেন, কিম্বা কোন না কোন দিন ভাববেনই। তখন কি মনে হবে?"

"আলোটা একটু ঘুরিয়ে দিন না।"

নির্মল একদৃষ্টে গুহর দিকে তাকিয়ে রইল। গুহ হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা সরিয়ে দিতে গেল। নির্মল ওর নাগালের বাইরে টেনে নিল।

"মনে হবে ভীষণ একা। পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপারই নিরর্থক। যে দৃশ্যকে তারিফ করছি, যে নারীকে ভালবাসছি, যে সন্তানের মঙ্গল কামনা করছি, এ সবই ক্ষণস্থায়ী। এর পিছনেই ওৎ পেতে রয়েছে ধ্বংস। তাই না?"

নির্মলের কণ্ঠস্বর ভ্যাপভ্যাপে শোনাল। গুহ সুগন্ধি রুমালে মুখ মুছে, অস্ফুটে বললেন, "আজ কেমন যেন গরম পড়েছে।"

"হ্যাঁ, পাখাটা বাড়িয়ে দিন না।"

গুহ রেগুলেটর টেনে পাখার বেগ বাড়িয়ে এলেন।

"আপনার ঘরে বাইরের হাওয়াও আসে না।"

"হ্যাঁ।" নির্মল আলোটা ঘুরিয়ে নিল, সঙ্গে সঙ্গে গুহ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন।

"কি সব আজেবাজে কথা যে বললেন। সবই যদি নিরর্থক তাহলে এত সব কিছু গড়ে উঠত না।"

নির্মল চেয়ারে মাথা হেলিয়ে ক্লান্তভাবে বসে রইল। গুহ আর একটু উৎসাহ ভরে বললেন, "আপনার মত করে যদি সবাই ভাবতো, তাহলে এসব কিছুই হত না।"

"কি হত না?"

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডে দুর্গাপুর ও রাণীগঞ্জের মধ্যবর্তী/
সিংগারণ সেতু

"এই বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, ছেলেপুলে।" গুহর গাল ভর্তি হয়ে গেছে কথার প্রাচুর্যে, বার কয়েক ঢোক গিলে আবার বললেন, "আসলে কি জানেন, দিনরাত কুঁজো হয়ে চেয়ারে বসে এই এক ঘেঁয়ে কাজ করেন, বাইরে তো আমাদের মত বেরোন না, তাই। একটা কিছু করুন, যাতে সুখ শান্তি পান।"

"সুখী লোকেরাই তো মৃত্যু ইচ্ছার শিকার হয়। আপনারও হয়।"

গুহ যেন ছুরিকাহত হলেন। "কি বলছেন, আমি!"

"নিশ্চয়, আপনি সুখী একথা অস্বীকার করবেন ?"

নির্মল ঝুঁকে পড়ল। যেন ভূপতিত শিকারকে পর্যবেক্ষণ করছে। "আপনি সুখী নন ? আপনার স্ত্রী সুখী নন ?"

"নিশ্চয়।" গুহ শেষ চেষ্টার মত প্রায় চীৎকার করে উঠলেন। "কেন, সুখী হওয়াটা কি দোষের ?"

"সুখ নিয়ে আপনারা কি করেন ? সর্বদাই তো ব্যস্ত সুখকে আগলে রাখতে। এতে কি ক্লান্তি আসে না ? তখন কি মনে হয় না, আরো বড় সুখ, যাতে ক্লান্তি নেই, উদ্বেগ নেই, তার আশ্রয় নেওয়াই ভালো ?"

হটাৎ করে চেয়ার ঠেলে গুহ উঠে দাঁড়ালেন। একটি কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন।

নির্মল দেয়ালঘড়ি দেখল। আজ ওকে বিদায় করতে বেশি সময় লাগেনি। লেখার মাঝে এইভাবে এসে লোকটা সব গুলিয়ে দিয়ে যায়। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন। নির্মল কলম খুলে লেখার দিকে তাকাল। ডেথ্ শব্দটির সঠিক ব্যবহার কিভাবে হয়, উদাহরণ দিয়ে বাক্য রচনা করতে হবে।

বইয়ের তাকগুলোর দিকে সে তাকাল। যে কোন একটা বই খুললে একটি বাক্য পাওয়া যাবেই। উঠে নামিয়ে আনতে হবে। খুঁজে বার করে লিখতে হবে, অনুবাদ করতে হবে। এর থেকে বরং বানিয়ে একটা বাক্য রচনা করে ফেলা যায়। কিন্তু বাক্যের শেষে ব্র্যাকেটে কোন বড় লেখকের নাম দেওয়া যাবে না। লোকের ধারণা বড় লেখকরাই শুধু শব্দের যথাযথ ব্যবহার জানে, উজবুগ আর কাকে বলে! একটা চমৎকার বাক্য লিখে পাশে যদি শেক্সপীয়রের নাম বসিয়ে দিই! চিটিং, ঠকানো হবে ? কাকে ?

শেক্সপীয়র, না এই অভিধানের পাঠককে ? লোকটা তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে, মানহানির মামলা করতে আসবে না।

নির্মল হাসল। বানিয়ে লিখলে মন্দ হয় না। অন্যায় হবে বটে, নিজের লেখা অন্যের নামে চালিয়ে দেওয়ায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি কি ? এতে আমারই সুবিধে, কষ্ট করে উঠে তাক থেকে বই আনতে হবে না।

উঠতে হবে না, এই ভেবেই নির্মল আরাম বোধ করল। একবার বাথরুমে যাওয়া দরকার। একটু পরে গেলেও চলবে। দুটো পা তুলে দিল, যে চেয়ারে গুহ বসেছিলেন। শব্দ করে আঙুল মটকালো। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে পাণ্ডুলিপির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় চোখ বুজল।

হঠাৎ চটকা ভাঙল প্রচণ্ড শব্দে। একটা জেট বিমান নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে। পিছনে যেন বিরাট পাথরের চাঙড় বাঁধা। তারই ধাক্কায় বিশ্ব চরাচর চুরমার করতে করতে বিমানটি চলে গেল। সিধে হয়ে বসতে গিয়ে নির্মল টের পায় স্নায়ুকোষের প্রাচীরগুলো ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। বুকের মধ্যে দপদপ করছে।

কিছুক্ষণ পরেই তার এই বিধ্বস্তভাব কেটে গেল। ঘড়িটা টকটক করছে। দূরের কোন বাড়িতে নাছোড়বান্দা বেহালাবাদকটি আজও সাধনা সুরু করেছে। এই দুটি শব্দ উদ্ধারকারীর মত নির্মলকে টেনে তুলল। চোখে মুখে জল দেবার জন্য সে বাথরুমে এল।

দুটি ফ্ল্যাটের বাথরুম পাশাপাশি। এ বাড়ির প্রতি তলাতেই তাই। বাথরুমের জানলায় গরাদ নেই, পাল্লায় ঘষা কাঁচ লাগানো। জানলা খোলা দেখে নির্মল বিরক্ত হল। পাশের ফ্ল্যাটে চোর ঢুকলে এই জানলা গলে কার্নিশে নামতে পারে। ড্রেন পাইপ ধরে ওপাশে হাত বাড়ালেই পাশের বাথরুমের জানলায় পৌঁছন যায়। গয়ারামকে জাগিয়ে তুলে ধমক দেবার ইচ্ছাটি মুলতবী রেখে সে জানলা বন্ধ করল। চৌবাচ্চায় মুখ ডুবিয়ে দিল।

সন্তর্পণে নির্মল চোখ খুলল। ঘোলাটে আবছা। চৌবাচ্চার তলায় কালো কালো কি সব, সম্ভবত শ্যাওলা। ডান হাতটা জলে ডুবিয়ে নাড়তেই, পর্দার মত কালো শ্যাওলা দুলতে থাকল। মুখ তুলে নিল সে। দমবন্ধ হয়ে আসছিল।

হাওয়ার জন্য নির্মল রাস্তার ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সারি দেওয়া গাছের ডালপালা রাস্তার আলোকে চেপে ধরেছে ভূপৃষ্ঠে। ভারী ক্লান্ত হয়ে রাস্তা দিয়ে কেউ চলেছে। ঝুঁকে দেখল, পা টেনে টেনে একটা ষাঁড়। অজস্র নক্ষত্র। কেউ যেন একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে আকাশে চেপে নিভিয়েছে। নির্মল ঠাণ্ডা রেলিংয়ে কপাল ঠেকাল। এই গভীর রাতে নিঃসঙ্গতা প্রকট হয় অতি ধীরে।

গুহদের ফ্ল্যাটে নীল আলো জ্বলছে। প্রতিটি ঘরে, কলঘরে, দালানেও। মিসেস গুহর ভূতের ভয়। রাতে ওর নাকি মনে হয়, কে এসে গলা টিপে ধরবে। মাস দুয়েক আগে ঠিক এইভাবেই নির্মল দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মাঝে রেলিং-এ কপাল ঠুকছিল। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন মিসেস গুহ। নির্মল অপ্রস্তুত হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে। গুহর টর্চের আলোয় বারান্দাটা তোলপাড় হয়। পরদিন তিনি জানান, কেউ যেন বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল বলে ওর স্ত্রীর মনে হয়েছিল। নির্মল বলেছিল, উনি কি রাত্রে জেগে থাকেন এই সব দেখার জন্য ? গুহ বলেন, প্রতি রাত্রেই ওর ঘুম ভেঙে যায়।

একটা কুকুর তারস্বরে চীৎকার শুরু করতেই নির্মল শুতে গেল। শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ল, গয়ারাম তুলে দিল ভোরবেলাতেই। প্রকাশক এসেছে। দশ মিনিটেই কথা সেরে নির্মল আবার ঘুমিয়ে পড়ল। এ লোকটিকে আরও একটি প্রি-ইউনিভার্সিটির নোট লিখে দিতে হবে।

বুধবার অনন্তর বড় ছেলের উপনয়ন। পরিচিত একজনকে মাত্র নির্মল দেখতে পেল। সুধাংশু ষোল বছর কলেজে পড়াচ্ছে। পাঞ্জাবীর গলায় বোতাম আঁটা, কাঁধে পাট-করা চাদর।

"আমাদের আর থাকা না-থাকা।"

নির্মলের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "তুমি কলেজ ছাড়লে কেন?"

"এমনি। রোজ একঘেয়ে বকতে ভাল লাগছিল না।"

"বইগুলো তো বেশ ভালই চলছে।"

নির্মল হাসল। সুধাংশুও। প্রায় চার বছর পরে দেখা।

"ছেলেপুলে কটি?"

নির্মল হেসে মাথা নাড়ল।

"একটিও না।" এবং সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জিজ্ঞাসা, "শুনেছিলাম একটা টিউটোরিয়াল করেছ?"

সুধাংশু ঘাড় নাড়ল।

"কি রকম রোজগার হচ্ছে?"

"বড্ড খাটুনির কাজ। দুজন পোস্ট গ্র্যাজুয়েটকে রেখেছি। আমার বউও পড়ায়। অংকটা ভালই পারে, বি এ-তে তো অনার্স ছিল।"

সুধাংশুর স্তিমিত চোখে ঔজ্জ্বল্য দেখা দিয়েছে। নির্মল মুখ ফিরিয়ে ঘরের আর এক কোণের আলোচনায় মন দিল। হাসির কথা হচ্ছে।

"অসীমাকে তো বললুম, এবার তোর বউকে রেস্ট দে, তা হতচ্ছাড়া বলল...." বক্তা নিচু স্বরে কিছু বলল, হৈহৈ করে উঠল বাকিরা।

"ওকে তো দেখি সন্ধের পর ময়দানে ঘুরঘুর করে। বউ তো অনেক দিন শয্যা-শায়ী।"

অনন্ত ভিতর থেকে এল। ঘামে টসটস করছে। গল্পগুজবের মাঝখানে বসল।

নির্মল মাথা হেলিয়ে সুধাংশুকে জিজ্ঞাসা করল, "সারা দিনে কি কর?"

কথাটা মাথায় ঢুকল না। অবাক হয়ে সুধাংশু তাকাল, "কি করি মানে?"

"টাকা রোজগার ছাড়া?"

"আবার কি করব!"

হঠাৎ অনন্ত চীৎকার করল, "এই নির্মল, একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার শুনে যা, তোর প্রতিবেশিনী সম্পর্কে।"

চমকে উঠল নির্মল। এ রকম আসরে মিসেস গুহর কথা উঠল কি করে! হেসে বলল, "তুই তো আমার প্রতি-বেশিনীকে সেদিন এক মিনিট মাত্র দেখলি!"

"আমাদের আগের পাড়ায় ওরা যে ভাড়া থাকত। বেশ অবস্থাপন্ন, বাপ কোলিয়ারীর ম্যানেজার।"

অনন্তর বন্ধু বলাই যোগ করল, "ওর বড় ভাই তখন বিলেত গেছে, ডাক্তারী পড়তে।"

"তখন ও মালতী দত্ত" অনন্ত শুরু করল, "এখন যে রকম দেখতে তখনো ঠিক হুবহু তাই ছিল। প্রায় কুড়ি বছর তো হল। চেহারা কিন্তু একটুও বদলায়নি। ইন্টারমিডিয়েট পড়ত, ভবদেব নামে একটা ছেলে, তখন এম এ পড়ছে, ওকে পড়াত। সাঁতারে ভবদেবের খুব নাম ছিল। ছাত্রও ভাল। ম্যাট্রিক থেকে স্কলারশিপের টাকায় পড়ছে।"

"দেখতেও সুন্দর ছিল।" বলাই যোগ করল।

"তারপর যা হয়! প্রেমে পড়ল দুজনেই। জানতে পেরে ধানবাদ থেকে বাপ ছুটে এল। ভবদেবের চাকরী গেল। কলেজে গিয়ে দেখা করত সে। মালতীকে তখন পাটনায় পিসীর কাছে পাঠান হল। সেখান থেকে একদিন ভবদেবের সঙ্গে সটকান দিল।"

"এই তোর গপ্পো! দ্যাখ, দ্যাখ, ওদিকে কদ্দুর, নটা বেজে গেল।" বক্তা হাতঘড়ি দেখল। অন্যান্যরাও ব্যস্ততা দেখাল। এই-ভাবে থামিয়ে দেওয়ায় অনন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল। এদের খেতে বসানোর উদ্যোগ করতে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নির্মল ঠিক করে ফেলল, বলাইয়ের পাশে বসে খেতে খেতে বাকিটুকু জেনে নেবে।

ফিরতে রাত হল। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়ই নির্মল টের পেল গুহদের ফ্ল্যাটে গ্রামোফোন বাজছে। ওদের দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলল বাচ্চা চাকরটা।

"সায়েব আছে?"

নেই শুনে, নির্মল ভাবল মালতী গুহর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলবে কি না। অনন্তর বাড়ি থেকে এতটা পথ হেঁটে এসে ফুর-ফুরে লাগছে। হঠাৎ গ্রামোফোন বন্ধ হল। খসখস চটির শব্দ। মিসেস গুহ এলেন।

"কি ব্যাপার, উনি তো এখনো আসেননি। অফিসে মিটিং আছে অফিসারদের।"

নির্মল এই প্রথম লক্ষ্য করল, মালতী গুহ বাড়িতেও ঠোঁটে রঙ ব্যবহার করেন।

"না, খুব কিছু দরকার নয়। সেদিন আপনার পায়ে লাগল, কেমন আছে?"

"কোথায় লাগল!" মালতী গুহ বিস্মিত হলেন। নির্মল লক্ষ্য করল, উনি ভ্রূতে পেন্সিল ব্যবহার করেন।

"ওর কথা আর বলবেন না। বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি, ভেতরে আসুন।"

নির্মল গুহদের বসবার ঘরে এসে আগের বার আসবাবের অবস্থান যে রকম দেখে-ছিল, এখন আর তা নেই।

"দেখছি, অন্য রকম করে সাজিয়েছেন।"

"হ্যাঁ, এক রকম দেখতে দেখতে চোখ পচে যায়। নতুন করে য়্যারেঞ্জ করলে হয় কি, নিজেকেই নতুন লাগে, তাই না?"

জবাব না দিয়ে নির্মল ঘরটাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকল।

"মিস্টার গুহর শিকারের শখটখ এখন আর নেই বোধ হয়।"

মালতী গুহও ছবিটার দিকে তাকালেন। বন্দুক হাতে বীরোচিত ভঙ্গিতে তার স্বামী একটা মৃত চিতার মাথায় পা দিয়ে। লক্ষ্য করার বিষয়, গুহর মাথা তখন চুলে ভরা।

"আমিই ওর শখটা ছাড়িয়েছি। আপনিই বলুন, ব্যাপারটা বিশ্রী নয় কি, এই অর্থহীন হত্যা?"

"অর্থহীন বলছেন কেন, ওরা তো হিংস্র।"

"ওটা একটা অজুহাত মাত্র। বিবেককে সান্ত্বনা দেওয়া।"

উনি মিটমিট করে হাসছেন। বারান্দা থেকে নির্মল এক সন্ধ্যায় দেখেছিল, গুহ শোবার ঘরের মেঝেয় বাঘ হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন, খাটে দাঁড়িয়ে মালতী গুহ বন্দুকের মত ছড়িটাকে বাগিয়ে দুম্ করলেন। গুহ লুটিয়ে পড়লেন।

খাওয়াটা ভরপেট হয়ে গেছে।

এখন বিবেক-টিবেক নিয়ে তর্ক পোষায় না! ওটা তো আর বাইরের জিনিস নয় যে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া চলে।

"বুঝলেন, মিস্টার গুহ আমার ওপর খুব চটেছেন।"

"কেন?"

"ওকে বলেছিলাম মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সময় মরতে চায়। বিশেষত যারা সুখী। তাইতেই উনি চটেমটে বেরিয়ে গেলেন।"

"ওর কথা আর বলবেন না।"

মালতী গুহ উঠে গেলেন ঘরের কোণে টেবলে রাখা মাছের কাঁচের আবাসগৃহের কাছে। ঝুঁকে রঙীন মাছগুলিকে দেখতে থাকলেন। নির্মলের মনে হল, স্বামীর কথায় যেন অস্বস্তিতে পড়েছেন।

"তখন কি রেকর্ড বাজাচ্ছিলেন? আমি অবশ্য ক্লাসিক গানের কিছুই বুঝি না।"

"আবদুল করিমের ঠুংরী।"

উনি সিধে হয়ে দাঁড়ালেন। দীর্ঘ দেহ, ঋজু। পাতলা বাদামী চামড়া। দুটি হাত যেন দুটি রাজহাঁসের গলা। কুড়ি বছর আগে এই মহিলাটি কতটা আকর্ষণীয় ছিলেন, নির্মল সে-কথা ভাবল। ভবদেবকে দোষ দিলে অন্যায় হবে। ওর জন্যে এখনো মৃতেও চোখ খুলবে, কাপুরুষেও আত্মহননের সামর্থ্য দেখাবে।

নির্মলকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে দেখে মালতী গুহ আঁচলটাকে বুকে আরো ছড়িয়ে বাম বাহু পর্যন্ত টেনে দিলেন। চাবুক খেল নির্মল। কুঁকড়ে গেল সে। সন্দেহ নেই উনি ভেবেছেন, এই লোকটা কলুষ চিন্তা করছে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ভারী ভিজে কাঁথায় সে জড়িয়ে গেল। প্রাণপণে তা টেনে ফেলার চেষ্টায় বলল, "আপনার মত আমার এক বোন ছিল। মারা গেছে।"

"আহা!"

মালতী গুহ যেন আঘাত পেলেন। "কি হয়েছিল?"

"নিউমোনিয়া। তখন আঠারো উনিশ বয়স। কলেজে পড়ত।"

"ভারী দুঃখের কথা। কেউ মারা গেছে শুনলে এত কষ্ট হয়।"

উনি আলতোভাবে সোফায় বসলেন, চোখে স্নিগ্ধ সহানুভূতি।

"আপনাকে দেখলেই ওর কথা মনে পড়ে। ওর মরার মুহূর্তে আমি পাশে ছিলাম।"

নির্মলের দমবন্ধ হয়ে আসছে। উনি কি বুঝতে পারছেন তার সামনে একটা লোক ভরপেট খেয়ে এসে তাহা মিথ্যা বলে যাচ্ছে! প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, সে সচ্চরিত্র।

"আপনাকে খুব ভালবাসতো?"

"হ্যাঁ।"

"এখন কত বয়স হ'ত?"

"আপনারই বয়সী। ঠিক আপনার মতই লম্বা, গলার স্বর, কথাবলার ভঙ্গিটাও। যখন ওখানে গিয়ে ঝুঁকে মাছ দেখছিলেন, চমকে উঠেছিলাম। মনে হল ও এসে যেন দাঁড়িয়েছে। ভীষণ ভয় লেগেছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে শেষ দেখেছি।"

নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে সে যেন আরো জড়িয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে বানিয়ে বানিয়ে এক ঘণ্টা ধরেও বলা যায়। কিন্তু কেন তা বলতে হবে। নির্মল নিজের উপর রাগতে শুরু করল। এ ধরনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কৈফিয়তের মত এত কথা বলতে হচ্ছে কেন?

"আপনার বোনের নাম কি ছিল?"

"মিনু, মৃণ্ময়ী।"

"অসুখ হল কেন?"

"যেভাবে হয়, ঠাণ্ডা লেগে। রাগ করে সারা রাত ছাদে শুয়ে ছিল। ঝগড়াটা হয়েছিল আমার সঙ্গেই, একটা গল্পের বই নিয়ে।"

"খুব অভিমানী ছিল?"

"হ্যাঁ। জেদীও।"

"নিশ্চয় খুব আদর পেত।"

"বাড়ির একমাত্র মেয়ে ছিল।"

এই বলেই নির্মল উঠে দাঁড়াল। একটা পচা টক গন্ধ পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

"যাচ্ছেন।"

মালতী গুহও উঠে দাঁড়ালেন। নির্মল অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। ওর কাঁধ রাজহাঁসের গলার মত। তবে এখন তাকালে নিশ্চয় ভাববেন না যে, লোকটার দৃষ্টিতে লোভরোগ আছে। বরং ভাববেন আহা, মৃত বোনকেই দেখছে। এই দেখায় সাহায্য করে নিশ্চয় খুশিও বোধ করবেন।

"হ্যাঁ যাই।"

"চা-ও দেওয়া হল না।"

"তাতে কি হয়েছে। তাছাড়া এইমাত্র একটা নেমন্তন্ন খেয়ে আসছি।"

মালতী গুহ দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, "মাঝে মাঝে তো আসলেই পারেন।"

নির্মল হাসল মাত্র।

দয়ারাম দরজা খুলে দিল। নির্মল ফিরে এসে শুয়ে পড়ল।

মাঝরাতে অন্ধকার হাতড়ে টেবল-ল্যাম্প জ্বালল। ড্রয়ার থেকে নীল প্যাড আর লাল কালির কলম বার করল। কয়েক মুহূর্ত ভেবে বাঁ হাতে ধরে ধরে কয়েকটা কথা লিখল। ছিঁড়ে ফেলে আবার লিখল: মালতী, শান্তি পাচ্ছি না কেন। বার বার তোমাকেই শুধু মনে পড়ে। ভবদেব।

শুধু এই কটি কথা। লেখাটার দিকে তাকিয়ে নির্মল হাসছে। কুড়ি বছর আগে ভবদেব আত্মহত্যা করে মরেছে, নারী হরণ মামলার আসামী না হতে চেয়ে। মালতী গুহ কি তা জানে না! এ চিঠি পাওয়া মাত্রই জানবে, অন্য কেউ। অভিধানের খোলা পাতায় চোখ পড়তেই থেমে গেল। দ্রুত বইগুলো বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার মনে হল কেউ যখন দেখতে পাচ্ছে না, তখন ভয় পাওয়াটা অহেতুক।

সকালে গুহ এলেন। ভারী চিন্তিত।

"টুরে যেতে হবে, কিন্তু কি মুশকিলে পড়লুম বলুন তো! রাণু কান্নাকাটি শুরু করেছে।"

"কেন, এর আগেও তো গেছেন।"

"তাই তো বললুম। কিন্তু কি যে হয়েছে, কিছুতেই যেতে দেবে না। খুব জরুরী ব্যাপার, জেনারেল ম্যানেজার নিজে কাজ

বাড়িতে ডেকে পাঠিয়ে বললেন।

গুহ শিশুর মত তাকিয়ে রইলেন। রাগ চড়তে শুরু করেছে নির্মলের। কিন্তু হেসে বলল,

"কারণটা কি?"

"কি জানি। এ রকম মাঝে মাঝে এক-গুঁয়ে হয়ে যায়। কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চায় না। তাছাড়া জানেনই তো ভূতের ভয় আছে। প্রত্যেক রাতেই চমকে চমকে ওঠে।"

"নির্দিষ্ট কারণ যখন নেই, এক্ষেত্রে আমিই বা আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি।"

গুহ চলে গেলেন। নির্মল ড্রয়ার তন্ন তন্ন করেও একটা খাম পেল না। নীল চিঠিটা নিয়ে সে বেরোল ডাকঘরের দিকে।

ডাকপিওন সকাল দশটা নাগাদ এ বাড়িতে চিঠি বিলি করতে আসে। পরদিন সাড়ে নটা থেকে নির্মল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। রাত্রে চমৎকার ঘুম হয়েছে। সকালটাও ঝরঝরে। তাছাড়া এইমাত্র স্কুলের একটা বাস গেল। ফুটফুটে একটা ছেলে তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে গেছে।

পিওন আসছে। এ বাড়িতে না ঢোকা পর্যন্ত নির্মল বারান্দায় রইল, তারপরই ছুটে এসে দরজাটা প্রায় সিকি ইঞ্চি ফাঁক করে অপেক্ষা করতে লাগল। গুহদের দরজায় লাগান লেটারবক্সটা দেখা যাচ্ছে।

দোতলায় কলিংবেলের শব্দ হচ্ছে। সায়গলদের চিঠি, ডেকে দিতে হয়। হঠাৎ দরজাটা খুলে যেতেই নির্মল চমকে সরে গেল। গুহ অফিসে বেরোচ্ছেন।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নির্মল আবার দরজার ফাঁকে চোখ রাখল। তার এই উপস্থিতি বাইরে থেকে টের পাওয়া সম্ভব নয়।

মালতী গুহ দাঁড়িয়ে। মসমস শব্দটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। ওদের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নির্মল পিওনের জুতোর শব্দের অপেক্ষায় থেকে বুঝল এতক্ষণে তার উপরে আসা উচিত ছিল। হতাশ হয়ে ঘরে আসামাত্র রাস্তা থেকে গুহর চীৎকার শুনল। পা টিপে বারান্দায় এসে নির্মল উঁকি দিল। পিওন চলে যাচ্ছে। গুহর হাতে একটা খাম।

"তোমার চিঠি।"

গুহ খামটা মাথায় তুলে নাড়ল। মিসেস গুহ বারান্দায়। নির্মল ভিতরে সরে এল। একটা বুরুশ শিরাগুলোর মধ্যে ঘষে যাচ্ছে। ময়লা পলি সাফ হয়ে যাওয়ায় রক্তের ছোটা-ছুটি বেড়ে গেছে, তাই ঠক্ ঠক্ করে তার হাত-পা কেঁপে উঠল। চেয়ারে হেলান দিয়ে, কাপাগলায় আর এক কাপ গরম চা দেবার জন্য গয়ারামকে হুকুম দিল।

গুহ আবার এলেন সন্ধ্যাবেলায়। খুব বাস্ত।

"আপনার ওডিকোলন আছে? দুপুর থেকেই রাণুর ভীষণ মাথা ধরেছে। উঠতে পারছে না।"

"না, নেই।"

গুহ দ্রুত চলে গেলেন। নির্মল মুচড়ে পাক খেয়ে টেবলের উপর মুখ গুঁজে পড়ল। কাকপক্ষীতেও ওর হাসি জানতে পারল না। ঘড়িতে সাতটা বাজল। নির্মল খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতাটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকল। আধ ঘণ্টা পরে শিস দিতে দিতে সে ফ্ল্যাট থেকে বেরোল।

ফিরল প্রায় বারোটায়। রাস্তা থেকেই দেখল গুহদের শোবার ঘরে সাদা আলো জ্বলছে। বোধহয় মাথাধরাটা সারেনি। সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে উঠল। টের পেলেই গুহ হয়তো মাথাধরা সারানোর পরামর্শ চাইতে বেরিয়ে আসবে। নির্মল ওদের লেটারবক্সটায় আস্তে একটা টোকা মারল।

শুতে যাবার আগে সে নীল প্যাড আর লাল কলম নিয়ে বসল। আটটি খাম কিনেছিল, সাতটা রয়েছে। বাঁ-হাতে ধরে ধরে সাতটি চিঠি লিখল। প্রতিটিতে একই কথা। দুদিন অন্তর একটি করে ডাকে ফেললেই দু-সপ্তাহ কেটে যাবে। নির্মল একটি ব্যাপারে শুধু ফাঁপরে পড়ল। গুহ ফ্ল্যাটে থাকাকালীন সময়ে যদি দেখেন দুদিন অন্তর বৌয়ের নামে চিঠি আসছে, তাহলে নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করবেন। নিশ্চয় কৌতূহলী হয়ে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করবেন। নির্মলের তা মোটেই অভিপ্রেত নয়। দুপুরের শেষ-দিকে একবার পিওন আসে। সেই ডাকটাকে কাজে লাগাতে হলে কোন সময়ে চিঠি ফেলা দরকার, সেটা আবিষ্কার করতে হবে।

বিছানায় শুয়ে নির্মল এই সমস্যাটার কথা ভাবছিল, তখন খুব শব্দ করে একটা জেটবিমান উড়ে গেল। বহুক্ষণ ধরে বেহালার যে ক্যানক্যানে সুরটা আসছে, তার অবশ্য কোন হেরফের ঘটল না।

এরপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে পিওন আসার সময় হলেই নির্মল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দরজাটা সামান্য ফাঁক করে চোখ পেতে দেয়। পিওন বাক্সে চিঠিটা ফেলে যায়। উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে সে। ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারী শুরু করে। আবার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। বাক্সের পাল্লায় চৌকো একটা কাঁচ লাগানো। ফিকে নীল খামটা রয়েছে বোঝা যায়। নির্মলের তখন ইচ্ছে করে ওদের দরজায় টোকা দিয়ে বলে আসে, আপনাদের একটা চিঠি এসেছে। কিংবা একটু পরেই হাজির হয়ে বলে, এই যে এলাম। না এসে থাকতে পারি না। আপনাকে হুবহু আমার বোনের মত দেখতে।

এর মধ্যে একদিন সে লক্ষ্য করল, মিসেস গুহ দুপুর থেকে তাদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে।
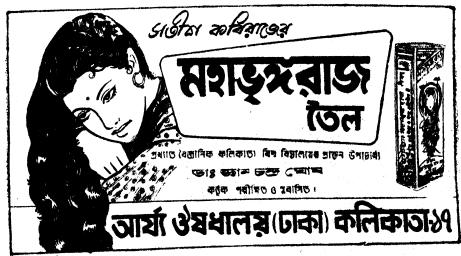
স্নান করেন নি। চুলে জট। মুখে প্রসাধনের স্পর্শ নেই। দেহটি নুয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে চোখ সরু করে রাস্তার বহুদূর পর্যন্ত দেখছেন। চোখের কোণে অনিদ্রার কালি। রৌদ্রে পুড়তে পুড়তে তিনি কয়েকবার চোখ বুজলেন।

নির্মলের মনে হল, মালতী গুহের অজস্র সমস। যেন পোকা লেগেছে। ভেতরটা ফোঁপরা হলেও কোনরকমে খাড়া রয়েছেন। কিন্তু টের পেয়ে গেছেন আর প্রয়োজন নেই। ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে চলে যাবার তোড়জোড় চোখের চাউনিতে।

নির্মল ওর অবয়বটিকে চোখে ধরে রয়েছে। হঠাৎ নজরে পড়ল, ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে ওর মুখ। চোখ দুটি অনুসরণ করছে ক্রমশ এগিয়ে আসা কোন মানুষকে। নির্মল বুঝল ডাকপিওন। চতুর্থ চিঠিটি নিয়ে আসছে। প্রবলভাবে রেলিংটা আঁকড়ে ধরেছেন। মাথাটা একটু একটু করে ঘুরে হেঁট হচ্ছে।

তারপর অনেকক্ষণ মিসেস গুহ মাথা তুললেন না। নির্মল স্পষ্ট দেখল, কাঁপছেন। একটু পরে দু'হাতে বুক চেপে টলতে টলতে ঘরে চলে গেলেন। নির্মল বারান্দায় এসে পিওনকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেখল।

পরদিন দুপুরে গুহ হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন। নির্মল তখন বেরোচ্ছিল পাবলিশারের কাছে যাবে বলে।

"কি ব্যাপার, আপনি এখন?"

"ডক্টর সেনগুপ্তকে কল দিয়ে অফিস থেকে চলে এলুম। রাণুর হার্টের ট্রাবলটা আবার........"

লাফাতে লাফাতে গুহ উঠে গেলেন।

ট্রাম-স্টপ থেকে নির্মল ফিরে এল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় বসে থেকে ঠিক করল, কয়েকদিন একদম কাজে বসা হয়নি, শুরু করা যাক। বইগুলো বন্ধ। প্রতিটির পাতা উল্টিয়ে খুঁজে খুঁজে ডেথ্ বার করল। উদাহরণ সহ প্রয়োগ দেখান হয়নি। উঠে গিয়ে খুঁজে খুঁজে সেক্সপীয়র বার করল। চেয়ারে বসে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মনে হল, বোধ হয় আমার জন্যই মিসেস গুহ অসুস্থ হয়েছেন। কুঁজো হয়ে বসেছিল, মাথাটা টেবিলে ঠেকাল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন রাত প্রায় একটা। দরজায় করাঘাতে নির্মলের ঘুম ভাঙল। খুলে দেখে গুহ।

"কি রকম যেন করছে।"

নির্মলের চোখে তখনো ঘুম। গুহর টাকটাকে তার টুপির মত মনে হল। বুক-পিঠে লোমগুলো যেন আঠা দিয়ে আটকানো।

"এখন কি করি?"

"ডাক্তারকে কল দিন।"

"দুপুরে দিয়েছিলাম, পাইনি। সকালেই রুগী দেখতে পাটনা চলে গেছেন।"

"আরো তো ডাক্তার আছে। আমাদের এই রাস্তাতেই তো গোটা পাঁচছয় বাড়ির পরেই একজন আছে। চটপট ডেকে আনুন।"

নির্মল ওকে কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিল।

"রাতটা তো কাটুক। কালকে স্পেশালিস্ট আনবেন।"

ঠেলে দিল সিঁড়ির দিকে। কলের পুতুলের মত গুহ গড় গড় করে নেমে গেলেন। ওদের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। নীল আলোগুলো জ্বলছে। সিধে দালানটা অন্ধকার-প্রায়। শোবার ঘর থেকে জানলার পর্দায় ছেঁকে সাদা আলোর তলানি দালানে পড়েছে। নির্মলকে পিছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে কেউ গুহদের ফ্ল্যাটে ঢুকিয়ে দিল।

পর্দার নীচে কিছুটা ফাঁক রয়েছে। পর্দা সরিয়েই দেখা যেত, তা না করে সে উবু হয়ে বসল। খাটটা জানলা থেকে দূরে। বালিশে হেলান দিয়ে মালতী গুহ আধশোয়া। চোখ বন্ধ। দুহাত বুকে জড়ো করা। মাথা নামানো।

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করার দরকার বোধ করল নির্মল। বদলে ঢোক গিলল। মুখ বিকৃতি করে বুক চেপে মালতী গুহ কাত হলেন। অস্ফুট কয়েকটা শব্দ হল। শরীরটা ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসে কাঁপছে।

নির্মল অকারণে নিজের পিছন দিকে তাকাল। মনে হয়েছিল কেউ যেন পিছনে। খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। ওখানকার আলো অত্যন্ত ম্লান। দূর থেকে কটু লাগে। গুহ যেন বড্ড দেরী করছেন।

আর একবার কাতরালেন মালতী গুহ। নির্মল শিউরে উঠল।। হঠাৎ ওর মনে হল, যদি মারা যায়! ভাবামাত্রই সে অবশ হতে শুরু করল। শিরাগুলোকে বেছে বেছে আঁটি বেঁধে রাখা হয়েছে। হাড় আর মাংসের স্তূপ এখন সে। এখন যদি ওকে জানিয়ে দিই, নির্মল ভাবল, আসলে চিঠিগুলো পাশের ফ্ল্যাটের নির্মলবাবুর লেখা। বিশ্বাস না হয়, ওর বাঁ-হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন। ওর ড্রয়ার খুঁজলে নীল প্যাড আর লালকালির কলম পাওয়া যাবে। এখনো তিনটে চিঠি ওর তোষকের নীচে ডাকে দেবার জন্য রয়েছে। তাতে মালতী গুহের নাম-লেখা। এই তথ্যগুলো জানালে কি ওর অসুখ সেরে যাবে?

নির্মল চোখ সরু করে দেখল। বুঝতে চেষ্টা করল, মারা যাচ্ছেন কিনা। এত বোকা হয় মানুষ, এটুকু বুঝল না ঐ চিঠি কোন নষ্ট ভ্রষ্ট, জীবিত লোকের লেখা!

"শুনছেন।"

নির্মল আস্তে করে তাকাল। মনে হচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে কারা উঠে আসছে। দরজার দিকে তাকাল। করিডরে ম্লান আলো, বিবর্ণ দেয়াল। সারা-বাড়িটা নিস্তব্ধ।

"শুনছেন, আমি নির্মল, পাশের ফ্ল্যাটের।"

এবারে আর একটু জোরে বলল। বলার সময় মাথাটা দুই গরাদের ফাঁকে চেপে ধরল।

"কে, কে?"

উঠে বসেছেন মিসেস গুহ। বিস্ফারিত চোখে জানলার দিকে তাকিয়ে। ধীরে ধীরে ওর চোয়াল ঝুলে পড়ল। জানলার সাদা পর্দা ঠেলে মানুষের মাথার মত একটা বস্তু ঘরে ঢুকছে যেন। খাটের কিনারে গড়িয়ে এসে নামতে গেলেন। আঁচলে পা বেধে লুটিয়ে পড়লেন।

বাহিনীর অগ্রবর্তী ড্রাম-বাদকের মত সিঁড়িতে পদধ্বনি শেষ ধাপে পৌঁছচ্ছে। কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। গুহের উত্তেজিত কণ্ঠ চেনা যায়। নির্মল ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগল।

সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে লুকোবার উপায় নেই। সর্বত্র আলো জ্বলছে। পাশে বাথরুমের দরজা দেখে নির্মল ঢুকে পড়ল। পদধ্বনি দরজা অতিক্রম করে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে।

ব্যূহ মধ্যে শেষ জীবিতের মত নির্মল পলায়নের উপায় খুঁজল।

বাথরুমের গরাদবিহীন জানলাটা খুলে বাইরে পা বাড়াল। সরু কার্নিশে পা রেখে, অপর পা-টিকেও বার করে এনে; ডান হাত দিয়ে ড্রেনপাইপ ধরে, পা ঘষে ঘষে তার নিজের ফ্ল্যাটের দিকে এগোল।

প্রথমে ড্রেনপাইপটাকে অতিক্রম করল। তারপর আবার ডানহাত বাড়িয়ে নিজের বাথরুমের জানলার ফ্রেম ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দেখল, ভিতর থেকে বন্ধ। জোরে ধাক্কা দিলেও ঘুমকাতুরে গয়ারাম শুনতে পাবে না।

নির্মল নীচে তাকাল। অন্ধকার বাট ফুট হাঁ নিয়ে তাকে গিলবার অপেক্ষায়। হাত কেঁপে উঠতেই বুঝল কিছুক্ষণের মধ্যেই সে পড়ে যাবে। ফিরবে কি? মুহূর্তেক ভাবল, তাহলে কিসের ভয়ে পালাচ্ছিলাম। আবার সে নীচে তাকাল। অহেতুক দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

ইঁদুরের মত কার্নিশ দিয়ে সে গুহদের ফ্ল্যাটের দিকেই ফিরে চলল।

সম্পাদক— শ্রীঅশোককুমার সরকার
আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং সুতারকিন স্ট্রীটস্থ কলিকাতা—১ আনন্দ [illegible] হইতে শ্রীস[illegible] ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত